শারদীয়া

শুকতারা

১৪০৪

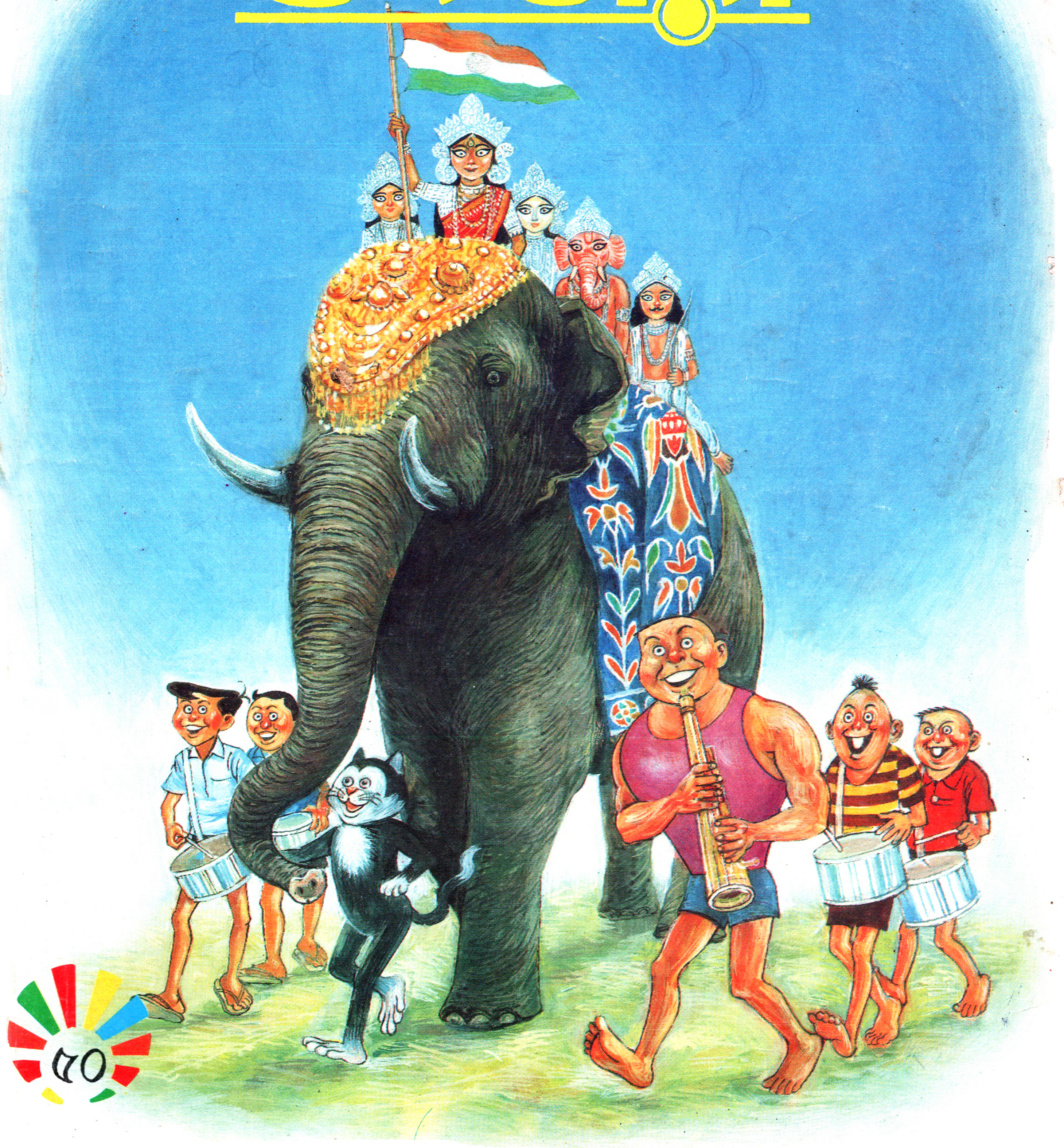

শারদীয়া শুকতারা ১৪০৪

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার

লিভারের সুরক্ষায় লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

''সর্বাধিক রোগের কারণ—

পেটের গন্ডগোল ও অসুস্থ লিভার''

অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, পেটের গোলমাল সারাতে আর লিভারের সুরক্ষায় **লিভোসিন** সেবন করুন।

ডাঃ সরকারের

এক ফলপ্রসূ

আবিষ্কার

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক

লিভার টনিক

স্বাস্থ্য আর সতেজতা লিভোসিনের শেষ কথা

Allen's ad / PAD / Liv / Ben / 03 / 97

Jupiter

Mfd. by : **JUPITER PHARMACEUTICALS LTD.**

Mktd. by : **JupiterAllen (India) Limited**

ArnikaPlus Apt. 35, A.P.C.Road, Calcutta - 700 009

Phone : 350 9026, 27 0224 Fax : (033) 26 0156, 351 1076

Jupiter Allen Emars allen's Dr. Sarkar Group

Serving for a better future

সোনালী স্বপ্নের ইন্দ্রধনু

বেনারসী, লালচেলী, মাথায়
টোপর, কপালে চন্দনের ফোঁটা,
কনে সেজেছে বিয়ের সাজে।
অঙ্গে আমাদের শিল্পীদের শিল্পের
পরশে অনবদ্য সৃষ্টি—
সোনার অলঙ্কার।

GE

গিনি এম্পোরিয়াম

১৭১ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০১২
ফোন : ২৪১ - ৬১৭৩/২৪১ - ৮৩১০ (ফ্যাক্স)

যে কোন উৎসবে ফ্যাশনের সাথে ম্যাচ করা সোনার গহনা, জড়োয়া সেট, সীতাহার, বালা অথবা নানা ধরনের হাল্কা ও ভারী সোনার গহনা আমাদের বিশেষত্ব। আসুন! আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সোনার সংসারে ও নিজের পছন্দমতো হাল্কা ভারী গহনার ডিজাইনের সম্ভার থেকে বেছে নিয়ে নিজের সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করুন এক নতুন মাত্রায়–

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত

মহামায়া জুয়েলারী হাউস

২২০ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা – ৭০০ ০১২ (বৌবাজার ক্রসিং) ফোন :– ২৬-৩১৪৪, রেসি :– ২৬-৪২৬১

চুলের সমস্যা !

• খুস্কি • চুলপড়া • অকালপক্কতা
• অ্যালোপেসিয়া এরিয়েটা

স মা ধা ন

বি শ্বে স র্ব প্র থ ম

ডাঃ সরকারের

এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল অ্যাকশন হেয়ার ভাইট্যালাইজার

আর্ণিকাপ্লাস

তলবিহীন হোমিও হেয়ার ভাইট্যালাইজার

লের গোড়া প্রাণবন্ত করে

ট্রায়োফার ট্যাবলেট

াওয়ার হোমিও হেয়ার টনিক

লিভার ও পেটের গোলমাল সারায়-যা

লের সমস্যার অন্যতম কারণ

কেশ সমস্যার সমাধানে
পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ।
প্রসাধন সামগ্রী নয়।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

• অতিরিক্ত চুল পড়া বন্ধ করে
• অসময়ে চুল পড়া/অকালপক্কতা রোধ করে
• চুলের বৃদ্ধি উন্নত করে • মাথার খুস্কি দূর করে
• চুলের পুষ্টি যোগায় তাই চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়

Allen

Mfd. by : **ALLEN LABORATORIES LTD.**
Mktd. by : JupiterAllen (India) Limited
ArnikaPlus Apt. 35, A.P.C.Road, Calcutta - 700 009
Phone : 350 9026, 3510062 Fax : (033)3512285, 3511076

Jupiter Allen Emars Allen's
Dr. Sarkar Group
Serving for a better future

শুকতারা

আশ্বিন ১৪০৪ ◻ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

সূচীপত্র

অপ্রকাশিত বড় গল্প ◻

আশাপূর্ণা দেবী—মেয়ে গোয়েন্দার বাহাদুরি ৮

সম্পূর্ণ উপন্যাস ◻

চিত্তরঞ্জন মাইতি—নোয়া, তর্তন ও ঈশ্বর ৬২

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—বাতিঘর রহস্য ২২

মানবেন্দ্র পাল—অলৌকিক জল্লাদ ১০২

দীপঙ্কর বিশ্বাস—মেজদাদার কারবার ১৩৬

অনিন্দ্য গোস্বামী—মরণ দ্বীপের মহারণে ২১৮

সঞ্জীব সিংহ—অস্ত্র-জলার মৃত্যু-ফাঁদ ১৮০

বড় গল্প ◻

নারায়ণ সান্যাল—ভূতায়ন ২৬৮

সুভাষ ধর—স্নোয়ি ২৪১

গল্প ◻

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—দেওয়ালের সেই ছবি ৪৭

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—শিবেনবাবু ভাল আছেন তো! ৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দুষ্টু প্রজাপতি ১২৭

সমরেশ মজুমদার—দুষ্টু পুতুল ৩০২

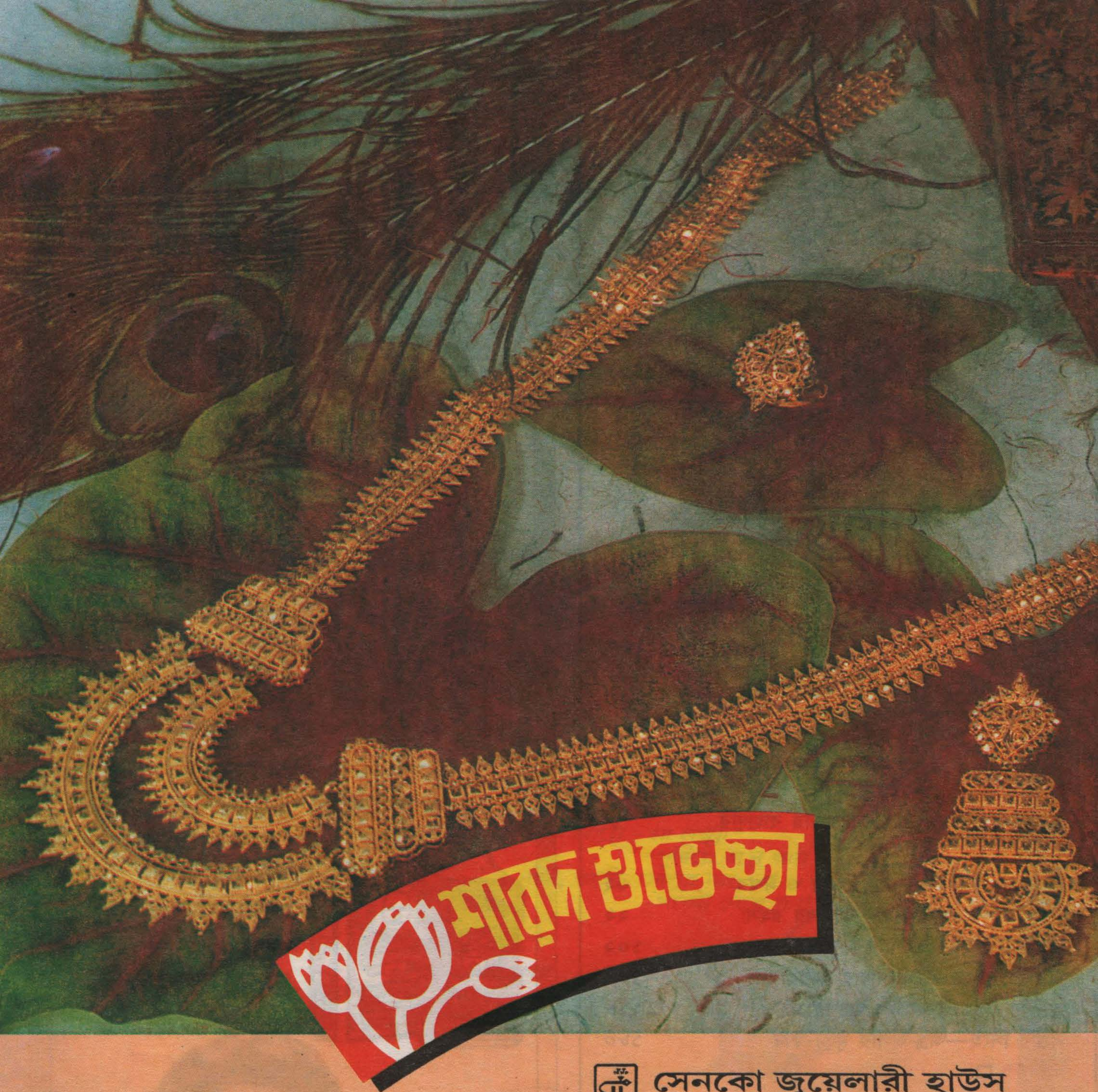

দি সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১৯৯ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন ঃ ২৪১-৬১০১/১৯৫৮

ন্যাশন্যাল এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্স ঃ 91-33-225-5358
ই-মেল ঃ ITBPC @ GEMS.VSNL.NET.IN
টেলেক্স ঃ 81-21-4545 VSN IN.
BENTEX ঘড়ির অনুমোদিত ডিলার

সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৭০/২, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন ঃ ২৪১-৭১০৪/৯৫৮৫

সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১১৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
লেকমার্কেট, ফোন ঃ ৪৬৬-৬১২৪

নিউ সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৯৫/১, রাসবিহারী এভিনিউ (বিজন সেতুর কাছে)
কলিকাতা-১৯, ফোন ঃ ৪৪০-৪৬৯৫

Banker's Credit Card-এর ব্যবস্থা আছে

মঞ্জিল সেন—ধলা ৯২
তারাপদ রায়—অভিরূপের পৃথিবী ১৫৩
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়—বাবাইয়ের রেনি-ডে ১৯
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়—ভিক্ষু ২৬২
রমেন দাস—অভিমান ১৬৫
অংশুমান বসু—কাকতাড়ুয়া ২৫১
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ফাঁসি থেকে নিরুদ্দেশ ২৯৫

ভূতের গল্প □

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—অদ্ভুত যত ভূত ১৯৮
অনীশ দেব—ঠিক দশটায় ট্রেন এসেছিল ২৮৮
গৌরী দে—২৫ বছর পরে ১৫৭

গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প □

প্রফুল্ল রায়—তোরঙ্গ রহস্য ৫২
নিমাই ভট্টাচার্য—বাহাদুর ভাইমণি ২৮৪
অদ্রীশ বর্ধন—কায়রোর পাগলা বৈজ্ঞানিক ৯৬
অজেয় রায়—রহস্যময় চুরি ১৫৯

হাসির গল্প □

হিমানীশ গোস্বামী—জীবরামের মামার মামার মামার গল্প ২০২
আনন্দ বাগচী—গুলাতঙ্ক ২৭৭
হীরেন চট্টোপাধ্যায়—গগনদা দি গ্রেট ১৭০
সুচিত্রা ভট্টাচার্য—পেটে যখন ছুঁচোর ডন ৩০৫
পবিত্র সরকার—সুমনা মাসির দিনকাল ১৭৪

শিকার ও জঙ্গলের গল্প □

সুকুমার ভট্টাচার্য—বুদ্ধু ও কালো সনপ ৮২
পরেশ দত্ত—মধ্যরাতে চিতার আতঙ্ক ১২৩

রূপকথা ও পৌরাণিক গল্প □

নবনীতা দেবসেন—উষসী ২৯৭
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়—বুড়োবুড়ি ১৭৭
নন্দলাল ভট্টাচার্য—গণেশ হলো ময়ূরেশ ১৬৭

বিজ্ঞানভিত্তিক ও অ্যাডভেঞ্চার গল্প □

সঙ্কর্ষণ রায়—দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পুঁথি ১২০
রাহুল মজুমদার—তুষার কফিনে ৮৯

আবিষ্কারের গল্প □

ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত—বিষ থেকে আশিস ৮১

ম্যাজিক □

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল ৩১৬

বাজারচলতি সব হজমের ওষুধ
খেলেই ঝটপট আরাম
সঙ্গে পাবেন আরও কিছু
পাঁচমিশালী ব্যারাম

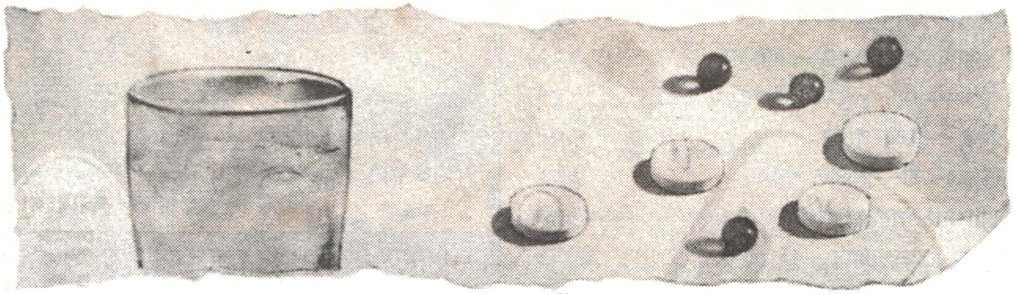

বাজারে আজকাল হরেকরকম হজমের ওষুধ পাওয়া যায়। তাদের আশ্বাস—পেটের গোলমাল থেকে ঝটপট আরাম। কিন্তু আপনি জানেন না বোধহয় এদের মধ্যে বেশীর ভাগই সম্পূর্ণ নিরাপদ নিরাময় করে না। চটজলদি তখনকার মত উপসর্গগুলিকে চাপা দিয়ে দেয়। ফলে অসুবিধাগুলি পরে আবার মাথা চাড়া দেয়। তার সাথে শরীরের অনেকরকম ক্ষতিও করতে পারে। এক রোগ সারাতে গিয়ে দেখা দেয় অন্য উপসর্গ। অ্যাকোয়াটাইকোটিস কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নিরাময়ের একমাত্র প্রাকৃতিক উপায়। এ শুধু হজমের গোলমালই সারায় না, বাজার চলতি ও বহু বিজ্ঞাপিত ওষুধগুলির কুফলও এতে নেই। নিশ্চিন্তে থাকুন, ভরসা রাখুন অ্যাকোয়াটাইকোটিস-এর ওপর।

অ্যাকোয়া টাইকোটিস
নিরাপদ নিরাময়

BC PL বেঙ্গল কেমিক্যালস এন্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

naa/95

মহাজীবনের গল্প □
প্রণবেশ চক্রবর্তী—একজন বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ১৬
নাটক □
জ্যোতিভূষণ চাকী—নাট্যে কথামৃত ১৫
বিজ্ঞান বিচিত্রা □
অমিয় কুমার হাটি—মঙ্গলে বসতি গড়বে মানুষ? ২১০
বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—দুঃসাহসী অটোপাইলট ২১২
বিস্ময় বিচিত্রা □
নীলাঞ্জন নন্দী—সোনার শহরের সন্ধানে ১৩৩
ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী—শয়তানের পদচিহ্ন ২০৭
কবিতা ও ছড়া □
অন্নদাশঙ্কর রায়—অজানা এক যোদ্ধা ৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায়—ঠিক চিনি ৫৭
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—স্বার্থপর ৫৭
কৃষ্ণ ধর—স্বপ্ন নিয়ে ৪৬
গৌরাঙ্গ ভৌমিক—অলীক ২৭৬
কার্তিক ঘোষ—হঠাৎ দেখি ১৫২
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—ভূতের গোষ্ঠী, ঠিকুজি-কোষ্ঠী ২৬৭
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়—ম্যাডাম চাপলো সাইকেল ২৮০
পঙ্কজ সাহা—ইষ্টি-বিষ্টি-মিষ্টি ১৭৯
রূপক চট্টরাজ—সেই ছেলেবেলাকার ১৫৬
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়—দস্যি ১৪
অশোক সী—ব্যস্ত তুমি ব্যস্ত আমি ১৯৭
মুস্তাফা নাশাদ—মৎস্যশিকারী ২৫৫
দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যারেন ১২২
সাধনা মুখোপাধ্যায়—পুজোর শুকতারা ৫৭
সলিল মিত্র—পুজো-পুজো ১২২
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী—শিউলি শরৎ ১৩২
বসন্ত ভট্টাচার্য—সার্থক অভিযান ১৭৩
নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়—দুই খোকা ১৭৩
ইন্দ্রজিৎ গুহ—হায়, শিকারি! ১৭৯
বীরেন সাহা—পথনির্দেশ ২৫৫
নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ভাগ্যিস ২৭৬
পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়—চলো দুন এক্সপ্রেসে ২৯৪
সিদ্ধার্থ সিংহ—ছুটি, ছুটি ২৮০
ধূর্জটি চন্দ—মিষ্টি সৃষ্টি ১৪
অভীক বসু—শ্রেণী বিভাগ ৩১২
মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী—সব পেয়েছির পাওয়া ৩০১
রবিদাস সাহারায়—ভূতের ঝগড়া ৩০১
দিলীপ রায়—চাঁদের দেশে শ্রীচাঁদ ৩১২
শিবায়ন ঘোষ—সর্বভুক ৩১৮
আশিস সান্যাল—দুটি ছড়া ৩১৮
সঞ্জীব কুমার দে—দেশ-বিদেশ ৩১৫
প্রসিত রায়চৌধুরী—হুকুম বনাম ভুতুম ৩১৫
তপন সেন—শিল্পী ২৯৪
বিভাগীয় লেখা □
দাদুমণির চিঠি ২৮১
তোমাদের পাতা ২৮২
কমিকস্‌ □
নারায়ণ দেবনাথ—বাঁটুল দি গ্রেট ২
নারায়ণ দেবনাথ—হাঁদা-ভোঁদা ৫৮
নারায়ণ দেবনাথ—বাহাদুর বেড়াল ২০৯
সুফি—হাসতে মানা ৩০৪
ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য—শেষ লড়াই ২৫৬
খেলা □
স্নেহাশিস গাঙ্গুলি—সৌরভ আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল ৩১০
প্রসূন ব্যানার্জি—মিঠুনই ম্যান অফ দ্য সিরিজ ৩০৮
রাজু মুখার্জি—এগোচ্ছে শ্রীলঙ্কা, রোখা মুশকিল ৩০৯
তপন দাম—ফুটবল বিশ্ব তাকিয়ে আছে রোনাল্ডোর দিকে ৩১১
তুষার শীল—সাফল্যের চাবিকাঠি ব্যায়াম ও ধ্যান ৩১৪
অভয় মিত্র—রিং লোফালুফির খেলা ৩১৫
মণিমুক্তা □ **বিচিত্র খবর** □
পৃথা বল ২৯৬
বরুণ মজুমদার ৫১

প্রচ্ছদ: বিজন কর্মকার
দুর্গার ছবি: রাজদীপ পুরী, বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবন, ব্যারাকপুর

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO No. 456(17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ১১০ টাকা; ডাকে: বুক পোস্টে ১২৭ টাকা; রেজিস্ট্রি ডাকে ১৮৫ টাকা।

Annual Subscription; Bangladesh– Regd. Post Rs. 300.00; By Air Mail Rs. 515.00; UK and USA—By Sea Mail Rs. 405.00; By Air Mail Rs. 645.00; R.N.I. Registration No 2621/57.

মূল্য: ৪৪ টাকা মাত্র

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫০-তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে

ভারতবর্ষে সর্বাধিক বিক্রিত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস পেশ করছে

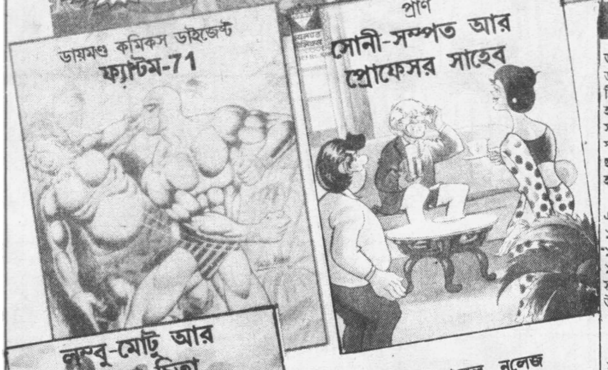

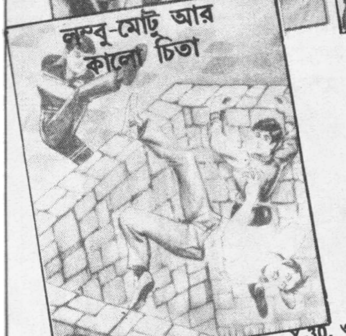

ডায়মণ্ড জেনারেল নলেজ
টু-ডে 1997

গোটা বিশ্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদানকারী একমাত্র পুস্তক।
মূল্য : 35.00,
ডাক খরচ 5.00 অতিরিক্ত।

ডায়মণ্ড কমিকস (প্রাঃ) লিমিটেড
X-30, ওখলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া (ফেজ-2)
নূতন দিল্লী-110 020

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাবের সদস্য হোন এবং বছরে ২০০ টাকা বাঁচান

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব -এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৭ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৬-টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম-ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী! ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৭.০০ (ডাক খরচ)	৮৪.০০
১	৪৮.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৪৮.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		৮.০০
		২০০.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি 'ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব'-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি.পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : ______

ঠিকানা : ______

পোস্ট : ______ জেলা : ______ পিন কোড : ______

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট/মানিঅর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : ______

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মহিলাদের হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'গৃহলক্ষ্মী'

বাঁটুল দি গ্রেট

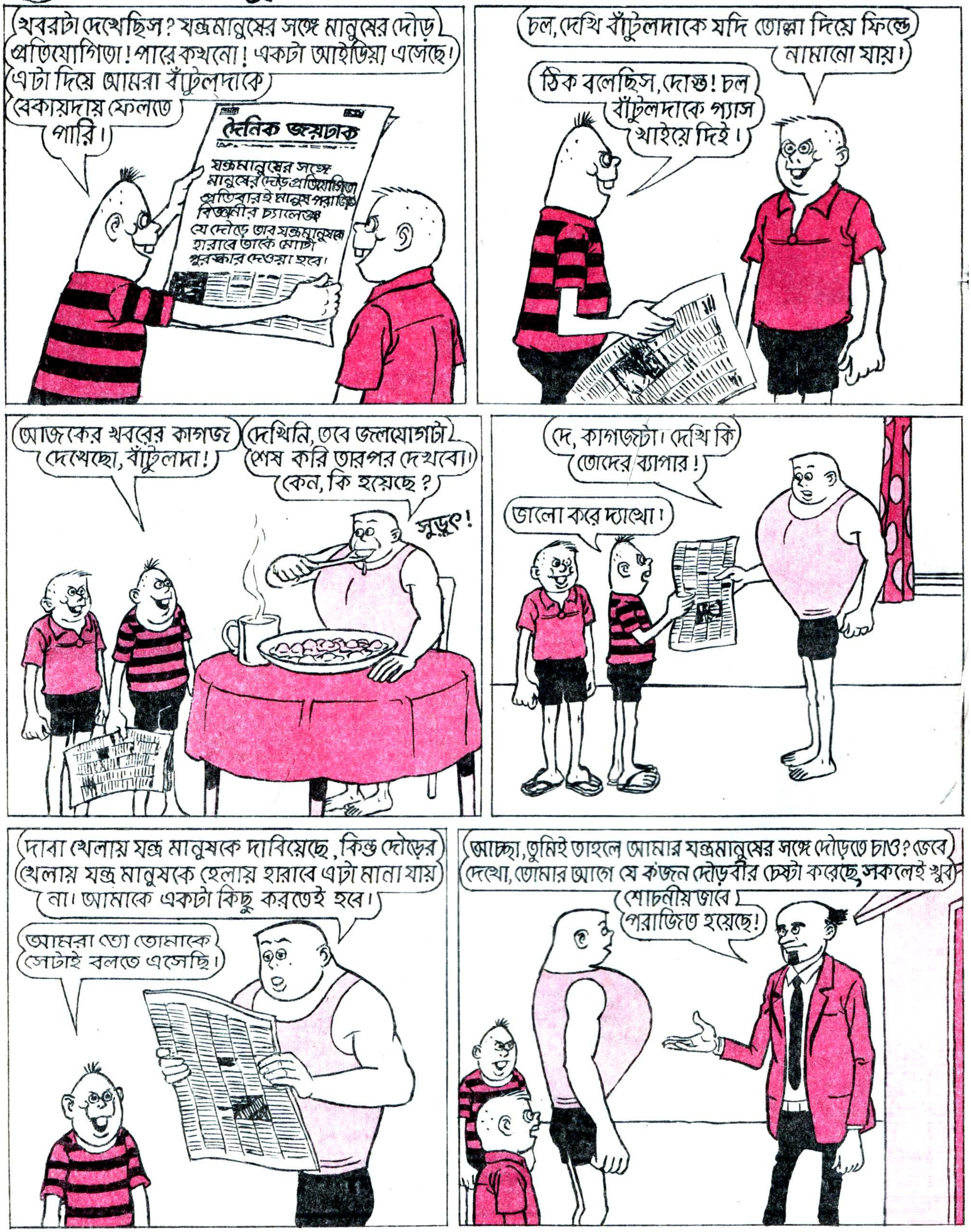
খবরটা দেখেছিস? যন্ত্রমানুষের সঙ্গে মানুষের দৌড় প্রতিযোগিতা! পারে কখনো! একটা আইডিয়া এসেছে! এটা দিয়ে আমরা বাঁটুলদাকে বেকায়দায় ফেলতে পারি।
দৈনিক জয়ঢাক
যন্ত্রমানুষের সঙ্গে মানুষের দৌড়প্রতিযোগিতা
প্রতিবারই মানুষ পরাজিত
বিজ্ঞানীর চ্যালেঞ্জ
যে দৌড়ে তার যন্ত্রমানুষকে হারাবে তাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে।
চল, দেখি বাঁটুলদাকে যদি তোল্লা দিয়ে ফিল্ডে নামানো যায়।
ঠিক বলেছিস, দোস্ত! চল বাঁটুলদাকে গ্যাস খাইয়ে দিই।
আজকের খবরের কাগজ দেখেছো, বাঁটুলদা!
দেখিনি, তবে জলযোগটা শেষ করি তারপর দেখবো। কেন, কি হয়েছে?
সুড়ুৎ!
দে, কাগজটা। দেখি কি তোদের ব্যাপার!
ভালো করে দ্যাখো।
দাবা খেলায় যন্ত্র মানুষকে দাবিয়েছে, কিন্তু দৌড়ের খেলায় যন্ত্র মানুষকে হেলায় হারাবে এটা মানা যায় না। আমাকে একটা কিছু করতেই হবে।
আমরা তো তোমাকে সেটাই বলতে এসেছি।
আচ্ছা, তুমিই তাহলে আমার যন্ত্রমানুষের সঙ্গে দৌড়তে চাও? তবে দেখো, তোমার আগে যে ক'জন দৌড়বীর চেষ্টা করেছে, সকলেই খুব শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে!

বিজ্ঞানী বোধহয় ওর যন্ত্রমানবের কলকব্জা ঠিকঠাক করে দিচ্ছে!
এইবার বাঁটুলদার অবস্থা কাহিল হবে!
দৌড় শুরুর সঙ্কেত দিয়ে দিন। বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে! যন্ত্রমানুষের সঙ্গে দৌড়ে ও জেতার আশা করছে।
মরেচে! এযে বেড়া ফ্যারা ভেঙে ছুটতে শুরু করেছে।
ওটা দেখছি অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাকে এবার কিঞ্চিৎ গতি বাড়াতে হবে।
গাছটার তলা দিয়ে আমি শর্টকাট করি।
ব্যাটা লম্বা আর দৃষ্টি নেই তাই সোজা গিয়ে ডালে ধাক্কা খেয়েছে!
বেচারা যন্ত্রমানবকে উঠতে সাহায্য না করে যাই কি করে।

এবার গাড়ি চলা রাস্তা পেরোতে হবে।
অ্যাই থামো, এগিয়ো না! আরে ধ্যাৎ! চেঁচালে কি হবে, ওর তো চোখ কান কিছুই নেই!
মরেছে! মাস্টারের সঙ্কেত মেনে চলতে গিয়ে বেচারা রোবট বিপদের মুখে পড়েছে!
ধাক্কা খেয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী খানায় গিয়ে পড়েছে। চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়নি এই রক্ষে!
দৌড়ে বোধহয় এই প্রথম যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নানাভাবে সামাল দিয়ে দৌড়োতে হচ্ছে।
তুলতেই বেতার সঙ্কেতে যন্ত্রমানব দুরন্ত গতিতে ছুটলো
আরিব্বাস! এযে মেল ট্রেনের মতো ছুট লাগিয়েছে!

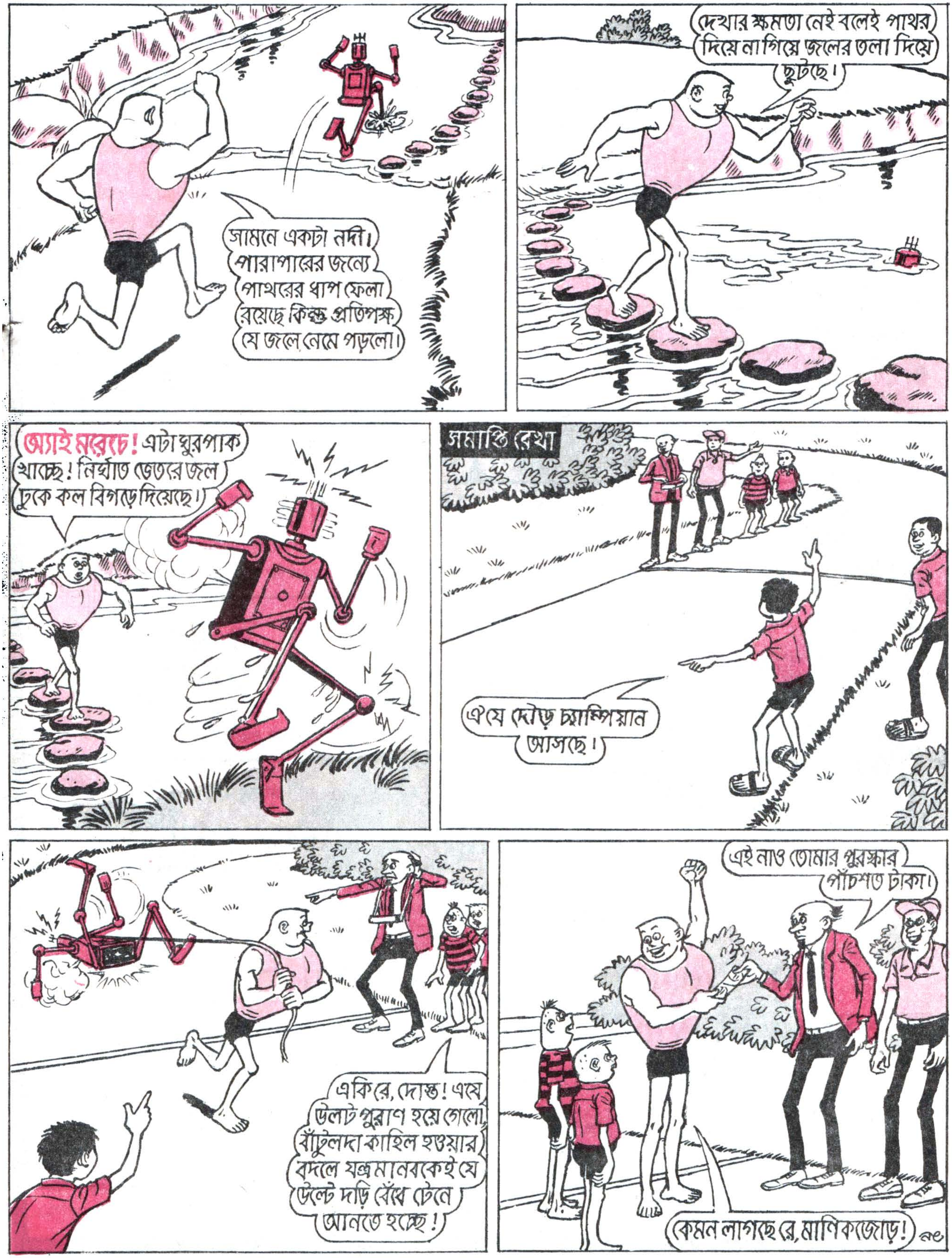
সামনে একটা নদী। পারাপারের জন্যে পাথরের ধাপ ফেলা রয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ যে জলে নেমে পড়লো।
দেখার ক্ষমতা নেই বলেই পাথর দিয়ে না গিয়ে জলের তলা দিয়ে ছুটছে।
অ্যাই মরেছে! এটা ঘুরপাক খাচ্ছে! নির্ঘাত ভেতরে জল ঢুকে কল বিগড়ে দিয়েছে।
সমাপ্তি রেখা
এযে দৌড় চ্যাম্পিয়ান আসছে।
একি রে, দোস্ত! এযে উলটপুরাণ হয়ে গেলো, বাঁটুলদা কাহিল হওয়ার বদলে যন্ত্রমানবকেই যে উল্টে দাড়ি বেঁধে টেনে আনতে হচ্ছে!
এই নাও তোমার পুরস্কার পাঁচশত টাকা।
কেমন লাগছে রে, মাণিকজোড়!
নও

শুকতারা

৫০ বর্ষ ● শারদীয়া সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪০৪/সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

অজানা এক যোদ্ধা

অন্নদাশঙ্কর রায়

ওর সঙ্গে আড়ি
যাইনে ওর বাড়ি।
ফুটবলটা খেলতে গিয়ে
পড়ল কাড়াকাড়ি।

ওর সঙ্গে ভাব
ওর সঙ্গলাভ।
ইস্কুলের ছেলেদের
সেইটেই স্বভাব।

চাকরি করেন যাঁরা
বদলি হন তাঁরা।
বদলি হয়ে গেলেন কোথা
কে জানে কিনারা।

অনেক কাল পরে
বেরিয়েছি সফরে।
কে একজন পথিক এসে
আমায় সেলাম করে।

চিনতে কি আর পারি ?
ইয়া গোঁফ দাড়ি।
ঝোলা নিয়ে সামনে দাঁড়ায়
গান্ধীটুপিধারী।

তাকিয়ে ওর চোখে
চিনতে পারি ও কে।
অমনি বুকে জড়িয়ে ধরি
অবাক হয় লোকে।

অনেক কাল পরে
কলকাতা শহরে
সাক্ষী দিতে এসে নরেশ
ঢোকে আমার ঘরে।

কী সমাচার, নরেশ ?
কোথায় এখন পরেশ ?
দেশ তো হলো স্বাধীন
ভাগ্য ওর সরেশ।

মুখটি করে আঁধার
খবর শোনায় দাদার।
জানা গেল সেকালের এক
জবাব গোলোকধাঁধার।

জাপানীদের সনে
পরেশও যায় রণে।
বর্মা দেশে দেহ রাখে
ফেরে না জীবনে।

আমি তো হই হাঁ
মুখেতে নেই রা।
বাল্যকালে এমন কারো
ছিল না কল্পনা।

বন্ধু আমার বীর
মিথ্যে আঁখিনীর।
ও যে আমার গর্ব, আমি
নোয়াই আমার শির।

ছবিঃ সুফি

মেয়ে গোয়েন্দার বাহাদুরি

আশাপূর্ণা দেবী

কী? 'মেয়ে গোয়েন্দা' শুনেই একটু অবজ্ঞার হাসি হাসা হলো মনে হচ্ছে! তা হাসিটা হতেই পারে। গোয়েন্দা গল্পের লেখকরা তো মেয়েদের কখনো তাঁদের আসরে আসতে দেন না বড় একটা। যেন গোয়েন্দা হওয়াটা পুরুষদেরই একচেটে অধিকার।

অথচ ঘরে সংসারে এদিকে সেদিকে নিরীক্ষণ করলেই দেখতে পাওয়া যায় 'গোয়েন্দাগিরি'তে মেয়েরা ছেলেদের থেকে চতুর্গুণ বুদ্ধি ধরে। মেয়েরা সহজাত ক্ষমতায় অপরাধের গন্ধ পায়। আর ব্যাপারটা তাদের হাতে ছেড়ে দিলে, গন্ধের মূল উৎসটিও আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

তবু 'মেয়ে গোয়েন্দা' যেন একটা কৌতুকের শব্দ।

অথচ চুপি চুপি বলে ফেললে বলা যায় আমাদের ওইসব গোয়েন্দা গল্প-লিখিয়েরা অনেকেই একটি অসত্য গোয়েন্দা গল্প লিখিয়ে মহিলার অগাধ গল্পের ভাঁড়ার থেকে দিব্যি টুকে মেরে মৌলিক বলে চালিয়ে দেন।

তা সে যাকগে, এখন এই গল্পটা হোক। এটি কিন্তু নির্ভেজাল মৌলিক। কারণ ঘটনাটা সত্যি।

একে শীতের রাত তায় সারাদিন দারুণ খাটুনি গেছে নার্সিংহোমে একটা বড় অপারেশান নিয়ে। তবু ডাক্তারের অভ্যস্ত কান! টেলিফোনের ক্রীং ক্রীং শব্দেই ঘুমটা ভেঙে গেল!

গা থেকে ভারী রাগখানা ঠেলে পায়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন ডাক্তার লাহিড়ী!

ভাবলেন, কী হলো? অপারেশন কেসটায় কী কিছু গড়বড় দেখা দিল না কী?

উঠে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ঘরের সামনের হলটায়। যেটাকে ড্রইংরুমই বলা যায়! টেলিফোনটা এখানেই রাখা আছে দেয়ালঘেঁষা একটা ছোট টেবিলে।

ডাক্তার লাহিড়ী চিৎকাররত ফোন-এর রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে গম্ভীর ভারী

গলায় বললেন, হ্যালো! হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার লাহিড়ী! কোথা থে বলছেন?

নিশ্চিত ছিলেন, শুনবে 'নিরাময় নার্সিংহোম থেকে', কিন্তু তা শুনলেন না। যা শুনলেন, তা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন, কী বলছেন? বারুইপুর থানা থেকে বলছেন? কী ব্যাপার? কী বলছেন? একটু আগে আমার বাড়ি থেকে ফোনে থানায় একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছে, কিনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ পাঠিয়ে দিতে—ভীষণ একটা কাণ্ড ঘটেছে বলে।

ইম্‌পসিবল্! মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে। আপনি কোন ডাক্তার লাহিড়ীকে চাইছেন?...কী বলছেন? নিউ বারুইপুর আদর্শ উপনগরী!...ফ্ল্যাট নাম্বার টোয়েন্টি টু...ডক্টর অভীক লাহিড়ী। হ্যাঁ এগুলো তো ঠিক হচ্ছে—কিন্তু মেসেজটা? কে দিচ্ছে, নাম বলেছে কিছু? কী বললেন, কাজল! হ্যাঁ, এটা তো আমার বাড়ির মেয়েটার নাম। কিন্তু সে কেন? সে কী করে? না না, অসম্ভব। নিশ্চয় কোনো বাজে লোক এইগুলো জেনে নিয়ে আমাকে অথবা পুলিশকে হ্যারাস করতে—আচ্ছা—দেখছি আমি।...কাইন্ডলি দু' সেকেন্ড ধরুন তো!

রিসিভারের মুখ চাপা দিলেন।

আর উত্তেজিত ডাক্তার লাহিড়ী হঠাৎ হাতের ওপর একটা কিসের স্পর্শ পেলেন। মানুষের নয়, একটুকরো কাগজের।

কাগজের টুকরোটা যেন পিছন থেকে পড়ল। তাকিয়ে দেখলেন, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা— "ভীষণ কাণ্ড! তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে বোধহয় একটা মার্ডার হচ্ছে—পুলিশকে আসতে বলুন। জানলা দিয়ে দেখুন—"

দেখলেন কাজল পিছন থেকে সামনে সরে আসছে।

কিন্তু জানলা দিয়ে কোথায় কী দেখবেন? কোন জানলা দিয়ে? টেলিফোন ধরা অবস্থায় ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, তেমন কিছু দেখতে না পেলেও ডাক্তার লাহিড়ী সামনে সরে আসা কাজলের মুখের চেহারাটা দেখতে পেলেন। ভয়ার্ত, উত্তেজিত। শরীরটাও যেন কাঁপছে!

কে জানে কাঁপুনিটা ভয়ে না শীতে?

শীতেই বা কেন? বন্ধ ঘর, গায়ে গরম চাদর।

কাজল এবার ডাক্তার লাহিড়ীর ফোন ধরা আঙুলটার ওপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে এমন একটা ইশারা করলো যার মানে হতে পারে, পুলিশকে দ্রুত আসতে বলুন। ভীষণ অবস্থা!

ওঃ। আঙুলের ডগাটা কী ঠাণ্ডা! যেন কে এক টুকরো বরফ ঠেকালো ডাক্তার লাহিড়ীর আঙুলে।

সবই এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কাজেই ডাক্তার দু' সেকেন্ড পরেই বলে উঠলেন, সরি! ও ইয়েস! ব্যাপারটা সত্যি! পাশের ফ্ল্যাটে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে, দয়া করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।---হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার জানলা থেকে—

পুরো কথাগুলো যে বলে উঠতে পারলেন তা নয়। বললেন—ছাড়া ছাড়া ভাবে!

কারণ ততক্ষণে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে!

কাজলের ইশারায় তিনি ফোনের দড়িটাকে যতোটা সম্ভব টেনেটুনে জানলার ধারে গিয়ে পড়েছেন, আর সেই তেইশ নম্বর বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে তাঁর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে!

কী দেখতে পেলেন ডাক্তার লাহিড়ী?

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবার কল্পনাও কী করেছিলেন তিনি? দৃশ্যটাকে 'মুভি'ও বলা যায়।

দেখছেন!...

দেখে চলেছেন! শরীরের সমস্ত রক্ত দাপাদাপি করছে। মাথার মধ্যে দামামা পিটছে, ভয়ঙ্করভাবে চেঁচিয়ে ওঠবার জন্যে আপ্রাণ প্রেরণা আসছে। কিন্তু নাঃ! কিছু করা যাচ্ছে না। করার উপায় নেই।

এমনকী এমন নিঃশব্দ অবস্থা যে পাশের ঘরে ডাক্তার লাহিড়ীর মা কণামাত্রও টের পাচ্ছেন না। দিব্যি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

মা অবশ্য বুড়ো মানুষ। কিন্তু ঘুম তো এমনিতে খুবই পাতলা। সারারাতই প্রায় সজাগ থাকেন। একটু খুটখাট শব্দ হলেই বলে ওঠেন, কে র‍্যা'?

তবে ক'দিন শীতটা তো বড্ড বেশি জাঁকিয়ে পড়েছে। কম্বলের ওপর আবার লেপ চাপা দিয়ে শুচ্ছেন। তাই কানের ফুটো দুটো প্রায় সিল হয়ে পড়েছে। মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিচ্ছেন তো!

এতো শীত!

তবু ডাক্তার লাহিড়ীর যেন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। কপালে ঘাম ঘাম ভাব।

ইশারায় কাজলকে জানান এক গেলাস জল!

হল-এর সংলগ্নই ডাইনিং স্পেস।

সেখানেই ফ্রীজ!

কাজল ফ্রীজ থেকে এক গ্লাস জল বার করে নিয়ে বুদ্ধি করে থার্মোফ্লাস্কে রাখা গরম জল একটু ঢেলে নিয়ে মিশিয়ে দিয়ে হাতে ধরিয়ে দেয়।

এই রাতে ফ্রীজের ঠাণ্ডা জল খেলে আর দেখতে হবে না!

ডাক্তার কাকুর মা তো দিনে-রাতে সবসময় গরম জল মেশানো জল খান! কাজেই এটা কাজলের জানা।

মেয়েটা তো বেশ আন্তরিক আর বুদ্ধিমান। তবে হঠাৎ এমন একটা উৎকট কাজ করে বসলো কেন? তেমন কিছু দেখলে তো ডাক্তার লাহিড়ীকেই জাগিয়ে বলতে পারতো।

কিন্তু সে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। ডাক্তার লাহিড়ী জল খেয়ে আবার তাকালেন। এবং যা দেখলেন তাতে নিঃসন্দেহ হলেন তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে একটা খুনের ঘটনাই চলছে!

কিন্তু দেখলেনটা কী?

কেউ কাউকে ছুরি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে? না কী রিভলভার বাগিয়ে ধরে তাক্ করছে?

নাঃ তা নয়! দেখলেন, কাজটা সমাধাই হয়ে গেছে।

দেখলেন ঘরের মাঝখানে সিলিং ফ্যানের ঠিক নিচেয় যে পালঙ্ক টাইপের খাটখানা পাতা আছে, তার ওপরে দুটো মুশকো মতো লোক ফ্যান-এর সঙ্গে একগাছা দড়ি লটকাচ্ছে ফাঁস লাগাতে। যেভাবে লোকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে,

সেই ভাবে কায়দাটা করছে।
কিন্তু সেই সঙ্গে?
সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘকায় 'লাশ' তুলে ধরে তার গলাটায় ফাঁসটা পরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।
দেহটা যে মৃতদেহ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।
এ দেহটি আর কারো নয়, তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটের মালিক জগদীশবাবুর। শেয়ার মার্কেটের দালাল জগদীশ তালুকদার, অনেক পয়সা। বেশ উন্নাসিক, পাড়ার কারো সঙ্গে বিশেষ মেশেন না। তবে একবার ওঁর বুড়ো বাবা দেশ থেকে না কোথা থেকে এসে হঠাৎ অসুখে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই ডাক্তার লাহিড়ীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।
তবে যে ঘরে গিয়ে রুগী দেখেছিলেন ডাক্তার লাহিড়ী, সেটা এ ঘর নয়, অন্য একটা ঘর।
ওই মুশকো লোক দুটো যেভাবে খাটের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করে চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে খাটখানা ভেঙে না পড়ে।
কিন্তু এই সব কী ওরা ঘরে আলো জ্বেলে করছে? তাই এতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে?
না, আলো জ্বেলে নয়। তবে আরও একটা লোক—টিংটিঙে মতো, মাটিতে দাঁড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে টর্চের বোতাম টিপে যাচ্ছে!
তবে সুবিধে এই জানলায় পর্দা নেই। এবং জানলাটা পুরো কাচের।
ডাক্তার লাহিড়ীরও তাই। তবে ওঁর বাড়িতে সব ঘরে ঘরে মোটা কাপড়ের ভারী ভারী পর্দা। বিশেষ করে শীতকালে। এখন তার ফাঁক দিয়েই দেখছেন। তাছাড়া ওই দৃশ্যের দর্শক হওয়া মাত্রই তো নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন! শোবার ঘরে যে একটা মৃদু নীল আলো জ্বলে, সেটা পর্যন্ত।
কাজল খুব মৃদু গলায় বললো, ঠাকুমার ঘুম ভেঙে গেলে মুশকিল। তবে এ ঘরে এসে দেখতে পারলে আরো সুবিধে হতো।
'এ ঘর' মানে সেই ডাইনিং স্পেসটা। যেখানে ফ্রীজটা আছে। এ ঘর থেকে ডাক্তার লাহিড়ীর মায়ের ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারার মতো একটা দরজা আছে। দরজাটা খোলা থাকে।
বৃদ্ধা মহিলার যদি কিছু দরকার হয়, তাহলে ডাকলে সাড়া পাবে। এখন এই কাজলের প্রধান কাজই ওই বুড়িকে দ্যাখ্ভাল করা। কাজল যাকে বলে রীতিমতো বুদ্ধিমতী! সে ঠাকুমাকে সকালে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। আর দুপুরে মার ঘুম না এলে গল্পের বই, পত্রপত্রিকা পড়ে শোনায়।
মহিলার পড়ার নেশাটি চিরকালই দারুণ, কিন্তু এখন দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ায় মুশকিলে পড়েছেন। খবরের কাগজ বা গল্পের বইটইয়ের স্বাদ না পেলে যেন হাঁসফাঁস করেন। তা সে যেমন বইই হোক।
এদিকে কাজলেরও নাকি অল্প বিদ্যেতেও গল্পের বইয়ের নেশা। বিশেষ করে ভূতের, বা ডিটেকটিভ বইয়ের।
কাজেই সোনায় সোহাগা হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে। মা 'কাজল' বলতে অজ্ঞান। সন্ধ্যাকালে অবশ্য তিনি ভূতের গল্প শোনা পছন্দ করেন না। তা সন্ধ্যা কাটাতে তো টি.ভি. আছে!
তবে শীতকালটায় বুড়ি একটু কাবু থাকেন। যদিও ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা সবই আছে।
ওই মা'টি ছাড়া ডাক্তার লাহিড়ীর তো সংসারে আর কেউ নেই। মায়ের জন্যেই সব ব্যবস্থা।
কাজলের ওপর ডাক্তার লাহিড়ীও বেশ সন্তুষ্ট, কারণ সে মাকে যতটা সম্ভব যত্ন করে, মান্য ভক্তি করে।
এদিকে সব বিষয়ে চৌকস আর বেশ স্মার্ট।
তবু আজকে ওর এই মাঝরাত্তিরে থানায় খবর দেওয়াটা খুব একটা পছন্দ হয়নি ডাক্তার লাহিড়ীর। ভাবছেন, ও বাড়িতে যে একটা কাণ্ড ঘটছে সেটা ও জানলো কী করে? ও কী রাত জেগে জানলায় চোখ ফেলে বসেছিল? যদি তাই থাকে, সেটা কেন?
জেগে বসেছিল সেটা তো নিশ্চিত।
তা হলেও—
এ ঘর থেকে ভাল দেখা যাবে। তবে মার না ঘুম ভেঙে যায় বলায়, ডাক্তার লাহিড়ী খুব নিঃশব্দে এ ঘরে চলেই এলেন। আর দেখে অবাক হলেন, ভাল করে দেখতে পাবার একটি অভাবনীয় কৌশল আবিষ্কার করেছে কাজল।

সত্যিই ভাল করে দেখতে পাওয়া গেল।
দেখা গেল তিনজনে মিলে কোনো মতে সেই মরে যাওয়া দেহটাকে উঁচু করে তুলে ধরে তার মুণ্ডুটাকে ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললো।...অর্থাৎ তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে থাকলেন। যে জগদীশবাবুকে আজ সকালেই দিব্যি ঘুরতে দেখা গেছে।
কিন্তু ঝুলতেই থাকলেন, দুলতে থাকলেন কী?
পায়ের আগা দুটো যেন বিছানায় ঠেকু ঠেকু!
ওরা তিনজনে খাট থেকে নেমে এল। হাত-মুখ নেড়ে যা বললো, তাতে মনে হলো, ব্যবস্থাটা যেন খুব সঠিক হয়নি। পা দুটো শূন্যে ঝোলা দরকার।
আবার অন্য অ্যাক্‌শান। হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে যেন। তবু এখন তিনজনে মিলে খাটখানাকে ঠেলে ঠেলে একটু সরিয়ে আনলো। এখন মৃতদেহের পা দুটো শূন্যে দোলায়মান হলো!
তার মানে প্রতিপন্ন করতে হবে, লোকটা নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ডাক্তার লাহিড়ী অবাক হয়ে ভাবছেন, লোকটার বাড়ির লোকেরা কিছু টের পাচ্ছে না কেন? আছে তো বৌ ছেলে কারা যেন সব।
কিন্তু ওঁর মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে, এই ভয়ে এমন চুপচাপ দেখে যাবেন, এমন একটা বীভৎস ঘটনা? চেঁচামেচি করে ওদের জানাবেন না? পাড়ার লোক জড়ো করবেন না?
আবার ভাবছেন, তাতে কতটুকু লাভ হবে? কে কী করতে পারবে? ওই খুনেদের কী ধরতে পারবে? পাড়ার লোকেরা যে 'খুন! খুন!' বলে চিৎকার শুনলেই ছুটে আসবে তার গ্যারান্টি কী

আছে?

পুলিশকে তো খবর দেওয়া হয়েইছে।

কিন্তু সত্যিই কী এখনি এসে পড়বে?

ওদের তো আঠারো মাসে বছর।

'এই যাচ্ছি' বলে হয়তো কাল সকালে ব্রেকফাস্টটি সেরে তবে আসবে!

কিন্তু নাঃ। সব সময় ওদের নামে দোষ দেওয়া ঠিক নয়! কখনো কখনো ওদের ঠিক বারো মাসেই বছর হয়।

ডাক্তার লাহিড়ী যখন ভাবছেন, মরার পর মড়াটাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিলে কী তার জিভটা বেরিয়ে আসে? ডাক্তারী শাস্ত্র তো তা বলে না।

ওমা! ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ কাজল চাপা আতঙ্কে বলে ওঠে, দেখুন! দেখুন! কী করছে ওরা!

কী করছে?

দেখলেন। দেখে শিউরে উঠলেন।

এ রকম বীভৎস কাণ্ডও করতে পারে মানুষ? কী দেখলেন?

দেখলেন, সেই রোগাপটকা লোকটা আবার খাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মৃতদেহটার মুখের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে জিভটা ধরে টানাটানি করবার চেষ্টা করছে! যাতে বেরিয়ে আসে!

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন ডাক্তার লাহিড়ী। আর কাজল 'ওরে বাবারে' বলে দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

আর ঠিক সেই সময়, হ্যাঁ ঠিক সেই সময় পুলিশের গাড়ি এসে পড়লো।

এলো প্রায় নিঃশব্দেই। দমকলের মতো রাস্তা দাপাতে দাপাতে, পাড়া কাঁপাতে কাঁপাতে আর ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে জাগাতে তো নয়। তবু—দেখতে পেলেন।

জানলার পর্দা সরিয়ে দেখছিলেন কিনা বারে বারে।

দেখতে পেলেন মোড়ের মাথায় রাস্তার ওপর হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে একটা হেড-লাইটের আলো পড়লো। এক সেকেন্ড। তারপর সেই গাড়ি এসে থামলো।

উর্দিপরা এক কনস্টেবল লাফিয়ে নেমে পড়ে একটা পেন্সিল টর্চ হাতে নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির কম্পাউন্ডের গেট-এর সামনে দাঁড়ালো।

ডাক্তার লাহিড়ী ততক্ষণে নিচের তলায় নেমে এসে গেট-এর মধ্যে থেকে টর্চ বাড়িয়ে আলোর সঙ্কেত করলেন।

তারপর?

তারপর আরো দুজন কনস্টেবল নেমে লাফ মেরে ছুটে এলো। পিছনে আরো একজন অফিসার গোছের।

ব্যস্ হাতে হাতে ধরা পড়বেন বাছাধনেরা।

ডাক্তার লাহিড়ী আর কাজল দুজনের মধ্যেই একই কথা। শুধু খুন নয়, মৃত মানুষটার জিভ টেনে লম্বা করার চেষ্টা! উঃ। কী নারকীয়! কাজল দেখে, ওরে বাবা, ঠোঁটের পাশে আবার একটা শিশি থেকে কী ঢেলে দিচ্ছে। কোনো রং। আর কী হবে? লালই। বোঝা গেছে, ভাব দেখাতে হবে যেন গলায় দড়ি দেওয়ার ফলে ঠোঁটের পাশে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে!

কাজল তিনতলায়, ডাক্তার নিচের তলায়, দুজনেই অধীর আগ্রহে দেখছে পুলিশরা এসে গেলো মূল কাণ্ডর কাছে।

কিন্তু বদমাইশদের আলাদা ভগবান। তারা ঠিকই পুলিশের হাত ফসকায়। হবি তো হ, ঠিক সেই মুহূর্তেই কিনা এই ব্লকেরই একজন—ঘোষবাবুদের বাড়ি থেকে চিৎকার উঠলো, 'চোর! চোর! চো...র।'

তা চোখের সামনে চো-র চো-র শুনলে তো আর পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তারা চোর ধরতেই তৎপর হলো!...অথচ নেহাৎই বোধহয় ছিঁচকে চোর। কারণ যেটাকে ধরে গাড়িতে তুললো, তার পিঠে নেহাৎই রাস্তার 'গামছা লুঙ্গি ছিট কাপড়ের' ফেরিওয়ালার মতো দুটো পুঁটুলি! হয়তো কিছু জামা-কাপড় কী বাসনপত্র হাতিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল।

তাকে ধরতে গিয়ে 'আসল'রাই হাতছাড়া হলো! মাত্র তিনজন তো পুলিশ!

তা রাতদুপুরে টেলিফোনে কী না কী একটা উড়ো খবর পেয়ে, থানা থেকে তো একটা বিরাট ফোর্স পাঠাতে পারে না?

তা যাই হোক, ওই চোরটাকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে একজন পুলিশ তার কাছে পাহারা দিতে বসে থেকে, বাকি দুজন আর অফিসারটি যখন সেই তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে উঠে এলো, তখন তো পাখি উড়ে গেছে।

অবশ্য উড়ে যে গেছে, সেটা বুঝতে বিস্তর সময় লাগলো!

যদিও 'চোর চোর' শুনে ব্লকের আর সব বাসিন্দারা জেগে উঠে পড়লেও ওই তেইশ নম্বর বাড়িটি নিঃসাড়!

'সদর' দরজা বলতে যে দরজা, তাতে বেল বাজিয়ে বাজিয়ে হত্যে হয়েও কেউ খুললো না। স্বয়ংক্রিয় চাবি তো! বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেলেই তো বন্ধ হয়ে যায়।—কাজেই পুরো এলাকাটার জন্যে যে একজন কেয়ারটেকারবাবু আছেন তাঁকে ডেকে সমস্যাটা জানাতে তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে দিলেন দরজাটা।

তা সেই ভদ্রলোকের কাছেই জানা গেল তালুকদার পরিবারের সবাই আজ কোনো একটা বিয়ে উপলক্ষে কলকাতার বাইরে নেমন্তন্ন গেছেন। বাড়িতে কর্তা একা রইলেন। শরীরটা তেমন ভালো নেই বলে গেলেন না। ওঁর প্রতি একটু লক্ষ্য করবেন, জগদীশবাবুর ছেলে বলে গেছে কেয়ারটেকারবাবুকে। কাল সকালেই চলে আসবে সবাই।

তা সারাক্ষণ আর কী লক্ষ্য করবেন? বিকেলে একবার এসে দেখা করে গেছেন। দেখে গেছেন ফ্লাস্কে রাখা চা আর হাতের কাছে রাখা বিস্কুট খেয়ে, দিব্যি চাদর মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। বেশ খোশ গল্প করলেন।

কিন্তু এখন? জগদীশবাবুর সেই ঘরটিও যে ভিতর থেকে বন্ধ!

ঠেলে ঠেলে ধাক্কা মেরে মেরে বিফল হয়ে অগত্যা দরজা ভাঙতেই হলো। এর চাবি তো আর কেয়ারটেকারের কাছে নেই। এ তো ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগানো।

অতঃপর?

সেই বন্ধ দরজা ভাঙা মাত্রই 'পুলিশ' হেন জিনিসও ছিটকে দশ পা পিছিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কেয়ারটেকারবাবুও।

পাখার সিলিঙে দড়ির ফাঁসে ঝুলছেন দশাসই তালুকদার মশাই।

কেমন যেন বাঁকাচোরাভাবে!

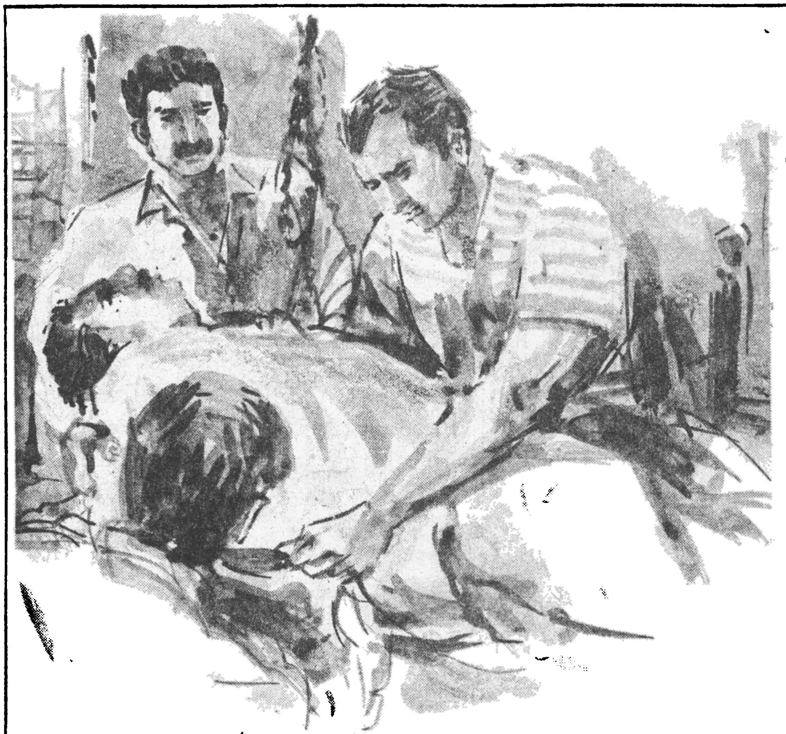

দেহটা যে মৃতদেহ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে

তারপর?

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটতে থাকে। প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় ঘরের দরজা যখন ভিতর থেকে বন্ধ, এবং ঘরে আর কোনো দরজা নেই, তখন অবশ্যই 'আত্মহত্যা'।

তবে পায়ের কাছে তো কোনো টুলফুল উল্টে নেই, ঝুললেন কী করে? খাটখানাকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে?

সেটা সম্ভব?

অথচ সরানো যে হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। খাটের পায়ার দাগ দেখে দেখা গেল একটুখানি করে চৌকো জায়গা ফর্সা, তার চারধারে কেমন ময়লা ময়লা।

গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে খাট সরিয়ে দেওয়াও যেমন অবাস্তব, তেমনি অবাস্তব তো আগাগোড়া বন্ধ ঘরে থেকে অন্য কারো দ্বারা নিহত হওয়া।

হত্যাকারী কী দেয়াল ভেদ করে হাওয়া হয়ে যাবে?

পুলিশ যা করবার করলো।

দড়ি কেটে মড়া নামালো। তারপর নিরীক্ষণ করে দেখে বললো, ঠোঁটের পাশ দিয়ে যেটা গড়াচ্ছে, সেটা তো রক্ত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে রং। আর জিভটা মুখের মধ্যেই শক্ত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। তার মানে—

পুলিশরা তাকাতাকি করে বললো, মনে হচ্ছে আগে হত্যা করে পরে দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।...আর হত্যাকারী বা 'কারীরা' খাট ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু—?

হ্যাঁ, ওই 'কিন্তু'টি হচ্ছে—যে বা যারা এসব করলো, তারা বেরিয়ে গেলো কোথা দিয়ে?

অতঃপর?

অতঃপর কাজলের ডাক পড়লো। আর তারপরে জেরা। যার নাম হচ্ছে পুলিশি জেরা।

কী দেখে সে বুঝতে পেরেছিল তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে একটা কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে? যা দেখে সে থানায় ফোন করার মতো দুঃসাহসিক একখানা কাজ করে বসেছিল? ডাক্তারবাবুকেই বা জানায়নি কেন?

কোনখান থেকেই বা দেখতে পেয়েছিল? মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে নজর ফেলতে গিয়েছিল কেন?... তাও শীতকাল। লেপ-কম্বল ছেড়ে উঠে!

পুলিশের কাজই তো হচ্ছে সন্দেহ করা।

কাজেই তাদের সন্দেহ, ওই খুনীদের সঙ্গে নিশ্চয় যোগসাজস আছে কাজলের। তবে এখন হয়তো টাকাপয়সার বখরাঘটিত কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যাওয়ায় প্রতিহিংসার বশে দলের লোককে ধরিয়ে দেবার মতলবে—

মনে হচ্ছিলো কাজল বেচারী বোধহয় ভয়ানকভাবে ভয় খেয়ে 'প্রকৃত তথ্য' কবুল করে বসবে।

আর পুলিশ সাহেবরা নিজেদের ক্যাপাসিটি দেখিয়ে আহ্লাদে ভাসবেন।

তবে পাখি হাতছাড়া হয়ে গেছে, এই যা।

তা কাজল নামের ওই বছর কুড়ি বাইশের মেয়েটা প্রকৃত তথ্যই বলে গেল বটে, তবে ভয় খেয়ে নয়, নির্ভীকভাবে!

পুলিশের প্রশ্ন—কী দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে কোনো একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে?

উত্তর—কী দেখে আবার? যদি দেখা যায় একটা মানুষ বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, আর দুটো ধুমসো লোক তার খাটের ধারে দাঁড়িয়ে কিছু বলাবলি করতে করতে হঠাৎ একজন লাফিয়ে খাটের ওপর চড়ে বসে দু'হাতে তার গলাটা টিপে ধরলো, তাহলে কী ভাবতে হবে একটা মজাদার ঘটনা ঘটছে?

কেন কাকুকে জানাতে যায়নি?

কাজলের উত্তর—এই ভেবে, উনি আজ সারাদিন খুব খেটে, সবে ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়েছেন। তাই মমতার বশে! দুঃসম্পর্ক হলেই বা, মায়া-মমতা থাকবে না? নিজের বাবা বা দাদু হলে, এ মায়াটা আসতো না?

তাছাড়াও—ওই ঠাকুমাটির ঘুম ভাঙার ভয়ে। উনি জেগে উঠলে এমন চেঁচামেচি ডাকাডাকি করেন। অপরাধীরা টের পেয়ে সাবধান হয়ে যেতো।

কোনখান থেকে সে দেখেছে?

যে ঘরে শোয় সে, সেই ঘরের জানলা দিয়েই। তবে সরাসরি সম্ভব হতো না। নিজস্ব কৌশলে সম্ভব হয়েছে।

সেই কৌশলটি কী?

পুলিশ সাহেবরা দেখুন এসে।

তা দেখলেন এসে তাঁরা।

জানলার ধারে দু'দুখানা ছোট মাপের আর্শি এমনভাবে তেরছা করে ফিট করে রেখেছে যে ওদের ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটে, সব দেখা যায়।

সত্যি! সব কিছু দেখা যাচ্ছে ওদের ঘরের। খুঁটিনাটি। অথচ শুধু খোলা জানলা দিয়ে এতো সব দেখতে পাবার কথা নয়।

আর্শি যে কী জিনিস!

দেয়ালের পাশের দৃশ্যটিও দেখা যাচ্ছে।

কাজল কেন হঠাৎ এই কৌশলটি করতে গেল? কী বাবদ?

হঠাৎ নয়। একদিন পড়ন্ত বেলায় ঘরের দেয়ালে টাঙানো আয়নায় ভাল করে মুখ দেখতে না পাওয়ায় একটা ছোট্ট হাত আয়না নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে টিপ পরতে পরতে হঠাৎ এই অবাক করা দৃশ্যটি চোখে পড়ায়, থমকে যায় সে। তারপর কৌতূহল থেকে কেবলই দেখে।

তো কী সেই দৃশ্য?

দৃশ্যটা হচ্ছে, এই ব্লকের একদম নিচের তলায় ঘোষবাবুদের ফ্ল্যাটের পাশের দিকে জমাদার যাতায়াতের যে একটা প্যাসেজ আছে, বা গলি মতো আছে—সেই পথ দিয়ে একটা লোক ঢুকে যতসব রেনওয়াটার পাইপ আর বাথরুমের নোংরা জল পড়বার মোটা মোটা পাইপ আছে সারি সারি দেওয়াল ভর্তি, তারই একটা বেয়ে বেয়ে উঠে আসে এই তিনতলার তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানলার নিচে। আর জানলার নিচের কার্নিশের ওপর দাঁড়িয়ে কি যেন চেষ্টা করে চলে জানলার গ্রীলে।

দেখলে কৌতূহল হয় না? যদি মিস্ত্রীই হয়, তাহলে তো ন্যায্য পথেই আসবে। এমন রাতবিরাতে ঘোরাপথে কেন? তাছাড়া মিস্ত্রী হলে, তার কাজটা সারতে এতো দেরি হতো না।

তো এই রাত্রেও কাজল উঠে দেখতে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত লোকটা করল কী?

তা সেই দেখতে গিয়েই ওই গলা টেপার দৃশ্য দেখে আঁৎকে উঠে থানায় ফোন করে বসেছিল।

তারপর?

তারপর তো ডাক্তারবাবু জেগে উঠে নিজেই সব দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন—মরা মানুষটাকে তুলে ধরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

ডাক্তার লাহিড়ী বলে উঠলেন, সেই তো! আমিও তো নিজের চোখেই দেখলাম। তবে আমিও বুঝলাম চেঁচামেচি করে পাড়ার লোককে জাগানোর চেষ্টা না করাই ভাল। থানায় যখন খবর একটা পৌঁছেই গেছে।

জগদীশবাবুর ঘরে কোনও আলমারি নেই। শুধু বড় একটা চাকাওয়ালা ওয়ার্ডরোব। কাজল জানায় ও জগদীশবাবুকে অনেক দিনই ঐ ওয়ার্ডরোবটা ঠেলে তার পেছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে।

একথা শুনেই এঁরা লক্ষ্য করেন এঘর দিয়ে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়, বড় ওয়ার্ডরোবটার পিছন দিকে ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে। অনেকটা যেন চোরা কুঠুরি।

অ্যাঁ? এটা কী?

ঢুকে পড়েন পুলিশের অফিসারটি। আর ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠেন, মাই গড!

কেন? কী ছিল সেই ঘরে? আরো কোনো মৃতদেহ না কী?

না না। সে রকম কিছু না। দেখা গেল ব্যাঙ্কের 'লকার' ঘরের মতো একটা জানলা-দরজা বিহীন ওই ঘরটার দেয়ালের ধারে ধারে ইয়া ইয়া গডরেজের আলমারি বসানো—সবগুলো হাটপাট খোলা। আর একদম ভোঁ-ভাঁ ফাঁকা।

তবে ঘরের মেঝেয় ছড়ানো রয়েছে কিছু কাগজপত্র, আর কয়েকটা গহনার কেস।

তাড়াতাড়ি খুলেই মুখটা প্যাঁচা হয়ে গেল পুলিশ সাহেবের।

খালি বাক্স। নেকলেস আর ব্রেসলেট এবং মুক্তোর মালা গোছের কিছু ছিল বোধহয়, শুধু তার খাঁজগুলোই দেখা যাচ্ছে। ভিতরের জিনিসগুলি হাওয়া।

অর্থাৎ স্রেফ খুন করে ডাকাতি!

খুন! ডাকাতি।

কিন্তু যে বা যারা এসব করলো তারা পালালো কোথা দিয়ে? তারা কী অদেহী ভূত?

অথচ ঘরের মেঝেয় দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু পোড়া বিড়ির টুকরো।

ভূতেরা কী বিড়ি খায়?

শেষ পর্যন্ত কাজলের বুদ্ধির কাছেই হার মানা।

কাজলই বারবার কর্তার ঘরের অ্যাটাচড্ বাথরুমের দিকে যেতে বলে চলেছে। এনারা গেছলেনও একজন। দেখে বলে উঠেছিলেন, আরে জানলার গ্রীল তো লাগানোই রয়েছে।

তাহলে?

অতঃপর আবারও কাজল। সে নিজেই ঢুকে পড়ে বলে ওঠে, এই দেখুন ব্যাপার।

কী ব্যাপার? ব্যাপার এই সমস্ত স্ক্রুগুলো খোলা, শুধু ওপর-নিচের দুটো স্ক্রু ঢিলে করে লাগানো। যাতে কোনোমতে একটু ঠেকিয়ে রেখে লোক ঠকানো যায়।

কাজল হাত দিয়েই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই স্ক্রু দুটো খুলে ফেলে বলে ওঠে, কেউ ধরুন, ধরুন। ভীষণ ভারী। নিচে পড়ে গেলে বিপদ হবে!

ধরে ফেলে দেখা গেল জানলার বাইরে কার্নিশে স্ক্রু ড্রাইভার। তার মানে মাল পাচার করে ফেলার পর শেষমেশ লোকের চোখকে ধোঁকা দিতে বাইরে থেকেই একটু জুড়ে রেখে আবার পাইপ বেয়ে পগার পার!

পুলিশ সাহেবের পাকা মাথা থেকে কথাটা আবিষ্কার হওয়ার আগেই কাজল বলে ওঠে, এই মতলবেই ক'দিন আগে থেকে জানলার গ্রীল খুলেছে।

আর শেষ রাত্রে ঘোষবাবুদের ফ্ল্যাট থেকে যে 'চোর চোর' হল্লা উঠেছিল, যাদের কাঁধে পুঁটুলি দেখে ছিঁচকে চোর মনে হয়েছিল, তারাই আসল পাপী। তো মোটা মোটা দুটো তো সটকান দিয়েছে, ধরা পড়ে মরেছে সেই রোগা টিঙটিঙেটা।

ঘোষবাবুর বাড়ির চাকর তার পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে, একটা ঢিল ছুঁড়ে মারার ফলে সে উঃ বলে রগটা চেপে

ধরে বসে পড়েছিল।

তখন পুলিশ এসে ক্যাঁক।

কিন্তু তার পুঁটুলিটায় ছিল কী?

ছিল কয়েক গোছা একশো টাকার নোট! কিন্তু নোটগুলো যে সব জাল।

পুলিশের পিটুনি খেয়ে স্বীকার পেলো, আগের মোটা দুজন এরকম নোট বস্তা ভর্তি করে নিয়ে গেছে। আর নিয়ে গেছে একগাদা দামী দামী গহনা। সে বেচারী নেহাৎই তুচ্ছ বলে তাকে সামান্য বখরা দিয়ে গেছিলো ওরা।

স্ক্রু খোলা পর্যন্তই তার ক্যাপাসিটি! ওদের দলের কাজকর্ম কী তা সে জানে না।

কিন্তু জানা গেলো।

ধর্মের কল বাতাসে নড়লো!

থানায় টিঙটিঙের পুঁটুলির কাপড়টা দেখে কাজল বললো, এ তো তালুকদার-বাবুর বাড়ির জানলার পর্দা। হ্যাঁ, কাজলকেও পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল অবশ্য আরও তথ্যের আশায়।

ওইটিই ধরা পড়বার সূত্র।

পর্দা খোলা থাকার ফলেই তো সব কিছু দেখা গেলো। আর টিঙটিঙের সঙ্গে খুনীদের যোগাযোগ।

আর আটক করা কাগজপত্র থেকে জানা গেল জালি নোটের কারবারী তালুকদারবাবুর কীর্তিকলাপ। অবশেষে একটা গ্যাং ধরা পড়লো সেই মুশকো দুটো সমেত।

কাজলের নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে তাকে কিছু পুরস্কার দেবার কথা হলো।

কাজল বললো, অন্য কোনো পুরস্কার চাই না স্যার, শুধু আপনারা যেন একটু স্বীকার করেন, মেয়েরাও গোয়েন্দা হতে পারে। আজ পর্যন্ত তো একটা এমন গোয়েন্দা গল্প পড়তে পাইনি, যার গোয়েন্দাটি মেয়ে। আপনারা প্রচার করলে, লেখকরাও ভাবতে পারেন, মেয়ে গোয়েন্দার গল্পই লিখি দু'একটা।

ছবি : বিজন কর্মকার

মিষ্টি সৃষ্টি

ধূর্জটি চন্দ

মোটেই সে খোঁড়ায় না, তবু নাম ল্যাংচা
দেখলেই জিভে জল, যতই তুই ভ্যাংচা!
গাছ থেকে পাড়া নয় তবু নাম কালোজাম
এরকম আরো আছে, সবেরই যে ভালো দাম!
প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি, তাই নাম প্রাণ-হরা,
মন নিয়ে যায় বলেই হয় কি সে মনোহরা?
তাল নেই তবু নাম তালশাঁস সন্দেশ
একবার মুখে দিলেই ভরে যায় মন বেশ!
দর যদি ভালো হয় বলি মোরা 'দর বেশ',
আসলে সে ফকির না, উপাদেয় দরবেশ?
কচুপোড়া মুখপোড়া খারাপ নয় সব পোড়া
যদি দেখ পেয়ে গেছ চাঁদিপুরী ছানাপোড়া!

দস্যি

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার আছে লাটাই-ঘুড়ি, আছে গুলতি-গুলি,
মহিমস্যারের ভীষণ বকা, 'আয় কাছে কান মুলি!'
ঢোলক-ভেঁপু লাট্টু-লাটিম, ঘাড় নাড়া এক বুড়ো,
স্যার বলেছেন, 'হাট কবিতা মুখস্থ চাই পুরো!'
স্যারের পড়া করতে আমার ভারিই গেছে বয়ে,
বেতের ঘায়ে আর লাগে না, ওসব গেছে সহে।
খুব সকালে ডাকেন বাবা, 'পড়তে বসো, ওঠো',
পড়তে আমার ভাল্লাগে না, বেড়াই ঘুরে টো-টো!
সুযোগ পেলে স্কুল পালিয়ে ফিকির আঁটি নানা,
ভাল্লাগে না বাধা-নিষেধ, হাজার রকম মানা!
ভরদুপুরে ঠা-ঠা রোদে ওড়াই আমি ঘুড়ি,
পিন্টু-পাপু থাকলে সাথে আম-পেয়ারা চুরি!
যতই বকুক, মারুক-ধরুক, এসব করেই খুশি,
মা-হারা এক কোকিলছানা, যত্নে তাকে পুষি!
সবাই ঘুমে, ছিপ নিয়ে যাই, বসি পুকুরপাড়ে,
টপটপাটপ মাছ ওঠে খুব, আহা দারুণ চারে!
কাঠবেড়ালি ফুড়ুৎ পালায়, ক্লান্ত ঘুঘু ডাকে,
মহিমস্যারের সঙ্গে দেখা অশথতলার বাঁকে।
স্যারকে দেখে ছুটতে থাকি, ছুটতে থাকি চোঁচা,
কে যেন কে বললো শুনি, 'মায়ের দুঃখ ঘোচা!'
সবাই আমায় খারাপ বলে, যা-তা বলে পড়শি,
এ গাঁয়ে নেই আমার মতো দ্বিতীয় এক দস্যি!

ছবিঃ সুফি

নাট্যে কথামৃত

জ্যোতিভূষণ চাকী

[শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের গল্প তো সবাই জান। কথা নয় অমৃত, গল্প নয় হীরের টুকরো। এই চিরনূতন গল্পগুলোতে অল্প পরিসরে নাট্যরূপ দেওয়া হলো। তোমরা স্কুলের অনুষ্ঠানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন-চারটে গল্পের ছোটো ছোটো নাটকগুলো খুব সহজেই অভিনয় করতে পার। একটু সাজসজ্জা হলে তো ভালই হয়। তার জন্য খুব ঘটা করবার দরকার নেই। তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি করে সামান্য উপকরণে নিজেদের সাজ নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে। বাড়িতেও ভাইবোনেরা মিলে এই অভিনয় করতে পার। কখনও বাবা-মাও তাতে যোগ দিতে পারেন। সে ভারি মজা হবে।]

ঠিকানা

[গ্রামের পরিবেশ। একটি ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়ে আসছেন]

ভদ্রলোক—কই, কাউকে তো দেখছি নে। হরিদাস গাঙ্গুলির বাড়িটা যে ঠিক কোথায় হবে ঠাওর করতে পারছি নে।

[ভদ্রলোক এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে দেখতে পেলেন দূরে পুকুরে মাছ ধরছেন একজন গ্রামের লোক]

ঐ তো একজনকে পাওয়া গেছে যা হোক। ওঁকেই জিজ্ঞেস করি।

(কাছে গিয়ে) মশাই, হরিদাস গাঙ্গুলির বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

[গ্রামবাসী নিরুত্তর। একমনে ফাতনার দিকে তাকিয়ে]

(উচ্চতর কণ্ঠে) ও মশাই, বলি হরিদাস গাঙ্গুলির বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

[গ্রামবাসী নিরুত্তর]

(স্বগতোক্তি!) সে কী। কালা নাকি?

(উচ্চতর কণ্ঠে) বলি, মশাই, শুনতে পাচ্ছেন? বলি হরিদাস গাঙ্গুলি মশাইয়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

[গ্রামবাসী নিরুত্তর। চোখ ফাতনার দিকে]

(বিরক্তি সহকারে) বদ্ধ কালা, বুঝে গেছি। একাই খুঁজি তবে।

[ভদ্রলোক কিছু দূরে গিয়েছেন। এমন সময়—]

গ্রামবাসী—ও মশাই! শুনুন, শুনুন। বলি ও মশাই!

[ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে এসে ঝাঁঝালো সুরে]

বলি, পিছু ডাকলেন কেন? তখন যে এত করে শুধোলেম, হরিদাসবাবুর বাড়িটা কোনখানে—

গ্রামবাসী (একগাল হেসে)—ও হরিদাসবাবুর বাড়ি? ঐ যে খেজুর গাছটা দেখছেন, ওর বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে যান, দেখবেন একটা বাঁশঝাড়। ওখানেই তাঁর বাড়ি।

ভদ্রলোক—বেশ! তা তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, মশাই। তখন যে এত করে জিজ্ঞেস করলাম, হরিদাসবাবুর বাড়ি কোথায়। কথাটা কানেই নিলেন না। ব্যাপারটা কী বলুন তো।

গ্রামবাসী—আজ্ঞে, তখন তো ফাতনা ডুবছিল। অন্য দিকে মন দিলে কি আর রুই মাছটা ধরতে পারতাম! (রুই দেখালেন)

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক—এই হলো একাগ্রতা। যে মাছ ধরছে, ফাতনার দিকে তার সমস্ত মন। ফাতনা ডুবতেই সে টান দেয়। তাই সে বড়ো মাছটা ধরতে পারে। এমনি সব কাজে একাগ্রতা থাকলেই সিদ্ধি। তা সে খেলার মাঠে গোল করার ব্যাপারেই হোক, পড়াশুনোর ব্যাপারেই হোক, আর ঈশ্বর সাধনার ব্যাপারেই হোক।

(পরের মাসে নতুন গল্প)

একজন বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এবং স্বামী বিবেকানন্দ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

সেই সময় ইউরোপে মাদাম এমা কালভে-কে সবাই চিনতেন এক ডাকে। মঞ্চে এতবড় গায়িকা তখন আর কেউ ছিলেন না। তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠের গান শোনার জন্য সর্বত্রই দারুণ ভিড় হতো।

আমরা যে-সময়ের কথা বলছি, সেটা ১৮৯৪ সাল। মাদাম কালভে তাঁর সঙ্গীত সফরে ফ্রান্স থেকে এলেন আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। এই অপেরা-গায়িকার অতুলনীয় কণ্ঠের গান শোনার জন্য নিউ-ইয়র্কের মানুষ প্রতিটি শো-তেই ভিড় জমিয়েছিল। এবার মাদাম এলেন নিউ-ইয়র্ক থেকে শিকাগো শহরে। এই বিখ্যাত শহরেও তিনি কয়েকটি অনুষ্ঠানে গান করবেন।

১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরেই অবস্থান করছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময় তিনি যাঁর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তিনি মাদাম এমা কালভের একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। মাদাম কালভে শিকাগোতে গান গাইতে এসে ওই বান্ধবীর মুখেই প্রথম শুনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের কথা, শুনেছিলেন এই ভারতীয় মহাযোগীর অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী।

স্বামীজির কথা মুগ্ধ বান্ধবীর মুখে শুনতে শুনতে মাদাম কালভে কেমন যেন এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি। বিশেষ করে এই বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা একদিকে যেমন সহস্র মানুষকে বিমোহিত করে মঞ্চে উজ্জ্বল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গান করেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এক নিঃসঙ্গ ও অশান্ত হৃদয় নিয়ে অন্ধকারের নির্জনতায় আত্মগোপন করেন।

এই অশান্ত-নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর একমাত্র আশার প্রদীপ ছিল কন্যাটি। এই কন্যাটিই তাঁর সংসার জীবনে একমাত্র বন্ধন। তাই হাজার ব্যস্ততার মধ্যে কখনও কন্যাটিকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারতেন না।

সেদিন শিকাগোর এক বিরাট অপেরায় তাঁর গানের আসর বসেছে। সহস্র মানুষের সহর্ষ করতালিধ্বনির মধ্যে তাঁর গান হলো অতুলনীয়। তাঁর মনে হলো, এর আগে এমন গান তিনি আর কখনও করেননি। এভাবেই প্রথম অঙ্ক শেষ হলো। এবার কিছুক্ষণের জন্য বিরতি। এই বিরতির সময় হঠাৎই একটা অজানা আশঙ্কা তাঁকে ঘিরে ফেলল। কেন যে এমন হলো, তা তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন না। বুক ঠেলে কান্না এসে যেন তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে তা-ও তিনি জানেন না। তাঁর মনে হলো, আজ আর তিনি গাইতে পারবেন না। অজানা এক আশঙ্কায় তিনি যেন গান গাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

এ-কথা শুনেই অপেরা কর্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মাদাম এমা কালভে গান না করলে দর্শকরা যে তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে তিনি আবার গান গাইতে রাজী হলেন। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে তিনি গান করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের পর বিরতির সময় তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কী এক অজানা আশঙ্কা তাঁর দেহ-মনকে একেবারে স্থবির করে তুলল। তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকে, শ্বাসকষ্ট হয়ে ওঠে প্রবল। তবু অপেরার ম্যানেজার ছাড়ার পাত্র নন। সকলের অনুরোধে এবং শ্রোতাদের দাবিতে ওই অবস্থাতেই তিনি আবার গান গাইতে মঞ্চে গিয়ে ঢুকলেন। শ্রোতাদের প্রচণ্ড করতালির মধ্যে মঞ্চের পর্দা উঠল। তারপর মাদাম যে গান গাইলেন, তার কোনো তুলনাই নেই।

গান শেষ করেই তিনি ছুটে সাজঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন অপেরার ম্যানেজার এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী অশ্রুসজল চোখে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। স্তম্ভিত এবং শঙ্কিত মাদামকে তাঁরাই শোনালেন সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ: মাত্র কিছুক্ষণ আগে মাদামের একমাত্র অবলম্বন তাঁর কন্যাটি আগুনে পুড়ে মারা গেছে। সব কথা মাদাম আর শুনতে পারলেন না, তার আগেই জ্ঞান

হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

॥ ২ ॥

এরপরের ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক এবং করুণ।

একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে মাদাম হারিয়ে ফেললেন তাঁর মানসিক ভারসাম্য। পাগলের মতো অসংলগ্ন হয়ে উঠল তাঁর আচরণ, বন্ধ হয়ে গেল গান। তাঁর সেই বান্ধবী মাদামের এই দুঃসহ অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একসময় তিনি বললেন, চল না আমাদের বাড়িতে সেই ভারতীয় যোগীর কাছে। তুমি তাঁর শরণ নাও—জীবনে শান্তি পাবে।

কিন্তু কন্যা-হারা মাদাম তো তখন জীবনে আর শান্তি চান না, চান মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যু। কন্যা হারানোর শোক ভুলবার জন্য আত্মহত্যা করবেন বলে তিনি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মাদাম যে বাড়িটাতে থাকতেন, তার কাছেই ছিল একটা বড় লেক (সরোবর)। একদিন উদ্‌ভ্রান্ত গায়িকা ঠিক করলেন, ওই লেকের জলেই তিনি আত্মহত্যা করে জীবনের সব জ্বালা জুড়াবেন। সেদিন তিনি লেকে ঝাঁপ দেবেন বলে বাড়ি থেকে বের হলেন—কিন্তু এক অজানা আকর্ষণে তিনি লেকের দিকে না গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথ চলতে চলতে নিজেরই অজান্তে গিয়ে হাজির হলেন স্বামীজির সেই বাড়ির কাছে। হঠাৎ যেন কী হয়ে গেল। তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি ভাবলেন, এখানে তিনি এলেন কেন? মনে পড়ে গেল তাঁর সব কথা। সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করার সংকল্প নিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে।

দ্বিতীয় দিনও আত্মহত্যা করার জন্য পথে বেরিয়ে সেই লেকের দিকে না গিয়ে এক অদম্য, অথচ তীব্র আকর্ষণে নিজের অজান্তেই তিনি গিয়ে হাজির হলেন স্বামীজির বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আবার আগের মতোই সম্বিৎ ফিরে পেলেন। আবার ছুটে চলে এলেন নিজের বাড়িতে। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, লেকের পথে পা বাড়িয়ে তিনি কেন বারবার স্বামীজির সেই বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হচ্ছেন।

একদিন বা দু'দিন নয়, পরপর তিনদিন এই একই ঘটনা ঘটল। চতুর্থ দিনে তিনি দৃঢ়সংকল্প হয়ে সতর্কভাবে এগিয়ে চললেন লেকের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, কোথায় লেক— তিনি তো স্বামীজির সেই বাড়ির সামনে আজও চলে এসেছেন। কিন্তু কে তাঁকে এখানে নিয়ে এলো? বারবার ভেবেও কোনো কূলকিনারা পেলেন না তিনি। এবারে আর নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন না। অদৃশ্য বিধাতা তাঁকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটাই সেদিন তিনি দেখতে চাইলেন। তাই, স্বামীজির সেই বাড়ির দরজায় খুব জোরে জোরে করাঘাত করতে থাকেন। বাড়ির পরিচারক এসে দরজা খুলে দিল। তিনি দুরন্ত ঝড়ের মতো খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা চেয়ারের উপর নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন। তারপর একটা আচ্ছন্নভাবের মধ্যেই পরিচারককে বললেন, আমার বান্ধবীকে একবার খবর দাও। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, বান্ধবী এলে তাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করবেন।

বিধ্বস্ত হৃদয় নিয়ে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞানহারা হয়েই সেই ঘরে বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন এক অপূর্ব গম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠস্বর। পাশের ঘর থেকে সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—তাঁকেই যেন সেই কণ্ঠস্বর একান্ত আপনজনের মতো অন্তরমথিত ভাষায় ডাকছেন, এখানে এসো মা। এই যে আমি তোমারই জন্য বসে আছি। এসো—ভয় কি তোমার?

এই কণ্ঠস্বরের মায়ায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মাদাম। তারপর ওই কণ্ঠস্বরের টানে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন পাশের ঘরে। ভাবাবিষ্টের মতো ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাকিয়ে দেখলেন, বিরাট একটা টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন গেরুয়া বসন-পরিহিত, অপূর্ব-দর্শন এক সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগী ভারতীয় ওই সন্ন্যাসীর অন্তরভেদী দু'টি অত্যুজ্জ্বল চোখ এবং প্রসন্ন মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে মাদাম কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে গেলেন। কথা বলার কোনো ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। স্বামীজিও নির্বাক। পরস্পর পরস্পরকে দেখছেন। এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। তারপর একসময় স্বামীজি ইঙ্গিতে এমা কালভেকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

এমা কালভে যেন স্বপ্ন দেখছেন। সেভাবেই তিনি তাকিয়ে আছেন স্বামীজির দিকে, সেভাবেই তিনি বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। এবার স্বামীজির স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি। স্বামীজি বলছেন, মা, তোমার চারদিকে কি ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশ। শান্ত হও। শান্তি পেতে হলে শান্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

এরপর যা ঘটল, তাতে মাদাম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্বামীজি ধীরস্থির কণ্ঠে মাদাম কালভের বৈচিত্র্যময় জীবনের গভীর সমস্যাগুলি একে একে বলে যেতে লাগলেন, বলে যেতে লাগলেন এই বিশ্ববিখ্যাত গায়িকার যাবতীয় উদ্বেগের কথাও। স্বামীজির কথা শুনতে শুনতে মাদাম কেমন যেন বিবশ হয়ে গেলেন। কথা বলার শক্তিও তাঁর ছিল না। তিনি শুধু ভাবতে থাকেন, স্বামীজি এমন সব কথা বলে গেলেন যা মাদাম কোনোদিন কাউকে বলেননি। তাহলে দূরদেশ থেকে আগত একজন সন্ন্যাসী এসব কথা জানলেন কেমন করে? স্বামীজির সুন্দর কণ্ঠস্বর তাঁকে যেন ভিন্ন জগতে নিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ মাদাম সম্বিৎ ফিরে পেলেন, প্রশ্ন করলেন স্বামীজিকে, আচ্ছা স্বামীজি, আমার জীবনের এই সব গোপন কথা আপনি জানলেন কিভাবে?

স্বামীজি প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তাকালেন এমা কালভের দিকে, তারপর বললেন, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। তুমি যেমন করে একখানি খোলা বই পাঠ কর, ঠিক তেমনি করে আমিও তোমার মনের কথাগুলি পড়ে নিলাম।

এমা একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকেন। স্বামীজি শান্তস্বরে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। এভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর এমা বুঝলেন, তাঁর মন অনেকটাই শান্ত হয়েছে, আত্মহত্যা করার চিন্তাটাও মন থেকে অনেকটা দূরে চলে গেছে। এবার তিনি তাই ঘরে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজি তাঁকে পরম স্নেহের সুরে বললেন, তুমি তোমার জীবনের ঐ সব বিশ্রী ঘটনাগুলি চিরতরে ভুলে যাও। আবার তুমি প্রফুল্ল হও, সুখী হও। তোমার শরীরটাকে ঠিক কর। একা একা বসে শুধু নিজের দুঃখকষ্টের কথা আর ভেবো না। তোমার সুস্থ চিন্তা ও মনের জন্য এ-জিনিসটা বিশেষ প্রয়োজন, প্রয়োজন তোমার সঙ্গীত সাধনার জন্যও।

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার পর এমা কালভে যেন নতুন জীবন লাভ করলেন, ঘটল তাঁর নতুন জন্ম। তিনি হয়ে উঠলেন নতুন মানুষ। এমা কালভে স্বামীজির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন এবং স্বামীজিকে তিনি ফরাসী ভাষায় Mon Pere (মঁ পিয়ার) বলে সম্বোধন করলেন—যার অর্থ "আমার পিতা"।

এই মাদাম কালভে সম্পর্কে স্বামীজি নিজেই লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত "পরিব্রাজক" গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; তাঁর বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র ঘরে তাঁর জন্ম। ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধনের, রাজা-বাদশার সম্মানের অধিকারী। মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকলে আছেন। জাঁ দরজে, কি প্লাস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কগণও আছেন। এঁরা সকলেই দু'তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন। কিন্তু কালভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে (যুক্ত হয়েছে) এক অদ্ভুত প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবীকণ্ঠ। এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। তাঁর শৈশবে অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট, যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়-লাভ—এই সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।

১৮৯৩ সালে শিকাগোয় বসেছিল বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন। আর ১৯০০ সালে প্যারিসে বসেছিল ধর্ম ও ইতিহাসের মহাসম্মেলন। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্যারিস কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময় ফরাসী-দুহিতা মাদাম কালভে স্বামীজির আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৯০১ সালে স্বামীজি যখন মিশর, তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতি দেশ পর্যটন করছিলেন, তখন মাদাম এমা কালভে, বোস্টনের ধর্মযাজক হিয়াসিন্থ ও তাঁর স্ত্রী এবং শিকাগোর কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড তাঁর সঙ্গী ছিলেন। মাদাম কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে এই ভ্রমণের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, কি সুন্দর তীর্থযাত্রাই না হয়েছিল! বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাসের কোনো রহস্যই স্বামীজির অজ্ঞাত ছিল না। আমার চারপাশে যে-সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো, আমি উৎকর্ণ হয়ে সে সকলই শুনতাম। আমি তাঁদের যুক্তিতর্কে যোগদানের চেষ্টা করতাম না। আমার অভ্যাস অনুসারে বিভিন্ন উপলক্ষে আমি শুধু গান করতাম। প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক ও পণ্ডিত ফাদার লয়সনের সঙ্গে স্বামীজি সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গির্জা সংসদের তারিখ ও দলিলের মূল বিষয়টি পর্যন্ত তিনি বলে দিতেন। ফাদার লয়সন খ্রিস্টান ধর্মযাজক হয়েও সেই সকল বিষয় এতটা বিস্তৃতভাবে জানতেন না।

এ ব্যাপারে বিস্ময়ে অভিভূত মাদাম একদিন স্বামীজিকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, আপনি এ-সব সংবাদ জানলেন কি করে?

উত্তরে স্বামীজি বললেন, গত দশ হাজার বছর ধরে আমাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের শেষাংশ উপনিষদগুলি পুরুষানুক্রমে মুনি-ঋষিরা লিখে রেখেছেন। এই মুনি-ঋষিদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত, অধ্যয়ন, অনুভূতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই সব লেখার আলোচনা ও সংস্কার করেন। কখনও কারো গ্রন্থের একটিমাত্র বাক্য বা একটি পৃষ্ঠামাত্র গৃহীত হয়। কদাচিৎ কারো গোটা রচনাটাই রক্ষিত বা উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রাগার সুবিশাল—সম্ভবত সব থেকে বড়ও।

মিশর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দিকে যাত্রা করেন। স্বামীজির সঙ্গে সেখানেই মাদাম কালভের শেষ দেখা।

॥ ৩ ॥

১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজি মহাসমাধিতে লীন হয়ে যান। ১৯১০ সালে মাদাম কালভে তাঁর Mon Pere-এর দেশ ভারত দর্শনে এসেছিলেন। তিনি কলকাতায় এলে বিবেকানন্দ সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে গ্র্যান্ড হোটেলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। উক্ত সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মাদামকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দুইখানি প্রতিকৃতি উপহার দেন। সকলের সামনেই মাদাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিটি বারবার মাথায় ঠেকাতে থাকেন। তারপর স্বামীজির প্রতিকৃতিটি হাতে নিয়ে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে যান—ফরাসী ভাষায় প্রবল আবেগের সঙ্গে স্বামীজির কথা বলতে থাকেন। তিনি বললেন, স্বামীজি যীশুর মতোই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি যীশুর মতোই সরল, প্রেমিক আর পবিত্র।

মাদাম এলেন স্বামীজির স্বপ্ন দিয়ে গড়া বেলুড় মঠ দর্শন করতে। স্বামীজির গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ তাঁকে মঠে সম্বর্ধনা জানালেন, তাঁকে নিয়ে গেলেন স্বামীজির স্মৃতিমন্দিরে। সেই নীরব-শান্ত গঙ্গাতীরে মাদাম কালভে গিয়ে বসলেন তাঁর গুরুর মর্মরমূর্তির পদপ্রান্তে। সেখানেই মাদাম হলেন ধ্যানস্থা। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে এসে তিনি ঠাকুরকে গান শোনালেন। এখানেই স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

বাবাইয়ের রেনি-ডে

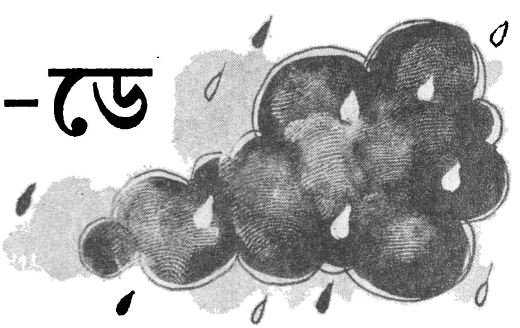

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা সেদিন ভাসছে। বাবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে—হঠাৎ মেঘ ফেটে বৃষ্টি শুরু হলো। রাস্তায় বৃষ্টির জল জমবে জমবে করেও জমছে না। আরও একটু জোরে বৃষ্টি নামলেই তো স্কুল ছুটি হয়ে যেত। কিন্তু জল জমলো স্কুল শুরু হবার পর। অবশ্য স্কুল বন্ধ হলে যে বাড়িতে মজা হয় তা কিন্তু নয়। স্কুলেও মজা নেই। বাড়িতেও নেই। কাজেই স্কুলে আসা।

আজকাল ও স্কুলে আসে। এর আগে পরপর তিনটে স্কুল থেকে ওর নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল। সব স্কুলেই ঐ এক কথা—'অসম্ভব! এ ছেলের কিছু হবার নয়।' সবাই নানাভাবে বলে দিয়েছেন, হয় ওর মাথায় বুদ্ধিই নেই কিংবা ভীষণভাবে গুলিয়ে গেছে। ডাক্তার দেখানো দরকার। নানা রকম ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। যন্ত্রতন্ত্র বসিয়ে ভাল করেই সব দেখেছেন। কথাও হয়েছে অনেক। শেষবার যিনি দেখেছেন, খুব নামকরা কেউকেটা ধরনের, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আধ-বোজা চোখে বলেছেন, 'হতেও পারে, নাও হতে পারে। কেস্‌টা ধৈর্যের। অপেক্ষা করতে হবে! এক বছরেও হতে পারে, পাঁচ বছরও লাগতে পারে।'

এই সব কথা শুনে সেদিন মা, বাবা, ঠাম্মা আর দাদাভাই মুখ চুন করে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। শেষে দাদাভাই রেগে উঠে বললেন, 'ডাক্তারগুলো যা-হয় একটা বলেই খালাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকেই ব্যাপারটা হাতে নিতে হবে। টিভি দেখাটা বন্ধ কর! স্কুলটুল যাবারও দরকার নেই। আমি দেখি কি করতে পারি!' শুনে দিদার তো হাঁউমাঁউ অবস্থা—'সেকি, সেকি! তাহলে সারাটা দিন তোমার আদরে মাথার যেটুকুও বা কাজ করছে তা একেবারে বন্ধ হবে। না, না, না—তা হতে পারে না।' ওর মা আর বাবা দু'জনেই আপিস যান। সবে ফিরে এই কাণ্ড দেখে খুব দুঃখের সুরে নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কিসব কথা বললেন। শেষে ওর মা— 'ও মাই গড্!' বলে কাঁদো কাঁদো মুখে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন। ওর বাবা তখন বাবাইয়ের হাত ধরে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। একটু পরে হঠাই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আকাশে কী থাকে, বল তো?'

বাবাই ঘাড় নাড়ল—জানে না। মনে মনে হাসল—'জানি, কিন্তু বলব না। আকাশে চাঁদ আছে, সূর্য আছে, মেঘ—পাখিটাখি কত কী আছে—' এসব বলতে ওর ভারি বয়েই গেছে!

ও যে রোজ স্কুলে যায় সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করে সবাই। কিন্তু ওর সত্যিই কি স্কুলটা ভাল লাগে? মোটেই না। তবে এটা ঠিক, এখানে কেউ বিশেষ বকাঝকা করে না আর জোর করে পড়ায় না। এখানে ক্লাসে গানটান হলে শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু গাইতে বললেই ওর রাগ হয়। আর মাঝে মাঝে টিভি-তে দেখা ভিলেনদের মতো যখন মারামারি হয় টিফিনের সময়, তখন কখনও কখনও ও দু'চারটে ঘুঁষি চালাতে ভালই বাসে। কিন্তু বেশিক্ষণ কিছুই ভাল লাগে না ওর।

ওকে বাড়ি নিয়ে যায় মোহনলাল। গাড়িতে বসে ওর সঙ্গে কথা হয়। মোহনলাল ওদের বাগানটার মালী আর ওদের বাড়ির পেছনের ছোট্ট ঘরে থাকে। কেউ নেই ওর। কত গল্প জানে। গান গায়, তবে খুব নিচু সুরে—ভয়ে ভয়ে। জোরে গাইতে গেলে যদি কেউ শুনতে পেয়ে বকে! লেখাপড়াও জানে অল্প, ক্লাশ টেন পর্যন্ত। তবে ঐ গাড়িতেই যা কথা হয়। ওর ঘরে যাওয়া বুবাইয়ের বারণ। কেন বারণ তা অবশ্য বুবাই জানে না। 'এ কোরোনা ও কোরোনা', 'এখানে যেও না ওখানে যেও না'-তে তো জান কয়লা।

বাড়িতে কেউ নেই। কেবল আয়াদি

ছাড়া। আয়াদি সারাদিন অনেক কাজ করে। সেসব কাজের মাথামুণ্ডু নেই। মোহনলাল বলে, ও হলো জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করা টাইপের লোক। সারাদিন যেন ছায়ার সঙ্গে লড়াই করাই ওর কাজ। আয়াদি এখন ছাদে গেছে। ও সেই সুযোগে ঢুকল মার ঘরে। আসলে মার ঘরে যে মস্ত দেওয়ালের আধখানা জোড়া আয়নাটা, সেটা যেন মোহনের চাইতেও 'মাই ডিয়ার'।

আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বাবাই দেখলো ঠিক ওর মতো একটা ছেলে. আয়নার মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরে! বলে, বাবাই কোমর থেকে হাত দুটো নামালো। ছেলেটাও হাত নামিয়ে নিল। কী চোট্টা ছেলে রে বাবা! কিন্তু ও যা-ই করে তা কিন্তু আয়নায় উল্টো হয়ে যায়। কেউ তো আগে বলেনি যে আয়নার ছেলেটা ওর ডান হাত বাড়িয়ে দিলে, ও বাঁ হাতে তা ধরে। একবার বাবাই মুখ ভ্যাংচালো। ছেলেটাও তখুনি তাই করলো। আয়নার কাছে গিয়ে প্রায় নাক ঠেকিয়ে জীবটা লম্বা করে বার করে মা-কালীর মতো,বাবাই হাত উঁচিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটাও মা-কালী হয়ে গেল। একি রে বাবা! বাবাই ভাবতে লাগল—আমি কে? সত্যি সত্যি ওকি আমি, না কি আমি ও?

চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চারধার দেখে নিল ও। নাঃ, আয়াদি পর্যন্ত নেই। দাদাভাই আর ঠাম্মা গেছেন নেমন্তন্নে। মা আর বাবার ক্লাবে ফাংশান। অন্যসব যে কাজের লোক; তারা সবাই নিজের নিজের তালে আছে বা নেই।

টুক্ করে দরজা খুলে বাড়ির পেছনের গলি দিয়ে বাবাই সোজা মোহনলালের ছোট্ট ঘরে হাজির হলো দরজা ঠেলে। মোহন একটা ছেঁড়া গল্পের বই পড়ছিল মন দিয়ে।

'মোহনদাদা!'

চমকে, প্রায় লাফিয়ে উঠল মোহন।

'কে?—বাবাই? এত রাতে?'

মুখে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বাবাই বড় বড় চোখ করে বলে উঠল—'চুপ্!'

তারপর ঠিক যেন ষড়যন্ত্র করছে এমনিভাবে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে মুখটা মোহনের কানের কাছে এনে বলল, 'ঐ যে, মার ঘরে যে আয়নাটা আছে তার মধ্যে আমার মতো একটা ছেলে। ঠিক আমি যা করছি ও তাই করছে। কেবল আমি ডান হাত নাড়লে ও বাঁ হাত নাড়ছে—সব একটু উল্টো উল্টো—কেন, বলো তো?'

হেসে চাপা গলায় মোহন বলল, 'বোসো, বোসো, বলছি। ঐ আয়নায় তোমার কী হয়েছিল জানো? আয়না আসলে একটা কাচের জিনিস, যার ও-পিঠে রুপোলী রঙ লাগানো। যদি আয়নার পেছনে ঐ রুপোলী রঙ না থাকে তাহলে সেটা আর আয়না হয় না—কাচ হয়। ঐ যে তোমার ঘরের কাচের জানলা—তার ভেতর দিয়ে আলো ধাঁ করে ঢুকে যায়। সব পরিষ্কার ঝকঝকে। কিন্তু যেই না কাচে রুপোলী রঙ লাগানো হয়, অমনি তাতে আলো পড়ে ছিটকে যায়। তোমার ঐ আয়নার ছেলেটাকে উল্টো লাগে, কেন না, আলো ছেলেটার গা থেকে সোজা আয়নায় ঝাঁপিয়ে পড়েই আবার সোজা পেছনে লাফিয়ে পড়ে। বুঝেছ? পরে একদিন দেখাবো কী করে কী হয়—বুঝেছ, বাবাইরাম? এখন ছুটে ঘরে চলে যাও।'

বাবাই এক ছুট্টে নিজের ঘরে চলে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর সেদিন যা ঘুমোলো—একটা স্বপ্নও দেখল না।

গড়িমসি করে ইস্কুলের জন্যে তৈরি হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বাবাইয়ের মনটা গাঁইগুঁই করতে থাকে। ও তো বেশ নিজের মনে মনেই থাকে। কিন্তু আজ মনটা ভারি চন্মন্ করছে। আকাশে কত মেঘ—কালো, ছাই রঙের, সাদাটে। একটু গুম্গুম্ আওয়াজ আসছে মাঝে মাঝে। হাওয়া উঠল।

স্কুলে পৌঁছে দিয়ে মোহনলাল বলল, 'আজ একটু পড়াশুনো করার চেষ্টা কোরো, কেমন? বড়ো সায়েব আমাকে একটা কাজে শ্যামবাজার পাঠাচ্ছেন, নিতে আসতে পারবো না। ভালভাবে বাড়ি চলে যেও।'

'ওঃ!' বলে একটু তাকিয়ে থেকে বাবাই স্কুলের ভেতর ঢুকল। মনটা ভারী ভারী লাগছে।

হঠাৎ কানে এলো কান্নার আওয়াজ—ওদের ভিজিটর্স্ রুমের ভেতরে বসে কারা কাঁদছে। উঁকি মেরে যা দেখল তাতে ও না দাঁড়িয়ে পারল না। ওর চাইতে বড়, মোটাসোটা দুটো ছেলে সোফায় বসে ভীষণ জোরে চেঁচাচ্ছে। গলায় কান্নার সুর লাগিয়ে রাখলেও চোখে এক ফোঁটা জল নেই। বড় ছেলেটা, যার গালগুলো টেবো-টেবো—কেঁদে বলছে, 'ও বাবাগো, আমরা ইস্কুলে পড়বো না—বাবা, তুমি কোথায় গেলে গো—!' ছোট ছেলেটা, যার চোখ দুটো গুলি-ভাঁটা ধরনের, ভীষণ গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে—'বাবা, এই ইস্কুলে পড়লে আমরা মরে যাব। দাদুর কাছে নিয়ে যাও বাবা। আমরা পড়াশুনো করতে চাইনে—।' একজন টিচার কেবলই তাদের বোঝান—'না বাবা, ওরকম করে না—তোমাদের বাবা এক্ষুণি এসে তোমাদের নিয়ে যাবেন—একটু চুপ করো, লক্ষ্মী ছেলেরা!' কিন্তু কেঁদেই চলেছে দু'জন।

এমন সময় বাবাইকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড় ছেলেটা কান্না থামিয়ে ওকে দেখতে লাগল। হঠাৎ ছোট ছেলেটা রসগোল্লার মতো চোখ দুটো পাকিয়ে, তার দাদার গালে প্রচণ্ড জোরে চড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল—"এই স্টুপিড দাদা, কান্না থামালি কেন?- ভর্তি করে নেবে তো!' তখন আবার চিৎকার করে শুরু হলো দু'জনের কী ভয়ানক হল্লাবাজি!

বাইরেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে টিচারকে বললেন, 'ওদের ছেড়ে দিন—বাড়ি নিয়ে যাই। আমার বাবা বলে দিয়েছেন ওরা কান্নাকাটি করলে যেন ভর্তি না করি। আয় রে তোরা!'

বাবাইয়ের মনটা কেমন কেমন হয়ে গেল—'ওদের বাবা কি মাই ডিয়ার!'

স্কুলে ঢুকতেই কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! ক্লাসের 'আন্টি' জানলা ভেজিয়ে দিতে দিতে বলে উঠলেন, 'আজ রেনি-ডে হয়ে যাবে।' ব্যস্! তখন হাততালির চোটে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল। বাবাই-ও হাততালি দিয়ে আজ বেশ মজা পেল।

নিচে গিয়ে দেখল, 'রেনি-ডে' হতে

পারে ভেবে বড়রা অনেকেই থেকে গিয়েছিলেন। এখন ছেলেমেয়েরা বাবা বা মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেকে। ওদের গাড়ির ড্রাইভার—কিষাণ, ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে 'বৈঠো আরামসে' বলে যেই আবার স্কুলে ঢুকে সইয়ের খাতায় সই করতে গেছে, উল্টো দিকের দরজা খুলে বাবাই ছপাৎ করে জলে নেমে উল্টো দিকে হেঁটে একটা বাড়ির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। কিষাণ একটু পরে বেরিয়ে এসে তো তাজ্জব—কোথায় গেল বাবাইবাবা? খোঁজাখুঁজি, হৈচৈ চলল। টেলিফোনে বাড়িতে যোগাযোগ করে পাওয়া গেল না লাইন। কিষাণ ড্রাইভার প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে রওনা দিল। আর আশপাশের থানাগুলোয় ফোন করা হতে থাকল স্কুল থেকে।

এবার চুপি চুপি বাবাই চলল উল্টো রাস্তা ধরে। জলে হাঁটা জীবনে এই প্রথম। হাঁটু অবধি জল উঠেছে কোথাও কোথাও। সামনেই একটা পুলিশের গাড়ি থেকে ছোকরামতো কে একজন নেমে এসে ওকে ধরে ফেলে বলল, 'আরে! তুমি কী বাবাই?'

'না, কেন? তুমি তো পুলিশ।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছ। আমার সঙ্গে এসো।'

'না, যাব না। গাড়িটা বিচ্ছিরি।'

'ঠিক আছে, হেঁটেই চল। ঐ তো আমার বাড়ি। দু'জনে মিলে আড্ডা দেওয়া যাবে।' বলে পুলিশ অফিসারটি পকেট থেকে নোটখাতা বার করে ঘস্‌ঘস্‌ করে কিসব লিখে দিয়ে ভ্যান গাড়িতে বসে থাকা একজন বুড়োমতো পুলিশকে বলল, 'এটা নিয়ে থানায় যাও। এই নম্বরে ফোন করে যেন বলে দেন—সব ঠিক আছে। সময়মতো পৌঁছে যাবে।' ভ্যানটা জল ছিটকিয়ে চলে গেল।

'তোমার নাম কি?'

'আনন্দ! তোমার?'

'বাবাই। ইস্কুলের ভাল নাম রাজীব।'

'বাঃ!'

বাবাই দেখল আনন্দর মুখটা সবসময় হাসিহাসি। দারুণ দেখতে। অন্তত বাবাইয়ের দারুণ লাগছে। টিভি-র হিরোদের মতো নয়। অন্যরকম হিরো।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আনন্দ ওর ফ্ল্যাটে এসে জামাকাপড় বদলে নিল। বাবাইকে ওর বাড়ির কোনো ছোটছেলের জামাপ্যান্ট পরিয়ে নিয়ে বলল, 'চলো, ঘুরে আসি।' বলে একটা ফিয়াট গাড়ি বার করে বাবাইকে পাশে বসিয়ে সেইরকম হাসিহাসি চোখ দিয়ে বাবাইকে দেখে নিতে নিতে বলল, 'কেমন লাগছে, স্যার?'

'ভাল। খু—ব ভাল। ওটা কী? অত জল কোথায় যাচ্ছে?'

'গঙ্গা নদী। কলকাতার এই অংশটাকে বলে হুগলী নদী। নৌকো চড়ে যাবে?'

'নৌকো? কখনও দেখিনি।'

'ঐ যে,—ছোট ছোট জিনিসগুলো জলে ভাসছে। ছবিতে দেখোনি?'

'না তো!'

আনন্দ সত্যিই অবাক হলো। ছ'সাত বছরের ছেলে—অথচ নৌকো দেখেনি! গাড়িটাকে এক টহলদার পুলিশের হেপাজতে রেখে ও বাবাইকে আবার জিজ্ঞেস করলো—'ঐ যে বড় বড় গোল গোল জিনিস ভাসছে, ওগুলো কী বল তো?'

বাবাই তো অবাক—'ওগুলো? ওগুলো কী?'

'ওগুলোকে বলে বয়া। ওরা জলে ভেসে থাকে নৌকো বাঁধার জন্যে, কিংবা কেউ বিপদে পড়লে ওগুলোকে ধরে ভেসে থাকতে পারে।'

'আমাকে নিয়ে যাবে ওখানে?'

'যাব। আগে খেয়ে নাও। অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

রাস্তার ধারে ফেরিওয়ালার কাছে ঠোঙায় করে কী অসম্ভব মজার খাবার খেল ওরা দু'জনে। আরও খেতে ইচ্ছে করছে—আরও, আরও।

'আনন্দ!'

'আমায় আনন্দদা বলে ডেকো!'

'আনন্দদা, তোমার কাছে আমি থাকবো। প্লীজ্‌!'

আনন্দ হেসে ওঠে।

'সে হবে'খন। এখন চলো নৌকোয় চড়ে সূর্যাস্ত দেখা যাক। দেখো, দেখো—মেঘের ফাঁকে সূর্য কিরকম উঁকি দিয়ে তোমায় দেখছে।'

"য্যাঃ!'

'হ্যাঁ, সত্যি! সূর্য ভীষণ মাই ডিয়ার লোক। কতরকম খেলা যে জানে। আর ঐ যে গাছটা লম্বা উঠে গেছে—ঝুরু ঝুরু লম্বা লম্বা পাতা—ওটা কী গাছ জানো না তো? দেবদারু। আর এ-ও নিশ্চয় জানো না যে, সূর্যের সঙ্গে ওর কী ভীষণ ভাব। সূর্যের আলো না পেলে ও কান্নাকাটি জুড়ে দেয়—পাতা সবুজ থাকে না—'

মাঝি বলল, 'দাদা, বেশিদূর যাবার উপায় নেই। কাছাকাছি ঘুরিয়ে আনছি। বর্ষাকাল, বুঝছেন তো!'

আনন্দের গা ঘেঁষে বসেছে বাবাই। মুখটা ওরও আনন্দর মতো হাসিহাসি দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠছে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল ডাঙার দিকে।

'পাখিরা সব ঘরে ফিরছে—দেখো, দেখো! আর গাছেরা ডালপালা ছড়িয়ে আছে ওদের বাসা দেবে বলে। আর এই যে নদী—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, বাবাই?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বাবাই বলে উঠল—

'যদি ঘুমিয়ে পড়ি, সব কিছু নোট করে রেখো আনন্দদা!' বলে ঝপ্‌ করে যেমন সূর্য অস্ত গেলো, বাবাই-ও পড়ল ঘুমিয়ে।

আর গঙ্গার ঝিকিমিকি ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে আনন্দ মাঝিকে বলল—

'নৌকো ঘুরিয়ে নাও। খোকাবাবুকে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।'

'খোকাটি তোমার লয়?'

'না।'

কথাটা বলে এই প্রথম আনন্দর হাসি-মাখানো চোখে একটা গভীর মন-কেমনের ছায়া পড়লো।

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

(এক)

বাবু পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। সতর্ক তার দৃষ্টি। একটা অজানা আশঙ্কা ওকে আরো বেশি সাবধানী করে তুলেছে। খালি মনে হচ্ছে একটা কিছু ঘটবে। ভাল না মন্দ তা জানে না। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

সমুদ্রের হাওয়ার ঝাপটায় বাবুর চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। ঢেউ ভাঙার টানা শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নীল আকাশের বুক চিরে নেমে এসে ক'টা গাঙচিল সমুদ্রের জলের ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। জনমানুষের চিহ্ন নেই কোনোদিকে।

বাবু লাইট হাউসের কাছাকাছি প্রায় এসে গেছে। ও এখন অনেক বেশি সতর্ক। বাবু থমকে দাঁড়ায়। ওর মনে হয়, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে। ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই...

বাবু চারপাশে তাকায়। লাইট হাউসের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বার কয়েক দেখে। কিছুই চোখে পড়ে না। তবে কী কেউ এখানে নেই, কেউ ওর ওপর দৃষ্টি রাখছে না? ওর মন যে অন্য কথা বলছে। ওকে সতর্ক করে দিচ্ছে। কে যেন ওকে বারবার বলছে, আর এগিও না। এগোলেই বিপদ। ফিরে যাও, ফিরে যাও। কিন্তু ওর বল! একটা নয়, তিন-তিনটে। ওরা আসার সময় তিনটে বল এনেছিল। তিনটেই গায়েব। কোথায় গেল? হাওয়ায় তো উবে যায়নি! ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজছে। পায়নি।

মিউ রহস্য করে বলেছিল, এ কী রে বাবা! এ যে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মতো ব্যাপার দেখছি! বলগুলো সত্যি গেল কোথায়?

বাবু তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, দুপুরবেলায় একা এসে ও ব্যাপারটা দেখবে। আসলে ওরা গত পরশু এখানে এসে পৌঁছুবার পর ওর খালি মনে হচ্ছে,

বাতিঘর রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার একটা ভয়ানক রহস্যের জালে ওরা জড়িয়ে যাবে। কিন্তু এখন ও কী করবে—আরো এগোবে না বাড়ি ফিরে যাবে? ওর মনে হয়, এইভাবে অজানা, অচেনা জায়গায় একা আসা উচিত হয়নি।

হঠাৎ ওর চোখ পড়ল বাতিঘরের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের শিহরন খেলে গেল ওর গোটা শরীরে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সত্যি তাহলে বাতিঘরে ভূত আছে? কিন্তু ভূত? ও আবার বাতিঘরের ওপর দিকে তাকাল। না, এখন আর কিছু নেই। কিন্তু একটু আগেও ওখানে ছিল। কী বীভৎস মুখটা! মুখটার কথা মনে করে আতঙ্কে ও কেঁপে ওঠে। তবে কী বাতিঘর সম্বন্ধে ওরা যা শুনেছে তা সত্যি! এখানে আসার আগে থেকেই ওদের পইপই করে বারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে বাতিঘরের দিকে যেন কিছুতেই না যায়। এখানে আসার পরও শুনেছে। ওদের জন্যে যে রান্নাবান্না করে সেই মানুদির ছেলে ভানুও বলেছে, ওদিকে যেও না, বাতিঘরে ভূত আছে।

ধ্যাৎ ভূত আবার হয় নাকি? তোদের যত সব মিথ্যে কথা!

না, না, ওখানে সত্যি ভূত আছে। আমার মাকে জিজ্ঞেস কোর। মাও দেখেছে। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলায় আলো জ্বলে ওঠে!

বাতিঘরে তো আলো জ্বলবেই।

রাজার কথা শুনে অবাক হয়ে তাকায় ভানু। বলে, কেন জ্বলবে—এখন তো আর ওখানে কাজ হয় না!

তাই তো! মিউ ভানুকে সমর্থন করে।

মোমা বলে, কী দরকার বাবা ওদিকে যাবার!

তুই চুপ কর তো! সবতাতেই তোর ভয়!

তা বাতিঘরের ভূতকে কেউ দেখেছে?

বাবুর প্রশ্ন শুনে ভানু বলল, বললাম তো—অনেকেই দেখেছে।

কী দেখেছে?

সে নাকি ভীষণ ভয়ের ভূত। দেখলে রক্ত হিম হয়ে যায়।

রক্ত হিম হয়ে যায়...কার কাছে কথাটা শুনেছিস রে? রাজার কথা বলার ধরন দেখে ওরা হেসে ওঠে।

হেসো না, আমাদের গ্রামের কেউ যায় না ওখানে।

বাবু বুঝল, ভানু কিছু মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যি ঐ বীভৎস মুখের দিকে তাকালে রক্ত হিম হয়ে যায়! কিন্তু...। না, একা একা আর এগোন ঠিক হবে না। বাবু নিশ্চিত, এর পেছনে নির্ঘাৎ কোনো গভীর রহস্য আছে। সেই রহস্য আড়াল করার জন্যেই কী...

বাবু দাঁড়িয়ে ছিল। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ আর ঢেউ ভাঙার একটানা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। ও আবার বাতিঘরের ওপর দিকে তাকাল। না, কিছু নেই। পরিত্যক্ত বাতিঘরটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো মানুষের সাড়া নেই। প্রচণ্ড একটা কৌতূহল বাবুকে অস্থির করে তুলেছে। ওর ইচ্ছে করছে, বাতিঘরে ঢুকে ব্যাপারটা দেখতে। পর-মুহূর্তে ওর মনে হলো, একা একা এত বড় ঝুঁকি নেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। ভূত-প্রেত আছে কিনা ও জানে না। টাকীর বাড়িতে গিয়ে ওদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর ওসবে বিশ্বাস রাখা কঠিন।*

বাবু আর দেরি করল না। পিছিয়ে এসে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। ওর মনটা খচ্‌খচ্‌ করে। খালি মনে হয়, এর পেছনে কোনো গভীর রহস্য আছে। ওসব ভূত-টুত বাজে কথা। মানুষকে ভয় দেখানো, মানুষ যাতে এদিকে না আসে তার জন্যেই এই ভয় দেখানোর চেষ্টা। ওরা শুনেছে, বাতিঘরের আলোও নাকি হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠে। গ্রামের মানুষের ধারণা এ সবই ভৌতিক কাণ্ড। পরিত্যক্ত ঐ বাতিঘরে প্রেতাত্মাদের বাস। বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস, এ সবই মানুষকে দূরে রাখার কৌশল। কিন্তু কেন? কী রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ বাতিঘরকে ঘিরে?

দিন তিনেক বাবুরা এখানে এসেছে। স্কুলের ছুটি হলেই ওরা কোথাও না কোথাও যায়। এবার কথা ছিল বাবা-মাও আসবেন। কিন্তু বাবাদের যা হয়, শেষ মুহূর্তে কাজ পড়ে যায় আর আসা হয় না। তা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। এলেই তো এই কোর না, ঐ কোর না, এখানে যেও না, ওখানে যেও না—এই সব হতো। আসলে ওদের বাবা-মারা সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকেন—এই বুঝি তাঁদের ছেলে-মেয়েরা আবার কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। তাই আজকাল একা ছাড়তেও চান না। কিন্তু সব সময় তো আর উপায় থাকে না। এবারও ছিল না। তা এই জায়গাটা ভারী সুন্দর। একদিকে সমুদ্র। অন্যদিকে ছোট ছোট টিলার মতো পাহাড়। তবে জায়গাটার সব থেকে বড় আকর্ষণ ঐ বাতিঘর বা লাইট হাউসটা। ওটা অবশ্য এখন আর কাজ করে না। এক সময় সারা রাত আলো জ্বলতো। বহু দূর থেকে জাহাজগুলো সেই আলো দেখতে পেত। পথের হদিস পেত। এখন ঐ বাতিঘরটা পরিত্যক্ত।

জায়গাটা খুব ফাঁকা ফাঁকা। বাবু ভাবে এত সুন্দর জায়গায় একটা ট্যুরিস্ট স্পট হতে পারত। হয়নি কেন, কে জানে। গ্রামটা একটু দূরে। চাষের খেত। দু'একটা দোকান আছে কাছেপিঠে। সকালের দিকে বাজার বসে। সপ্তাহে দু'দিন হাট। এই অঞ্চলের মানুষ ঝেঁটিয়ে আসে সেখানে। বাড়িটা ছোট। কিন্তু ভারী সুন্দর। মোমার কোন আত্মীয়র। এবার ছুটিতে কোথায় যাওয়া হবে এই নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন মোমাই কথাটা বলে। বলে, মিউয়ের জ্বর হয়েছিল। এখনো দুর্বল। ডাক্তারবাবু যখন বলছেন কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় যেতে তখন চল আমরা লাইট হাউসে যাই।

লাইট হাউস! মানে?

বাবু আর মিউ অবাক হয়ে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, অদ্ভুত নাম। ওখানে একটা পরিত্যক্ত লাইট হাউস আছে। সামনে বিশাল সমুদ্র। তার ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে তীরে। পাহাড়ী অঞ্চল। কিন্তু পাহাড় বলতে যা বোঝায় তা নেই। টিলার মতো। বেশি দূরেও না।

তুই কখনো গিয়েছিস?

হ্যাঁ, একবার। তাও অনেকদিন আগে।

বাড়িটা কার?

বললাম না আমাদের এক আত্মীয়র?

আত্মীয়র বললে হবে না। কার বাড়ি জানতে হবে তো।

আমার ছোট মামীদের।

আমাদের থাকতে দেবে!

কেন দেবে না! যতদিন খুশি। যদি যেতে রাজী থাকিস তাহলে বল, মামীকে ফোন করি।

কর।

মোমা উঠে গিয়ে বোতাম টিপে টিপে নম্বরটা পুশ করল। ওদিক থেকে সাড়া পেয়ে বলল, ছোটমামী, আমি মোমা বলছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সকলে ভাল আছে।

......

যাবো, যাবো একদিন। আচ্ছা শোন, এবারের ছুটিতে আমরা তোমাদের লাইট হাউসের বাড়িতে যেতে চাই।

......

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা ক'জন। মিউ-এর ভাইরাল ফিবার হয়েছিল। খুব দুর্বল। ওর জ্যেঠু চেঞ্জে যেতে বলেছেন।

.....

হ্যাঁ, ঠিক আছে। তুমি খবর দিয়ে দাও। আমরা কবে যাব তোমায় জানিয়ে দেব।

শেষ পর্যন্ত ওরা লাইট হাউসেই এসেছে। কী সুন্দর যে জায়গাটা! ওদের সব থেকে পছন্দ হয়েছে বাতিঘরটা। বাতিঘরের চারপাশে ছোট-বড় পাথর। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে সেই পাথরের ওপর। নীল জলে সাদাটে ফ্যানা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ আর বাতাসের ঝাপটার গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা যায় অনেক দূর থেকে। ওদের বাড়ির বারান্দায় বসে ওরা তাই দেখে। বাতিঘরটা সামনেই। এই বাড়ি আর বাতিঘরের সামনে একটা ফাঁকা মাঠ।

ঐ মাঠে বল খেলতে গিয়েই ঝামেলা। বলগুলো যে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে! একটা-দুটো নয়, তিন-তিনটে বল হারিয়ে গেল। কোথায় গেল? ওরা ভীষণ অবাক হয়ে যায়। আজ দুপুরে বাবু গিয়েছিল

* 'পাতালঘর রহস্য' দ্রষ্টব্য।

সেই বলগুলোর সন্ধানে। বল খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, ওর যা অভিজ্ঞতা হলো তা তো রীতিমতো রহস্যজনক। বাবু বুঝতে পারছে না—কথাটা সকলকে বলবে কিনা!

বাবু যখন বাড়ি এল তখনো ওরা ঘুমোচ্ছে। শুধু মিউ বারান্দায় একটা চেয়ার এনে বসেছিল। এখানে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেই সময় কেটে যায়। বাবুকে দেখে মিউ জিজ্ঞেস করল, বাবু-দাদা, কোথায় গিয়েছিলে?

বলগুলো খুঁজতে!

পেলে?

না! বাবুর মুখে একটা ইতস্তত ভাব। মিউ পরিষ্কার বুঝতে পারল বাবু একটা কিছু চেপে যেতে চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বাবুদাদা?

চারপাশটা একবার দেখে নিল বাবু। ধারেকাছে কেউ নেই। তবু চাপা গলায় বলল, হাইলি সাসপিসাস!

মানে? মিউ নড়েচড়ে বসে।

বাতিঘরটা ঘিরে একটা গভীর রহস্য আছে জানিস!

সেকী!

বাতিঘরের ওপরে একটু আগে আমি একটা বীভৎস মুখ দেখেছি।

ভূত!

কী জানি!

মানুদিদি কাল বলছিল না, ঐ বাতিঘরটা ভাল জায়গা নয়। ভূত আছে। প্রেতাত্মারা ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

প্রেতাত্মা না মুণ্ডু!

মিউ হাসল। বলল, আমরা যেখানে যাব সেখানেই কী আমাদের পিছু পিছু একটা না একটা কিছু রহস্য-টহস্য তাড়া করবে!

বাবু চিন্তিত মুখে বলল, ব্যাপারটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আমি গিয়েছিলাম বল খুঁজতে। কিন্তু যেতে পারলাম না বেশি দূর। ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো আমায়। কেন বল তো!

বুয়া এসে দাঁড়াল। বলল, মানুদিদি জিজ্ঞেস করছে বিকেলে তোমরা কী খাবে...

আমি বাবা ওভালটিন খাব না! মিউ মাথা নাড়ল।

মা কিন্তু তোমায় রোজ অন্তত দু'বার ওভালটিন খেতে বলেছেন।

তুই চুপ কর তো! মা কী এখানে দেখতে আসছেন!

বাবু বলল, তুই মানুদিদিকে বল, আমরা বিকেলে চায়ের সঙ্গে পকোড়া খাবো।

কিসের?

যা খুশি!

রাজা আর মোমা এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। রাজা বলল, বাবু, চল সমুদ্রের ধারে যাই। বলগুলো পাওয়া যায় কিনা একবার খুঁজলে হতো না?

পাওয়া যাবে না! বাবু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল!

মানে? তুই কী খুঁজে এসেছিস?

হ্যাঁ।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তিনটে বলই হারিয়ে গেল। কিন্তু গেল কোথায়? আশ্চর্য!

মানুদিদি এত তাড়াতাড়ি পকোড়া ভেজে আনল কী করে কে জানে। একটা সাইড টেবিল এনে প্লেটটা তার ওপর রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, কিসের আশ্চর্য?

তোমায় বলিনি—আমাদের তিনটে বলই হারিয়ে গেছে।

কি করে?

তা কী করে জানবো! ঐ মাঠে খেলছিলাম। বাতিঘরের দিকে বাবু শট মারল। বলটা বেশ খানিকটা দূরে পড়ে গড়াতে গড়াতে কোথায় যে হারিয়ে গেল!

তোমরা বাতিঘরের দিকে যেও না কিন্তু!

কেন?

ওরে বাবা, ওখান যে 'তেনারা' আছেন!

তেনারা আবার কে? বাবু সোজা হয়ে বসে।

তেনারা বুঝলে না? ভূত—ভূত!

এখানেও ভূত! মোমার মুখ শুকিয়ে গেল।

তুই চুপ কর তো! ভূত বলে কিছু আছে নাকি!

হায় মা! কী বলছ মিউদিদি! ভূত নেই! ঐ বাতিঘরের ভূতকে কত লোকে দেখেছে! মাঝে মাঝে আলো জ্বলে ওঠে। সে আলো আমিও দেখেছি। আলো জ্বললেই গাঁয়ের লোক বাড়ির মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। ভয়ে কাঁপে। তখন অদ্ভুত সব শব্দ-টব্দ হয়। গায়ের রক্ত হিম করা চিৎকার শোনা যায়। ঐ সময় কেউ যদি বাড়ির বাইরে যায় তাহলে সে আর বেঁচে ফেরে না। প্রেতাত্মার কবলে পড়ে প্রাণ হারায়।

কী সব আবোল-তাবোল কথা বলছো! বাবু কড়া গলায় বলে।

আবোল-তাবোল নয়—এসব সত্যি!

বাবু আর মিউ চোখে চোখে কথা বলে। আর মোমা অস্ফুটে বলে, সব সত্যি? মানুদিদি, তুমি দেখেছো?

না, আমি দেখিনি। আমার দাদা দেখেছে।

কী দেখেছে?

সে আমি বলতে পারবো না। ভয়ে গায় কাঁটা দিচ্ছে। আমায় সন্ধ্যের পর একা অতোটা পথ যেতে হবে!

ভয় নেই। সেরকম হলে আমরা তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো। রাজা বলল।

কাল সকালে তোমার দাদাকে নিয়ে আসবে? ওর মুখ থেকেই ভূতের গল্প শুনবো।

গল্প নয় দাদাবাবু, গল্প নয়—সব সত্যি!

সব সত্যি! মোমার গলা কাঁদো কাঁদো। পকোড়াটা হাতে নিয়েই বসে আছে। খেতে ভুলে গেছে।

মিউ তাড়া দেয়, খা না! তোর ভয়ের কী হয়েছে! আমরা আছি না নেই!

সেইটা তো আরো ভয়ের!

মানে?

তোমরা তো ভূত দেখতে বেরোবে!

মোমার কথা শেষ হলো না। বাবু, রাজা আর মিউ হেসে উঠল।

(দুই)

পরদিন সকালে মানুদি তার দাদাকে নিয়ে যখন এল তখন ওরা সূর্যোদয় দেখে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রে সূর্যোদয় সে যে কী সুন্দর! ওরা অবাক

হয়ে দেখল লাল রংয়ের একটা বিশাল থালা সমুদ্রের তলা থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। তার রংয়ের ছটা সমুদ্রের জলে তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে ওদের কাছে এগিয়ে এসে ঢেউয়ের মাথায় বসে যেন দোল খাচ্ছে। সূর্য যত ওপরে ওঠে, তার রং ততই বদলায়। তারপর একসময় যেন লাফ দিয়ে সেই লাল থালাটা আকাশে উঠে পড়ল। লাল রং আর নেই। রং বদলে সোনালী-কমলা হয়ে গেছে। এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে তাকিয়ে থাকা যাচ্ছিল। এখন চোখে ধাঁধা লাগে। ওরা চোখ নামিয়ে নেয়। ওদের সারা গা তখন দিনের প্রথম সূর্যের আভায় মাখামাখি। সূর্য আরো একটু উঠে পড়লে সমুদ্র ফিরে পেল তার সাবেক নীল রং। ও তো আর সমুদ্রর রং নয়। আকাশের নীলে নীল সমুদ্র।

সূর্যোদয়ের পর ওরা আপনমনে হাঁটছিল। এই জায়গায় জেলেরা আসে না। তাই আঁশটে গন্ধ নেই। লোকজন তো এখানে এমনিই কম। ট্যুরিস্টরাও আসে না যে সমুদ্রের ধারে ভিড় হবে। গ্রামের লোক রুজি-রোজগারে ব্যস্ত। ওদের সূর্যোদয় দেখার শখ নেই। বললে বলবে, ও সব দেখে দেখে নাকি ওদের চোখ পচে গেছে। তাই কখনো হয়!

ঘুরতে ঘুরতেই ওদের চোখে পড়ল মানুদি একটা লোককে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। ওই তাহলে মানুদির দাদা। ওকেই সঙ্গে করে আনতে বলেছিল কাল রাত্তিরে। লোকটা নাকি বাতিঘরে ভূত দেখেছে। আলো জ্বলতে দেখেছে। ওর ভূত দেখার খবর সারা গ্রামের মানুষ জানে। আগে তবু গ্রামের লোক এদিকে দু' চারজন আসত। কিন্তু ও ভূত দেখার পর পারতপক্ষে এদিকটায় কেউ ভুলেও আসে না। আসলে গ্রামের মানুষ ভূত-টুতে একটু বেশিই বিশ্বাস করে।

ওরা আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। মানুদির দাদা বারান্দায় বসে ছিল। ওদের দেখে উঠে দাঁড়াল। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। কালো রং। দেখলেই বোঝা যায়, পরিশ্রম করার প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে লোকটার। ওরা রোজ সকালে বেড়িয়ে এসে বারান্দায় বসে গল্প-টল্প করে। এখানে বসলে অবশ্য সমুদ্রর দিকে তাকিয়েই সময় কেটে যায়। মানুদি কাজে এসে তাই বারান্দা ঝাঁট দিয়ে, মুছে বেতের চেয়ারগুলো এনে সাজিয়ে রাখে। ওরা এক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। কিকি কোথায় ছিল, উড়ে এসে বসল মিউয়ের কাঁধে।

কিকিকে দেখে মানুদির দাদার চোখ গোল গোল হয়ে গেল। যদিও সে আগেই কিকির কথা শুনেছে। কিন্তু কাকাতুয়া আগে কখনো দেখেনি। তাই বড় বড় চোখ করে কিকির দিকে তাকিয়েছিল। তারপর কিকি যখন গলা ফুলিয়ে বলল, 'মিউ পড়তে বসো। বেলা হয়ে গেছে।' তখন আর তার কৌতূহল বাধা মানল না। বলে উঠল, এ মানুষের মতো কথাও বলে!

বলেই তো!

এটা কী পাখি বাবু? আগে তো দেখিনি!

কাকাতুয়া!

কাকাতুয়া! এ পাখির কথা শুনেছি মনে হচ্ছে। এ সব কথা বলে?

হ্যাঁ!

কিকি নতুন লোকটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, অত বকবক করছো কেন?

অ্যাঁঃ আমায় বলছে?

হ্যাঁ।

মানুদির দাদার মুখটা হাসিতে ভরে উঠছে। খুশিতে মাথাটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে সে।

বাবু জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

আজ্ঞে রামু। কথার উত্তর দিল বটে, কিন্তু ওর চোখ কিকির ওপর থেকে সরছে না।

বাবু বলল, রামু, তুমি নাকি ঐ বাতিঘরে ভূত দেখেছো?

কথাটা কানে যেতেই রামুর মুখের চেহারা বদলে গেল। একটা ভয় ভয় ভাব ফুটে ওঠে ওর মুখে। একটু ইতস্তত করে বলে, দেখেছি বাবু, সে বড় ভয়ানক, বড় বীভৎস মুখ। এখনো মনে করলে গায় কাঁটা দেয়।

কবে দেখেছো?

গত বছর।

বাতিঘরের বদনাম কবে থেকে?

খুব বেশি দিন নয়। আমরা তো আগে বাতিঘরের ওপরে উঠতাম। এই মাঠে বাচ্চারা খেলত।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?

হবে না! ওঃ কী সাংঘাতিক কাণ্ড...রামু চুপ করে গেল।

চুপ করে গেলে কেন, বলো।

বলতেই যে ভয় করছে। রামু ভয়ে ভয়ে বাতিঘরের দিকে তাকাল। ওদের বাড়ি থেকে বাতিঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়!

আমি কোনোদিন বাতিঘরে আলো জ্বলতে দেখিনি। আমার জন্মের অনেক আগে থেকেই বাতিঘরের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে ক'মাইল দূরে নতুন বাতিঘর তৈরি হয়েছে। রাত্তির বেলায় তার আলো অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

রামু চুপ করে। মানুদি এসে সকলকে চা আর বিস্কুট দিয়ে যায়। ওর দাদাকেও দেয়।

মাকে বলে দেবো—তোমরা চা খাচ্ছো।

তুই চুপ করবি! কিকিকে ধমক দেয় মিউ।

রামু আবার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কিকির দিকে। রাজা তাড়া দেয়। বলে, কী হলো, চুপ করে গেলে কেন? বলো কবে থেকে বাতিঘরে ভূতের উৎপাত শুরু হয়।

বছর পাঁচ-সাত আগে হঠাৎ একদিন শুনলাম, আগের দিন রাত্তিরে বাতিঘরে নাকি আলো জ্বলেছিল। তারপর শোনা গেল বাতিঘরে ভূত আছে। গ্রামের কেউ কেউ নাকি দেখেছে। গ্রামের লোক এই সব কথা বলাবলি করছিল। এই মাঠে বাচ্চারা যেমন খেলত তেমনি খেলছিল। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, যে রবারের বল নিয়ে বাচ্চারা খেলতো, সেগুলো হারিয়ে যেতে লাগল।

খেলার মাঝেই হারিয়ে যেতে লাগল?

হ্যাঁ! বাতিঘরের দিকে মাঠ পেরিয়ে একটু এগোলেই বলটা হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক খুঁজেও পাওয়া যেত না। তারই মাঝে বাচ্চারা একদিন একটা ভয়ের কিছু

দেখে খেলা ছেড়ে পালিয়ে এল। বাচ্চাগুলো এত ভয় পেয়েছিল যে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারেনি।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রামু সেটা নামিয়ে রাখল। বাবু জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি বাতিঘরের ভূত দেখেছো?

হ্যাঁ, দেখেছি' রামু ভয়ে ভয়ে বাতিঘরের দিকে তাকায়। বলে, ওঃ কী ভয়ানক দৃশ্য! মনে করলে এখনো বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

কি দেখেছিলে বলো না! মিউ তাড়া দেয়। মোমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। ওর খাওয়ার মুড নেই। মুখ ভয়ে, আতঙ্কে ফ্যাকাসে।

রামু বলে, সেদিন বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে এসেছিলাম। সঙ্গে বাঘা ছিল।

বাঘা কে?

কুকুর। দিশি কুকুর। কিন্তু খুব সাহসী। আমার খুব ন্যাওটা ছিল। সব সময় পেছনে পেছনে ঘুরতো। আমি এসেছিলাম, জাল ফেলতে। এদিকটা জলের তলায় এত বড় বড় পাথর যে কেউ মাছ ধরতে আসে না। আমরা জানি কোথায় পাথর নেই। সেখানে জাল ফেললে সহজেই সুরমাই (ম্যাকারেল), পমফ্রেট, চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। বিস্তর কাঁকড়াও মেলে।

রামু একটু চুপ করে আবার শুরু করে, আমি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি বাঘা বাতিঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এখানে ঝোপঝাড়ে খরগোশের আস্তানা। ভাবলাম, বাঘা নির্ঘাৎ খরগোশ দেখেছে। ওকে ডাকলাম। শুনল না। আমি কিছু না ভেবে জলে নামতে গেছি হঠাৎ বাঘার আর্তনাদ কানে এল। চারদিকে তাকিয়ে বাঘাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি ঐভাবে ছুটে এসে বাঘা যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম আর বাঘা বাঘা বলে ডাকতে লাগলাম...

হঠাৎ একটা অট্টহাসির মতো আওয়াজ এল বাতিঘরের দিক থেকে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে বাতিঘরের দিকে তাকাতেই...

চুপ করলে কেন? বলো, বলো কী দেখলে...বাবু তাড়া দেয়।

এখন ওদের কথা শোনা যায়।

সে এক ভয়ানক দৃশ্য বাবু। সে যে কী বীভৎস বলতে পারবো না। সে কথা মনে করলে আজো ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

তুমি কি করলে? রাজা জিজ্ঞেস করে।

আর কী কেউ ওখানে দাঁড়ায় বাবু! আমি ছুটে পালালাম।

আর বাঘা? মিউয়ের উদগ্রীব প্রশ্ন।

না, বাঘাকে আর পাওয়া যায়নি। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল! আমার বিশ্বাস, বাঘাকে ঐ ভূতটা খেয়ে নিয়েছে।

সে কী!

আমাদের মানে—গ্রামের মানুষের তাই বিশ্বাস। তা না হলে একটা জলজ্যান্ত কুকুর হঠাৎ হাওয়া হয়ে যাবে!

ভূতে কুকুর খায়? মোমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

কেন খাবে না! তেনারা সব কিছু খেতে পারেন। যাকে খুশি ধরতে পারেন।

আমাদেরও ধরতে পারে?

পারেই তো! আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন। বাতিঘরের কাছে আছেন। রাত্তিরে একদম বেরুবেন না।

রাত্তিরে না বেরুলে, বাতিঘরের আলো জ্বলছে কি না দেখবো কী করে, কখনো ভূত দেখিনি। যদি এই সুযোগে দেখা হয়ে যায়!

অ্যাঁঃ! বাবুর কথা শুনে রামু ভিরমি খায় আর কী!

মোমা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, বাবুদাদা, চলো আমরা ফিরে যাই।

তুই চুপ কর তো! এক নম্বরের ভীতুর ডিম! মিউ তাড়া দিয়ে মোমাকে চুপ করিয়ে দেয়।

বাবু বলে, আমরা ভাবছি একদিন বাতিঘরের ওপরে উঠব। রামুভাই, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

আঁতকে উঠে রামু বলে, কী যে বলেন বাবুরা! ওখানে কী কেউ যায়! যাবেন না, যাবেন না। সত্যিই ওখানে ভূত আছে। আমি দেখেছি।

রামু উঠে পড়ল। ও এখন পালাতে

চায়। বাবাঃ, এইটুকু সব ছেলে-মেয়ে—কী সাহস! বলে কিনা বাতিঘরে যাবে। ওখানে গেলে কেউ কী আর বেঁচে ফিরে আসবে! বাঘার কথা শুনেও...

রামু ওদের নমস্কার করে বারান্দা থেকে নেমে গ্রামের দিকে চলে গেল। রামুর চলে যাওয়া দেখে বাবু হেসে ওঠে। রাজা বলে, আমরা বাতিঘরে যাব শুনে রামু খুব ভয় পেয়েছে।

দেখলি না ও একরকম পালিয়ে গেল!

তোর কি মনে হয়। সত্যিই কি বাতিঘরে ভূত আছে?

ভূত কিনা জানি না, একটা কিছু আছে।

তুই কি করে জানলি?

আমি যে দেখেছি!

কী বললি...কী বললে, ওরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

ওদের অবস্থা দেখে বাবুর হাসি পাচ্ছিল। হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বলল, কাল বিকেলে আমি একটু বেরিয়েছিলাম, মনে আছে তো?

হ্যাঁ!

আসলে তিন-তিনটে বল কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, আমি দেখতে গিয়েছিলাম। আমি বাতিঘরের দিকে সতর্ক হয়ে এগোচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমার ওপর নজর রাখছে। বাতিঘরের কাছাকাছি গিয়ে কী মনে হওয়ায় ওপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম, একটা বীভৎস মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বীভৎস!

হ্যাঁ, বড় ভয়ানক মুখ। কোনো জীবন্ত প্রাণীর মুখ ওরকম হতে পারে না।

ওরা চুপ। কেউ কথাই বলছে না। রামুর কথায় ওরা তেমন পাত্তা দেয়নি। উল্টে হেসেছিল। কিন্তু এখন! মোমার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। ভয়ে, আতঙ্কে ও কথা বলতে পারছে না। কোনোরকমে ভাঙা গলায় বলল, বাবুদাদা, চলো আমরা এখান থেকে আজই চলে যাই। বাতিঘরের ভূত আমাদের মেরে ফেলবে।

তুই চুপ কর তো! মোমাকে মিউ থামিয়ে দিয়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, ওটা যে ভূত তা তুমি কী করে বুঝলে...

ভূত তো বলিনি!

তাহলে?

আমি বলছি কোনো জীবন্ত প্রাণীর মুখ ঐরকম ভয়ানক হতে পারে না।

ভূত যদি না হয় তাহলে ওটা কী! বাতিঘরে মাঝে মাঝে আলোই বা জ্বলে কেন?

তাই তো! বাতিঘরটা অন্তত পঁচিশ-তিরিশ বছরের পরিত্যক্ত।

গভীর রহস্য, বুঝলি! গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ বাতিঘরে।

তোমরা কী এখন সেই রহস্যের জাল খুলতে চাও বাবুদাদা? মোমা কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করে।

আরে না, না। মিউটার শরীর ভাল নেই। আমরা চেঞ্জে এসেছি। কিছুদিন পরে চলে যাব। কী দরকার আমাদের ঐ সব ঝামেলায় জড়ানোর!

তাহলে চলো না আমরা ফিরে যাই।

বাবু, মিউ আর রাজার চোখে চোখে ইশারা হয়। বাবু হাসি হাসি মুখ করে বলে, দু' চারদিন পরেই আমরা ফিরে যাব। এই তো সবে এলাম! কী দারুণ জায়গা বল। আর তো আসবো না। দু' চারদিন থেকে ভাল করে দেখে যাই।

লাইট হাউসের দিকে যাবে না তো?

না, না। বললাম না, ও সব ঝামেলায় আমরা এবার আর জড়িয়ে পড়বো না।

ঠিক তো?

হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ!

মোমাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত দেখাল।

(তিন)

রাত তখন কত কে জানে, একটা চাপা কান্নার শব্দে মিউয়ের ঘুম ভেঙে গেল। ওর পাশে মোমা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিকি ওয়ারড্রোবের ওপর বসে। মিউ আস্তে আস্তে উঠে বসল। শব্দটা বাতিঘরের দিক থেকে আসছে। রামু আজ সকালে বলেছিল, বাতিঘরে আলো যখন জ্বলে তখন একটা চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়। ঐ শব্দ শুনতে পেলে গ্রামের মানুষ ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে বসে ভয়ে কাঁপে। তার মানে এখন বাতিঘরে আলো জ্বলছে। চাদরটা ভাল করে গায় জড়িয়ে মিউ উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ও দেখল, বাবুদাদা আগেই এসে গেছে।

ওকে দেখে বাবু এগিয়ে এসে বলল, কথা বলিসনে। শুধু দেখে যা!

ওরা বাতিঘরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বাবু চাপা গলায় বলল, লক্ষ্য কর বাতিটা ঘুরছে না। লাইট হাউসের বাতি নয় ওটা। আমার মনে হচ্ছে, আলো জ্বেলে সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছে।

ভূত-টুত কিছু দেখা গেল না। তার বদলে আবছা আলোয় ওরা দেখল, ক'টা লোক ঘোরাঘুরি করছে।

বাবু বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস?

হুঁ! মনে হচ্ছে কিছু পাচার করা হচ্ছে।

আমারও তাই মনে হয়।

কিন্তু কী...

সেইটাই তো রহস্য। তবে আপত্তিকর কিছু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের বলগুলো, রামুর বাঘার হারিয়ে যাবার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?

নিশ্চয়ই আছে।

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। বাবুর মনে হলো, ওদের বাড়ির দিকে কেউ আসছে। বাবু বলল, মিউ, চট করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। মিউকে ঘরে ঠেলে দিয়ে বাবু নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল। ও শুয়ে পড়ল।

বাবু-মিউ কান পেতে রইল। যা ভেবেছে ঠিক তাই। ওদের বাড়ির চারপাশে দুটো লোকের পায়ের শব্দ ওরা পেল। ও বুঝতে পারল ওদের ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে ওরা। কিন্তু ওরা কারা?

সকালে উঠে ওরা বেড়াতে বেরুল।

সমুদ্রের ধার দিয়ে না হেঁটে ওরা ওদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। এসে পর্যন্ত ওরা ওদিকটায় যায়নি। ডান দিকে তাকালে চোখে পড়বে সমুদ্র। বাতিঘরটা পেরিয়ে ওরা গল্প করতে করতে হাঁটতে লাগল।

সমুদ্রর একটানা শব্দ এ ক'দিনে ওদের কানে সয়ে গেছে। হু-হু করে হাওয়া বইছে। এদিকটার মাটি এত পাথুরে যে চাষ হয় না। একটু দূরে মানুষের ঘর-বাড়ি। এইদিকটা একদম ফাঁকা। বাচ্চারা পর্যন্ত খেলতে আসে না। ভূতের ভয়ে এখানকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যায়।

বাবু নিজের মনে ভাবে, কাল বিকেলে ও যা দেখেছে তা কী সত্যিই ভূত? ভূতই যদি হতো তাহলে ওখানে লোক থাকতো না। রাতদুপুরে ওদের ওপর নজর রাখতে কেউ এসে বাড়ির পাশে ঘুরতো না। কিন্তু ব্যাপারটা কী? কী হয় ওখানে? তবে যাই হোক না কেন, তা হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে, সাধারণ মানুষের চোখ এড়িয়ে। বাবু কৌতূহল চেপে রাখে।

দূরে একটা টিলা। একটু উঁচু। সেইদিকে তাকিয়ে বাবু বলে, ঐ টিলাটায় একদিন উঠতে হবে।

সকলে সেদিকে তাকায়। মিউ বলে, বেশি উঁচু নয়। ওঠা যাবে।

তুই উঠতে পারবি? রাজার প্রশ্ন।

কেন পারবো না, দেখছ না ক'দিনেই গায় কিরকম জোর পেয়েছি। জায়গাটা বেশ ভাল তাই না?

মোটেই না! ভূত আছে শুনছো না!

চুপ কর তো!- এখানে তুইই তো আমাদের নিয়ে এসেছিস!

তখন কী করে জানবো, এখানে ঐ সব ভূত-টুত আছে। আমি বলি কী বাবুদাদা, চলো আমরা ফিরে যাই।

রাজা হেসে ওঠে, সত্যি তোর মতো ভীতু আর একজনও নেই বোধহয়!

হঠাৎ বাবু দাঁড়িয়ে পড়ল। ডান দিকে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একটা ভাঙা বাড়ি। দোতলায় দু' তিনটে ঘর দাঁড়িয়ে আছে। আর সব ভেঙে পড়েছে। বাড়িটা খুবই বড়। চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল। বাড়ির মধ্যে থেকে বড় বড় ক'টা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাবুর দেখাদেখি ওরাও তাকিয়ে ছিল বাড়িটার দিকে। ওদের মধ্যে বাবু আর মিউয়ের কৌতূহলই সব থেকে বেশি। দুজনকেই বাড়িটা টানে। মিউ বলল, বাবুদাদা, বাড়িটায় ঢুকলে হয় না? পুরনো দিনের বাড়ি দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

চল যাই। বাবু পা বাড়ায়।

কী দরকার ও সব ভাঙা বাড়ি-টাড়িতে যাবার! ওখানেও তো ভূত-টুত থাকতে পারে। মোমা বাধা দেবার চেষ্টা করে।

মোমার কথায় পাত্তা না দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। বাধ্য হয়েই মোমা ওদের সঙ্গ নেয়। বাবু বলে, ভূতরা সকাল বেলায় ঘুমোয়। বুঝলি! এখন ভয় পাবার কিছু নেই।

মোমা ওদের সঙ্গে ভাঙা বাড়িটার দিকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে।

বাড়িটা একেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। বাড়িটা যখন তৈরি হয় সমুদ্র তখন নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা দূরে ছিল। এখন এগিয়ে এসে বাড়িটার ঘাড়ের ওপর পড়েছে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রাস করবে বলে মনে হয়। ঢেউগুলো বাড়ির প্রায় গায়ের ওপর আছড়ে পড়ছিল। ওরা তাকিয়ে ছিল সমুদ্রর দিকে। দূরে আকাশটা যেন সমুদ্রে ডুব দিয়েছে। সেখানে সমুদ্রকে কীরকম যেন শান্ত মনে হয়। সমুদ্র যত তীরের দিকে এগিয়ে এসেছে ততই তার রূপ বদলে গেছে। বড় বড় ঢেউগুলো সাদা ফেনার মুকুট পরে ওদের প্রায় পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে। কী তার তেজ, কী গর্জন! সব কিছু যেন ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে চায়।

ওরা এপাশে ঘুরে বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। এমনভাবে সব ইঁট-টিট পড়ে আছে যে ওখান দিয়ে ঢোকা মুশকিল। সমুদ্রর দিক দিয়ে ঘুরে যেতে ভরসা হয় না। বড় বড় পাথরে জায়গাটা ভরা। বাবু বোঝে ঐ পাথরগুলোর জন্যেই বাড়িটা এখনো টিকে আছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরের ওপর। জল পড়ে পড়ে সেগুলো যে পেছল হয়ে আছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে না। চেষ্টা করলে সমুদ্রে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। বাবু বলল, এদিক দিয়ে বাড়িটায় ঢোকা যাবে না। চল, আমরা ওপাশ দিয়ে ঘুরে যাই।

তাই চলো। তবে এদিকটা ভাল করে দেখে রাখো। বলা তো যায় না। এদিক দিয়ে আসতে হতেও পারে।

কেন, কেন, এদিক দিয়ে আসতে হবে কেন? তোমরা যে কেন বাড়িটার মধ্যে ঢুকছো কে জানে!

মোমার কথা শেষ হলো না, মিউ বলে উঠল, ভয় করলে তুই বরং বাড়ি ফিরে যা!

মোমা কথা বাড়াল না। ও ভাল করেই জানে, এদের কিছু বলে লাভ নেই। ওরা যা ঠিক করেছে তা করবেই। ওদের ফেলে একা যে বাড়ি যাবে তারও উপায় নেই।

ওরা এপাশ দিয়ে ঘুরে দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। পশ্চিম দিকে একটা জায়গায় বাড়িটা প্রায় ধসে পড়েছে। বাবু বলল, একটু চেষ্টা করলে এখান দিয়ে মনে হচ্ছে ঢোকা যাবে।

রাজা এগিয়ে গিয়েছিল। ওকে ডাকল বাবু।

মিউ কাঁধ থেকে কিকিকে নামিয়ে ওকে বলল, উড়ে গিয়ে বাড়ির মধ্যে একটা গাছে বসতে। কিকি উড়ে গেল। ওর সাদা পালক আর মাথার ঝুঁটি সকালের রোদে চকচক করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে কিকিকে আর দেখা গেল না। সে বাড়ির মধ্যে গিয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে একটা গাছে বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করবে। ভাঙা ইঁট-কাঠ পেরিয়ে ওরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। প্রথমে বাবু, তারপর মিউ, মোমা, সব শেষে রাজা। বুয়া আসেনি। ও বাড়িতে আছে। মানুদির সঙ্গে টুকটাক কাজ করছে।

একটু পরেই ওরা দুটো ঘরের মধ্যের একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে এল। নির্জন, নিস্তব্ধ পরিবেশ। সমুদ্রর গর্জন আর হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে যায় না। বাবু বলল, চল ঐ গাছটার আড়ালে দাঁড়াই। এই সব পোড়োবাড়ি দুষ্টু লোকদের আখড়া হয়ে দাঁড়ায়। হেন খারাপ কাজ নেই যা ওরা এই সব নির্জন জায়গায় করে না। খুন পর্যন্ত করে।

খু..উ...ন...মোমা ককিয়ে উঠল।

মোমা, প্লিজ চুপ কর। ন্যাকামি করিস নে! কোথায় কে আছে, তোর কথা শুনতে পাবে। শেষকালে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাবে।

মিউয়ের কথা শুনে মোমা চুপ করে

যায়। বাবু গাছের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওপরে-নিচে সব জায়গার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ কিকি এসে মিউয়ের কাঁধে বসে ফিস ফিস করে কিছু বলল।

মিউ বাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, বাবুদাদা, বাড়িতে এখন কেউ নেই। কিন্তু ওপাশে মানে উত্তর দিকে কিকি মানুষের গন্ধ পেয়েছে।

তাহলে চল, আমরা চারদিকটা ঘুরে দেখি।

ওরা এগিয়ে গিয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠল। টানা-লম্বা বারান্দা। বেশ খানিকটা গিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে। পর পর ঘর। বেশির ভাগই ভাঙা। দরজা-জানলা নেই। ওরা উঁকি মেরে ঘরের মধ্যেটা দেখছিল। কিছু নেই, ধুলো-বালি, ঝুলে ভরা। দু' একটা ঘর থেকে ওদের দেখে চামচিকের দল চিঁচিঁ করতে করতে ঘুরতে লাগল।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে এসে ডান দিকে ঘুরেই ওরা থমকে দাঁড়াল। এদিকটা যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরগুলোর দরজা দেওয়া। দরজা ঠেলে ওরা উঁকি দিল। প্রথম ঘরটায় তেমন কিছু চোখে পড়ল না। দ্বিতীয় ঘরে ওরা রান্নার জিনিসপত্তর দেখতে পেল। তোলা উনুন, কড়া, হাঁড়ি, থালা-টালা সাজান রয়েছে। পাশের ঘরটায় বিছানা দেখতে পেল। তার পরের ঘরটায় তালা দেওয়া।

একটু পিছিয়ে এসে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। রেলিং নেই। ভেঙে গেছে। সিঁড়িটা মোটামুটি ঠিক আছে। ওরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। বাইরে থেকে ওরা দেখেছে, দোতলায় দু' তিনটির বেশি ঘর দাঁড়িয়ে নেই। বাকিগুলো কবে ভেঙে গেছে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে স্তূপের মতো হয়ে আছে। মোমা বলল, কাছে যেও না, সাপ-টাপ থাকতে পারে।

তুই কিচ্ছু জানিস না। সাপ থাকলে নিচে থাকবে। ওপরে নয়।

দোতলায় দু' তিনটে ঘর ঠিক ছিল। খোলা। ওরা ঢুকে দেখতে লাগল। এত ময়লা ঢোকাই যায় না। তার ওপর ঝুলে ভরা। কত যুগ যে মানুষ এই সব ঘরে ঢোকেনি! জিনিসপত্তর কিছুই নেই। ঘরগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি। বন্ধ আঙটায় একটা মরচে পড়া ছোট তালা। বাবু একটানে পাল্লাটা খুলে ফেলেই অবাক। বেশ কয়েকটা বই রয়েছে। ইংরেজি। একটা ডায়েরি দেখে বাবু সেটা টেনে নিল। মিউ বইগুলোর নাম পড়ার চেষ্টা করছিল। কিকি ঘরে ঢোকেনি। ও জানে, এ সব সময় ওকে পাহারা দিতে হয়। হঠাৎ উড়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসল। গলা নামিয়ে বলল, নিচে লোক। সাবধান।

ওরা চমকে উঠে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। বাবু ওদের ওখানে অপেক্ষা করতে বলে ঘরের বাইরে এসে পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে যায়। এখান থেকে কিছু দেখা যায় না। অস্পষ্টভাবে মানুষের গলা শোনা যায়। একটু নিচে নেমে গেলে হয়তো দেখা যায়। বাবুর সাহস হয় না। ও বুঝতে পারে না এখন কী করা উচিত। অন্য সময় হলে, কিছু ভাবতো না। কিন্তু গতকাল বিকেলের ঘটনাটা ওকে সতর্ক করে দিয়েছে। তার ওপর রাত্তিরে ওদের বাড়ির ওপর নজর রাখার পর বুঝেছে, বাতিঘরটা কেন্দ্র করে একটা কিছু এখানে চলছে। চেহারা দেখতে পেলে লোকগুলো কিরকম তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যেত। সে উপায় তো নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামলেই ওদের চোখে পড়ে যেতে হবে।

বাবু ঘরে ফিরে আসে। চাপা গলায় বলে, আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

বাবু, দ্যাখ ছাদের ঐ কোণে একটা বড় গাছ রয়েছে। ওর পেছনে দাঁড়ালে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

রাজার কথায় বাবু সায় দেয়। ওদের ঘরের মধ্যে থাকতে বলে দুজনে ছাদের ওপর গাছটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ওখানে স্পষ্ট না হলেও নিচের লোক দুটোকে দেখা যাচ্ছে। তোলা উনুনটা বাইরে এনে আঁচ দিয়েছে। ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে না উঠতেই হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাবু বলল, মুশকিল হলো রে রাজা, ওরা এখন রান্না করবে।

তাই তো দেখছি।

হঠাৎ ওরা দেখল, লোক দুটো গামছা নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। ওরা বুঝল, আঁচ ধরার মধ্যেই ওরা চান করে ফিরে আসবে। তারপর রান্না চড়াবে। এই ফাঁকে ওদের এখান থেকে পালাতে হবে। এ সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা চলবে না। রাজা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে মিউ আর মোমাকে ডেকে আনল। ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে পথে এসেছিল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর সোজা বাড়ি। বাড়ি ঢুকে মোমা বলল, আর বেরুচ্ছি না বাবা। জোর বেঁচে গেছি। আর একটু হলেই...।

আর একটু হলেই কী হতো রে? বাবু হেসে জিজ্ঞেস করল।

বাবুদাদা, তুমি হাসছো!

হাসবো না! এতদিন আমাদের সঙ্গে থেকেও তোর ভয় গেল না। কিকিকে দ্যাখ, কীরকম এক্সপার্ট হয়ে গেছে। নিচে লোক দেখে এসে আমাদের খবর দিয়ে কীরকম সাবধান করে দিল।

না বাবুদাদা, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। জায়গাটা খুব খারাপ।

কেন?

বাঃ বাতিঘরে ভূত আর ভাঙা বাড়িতে দুষ্টু লোক!

তার জন্যে জায়গাটা খারাপ হয়ে গেল! কী সুন্দর সমুদ্র, টাটকা পমফ্রেট আর ম্যাকারেল খাচ্ছিস রোজ। দ্যাখ, এই ক'দিনেই আমি কীরকম সুস্থ হয়ে উঠেছি...

মিউকে থামিয়ে দিয়ে মোমা বলল, সুস্থ হয়ে উঠেছিস তো! এবার তাহলে চল, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

মোমার কথায় ওরা একসঙ্গে হেসে উঠল। বাবু বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, খেল্ তো সবে শুরু।

সে কী, তোমরা আবার ঐ সব করবে নাকি?

ঐ সব মানে? রাজার বিস্ময়।

মানে আবার কী! ঐ ভূতের পেছনে ছোটা, দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়া...

সে তো আমরা পড়েই গেছি।

মানে?

বাবু, রাজা আর মিউ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। মোমা হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল। বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর জামার মধ্যে ডায়েরিটা রয়েছে। কোন ভাষায় লেখা ও জানে না। কিন্তু দেখার জন্যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। বাংলা বা ইংরেজিতে হলে ও এক্ষুণি পড়তে শুরু করবে।

ইংরেজিতে লেখা। বাড়িটা এক জমিদারের। ওঁদের অভ্র খনি আছে। নেহাতই ব্যক্তিগত ডায়েরি। কিন্তু ইংরেজ আমলের সেই সময়টার কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পড়তে খুব ভাল লাগে। হাতের লেখাটাও সুন্দর।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ওরা বিশ্রাম নেয়। কলকাতা থেকে আসার সময় কিছু বই আর ম্যাগাজিন এনেছিল বুদ্ধি করে। বাবু ডায়েরিটা নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল। মিউকে ইশারা করেছিল বাইরে আসার জন্যে। একটু পরেই মিউ এল। বাবু বলল, আমি ঐ ভাঙা বাড়িটায় যাচ্ছি। শুধু তোকে জানিয়ে গেলাম। না ফিরলে ব্যবস্থা নিস।

আমি সঙ্গে যাব?

না।

তাহলে কিকিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

না রে থাক। আমি শুধু ওদের একটু ওয়াচ করব আড়াল থেকে।

ওরা যদি দেখতে পায়!

পাবে না।

আমার মনে হয় ওদের চারদিকে লোক ছড়ানো আছে।

সেইটাই তো স্বাভাবিক।

সাবধানে যেও। আসতে খুব দেরি হবে না তো?

হতে পারে। তেমন হলে সন্ধ্যের পর ফিরবো। তুই এইদিকটা ম্যানেজ করবি। কেউ যেন জানতে না পারে আমি ঐ পোড়ো বাড়িটায় গেছি।

ঠিক আছে।

বাবু বেরিয়ে গেল। বাবু চোখের আড়ালে চলে যেতেই মিউ ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। ডায়েরিটা বাবু ওর কাছে দিয়ে গিয়েছিল। বড্ড পুরনো। পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। হাতের লেখাটা খুব সুন্দর। পড়তে অসুবিধে হয় না।

পোড়ো বাড়িতে যারা আছে তারা যে সুবিধের নয় তা বাবু সকালেই বুঝতে পেরেছে। বাতিঘরের ভূতের ফাঁদটা ওরা পেতেছে কিনা সেইটাই বুঝতে পারছে না। খুব সতর্ক হয়ে বাবু বাড়িটায় ঢুকলো। এ পাশটা আগাছার জঙ্গল বলে ওর সুবিধে হলো। দিব্যি একটা ঝোপের আড়ালে বসে ওদিকটায় তাকাতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় বাবু। সাত-আটজন লোক। প্রত্যেকের হাতেই এ কে ৪৭ রাইফেল। এ কে ৪৭ ওরা ভালভাবেই চেনে। সেবার টাকীতে* দেখেছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। বাবু শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের জন্যে কিছু শোনা যায় না। হামাগুড়ি দিয়ে বাবু আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। লোকগুলো এখন আর বেশি দূরে নয়। এখন ওদের কথা শোনা যায়।

বস, আমাদের নেক্সট কনসাইনমেন্ট কবে আসবে?

সাত দিন পরে।

এত রাইফেল এ বাড়িতে রাখা ঠিক নয়।

এ বাড়িতে কেন—টানেলে থাকবে। ভাল করে চট দিয়ে মুড়ে আজ রাত্তিরেই টানেলে নিয়ে যাবে।

ছেলেমেয়েগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে?

ইয়েস বস। ওরা চেঞ্জে এসেছে। ওদের একজন অসুস্থ।

কাল রাত্তিরে ওরা কিছু দেখেনি তো?

না, আমাদের দুজন ওদের বাড়ির চারধারে পাহারা দিচ্ছিল। ওরা এসে বলেছে, বাচ্চাগুলো ঘুমোচ্ছিল।

গাড়ির শব্দ?

কী করে শুনবে, বাতাস যে উল্টো দিকে। তার ওপর সমুদ্রের গর্জন।

ঠিক আছে। রাইফেলগুলো আজ রাত্তিরেই সরিয়ে ফেলবে। আমি শহরে যাচ্ছি। পার্টির সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিন-চার দিনের আগে ফিরব না। তোমরা সাবধানে থাকবে।

এখনি যাবেন?

হ্যাঁ। আমি টানেল দিয়ে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে চলে যাবো।

লোকটা কথা না বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দেখতে মন্দ নয়। তবে দোহারা দুর্দান্ত চেহারা। তারপরই বাবু আঁতকে উঠল। লোকটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। বাবু বসে পড়ল। লোকটা ঝোপটার কাছে এসে ডান দিকে ঘুরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে গেল। বাবু লোকটার পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই আর লোকটাকে দেখতে পেল না। হঠাৎ যেন উবে গেল।

লোকটা বলেছিল, টানেল দিয়ে যাবে। তার মানে টানেলে ঢোকার মুখটা সিঁড়ির কাছাকাছি কোথাও।

বস চলে যেতেই অন্য লোকগুলোর মধ্যে গা-ছাড়া ভাব। এখানে-ওখানে ছিটিয়ে বসে পড়ে। একজন বলল, একটু চা হলে মন্দ হয় না।

উনুন নিভে গেছে। করা যাবে না।

স্টোভে কর।

কেরোসিন আনতে হবে।

কী দরকার, চল তো বটতলার দোকানে গিয়ে খেয়ে আসি।

এখানে কাউকে থাকতে হবে?

কী দরকার!

তালা খুলে রাইফেলগুলো রেখে দেওয়া যাক। কতকক্ষণ আর লাগবে। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো। তারপর রাইফেলগুলো চট দিয়ে মুড়ে টানেলে নিয়ে যাবো।

এক একটা রাইফেলের কত দাম রে!

জানি নে।

আমি শুনেছিলাম পঞ্চাশ-ষাট হাজার।

কার কাছে শুনলি?

সঞ্জয় দত্তের মামলা যখন চলছিল তখন কাগজে বেরিয়েছিল।

সত্যি!

ওরা কথা বলতে বলতে ওপাশ দিয়ে ঘুরে চলে গেল। বাবু নড়ল না। আরো খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের ঝাপটা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বড় নির্জন, বড় চুপচাপ জায়গাটা। বাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। লোকগুলো যে ঘরে রাইফেল রেখেছে সেই ঘরটা তালা বন্ধ। ছিটকিনিও তোলা। বাবু ছিটকিনি খুলে দরজা ঠেলল। দরজা দুটোর মধ্যে সামান্য

* 'পাতালঘর রহস্য' দ্রষ্টব্য

ফাঁক হলো। জানলা বন্ধ থাকায় ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার। বাবু দরজার দুটোর পাল্লার মধ্যে মুখটা এগিয়ে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। প্রথমটায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। চোখ সয়ে যেতে বাবু দেখল, অনেকগুলো এ কে ৪৭ রাইফেল পর পর সাজানো। বাবুর মেজমামা আর্মির খুব বড় অফিসার। জেনারেল। তাঁর কাছে শুনেছে, এই রাইফেলের খুব দাম। মেজমামারও একটা আছে। বাবু রাইফেলগুলো গোনার চেষ্টা করল। পারল না। অনেকগুলো যে! এর দাম বেশ কয়েক লাখ টাকা তো হবেই। এত টাকার মারণাস্ত্র! এরা তাহলে কী! অস্ত্রের চোরাচালানি বলে তো মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া রাইফেলগুলো আসছেই বা কোথা থেকে! যাচ্ছেই বা কোথায়!

দরজা টেনে বন্ধ করে বাবু ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। এখানেই কোথাও টানেলের মুখটা আছে। ওদের কথা শুনে সেই কথাই তো মনে হলো। বেশি খুঁজতে হলো না। সিঁড়ির কাছে একটা জায়গা কাঠ দিয়ে ঢাকা। বাবু কাঠটা সরাতেই দেখতে পেল একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। বাবু বুঝতে পারছিল না, নিচে নামা ঠিক হবে কিনা। ঠিক তখনই দুটো লোকের গলা কানে এল। কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে বন্ধ ঘরটার কাছে এগিয়ে আসছে। আর একটু এগোলেই ওরা বাবুকে দেখতে পাবে। ছুটে যে ঝোপের আড়ালে চলে যাবে সে উপায়ও নেই। আর কোনো উপায় নেই দেখে বাবু কাঠটা সরিয়ে নিচে নেমে পড়ল। সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। নিচের দিকে অন্ধকারে চোখ চলে না। ও চার-পাঁচটা স্টেপ নেমে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল।

লোক দুটোকে সে দেখতে পাচ্ছে না। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে, এরা সব গেল কোথায়?

বসই বা কোথায়? অন্য লোকটার গলা।

বসের বাইরে যাবার কথা। কিন্তু অন্যরা?

চা-টা খেতে গেছে বোধহয়।

আমাদের গ্রামের দিকে বেশি যেতে বস বারণ করে দিয়েছে না? বস জানতে পারলে কিন্তু মুশকিল হবে।

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। আয় একটু বসি। ওরা এক্ষুণি এসে যাবে।

আরে ও কী!

কী রে?

মনে হচ্ছে টানেলের কাঠটা সরানো!

তাই তো! চল দেখি ব্যাপারটা কী!

ওরা টানেলের কাছে এসে দেখতে লাগল। মধ্যেও উঁকি দিল। বাবুর বুকটা কেঁপে ওঠে। টর্চ জ্বাললেই চিত্তির। ও যে হঠাৎ ধাঁ হয়ে যাবে তারও উপায় নেই। কী করবে ভেবে পায় না। লোক দুটো না নিচে নামে! নিজের ওপর রাগ হয় বাবুর। সব বিষয়ে কেন যে এত কৌতূহল কে জানে!

হঠাৎ একটা লোকের গলা কানে আসতেই ও কেঁপে উঠল। মাথা থেকে পায়ের দিকে ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল।

চল নিচে নেমে দেখি। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

তাই চল।

ওরা নিচে নামতে যাবে তখনই অন্য লোকগুলো কথা বলতে বলতে ফিরে এল। ওদের দেখে একজন চেঁচিয়ে বলল, এই তোরা ওখানে কী করছিস রে?

টানেলের মুখটা খোলা। কাঠটা সরাল কে?

ওঃ! বসই হবে। একটু আগে বস ওখান দিয়ে গেছে। কাঠটা টেনে দিতে ভুলে গেছে বোধহয়। আমরাও খেয়াল করিনি।

ঠিক তো!

হ্যাঁ!

বাইরের কেউ আসেনি তো?

ওরে না, না। এই ভূতের রাজত্বে কে আসবে রে?

ঠিক বলেছিস! ভূতের রাজত্বই বটে।

লোক দুটো কথা বাড়াল না। কাঠটা টেনে টানেলের মুখটা ঢেকে দিয়ে ওদিকে চলে গেল। ওরা কথা বলছে, বাবু অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে। বাবু ভেবে পাচ্ছে না এখন কী করবে। লোকগুলো এখন চট দিয়ে রাইফেলগুলো মুড়বে। তারপর টানেলের মধ্যে নিয়ে আসবে। সবাই মিলে হাত লাগালে কতক্ষণই বা লাগবে! বাবু বোঝে কাঠটা সরিয়ে ওপরে উঠতে গেলে ওদের চোখে পড়ে যাবে। তাহলে আর দেখতে হবে না। বাবুর বুকে হাতুড়ি পিটছে। ও নিজেকে স্টেডি রাখার চেষ্টা করে।

ও দেখেছে, দুষ্টু লোকগুলোর বস এখান দিয়েই নেমে গেছে। তার শহরে যাবার কথা। তার মানে এখান দিয়ে বাইরে বেরুবার পথ আছে। বাবু আর দেরি করল না। ও দেওয়াল ধরে ধরে নিচে নামতে শুরু করল। যত নিচে নামে, অন্ধকার ততই গাঢ় হয়। ও থামে না। এগোতে থাকে। অন্য সময় ওর পকেটে ছোট একটা টর্চ থাকে। আজ তাও নেই।

অন্ধের মতো ও এগোচ্ছে। বেশ খানিকটা নিচে নামার পর ওর মনে হলো

আর সিঁড়ি নেই। পথটা যেন সমতল। বাবু দেওয়াল ধরে ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে যায়। মিনিট ছ'সাত এগোবার পর ওর মনে হলো ও দুটো পথের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে এতক্ষণ থাকার জন্যে চোখটা সয়ে গেছে। আবছা আবছা ও দেখতে পায়। ওর মনে হলো একটা পথ ডান দিকে ঘুরে গেছে। অন্যটা বাঁ দিকে। বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করল। ওর মনে হলো বাঁ দিকের টানেলটা নির্ঘাৎ বাতিঘরের দিকে গেছে। তার মানে ডান দিকেরটা মাঠের দিকে।

বাবু সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের টানেলের দিকে ঘুরে দেওয়াল ধরে এগোতে লাগল। একটু পরেই ওর পা কিছুতে ধাক্কা খেল। ও আস্তে আস্তে পাটা তুলল। যা ভেবেছে তাই। আবার সিঁড়ি। তবে এটা নরম। মনে হচ্ছে মাটির। বাবু এক পা, দু' পা করে উঠতে লাগল। বেশ খানিকটা ওঠার পর ওর মনে হলো দূরে হাল্কা আলোর আভাস। তবে কী ও মাঠের দিকে যাচ্ছে! আশায় আশায় আরো তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল বাবু। যত এগোয় আলোটা ততই যেন বাড়ে।

একটু পরে বাবু দেখল সিঁড়ি শেষ। মাথার ওপর নীল আকাশ। সমুদ্রর ঢেউ ভাঙার শব্দও কানে আসে। কিন্তু গর্তের মুখ পাঁচ-ছ' ফুট ওপরে। কী করে উঠবে সে? পকেটে দড়িটাও নেই। থাকলেই বা কী হতো! বাবু বোঝে, লোকগুলো এখান দিয়ে কখনো-সখনো যাওয়া-আসা করে। কিন্তু ওপরে ওঠে কী করে? ওর মাথায় কিছু ঢোকে না। বাবু বোঝে, ওকে খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতেই হবে। যত সময় নষ্ট হবে ততই ওর ধরা পড়ে যাবার চান্স বাড়বে। কিন্তু ওপরে ও উঠবে কী করে! গর্তটার ব্যাস তিন ফুটের মতো। ওপর থেকে লাফিয়ে নামা যায়। নিচে থেকে তো আর লাফানো যাবে না।

বাবু মাটির দেওয়ালটা হাত দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল, কোথাও খাঁজ কাটা আছে কিনা। তা নেই। কিন্তু খাঁজ দেখতে গিয়ে বাবু হাতে পেল একটা মোটা তক্তা। তার রংটা মাটির মতো হয়ে গেছে। তাই দেখা যাচ্ছিল না। বাবু দেখল তক্তাটার গায়ে খাঁজ কেটে স্টেপ বানানো আছে।

আর একটুও দেরি না করে বাবু হামাগুড়ি দেবার মতো করে দু' হাত দিয়ে তক্তাটা ধরে ওপরে উঠতে লাগল। একটু পরেই সে দেখল, একটা ঝোপের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে। সামনেই গর্তর মুখ। বাবু বুঝতে পারল, রামুর বাঘা এখান দিয়েই নিচে পড়ে গিয়েছিল। তখন নিশ্চয় তক্তাটা ওখানে ছিল না, তাই উঠতে পারেনি। ও মনে মনে বসকে ধন্যবাদ দেয়। সে একটু আগে এখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলেই তক্তাটা ওখানে ছিল। ফিরে এসে বোধহয় ওখান দিয়েই নামবে। ওদের বলগুলো বোধহয় ওখান দিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল।

বাবু আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি সমুদ্রর ধারে এগিয়ে গেল। বলা তো যায় না, বাতিঘর থেকে কেউ হয়তো নজর রাখছে। সমুদ্রর ধার দিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এসে বারান্দার একটা চেয়ারে বসে হাঁপ ছাড়ল। মনে হচ্ছে, ওর শরীরে কোনো জোর নেই। প্রচণ্ড টেনশানে বাবু কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে। ও চোখ বুজে বসে থাকে। মস্ত বড় একটা বিপদ থেকে এই মাত্তর সে বেঁচে ফিরে এল। ধরা পড়লে কী যে হতো! বাবুর ভাগ্য ভাল যে বাতিঘর থেকেও কেউ তখন লক্ষ্য রাখছিল না। ওরা সকলে রাইফেলগুলো প্যাক করার কাজে ব্যস্ত ছিল।

বাবুর মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। ওরা উগ্রপন্থী নয় তো! এসব অস্ত্র-শস্ত্র উগ্রপন্থীদের জন্যে আসছে না তো? কথাটা মনে হতেই বাবু নড়েচড়ে বসল। জায়গাটা দারুণ বেছেছে। এখানকার নিরীহ লোকগুলোকে ভূতের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা খুব সহজ। ওরা রেখেছেও তাই। অতগুলো এ কে ৪৭! বাবু শুনে এল, আরো রাইফেল আসছে। শুধু রাইফেল! আর ডি এক্স নেই তো! থাকতেই পারে।

বাবু ভেবে পায় না, এখন ওদের কী করা উচিত! সব জেনে-শুনেও চুপ করে থাকতে মন সায় দেয় না। কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে, কলকাতা থেকে এত দূরে ওরা কটা ছেলেমেয়ে কী বা করতে পারে! বাবু ঠিক করল, এই ব্যাপারে সে মিউয়ের সঙ্গে আলোচনা করবে। দুজনে মিলে পরামর্শ করে যা হোক একটা কিছু করা যাবে। মুশকিল হয়েছে, মিউটার আবার শরীর খারাপ। গায় জোর পেয়েছে বটে, এখনো পুরো সুস্থ হয়নি।

বেলা পড়ে আসে। রোদের রং বদলে গেছে। সোনালী রোদ এখন সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নেচে বেড়াচ্ছে। গাঙচিলগুলো এখনো জোট বেঁধে সমুদ্রর মাছ ধরার তালে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একবার নিচে নেমে আসছে, তারপর আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওদেরও ঘরে ফেরার সময় হয়ে এল। বেলা গড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা এখনো উঠছে না, বাবু উঠে ঘরে যায়।

(চার)

বাবু প্রথমে রাজাকে ডাকে। এ ঘরে মিউ, মোমা আর বুয়া অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবু ভেবে পায় না, এত ঘুমের কী। মিউ দুর্বল। ও ঘুমোতে পারে। কিন্তু মোমা আর বুয়া? কিকিটা আবার কোথায় গেল! বাবু একটু চিন্তায় পড়ে।

রাজা এসে ঘরে ঢোকে। বলে, এখনো ঘুমোচ্ছে, ডাকি ওদের?

না থাক। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। কিকিটা কোথায় গেল?

পেয়ারা গাছে বসে আছে বোধহয়।

চল তো দেখি।

ওদের বাড়িটার মধ্যেই একটা বড় পেয়ারা গাছ আছে। এখানে আসার পর থেকে চান্স পেলেই কিকি গিয়ে ঐ গাছে বসে থাকে। বাবু আর রাজা উঠোনের পাশে গাছটার কাছে গিয়ে দেখল, কিকি একটা ডালে বসে আছে। ওরা ডাকল না। বারান্দায় গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। মানুদিও বাড়িতে নেই। বাবু বুঝতে পারছিল না রাজাকে বাতিঘরের কথা বলবে কিনা। তারপরই ওর মনে হলো, বলে রাখা ভাল। কখন যে কোথা দিয়ে বিপদ আসে কেউ বলতে পারে না।

বাবু বলল, বুঝলি রাজা, লাইট হাউসের ব্যাপারটা হাইলি সাসপিসাস।

ভূত তো!

ভূত না মুণ্ডু। আসলে ওটা দুষ্টু লোকদের ডেরা। মনে হচ্ছে, ওদের সঙ্গে

অস্ত্রপাচারের একটা সম্পর্ক আছে।
কী বলছিস!
হ্যাঁ রে, আমি প্রমাণ পেয়েছি।
কি করে?
আমি আজ দুপুরে পোড়ো বাড়িটায় গিয়েছিলাম। টানেলেও ঢুকেছিলাম। দেখলাম, এক গাদা এ কে ৪৭ রাইফেল।
রাজা সোজা হয়ে বসল। কি করবি এখন? কমলদাকে খবর দিবি?
ভাবছি। এখান থেকে ফোন করাও তো মুশকিল। কোথা থেকে ফোন করব বল। জানাজানি হয়ে যাবার চান্সও বেশি।
থানায় খবর দিলে হয় না?
লোকাল থানার সঙ্গে ওদের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। তা ছাড়া এটা একটা অন্য স্টেট।
তা ঠিক।
তা ছাড়া ওরা যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে, আমরা সব জেনে গেছি তাহলে আমাদের ছেড়ে দেবে না। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।
ওখানে কী শুধু রাইফেল—আর ডি এক্স নেই তো?
থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আমি অবশ্য রাইফেলই শুধু দেখেছি।
আমাদের এখন কী করা উচিত?
বুঝতে পারছি না। মোমা আর বুয়া যেন কিছু জানতে না পারে। মিউকে আমি সব বলে রাখব।
সেই ভাল। কিন্তু কমলদাকে জানাবার কী করবি?
সেইটাই তো ভাবছি।
আমাদের ওপর ওদের কোনো সন্দেহ হয়নি তো?
এখনো হয়নি বলে মনে হয়। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, আজ না হয় কাল ওরা আমাদের এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবে। ওরা কিছুতেই চাইবে না, ওদের নাকের ডগায় কেউ বসে থাকুক।
সে তো ঠিকই।
আমাদের তাই অনেক বেশি সাবধানে থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে।
রাজার মুখে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবু একটু অন্যমনস্ক। এখন যে ওদের কী করা উচিত বুঝতে পারছে না। একবার মনে হয়, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। চুপ করে থাকাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। পরমুহূর্তে মনে হয়, অস্ত্রপাচারকারীরা দেশের শত্রু। ওদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সেইটাই ঠিক। ছেড়ে দিতে তো চায়ও না। কিন্তু ওরা কটা ছেলেমেয়ে কী করতে পারে!
হঠাৎ বাবুর মুখটা কঠোর হয়ে ওঠে। ও মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। একটা কিছু করতেই হবে। যেভাবেই হোক এই দুষ্ট চক্রকে ভেঙে দিয়ে অস্ত্রপাচারকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু কী করে—ওর মাথায় কিছু ঢোকে না। ও দেখে এসেছে, ওদের কতটা পাকা ব্যবস্থা। লোকজনও অনেক। বাতিঘর থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে চট করে কারো চোখে কিছু পড়বে না। তার ওপর ভূতের ভয় দেখিয়ে এখানকার মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। স্থানীয় মানুষের কোনো সাহায্য ওরা পাবে না। তাছাড়া ওদের চরও নিশ্চয়ই সব জায়গায় ঘুরছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই ওদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে। তখন আর দেখতে হবে না। তাই ওদের পা ফেলতে হবে অত্যন্ত হিসেব করে। সতর্ক হয়ে।
বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশে এখন কনে দেখা আলো। মানুদি প্রায় ছুটে এল, বড্ড দেরি হয়ে গেল তাই না! চা খাবে না দুধ দেব?
তার সঙ্গে কী? রাজার প্রশ্ন।
ভেবেছিলাম আলুর চপ আর পেঁয়াজি করে দেব।
তা দাও না!
দেরি হয়ে গেছে যে!
তাতে কী! মিউরা এখনো ঘুম থেকেই ওঠেনি।
তাহলে ঠিক আছে। আমি আলুর চপ, পেঁয়াজি ভাজতে আরম্ভ করে ওদের ডাকব।
মানুদি রান্নাঘরে চলে গেল। ওরা বাঙালী। ওর বাবা এখানে চলে এসেছিলেন ১৯৪৭ সালে পার্টিশনের পর। রামুদাদা, মানুদির জন্ম এখানেই। তবে বাংলাটা ভালই জানে। এই বাড়িটার দেখাশোনার ভার ওদের ওপরেই। তাই এখানে এসে বাবু-মিউদের খুব সুবিধে হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা নেই।
রাজা বলল, আজ আর বেরুবি না?
না, সন্ধ্যে তো প্রায় হয়ে এল। সমুদ্রর দিকে তাকিয়ে থাক, দেখবি অন্ধকার ধীরে ধীরে সমুদ্রকে কীভাবে গ্রাস করে।
চাঁদ উঠবে কবে রে? জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রর চেহারাই নাকি বদলে যায়। দারুণ দেখতে লাগে।
সবে তো অমাবস্যা গেল। পূর্ণিমা আসুক। তবে তো দেখবি।
হঠাৎ ওদের কানে এল মানুদির গলা। মোমা, মিউ আর বুয়াকে তুলছে, সন্ধ্যে যে হয়ে গেল—আর কত ঘুমোবে! ওঠো, ওঠো...
একটু পরেই মিউ আর মোমা এসে বাইরে বসল। উঃ কী ঘুমটাই না ঘুমোলাম!
হ্যাঁ, সন্ধ্যে হয়ে এল।
আলুর চপ, পেঁয়াজি আর চা এসে গেল। ওদের এখন আর কথা বলার সময় নেই।
একটু পরে মানুদি কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে যেতে এল। বাবু জিজ্ঞেস করল, মানুদি, মিউ কেমন আছে জানাবার জন্য কলকাতায় একটা ফোন করার দরকার। কোথা থেকে করি বলো তো!
পোস্ট অফিসে শুনেছি ফোন আছে। সেখানে যাও না।
কোথায় সেটা?
ঐ তো বাজারের পেছনে।
বাজারটা কোথায় বাবুরা তাই জানে না। সে কথা আর মানুদিকে বলল না। খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না। ঠিক করল, কাল সকালেই কমলদাকে ফোন করে সব জানিয়ে রাখবে।
ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। কে যেন একটা বিশাল চাদর দিয়ে গোটা সমুদ্রকে ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে। সমুদ্রের এ আর এক রূপ। ঝড়ো হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের গায়ের ওপর। বাতাসের শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে ঢেউ ভাঙার আওয়াজে। বাবু বলে, চল ঘরের ভেতরে যাই। সন্ধ্যের পর বাইরে বসে থাকলে মিউয়ের ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।
সেই ভাল।

ওরা এক এক করে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। সঙ্গে অনেক গল্পের বইটই এনেছে। সময় কাটাবার অসুবিধে নেই। সারাদিন একরকম থাকলেও সন্ধ্যের পর মোমার আতঙ্ক বাড়ে। ওর ভয়, বাতিঘরের ভূত এই বুঝি এ বাড়িতে এসে ওকে ধরল। ওর ভয় দেখে অন্যরা হাসে। বাবু চুপ করে থাকে। একমাত্র ঐ জানে, ভূত-টুত সব বাজে কথা।

ঘরে ফিরে গিয়ে গল্পগুজব করে। মিউ শুয়ে পড়ে একটা বই নিয়ে। বাবু এক কোণে বসে ডায়েরিটা পড়তে শুরু করে। পাতাগুলো এত ঝিরঝিরে হয়ে গেছে যে খুব সাবধানে পড়তে হয়। পড়তেও কষ্ট হয়। সাল-তারিখ দেখে বুঝেছে, একশ বছর আগে এই ডায়েরিটা লেখা হয়েছে। আর তাতেই বাবুর কৌতূহল বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। সেই সময়ের সমাজ-সংস্কৃতি থেকে আরম্ভ করে বাজারদর পর্যন্ত এই ডায়েরির ছত্রে ছত্রে লেখা। কিন্তু বাবু যা খুঁজছে তা পায় না। ও জানতে চায় ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে। পুরনো বাড়ির ওপর ওর আলাদা একটা টান। সেই বাড়ির নাড়িনক্ষত্রর কথা ও জানতে চায়।

রাত্তির বেলায় ডায়েরিটা পড়তে পড়তে বাবু জানতে পারল কাছাকাছি একটা ছোট পাহাড়ে খুব দামী খনিজ কোনো পদার্থের খোঁজ ওঁরা পেয়েছিলেন। তারপর আর কিছু করা হয়নি। কারণ একজন এসে সব দেখে বলেছিলেন, ঐ পদার্থ তাঁদের অজানা। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে ক্ষতির সম্ভাবনা।

বাবুর কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। বাড়িটার কাছে ছোট পাহাড় কোথায়? টিলা অবশ্য অনেকগুলো আছে। বাবু ঠিক করল, কাল আবার ঐ বাড়িটায় যাবে। তার আগে একবার বাতিঘরে যেতে চায়। কিন্তু ও যে বাড়িটার মধ্যে সুড়ঙ্গর খোঁজ পেয়েছে, সে কথাটা কাউকে বলা হয়নি। মিউ আর রাজাকে বলার দরকার। পাশে তাকিয়ে দেখল রাজা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মিউয়ের দুর্বল শরীর। ও-ও নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। এই রাত্তিরে ওদের ব্যস্ত না করাই ভাল। বাবু আর দেরি করল না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরবেলায় বাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তখনো কেউ ওঠেনি। ওঠার কথাও নয়। এখনো বেশ অন্ধকার। আকাশে তারারা মিটিমিটি করে পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছে। আর একটু পরে ওদের আর কেউ দেখতে পাবে না। পুব আকাশে আলোর ছটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সূর্যদেব ঘুম ভেঙে নতুন দিনকে স্বাগত জানাবেন। বাবু উঠে পড়ে। মুখ-হাত ধুয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে।

বাইরে তখনো অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে ওর গায়। চুলগুলো উড়তে থাকে। পুব আকাশে সামান্য একটু আলোর আভাস। বাতিঘরটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাল গাছের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু এগিয়ে যায় সেইদিকটায়। আগে ভেবেছিল, কাল রাত্তিরে যে টিলার কথা পড়েছে সেটা খুঁজে বের করবে। আর লক্ষ্য রাখবে বাড়িটার ওপর। তা না করে সে এগিয়ে যায় বাতিঘরের দিকে। ওর ধারণা, এই শেষ রাতে দুষ্টু লোকগুলো নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। ওদের সর্দার শহরে গেছে। ফিরতে দেরি হবেই। তাই এখন ঝুঁকিও কম।

বাতিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বাবু কিছুক্ষণ ভাবে। বুঝতে পারে না, ঢোকা উচিত হবে কিনা। কেউ পাহারায় আছে কিনা তাও জানে না। বাবুর মনে হয়, যাই করুক সে তা এখনই করতে হবে। ভোর হয়ে এলে সকলের চোখে পড়ে যাবে। বাবু আর দেরি করল না। ক'ধাপ উঠে সে বাতিঘরের দরজা খুঁজতে লাগল। দরজাটা বন্ধ। এক চক্কর ঘুরে এসে আর একবার দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। বাবু অবাক হয়। কয়েক মুহূর্ত আগে সে যখন দরজাটা ঠেলেছিল তখন তো খোলেনি। তাহলে? কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না তো! বাবুর সন্দেহ হয়। একটু ইতস্তত করে। পরমুহূর্তে মনে হয়, অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে ও বোধহয় দরজার বদলে অন্য কোথাও হাত দিয়েছিল।

বাবু আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ভেতরে উঁকি দেয়। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। বাবু কলকাতার মনুমেন্টে একবার উঠেছে। ও জানে সিঁড়িটা সামনেই। সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। বাবু আর দেরি করে না। মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্ধের মতো হাত দিয়ে দেখতে দেখতে সিঁড়ির হদিস পেয়ে যায়। ও ওপরে উঠতে শুরু করে। সরু সিঁড়ি। ও বুঝতে পারে, একসঙ্গে দুজন ওঠানামা করা যায় না। বেশি উঁচু নয়। বাবু একটু পরেই ওপরে পৌঁছে যায়। সামনেই সমুদ্র। অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। দূরে ওদের বাড়ি অবধি চোখ চলে না। বাবু চারপাশটা একবার ঘোরে। রেলিং দিয়ে ঘেরা। পুব আকাশটা এখন অনেক পরিষ্কার। বাবু বোঝে, এখানে আর থাকা উচিত নয়। ও আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে। ওর মনে হয় নিচে যেন সামান্য আলোর আভাস! ও সতর্ক হয়। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়, ফাঁদে পড়েনি তো!

আরো দু'চার ধাপ নিচে নেমে আসতেই বাবু বুঝতে পারে, যে ভয়ের আশঙ্কা ও করেছিল তাই হয়েছে। ও ফাঁদে পড়েছে। বাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার আর পালাবার উপায় নেই। নিচে আলোর রেখা। ও যখন ওপরে উঠেছিল তখন অন্ধকার ছিল। ও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ওর কানে ভেসে এল, সময় নষ্ট কোর না। নেমে এস। পালাবার উপায় নেই।

বাবু নামে না। টুঁ শব্দও করে না। অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কী হলো, নেমে আসছো না কেন?

বাবু নামে না। নিচে ক'জন ও জানে না। একা কী আর ওদের সঙ্গে লড়তে পারবে! তা ছাড়া ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রও আছে।

নিচের আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজনের পরিষ্কার নির্দেশ বাবু শুনতে পেল, তোমরা ওপরে যাও—ছেলেটাকে ধরে নিয়ে এস।

কারো ওপরে ওঠার পায়ের শব্দ বাবু শুনতে পেল। তারপর টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ল মুখের ওপর। লোকটা এগিয়ে আসছে। হাতে উদ্যত রিভলভার। বাবু বুঝল, চুপ করে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।

নেমে এস। নির্দেশ দিয়ে লোকটা

নিচের দিকে নামতে লাগল।

বাবু পেছনে পেছনে নেমে এল। নিচে তিনটে ষণ্ডামার্কা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। তাদের নির্লিপ্ত মুখ। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ওরা হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। দয়া-মায়া বলে এদের শরীরে কিছু নেই।

একে কোথায় রাখবি?

নিচে নিয়ে গিয়ে রাখ। বস আসুক। তারপর যা বলবে তাই করা যাবে!

নিচে কোথায়? ল্যাবোরেটরিতে?

বাবু চমকে উঠল। এখানে আন্ডারগ্রাউন্ডে ওরা ল্যাবোরেটরি বানিয়েছে। আশ্চর্য!

পাগলা দাদু ক্ষেপে যাবে না তো?

অন্য লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠল। বলল, পাগলা দাদু না ভূত!

তা যা বলেছিস! বসের বুদ্ধি দেখেছিস। এমন অবস্থা করে দিয়েছে যে লোকটার আর কোথাও যাবার উপায় নেই। ওকে দেখলেই সকলে ভূত-ভূত বলে পালায়।

পাগলা দাদুটা কে? ও তাহলে যাকে সেদিন বিকেলে দেখেছিল, সেই ওদের পাগলা দাদু বা ভূত। কিন্তু লোকটা কে?

ওরা টানেলে নেমে আসে। বেশ খানিকটা যাবার পর আরো নিচে নেমে যায়। তারপরই এসে হাজির হয় আলো ঝলমলে একটা ঘরে। বাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মস্ত বড় ঘর। ঘর বললে ভুল হবে। একটা আধুনিক ল্যাবোরেটরি। এক কোণে একটা ডিভানে একজন বৃদ্ধ ওপাশ ফিরে ঘুমোচ্ছেন। ইশারায় বাবুকে একটা চেয়ারে বসতে বলল একজন। বাবু অসহায়ের মতো বসে পড়ল।

পালাবার চেষ্টা কোর না। আমাদের চোখ আছে সব জায়গায়, ধরা পড়ে যাবে।

বাবু চমকে উঠল। তবে কী কাল বিকেলে ওর আসার কথা ওরা জানে! এখনো না জানলেও জেনে যাবে। ক্যামেরা সব ধরে রেখেছে। বাবু বুঝতে পারে না—এদের ব্যাপারটা কী! কাল ভেবেছিল, এরা অস্ত্রশস্ত্রর চোরাকারবারী কিংবা উগ্রপন্থী। এখন তো সেকথা মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা মোটেই অত সাধারণ নয়। এমন আধুনিক ল্যাবোরেটরি বানিয়ে ওরা এখানে কী করছে? মাটির নিচে এই সব সুড়ঙ্গ, ল্যাবোরেটরি—এ সব তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু কেন?

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো বাবুর মনে একটা সম্ভাবনার কথা ঝলসে ওঠে। ওর মনে পড়ে ডায়েরিটার কথা। এখানে ঐ ছোট্ট টিলায় দামী খনিজ পদার্থের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। জিনিসটা কী ওঁরা জানতেন না। এরা কী সেইটা জেনে ফেলেছে! কী তা! এত গোপনে যখন পরীক্ষা চলছে তখন সেটা সাধারণ কিছু নয় তা বোঝা যায়। হঠাৎ বাবুর মনে হয় ইউরেনিয়াম নয় তো?

বাবুর চিন্তায় বাধা পড়ে। বৃদ্ধ এ পাশ ফিরে শোন। আর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবুর বুকটা কেঁপে ওঠে। কী বীভৎস মুখ! এই মুখটাই তো সেদিন বিকেলে বাতিঘরের ওপরে দেখেছিল। একটা মানুষের মুখ এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে! বাবু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বাতিঘরের ওপর এই মুখ দেখে ওর মনে হয়েছিল, মুখোশের কথা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, মুখোশ তো নয়। মুখোশ পরে কেউ রাত্তিরে ঘুমোয় না। এ তো বৃদ্ধ মানুষটির মুখ। উঃ কী বীভৎস! এই মুখ নিয়ে উনি কোনোদিন সভ্য সমাজে যেতে পারবেন না। ওঁকে আজীবন এই অন্ধকারেই থাকতে হবে। কিন্তু কী করে এমন হলো? কোনো দুর্ঘটনায়—না কী কেউ ইচ্ছে করে এমন অবস্থা করে দিয়েছে? কে জানে! তবে এরা যে অতি ভয়ঙ্কর লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাতিঘরে ভূতের ভয় দেখিয়ে মানুষজনকে দূরে সরিয়ে রেখে ওরা যে এখানে কি করছে কে জানে!

বেলা বাড়ছে। ঘরে একটা ওয়ালক্লক ছিল। বাবু দেখল, প্রায় সাতটা বাজে। মিউরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ উঠে পড়েছে। ওকে না দেখলে কেউ অবাকও হবে না। বাবু হামেশাই এইরকমভাবে বেরোয়। বাবু ভাবে, মিউরা কত কাছে আছে। কিন্তু ও যে এখানে বন্দী তা ওদের জানার কোনো উপায়ই নেই। ওরা ভাবতেও পারবে না, এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। দুপুরে না ফিরলে ওরা হয়তো একটু চিন্তা করবে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু সন্ধ্যে থেকে ওরা অস্থির হয়ে উঠবে। এখানকার টানেলগুলোর খবরও তো ওদের দেওয়া হয়নি। ওরা ভাবতেও পারবে না, এখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গর মধ্যে কত কী হচ্ছে! ওদের খবর দেওয়ার দরকার। কিন্তু কী করে যে দেবে! বাবুর মাথায় কিছু ঢোকে না।

হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে বৃদ্ধ উঠে বসতেই বাবু চমকে তাকাল। বয়েস হলেও চেহারাটা কিন্তু ভাল। বাবু তাকিয়ে ছিল বৃদ্ধের দিকে। মুখটা সামনের দিকে। বাবু পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ বাবুর দিকে চোখ পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে—এখানে কি করে এলে?

ইংরেজিতে কথা বললেন ভদ্রলোক। বাবু উত্তর দিল, আমরা এখানে চেঞ্জে এসেছি। আজ ভোরবেলায় আমি একা বাতিঘরটা দেখতে এসেছিলাম। দরজা খোলা দেখে ওপরে উঠেছিলাম। তারপর তিনটে লোক আমাকে এখানে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে।

হুঁ! খুব বিপদে পড়ে গেছ ভাই। এখানে একবার এলে আর বেরুবার পথ খোলা রাখে না ওরা। দেখছো না আমার অবস্থা!

কী করে এমন হলো?

সে অনেক কথা। পরে বলব। একবার যখন এসেছ...

কথা শেষ না করে বৃদ্ধ উঠে গিয়ে ল্যাবোরেটরির লাগোয়া বাথরুমে ঢুকলেন। এখানে দিনের আলো বলে কিছু নেই। এতক্ষণ হাল্কা নীলচে আলো জ্বলছিল। বৃদ্ধ সেটা নিভিয়ে দিয়ে দু' তিনটে টিউব জ্বেলে দিয়ে বাথরুমে গেছেন। ল্যাবোরেটরিটা এখন তাই আলোয় ঝলমল করছে। বাবু চারদিকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আধুনিক সব জিনিসপত্তর। একটা দিক ভালো করে ঘেরা। এখানে কী হয় কে জানে! বৃদ্ধের কাছ থেকে তা অবশ্য সে জেনে নিতে পারবে। কিন্তু এখান থেকে বেরুবে কী করে! মিউদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায়ই নেই। বাবু চুপ করে বসে থাকে। তার

মাথায় এখন হাজার চিন্তা। এখান থেকে কীভাবে বেরুবে—সেই ভাবনাতেই সে অস্থির হয়ে ওঠে।

একটু পরে মুখ-হাত ধুয়ে বৃদ্ধ ফিরে এলেন। ঝলমলে আলোয় ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবুর বুক কেঁপে উঠল। মুখে বোধহয় তার ছায়া পড়েছিল। বৃদ্ধ হেসে বললেন, আমার মুখ দেখে ভয় পাচ্ছো না?

না।

ব্রেভ বয়।

ক'দিন আগে বিকেল বেলায় আপনাকে বাতিঘরের ওপরে দেখেছিলাম। সেদিনই বুঝেছিলাম, ও সব ভূত-টুতের গুজব একদম বাজে। আমি ভেবেছিলাম, মুখোশ পরে কেউ ভয় দেখাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ। কেউ ধারে কাছে না থাকলে, চান্স পেলেই আমি বাতিঘরের ওপরে গিয়ে গাঁয়ের মানুষকে ডাকার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মুখ দেখে কেউ কাছে ঘেঁষে না। সকলে ধরে নিয়েছে, আমি ভূত। সারা অঞ্চলে খবরটা রটে গেছে। কেউ আর বাতিঘরের দিকে আসে না।

হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি।

তুমি তো বললে, আমায় দেখেছো!

হ্যাঁ, সে তো আমি একা। আর কেউ জানে না।

সেদিন তুমি একাই ছিলে বটে। তা ঐ রকম পা টিপে টিপে আসছিলে কেন?

আমাদের তিন-তিনটে ফুটবল বাতিঘরের কাছাকাছি এসে কোথায় যে হারিয়ে গেল সেগুলো খুঁজতেই...

কোনো কারণে সুড়ঙ্গর মুখটা খোলা ছিল। সেখান থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। বল তিনটে বাতিঘরের ওপরেই রাখা আছে। কিন্তু ও দিয়ে আর কী হবে! তুমি কী আর এখান থেকে বেরুতে পারবে!

বৃদ্ধের গলায় হতাশা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, এখানে একবার এলে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তোমায় নিয়ে এরা কী করবে কে জানে!

আপনি বাইরে কারো সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেননি?

করেছিলাম। কিন্তু...

কী করে?

রেডিও ওয়েভ লেংথে খবর পাঠিয়ে।

ট্রান্সমিটার আছে আপনার কাছে?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকান ছেলেটির দিকে। কথাবার্তায় অত্যন্ত মার্জিত। শিক্ষিত-ভদ্র পরিবারের ছেলে। বিজ্ঞানেও উৎসাহ আছে। বললেন, তা আছে, কিন্তু তুমি ওটা দিয়ে কী করবে?

খবর পাঠাব।

জানো কী করে খবর পাঠাতে হয়!

জানি। এটা আমাদের একটা মজার খেলা ছিল।

হঠাৎ দুটো লোক এসে ঘরে ঢুকল। বাবুকে দেখিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, একে কোথা থেকে আনলে?

বাতিঘরে উঠেছিল।

তাতে কী! বাচ্চা ছেলে উঠতেই পারে। তা দরজা খোলা পেল কী করে?

লোক দুটো উত্তর দিল না। উল্টে বলল, আপনি এখনো কাজ শুরু করেননি?

লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, কী তোদের এতবড় স্পর্ধা...

হাসতে হাসতে লোক দুটো ঘর ছেড়ে চলে গেল। বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বললেন, চা খাবে?

হ্যাঁ, মাথা নাড়ল বাবু।

এক কোণে টেবিলের ওপর একটা হিটার। চায়ের কাপ-প্লেট, আরো টুকিটাকি অনেক কিছু জিনিস রয়েছে। বৃদ্ধ উঠে গিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিলেন। একটু পরেই দু' কাপ চা তৈরি করে নিয়ে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বাবু বলল, আপনার নামটা জানতে পারি?

ম্লান হাসি খেলে গেল বৃদ্ধের মুখে। বললেন, অ্যাটমিক সায়েনটিস্ট হিসেবে একসময় সকলেই আমার নাম জানত। ভারতের মিসাইল পৃথ্বীর প্রাথমিক কাজ আমারই করা। আমাকে ইউরেনিয়াম-টিয়ামের বিশেষজ্ঞ বলে সবাই জানতো।

আপনি কি তাহলে নিরুদ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ সদাশিব রঙ্গনাথন?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, তুমি আমার নাম জানো?

শুধু জানি বললে ভুল হবে, আপনার লেখা সবকটা বইও আমার পড়া। আচ্ছা আপনি যে লিখেছিলেন, ওড়িশার উপকূলে সমুদ্রের বালিতে পিচ ব্লেন্ড আছে তা কী সত্যি?

সত্যি তো বটেই। আমার এই বন্দিদশাও তো সেইজন্যেই।

এই ল্যাবোরেটরিতে আপনাকে কী করতে হয়?

বিভাজন...

বুঝতে পেরেছি। ঐ টিলা থেকে র মেটেরিয়াল আসছে তো?

বৃদ্ধের বিস্ময় এবার আর বাধা মানে না। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, টিলার কথা তুমি জানলে কী করে!

এই বাড়ির দোতলার একটা ভাঙা ঘরে একশ বছরেরও পুরনো একটা ডায়েরি পেয়েছি। তাতে লেখা আছে, ঐ টিলাতে খুব দামী খনিজ পদার্থের খোঁজ পাওয়া গেছে।

জানো, দেশের এই মহামূল্যবান জিনিস আজ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

অনেকগুলো এ কে-৪৭ রাইফেল দেখলাম। সেগুলো?

ওরা বিদেশ থেকে আনিয়ে মোটা টাকায় উগ্রপন্থীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে।

বাবুকে চিন্তিত দেখায়। বলে, আমায় খুঁজতে এসে আমার ভাইবোনরা না এদের পাল্লায় পড়ে!

ওরা এই ভাঙা বাড়িটায় আসবে?

আসতেই পারে। আমরা তো একবার ঘুরে গেছি।

এখানে এলেই ওরা ধরা পড়ে যাবে।

বাবু জিজ্ঞেস করল, আপনার ট্রান্সমিটারে কতদূর পর্যন্ত খবর পাঠানো যাবে?

আমি গভীর রাত্রে চুপি চুপি ওটা তৈরি করছি। মনে হয় আজকালের মধ্যে শেষ করতে পারবো। ওর ওয়েভ লেংথ দু'তিনশ মাইল হবেই।

তাহলে তো কলকাতাকে ধরতে পারবো?

মনে তো হয়।

দাদু, আমি আপনাকে দাদুই বলব।

তা বলো।

ওটা শেষ করে ফেলুন। আপনাকে

এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাব।

বৃদ্ধের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। বললেন, এই মুখ নিয়ে সভ্য সমাজে যাবো! আমাকে দেখে সকলে ভূত ভাবে।

দাদু, আপনি না বিজ্ঞানী! প্লাস্টিক সার্জারি বলে একটা জিনিস আছে না!

তা তো আছে, আমার বয়েসটার কথা ভুলে গেলে!

দেখবেন কোনো অসুবিধে হবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে।

তা ঠিক।

বৃদ্ধ বললেন, আর গল্প করলে ওরা কিছু সন্দেহ করবে। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। তুমি ঐ ডিভানে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি কাজে বসি।

(পাঁচ)

সকালে উঠে বাবুকে দেখতে না পেয়ে ওরা চিন্তা করেনি। এমন তো হামেশাই হয়। শুধু ব্রেকফাস্টের সময় মানুদি খুঁতখুঁত করছিল, ছেলেটা গেল কোথায়? সকালে চাও খায়নি।

এসে যাবে, এসে যাবে। তোমায় অতো ভাবতে হবে না। মিউ মানুদিকে সান্ত্বনা দেয়।

রাজা বলল, বাবুটা যে কী করে! সাত সকালে উঠে কোথায় যে গেল!

ব্যাপারটা নতুন কিছু নাকি? মিউ রাজার দিকে তাকিয়ে বলে।

তা নয়, তবু!

তার ওপর এখানে ভূত-টুত সব রয়েছে...

তুই চুপ কর তো! মোমাকে থামিয়ে দেয় মিউ।

ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা এসে বাইরে বসল। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর সকালের রোদ খেলা করছে। ঢেউগুলো রোদ মেখে চকচক করছে, তারপর সাদা ফেনা ছড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। হু-হু করে বাতাস দিচ্ছে। মিউয়ের মনটা খুঁতখুঁত করছে। কোনো বিপদে-টিপদে পড়েনি তো বাবুদাদা! কাউকে কিছু বলে যায়নি। কাল দুপুরেও বেরিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল, কী করেছিল—সে কথাও বলেনি। মিউয়ের চিন্তা হয়। পুরনো ডায়েরিটা পড়ছিল। সেটা পড়ে কোথাও যায়নি তো! মিউ উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকে ডায়েরিটা টেনে নেয়। ও দেখল, যতটা পড়েছে বাবু মার্ক করে রেখেছে। মিউ পড়তে লাগল। কিন্তু কোথায় যেতে পারে তার হদিস পেল না।

মিউ জানলা দিয়ে দেখল, ওরা সমুদ্রের ধারে ঘুরছে। মিউ ডায়েরিটা নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। ডায়েরিটা বড্ড পুরনো। পাতাগুলো মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। ছেঁড়ার ভয় নেই কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। মিউ দ্রুত চোখ বুলোচ্ছিল। কাছে একটা টিলা আছে। সেইটার সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা আছে। ওখানে নাকি কোনো মহামূল্যবান খনিজ পদার্থের খোঁজ পাওয়া গেছে। তারপর কী হলো? সে সব কোনো কথাই ডায়েরিতে নেই। মিউ ধন্দে পড়ে। বাবুদাদা কী ঐ টিলার কাছে গেছে! কিন্তু ওখানে গিয়ে কী করবে! তাহলে? অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বেলা বাড়ে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়। বাবু ফেরে না। ওরা এক এক করে চান করে নিয়ে খেতে বসে। মিউয়ের মুখে চিন্তার রেখা। রাজা বলে, বাবুটা গেল কোথায় বল তো?

তাই তো ভাবছি। মিউ আস্তে আস্তে বলে।

ছেলেটা এখনো ফিরল না, তোমরা যে কী করে নিশ্চিন্তে আছো কে জানে! মানুদি নিজের মনে গজগজ করে।

আমরা কী করবো বলো!

ভূতে ধরেনি তো বাবুদাদাকে! মোমা ভয়ে ভয়ে বলে।

কী অলুক্ষণে কথা রে বাবা! বাতিঘরের ঐ ভূত ধরে থাকলে তো আর দেখতে হবে না। হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে মানুদি।

কী আজেবাজে কথা বলছিস মোমা!

খাওয়ায় ওদের মন ছিল না। কোনোরকমে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে উঠে পড়ল। বারান্দায় গিয়ে বসল। মিউ বলল, রাজাদাদা, আমাদের এখন কী করা উচিত বলো তো?

চুপ করে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

একবার ভাঙা বাড়িটায় গিয়ে খুঁজলে হতো না?

মিউয়ের কথা শুনে মাথা নাড়ে রাজা। বলে, ওখানে দুষ্টু লোকগুলো আছে না।

হুঁ! যা করতে হবে, লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হবে। একটু থেমে মিউ বলে, এত তাড়াতাড়ি কিছু করার দরকার নেই। বাবুদাদার ফেরার সময় এখনো যথেষ্ট আছে।

তা ঠিক। আমি ভাবছি, সেই ভোরবেলায় বেরিয়েছে, এত বেলা হলো—গেল কোথায়! কিছু খেতে-টেতে পেয়েছে কিনা কে জানে!

মিউ ঘড়ির দিকে তাকায়। দুটো বেজে গেছে। বাইরে গরম লাগছে। ওরা ঘরের মধ্যে চলে যায়। মিউ বলল, সন্ধ্যের মধ্যে না ফিরলে কমলদাকে ফোন করতে হবে।

কোথা থেকে ফোন করবি? পোস্ট অফিসের ফোন তো খারাপ।

দাঁড়াও মানুদিকে জিজ্ঞেস করি। মানুদি অনেক খবর রাখে। নিশ্চয়ই বলতে পারবে, কোথায় ফোন আছে।

মিউ শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিভাবটা কাটেনি। মনটা খারাপ হয়ে আছে, বাবুদাদার জন্যে ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। সেইজন্যে দুর্বলতাও বেশি বলে মনে হচ্ছে। বাবুদাদা যে কোথায় গেল! মিউয়ের মনে কু ডাকছে। ওর খালি মনে হচ্ছে, বাবুদাদা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। মন থেকে এ চিন্তা দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, পারে না।

কিকিটা ঘরে নেই। ও প্রায় সারাদিনই পেয়ারা গাছটায় বসে থাকে। মিউয়ের ভয় করে। এখানে যা চিলের উৎপাত। মিউ উঠে গিয়ে কিকিকে ঘরে নিয়ে আসে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়, বাবু ফেরে না। ভীষণ চিন্তায় পড়ে ওরা। কী যে করবে ভেবে পায় না। অথচ কিছু তো করতে হবে। সেই কিছুটা যে কী সেইটাই ওদের মাথায় ঢোকে না। মিউয়ের মন বলছে, বাবুদাদা বিপদে পড়েছে। কোথায়, কী বিপদ—কিছুই বুঝতে পারে না। আজ রাত্তিরে না ফিরলে কাল সকালে একটা ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। কিন্তু ব্যবস্থাটা যে কী!

রাত্তিরেও ফিরল না বাবু। পরদিন সকালেও না। মিউ জিজ্ঞেস করল, কী করা যায় বলো তো রাজাদাদা।

কমলদাকে একটা খবর দেওয়ার দরকার।

কি করে খবর দেবে? পোস্ট অফিসের ফোন তো খারাপ।

তাই তো ভাবছি। ধারেকাছে থানাও নেই যে সেখান থেকে লালবাজারে ফোন করবো।

চল সবাই মিলে চারপাশটা খুঁজে দেখি।

আমার মনে হয় ঐ ভাঙা বাড়িটায় আগে দেখা দরকার।

তাহলে ঐখানেই চল।

ওখানে তো সেই লোকগুলো থাকে বোধহয়। এত সকালে গেলে ওদের খপ্পরে পড়ে যেতে হবে না! আর একটু বেলা হোক।

ওদের চোখ-মুখ দেখলে বোঝা যায় কাল রাত্তিরে ওরা কেউই ভাল করে ঘুমোয়নি। একটু পরে মানুদি এসে গেল। বাবু ফেরেনি শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ওরা এ বাড়ির পুরনো লোক। বিশেষ কেউ আজকাল আসে না। বাড়িটার দেখাশোনা ওরাই করে। মানুদি জিজ্ঞেস করল, এখন কি করবে?

আশেপাশে একটু খুঁজে দেখি।

বাতিঘরের দিকে যেও না কিন্তু। জায়গাটা ভাল নয়।

আচ্ছা!

পুলিশে খবর দাও না।

আর একটু দেখি।

আর কী দেখবে! চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল ছেলেটা ফেরেনি!

মানুদি গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চা করতে গেল।

চা-বিস্কুট খেয়ে ওরা যখন বেরুল তখন বেলা বেশ চড়ে গেছে। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। সমুদ্রর ঝড়ো হাওয়া আছে বলে তেমন গরম লাগে না। ওরা ভাঙা বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। কিকি বসেছিল মিউয়ের কাঁধে। বাড়িটার কাছাকছি এসে মিউ কিছু বলতেই কিকি উড়ে গেল। মিউ বলল, আস্তে আস্তে চলো। কিকি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা ভাঙা বাড়িটার মধ্যে ঢুকবো না।

কিকি বুঝি দেখতে গেল, বাড়িতে কেউ আছে কিনা!

হ্যাঁ।

ওরা এসে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। কিকিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এল। না, বাড়িতে এখন কেউ নেই। ওরা নিশ্চিন্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। যে ঘরগুলো খুলতে পারল না তার সামনে গিয়ে বাবুর নাম করে ডাকল। সাড়া পেল না। দোতলায় উঠে দেখল কেউ নেই। ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে, বাড়িতে কেউ নেই। ওরা খুব আশা করেছিল, বাবুকে এখানেই কোথাও পাবে, পেল না।

রাজা বলল, বাতিঘরে যায়নি তো?

বাতিঘরে...ওখানে তো...

মোমা কথা শেষ করে না। ওর কথায় অবশ্য কেউ পাত্তাও দেয় না। নিচে নেমে এসে সিঁড়ির চারপাশটা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জায়গায় ওদের চোখ আটকে গেল। সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। রাজা বলল, সুড়ঙ্গ মনে হচ্ছে!

নেমে দেখবো?

বিপদে পড়ে যাবো না তো?

তাই তো ভাবছি। মিউ দু' একটা ধাপ নিচে নামে। কিছু চোখে পড়ে না। তবে সিঁড়িটা অনেক নিচে নেমে গেছে। মিউ পরিষ্কার বুঝতে পারে, সুড়ঙ্গটা ব্যবহার হয়। না হলে বোঝা যেত। ধুলো-ময়লা জমে থাকতো। মিউয়ের হঠাৎ মনে হয়, এটা একটা ট্র্যাপ নয় তো! কথাটা মনে হতেই ও সতর্ক হয়ে ওঠে। ততক্ষণে রাজা, মোমা আর বুয়াও নেমে এসেছে।

চল আরো নিচে নামি।

মিউ বলে, রাজাদাদা, বি কেয়ারফুল। আমার মনে হচ্ছে, এটা একটা ট্র্যাপ। এই টানেলটা সে দিনও ছিল। আমরা কেউ দেখতে পাইনি। তার মানে এমন কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল—যা চোখে পড়ে না। আজ খোলা কেন?

তোমাদের জন্যে। নিচে থেকে একটা ভারী গলা ভেসে এল।

নিচে নেমে এস। পালাবার চেষ্টা কোর না। কোনো লাভ হবে না। ওপরে তাকিয়ে দেখো।

সুড়ঙ্গর মুখটায় একটা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে উঠে পালাবার পথ বন্ধ। নিচে নেমে ধরা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। মিউ তাকাল রাজাদাদার দিকে। মোমার মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। বুয়া যথারীতি নির্বিকার। পালাবার পথ নেই। উপায় নেই বাধা দেবার। ওরা নিচে নেমে আসে। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। দুটো ষণ্ডামার্কা লোক সামনে দাঁড়িয়ে। একজন জিজ্ঞেস করে, এখানে এসেছো কেন?

মিউ উত্তর দেয়, আমার দাদাকে কাল সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে খুঁজতে এখানে এসেছি।

এত জায়গা থাকতে এই ভাঙা বাড়িতে কেন?

পুরনো দিনের বাড়ি, পুরনো জিনিসপত্তর ও খুব পছন্দ করে। তাই ভেবেছিলাম, যদি এখানে এসে থাকে।

কিকির খুব বুদ্ধি। এ সব ক্ষেত্রে কী করতে হয় ও জানে। কেউ বুঝতে পারেনি, কোন ফাঁকে সে উঠে গিয়ে বুয়ার সাদা দোপাট্টার আড়ালে বসেছে। বুয়া তাকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে কারো চোখে পড়ার উপায়ই নেই।

লোকগুলো ওদের নিয়ে গিয়ে ল্যাবোরেটরির লাগোয়া একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। বলল, পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। বুঝেছো। চারদিকে আমাদের লোক আছে। তোমাদের প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আমরা জানি।

কথা না বাড়িয়ে লোকগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরটা খুব একটা বড় নয়। কয়েকটা চেয়ার, গোটা দুয়েক ডিভান রয়েছে। মিউ চারপাশটা দেখছিল। ওপাশে একটা দরজা। মিউ এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে ঠেলল। ভেজানো। অল্প ফাঁক হতে মিউ উঁকি দিল। টেস্ট টিউব, বার্নার, আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস চোখে পড়ল। তার মানে এটা একটা ল্যাবোরেটরি। ভীষণ অবাক হয় মিউ। এখানে এই মাটির নিচে এইরকম একটা ল্যাবোরেটরি কেন? ব্যাপারটা কী? তার ওপর সশস্ত্র পাহারা!

মিউ ল্যাবোরেটরিতে ঢুকে পড়ে। চাপা গলার স্বর কানে আসে। একটা গলা চেনা-চেনা লাগে। মিউ এগিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা করে। তারপরেই চাপা গলায় ও ডেকে ওঠে, বাবুদাদা!

ডাকটা কানে যেতেই বাবু চমকে ওঠে। দেখতে পায় মিউকে, মিউ তুই?

বৈজ্ঞানিক বাবুর দিকে মুখ করে ছিলেন। মিউ পেছন থেকে ওঁকে দেখছে। মুখটা দেখতে পায়নি। মিউ ক'পা এগিয়ে আসতে আসতে বলে, তোমার খোঁজে ভাঙা বাড়িটায় এসে আমরা ধরা পড়ে গেছি।

আমরা মানে? সবাই!

হ্যাঁ! কিকিও!

কিকি কে?

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় মিউ। বাবু বলে, এ আমার মামাতো বোন মিউ। কিকি ওর পোষা কাকাতুয়া।

মিউয়ের দিকে ফিরে বাবু বলে, ইনি অধ্যাপক রঙ্গনাথন—নিউক্লিয়ার সায়েন-টিস্ট!

মিউ কিছু মনে করার চেষ্টা করে। বাবু বলে, তুই ঠিকই ভাবছিস, ইনিই সেই নিরুদ্দিষ্ট সায়েনটিস্ট!

প্রফেসর রঙ্গনাথন এবার মিউয়ের দিকে চাইলেন। মিউ আঁতকে উঠতে গিয়ে সামলে নিল। ওর স্বাভাবিক হতে একটু সময় লাগে। তারপর জিজ্ঞেস করে, ওঁর মুখটা এরকম হয়ে গেল কি করে?

এই দুষ্টু লোকগুলোর কীর্তি। যাতে আর সভ্য সমাজে ফিরতে না পারেন...

প্লাস্টিক সার্জারির কথা ওরা ভুলে গেছে!

ম্লান হাসলেন প্রফেসর, এখান থেকে বেরুতে পারলে তবে তো!

বাবু বলল, উনি বাতিঘরে উঠে গাঁয়ের লোককে ডাকার চেষ্টা করতেন। এখনও করেন। ওঁকে দেখে ভূত ভেবে সকলে পালায়।

অ্যাঁঃ, ইনিই তাহলে বাতিঘরের ভূত!

হ্যাঁ।

এখন কী হবে বাবুদাদা?

একটা প্ল্যান করেছি।

কী!

উনি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা ট্রান্সমিটার সেট বানিয়েছেন। তার ফ্রিকোয়েনসি আর ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি যা আছে তাতে মনে হয় আমরা লালবাজারে কমলদাকে ধরতে পারবো। আর একটা বড় খবর, এদের বস এখানে নেই। শহরে না কোথায় যেন গেছে। ফিরতে আরো তিন-চার দিন। এই সুযোগটা আমাদের নিতে হবে।

কি করে নেবে?

সেইটাই তো ভাবছি।

এখানে ওরা ক'জন আছে?

পাঁচ-ছ'জন তো বটেই। বেশিও হতে পারে।

তুমি ওদের হাতে পড়লে কী করে?

বাবু সব বলল। সেই সঙ্গে ডঃ রঙ্গনাথনের কথাও সব জানাল। ওঁকে কীভাবে ধরে আনা হয়েছিল, মুখটা ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া হয়েছিল—সব কথা।

রঙ্গনাথন বললেন, এরা দেশের মূল্যবান সম্পদ বিদেশে পাচার করছে। সেই সঙ্গে মারণাস্ত্র এনে উগ্রপন্থীদের কাছে মোটা দামে বিক্রি করছে। এরা কিন্তু নির্মম। হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে। দয়া-মায়া—ওসব কিছু নেই। খুব সাবধান।

মিউকে এ ঘরে ঢুকতে দেখেছিল। অনেকক্ষণ আসছে না দেখে রাজা, মোমা আর বুয়া এক এক করে এ ঘরে এসে দাঁড়াল। কিকি বুয়ার হাত থেকে উড়ে এসে মিউয়ের কোলের ওপর বসল। প্রফেসর রঙ্গনাথনের মুখের দিকে তাকিয়ে মোমা আঁতকে উঠে ভূ...বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। রাজা তাড়াতাড়ি ওর মুখ হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দেয়। মোমার মুখ থেকে একটু অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসে। ও চোখ বুজে ফেলে।

প্রফেসর বললেন, তোমরা সকলে এ ঘরে থেকো না। ওদের মনে কোনোরকম সন্দেহ দেখা দেওয়াটা ঠিক হবে না। যে কোনো মুহূর্তে কেউ এ ঘরে আসতে পারে। বাবুকে ওরা এ ঘরে রেখে গেছে, বাবু থাক। অন্যরা ও ঘরে চলে যাও। সবাই চুপচাপ থাকবে। দেখা যাক কী করা যায়।

মিউ উঠে ওদের নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

প্রফেসর বাবুকে বললেন, এই তিন-চার দিনের মধ্যে যা করার আমাদের করতে হবে। এদের সর্দার এলেই বিপদ।

বিপদ! কী বিপদ...

প্রফেসর ইতস্তত করেন। বাবু আবার একই প্রশ্ন করে। প্রফেসরকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখায়। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওদের বস তোমাদের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখবে না। লোকটা এক নম্বরের শয়তান, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

কী বলছেন আপনি!

যা সত্যি তাই বলছি। লোকটা যে কত নির্মম আমায় দেখে বুঝছো না! এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবার সময় সে যে আমাকেও মেরে ফেলবে তাও আমি জানি।

বাবুকে চিন্তিত দেখায়। প্রফেসর বললেন, দেখি আমি কী করতে পারি নিজে। আমি থাকতে এতগুলো নিরীহ ছেলে-মেয়েকে কিছুতেই মারতে দেব না।

এতদিন কিছু করিনি অন্য কারণে।
কি কারণ?
আমার জীবনের আর কী দাম বলো। এই মুখ নিয়ে তো আর কোনোদিন সভ্য সমাজে ফিরে যেতে পারব না। তা ছাড়া এতদিনে আমাকে তো সকলে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে। সুতরাং...
বাবু উঠে গিয়ে ডিভানে শুয়ে পড়ে। প্রফেসর রঙ্গনাথন কাজ শুরু করেন। একটু পরেই একটা লোক ক'টা ডিম আর এক পাউন্ড পাঁউরুটি নিয়ে এসে কোণের একটা টেবিলের ওপর রাখল। বলল, আপনাদের দুজনের আর পাশের ঘরে ক'টা ছেলেমেয়ে আছে। ওদেরও দেবেন। যে কদিন বেঁচে আছে, একটু খেয়ে-টেয়ে নিক।
অধ্যাপক কোনো উত্তর দিলেন না। বাবুর সঙ্গে ওঁর ইশারায় কথা হয়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অধ্যাপক রঙ্গনাথন উঠে গিয়ে হিটারে একটা সসপ্যানে জল দিয়ে ডিমগুলো সেদ্ধ করতে দিলেন। তারপর বাবুর দিকে ফিরে বললেন, শুনলে তো! বলেছিলাম না এরা বড় নির্মম। আমিও কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারি—এবার ওরা টের পাবে।
কি করবেন?
দেখোই না কী করি। বারোটা থেকে একটা-দেড়টা পর্যন্ত ওরা চান-খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া সর্দার নেই বলে ওদের একটু গা-ছাড়া ভাব। সেই সুযোগটা নিতে হবে। তুমি সাড়ে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাবার চেষ্টা করবে। রিসিভিং সেট বানাতে পারিনি। তাই উত্তর তো কিছু পাবে না। বারবার খবরটা পাঠাবে। হয়তো ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। তোমার দাদার পোস্টটা কি?
ডিসি ডিডি।
গুড। খবরটা হয়তো তিনি পাবেন। কিভাবে খবরটা পাঠাবে?
কোড ল্যাংগুয়েজে।
উনি জানেন?
হ্যাঁ।
গুড! লেট আস ট্রাই টুডে। ট্রান্সমিটারটা আমি রেডি করে ফেলেছি। এছাড়া আমি যা করার করবো!
কী!
এখন বলবো না। এটুকু জেনে রেখো—ওদের বারোটা বাজিয়ে দেব। এখন আমি জীবনের পরোয়া করি না। চিন্তা শুধু তোমাদের জন্য।
আপনার জানের পরোয়া আমরা করি!
মানে?
ভুলে যাবেন না—আপনি দেশের সম্পদ। আমরা থাকতে আপনার মতো বরেণ্য বৈজ্ঞানিকের গায়ে আঁচড় কাটতে দেবো না।
প্রফেসর রঙ্গনাথনের মুখে হাল্কা হাসি খেলে যায়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি বাবুর দিকে তাকান। ছেলেটাকে যত দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন। এখনো স্কুলে পড়ে, অথচ কী পরিণত। এদের অপঘাতে মরতে দেওয়া যাবে না। যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে।
কী কাজ শুরু হয়েছে না গল্পই চলছে?
একটা লোক এসে ঘরে ঢুকল। প্রফেসর রঙ্গনাথন নিজের মনে কাজ করছেন। লোকটার দিকে ফিরেও তাকালেন না। বাবু ডিভানের ওপর চোখ বুজে শুয়েছিল। বাবুকে লক্ষ্য করে লোকটা বলল, নে নে শুয়ে নে। আর ক'দিনই বা।
বাবু শুনেও শুনল না। ওর মাথায় হাজার চিন্তা। আজ সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিল, মিউরা বাইরে আছে, ওরা একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। কিন্তু ওরাও ধরা পড়ে গেছে। এখন কী যে করবে! শুধু ওরাই নয়, প্রফেসর রঙ্গনাথনকেও উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কী করে! বাবু অবাক হয়ে ভাবে, মাটির তলায় ওরা কী কাণ্ডই না করেছে। আধুনিক ল্যাবোরেটরি বানিয়েছে। লাইট জ্বলছে, ফ্যান আছে, এসি মেশিন পর্যন্ত রয়েছে। নিশ্চয়ই বড় জেনারেটর কিংবা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেছে। কোথায় আছে সেটা? আর একটা কথা ওর মাথায় ঘোরে, বেলা বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ওরা খাওয়া-দাওয়া করে। তখন কি কেউ পাহারায় থাকে না?
বাবু উঠে গিয়ে প্রফেসরের পাশে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, আপনি যে বললেন বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ওরা খাওয়া-দাওয়া করে, তখন কী পাহারায় কেউ থাকে না?
এতদিন থাকত না। ওরা জানে, আমার পক্ষে এই ভয়ঙ্কর মুখ নিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়। আজ থেকে তোমাদের জন্যে নিশ্চয়ই থাকবে। দুটো টানেলের মুখে থাকলেই পথ বন্ধ। ওরা নিশ্চয়ই পালা করে পাহারা দেবে।
আচ্ছা মাটির তলা থেকে ট্রান্সমিটারে খবর পাঠালে তা কী যাবে?
সে ব্যবস্থা করা আছে। ও সব নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।
আমার মনে হয় ওদের বস ফেরার আগেই আমাদের যা করার করে ফেলতে হবে।
সে তো নিশ্চয়ই। লোকটা বড় নির্মম। একবার একটা কুকুর টানেলের মুখ দিয়ে কোনোভাবে নিচে পড়ে গিয়েছিল। লোকটা সেই অসহায় প্রাণীটিকে পর্যন্ত খুন করেছে। যাও, তুমি গিয়ে শোও তো! আমি একটু কাজ সেরে নিই, একদম সময় নেই।
বাবু গিয়ে ডিভানে শুয়ে পড়ল। বাবুর ইচ্ছে করছিল, পাশের ঘরে মিউদের কাছে যেতে। এখন যাওয়া যাবে না। সাড়ে এগারোটা বাজে। বারোটা বাজলেই খবর পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে। ও মনে মনে খবরের বয়ানটা ভেবে নেয়। এই জায়গার লোকেশানটাও বলে দিতে হবে। এখন চিন্তা একটাই, কমলদা খবরটা পাবে তো?
বারোটার সময় প্রফেসর উঠলেন। বললেন, বাবু, এস।
বাবু কথা বলল না। ওঁর পেছনে পেছনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ক'পা ওপরে উঠে আসার পরই দেখল ওরা বাতিঘরের কাছাকাছি। ওঁর সঙ্গে বাতিঘরের ওপর উঠে গেল বাবু। অবাক হয়ে দেখল ওখানে একটা গোপন জায়গা থেকে অধ্যাপক ছোট্ট একটা ট্রান্সমিটার বের করলেন। তারপর বাবুকে বললেন, এটা অপারেট করা খুব সোজা। আমি উইচে লাগিয়ে দিচ্ছি। লাল আলো জ্বললে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে শর্ট ওয়েভে

পারবো না!

সেটা পুলিশের কাজ। আমাদের নয়। আমরা এখানকার শয়তানদের পুলিশের হাতে তুলে দেব।

তারপর...

তারপরের কথা এখনই তোমার জানার দরকার নেই। দেখতেই পাবে।

বাবু বুঝতে পারে প্রফেসরের মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। বদলা উনি নেবেনই।

বাবু খেয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে গেল। ওরা তখন খাচ্ছে। বাবু বলল, কিকি কী খাবে?

আমার কাছে একটা আপেল আর একটা পেয়ারা আছে। আজকের দিনটা চলে যাবে। বুয়া উত্তর দেয়।

কিকিও আমাদের সঙ্গে আছে, ওরা যেন জানতে না পারে। কথা শেষ করে বাবু মিউ আর রাজাকে কাছে ডাকল। বলল, কাল রাত্তিরে আমাদের অ্যাকশান শুরু হবে। যে চারটে লোক আমাদের খাবার দিতে আসে, তাদের পেছন থেকে অ্যাটাক করে বেঁধে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে দিতে হবে।

এ তো জলভাত।

রাজাকে থামিয়ে দেয় বাবু। বলে, অতো সোজা ভাবিস না। প্রফেসর দাদু বলেছেন, এরা যেমন সাংঘাতিক তেমনি নির্মম। তা ছাড়া জানিসই তো প্রতিপক্ষকে কখনো খাটো চোখে দেখতে নেই।

বাবুদাদা ঠিক বলেছে। মিউ বলে। তারপর বাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি ভেবো না বাবুদাদা, আমরা তৈরি থাকবো।

কোন ঘরে আগে খাবার দিতে আসবে সেইটাই প্রশ্ন।

যে ঘরেই আসুক আমরা একসঙ্গে অ্যাটাক করবো। চারটে লোককে বাঁধতে হবে, দড়ি চাই; মুখে কাপড় গুঁজতে হবে, কাপড় চাই।

দড়ি আমাদের সঙ্গেই আছে। আর কাপড়ের যোগাড় না হলে আমাদের দোপাট্টাগুলো ছিঁড়ে ওদের মুখে গুঁজে দেব।

ঠিক আছে।

বাবু আর দাঁড়াল না। ল্যাবোরেটরিতে চলে এসে শুয়ে পড়ল। প্রফেসর রঙ্গনাথন খুব ব্যস্ত। ভাঙছেন না, কিন্তু উনি যে একটা কিছু করছেন তা বোঝা যায়। বাবু ঘুমোবার চেষ্টা করে। মাথায় হাজার চিন্তা—ঘুম কী আসে!

বিকেলের পর প্রফেসর রঙ্গনাথন রোজ খানিকক্ষণ ধরে হাঁটেন। পুরো টানেলটা ঘুরে বেড়ান। কখনো-সখনো বাতিঘরে যান। ওপরে ওঠেন। কেউ আপত্তি করে না। এটা ওঁর অভ্যেস। ওদের বস বলে, একটু হাঁটাহাঁটি ভাল। বয়েস হয়েছে তো! শরীরটা ভাল থাকবে।

সেদিন ল্যাবোরেটরি থেকে বেরুবার সময় তিনি দেখলেন বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলেন না। একাই টানেলের মধ্যে হাঁটতে লাগলেন। একটু দূরে তিনজন বসে পাহারা দিচ্ছিল। তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা কথা শুনে হাঁটার গতি কমিয়ে দিলেন। লোকগুলোকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। ওরা কী সব বলাবলি করছে। হাসাহাসিও করছে। দু' চারটে কথা কানে এল, তাতেই যা বোঝার বুঝে গেলেন তিনি।

গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে নাকি খুব উত্তেজনা। ক'টা ছেলেমেয়ে এখানে বেড়াতে এসে হারিয়ে গেছে। ওদের হাসাহাসির কারণ এই খবরটা। কিন্তু ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অন্য একটা খবরে। আজ দুপুরে রেডিওতে বারবার অদ্ভুত সব ভুতুড়ে শব্দ শোনা গেছে। কী শব্দ, তার মানে কী কেউ তা বুঝতে পারেনি। ভুতুড়ে কথাগুলো রেডিওতে কেন শোনা গেল কে জানে! ব্যাপারটা নিয়ে ওরা রীতিমতো চিন্তায় পড়েছে। বস এখানে থাকলে নাকি অতো চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু তার ফিরতে এখনো দু' তিনদিন দেরি। সেই জন্যে আরো বেশি করে ওরা চিন্তায় পড়েছে। বাচ্চাগুলোর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে এতটা হৈচৈ হবে ওরা বুঝতে পারেনি। তার ওপর ছেলেটার সঙ্গে দাদুর বেশ ভাব হয়ে গেছে। ওদের হামেশাই গুজগুজ ফুসফুস করতে দেখেছে। বস ব্যাপারটা কী ভাবে নেবে কে জানে! চটে না যায়।

পরদিন ভোরবেলায় প্রফেসর রঙ্গনাথনের সঙ্গে গিয়ে বাবু আর একবার খবর পাঠিয়ে এল। আজ রাত্তিরেই যে ওরা পালাবার চেষ্টা করবে সেটাও জানিয়ে দিল। স্থানীয় রেডিও সেটগুলোতে ওদের মেসেজ ধরা পড়েছে জেনে বাবু খুব উৎসাহী। নিশ্চয়ই ওদের খবর লালবাজারে কমলদার কাছে পৌঁছুবে। ভয় একটাই, কমলদা যদি এখন কলকাতায় না থাকেন! ওদের কোড ল্যাংগুয়েজ আর কেউ কী পড়তে বা বুঝতে পারবে!

(ছয়)

প্রফেসর রঙ্গনাথনকে চিন্তিত মনে হয়। বাবু জিজ্ঞেস করে, অতো কী ভাবছেন দাদু?

ভাবছি লোকগুলোকে নিয়ে কী করবো। তোমরা তো ওদের বেঁধে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে দেবে। আমরাও না হয় এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। লোকগুলোর কী হবে! ওদের তো এখানে মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে পারি না।

কেন, পুলিশ এসে ওদের ধরে নিয়ে যাবে!

ধরো পুলিশ এল না। তোমাদের কমলদা খবরটা নাও তো পেতে পারেন।

লোকাল থানায় খবর দিলে হয় না?

প্রফেসর হাসলেন। বললেন, তাহলে কী এই অবস্থায় আমায় এইভাবে বন্দী থাকতে হতো!

বুঝেছি! কী হবে তাহলে...

ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

এখানে ওরা মোট কতজন আছে?

ওদের বসকে বাদ দিলে জনা আটেক তো হবেই।

চারজনকে আমরা এখানে ধরে ফেলব। বাকিদের কোথায় পাব?

একজন লাইট হাউসে গার্ড দেয়। বাইরে নজর রাখে। অন্য তিনজন ভাঙা বাড়িতে রান্না-টান্না করে।

তাহলে তো লাইট হাউসের গার্ডকে কব্জা করে আমরা টানেল দিয়ে গিয়ে মাঠে উঠে পড়তে পারি।

তা পারি। দিন তিনেক আগে টানেলের মুখটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন কে জানে মুখটা একদম খোলা ছিল। শুধু তাই নয়, যে কাঠটা দিয়ে ওরা

ওপরে ওঠে, সেটাও সেট করা ছিল। ওদের কোনো কারণে সন্দেহ হয়েছে। সেদিনই ওদের বস ওখান দিয়ে গেছে। কিন্তু সে কী অতবড় ভুল করবে? ওখান দিয়ে বেরুনো এখন মুশকিল।

আমিই তো ওখান দিয়ে পালিয়েছিলাম! আপনাকে বলেছি না, আগে আমি একবার টানেলে ঢুকেছিলাম।

থ্যাঙ্ক গড। ওরা দেখতে পায়নি। দেখতে পেলেই কিন্তু গুলি করত।

ওরা তো গ্রামের দোকানে চা খেতে গিয়েছিল!

সবাই যায় না। অন্তত দুজন টানেলের এদিক-ওদিকে পাহারায় থাকে। খুব বেঁচে গেছ।

দুপুরবেলায় আরও ক'বার ট্রান্সমিটারে খবরটা পাঠায়। বাবু ভাবে, এই নিয়ে তিনবার খবর পাঠাল। কমলদার হাতে খবরটা কী একবারও পড়বে না!

বিকেলের দিকে প্রফেসর একাই দু' তিনবার বেরুলেন। বাবুকে সঙ্গে নিলেন না। বাবুর মনে হলো, উনি কিছু একটা করছেন। কী করছেন, উনি বলছেন না। বাবুও জিজ্ঞেস করতে পারে না। ওর জানার ইচ্ছে হয়। কৌতূহল দমন করে। বাবু লক্ষ্য করল, সময় যত কাটে, ওঁর টেনশান ততই বাড়ে।

বাবু পাশের ঘরে ঘুরে এল। দড়ি যোগাড় হয়ে গেছে। একটা দোপাট্টা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে রেখেছে বুয়া। কিকিকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে। বাবু জিজ্ঞেস করে, তোরা রেডি তো?

হ্যাঁ!

সাতটার পর থেকে আমাদের অ্যালার্ট থাকতে হবে। কোন ঘরে আগে আসবে তা তো ঠিক নেই। যে ঘরেই আসুক আমরা অ্যাটাক করবো। চিন্তা একটাই, একসঙ্গে না আসে।

ঠিক আছে, আসুক না। দেখা যাবে।

কিকি কিছু খেয়েছে?

বুয়ার কাছে একটুকরো পেয়ারা ছিল, তাই খেয়েছে।

বাবু একবার চেষ্টা করেছিল এ কে ৪৭ রাইফেলগুলো ওরা কোথায় রেখেছে জানার। পারেনি। টানেলের মধ্যে কোথায় যে অতগুলো রাইফেল আছে কে জানে!

সময় যত কাটে, বাবুর টেনশান ততই বাড়ে। প্রফেসর দাদু আজ কাজ করেই চলেছেন। বাবু উঠে গিয়ে ওঁর পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, স্লিপিং গ্যাস কীভাবে ছাড়বেন ভাবছেন? দেখবেন আমরা যেন আবার ঘুমিয়ে না পড়ি।

আমার মাথায় সেই চিন্তাই তো ঘুরছে।

আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?

কী!

রুমাল ভিজিয়ে নাকে চেপে থাকলে হবে না?

ঠিক বলেছ! নিশ্চয়ই হবে। তুমি জানলে কি করে?

পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লে আমরা ভেজা রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকি তো!

হাসলেন প্রফেসর রঙ্গনাথন। টেনশানে উনিও টানটান। ঘরের বড় ঘড়িটার কাঁটা সাতটার ঘর ছুঁইছুঁই করছে। রাজা এসে দুটো ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। বাবু বুঝল ইশারাটা। ও তৈরি হয়ে দাঁড়াল। প্রফেসর রঙ্গনাথন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। দুজন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। রুটি আর তরকারি একজনের হাতে। অন্যজনের হাতে রাইফেল। ওরা এসে বাবুদের ঘরে ঢুকতেই বাবু এগিয়ে এল। মিউ এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে ঢুকে ওদের দেখে একটা লোক হেঁকে উঠল, এই তোমরা এখানে কেন? যাও যাও...

তার কথা শেষ হলো না, বাবু ঝাঁপিয়ে পড়ল রাইফেলধারীর ওপর। আচমকা আক্রমণে তার হাত থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়ল। লোকটা বিস্ময় কাটিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই প্রফেসর কী একটা তার মুখের ওপর স্প্রে করে দিলেন। লোকটা নেতিয়ে পড়ল।

তখন অন্য লোকটার সঙ্গে রাজা লড়ছে। বাবু এসে হাত লাগাল। মিউ পেছন থেকে লোকটার একটা পা টেনে ধরতেই সে উল্টে পড়ে গেল। বুয়া ছুটে এসে তার মুখে কাপড় গুঁজে দিল। তারপর চটপট দুজনকে বেঁধে ফেলে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল।

রাজা আর বাবু ততক্ষণে পাশের ঘরে চলে গেছে। এ ঘরে চারজন। খাবারও বেশি। তাই দুজনের কাঁধে রাইফেল, হাতে খাবার। বাবু আর রাজা দরজার দু' পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। লোক দুটো ঘরে ঢুকে দু' চার পা যেতে না যেতেই বাবু আর রাজা লাফিয়ে পড়ে দুজনের গলা চেপে ধরল। লোক দুটো অনেক বেশি শক্তিশালী। তারা এক এক ঝটকায় বাবু আর রাজাকে ঝেড়ে ফেলে ঘুঁষি তুলল মারতে।

এক মুহূর্তও দেরি না করে মিউ আর বুয়া লোক দুটোর হাত চেপে ধরল। ততক্ষণে বাবু আর রাজা উঠে পড়ে দুম-দাম করে ঘুঁষি মারতে লাগল, কিন্তু পেরে উঠছে না। হঠাৎ প্রফেসর রঙ্গনাথন এসে দুজনের মুখে স্প্রে করে দিলেন। রাজা, বাবু, মিউ আর বুয়া এক লাফে পেছনে সরে এল। গ্যাসটা যেন ওদের নাকে না যায়। লোক দুটো দু' একবার ওঠার চেষ্টা করে শুয়ে পড়ল। বাবু দুজনের রাইফেল দুটো টেনে নিল। তারপর ওদের বেঁধে ফেলে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরের বাথরুমে।

ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে ল্যাবোরেটরিতে এল। প্রফেসর বললেন, তোমরা চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে নাও। ওদের খোঁজে কেউ না কেউ এক্ষুণি আসবে।

চারজনকে আমরা কব্জা করেছি। আর ক'জন?

আরো চারজন তো বটেই। তিনজন ধরে নাও। লাইট হাউসের গার্ডকে আমি আগেই শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

সে কী! কখন?

খানিকক্ষণ আগে একবার বেরিয়েছিলাম না, তখন।

হঠাৎ বাবু সজাগ হয়ে উঠল। ওর মনে হলো, কেউ যেন এগিয়ে আসছে।

রাজা, গেট রেডি।

হঠাৎ ল্যাবোরেটরির বাইরে থেকে একজনের গলা ভেসে এল। কারো নাম ধরে ডাকছে।

কিকি যে কখন এসে দরজার পাল্লার ওপর বসেছে কেউ খেয়াল করেনি। গলা ফুলিয়ে সে বলে উঠল, কে, কে ওখানে!

অচেনা গলা। লোকটা ছুটে এসে ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকাতে লাগল। প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

ওরা খাবার দিয়ে যায়নি?

দিয়ে গেছে তো! ঐ তো টেবিলের ওপর খাবার।

লোকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, কোথায় গেল ওরা? কথাই বা বলল কে?

ওরা কোথায় গেছে আমার জানার কথা নয়। কথা বলেছিলাম আমি।

লোকটা পেছন ফিরে দরজার দিকে পা বাড়াতেই বাবু পা টিপে টিপে এসে ল্যাং মারল। লোকটা ছিটকে পড়তেই রাজা ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাবু এসে চেপে ধরল। লোকটা ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মিউ তাড়াতাড়ি ওর মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিল। বুয়া এসে পা দুটো টাইট করে বেঁধে ফেলল। তারপর চারজনে মিলে লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল।

প্রফেসর বললেন, রইল বাকি দুই। চল আমরা বেরিয়ে গিয়ে ওদের মোকাবিলা করি।

সেই ভাল। মিউ, তুই কিকিকে নে। বুয়া, মোমার হাতে দড়ি আর ন্যাকড়া দিয়ে আমাদের পেছনে আয়।

মোমা বলে উঠল, আমি এখানে থাকি না!

না, এখানে কেউ থাকবে না। চল আমাদের সঙ্গে। প্রফেসর কড়া গলায় বললেন।

মোমার ভয় যায়নি। ও প্রফেসরের মুখের দিকে তাকায় না। চোখ বুজে ফেলে।

প্রফেসর চললেন সবার আগে আগে। তাঁর হাতে ছোট্ট স্প্রে ক্যান। পেছনে ওরা। বাবু টানেলটা ভালই চেনে। সে বুঝল, প্রফেসর ভাঙা বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। টানেলে খুব অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। দেখার অসুবিধে হয় না। রাজা চাপা গলায় বলল, একটা রাইফেল সঙ্গে আনলে হতো!

আমরা তো চালাতেই জানি না।

তাতে কী! ভয় তো দেখানো যেত।

বাবু উত্তর দিল না। প্রফেসর ইশারায় ওদের চুপ করতে বললেন। চাপা গলায় বললেন, খুব সাবধান! টানেলের মুখের কাছে একজন গার্ড থাকবেই। তার হাতে কিন্তু রাইফেল। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই গুলি চালাবে।

বাবু মিউকে বলল, কিকিকে পাঠা। ও আগে অ্যাটাক করুক। তারপর আমরা।

ওরা আবার এগিয়ে চলল। ওদের একসঙ্গে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা রাইফেল বাগিয়ে ধরে বলে উঠল, সাবধান...গুলি...

ওর কথা শেষ হলো না—মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। কিকি ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে লোকটার মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। বাবু আর রাজা ছুটে গিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে কাবু করতে বেশিক্ষণ লাগল না। বুয়া তাড়াতাড়ি ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিল। তারপর লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হলো।

রইল বাকি এক! প্রফেসর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। পেছনে ওরা।

প্রফেসর ওপরে উঠেই থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই উদ্যত পিস্তল হাতে ওদের বস। বাচ্চাগুলো উঠে আসছে। উনি বারণ করতে পারছেন না! কী করবেন ভাবার আগেই বাবু আর রাজা এসে ওঁর পাশে দাঁড়াল। লোকটা বলল, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। ওদিকে এগিয়ে চল।

মিউ, বুয়া, মোমাও এসে গেছে। ওরাও ওদের পেছনে পেছনে চলেছে।

বাবু ঝাঁপিয়ে পড়ল রাইফেলধারীর ওপর।

কথা বলো। আমি নিচের দিকটায় লক্ষ্য রাখি। কেউ এসে গেলে মুশকিল। আমার খুব জোর কাশির শব্দ যদি শুনতে পাও তাহলে সেটটা এখানে লুকিয়ে ফেলবে।

একটা গোপন জায়গা বাবুকে দেখিয়ে দিয়ে প্রফেসর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাবু এক মুহূর্তও দেরি না করে ওদের কোড ল্যাংগুয়েজে খবর পাঠাতে শুরু করল। ওর কথা কারো বোঝার উপায় নেই। দুর্বোধ্য কতকগুলো অক্ষরের খেলা, শব্দর ধ্বনি...তারই মধ্যে দিয়ে বাবু জানিয়ে দিল জায়গাটা কোথায়। ওরা কোথায় বন্দী হয়ে আছে এবং সেখানে নিরুদ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রফেসর রঙ্গনাথনও যে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে আছেন সে কথাও জানিয়ে দিতে ভুলল না। বার তিন-চার বাবু মেসেজটা রিপিট করল।

বাবু জানে, তার এই মেসেজ শুধু লালবাজারেই পৌঁছুবে না। স্থানীয় রেডিও সেটেও ধরা পড়তে পারে। তবে ওর ভাষার বক্তব্য কারো মাথায় ঢুকবে না। প্রফেসর বললেন, বিকেলের দিকে মেসেজটা আর একবার পাঠালে হতো। কিন্তু একটু ঝুঁকি হয়ে যাবে।

এখন তো পাহারা কম। আমরা পালাতে পারি না?

এ কে ৪৭-এর সামনে দাঁড়াতে পারবে? এরা বড় নির্মম। স্ট্রেট গুলি করে মারবে। এভাবে পালাতে পারবে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

ওরা কথা বলতে বলতে নিচে নেমে ল্যাবোরেটরিতে চলে এল। বাবু পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, মিউ ছাড়া সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবু হাতছানি দিয়ে মিউকে ডাকল। জিজ্ঞেস করল, ওরা এখন ঘুমোচ্ছে কেন রে?

কাল রাত্তিরে আমাদের ঘুম হয়নি তো!

বাবু বুঝল, কেন ওদের ঘুম হয়নি। মিউকে নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে এল। বলল, কমলদার কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

পাবে তো?

প্রফেসর দাদু বলছেন তো কলকাতা অবধি খবরটা পৌঁছুতে কোনো অসুবিধে হবে না। লালবাজারের পাওয়ারফুল সেট নিশ্চয়ই মেসেজটা ধরতে পারবে।

কিন্তু কমলদা ছাড়া আর কেউ তো তার মর্ম উদ্ধার করতে পারবেন না।

না।

তাহলে?

ডিসি ডিডির কাছে মেসেজটা পৌঁছুবেই। আগেও দেখেছি।

এখন কী করা হবে...

সেইটাই তো ভাবছি।

এখানে ক'জন গার্ড আছে?

প্রফেসরের কাছে শুনেছি, ছ'সাত জন তো হবেই। বেশিও হতে পারে। উনি বলেছেন, ওদের প্রত্যেকের হাতে এ কে ৪৭। যা করার খুব সাবধানে করতে হবে।

কী যে করা যায় সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।

দু' চারজনকে পেছন থেকে অ্যাটাক করে আমরা কাবু করতে পারি।

তাতে লাভ কিছু হবে না। উল্টে ওরা আরো সতর্ক হয়ে যাবে। হয়তো আমাদের ওপর বেশি করে নজরদারি করতে শুরু করবে।

প্রফেসর নিজের মনে কাজ করছিলেন। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন, তুমি তো মিউ?

হ্যাঁ!

ও ঘরে যাও। একটু পরেই ওরা ভাত নিয়ে আসবে। আজ আর চানটান কোর না। এখানের জলটা ভাল নয়। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তোমাদের ঘরের লাগোয়া বাথরুম আছে জানো তো?

জানি।

যাও আর দেরি কোর না। যে কোনো মুহূর্তে ওরা এসে যাবে।

মিউ পাশের ঘরে চলে গেল। বাবু গিয়ে ডিভানে শুয়ে পড়ল। প্রফেসর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে লাগলেন। বাবু চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল কী করবে। এইভাবে শুয়ে-বসে থাকলে চলবে না। একটা প্ল্যান করতেই হবে।

একটু পরেই দুটো লোক এসে ভাত, ডাল আর বেশ বড় সাইজের পমফ্রেট মাছ ভাজা দিয়ে গেল।

বাবু উঠে এস। খেয়ে নাও।

বাবু হাত-মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিল, তোদের ভাত দিয়ে গেছে?

হ্যাঁ!

খেয়ে নে।

বাবু এ ঘরে ফিরে এল। প্রফেসর দুটো প্লেট বের করেছেন। ওরা খেতে লাগল। প্রফেসর বললেন, এ ঘরের সঙ্গে একটা মাইক্রোফোন ফিট করা ছিল। আমি সেটা অকেজো করে দিয়েছি।

ভাগ্যিস দিয়েছেন। তা নাহলে আমাদের সব কথা ওরা শুনতে পেত।

শোন, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। আমি ভাবছি, কাল রাত্তিরেই অ্যাকশান শুরু করবো।

ছ' সাত জন গার্ড আছে। ওদের কী ব্যবস্থা করবেন?

আমি একটা গ্যাস তৈরি করেছি। সেটা নাকে গেলে ওরা ঘুমিয়ে পড়বে।

সে কী! স্লিপিং গ্যাস!

হ্যাঁ!

কখনো তো এর কথা শুনিনি!

কতকিছুই তো শোননি! সে যাই হোক, কাল রাত্তিরে যারা খাবার দিতে আসবে, প্রথমে তাদের কাবু করে ফেলবো।

কি করে?

ল্যাবোরেটরি আর মিউদের ঘরে গ্যাস ছেড়ে দেব।

তাহলে আমরাও যে ঘুমিয়ে পড়ব। তার চেয়ে বরং যারা খাবার দিতে আসবে, তাদের পেছন থেকে অ্যাটাক করে আমরা কব্জা করে ফেলতে পারি।

আমরা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তার ব্যবস্থা করে রাখা যাবে। তবে তোমরা যদি একটা-দুটো করে গোটা কয়েক লোককে বেঁধে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে রাখতে পার তাহলে গ্যাসটা বাঁচানো যায়। খুব বেশি তো তৈরি করতে পারিনি।

আপনি বললে আজ রাত্তিরেই কাজ শুরু করতে পারি।

আজ নয়, কাল! তোমার খবর যদি সত্যিই লালবাজারে পৌঁছয় তাহলে তোমাদের কমলদাকে এখানে আসার জন্যে কিছুটা সময় দিতে হবে তো!

তা ঠিক!

যা করার আমরা কাল রাত্তিরেই করবো।

তাহলে যে ওদের সর্দারকে ধরতে

একটু এদিক-ওদিক করলেই গুলি করব।

হঠাৎ লোকটা আর্তনাদ করে উঠে চোখ চেপে বসে পড়ল। কিকি তার বড় নখ ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটার চোখের মধ্যে। বাবু আর রাজা মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। লোকটার চোখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। তাই নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়ছে। লোকটার চেহারা বিশাল। গায়ে প্রচণ্ড জোর। রিভালভারটা মাটিতে পড়েছিল। লোকটা চেষ্টা করছে সেটা তুলে নিতে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, জগ্গু, ফায়ার...

ওরা চমকে তাকাতেই কানে এল গুলির শব্দ। জগ্গুর হাত থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়েছে। পুরো জায়গাটা আলোয় ভরে উঠল। ভাঙা বাড়ির আশপাশ থেকে বেরিয়ে এল একদল পুলিশ। বস আর জগ্গুকে ধরে ফেলল তারা।

কমলদা এগিয়ে এলেন, তোরা ঠিক আছিস তো!

তারপর প্রফেসরের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন।

বাবু বলল, কমলদা, ইনিই প্রফেসর রঙ্গনাথন।

কমলদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই প্রফেসর বললেন, নিচে থেকে বদ লোকগুলোকে আনাবার ব্যবস্থা করুন। একটু পরেই বিস্ফোরণে পুরো টানেলটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

সে কী! কেন?

আমি এক্সপ্লোসিভ ফিট করে রেখেছি। আপনাদের হাতে আরো আধঘন্টা-খানেক সময় আছে। তবে রিস্ক নেবেন না। চলুন আমিই আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

কমলদা ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বস। আমিও প্রফেসরের সঙ্গে নিচে যাব। সবটা দেখে আসি।

ওরা গিয়ে দাঁড়াল ওপাশের ঘরের সামনে। প্রফেসর, কমলদা আর দশজন পুলিশ ও অফিসার নিচে নেমে গেলেন। ওপরের চত্বরে তখন অনেক পুলিশ আর অফিসার। ওরা গিয়ে বারান্দার ওপর বসে বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

একটু পরেই অজ্ঞান লোকগুলোকে কাঁধে আর অন্যদের হাঁটিয়ে আনা হলো। প্রত্যেকের হাতেই হ্যান্ডকাফ।

কমলদা কী নির্দেশ দিলেন। ওয়ার-লেসে খবর চলে গেল। একটু পরেই গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পেল ওরা। গাড়িতে দুষ্টু লোকদের তুলে দিয়ে কমলদা প্রফেসর আর ওদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন মোমাদের বাড়ির দিকে।

ওদের দেখে মানুদি ছুটে আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল...ভূত...ভূত!

প্রফেসর তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে ফেললেন।

কমলদা বললেন, স্যার, আপনার লজ্জা পাবার কিছু নেই। কলকাতায় ফিরেই আপনাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হবে। প্লাস্টিক সার্জারি করা হবে।

প্রফেসর বললেন, আমরা বাইরে বসি। একটু পরেই বিস্ফোরণ হবে।

কিছু দেখা যাবে?

না। শব্দ শোনা যাবে।

বাতিঘরের কিছু হবে না তো!

না! শুধু আন্ডারগ্রাউন্ডে যা আছে নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রফেসরের কথা শেষ হলো না, পর পর ক'টা প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল মাটি-ঘর-দোর।

প্রফেসর বললেন, মাটির নিচে যা ছিল সব শেষ।

বাবু বলল, গুপ্তধনটা খোঁজা হলো না।

গুপ্তধনের খোঁজ আবার কোথায় পেলি?

কমলদার দিকে তাকিয়ে হাসল বাবু। তারপর ঘরের মধ্যে থেকে ডায়েরিটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

ছবি : বিজন কর্মকার

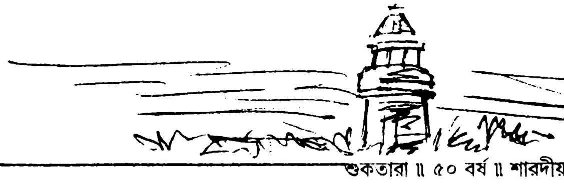

স্বপ্ন নিয়ে

কৃষ্ণ ধর

শিশুর স্বপ্ন নিচ্ছে কারা কেড়ে?
কোথায় পরী, চাঁদের বুড়ি,
মিলবে কি আর তাদের জুড়ি,
বল না খোকা, বল না খুকি, হ্যাঁরে?
তোদের স্বপ্ন নিচ্ছে কারা কেড়ে?

দ্যাখ না তোরা আকাশে ওই
তারারা সব ফোটাচ্ছে যুঁই,
একবারও কি তাকাবি না হ্যাঁরে,
পড়ার চাপে স্বপ্ন গেছে মরে?
তোদের স্বপ্ন নিচ্ছে কারা কেড়ে?

আয় না তোরা আমার সঙ্গে
যেখানে ঢেউ পড়ে ভেঙ্গে
সাগর জলে ভাসাবি আজ ভেলা
চল না তোরা, পড়েছিস তো মেলা।

তোদের নিয়ে চড়বো পাহাড়চূড়ায়
যেখান থেকে নদীর স্রোত গড়ায়।
ঝরনাজলে স্নান করবি তোরা
সাদা মেঘে স্বপ্ন বাঁধে তোড়া।
দেখতে ইচ্ছে হয় না তোদের, হ্যাঁরে,
স্বপ্ন তোদের নিচ্ছে কারা কেড়ে?

নিয়ে যাব তোদের অনেক দূরে
দেখবি চোখে মাঠ সে তেপান্তরে,
গা ছমছম গভীর বনের ধারে
দেখতে ইচ্ছে হয় না তোদের হ্যাঁরে?
স্বপ্ন তোদের নিচ্ছে কারা কেড়ে?

সেখানে গিয়ে দেখবি কী নিঃঝুম
স্বপ্নঘেরা গাছ-বিরিক্ষির ঘুম!
সকালবেলায় রোদের মুঠি ভরে
দেখবি আকাশ, বুঝবি তখন হ্যাঁরে
স্বপ্ন তোদের নিচ্ছে কারা কেড়ে!

দেওয়ালের সেই ছবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা অফিস যাবার জন্য তৈরি হন ঠিক সাড়ে ন'টায়। একদিনও তাঁর দেরি করবার উপায় নেই। কারণ বাবা দেরি করলেই টুবলুরও দেরি হয়ে যাবে। অফিস যাবার পথে বাবা টুবলুকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান।

এমনিতে বাবার খুব ভুলো-মন। প্রায়ই বেরুবার সময় কিছু না কিছু নিতে ভুল করেন। নিচে নেমে গিয়ে মনে পড়ে অফিসের দেরাজের চাবি নেননি, কিংবা পকেটে রুমাল নেই, কিংবা চশমাটা রেখে এসেছেন বাথরুমে। একদিন বড় রাস্তার মোড়ে মিনিবাসে উঠতে গিয়ে মনে পড়েছিল, মানি ব্যাগটাই আনেননি, পকেটে একটা পয়সাও নেই। বাসে উঠে পড়লে কী হতো? ভাড়া দিতে পারতেন না।

একটা ব্যাপারে কিন্তু বাবার কখনো ভুল হয় না। বেরুবার আগে দেওয়ালের একটা ছবির সামনে দাঁড়ান। চোখ বুঁজে প্রণাম করেন। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন প্রায় এক মিনিট।

ঐ ছবিটা বাবার বাবার। অর্থাৎ টুবলুর ঠাকুর্দার। ঠাকুর্দা তো মুখে বলে না, টুবলু বলে দাদু। মজার ব্যাপার এই, ছবিতে ঐ দাদুকে বাবার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট দেখায়। এ পাড়াতেই টুবলুর বন্ধু বাপির দাদুকে সে কতবার দেখেছে। খুব বুড়ো লোক, মাথায় পাকা চুল, দাঁত নেই। ফোকলা মুখে যখন কথা বলেন, সব বোঝাই যায় না। সব দাদুরাই বুড়ো লোক হয়, শুধু টুবলুর দাদুই বাবার চেয়েও ছোট, বড় মামার চেয়েও ছোট। বাবার কিছু কিছু চুল পেকেছে, চোখে চশমা। আর ছবির দাদুর মাথার সব চুল কাঁচা, চোখে চশমা নেই, মনে হয় যেন ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস।

টুবলু অবশ্য দাদুকে কখনো দেখেনি। তিনি মারা গেছেন টুবলুর জন্মের অনেক আগে। সেই সময় বাবারই নাকি বয়েস ছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর।

বাড়িতে একটা পুরনো অ্যালবাম আছে। তাতে দাদুর আরো কম বয়েসের ছবি আছে। একটা ছবিতে দাদু জার্সি পরে পায়ে একটা ফুটবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হয় চোদ্দ বছরের খোকনদার সমান। দাদু নাকি ভালো ফুটবল খেলতেন। ঐ অ্যালবামে বাবারও কম বয়েসের কয়েকটা ছবি আছে, তা দেখে টুবলু বাবাকে চিনতেই পারে না। বাবা আর মা-ও যে একসময় বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছিল, এ কথা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। টুবলুও একদিন বাবার মতন বড় হয়ে যাবে, তখন তার চেহারাটা কী রকম হবে? ঐ রকম চশমা পরা, গোঁফওয়ালা? টুবলু একদিন খানিকটা দড়িতে কালো রং মাখিয়ে গোঁফ বানিয়ে নাকে লাগিয়েছিল, বাবার চশমাটা পরে নিয়েছিল। তারপর আয়নায় মুখ দেখলো, তবু তাকে তো বাবার মতন দেখাচ্ছে না!

টুবলুর দাদু মারা গিয়েছিলেন জেলখানার মধ্যে। জেলের গার্ডরা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁকে আগে জেলে বন্দী করে রেখেছিল কেন?

বাবার এক বন্ধু দিলীপকাকু মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসেন। তিনিও দাদুর ছবিকে প্রণাম করেন। আর বছরে একদিন সেই ছবিতে একটা সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দেন।

আজ সেই দিন। দিলীপকাকু মালা পরিয়ে দিচ্ছেন, বাবা খালি পায়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছেন হাত জোড় করে।

তারপর দিলীপকাকু টুবলুকে বললেন, এই ছবিটায় আমি মালা দিই কেন জানিস? আমি যেমন তোর বাবার বন্ধু, তেমনি আমার বাবাও তোর দাদুর বন্ধু ছিলেন। তোর দাদু না থাকলে আমার জন্মই হতো না। আমার এই পৃথিবীটা দেখাই হতো না।

টুবলু ঠিক বুঝতে পারলো না কথাগুলো।

দিলীপকাকু বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই তোর ছেলেমেয়েদের সব বলিসনি?

বাবা বললেন, ওর দাদা আর দিদি জানে। ও এখনো অনেক ছোট, এখন

ঠিক বুঝবে না।

দিলীপকাকু বললেন, ছোট মানে? টুবলুর বয়েস কত?

বাবা বললেন, সবে ন' বছর।

টুবলু তাড়াতাড়ি বললো, ন' বছর তিন মাস!

দিলীপকাকু বললেন, যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। এই বয়েসের ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু বোঝে!

তারপর টুবলুর হাত ধরে দিলীপকাকু বললেন, আয়, আমার পাশে বোস, তোকে একটা গল্প বলি! ছবিতে তোর দাদুকে দেখিস, তাঁর নাম জানিস তো?

টুবলু মাথা হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ। ইন্দ্রজিৎ সরকার।

দিলীপকাকু বললেন, বেশ। আর আমার বাবা, তিনিও তোর একজন দাদু, তাঁর নাম ছিল রামানুজ সেন। ওঁদের ডাক নাম রাম আর ইন্দ্র। যদিও রামানুজ কথাটার মানে লক্ষ্মণ। রামের ছোট ভাই। রামায়ণের গল্প তো জানিস, সেখানে ইন্দ্রজিৎ ছিল রাম-লক্ষ্মণের শত্রু, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের দারুণ লড়াই হয়েছিল। এই ইন্দ্রজিৎ আর রামানুজ কিন্তু ছিলো দারুণ বন্ধু। এটা ঐ দুই বন্ধুর গল্প।

বাবা বললেন, দু'জনেই ভালো ফুটবল খেলতো।

দিলীপকাকু বললেন, হ্যাঁ, দু'জনেই ভালো খেলোয়াড় ছিলো, পড়াশুনোতেও ফার্স্ট-সেকেন্ড না হলেও খুব একটা খারাপ ছিলো না। দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠলো, স্কুল ছেড়ে কলেজে। ইন্দ্রজিৎ আগে চাকরি পেয়ে গেল, রামের তখনো চাকরি করার মন নেই, সে তখন একটা ফুটবল টিমের ক্যাপটেন।

বাবা বললেন, ইন্দ্রজিতের আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একটি ছেলেও জন্মালো, সেই ছেলেটিই হচ্ছি আমি।

দিলীপকাকু বললেন, একদিন হয়েছে কী, অনেক রাত, পাড়াসুদ্ধু সবাই ঘুমিয়ে আছে। অন্ধকার, কোথাও আলো জ্বলে নেই, এই সময় ইন্দ্রজিতের শোবার ঘরের জানলায় টক টক শব্দ হলো। ইন্দ্রজিৎ প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। আরও কয়েকবার শব্দ হতেই বিছানা থেকে উঠে এসে জানলা খুলে ফেললো। দেখলো, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাম। সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ, কারুকে ডাকিস না। দরজা খুলে দে, তোর সঙ্গে দারুণ জরুরি কথা আছে!

বাবা বললেন, আমাদের বাড়ি ছিল বেলগাছিয়ায়। তখন ও পাড়াটা ছিল বেশ নির্জন।

দিলীপকাকু বললেন, রাম ভেতরে আসবার পর ইন্দ্র দেখলো, রামের সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কপালের কাছে অনেকখানি কাটা, জামা-টামা ছিঁড়ে গেছে।

তা দেখে আঁতকে উঠে ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, এ কী? এরকম কী করে হলো? তুই কার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়েছিলি?

সেই অবস্থাতেও হেসে রাম বললো, পুলিশের সঙ্গে। খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছি!

ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, পুলিশের সঙ্গে? কেন? রাম, তুই কি কোনো ডাকাতের দলে ভিড়েছিস নাকি?

রাম বললো, না, আমি ডাকাত নই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

বাবা বললেন, টুবলু ও কথাটার কি মানে বুঝবে? আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। জানিস টুবলু, সেই সময়টা পরাধীন আমল। তার মানে, ইংরেজরা আমাদের দেশটা শাসন করে। অনেক অত্যাচার করে। আমরাও স্বাধীনতা আদায় করার জন্য লড়াই শুরু করেছি। উনিশ-শো বেয়াল্লিশ সালের অগাস্ট মাসে গান্ধীজী সাফসুফ জানিয়ে দিলেন, ইংরেজ সরকার, ভারত ছাড়ো! আর দেশের লোকদের বললেন, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! তার মানে, হয় স্বাধীনতা অর্জন করবো, নয় মরবো! তাই শুনে অনেক জায়গায় বিপ্লবীরা পুলিশের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই শুরু করে দিয়েছিল।

দিলীপকাকু বললেন, দুই বন্ধুর মধ্যে রাম গোপনে সেই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল, প্রাণের বন্ধু ইন্দ্রকেও কিছু বলেনি। অন্য কারুকে জানাবার নিয়ম ছিল না। সেই রাত্তিরে আহত অবস্থায় এসে রাম সব জানাতে বাধ্য হলো। মেদিনীপুরে সে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে অতি কষ্টে পালিয়ে এসেছে। এখন পুলিশ তাকে খুঁজছে, ধরতে পারলেই ফাঁসি দেবে। ইন্দ্রর হাত জড়িয়ে ধরে সে বললো, এখন কোথায় লুকোই বল তো?

কথাবার্তা শুনে ইন্দ্রর বউ জেগে উঠেছে।

বাবা বললেন, ইন্দ্রর বউ মানে কে বুঝলি তো টুবলু? আমার মা। আমার তখন মাত্র দেড় বছর বয়েস।

দিলীপকাকু বললেন, তারপর ইন্দ্রর বউ অত রাতে গরম জল করে দিল। তা দিয়ে রামের ক্ষতস্থানের রক্ত-টক্ত ধুইয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হলো। ছেঁড়া জামা-প্যান্ট ছেড়ে পরে নিল ইন্দ্রর পোশাক। দু'দিন কিছু খায়নি। তখন রান্না করে তাকে খাওয়ানো হলো, ডাল-ভাত, আলুসেদ্ধ আর ওমলেট। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে ভোরবেলা রামকে নিয়ে ইন্দ্র চলে গেল ক্যানিং। সেখান থেকে সুন্দরবন। সাতজেলিয়া নামে একটা গ্রামে একজন চেনা মাছের ব্যবসায়ীর বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হলো রামকে।

বাবা বললেন, পরদিনই পুলিশ এলো ইন্দ্রর বাড়িতে। সারা বাড়ি সার্চ করে তোলপাড় করে দিল। রামকে পেল না, কিন্তু ইন্দ্র ফিরতেই তাকে খপ করে ধরে নিয়ে গেল!

টুবলু বললো, তোমার তো তখন মাত্র দেড় বছর বয়েস। তোমার কী করে সে সব কথা মনে রইলো?

বাবা বললেন, আমার কী করে মনে থাকবে? পরে আমার মায়ের কাছে শুনেছি।

দিলীপকাকু বললেন, পুলিশ জেনে ফেলেছিল, রাম আর ইন্দ্র খুব বন্ধু। রামের সন্ধান ইন্দ্র জানবেই। সে যে ইন্দ্রর বাড়িতে এসেছিল, রক্তমাখা ছেঁড়া জামা-কাপড়গুলো দেখেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইন্দ্র কিছুতেই বন্ধুকে ধরিয়ে দেবে না। তার পেটের কথা টেনে বার করার জন্য পুলিশ তার ওপর কত রকম অত্যাচার যে করতে লাগলো, তা তুই কল্পনা করতে পারবি না। পা দুটো বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখতো।

বাবা বললেন, হাতের নখের মধ্যে আলপিন ঢুকিয়ে দিত।

দিলীপকাকু বললেন, মুখে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত। কিন্তু ইন্দ্রর এমনই মনের জোর, সে একটা কথাও বলেনি। প্রায় আধমড়া অবস্থায় ইন্দ্রকে জেলে ভরে রাখা হলো।

বাবা বললেন, রাম অবশ্য বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারেনি। ইংরেজ পুলিশ খুব ধুরন্ধর ছিল, একদিন ধরে ফেললো রামকে। তারপর বিচারে আরও অনেকের সঙ্গে ওদের দু'জনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো বহরমপুর জেলে।

দিলীপকাকু বললেন, দুই বন্ধু এক সঙ্গেই ছিল। কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল না। দেশ এখনো স্বাধীন হয়নি। দেশকে স্বাধীন করতেই হবে। তখন ওরা চুপি চুপি মতলব করতে লাগলো, কী করে জেল থেকে পালানো যায়। আরও তিনজন বিপ্লবীর সঙ্গে ওরা দিনের পর দিন পরামর্শ আঁটতে লাগলো। তারা প্রতিজ্ঞা করে ফেললো, কিছুতেই বছরের পর বছর জেলখানায় পচতে তারা রাজী নয়। তারা পালাবে, আবার দেশ উদ্ধারের কাজে লেগে পড়বে! একদিন সুযোগ পাওয়া গেল। সেটা ছিল একটা ছুটির দিন। ওরা লক্ষ্য করেছিল, ছুটির দিনগুলোতে খানিকটা ঢিলেঢালা ভাব থাকে। রাত্তির বেলা একজন মাত্র গার্ড ওদের সেলের বাইরে পাহারা দেয়। মাঝরাতে সেই গার্ডটার হাত-মুখ বেঁধে ফেলতে পারলে পাঁচিল টপকিয়ে বাইরে চলে যাওয়া যেতে পারে। সেই রকমই ব্যবস্থা হলো, আগে থেকেই সেলের একটা চাবি তৈরি করে ফেলা হয়েছিল। পাঁচজন বিপ্লবী রাত্তির ঠিক একটার সময় বেরিয়ে এসে সেই গার্ডটাকে কাবু করে ফেললো।

টুবলু জিজ্ঞেস করলো, তার হাতে বন্দুক ছিল না?

দিলীপকাকু বললেন, বন্দুক তো থাকবেই, কিন্তু সেটা সে তোলার সুযোগই পায়নি। ওরা পেছন থেকে এসে তার মুখ চাপা দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললো। মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল। সে আর চ্যাঁচাতে পারলো না। তারপর তারা ছায়ার মতন পা টিপে টিপে ভেতরে মাঠটা পেরিয়ে চলে এলো উঁচু পাঁচিলের কাছে। পাঁচিল কী করে ডিঙোবে? একমাত্র উপায়, একজনের কাঁধের ওপর উঠে একজন দাঁড়াবে, সে তখন পাঁচিলের ওপর হাত পেয়ে যাবে। প্রথমেই কাঁধ পেতে দিল ইন্দ্র।

বাবা বললেন, আমার বাবার গায়ে নিশ্চয়ই দারুণ জোর ছিল!

দিলীপকাকু বললেন, উহুঁ! নিখিল নামে আর একজন ছিল ওদের দলে, তার চেহারা আরও লম্বা-চওড়া। কিন্তু সে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার পা কাঁপছিল। সেইজন্য ইন্দ্র কাঁধ পেতে দিয়ে প্রথমেই নিখিলকে পার করে দিল। তারপর একে একে অন্যরাও।

টুবলু জিজ্ঞেস করলো, শেষে যে থাকবে, সে কী করে পার হবে?

বাবা কিছু বলতে যেতেই দিলীপকাকু বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাকিটা আমাকে বলতে দাও! শোনো টুবলু, অন্য তিনজন তো পার হয়ে গেল, বাকি রইলো রাম আর ইন্দ্র। ওরা নিজেদের গায়ের জামা ছিঁড়ে একটা দড়ি পাকিয়ে নিল। যে চার নম্বর, সে উঠে গিয়ে দড়িটা ছুঁড়ে দেবে, শেষ জন সেই দড়ি ধরে উঠে যাবে। রাম তখন বললো, ইন্দ্র, তুই তো তিনজনকে কাঁধে নিয়েছিস, এবার তুই আমার কাঁধে উঠে ওপরে চলে যা! ইন্দ্র বললো, আমি তিনজনকে কাঁধে নিয়েছি, তোকেও পারবো। আমি শেষে যাবো! রাম কিছুতেই রাজী নয়। সে শেষে যেতে চায়। প্রায় ঝগড়া লেগে যাবার যোগাড়। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তখন ইন্দ্র প্রচণ্ড ধমক দিল রামকে। একরকম জোর করে সে রামকে কাঁধে তুলে নিল। রাম ওপরে চলে গিয়ে ছুঁড়ে দিল দড়িটা।

দিলীপকাকু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। মুখ নিচু করে রইলেন বাবা।

টুবলু জিজ্ঞেস করলো, তারপর কী হলো? তারপর?

তবু কেউ কিছু বললেন না। বাবার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো।

টুবলু জিজ্ঞেস করলো, দড়িটা এদিকে এলো না?

দিলীপকাকু ভাঙা গলায় বললেন, দড়িটা ঠিক এসেছিল। ইন্দ্র সেটা ধরে উঠতে যেতেই পটাং করে ছিঁড়ে গেল, সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। সেই শব্দ শুনে ওয়াচ টাওয়ারে জ্বলে উঠলো আলো। সেই আলো এসে পড়লো ইন্দ্রর গায়ে। ইন্দ্র বুঝতে পারলো, তার আর পালাবার উপায় নেই। তখনো সে ভাবলো, অন্য বন্ধুদের বাঁচাতে হবে। ঐ জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকলে গার্ডরা বুঝে যাবে যে ঐখান দিয়েই আরও কয়েকজন পালিয়েছে। রাম আর অন্য তিনজন বেশি সময় পাবে না। সেই জন্য ইন্দ্র মাঠের মধ্যে এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করলো। বেজে উঠলো পাগলা ঘন্টি। অন্য গার্ডরা ছুটে এসে গুলি চালাতে লাগলো। কিন্তু ইন্দ্র এঁকেবেঁকে ছুটছে বলে তার গায়ে গুলি লাগছে না। প্রায় সাত মিনিট পরে একসঙ্গে তিনটে গুলি ফুঁড়ে গেল তার শরীর। সঙ্গে সঙ্গে শেষ। প্রাণ থাকতে সে ধরা দেয়নি। এর মধ্যে অন্য চারজন অনেক দূর পালিয়ে গেছে।

বাবা এবার চোখ মুছে বললেন, সেটা উনিশশো ছেচল্লিশ সাল। আর এক বছর পরেই দেশ স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু জেলখানার মধ্যে বসে ওঁরা সেটা বুঝতে পারেননি।

দিলীপকাকু বললেন, তোমার দাদু আর চারজনের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বাবাকে না বাঁচালে আমার জন্মই হতো না! আমার বাবা এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন, সব সময় তাঁর বন্ধু ইন্দ্রজিতের নাম বলতেন আর কাঁদতেন!

বাবা বললেন, অনেক লোক বাবার ছবিকে প্রণাম করে। অনেক লোক করে না। ইনি তো শুধু আমার বাবা নন, ইনি একজন দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এরকম আরও কতজন দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, এখনকার মানুষ তাঁদের ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা কি ভুলতে পারি?

দিলীপকাকু বললেন, ছবির তো বয়েস বাড়ে না। আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার দাদু ঠিক একরকম আছেন।

ছবিটা দেওয়ালের অনেক উঁচুতে। টুবলুর হাত যায় না। সে একটা টুল নিয়ে এসে তার ওপর উঠে দাঁড়ালো। তারপর মাথাটা ঠেকিয়ে রাখলো সেই ছবিতে।

শিবেনবাবু ভাল আছেন তো!

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনও হাতা গোটান না। শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে। চুলে পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভাল নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তাঁর গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দরবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন না। যদি তারা ফিরে আসে! বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক ঘিরে ধরল! বুকে রিভলভার, পেটে-পিঠে ছোরা।

রিভলভারওলা বলল, যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের টাকা নিয়ে লোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনওরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হলো যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়েও নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। বুকে, পিঠে, পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভলভার আর ছোরা ধরল। একই কথা বলল এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হলো।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল এল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভাল করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছেপিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটকানোর শব্দ হলো, তারপর বলল "হরি, হরি"। হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাতে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।

তার মানে?

কতবার জন্মেছি তার কি হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চীনেম্যান চাঁই চুঁই।

আ-আপনি কোথায়? দে-দেখতে পাচ্ছি না তো!

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারে-কাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছো কি কখনও?

আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।

আ মোলো! এ যে ভাল করতে এসে বিপদ হলো।

আ-আপনি কি চান?

তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে। কিন্তু বিধি বাম, সে উপায় নেই।

আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?

রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছো কি? কিছু করতে পারলে?

আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।

আর তোমার বুঝি কিছু নেই?

আজ্ঞে না।

কে বলল নেই?

ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেনসিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোটো লাঠি আছে।

আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি-লাঠির কথা জিজ্ঞেস করেছি কি তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?

আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার একটা গাদা বন্দুক ছিল।

গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক-টন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?

আজ্ঞে না।

বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!

জানি।

তোমার সেটাও নেই?

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হলো। তারপর গলার স্বরটা বলল, শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলো তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি-হাসি মুখ করে শুধু জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো!

শুধু এই কথা বললেই হবে?

বলেই দেখ না।

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে-কথাটা বলতে হবে তা বারবার বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত-পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাঁকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা।

পিস্তলওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

জীবনে কোনও সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো?

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তার পরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাক গে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল!

না, এর পর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তাঁর অফিসের বড়বাবু তাঁকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশীট দেন আর কি। হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাঁকে বলেছিলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো! তাইতে বড়বাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুবই ভাল ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সেদিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাঁকে খুবই তুলোধোনা করছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাঁকেও বললেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো! গিন্নি একেবারে জল।

হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভাল আছেন। কোনও উদ্বেগ, অশান্তি নেই। বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

ছবি ঃ অমিত চক্রবর্তী

বিচিত্র খবর

বরুণ মজুমদার

বাচ্চা হাতির কাণ্ড

অন্ধ্রপ্রদেশের মন্দির শহর তিরুপতিতে সেদিন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে। দুটি বাচ্চা হাতি একদল বাঁদরের ভয়ে তিরুমালা মন্দিরে ঢুকে পড়ে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের চারদিকে দৌড়ে ঘুরতে লাগলো পাগলের মতো। সেই সময় ভক্তরাও দেবতার পুজো দেবার জন্য মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলেন। ভাগ্য ভাল যে, কেউই হাতির পায়ের তলায় পড়ে যাননি। ভক্তদের অনেকের বিশ্বাস, হাতির বাচ্চা দুটি উর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটির সময় 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলে যে ডাক ছাড়ছিল তার পেছনে ভগবানের হাত আছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাতির বাচ্চা দুটি তাদের মন্দির সংলগ্ন আস্তানায় ফিরে গেছে। তাদের মাহুতরা সেখানে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এক মাহুত সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে, বাচ্চা হাতি দুটিকে যখন তাদের আচ্ছাদনের নিচে স্নান করানো হচ্ছিলো তখন সেই আস্তানার অ্যালুমিনিয়াম পাতের আচ্ছাদনের ওপর কয়েকটা বাঁদর এসে লম্ফঝম্প করছিল। তার শব্দে ওরা দারুণ ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকে পড়েছিল।

তোরঙ্গ রহস্য

প্রফুল্ল রায়

মাধ্যমিক পরীক্ষার পর রাজা আর তার বন্ধু রন্তু বোম্বাইতে বেড়াতে গিয়েছিল। এর আগে তাদের একা একা দূরে কোথাও যেতে দেওয়া হতো না। ছুটিতে বাবা বা কাকাদের সঙ্গে দিল্লি-আগ্রা বা দক্ষিণ ভারত ঘুরতে যেত। কিন্তু যারা মাধ্যমিক দিয়েছে তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার দরকার নেই। রাজা আর রন্তু দু'জনেরই দারুণ সাহস, ক্যারাটেটা খুব মন দিয়ে তারা শিখেছে। তা ছাড়া বিপদ-টিপদে পড়লে নিজেদের বাঁচাবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিও তাদের আছে।

বোম্বাইতে রাজার ছোট মাসি আর ছোট মেসো থাকেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে ডোনা। সে পড়ে একটা মিশনারি স্কুলে। মেসো একটা মস্ত বড় বিদেশী কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। অনেকদিন ধরেই ছোট মাসিরা রাজাকে বোম্বাইতে তাঁদের বাড়ি বেড়িয়ে আসার জন্য ফোন-টোন করছিলেন কিন্তু নানা কারণে যাওয়া আর হচ্ছিল না। ক্লাস টেনে ওঠার পর থেকে কোনও দিকে তাকাবার সময়ই পাওয়া যায়নি। দিন-রাত শুধু বই আর বই। মাধ্যমিকের পর বাবা তার আর রন্তুর জন্য বম্বে মেলের এয়ার-কন্ডিশানড কোচের দু'খানা রিটার্ন টিকেট কেটে দিয়েছিলেন। বোম্বাইতে ছোট মাসির কাছে কুড়ি দিন কাটিয়ে ওরা ফিরে আসবে।

ল্যান্সডাউন রোডে রাজারা আর রন্তুরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। দু'জনের এমনই বন্ধুত্ব যে রাতের শোওয়াটুকু বাদ দিলে সারাদিন একসঙ্গে কাটিয়ে দেয়। রাজা কোথাও গেলে রন্তু তার সঙ্গে যাবেই। রন্তুকে বাদ দিয়ে রাজাও কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে না।

একটা আটাশ-তলা বাড়ির তের তলায় ছোট মাসিদের ফ্ল্যাট। সামনের দিকের দেওয়াল-জোড়া কাচের জানলা খুললেই পৃথিবী-বিখ্যাত জুহু বীচ, তারপর সীমাহীন আরব সাগর দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। বীচে রংবেরংয়ের অজস্র ভেলপুরির দোকান, স্ন্যাকস-বার আর আইসক্রিম পার্লার। আর আছে জয়-রাইডের জন্য অগুনতি ঘোড়া এবং উট। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ওখানে যেন মেলা বসে থাকে। জাপানী, ইংরেজ, আমেরিকান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, আরব দেশের জোব্বা-পরা শেখ থেকে ইটালিয়ান, আইরিশ ইত্যাদি দেশ-বিদেশের টুরিস্টে টুরিস্টে জুহুর সমুদ্র সৈকত সারাক্ষণ গম-গম করতে থাকে। সব কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

ছোট মাসিদের বাড়িটার নাম 'প্যারাগন'। মাসি, মেসো আর ডোনা তো আছেই। এখানে আসার পর একটি ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার নাম শঙ্কর—শঙ্কর পারিখ। ওরা গুজরাটি, ডোনার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। থাকে

এই বাড়িরই টপ ফ্লোরের গোটাটা নিয়ে। ওর বাবার প্রচুর পয়সা।

বোম্বাইতে পৌঁছুবার পর ছোট মাসি আর ছোট মেসো প্রথম দু'-তিনটে দিন রাজাদের শহর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মেসোর অফিসে প্রচণ্ড দায়িত্ব। মাসিও একটা ইংরেজি খবরের কাগজের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। তাঁদের পক্ষে অফিসের কাজ ফেলে রোজ রোজ বেড়াতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বোম্বাই তো একটুখানি শহর নয় যে দু'দিনেই সব দেখা হয়ে যাবে। তাই এই ব্যাপারটা দেওয়া হলো শঙ্কর আর ডোনাকে।

শঙ্কর দারুণ হাসিখুশি আর স্মার্ট ছেলে। মোটে ষোল বছর বয়স কিন্তু এর মধ্যেই চমৎকার গাড়ি চালাতে পারে। একটা মারুতি ওমনিতে রাজাদের তুলে হইহই করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই সময়টা এখানকার স্কুলগুলোতে কয়েকদিন ছুটি চলছিল। পড়াশোনার চাপ নেই, সারাক্ষণ শুধু ঘোরাঘুরি, আড্ডা, হুল্লোড়। সকালে ব্রেকফাস্ট করে ওরা বেরিয়ে পড়ত, দুপুরে কোনও গুজরাটি কি উদিপি হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করে খেয়ে নিত। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-ন'টা।

পাহাড়, সমুদ্র, বাদামি বালির বেলাভূমি, আকাশছোঁয়া বিশাল বিশাল বাড়ি, আয়নার মতো ঝকঝকে, মসৃণ রাস্তা, গণ্ডা গণ্ডা ফ্লাইওভার, লক্ষ লক্ষ গাড়ি—সব মিলিয়ে বোম্বাই হলো চাম্পিয়ন শহর। এখানে না এলে রাজারা জানতেই পারত না, ভারতবর্ষে এমন একটা দুর্ধর্ষ শহর রয়েছে।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, এলিফ্যান্টা কেভ, বোম্বাই বন্দর, মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন থেকে আরে মিল্ক কলোনি, পাওয়াই লেক—কত জায়গায় যে শঙ্কর আর ডোনা রাজাদের নিয়ে যেতে লাগল তার হিসেব নেই।

দিন পনের এভাবে কেটে যাওয়ার পর ঠিক হলো, শঙ্কর আর ডোনা নিউ বম্বে দেখাতে নিয়ে যাবে। সকালবেলা রাজারা মাসির ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমে শঙ্করের জন্য অন্যদিনের মতো অপেক্ষা করছিল। সে কিন্তু এল না। এলেন তার বাবা লখুভাই পারিখ এবং ওঁদের এক আত্মীয় অমরনাথ শেঠ। দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লখুভাইয়ের চেহারা গোলগাল, টকটকে ফর্সা রং। তাঁকে আগেই দেখেছে রাজারা। আলাপও হয়েছে। মানুষটি খুবই স্নেহপ্রবণ, মুখে সর্বক্ষণ হাসি লেগেই আছে। তাঁর সঙ্গী অমরনাথকে সেই প্রথম দেখল রাজারা। ভদ্রলোক ঢ্যাঙা, একটু কুঁজো ধরনের। গায়ের রং বেশ কালোই, মাথায় টুপি।

দু'জনের দিকে তাকিয়ে রাজারা চমকে উঠেছিল। দেখামাত্র টের পাওয়া গিয়েছিল, সারারাত ওঁদের ঘুম হয়নি, চুল উস্কখুস্ক, চোখের তলায় কালি।

মাসি আর মেসো তখনও অফিসে বেরোননি। বললেন, 'লখুভাইজি, অমরনাথজি, আপনাদের এরকম দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

লখুভাই বললেন, 'আমাদের ভীষণ বিপদ ব্যানার্জি সাহেব!'

বিনায়ক ব্যানার্জি অর্থাৎ ছোট মেসো সামনের দিকে ঝুঁকে উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের বিপদ?'

লখুভাই এবার যা বললেন তা এইরকম। কাল রাত্তিরে রাজাদের সঙ্গে ঘুরে সাড়ে আটটায় ফিরে এসেছিল শঙ্কর। ন'টা নাগাদ কার একটা ফোন পেয়ে সে বেরিয়ে যায়, তারপর আর ফিরে আসেনি। কাজ সেরে এগারোটায় বাড়ি আসেন লখুভাই। শঙ্করের মায়ের কাছে তার খবরটা পেয়ে চারদিকে ফোন করেন। তারপর দূর সম্পর্কের ভাই অমরনাথকে তাঁদের বান্দ্রা ফ্ল্যাট থেকে তুলে যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছে, সবার বাড়ি যান। এমনকী ছেলের বন্ধুদের কাছে গিয়েও খোঁজ নেন কিন্তু শঙ্কর ওদের কারও কাছেই যায়নি। সারারাত ছোটাছুটির পর শেষ পর্যন্ত তাঁরা এসেছেন ডোনাদের কাছে। ক'দিন ধরে শঙ্করের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে। যদি তারা কোনও রকম হদিস দিতে পারে, এই আশায়।

ডোনা, রাজা এবং রন্তু একসঙ্গে বলে ওঠে, 'না আঙ্কল, শঙ্কর কোথায় গেছে আমরা কিছুই জানি না। ও আমাদের নিউ বম্বে নিয়ে যাবে, সেই জন্যে ওয়েট করছি।'

লখুভাই একেবারে ভেঙে পড়লেন। হতাশ গলায় বললেন, 'এখন আমি কী যে করব ভাবতে পারছি না।'

ছোট মেসো বললেন, 'পুলিশকে জানিয়েছেন কি?'

'না।'

'এক্ষুণি জানিয়ে দিন।'

'হ্যাঁ, তাই করি।'

লখুভাইরা চলে গেলেন।

শুধু পুলিশকেই জানানো হলো না। দু'দিনের ভেতর খবরের কাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে শঙ্করের ছবি ছাপা হলো। তার ছবি টিভিতেও দেখানো হলো। রেডিওতেও বার বার তার নাম ঘোষণা করে জানানো হলো, কেউ তার খবর দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু শঙ্করের খোঁজ পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে কুড়িটা দিন পার হয়ে গেল। এবার রাজাদের কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। মাসিরা আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে বললেন, রেলে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থাও ওঁরা করে দেবেন কিন্তু বোম্বাইতে আর ভাল লাগছিল না রাজাদের। শঙ্কর নিখোঁজ হওয়ার পর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আজ রাজারা ক্যালকাটা মেলে ফিরে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় মাসি, মেসো আর ডোনা দাদার স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে। ট্রেনটা আসবে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে। প্ল্যাটফর্মে সেজন্য অপেক্ষা করছিল তারা। হঠাৎ চোখে পড়ল প্রচুর লটবহর নিয়ে অমরনাথ শেঠ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মালপত্রের ভেতর রয়েছে একটা প্রকাণ্ড

স্টিলের ট্রাঙ্ক, লম্বায় পাঁচ ফুট তো হবেই। সঙ্গে রয়েছে দুটো ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা লোক। একজনের মুখ পরিষ্কার করে কামানো, আরেকজনের দাড়ি-টাড়ি নেই, তবে গোঁফ দুটো পাক খেয়ে ঝুলে আছে। দু'জনের চোখেই কেমন যেন ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর দৃষ্টি।

অমরনাথদের দেখে ছোট মেসোর সঙ্গে রাজারা এগিয়ে গেল। তাদের দিকে নজর পড়তেই কেমন যেন চমকে উঠলেন অমরনাথ। ফ্যাকাসে মতো একটু হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, আপনি এখানে?'

স্টেশনে আসার কারণটা জানিয়ে দিয়ে ছোট মেসো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কাউকে ক্যালকাটা মেলে তুলে দিতে এসেছেন?'

'না। বিজনেসের কাজে আমাকে একবার দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় যেতে হচ্ছে।'

'ভালই হলো।' রাজা আর রন্তুকে দেখিয়ে ছোট মেসো বললেন, 'ট্রেনে ওদের একটু দেখবেন।'

অমরনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ছোট মেসো বললেন, 'শঙ্করের ব্যাপারটা তো আর কিছুই এগুলো না।'

অমরনাথ বললেন, 'না। তবে আমি কলকাতা থেকে ফিরে হোম মিনিস্টারের কাছে লখুভাইকে সঙ্গে করে যাব। একটা ছেলে বোম্বাইয়ের মতো শহর থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবে, এ ভাবা যায় না।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে ক্যালকাটা মেল এসে গেল। রাজাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে ছোট মাসিরা চলে গেলেন।

একই এয়ারকন্ডিশানড কামরায় রাজাদের আর অমরনাথদের সীট পড়েছে। তবে কাছাকাছি নয়। বিশাল কামরার এক মাথায় রাজাদের সীট, অন্য মাথায় অমরনাথদের।

ট্রেন বোম্বাই এবং থানে পেছনে ফেলে ঘণ্টা দুই চলার পর অমরনাথ একবার রাজাদের কাছে এলেন। বললেন, 'তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

রাজা বলল, 'না।'

'আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাব। কিছু দরকার হলে বলো।'

'বলব।'

ঘড়ি দেখে অমরনাথ বললেন, 'ন'টা বাজতে চলল। খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়।'

রাজা ঘাড় কাত করে বলল, 'আচ্ছা।'

অমরনাথ চলে গেলেন।

ট্রেনে উঠলেই গাড়ির ঝাঁকানিতে ভীষণ ঘুম পায় রাজার। ছোট মাসি দুটো হট কেস বোঝাই করে খাবার দিয়েছিলেন। সেগুলো বার করে রন্তু আর সে খেয়ে নিল। এয়ারকন্ডিশানড কোচে শোওয়ার জন্য বেড-রোল দেওয়া হয়। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল রাজা। রন্তুর কিন্তু সহজে ঘুম আসে না। সে একটা রঙিন স্পোর্টস ম্যাগাজিন নিয়ে কাচের বন্ধ জানলার পাশে বসে পাতা ওলটাতে লাগল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর মুখ-টুখ ধুয়ে রাজারা সবে ব্রেকফাস্ট করার জন্য হট কেস খুলেছে, অমরনাথ দুটো বড় বড় কাগজের প্লেটে সিঙাড়া, কচুরি, লাড্ডু আর গুলাবজামুন নিয়ে এলেন। বললেন, 'খাও—'

রাজা বলল, 'আবার এসব নিয়ে এলেন কেন? আমার মাসিমা এত খাবার দিয়েছেন যে দুপুর পর্যন্ত চলে যাবে।'

'মাসির খাবার পরে খেও। এখন আমারটা খাও।'

ভদ্রলোককে খুব ভাল লেগে গেল রাজাদের। এরপর এক-আধ ঘণ্টা পর পর অমরনাথ তাদের কাছে আসতে লাগলেন। যখনই আসেন হাতে কিছু না কিছু থাকে—চানাচুর, কাজুবাদাম, কেক বা মুরুক্কু।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। ট্রেন ততক্ষণে নাগপুর পেরিয়ে কলকাতার দিকে ছুটছে।

হঠাৎ রাজাদের মনে হলো, অমরনাথই বার বার তাদের কাছে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরও দু'-একবার ওঁর কাছে না গেলে খারাপ দেখায়।

রন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, যাবি?'

রাজা বলল, 'হ্যাঁ, চল।'

কম্পার্টমেন্টের এক ধার দিয়ে সরু প্যাসেজ। আর দু' পাশে কাঠের দেওয়াল তুলে সারি সারি খোপের ভেতর নম্বর লাগানো বার্থ। অমরনাথদের বার্থগুলো কোথায়, রাজারা জানতো। প্যাসেজ ধরে দু'জনে কামরার শেষ প্রান্তে চলে আসে।

অমরনাথ তাঁর সঙ্গী সেই তাগড়াই লোক দুটোর সঙ্গে, যাদের একজনের গোঁফ দুটো সার্কল করে ঝুলে আছে, মুখ নিচু করে চাপা গলায় কী যেন কথা বলছিলেন। রাজাদের তাই তিনি লক্ষ্য করেননি। তাঁকে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ রন্তুর চোখ চলে যায় সেই স্টিলের বিরাট ট্রাঙ্কটার দিকে। কাল দাদার স্টেশনে ওটা দেখে ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেননা এমন লম্বা, বেঢপ ট্রাঙ্ক আগে কখনও ওদের চোখে পড়েনি। সেটা সিটের তলায় রাখা হয়েছে বটে, তবে পুরোটা ভেতরে ঢোকানো যায়নি, অনেকটাই বাইরে বেরিয়ে আছে।

ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রন্তু বেশ অবাকই হয়ে গেল। ওটার গায়ে এক টাকার মুদ্রার সাইজের অনেকগুলো গোল গোল ফুটো। নিখুঁতভাবে ফুটোগুলো করা হয়েছে। এমন ছিদ্রওলা তোরঙ্গ আগে আর কখনও দেখেনি রন্তু। খুব আস্তে রাজার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে সে বলল, 'ওদিকে দ্যাখ—' বলে ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে দেয়।

রাজাও রন্তুর মতোই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় অমরনাথ তাকে দেখতে পেলেন। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, তোমরা এখানে!'

রাজা বলল, 'আপনি বার বার কষ্ট করে আমাদের কাছে যাচ্ছেন, তাই ভাবলাম—'

অমরনাথ হেসে হেসে বললেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ। তোমাদের আসতে হবে না। আমিই যাব। এখন বল কিছু দরকার আছে?'

'না না, এমনিই এসেছিলাম—'

'চল—চল, তোমাদের ওখানে গিয়ে গল্প করি।' বলে রাজার কাঁধে হাত রেখে প্যাসেজের দিকে পা বাড়ালেন অমরনাথ। বোঝা যাচ্ছিল, রাজারা ওখানে থাকুক সেটা একেবারেই চাইছেন না তিনি।

এদিকে রস্তু দুম করে বলে উঠল, 'আঙ্কল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

অমরনাথ বললেন, 'কী?'

তোরঙ্গটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে রস্তু বলল, 'আপনার ওই ট্রাঙ্কটায় এত ফুটো হলো কী করে?'

অমরনাথ প্রথমটা চমকে ওঠেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'কারখানা থেকে ওটা ওইরকমই তৈরি করেছে। চল, চল—' প্রায় জোর করেই রাজা আর রস্তুকে ঠেলতে ঠেলতে প্যাসেজে নিয়ে গেলেন তিনি।

চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে তাকায় রাজারা। দেখতে পায়, সেই জবরদস্ত চেহারার লোক দুটো ঠাণ্ডা হিংস্র চোখে তাদের লক্ষ্য করছে।

রাজারা নিজেদের সীটে ফিরে আসার পর অমরনাথ বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করে চলে গেলেন। তোরঙ্গটার কথা দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করতে তাদের সাহস হলো না। কিন্তু ওটাকে মাথা থেকে বারও করে দিতে পারছে না। গোল গোল ওই ফুটোগুলোর রহস্য কী, কে জানে।

অমরনাথ চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রাজারা। একসময় রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রস্তু জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছিস রে?'

রাজা একটু হাসে। বলে, 'তুই যা ভাবছিস, আমিও তাই ভাবছি। ওইরকম গর্তওলা ট্রাঙ্ক কোনও কারখানায় তৈরি হয় বলে শুনেছিস?'

'নেভার। নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে।'

'কারেক্ট। দেখলি না, আমাদের ওখানে দু' মিনিট দাঁড়াতেও দিল না।'

খানিকক্ষণ কী ভেবে রাজা বলল, 'একটা ব্যাপার আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

রস্তু বলল, 'আমিও। ওই ট্রাঙ্কটার রহস্য জানতেই হবে—তাই তো?'

'রাইট।'

'কিন্তু কীভাবে? ওরা তো ট্রাঙ্কটার কাছে আমাদের ঘেঁষতেই দেবে না।'

রাজা বলল, 'ওরা যাতে টের না পায়, সেইভাবে ট্রাঙ্কটা ভাল করে দেখে আসতে হবে।'

এরপর দু'জনে ঘণ্টাখানেক নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একটা ফন্দি বার করে ফেলল।

ক্যালকাটা মেলে হাওড়ায় পৌঁছতে পুরো দুটো রাত আর একটা দিন লেগে যায়। একটা রাত কালই কেটে গেছে। ট্রেনের দুলুনিতে ভালই ঘুম হয়েছিল রাজাদের। আজ রাতের খাওয়া চুকিয়ে ওরা কিন্তু ঘুমল না। পাছে ঘুম আসে তাই পাশাপাশি বার্থে শুয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল। তারপর রাজা একটা দম বন্ধ-করা ডিটেকটিভ গল্প পড়তে লাগল। রস্তু বোম্বাই থেকে অনেকগুলো ম্যাগাজিন কিনে এনেছিল। সে সেগুলোর মধ্যে ডুবে গেল।

অনেক রাতে চারপাশের প্যাসেঞ্জাররা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ট্রেনের চাকার একটানা আওয়াজ ছাড়া সমস্ত নিঝুম, প্যাসেজের টিমটিমে বাতিগুলো ছাড়া সব আলো নিভে গেছে, সেই সময় রাজা আর রস্তু বার্থ থেকে নিচে নেমে পড়ল। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। কম্পার্টমেন্টের শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনে।

নিচের পাশাপাশি দুটো বার্থে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে সেই তাগড়াই লোক দুটো। ওপরে একটা বার্থে কাত হয়ে শুয়ে আছেন অমরনাথ। তাঁর চোখ বোজা। গোঁফওলা লোকটার বার্থের তলায় সেই ট্রাঙ্কটা রাখা আছে।

খানিকক্ষণ অমরনাথদের লক্ষ্য করার পর নিচু হয়ে রাজা আর রস্তু ট্রাঙ্কটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। প্যাসেজে যে কম পাওয়ারের বাতিটা জ্বলছে তার অল্প একটু আলো এসে পড়েছে এখানে। দু'জনে ট্রাঙ্কের ফুটোগুলোয় চোখ রেখে ভেতরে কী আছে দেখার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। ট্রাঙ্কটার ডালা যে খুলবে তারও উপায় নেই, কেননা ওটার গায়ে একটা প্রকাণ্ড তালা লাগানো আছে।

রস্তু বলল, 'কী করা যায় বল তো?'

রাজা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ট্রাঙ্কের ভেতর অস্পষ্ট একটু আওয়াজ শোনা গেল। মনে হলো, কিছু যেন নড়াচড়া করছে। চমকে উঠে সে রস্তুকে বলে, 'শুনতে পাচ্ছিস?'

রস্তু বলল, 'হ্যাঁ। কী ব্যাপার বল তো?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না।'

ঠিক এই সময় গোঁফওলা লোকটার ঘুম ভেঙে যায়। আলো-আঁধারিতে সে খুব সম্ভব রাজাদের চিনতে পারেনি। 'এই, কে রে—' বলে সে চেঁচিয়ে ওঠে।

মাঝরাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ট্রাঙ্ক দেখতে এসেছিল। ধরা পড়লে ভীষণ মুশকিল হয়ে যাবে। রাজারা বিদ্যুৎগতিতে প্যাসেজে চলে আসে। কম্পার্টমেন্টের দু'দিকেই রয়েছে এক জোড়া করে টয়লেট। ওরা দৌড়ে গিয়ে একটা টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

এদিকে গোঁফওলার হাঁকাহাঁকিতে অমরনাথ এবং অন্য লোকটাও উঠে পড়েছে। তারা সবাই মিলে এধারে-ওধারে ছুটে রাজাদের খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। কাউকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফের গিয়ে শুয়ে পড়ে।

যখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়, সেই সময় টয়লেট থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে রাজা আর রস্তু নিজেদের বার্থের দিকে চলে যায়। যেতে যেতে রাজা বলে, 'ওই ট্রাঙ্কটায় জামাকাপড় বা অন্য

জিনিসপত্র থাকলে ওরকম শব্দ হবে কেন?'

রন্তু বলে, 'তা হলে কী থাকতে পারে?'

'সেটাই জানতে হবে।'

'অসম্ভব। অমরনাথ আর ওই লোক দুটোর চোখে ধুলো দিয়ে কিছুই করা যাবে না।'

রাজা উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে ক্যালকাটা মেল হাওড়া পৌঁছে গেল। গাড়িটা থামতেই রাজা রন্তুকে বলল, 'তুই এগিয়ে গিয়ে খানিকটা দূর থেকে অমরনাথদের ওপর নজর রাখ। ওদের সঙ্গে প্রচুর মালপত্র রয়েছে। কুলি-টুলি ডেকে সে সব নামাতে সময় লাগবে। আমি তার মধ্যে ফিরে আসব।' বলে ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। কাল টয়লেট থেকে ফেরার পর আর ঘুমোয়নি। বাকি রাতটা ভেবে ভেবে ওই ট্রাঙ্কটার ব্যাপারে একটা ফন্দি বার করে ফেলেছে।

স্টেশনে রেল পুলিশের মস্ত অফিস আছে। একজন টিকেট চেকারকে জিজ্ঞেস করে সেখানে চলে এল রাজা। একজন অফিসারকেও পাওয়া গেল। তাঁকে অমরনাথ এবং তাঁর ট্রাঙ্কটা সম্পর্কে সব জানিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় ট্রাঙ্কটা একবার দেখা দরকার।'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। চল—চল—'

দু'জন বন্দুকওলা কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে অফিসার রাজার সঙ্গে তাদের সেই কম্পার্টমেন্টের সামনে এলেন, অমরনাথরা তিনটে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে সবে প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন। তাঁদের পেছন পেছন রন্তুও তার আর রাজার দুটো সুটকেস হাতে নিয়ে নেমে পড়েছে। রাজাকে এতক্ষণ না দেখে সে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল। এবার তাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখায়।

কুলির মাথায় অমরনাথের তোরঙ্গটা দেখিয়ে রাজা পুলিশ অফিসারকে বলে, 'এই যে সেই ট্রাঙ্কটা—'

পুলিশ দেখে অমরনাথ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। অফিসার তাঁকে বললেন, 'ট্রাঙ্ক নামাতে বলুন—'

অমরনাথ বললেন, 'কেন স্যার, কেন স্যার, ওটার ভেতর কিছু স্টিলের বাসনটাসন ছাড়া কিছু নেই।'

'যাই থাক, নামান—'

'স্যার, শুধু শুধু কেন হয়রান করছেন। আমাদের তাড়া আছে। দয়া করে যেতে দিন।'

অফিসার কোনও কথা শুনলেন না। জোর করে ট্রাঙ্ক নামানো হলো। অমরনাথের কাছ থেকে চাবি নিয়ে ওটা খুলতেই দেখা গেল ভেতরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে শঙ্কর। যাতে সে কথা বলতে না পারে সেজন্য মুখটা টেপ দিয়ে আটকানো।

ট্রাঙ্কটা খুলতেই সেই তাগড়াই লোক দুটো পালানোর জন্য দৌড় লাগিয়েছিল কিন্তু অফিসারের সঙ্গে যে বন্দুকধারী কনস্টেবলরা এসেছিল, তারা ওদের ধরে ফেলল।

তোরঙ্গের ভেতর থেকে একটা ছেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে, খবরটা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ভিড় জমে গেল। কীভাবে যেন রটে গেল অমরনাথই নাটের গুরু। ফলে উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘিরে ফেলে কিল চড় লাথি চালাতে লাগল। কোনও রকমে রাজা, রন্তু আর অমরনাথদের নিয়ে অফিসার পুলিশের ঘাঁটিতে এলেন। শঙ্করের হাত-পায়ের বাঁধন আর মুখের টেপ খুলে ফেলা হলো। সে প্রায় ধুঁকছিল। তাকে গরম দুধ খাইয়ে কিছুটা সুস্থ করে তোলা হলো।

শঙ্করের কাছ থেকে যা জানা গেল তা এইরকম। দু' দিন আগে রাত্রিবেলা রাজাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসার পর সে একটা ফোন পায়। এক বন্ধু তাকে তক্ষুণি যেতে বলেছে।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধুই তোমাকে ফোন করেছিল?'

শঙ্কর বলল, 'না। যে ফোন করেছিল সে বললে বন্ধুটির বাড়িতে কাজ করে।'

কোনওরকম সন্দেহ না করেই বেরিয়ে যায় শঙ্কর। বন্ধুটির বাড়ি জুহুতেই, জায়গাটা নির্জন। বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের রাস্তার আলোগুলো ওখানে জ্বলছিল না। খুব সম্ভব খারাপ হয়ে গেছে। ফলে চারদিক বেশ অন্ধকার। সে বন্ধুর বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই একটা লোক তার মুখ চেপে ধরে, আরেকটা লোক পাঁজাকোলা করে তাকে একটা গাড়িতে নিয়ে তোলে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাওয়াই লেকের কাছে একটা বাড়িতে। জোর করে এক গেলাস লস্যি খাওয়ানো হয়, ফলে ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সেই তাগড়াই লোক দুটোকে দেখিয়ে অফিসার বলেন, 'দেখ তো এরাই তোমাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল কিনা?'

ভাল করে দেখে শঙ্কর বলে, 'হ্যাঁ স্যার, এরাই।'

এবার অমরনাথের দিকে তাকান অফিসার। বলেন, 'শঙ্কর না সম্পর্কে আপনার ভাইপো হয়?'

মুখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়েন অমরনাথ, 'হ্যাঁ স্যার।'

'তার এরকম সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন কেন?'

প্রথমটা উত্তর দেন না অমরনাথ। তারপর প্রচণ্ড ধমক খেয়ে কবুল করেন, টাকার জন্যই এ কাজ করেছেন। বোম্বাইতে থাকলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। তাই শঙ্করকে কলকাতায় এনে তার মা-বাবার কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করতেন। তোরঙ্গের সেই ফুটোগুলোর রহস্যও জানা গেল। যাতে ভেতরে হাওয়া ঢুকতে পারে আর শঙ্কর দমবন্ধ হয়ে না মারা যায় সেজন্য ওগুলো করা হয়েছিল।

রাজা আর রন্তুকে দেখিয়ে অফিসার বললেন, 'এই ছেলে দুটোর জন্যে মতলব আর হাসিল করা গেল না, কী বলেন?'

বুকের ওপর মাথাটা আরও ঝুলে পড়ল অমরনাথের।

আরও কিছুক্ষণ পর অমরনাথ আর তাঁর দুই সঙ্গীকে হাজতে পাঠিয়ে অফিসার রাজাদের জিজ্ঞেস করেন, 'শঙ্কর তো তোমাদের বন্ধু। ওর ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে। ও তোমাদের কাছে থাকলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ স্যার'—রাজা বলল, 'আমরা শঙ্করকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।'

'আমি তোমাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। শঙ্করদের বম্বের ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়ে যাও। আমরা ওর বাবার সঙ্গে কনট্যাক্ট করছি।'

'আমরাও ফোন করে সব জানিয়ে দেবো।'

হাওড়া থেকে বাড়ি ফিরেই ফোনে লখুভাই পারিখকে ধরে ফেলল রাজা। কীভাবে শঙ্করকে তারা অমরনাথের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, সব জানিয়ে দিল। লখুভাই এবং তাঁর স্ত্রী ছেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। জানালেন, বিকেলের ফ্লাইটে তাঁরা কলকাতায় আসছেন।

কলকাতায় এসে তিনটে দিন তাঁরা রাজাদের বাড়িতেই থেকে গেলেন। ছেলেকে ফিরে পেয়ে রাজাদের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

তিন দিন পর শঙ্করকে নিয়ে ফিরে যাবার সময় লখুভাই বললেন, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরুবার পর রাজা আর রন্তুকে একমাস তাঁদের কাছে কাটিয়ে আসতে হবে। এবার গিয়ে বম্বেতেই আটকে ছিল তারা। পরের বার লখুভাই নিজে তাদের অজন্তা ইলোরা গোয়া থেকে সোমনাথ পর্যন্ত সব জায়গায় ঘুরিয়ে আনবেন। আর যা পুরস্কার দেওয়া হবে সেটা রাজারা এখন ভাবতেও পারবে না।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

ছবিঃ বিজন কর্মকার

ঠিক চিনি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তোষক লেপ গদি বালিশ কাঁথা কানি।
চোর বাছাধন জেলখানাতে টানছে ঘানি॥
আলনা শিকে কুলুঙ্গি তাক আলমারি।
জন্মদিনে দিদিকে মা কিনে দিয়েছেন লাল শাড়ি॥
টুল বেঞ্চি চৌকি মোড়া চেয়ার টেবিল দেরাজ সোফা।
এবার আমরা দীঘায় গিয়ে খোলা হাওয়ায় ছিলাম তোফা॥
খাতা কলম ফুলদানি বই পর্দা পাপোশ খড়খড়ি।
অঙ্কের স্যার লেখেন কম, ভাঙেন বেশি চকখড়ি॥
ঝোলা ঝুলি ব্যাগ বাস্কেট বাক্স তোড়ং সিন্দুক।
কাজ করতে গেলেই দেখো ভুল ধরবে নিন্দুক॥
কলিং-বেল লেটারবক্স তালাচাবি ছিটকিনি।
কোন লোকটা সুবিধের নয়, মুখ দেখেই ঠিক চিনি

স্বার্থপর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বেঞ্চে বসে ঠ্যাং নাচায়
আর গপাগপ ল্যাংচা খায়
খ্যাংরা-গুঁফো লোকটা, তার
ফন্দিটা কী বোঝাই ভার।

ঘাড়-ছাঁটা চুল, লম্বা নোখ,
ভাঁটার মতন ঘুরছে চোখ,
মাথার মধ্যে খাচ্ছে পাক
খারাপ চিন্তা কয়েক ঝাঁক।

উঁচকপালে, হলদে দাঁত—
আড়াল থেকে নজর কর্,
বুঝবি তবে ও নির্ঘাত
গুণ্ডা কিংবা গুপ্তচর।

আর তা ছাড়া খেয়াল কর্
লোকটা খুবই স্বার্থপর।
নইলে কি আর ঠ্যাং নাচায়
একলা বসে ল্যাংচা খায়?

পুজোর শুকতারা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পুজোয় চলে রান্নাবান্না কুটনো কোটাকুটি
জোগাড় হলো অনেক কিছুই এলো পুজোর ছুটি
রমু কমু বড়ই খুশি যাত্রা দেখতে যাবে
শুয়ে শুয়ে রাতে তারা রামের কথাই ভাবে
কদিন ধরে মেলা চলছে চড়কডাঙার মোড়ে
তারা দুজন হাততালি দেয় নাগরদোলায় চড়ে
রাত ও দিন কোথা দিয়ে কাটল এমন করে।

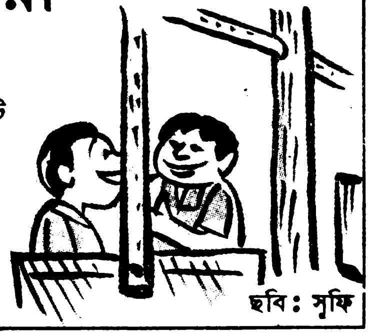

ছবিঃ সূফি

হাঁদা-ভোঁদার
বক্সিং প্রতিযোগিতা
নাম দিয়ে দাও, ভোঁদাদা! গত বার হাঁদাদা তোমাকে হারিয়েছিলো। এবার তার বদলা নাও।
নোটিশ
স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতা
গেম টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ করো।
বলছিস, বচা? তাহলে গেম টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ করি।
স্যার, এবারও আমি স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতায় নামতে চাই।
বেশ, লিস্টে তোমার নাম দিয়ে দেবো।
এবার তুমি ভালো করে প্র্যাকটিস শুরু করে দাও, ভোঁদাদা।
ঠিক কথা বলেছিস, বচা।
সেই মতো
কি রকম হচ্ছে রে, বচা?
দারুণ হচ্ছে, ভোঁদাদা! চালিয়ে যাও।
ওদিকে
এবার তোকে হারাবার জন্যে ভোঁদা একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে, রে, হাঁদা।
লাগতে দে।
গত প্রতিযোগিতায় নক আউট করিনি, এবারে ওটা করে দেবো। তুই এবারে বলটা আমার দিকে দে।
ঠিক আছে, হাঁদা।
অ্যাই, সাবধানে!
ওপস!
গদাম!
আরফ! আমার কানটা গেলো!
মরেছে!

উরিব্বাস! শিগগির দৌড়ো!
গরর! পালাচ্ছিস কেন? ফিরে আয় অপগণ্ডের দল!
এই যে আপনার একটা চিঠি, গেম টিচার! আর আপনি ভবিষ্যতে আপনার কয়েকজন দস্যি শিষ্যের ওপর নজর রাখবেন।
ঠিক আছে। এই প্রতিযোগিতাটা শেষ হোক, তারপর দেখবো আপনার অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে।
আরিব্বাস! স্কুলের সেরা বক্সারকে আর তার সঙ্গে তার প্রশিক্ষককেও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
সেই মতো
সবাই জিমখানায় চলো। ওখানে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। বিশেষ করে হাঁদাকে।
কেন, স্যার! আমার তো প্র্যাকটিস করাই আছে।
শোন, হাঁদা! তুই তো গতবারের চ্যাম্পিয়ান। এবারও যদি জিততে পারিস তবে চ্যাম্পিয়ানশিপের সঙ্গে বিশেষ পুরস্কার পাবি।
তাহলে তো প্র্যাকটিস করতেই হয়, স্যার!
সুতরাং
এরপর রোজ শ্যাডো প্র্যাকটিস করে যাবি।
ঠিক আছে, স্যার!

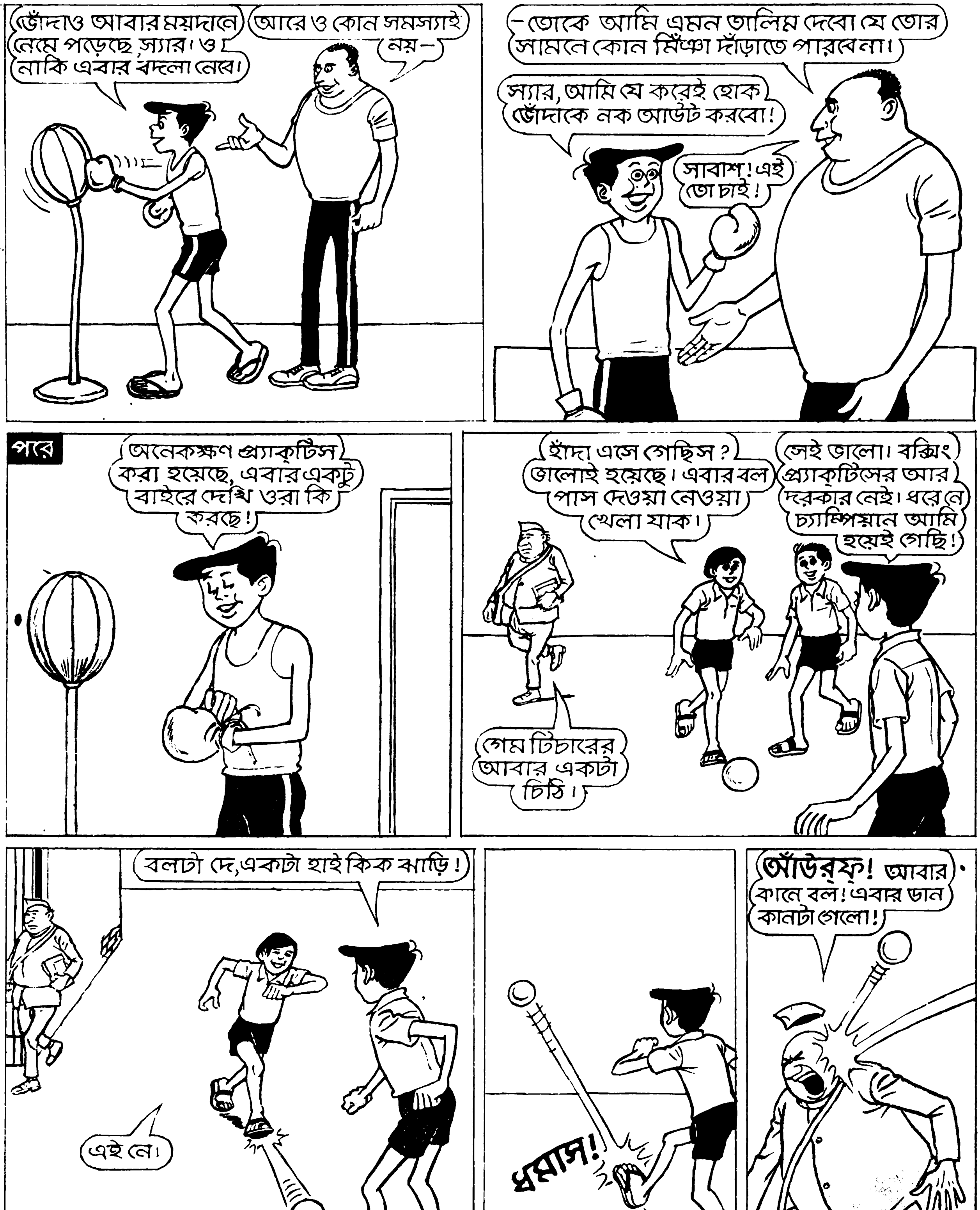
ভোঁদাও আবার ময়দানে নেমে পড়েছে স্যার। ও নাকি এবার বদলা নেবে।
আরে ও কোন সমস্যাই নয়—
—তোকে আমি এমন তালিম দেবো যে তোর সামনে কোন মিঁঞা দাঁড়াতে পারবেনা।
স্যার, আমি যে করেই হোক ভোঁদাকে নক আউট করবো!
সাবাশ! এই তো চাই!
পরে
অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস করা হয়েছে, এবার একটু বাইরে দেখি ওরা কি করছে!
হাঁদা এসে গেছিস? ভালোই হয়েছে। এবার বল পাস দেওয়া নেওয়া খেলা যাক।
সেই ভালো। বক্সিং প্র্যাকটিসের আর দরকার নেই। ধরে নে চ্যাম্পিয়ান আমি হয়েই গেছি!
গেম টিচারের আবার একটা চিঠি।
বলটা দে, একটা হাই কিক ঝাড়ি!
এই নে।
ধমাস!
আঁউরফ! আবার কানে বল! এবার ডান কানটা গেলো!

মরেচে! আবার সেই পোস্টম্যান!
ছুঁচো, পাজি, ধরতে পারলে মজা দেখিয়ে দেবো।
প্রতিযোগিতা শুরুর আগে
কেন মিছিমিছি লোক হাসাবি, ভোঁদা! তার চেয়ে আমাকে ওয়াক-ওভার দিয়ে দে! হেঃ হেঃ!
না, লড়াই থেকে আমি নড়ছি না।
তুই তো ভালোই লড়িস, তবুও যেভাবে তালিম দিয়েছি সেই ভাবে লড়লেই বাজিমাৎ করে দিবি, হাঁদা!
ঘাবড়িও না, ভোঁদাদা! লড়ে যেও।
আঃহা! এইতো রেফারি এসে গেছেন! চমৎকার! এবার জলদি শুরু করা যাবে!
একি! তুই! এবারে তুই কোথায় পালাবি রে, হাড়গিলে!
রেফারি
ওরে বাবা! সেই পোস্টম্যান!
বাঁচাও! হেল্প! আমি কেটে পড়ছি!
পালাচ্ছিস কোথায়? ফিরে আয় বলছি!
বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ভোঁদাদার জয়!
হাঁদা আমাকে ওয়াক-ওভার দিতে বলেছিলো, উল্টে ওই এখন আমাকে রানিং ওভার দিচ্ছে!
অপদার্থ!
রেফারি
বাঁচাও!

নোয়ার সঙ্গে তর্তনের প্রথম পরিচয়ের দিনটি ছিল খুব মজার। রোজ ভোরবেলা নোয়া ইডেনের বাগানকে বাঁয়ে রেখে ডাইনের ধুধু প্রান্তরে নেমে যেতেন। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি থাকত পুব দিগন্তের ওপর।

ধীরে ধীরে লালের তরঙ্গ তুলে দিগন্তের বনরেখার মাথায় লাফিয়ে উঠত লাল সূর্য। নোয়া অমনি নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করতেন।

সব কুশল তো?

প্রভু, আপনার কৃপায় সব কুশল।

নোয়া প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন।

তোমাদের ক্ষেতের ফসল?

সব তোলা হয়ে গেছে প্রভু।

সারা বছরের কঠোর শ্রমের ফল কি লাভ করেছ?

আশাতীত লাভ হয়েছে। পর পর তিন বছর আমার তিন পুত্র আর পুত্রবধূরা যে ফসল ঘরে তুলেছে তা সাত বছর খেয়েও শেষ করা যাবে না।

ঈশ্বর বললেন, সে-ই বিচক্ষণ যে দুর্দিনের কথা ভেবে সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখে।

এমনি এবং আরও অনেক কিছু কথা হয় ঈশ্বরের সঙ্গে নোয়ার।

কথা শেষে নোয়া উঠে দাঁড়ান। ঈশ্বর তাঁর ভক্তের গায়ে জড়িয়ে দেন একখানি অতি অপূর্ব সোনালী উত্তরীয়। সেই তপ্ত উত্তরীয়খানি গায়ে জড়িয়ে নোয়া ফিরে আসেন ঘরে।

নোয়া, তর্তন ও ঈশ্বর

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সেদিনও নোয়া ভোরের ভ্রমণে যাবার জন্য বেরোলেন। কুয়াশায় সঠিক সময় বোঝা যায়নি। ইডেনের কাছাকাছি আসতেই কুয়াশা কেটে গেল। নোয়ার মনে হলো ভোরের প্রার্থনার সময় পার হয়ে গেছে।

অতি দ্রুত পা চালিয়ে ইডেন পার হয়ে যাবার সময় বাগানের সীমার বাইরে

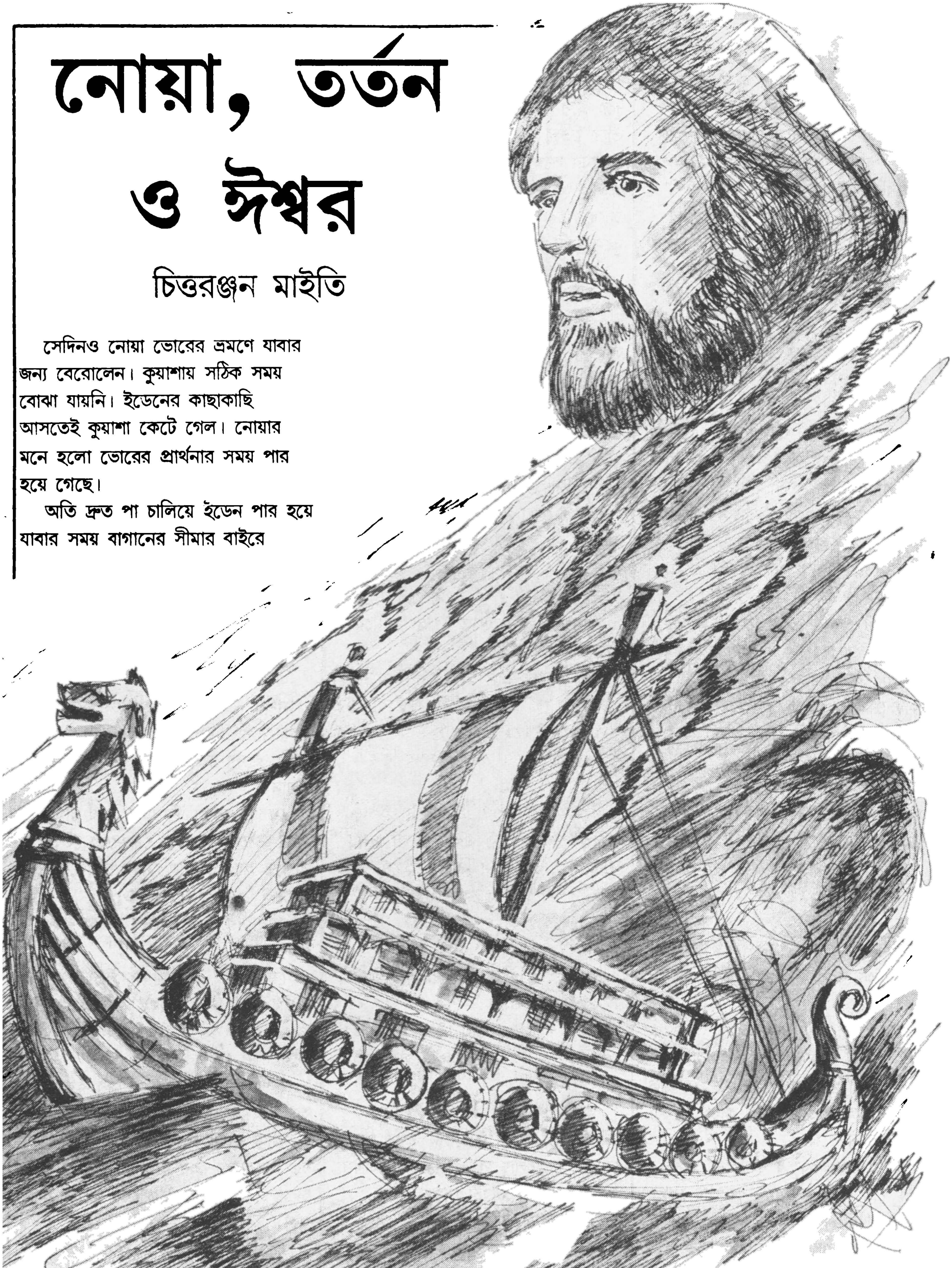

দাঁড়িয়ে থাকা একটি পুরনো অলিভ গাছের ডালপাতার ফাঁকে ভোরের হাওয়ার সঙ্গে ভোরের পাখিদের কূজন শুনতে পেলেন।

ভোরের হাওয়া বয়ে যাবার শব্দ আর অনেক পাখির সম্মিলিত কলরব উঠছিল। ভোরবেলাকার বড় পরিচিত সব শব্দ।

তাহলে কি সময় পার হয়ে যায়নি! কিন্তু নোয়া ভোরের পাখিদের ঝাঁক বেঁধে উড়ে যেতে দেখলেন না। আর হাওয়ার শব্দ হলেও তা তাঁর গায়ে এসে লাগল না। তিনি অবাক হলেন।

মাঠে নামতে গিয়ে দেখলেন, কুয়াশার জাল ছিঁড়ে সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে।

নোয়া ভাবলেন, পাখিরা তো এত ভুল করে না। ভোরের গন্ধ পেলে তারা ঝাঁক বেঁধে কখন উড়ে যেত।

পেছন ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। আশ্চর্য! পাখিরা গেল কোথায়! হাওয়ার শব্দও নেই, নিথর দাঁড়িয়ে আছে জলপাইয়ের গাছ, পাতাটিও নড়ে না।

ওখানে গাছের তলায় কে? মাথাভরা চুল, কোমরে চামড়ার একখণ্ড পোশাক জড়ানো। কাঁধ থেকে ঝুলছে চামড়ার একটি ঝোলা। হাতে ভেড়া তাড়ানোর লাঠি। ঐ তো একটু দূরে ভেড়ার পাল চরছে।

কিশোর ছেলেটিকে দেখে ভারি ভাল লেগে গেল নোয়ার। তিনি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

কি নাম তোমার? নোয়া পরিচিত হতে চাইলেন।

তর্তন।

তর্তন মানে তো সেনাপতি। তুমি অনেক কষ্টসহিষ্ণু, স্থিরবুদ্ধি আর সাহসী হবে।

তুমি তো নোয়া দাদু, আমি তোমাকে চিনি। রোজ আমি গাছের তলায় বসে তোমাকে প্রান্তরে যেতে দেখি। সূর্য লাল হয়ে ওঠে আর তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর নতজানু হয়ে।

নোয়া লজ্জিতভাবে বললেন, আজ বড় দেরি হয়ে গেছে আমার। কুয়াশায় বেলা বুঝতে পারিনি। আজ আমার আসার আগেই প্রভু তাঁর দিনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কর্মরত প্রভুকে আমি অসময়ে ডেকে বিরক্ত করতে চাই না।

তর্তন বলল, আমি ভেড়া নিয়ে অনেক দূরে চলে যাই। একদিন গীহোন নদীর তীরে ভেড়া চরাতে চরাতে এক বুড়ো মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। এত বুড়ো যে তার মাথা হাঁটুতে লেগে গেছে। তবু সে অতি কষ্টে একটা খন্তা তুলে মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করছিল।

আমি তাকে বললাম, তুমি কি করছ?

লোকটি চোখের ওপর হাতের ছাউনি ফেলে আমার দিকে একবার তাকাল, তারপর নিজের কাজ করতে করতে বলল, দেখতেই তো পাচ্ছ মাটি খুঁড়ছি।

লোকটির হাতের খন্তা অতি ধীরে উঠতে-নামতে লাগল। আমি দেখলাম প্রতি আঘাতে ও এক ঝিনুকের অর্ধেক মাটিও সরাতে পারছে না।

আমি বুড়ো মানুষটিকে বিনীতভাবে বললাম, বড় অসময়ে তুমি খোঁড়ার কাজ শুরু করেছ, এই বুড়ো বয়সে এত ভারী কাজ।

মানুষটি এবার হাতের খন্তা থামিয়ে আমার দিকে তাকাল।

যে কোনো ভাল ইচ্ছা যখনই মনের ভেতর জেগে উঠবে তখনই জানবে, শুভ সময় এসে গেছে, কাজ শুরু করে দিতে হবে। শুভ কাজে সময়-অসময় কিছু নেই।

[নোয়া ভাবলেন, ঐ বৃদ্ধটির কথা বলে তর্তন আমাকে একটি শিক্ষা দিল। ঈশ্বরকে ডাকার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যখনই মন তাঁকে চাইবে তখনই বুঝতে হবে সময় হয়েছে তাঁকে ডাকবার।]

বৃদ্ধের গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। আকাশে সূর্যের প্রখর তেজ।

আমি বললাম, তুমি কি এই মাঠের শেষে যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, সেখানে থাক?

আমি যখন গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে জীবন কাটাতাম তখন গ্রামের কোনো গাছতলায় পড়ে থাকতাম। এখন এই যে পাশের টিবিটা দেখছ, ওর আড়ালে পড়ে থাকি।

প্রতিদিন তাহলে খাবার জন্য ভিক্ষে করতে যেতে হয় গ্রামে?

বৃদ্ধ বলল, না, এই গীহোন নদী কূশ দেশকে বেড় দিয়ে বইছে। অনেক নৌকো এই নদীপথে যাতায়াত করে। আমার একটি বঁড়শি রয়েছে। আমি নদীতে মাছ ধরি। সেই মাছ কিছু খাবারের বিনিময়ে মাঝিদের দিয়ে দিই। ওতেই চলে যায়।

আমি বললাম, এই খোঁড়ার কাজটা তুমি চালাচ্ছ কেন?

ঋণশোধ।

কি রকম?

আমি যাদের কাছে এতদিন ভিক্ষে করে খেয়েছি তাদের সামান্য ঋণশোধের চেষ্টা করছি।

আমাকে বুঝিয়ে বল।

বুড়ো মানুষটি বলল, চল, আমরা টিবির আড়ালে ডেরায় গিয়ে বসি। ওখানে সামান্য কিছু খাবার আছে, তাই খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আমি বললাম, আমার থলেতে অনেক শুকনো খেজুর আছে, ভেড়ার দুধের সঙ্গে বেশ জমবে।

বুড়ো মানুষটির মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

এ যে রাজভোগ রে।

নদীর তীর জুড়ে বেশ ঘাস জন্মেছে। ভেড়াগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। আমি তাদের ভেতর ঢুকে দুধ দুয়ে নিয়ে এলাম।

ডেরাটি বেশ। উঁচু টিবি। সূর্য মাথার ওপর উঠলে কিছুসময় রোদ্দুরের ভেতর থাকতে হয়, তারপর টিবির চারদিকে ঘুরলেই রোদ ঠেকানো যায়।

আমাদের প্রথম দিনের ফলার দারুণ জমল।

সেদিন সূর্য ডোবার পর গাঁয়ের মাথায় জেগে উঠল চাঁদ। ক্রমেই সেটা আকাশে উঠতে লাগল আর তার আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক।

বুড়ো মানুষটি বলল, চাঁদের ঝকঝকে আলোয় কেমন দেখাচ্ছে ঐ গাঁ?

আমি বললাম, প্রতিটি ঘর আর বড় বড় গাছগুলো যেন আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। বড় সুন্দর, ঠিক যেন স্বপ্নের পুরী।

বুড়ো মানুষটির গলায় ঝাঁঝ। বলল, বাস বাস, আর বেশি বলতে হবে না।

দূর থেকে সবকিছু সুন্দর দেখায়, কাছে গেলেই চেনা যায় তার আসল রূপটি।

আমি কোনো কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম দেখে বুড়ো মানুষটি আবার বলল, গ্রামটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। পুব-পশ্চিম দুটো দিকের মানুষ, দু'ভাগ হয়ে লড়ছে। লাঠালাঠি মারামারি লেগে আছে সারাক্ষণ। এই যে ফাঁকা মাঠ দেখছ, নদী থেকে খাল কেটে নিয়ে গেলে ওখানে সোনা ফলে কিন্তু ওরা তা মিলেমিশে করবে না। তাই মরার আগে আমি যতটুকু পারি করে যাব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কি করবে?

এই তো খাল কাটার কাজ করছি।

এত অল্প শক্তিতে এতবড় কাজ কি করে করবে?

মানুষটি বলল, একেবারে কিছু না করার চেয়ে অতি সামান্য কিছু করাও ভাল। আমি জানি, দু'হাত মাটি কেটে খালটার গোড়াপত্তন করে যাবার আগেই ওপার থেকে আমার ডাক আসবে, তবু এককণা হলেও ঋণ শোধের চেষ্টা করে গেলাম, এই সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারব।

নোয়া বললেন, ওকে সাধারণ ভিখিরী বলে মনে কর না, প্রভুর কিছু কৃপা আছে ওর ওপর।

তর্তন বলল, এবার ওর পরিণতির কথাটা শোন।

নোয়া তাকালেন তর্তনের মুখের দিকে।

আমি বুড়ো মানুষটির সঙ্গে যোগ দিলাম মাটিকাটার কাজে। বেলেমাটি, তাই কাজ করা বেশ সহজ হলো। আমি একসময় ওকে বললাম, তুমি খন্তাটা আমার হাতে দাও। তুমি বরং মাছ ধরার কাজটা চালিয়ে যাও।

আমাদের ব্যবস্থা ঠিক ছিল, কাজও এগোচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল একদিন। দু'পক্ষই খাল কাটা হচ্ছে জানতে পেরে শাসিয়ে গেল। যে যার পাড়ার সীমানা থেকে খালটাকে অন্য পাড়ার দিকে ঠেলে দিতে চাইল।

নোয়া জানতে চাইলেন, এর কারণ? সবাই তো চাইবে নিজের পাড়ার দিকে খালটাকে টেনে নিয়ে যেতে।

তর্তন বলল, ওরা ধরে নিয়েছিল, একদিন খালটাই হবে দু'পাড়ার জমির সীমানা। তাই অন্য পাড়ার দিকে খালটাকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের জমি বাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল।

তারপর?

তর্তন বলল, ব্যাপারটা নিয়ে দু'দলে এমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল যে লড়াই করে ফয়সালা করতে চাইল।

নোয়া বললেন, সে আবার কি রকম ফয়সালা?

ওরা ঠিক করল, সূর্য মাথার ওপর উঠলেই দু'পক্ষ লড়াই শুরু করবে, তারপর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শেষ।

এই হারজিতে কি ফয়সালা হবে?

তর্তন বলল, সামনের ময়দানে সূর্য ডোবার আগে যে দল অন্য দলকে যতটা হটিয়ে দিতে পারবে ততটা জায়গা তাদের।

তারপর?

লাঠিসোটা, ধারাল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দু'পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেহের ছায়া পায়ের তলায় এলেই শুরু হয়ে যাবে লড়াই।

হঠাৎ ওরা একটা চিৎকার শুনে নদীর দিকে ফিরে তাকাল। আমিই উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ওদের চিৎকার করে ডাকছিলাম।

ওরা দু'পক্ষই নদীর দিকে এগিয়ে এল। বুড়ো মানুষটি এতগুলো গ্রামবাসীর বিপদের কথা ভেবে সেই যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আর ওঠে না। চোখ দুটো প্রায় স্থির, জরাজীর্ণ পাঁজরে কান পাতলাম, বুকের ভেতরে একটা ধুক্‌ধুক্ আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছিল।

সবাই আমার ডাক শুনে এসে পৌঁছল বুড়োর কাছে। তখন সেই সাধু ভিখিরীর প্রায় শেষ অবস্থা। সব মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তখন।

আমি মুখে, মাথায় জল দিলাম। মরণ-পথের যাত্রী চোখ ঘুরিয়ে মনে হয় সবাইকে একবার শেষ দেখা দেখে নিল। মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। বহু কষ্টে কাঁপা কাঁপা হাত একখানা ওপরের দিকে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল সে হাত। আর সেই মুহূর্তে বেরিয়ে গেল প্রাণ।

আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, ওর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম।

ওরা ততক্ষণে ওদের ভুল বুঝতে পেরেছে। আমাকে সেই মৃত মানুষটির বুক থেকে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

সবাই অবাক হয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করল, মৃত মানুষটি তার বাঁহাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে মাটি খোঁড়ার সেই খন্তাটা।

মুহূর্তে মানুষগুলোর মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। সেদিন সেখানেই তারা প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনও নিজেদের ভেতর লড়াই করবে না। আগামী দিন থেকে মিলেমিশে তারা এই খাল খুঁড়ে নদীর জল মাঠের ভেতর নিয়ে যাবে। যে ফসল ফলবে তা গাঁয়ের সবাই দরকার মতো ভাগ করে নেবে।

সেই বুড়ো মানুষটিকে সবাই মিলে পাশের ঢিবির ওপর নিয়ে গিয়ে কবর দিল। মাথার দিকে একটা গাছও লাগানো হলো।

সবাই বলতে লাগল, এই মানুষটিই

এখানে থাকবে আমাদের গাঁয়ের মানুষ আর ক্ষেতের ফসলের রক্ষাকর্তা হয়ে।

তর্তন তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শেষ করে বলল, আমি ঈশ্বরকে নিজের চোখে দেখিনি, জানি না তিনি কেমন, তবে এই বুড়ো মানুষটি আমার সবটুকু ভক্তি আর ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছে।

ছেলেটিকে ভাল লেগে গেল নোয়ার।

পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই প্রান্তরে পৌঁছে গেলেন নোয়া। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল কলরব তুলে। ধীরে ধীরে লাল সূর্য দিগন্তরেখার ওপর উঠল। প্রান্তরে নোয়া নতজানু হলেন।

সেই অপার্থিব কণ্ঠস্বর শোনা গেল, নোয়া, তুমি কি নদীর স্রোতে রাশি রাশি শ্যাওলা ভেসে যেতে দেখছ না?

দেখেছি প্রভু, হিদ্দেকল নদী দিয়ে প্রচুর শ্যাওলা আসুর দেশের দিকে বয়ে যাচ্ছিল।

শুধু হিদ্দেকল, পীশোন, গীহোন আর ইউফ্রেতিস নয়, আমার বহু আনন্দ দিয়ে গড়া এই পৃথিবীর সব নদীতেই শ্যাওলা জমে উঠেছে। আমার স্বচ্ছ নীল আকাশে নির্মল বাতাস বইছিল, এখন পৃথিবীর ধূলিকণা তাকে গ্রাস করছে। আর পৃথিবীর বুকে যে মানুষকে আমি আমার সব থেকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে করেছিলাম, তাদের মুখেচোখে আমি কুটিল ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তারা ভুলে যাচ্ছে কৃতজ্ঞতা শব্দটাকে।

নোয়া বলল, প্রভু, আমার আচরণ কি কোনোদিন আপনার ক্ষোভের কারণ হয়েছে?

আজ পর্যন্ত তুমি আমার সৃষ্টির ভেতর সব থেকে শুদ্ধ আর শ্রদ্ধাবান বলে চিহ্নিত হয়ে আছ।

ঈশ্বর সেদিনও নোয়াকে একটি সোনালী উত্তরীয় দান করে আকাশপথে গমন করলেন।

নোয়া ফিরে এল ইডেন উদ্যানের ধারে সেই প্রাচীন জলপাই গাছের তলায়।

তর্তন এতক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছিল। তার ভেড়াগুলো চরছিল ইডেনের ভেতর দিয়ে বয়ে আসা মূল জলস্রোতের তীরে। ঐ স্রোত থেকেই জন্ম নিয়েছে চারটি নদীঃ পীশোন, গীহোন, হিদ্দেকল আর ইউফ্রেতিস (ফরাৎ)।

তুমি বাঁশি বাজাতেও পার?—নোয়ার সপ্রশংস জিজ্ঞাসা।

তর্তন বলল, শিখলেই সবকিছু পারা যায়।

নোয়া বলল, তা ঠিক, তবে তার সঙ্গে ঈশ্বরের বাড়তি করুণা চাই।

এ বিষয়ে আমি কি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি নোয়া দাদু?

অবশ্যই। কি প্রশ্ন?

আমাকে বাঁশি শেখালেন একজন গুণী মানুষ। আমি তাঁর শেখানো সুরগুলোকে অভ্যেস করছি, এখানে ঈশ্বরের করুণা এলো কোন্ পথে?

আকাশে-বাতাসে, পাখির গানে, পাতার মর্মরে, মেঘের ডাকে, বৃষ্টিপাতে আর জলের কল্লোলে যে ধ্বনি ওঠে তাই নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সুর। ঈশ্বর আড়ালে থেকে গুণীদের ঐ সুর শোনান। তার সঙ্গে মিশিয়ে দেন, ভাল লাগার মধু। তাই গুণীদের কাছে যে কোনো সুর শুনে আমরা মুগ্ধ হই।

আচ্ছা দাদু, তোমার মুখে শুনি ঈশ্বর করুণাময়, কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন বার বার জেগে ওঠে, তার উত্তর এখনও আমি পাইনি।

কি প্রশ্ন বল? আমি সাধ্যমতো উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

আমি যখন অনেক ছোট তখন থেকে ঐ ইডেন উদ্যানের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু আমি কোনোদিনই ঢুকতে পারিনি। একটা গাছের ডালে রসাল সব ফল ফলে আছে, সেই গাছের একটি ফলও কোনো পাখি, কোনো কাঠবিড়ালী, কোনো প্রাণী খেতে পায় না। সেই ফলের গাছকে পাহারা দিচ্ছে উড়ন্ত সব শিশু-দেবদূতেরা। কেউ ফল পাড়ার চেষ্টায় এগোলেই একটি জ্বলন্ত খড়্গ ঘুরতে ঘুরতে তার সামনে এসে হাজির হয়। বাগানের যে কোনো পথ ধরে ঐ গাছের দিকে যাবার চেষ্টা করলেই সেই উড়ন্ত পাহারাদার আর ঐ জ্বলন্ত খড়্গ ঘুরতে ঘুরতে এসে পথ আটকাবেই। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইনি।

নোয়া বললেন, ওটা যে জীবনবৃক্ষ, ওর ফল খেলে মানুষ যে অমর হয়ে যাবে। তার আর মৃত্যু হবে না।

অমর হলে হবে, তাতে ক্ষতি কি?

নোয়া বললেন, বোকা ছেলে, তাতে ক্ষতি আছে বই কি। ঈশ্বর সব দিক ভেবেই গাছটাকে ওভাবে রক্ষা করছেন।

কি রকম?—তর্তন সহজে কোনো কিছু মেনে নেবার পাত্র নয়।

এই ধর তোমার মহল্লায় শুধু ভাল লোকই নেই, কিছু মন্দ লোকও আছে। ভাল লোক যেমন মানুষের উপকার করে, মন্দ লোক তেমনি চেষ্টা করে মানুষের অনিষ্ট করার। এটা মান তো?

মানি।

অমর হয়ে গেলে দুষ্টু লোকেরা অনন্তকাল ধরে এ দুনিয়াটাকে লণ্ডভণ্ড করবে।

সেটা বুঝলাম, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না।

বল, কি বুঝতে পারনি?

বাগানে ঐ গাছটাকে রেখে দেবার দরকারই বা কি? ওটাকে ওখানে রেখে ঈশ্বর মানুষের লোভকেই জাগিয়ে তুলছেন।

কথাটা ভাল লাগল না নোয়ার। ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছার সমালোচনা করার শক্তি নেই কারো, এই সত্যটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বসে আছেন নোয়া। তবু কিছু বলতে হয় তর্তনকে, তাই বললেন, এত বড় বিশ্বের কোটি কোটি বস্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ভাবনা বা উদ্দেশ্যের কতটুকুই বা আমরা ধরতে পারি। কোনো কিছু নেই থেকে যিনি এত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে আমরা কি করে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরতে পারি বল। তুমি কি পার, কিছু না থেকে একটা দূর্বা ঘাস তৈরি করতে? কোটি কোটি প্রাণীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আকার দিতে? ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে সমালোচনা করে কোনো কথা বল না তর্তন। আমি তোমাকে ভালবাসি, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে তুমি আর আমাকে কষ্ট দিও না। এসো, আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করি।

তর্তন বলল, বেশ তাই হোক।

আসলে তর্তনের ভেতর একটা জিজ্ঞাসু মন আছে। কিন্তু তার মনের গড়নটা বড়

কোমল। সে মানুষের কষ্ট, দুঃখ সইতে পারে না।

নোয়া বললেন, ভেড়া চরাতে চরাতে তুমি তো অনেক দূর দেশে গেছ, ঐসব দেশ আর মানুষজনের গল্প শোনাও।

তর্তন বলল, যেদিন কুয়াশার জন্য তুমি সময় ঠিক করতে পারনি, আর অনেক দেরি হয়ে যাবার জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনাও করতে পারনি, সেদিন কি তুমি ভোরের পাখির ডাক শোননি?

শুনেছিলাম, শুনে অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, পাখিদের এত ভুল হবার তো কথা নয়। তারা এত বেলায় ভোরের কলরব করছিল কিভাবে! আমি কিন্তু তারপর তাদের আকাশ দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেতে দেখিনি। গান থেমে গিয়েছিল। গাছের ডালে আমি পাখিদেরও দেখতে পাইনি।

তুমি পাবে কি করে, তোমার আসার আগেই পাখিরা উড়ে গিয়েছিল, সেই সূর্য ওঠারও আগে।

সে কি! আমি যে নিজের কানে ওদের গান শুনলাম, সূর্য তখন যদিও অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে।

তর্তন নোয়াকে অবাক করে দিয়ে বলল, তুমি আমার ডাক শুনে পাখির কলরব বলে মনে করেছিলে।

অসম্ভব! মানুষের কণ্ঠস্বর কিভাবে এতগুলো পাখির কাকলি হতে পারে!

আমি সত্যি বলছি নোয়া দাদু, তুমি শুনতে চাও তো এখুনি তোমাকে কয়েকটা আওয়াজ শুনিয়ে দিচ্ছি।

নোয়া কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

মিষ্টি সুরে হঠাৎ ডেকে উঠল একটা কোকিল। ডাকটা মনে হলো ইডেন উদ্যানের কোনো গাছের ভেতর থেকে ভেসে আসছে।

পরমুহূর্তে অন্য পাখিটা সঙ্গীর ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল।

অনবদ্য সুরেলা ছিল সেই উত্তর-প্রত্যুত্তর।

এরপর থলে থেকে কি একটা জিনিস বের করে মুখে ঢোকাল। তারপর এমন জোরাল একটা শব্দ তুলল, যাতে মনে হলো ঝড় বইছে।

কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের আওয়াজ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল নদীর কলধ্বনি। কখনো কাছে নদী বইছে, কখনো দূরে সরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ এক ঝাঁক যাযাবর হাঁস কলরব করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে। এতগুলো হাঁসের পতনের শব্দও নিখুঁতভাবে বাজতে লাগল কানে।

এখন চরাচর নিস্তব্ধ, থেমে গেছে তর্তন। বিস্ময়ে কথা বেরোচ্ছে না নোয়ার মুখ দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে নোয়া বললেন, আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না কোনো মানুষের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব। তাছাড়া তর্তন, তোমার বয়স তো এখনও পনের বছর পার হয়ে যায়নি। এই কিশোর বয়সে তুমি কি করে পারলে এমন অসাধ্যসাধন করতে!

একটু থেমে গেলেন নোয়া। তারপর নিজেই যেন উত্তরটা খুঁজে পেয়েছেন, এমনিভাবে বললেন, করুণা, করুণা, তাঁর কৃপা ছাড়া কি এ কাজ কারু পক্ষে করা সম্ভব? বিশেষভাবে এই অল্পবয়সী কিশোরটির পক্ষে!

তর্তন বলল, আমি যাঁর কাছে এ বিদ্যা শিখেছি তিনি আমাদেরই মতো মানুষ, তিনি ঈশ্বরের করুণালাভের কথা কোনোদিনই আমার কাছে বলেননি। বরং তিনি আমাকে বলেছিলেন, যা শিখলে তা রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। অস্ত্রে শান দিলে তবেই তার ধার থাকে, নাহলে মরচে পড়ে ভোঁতা হয়ে যায়। তুমি রোজ এগুলি অভ্যেস করবে তবেই দিনে দিনে নিখুঁত আর উজ্জ্বল হবে।

নোয়া বললেন, তোমার গুরুর কথা ঠিক, অনুশীলন না করলে যে কোনো বিদ্যাই নষ্ট হয়ে যায়। তবে একটা কথা মনে রেখ, তোমার এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।

তর্তন বলল, আমাকে একটু বুঝিয়ে বল দাদু।

নোয়া বললেন, তুমি যে অসাধারণ গুণটি আয়ত্ত করেছ সেটি কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকেই পাওয়া।

কি রকম?

বাতাসের শব্দ, নদীর স্রোতের ধ্বনি, উড়ন্ত হাঁসের ডাক, জলের চল্‌কে ওঠার শব্দ, এসবই বিধাতার বিচিত্র শব্দ রচনার ভেতরেই রয়েছে, তুমি সেগুলিকে তোমার অসাধারণ ক্ষমতার বলে অনুকরণ করেছ মাত্র। আচ্ছা, এখন তুমি তোমার গুরুর কথা কিছু শোনাও। তাঁর ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না।

গুরুর কথায় তর্তন দারুণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে শুরু করে দিল তার গুরু ওফীরের কাহিনী।

পীশোন নদীর তীর ধরে ভেড়া চরাতে চরাতে এক সময় আমি হবীলা দেশে হাজির হলাম। নদী এখানে দেশটাকে যেন ঝকঝকে একখানা রুপোর বালার ভেতর বন্দী করে রেখেছে। হবীলা দেশ সোনার জন্য বিখ্যাত। উৎকৃষ্ট সোনার ভাণ্ডার আছে সেই দেশে। কিন্তু সোনার গুপ্ত ভাণ্ডার কোথায় আছে তা একজন ছাড়া কেউ জানে না। তিনিই দেশের মানুষের সর্দার। তাঁর কথাতেই সারা দেশটা চলে। বণিকরা যখন বাইরের দেশে ব্যবসার জন্য যাত্রা করে তখন সর্দার তাদের সঙ্গে গোমেদকমণি, গুগ্‌গুল্‌ আর সোনার খণ্ড দিয়ে দেন। সেই সবের বিনিময়ে বিদেশ থেকে বণিকরা হবীলার জন্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিস নিয়ে আসে।

নোয়া বললেন, সর্দার যখন মারা যাবে তখন নতুন কোনো লোককে তো সর্দার নির্বাচন করা হবে?

তা নিশ্চয়ই হবে।

ওখানে কি পুরুষানুক্রমে সর্দারের বংশধররাই সর্দার হয়?

একেবারেই নয়। সর্দার মারা গেলে ওখানকার মোড়লরা নানারকম চিহ্ন দেখে চারজনকে সারা দেশের চারদিক ঢুঁড়ে নির্বাচন করে আনে। তাদের আবার এগোতে হয় নানারকম প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে। শেষে বিজয়ী জনকেই সর্দারের পদ দেওয়া হয়।

নোয়া বললেন, কিন্তু একটা প্রশ্ন যে থেকে যাচ্ছে।

কি প্রশ্ন?

সর্দার মারা যাবার পরেই তো নতুন সর্দার আসবে।

হাঁ।

তাহলে সে সোনার ভাণ্ডারের ঠিকানা জানবে কি করে? তুমি তো বলছ

একমাত্র সর্দারই সে খবর জানে। আর যে হঠাৎ করে মারা গেল, তার কাছ থেকে তো সোনার ভাণ্ডারের হদিস পাওয়া সম্ভব নয়।

তর্তন বলল, সর্দার মারা যাবার পরেই নতুন সর্দার এসে তার শোবার ঘরের মাথার দিকের দেওয়ালের ঠিক মাঝের একখানা পাথর খসিয়ে ফেলবে। ঐ পাথর তিনকোণা, আকারে বেশি বড় নয়। পাথরখানা হাতে নিয়ে তার উল্টো দিকে তাকালেই কতকগুলো আঁকিবুকি দেখা যাবে। তার সমাধান করতে পারলেই নতুন সর্দার সেই সোনার ভাণ্ডারের হদিস পাবে, আর মরণ না আসা পর্যন্ত সে-ই সর্দার হয়ে থাকবে।

কিন্তু সর্দার হবার পরে সে যদি সোনার ভাণ্ডারের হদিস না পায়?

তর্তন বলল, সারাদিন সন্ধান করার সুযোগ পাবে। খোঁজ না পেলে আবার আসবে নতুন আর এক সর্দার। তাকে বিদায় নিতে হবে।

নোয়া বললেন, এখন বল তোমার সেই গুরুর কথা।

তর্তন বলল, আমি যে এক মেষপালক হয়ে হাবীলা দেশের এত কথা জানলাম, তার মূলে কিন্তু রয়েছেন আমার সেই গুরু। আর তাঁর দয়ায় আমি শুধু এই ডাকগুলোই শিখিনি, হাবীলার সেই সোনার ভাণ্ডারটিও দেখে এসেছি।

আশ্চর্য! তুমি কি করে দেখলে? ঐ ভাণ্ডারের খবর তো একমাত্র সর্দারেরই জানার কথা।

তর্তনের বয়স অনেক কম কিন্তু অভিজ্ঞতা তার কম নয়। ছোটবেলা থেকে মা-বাবাকে হারিয়ে সে পথে পথে ঘুরছে তার ভেড়ার পাল নিয়ে। কখনো বনের ছায়ায়, কখনো মরুপ্রান্তরে, কখনো বা পাহাড়ের গুহায় তার আশ্রয় জোটে। পথে পথে কত মানুষকে দেখেছে সে, তাদের বিচিত্র জীবনের কথায় ভরে উঠেছে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি।

নোয়ার জিজ্ঞাসার জবাবে তর্তন বলল, আমি তখন পীশোন নদী ধরে আমার ভেড়ার পাল নিয়ে হাবীলায় পৌঁছেছি। হাবীলার উত্তর দিকে জঙ্গল আর পাহাড়। আমি লোকালয়ে না গিয়ে কদিন বনের ভেতরেই ভেড়া চরালাম। অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার আর পাখি রয়েছে বনে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, একটি বুড়ো চিতা ছাড়া হিংস্র কোনো জন্তু ও বনে নেই।

পীশোন নদী বনের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে উত্তরের পাহাড়ে ঢুকেছে। তারপর পাহাড় কাটতে কাটতে বেরিয়ে গেছে ওপারে। দিনের পর দিন ওপরের নদীখাতে বড় বড় পাথর আর গাছপালা পড়ে ওপরটা একেবারে জমাট বেঁধে গেছে। নদী কিন্তু ভেতরের সুড়ঙ্গ-পথ ধরে বয়ে চলেছে প্রবল গতিতে। ওপরের পাথরগুলোর ফাঁকে কান পাতলে, সুড়ঙ্গ-পথে ধেয়ে চলা নদীর গর্জন শোনা যায়।

একদিন ভেড়া নিয়ে আমি ঘাসের জমির খোঁজে পাহাড়ে উঠেছি। আমার পেছন পেছন আসছিল ভেড়ার পাল। আমি তখন জলতেষ্টায় কাতর। একটু দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে পেয়ে আমি একটু নিচে নেমে সেদিকে ছুটলাম।

জল খেতে খেতে শুনতে পাচ্ছিলাম, ভেড়াগুলো চেঁচাচ্ছে। জায়গাটা ভারী সুন্দর। পাহাড়ী লতা আর ফুলে ছেয়ে আছে চারদিক। হাওয়ার একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মাঠের ওপর দিয়ে যেন একঝলক হাওয়া ছুটে চলেছে, এমনি শব্দ। তার ভেতর ঝরা পাতার উড়ে যাবার শব্দও পেলাম। একটা পাখি গাছের ডালে ডেকে উঠেই ঝটপট পাখা মেলে উড়ে গেল।

আমি তাকিয়ে কিন্তু পাখিটাকে দেখতে পেলাম না।

ক্লান্ত ছিলাম, একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। পাহাড়ে অনেক গাছ আছে। আমার ভেড়াগুলোকে যেখানে ছেড়ে এসেছি, সেখানেও অনেক গাছ ছিল। ওরা নিশ্চয়ই আমি না যাওয়া পর্যন্ত ওখানে গাছের তলায় শুয়ে, দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করবে।

আমি যে পাথরের ওপর বসেছিলাম, তার তলা থেকেই একটা শব্দ উঠছিল। আমি পাথরটার ওপর শুয়ে কান ঠেকিয়ে ঐ শব্দ শুনতে লাগলাম। মনে হলো, পাতাল থেকে শব্দটা উঠে আসছে।

কতক্ষণ পরে আমি আবার উঠে দাঁড়িয়ে ভেড়াগুলোর দিকে চলতে লাগলাম।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখি, একটিও ভেড়া নেই। কোনো যাদুকর যেন মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে গেল ভেড়াগুলোকে।

খানিকটা সময় আমার ঝর্ণার ধারে কেটেছে ঠিক, কিন্তু ভেড়াগুলোর তো এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার কথা নয়। আমি আশ্চর্য হলাম!

হঠাৎ যেন একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে আমি ভেড়াদের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেদিকে ছুটলাম। আমার মনে হলো, ভেড়াগুলো এঁকেবেঁকে অন্য একটা পাহাড়ের দিকে শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে।

আমি সেদিকেই ছুটলাম, কিন্তু তাদের পেলাম না। মাঝে মাঝে ডাক শুনি, ছুটে যাই, কিন্তু বৃথা। যেন একটা গোলক-ধাঁধায় পড়ে গেছি আমি। শেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম।

পেছন থেকে একটা লোকের গলা শোনা গেল।

তুমি কি তোমার ভেড়াগুলোকে খুঁজছ?

আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

মনে হলো, লোকটি মৃদু মৃদু হাসছেন। বেশ সম্ভ্রান্ত, বলিষ্ঠ, সুন্দর এক পুরুষ। মানুষটিকে দেখে মনে হলো, কখনো কারুর অনিষ্ট করতে পারেন না।

আমি বললাম, নিচে ঝর্ণায় জল খেতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে ওদের খুঁজে পাইনি। মাঝে মাঝে ডাক শুনে এগিয়েছি কিন্তু ওদের ধরতে পারিনি কিংবা দেখতে পাইনি।

তুমি এসো আমার সঙ্গে।

আমি লোকটির পেছন পেছন পাশের একটা পাহাড়ে উঠে গেলাম।

লোকটি এবার নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে সবুজ ঘাসের জমিনে তোমার ভেড়ারা চরছে। আমি ওদের ওখানে পৌঁছে দিয়েছি।

আপনি!

হাঁ আমি। নিচ থেকে উঠে আসছিলাম, ওদের অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাই ওদের ঐ ঘাসের

জমিন চিনিয়ে দিয়ে এসেছি।

বললাম, আমি কিন্তু এদিকটাতে স্পষ্ট ওদের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

লোকটি হেসে বললেন, এসো আমরা এই পাথরটার ওপর বসি।

আমরা পাশাপাশি বসলাম।

কোথা থেকে আসছ?

ইডেন উদ্যানের জলধারা থেকে যেখানে পীশোন নদী বেরিয়েছে, সেখানে একটা জলপাই গাছের তলায় আমি থাকি। তার কাছাকাছি কাঁকুরে মাটির একটা ঢিবি আছে। ঐ ঢিবির ভেতর শক্ত একটা গুহার মতো আছে। বৃষ্টি পড়লে ওদের ঐ গুহায় ঢুকিয়ে দিই। তাছাড়া সারা বছর ওরা আমার সঙ্গে ঘোরে অথবা ঐ গাছতলাতেই থাকে।

বৃষ্টির সময় তুমি কোথায় থাক?

আমি গাছতলাতেই থাকি। রোদ, বৃষ্টি, শীতে আমি সারাক্ষণ বাইরেই কাটাই। ছোটবেলাতে মা-বাবাকে হারাই, তারপর থেকে আকাশের নিচেই আমার ঘর। দিনের পর দিন বৃষ্টিতে ভিজলে কিংবা রোদে পুড়লে আমার কিছুই হয় না।

সাবাস। তুমি এখানে কতদিন থাকবে ভেবেছ?

ঘাসের জমিনে যতদিন ঘাস থাকবে।

উনি বললেন, দুটো ঘাসের জমি আছে এখানে। ঝর্ণার জলও বইছে তার পাশ দিয়ে। তোমার ভেড়ার পাল বেশ কিছুদিন সুখেই কাটাবে। আর তুমি এই পাহাড়ে থাকবে আমার অতিথি হয়ে। তোমার অনেক অভিজ্ঞতা হবে এখানে থাকলে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, আপনার কাছে কিছুদিন থাকলে মনে হয় খুব আনন্দে কাটবে আমার। তবে বর্ষার আগে ফিরে যেতে চাই।

অবশ্যই যাবে। হাঁ, তুমি প্রথম একটা কথা বলেছিলে, তার উত্তর আমি তখন দিইনি। তুমি পাহাড়ের এদিকটাতে ভেড়ার ডাক শুনেছিলে, অথচ তোমার ভেড়াগুলো চরছে উল্টোদিকে।

আমি বললাম, ঠিক তাই। ভেড়াগুলোকে উল্টোদিকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, কারণ এদিকেই আমি স্পষ্ট শুনেছি ভেড়ার ডাক।

তুমি ঠিকই শুনেছ। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করব বলে তোমার প্রিয় ভেড়াগুলোর ডাক ডেকে এখানে তোমাকে টেনে এনেছি।

পথে পথে ঘুরছে তার ভেড়ার পাল নিয়ে

জীবনে এত বিস্মিত আমি কখনও হইনি।

উনি বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে শোন।

আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে উনি ভেড়াদের ডাক ডাকতে লাগলেন। প্রথমে একটা ভেড়া ডেকে উঠল। তাই শুনে দলের অন্য ভেড়াগুলোও ডাকতে লাগল। কখনো কাছে কখনো দূরে বাজতে লাগল সে ডাক।

ওঁর ডাক থামলে আমি বললাম, বিশ্বাস করতে পারছি না। মানুষে কি এমন নিখুঁত ডাক ডাকতে পারে!

তুমি তো এখন রয়েছ, আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। শুধু ভেড়ার ডাক নয়, আরও অনেক কিছু। তুমি যখন ঝর্ণার জল খেয়ে বিশ্রাম করছিলে, তখন একটা পাখির ডাক শুনেছ, বাতাসের ঝরা পাতাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবার শব্দ শুনেছ, তাই না?

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, সেও কি আপনার সৃষ্টি নাকি?

উনি হেসে উঠে বললেন, শুধু ঐ নয়, আরও অনেককিছু তুমি শিখতে পারবে। আগ্রহ চাই আর রোজ অভ্যেস চাই।

আমি বললাম, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব আপনার সমস্ত উপদেশ। আমি সবকিছু শিখতে চাই।

এরপর তিনি আমাকে নিজের গুহায় রেখে, আশ্চর্য এই বিদ্যা শেখালেন।

নোয়া বললেন, আমি তোমাকে প্রথম যে প্রশ্নটি করেছিলাম তার উত্তর এখনও পাইনি। তুমি হবীলা দেশের সোনার ভাণ্ডারটি দেখে এসেছ, কিন্তু সেই ভাণ্ডারের খবর তো কেবলমাত্র ওদেশের সর্দারই জানেন, তাহলে তুমি জানলে কি ভাবে?

তর্তন বলল, আমার গুরুই আমাকে ঐ ভাণ্ডার দেখিয়ে এনেছেন।

কি রকম? তিনি কি হবীলা দেশের সর্দার?

না। তিনি বাকি তিনজনকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে সোনার ভাণ্ডারের সন্ধানে গিয়েছিলেন। পেয়েও ছিলেন, আর ভাণ্ডার থেকে একতাল সোনা হাতে নিয়েও ফিরছিলেন। কিন্তু পথে এক বাধার সৃষ্টি হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর আসতে পারেননি। তাই নিয়ম মতো তিনি

সর্দারের পদ থেকে বঞ্চিত হন।

নোয়া বললেন, যাঁরা অবশেষে সোনার ভাণ্ডারের সন্ধান করেও অকৃতকার্য হন, তাঁরা কি ঘরে ফিরে যান?

না, তাঁদের ঘরে ফেরার আর উপায় থাকে না। তাঁরা যে পাথরের লেখা পড়ে ফেলেছেন। তাই ঐ পাহাড়েই সারাজীবন তাঁদের কাটাতে হয়।

নোয়া উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, তাঁদের ভরণপোষণ কিভাবে হয়?

নির্দিষ্ট দিনে হাবীলার প্রাসাদ থেকে তাঁদের জন্য পাহাড়ের গুহায় খাবার রেখে আসা হয়। আমি ঐ পাহাড়ের তিনটি গুহায় তিনজনকে দেখেছি। আমার গুরু ছাড়া আর দুজন অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের দেখাশোনা করেন আমার গুরুই।

নোয়া বললেন, ওঁদের নির্বাচন কিভাবে হয় তুমি জান?

আমি বললাম, আমার গুরুর, 'সর্দার প্রতিযোগিতা'য় অংশ নেবার কাহিনীটি বললে আপনি মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন। ওতেই পাবেন সোনার ভাণ্ডারের খবর।

বল শুনি।

হাবীলার সর্দার মারা যাবার পর দেশের চারদিকে মোড়লরা ছুটল নতুন সর্দারের খোঁজে। আমার গুরুকে নির্বাচন করল একদল মোড়ল।

নোয়া জানতে চাইলেন, কি ধরনের লক্ষণ দেখে তারা নির্বাচন করেছিল?

প্রথম লক্ষণটি হলো, বাঁ হাত ব্যবহারে আজন্ম দক্ষতা। ঐ হাতে অস্ত্র চালানোর স্বাভাবিক ক্ষমতা।

নোয়া বললেন, এর কোনো ব্যাখ্যা কি তোমার গুরু তোমাকে দিয়েছেন?

উনি বলেছেন, ডান হাতে দান করতে হয়, প্রজাদের আশীর্বাদ করতে হয়, তাই ও হাতে দুষ্টের দমনের জন্য তরবারি তোলা হাবীলার মোড়লদের পছন্দ নয়। কেবল ধনু ব্যবহারের সময় ধনুটি সে ডান হাতে ধরে রাখতে পারে, কিন্তু তীর চালাতে হবে বাম হাতেই।

নোয়া এবার জানতে চাইলেন, প্রতিযোগীর আর কি গুণের পরিচয় নেওয়া হয়?

তর্তন বলল, এবার তাকে দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। কোন পাখি এবং কোন পশু তার বেশি পছন্দের। সঙ্গে সঙ্গে তার পছন্দের কারণও জানাতে হবে।

তোমার গুরু কি উত্তর দিলেন?

তিনি পশুদের ভেতর সিংহ এবং পাখিদের ভেতর শকুনিকে পছন্দ করেছিলেন।

কিন্তু কেন?

তিনি বলেছিলেন, সিংহের চলন ধীর-স্থির, গর্জন রাজকীয়। কিন্তু প্রয়োজনে অতি দ্রুতগতি মৃগকেও অনায়াসে ধরে ফেলতে পারে।

আর শকুনি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি?

অনেক ওপরে উঠেও সে নিচের সবকিছু দেখতে পায়, তাছাড়া পৃথিবীর বুক থেকে মৃত গলিত আবর্জনাকে সে সরিয়ে ফেলে।

নোয়া বললেন, এ সব প্রশ্নের তাৎপর্য সম্বন্ধে তোমার গুরু তোমাকে কিছু বলেছেন কি?

তিনি বলেছিলেন, যে কোনো দলপতির এসব গুণ থাকা চাই। তাঁর বহুদূর পর্যন্ত দেখার ক্ষমতা, সমাজের আবর্জনা মুক্ত করার ইচ্ছা এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে রাজমহিমায় বিরাজ ও বিচরণ করার সহজ শক্তি থাকা দরকার। তাছাড়া সিংহের আর একটি গুণের কথা বলেছিলেন।

কি গুণ?

ক্ষুধা না পেলে অথবা পরিবারের অন্য প্রাণীদের প্রয়োজন না থাকলে সিংহ অকারণে পশুবধ করতে চায় না। এ গুণটিও বিবেচক রাজার থাকা প্রয়োজন। প্রজাদের অকারণে পীড়ন করে রাজভাণ্ডারে অতিরিক্ত সম্পদ মজুদ করা রাজার কর্তব্য নয়।

নোয়া এবার জানতে চাইলেন, কি ধরনের প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে তোমার গুরু অন্য তিনজনকে হারিয়ে প্রাথমিকভাবে জয়ী হয়েছিলেন?

ওখানে মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা ও ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতিযোগীরা তাঁদের নিজস্ব কোনো অস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল দেখিয়ে বিচারক ও দর্শকের মনোহরণ করতে পারেন।

এরপর সর্বশেষ প্রতিযোগিতা, পীশোন নদীর বুকে নৌ-চালনা।

তোমার গুরু কি সবকটি প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন?

মল্লযুদ্ধ ছাড়া সবকটিতে। মল্লযুদ্ধে দুজনকে হারিয়েছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়েছিলেন তৃতীয় জনের কাছে।

অসিযুদ্ধে কি নিয়ম ছিল?

যুদ্ধের মধ্যে একজনের হাত থেকে অসি ভূমিতে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত অন্যজন জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু দেখতে হবে, একবিন্দু রক্তপাত যেন না হয়।

নোয়া বললেন, আর তীরের খেলা?

কিছু দূরে দূরে ঝোলানো তিনটি মাঝারি আকারের বালার ভেতর দিয়ে তীর ছুটে গিয়ে একটি কিশোরী মেয়ের মাথার ওপরে রাখা একটি ফলকে গেঁথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অদূরে ঐ ফলের গাছের গোড়ায় ফেলে দেবে। আর ঐ তীর ছুঁড়তে গিয়ে যদি কিশোরীটির কোনো ক্ষতি হয় তাহলে প্রাণদণ্ড হবে ঐ প্রতিযোগীর।

নৌ প্রতিযোগিতাতেও তো তোমার গুরু জয়ী হয়েছেন।

হ্যাঁ। তিনি বলেন, কোনো কিছুতেই উত্তেজিত না হয়ে স্থির বুদ্ধিতে কাজ করলে সফল হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। উনি নৌকো নিয়ে সবার পেছনে মোটামুটি তাল রেখে চলছিলেন, তারপর যখন দেখলেন, একে একে আগের প্রতিযোগীরা ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ছে তখন উনি একজন একজন করে সবাইকে পেছনে ফেলে লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন। মানুষটি অতি ধীরস্থির, দয়ালু, সব অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন।

নোয়া বললেন, তোমার গুরু বিশেষ কোনো অস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল দেখিয়েছিলেন কি?

তিনি নিজের তৈরি একটি অস্ত্রকে এমন কৌশলে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, যেটা কিছুদূর বাতাসে ভেসে গিয়ে আধখানা চাঁদের মতো বাঁক নিয়ে ফিরে এসেছিল তাঁরই হাতে। এই দৃশ্য দেখে সমস্ত দর্শক হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

তুমি তোমার গুরুকে দয়ালু বলেছ,

তাঁর দয়ার কিছু পরিচয় তুমি পেয়েছ কি?

গুরু ছাড়া অন্য যে দুজন ঐ পাহাড়ে রয়েছেন তাঁদের অনেক বয়স হয়েছে, একজন তো অথর্ব। তিনি তাঁদের অনেক সেবা-যত্ন করেন। আমি যতদিন ছিলাম তিনি আমাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে করে ওঁদের কাছে নিয়ে যেতেন। ঐ দুজন মানুষের দুটি কথা আমার বেশ মনে আছে।

কি সে কথা তর্তন?

একজন বলেছিলেন, অল্পে সন্তুষ্ট যে থাকতে পারে সে-ই সুখী। তার অভাব বোধ কম, হাল্কা মনে আনন্দে সে থাকতে পারে। এই দেখ না, একটা রাজ্যের মালিক হবার স্বপ্ন দেখে আমার কি দশা। ছোট্ট শান্তির নীড়টুকু হারালাম, এদিকে রাজ্যও পেলাম না। নির্জন পাহাড়ে এখন মৃত্যুর দিন গুণছি।

অন্যজন একেবারে অথর্ব। তিনি গুহা থেকে বড় একটা বেরোন না। আমার গুরু তাঁর হাত ধরে মাঝে মাঝে বাইরে বের করে আনেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি একেবারে নেই বললেই হয়।

নোয়া বললেন, এই দৃষ্টিহীন অথর্ব মানুষটি কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, বাইরে সাঁঝের আঁধার যত ঘনিয়ে উঠছে, ভেতরে একটা আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখছি।

নোয়া সহসা প্রার্থনার ভঙ্গিতে নত হয়ে বসে বললেন, হে প্রভু, তোমার কত কৃপা! তুমি ঐ অন্ধ মানুষটির অন্তরে তোমার অনির্বাণ আলোটি জ্বেলে দিয়েছ।

সেদিন নোয়া ঘরে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। যাবার সময় তর্তনকে বললেন, আমি যেমন আসি তেমনি কালও আসব, আর এখানে জলপাই গাছের তলায় বসে তোমার মুখে তোমার গুরুর সোনার ভাণ্ডারে অভিযানের গল্প শুনব।

তর্তন উঠে দাঁড়িয়ে নোয়াকে বলল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে দাদু। তোমার মতো এমন শ্রোতা আমি আর কাউকেও পাইনি।

নোয়া বললেন, ভোরবেলা ঈশ্বরকে প্রণাম করে আমি এই গাছতলায় আসি, তোমার মুখ থেকে বিচিত্র সব গল্প শোনার আশায়।

পরের দিন নোয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করে গাছতলায় এসে বসলেন। সঙ্গে একটি ছোট্ট পুঁটলি। নোয়া কিন্তু আশেপাশে তর্তনকে দেখতে পেলেন না।

কিছুক্ষণের ভেতরেই একটা বাঁশির সুর নোয়ার কানে এসে বাজল। ঐ বাঁশির সুরেই তিনি চিনে নিলেন বংশীবাদককে।

কিছুদূর থেকেই বাঁশি থামিয়ে নোয়া দাদুর কাছে ছুটে এল তর্তন।

আজ আমারই দেরি হয়ে গেল। একটা ভেড়ার পায়ে চোট লেগে আলের ধারে শুয়ে পড়েছিল। গাছগাছালির পাতা থেঁতো করে তার ব্যথার ওপর লাগিয়ে বেঁধে দিয়েছি, ও ঠিক সেরে যাবে। ভেড়াটা অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, দলের সঙ্গে আর তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। আমাকে বাচ্চা ভেড়ার মতো অনেকসময় ওকে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

নোয়া আবেগভরা গলায় বললেন, তুমি জীবজন্তুকে এত ভালবাস তর্তন! চিরদিন তুমি কিন্তু বৃদ্ধদের আশীর্বাদ কুড়োবে। তোমার বয়সী কোনো ছেলেই প্রায় বৃদ্ধদের সেবা তো দূরের কথা, তাদের ছায়াও মাড়াতে চায় না। তুমি তাদের অনেকের চেয়েই স্বভাবে একেবারে আলাদা।

তর্তন বলল, আমার বন্ধুরা কিন্তু খুবই ভাল। ওরা ভেড়া চরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে কোনো বৃদ্ধবৃদ্ধাকে বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে দেখলে তাদের মাথার বোঝা কেড়ে নিয়ে নিজেরাই বয়ে নিয়ে যাবে।

নোয়া এসব শুনে বড় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

তাহলে আমার ধারণা সঠিক নয় ভাই। আমার ধারণা মিথ্যে হলে আমি সব থেকে খুশি হব জেনো।

এবার পাশে পড়ে থাকা পোঁটলাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে নোয়া বললেন, তুমি ঐ নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি ততক্ষণে এটা খুলছি।

কি আছে ওতে?

নোয়া বেশ কৌতুকের সঙ্গে বললেন, খাবার জিনিস, খেতে খেতেই বুঝবে। যার তার নয়, তোমার দিদার হাতের তৈরি। দুনিয়ায় এ জিনিস মেলা ভার।

তর্তন নদীর দিকে দৌড়তে দৌড়তে বলল, তাহলে তো আর একতিল সময় কথা বলে নষ্ট করা যাবে না। আমি হাতমুখ ধুয়ে দৌড়ে ফিরে আসছি।

একটি বড় পাতায় পিঠে সাজিয়ে রাখলেন নোয়া। কোনোদিন ছেলেটাকে কিছু খাওয়ানো হয়নি, আজ এই পিঠেগুলো খেয়ে খুব খুশি হবে ও। আহা, ওর কেউ নেই, সারাদিন ভেড়া চরায়, যা পায় তাই খায়।

তর্তন নদীতীর থেকে ছুটে ছুটে আসছে দেখে নোয়ার বড় মায়া হলো।

এসো এসো, তোমার খাবার দেওয়া হয়ে গেছে।

তর্তন বসে গেল খেতে। মুখে দিয়েই তার মনে হলো, এমন অমৃত কখনও জোটেনি তার কপালে।

সে যখন খাচ্ছিল তখন তার মুখের প্রতিটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিলেন নোয়া। কি আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে এই ভেড়াচারক ছেলেটি। একদিন ওকে বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়।

আবার মনে হলো, যে ছেলে ঈশ্বরের গড়া আকাশ, মাটি, পথ-প্রান্তরের স্বাদ পেয়েছে, যার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশের নক্ষত্র, তাকে কি ঘরের মায়ায় বাঁধা ঠিক হবে, না সে মানুষের এই ছোট্ট গণ্ডির ভেতর ধরা দিতে চাইবে।

নোয়া ভাবলেন, এই ছেলেটির গায়ের গন্ধই আলাদা। ফাঁকা প্রান্তরের গন্ধ, ছুটে চলা নদীর গন্ধ, বুনো ফুলে ভরে থাকা বনের গন্ধ ওর গায়ে মাখানো। ঈশ্বরের সঙ্গে ওর সহজ যোগাযোগ, নাড়ির বাঁধন কিন্তু ছেলেটা এখনও জানে না, ঈশ্বরের সঙ্গে ওর কত নিকট সম্পর্ক!

তর্তনের খাওয়া শেষ হলে শুরু হলো গল্প। সেই গুরুর গল্প, যিনি হাবীলার পাহাড়ে চিরদিনের মতো বন্দী।

কিন্তু কি আশ্চর্য জীবন তাঁর!

তর্তন বলল, একদিন গুরু তাকে বলেছিলেন, সামনে দিয়ে বাইরে বেরোবার পথ আমার বন্ধ, সেখানে দিনে-রাতে অতন্দ্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে

পারি।

আমি উৎসুক হয়ে বললাম, কি রকম?

গুরু বললেন, এই পাহাড়ে ওঠার একমাত্র পথ যেটি, সেখান দিয়ে তুমি উঠে এসেছ। তোমাদের মতো মেষচারকদের হাবীলার পাহারাদারেরা কিছু বলবে না। কিন্তু আমাদের পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পথ থাকলেও নিচে নামার পথ চিরদিনের মতো বন্ধ।

এখন শোন, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পথ কিন্তু ঐ একটা। ঐ চূড়ায় কেউ যদি উঠে যায় সে পীশোন নদীকে ওপর থেকে দেখবে মেয়েদের গলার একটা হাঁসুলি হারের মতো। ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে পীশোনের বুকে কেউ যদি লাফ দিয়ে নামতে পারে, আর অলৌকিকভাবে জীবিত থাকে, এবং তারপরও খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কেটে ওপারে যেতে পারে তাহলে তার মুক্তি। যা কোনো দেহধারী মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আমি বললাম, পাহাড় থেকে বাইরে যাবার ঐ যদি একমাত্র পথ হয় তাহলে আপনি বেরোবেন কিভাবে?

গুরু বললেন, আকস্মিকভাবে আমি আর একটা পথ আবিষ্কার করেছি, সেটা দুর্গম এবং বিপদজনক হলেও সে পথে বেরিয়ে যাওয়া যায়। যদিও পীশোন নদী এ পথেও সাঁতরে পার হতে হবে।

বললাম, আপনি সে পথে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা এতদিন করেননি কেন?

এখানে দুটো বুড়ো মানুষকে কেবল ঈশ্বরের জিম্মায় ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে আমার বিবেক সায় দেয়নি।

নোয়া অমনি মন্তব্য করলেন, আসল রক্ষাকর্তা কিন্তু ঈশ্বরই। তিনি যদি কাউকে বাঁচাতে চান তাহলে তাকে ধ্বংস করবার সাধ্য কারু নেই, আর তিনি যদি কাউকে মারতে চান তাহলে তাকে বাঁচায় কে। এখন বল তোমার গুরুর কৃতিত্বের কথা, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে।

গুরুর প্রশংসা শুনে ভারী উৎসাহিত হয়ে উঠল তর্তন। সে বলল, গাছপালা, লতাপাতা, শেকড়-বাকড়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার গুরুর জ্ঞান অসামান্য। তিনি বলেন, যদি পুরো একটি বছর ধরে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহলেও বিশেষ একটি গাছের এক টুকরো করে শেকড় চিবিয়ে খেলে মানুষ কোনো রকমে তার প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

অসাধারণ ব্যাপার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনোটাই করতে পারছি না। তবে ঈশ্বরের রাজ্যে সবই সম্ভব। তাঁর সৃষ্ট নদী পর্বত অরণ্যপ্রান্তর আর জীবজগতে এমন সব প্রাণদায়ী উপাদান আছে যা চিনে নিতে পারলে মানুষ দীর্ঘজীবন নীরোগ শরীরে বেঁচে থাকতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই। তাঁর কৃপা যাঁর ওপর বর্ষিত হয় তিনিই কেবল পারেন ঐসব প্রাণদায়ী ভেষজগুলি চিনে নিতে।

তর্তন বলল, আমার গুরুর ওপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে কিনা জানি না তবে তাঁর দেওয়া ঐ বিশেষ শেকড়ের গুণটি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। ঐ শেকড়ের সামান্য একটুকরো খেয়ে আমি সাত দিন খিদে অনুভব করিনি, শরীরও বেশ সুস্থ ছিল।

আশ্চর্য!

তর্তন তার চামড়ার বড় থলেখানা খুলে বেশ মোটা এক আঁটি শেকড় বের করল।

আমি যখন ভেড়া নিয়ে ঐ পাহাড় ছেড়ে দেশে চলে আসি তখন আমার গুরু এই শেকড়গুলো আমার হাতে দিয়ে দেন।

গুণী মানুষ, সত্যিই গুণী। এ রকম মানুষ বিধাতা অতি অল্পই সৃষ্টি করেছেন। এখন আমি তোমার গুরুর ঐ সোনার ভাণ্ডার অভিযান-কাহিনীটি শুনতে চাই।

তর্তন গুরুর অভিযান-কাহিনী শুরু করল।

গুরু তাঁর তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সর্দার নির্বাচিত হবার পর তাঁর হাতে সোনার ভাণ্ডারের পথ-চিহ্ন আঁকা একটি ত্রিভুজাকৃতি পাথরের খণ্ড তুলে দেওয়া হয়। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে একজন প্রহরী বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যান। সুসজ্জিত কক্ষ, দরজার বাইরে মশালের আলোয় চারদিক আলোকিত। তার ছটা এসে পড়েছিল ঘরের ভেতরে। গুরু সেই আলোকে হাতে ধরা পাথরের পাঠ পড়তে লাগলেন।

এবার গুরুর কথাতেই শোনা যাক তাঁর কাহিনী।

পাথরখানা চোখের সামনে মেলে ধরতেই কয়েকটা ছবি ফুটে উঠল।

প্রথম, আধখানা সূর্যের একটা ছবি। তার মাথায় রশ্মির রেখা। তারপর তিনটে দাঁড়ি। মাঝের দাঁড়িটি সোজা দাঁড়িয়ে, দু'পাশে অন্য দুটি দাঁড়ি শুয়ে পড়ে আছে।

তার পরের ছবি একটুকরো নল। যার শুরু এবং শেষে আঁকাবাঁকা কয়েকটি রেখা। চতুর্থ ছবিতে তীরযুক্ত ধনুক।

এরপর, ওপর-নিচ করে একই রেখায় তিনটি ছবি। ওপরে গাছের একটা ডাল পেঁচিয়ে ধরে আছে একটা সাপ। মাঝে কয়েকটা ফুল আর মৌমাছি। নিচে থাবা উঁচিয়ে একটা ভালুক বসে আছে।

ষষ্ঠ ছবিতে এক শিকারীর কাঁধ থেকে ঝুলছে শিংওলা একটা মৃত পশু। শেষ বা সপ্তম ছবিতে পাশাপাশি দুটো ত্রিভুজ আঁকা। প্রথম ত্রিভুজের তলায় শুয়ে আছে একটা চিতাবাঘ। দ্বিতীয় ত্রিভুজের মাথায় মুকুটের মতো আঁকিবুকি। ঐ ত্রিভুজের একটু ওপরে আধখানা সূর্য এবং রশ্মি।

ফলকটা হাতে নিয়ে আমি অনেক রাত অবধি ভাবতে লাগলাম, কিন্তু কোনো সমাধানের পথ দেখতে পেলাম না।

তবে একটা কথা বুঝলাম, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হতে হবে। আর ফিরতে হবে সূর্যাস্তের আগে। সময়ের এতটুকু হেরফের হলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তখন দিগন্তরেখায় লাল সূর্যটা আধখানামাত্র উঠেছে, পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে আকাশপথে। আমি একটা তলোয়ার কোমরে ঝুলিয়ে, কাঁধে ধনুকটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বনের পথে পাহাড় লক্ষ্য করে।

পাহাড়ে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না।

এবার পাহাড়ে উঠছি আর মনে মনে ভাবছি ছবিগুলোর কথা। প্রথম ছবিটা তো সূর্যোদয়ের। ওটা দেখেই পথচলা শুরু করেছি। এখন দ্বিতীয় ছবিটার অর্থ ভেদ করা সম্ভব হয়নি। শুধু ভেবেই চলেছি, কি হতে পারে।

চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে

রাস্তা গুলিয়ে ফেললাম। তিন দিকে তিনটে রাস্তা গেছে। সোজা উত্তরে একটা, পুবে-পশ্চিমে বাকি দুটো। পুব-পশ্চিমের দুটো রাস্তা ঢালুর দিকে নেমে গেছে। উত্তরমুখো রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে।

আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম, পেয়েছি, পেয়েছি। উত্তরের পথেই সোজা চলে যেতে হবে। তিন দাঁড়ির রহস্যটা ভেদ হলো, একটা দাঁড়ি সোজা দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'পাশে বাকি দুটো কাৎ হয়ে পড়েছে।

এবার ঐ পথ কখনো কিছুটা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠছে আবার কখনো উৎরাইতে নেমে চলেছে।

হঠাৎ পাহাড়ের একদিকে বয়ে চলা জলের চাপা একটা শব্দ শুনে আমি থমকে দাঁড়ালাম।

নিশ্চয়ই একটা জলধারা ঢাকা পড়ে যাওয়া কোনো নালার ভেতর দিয়ে বইছে।

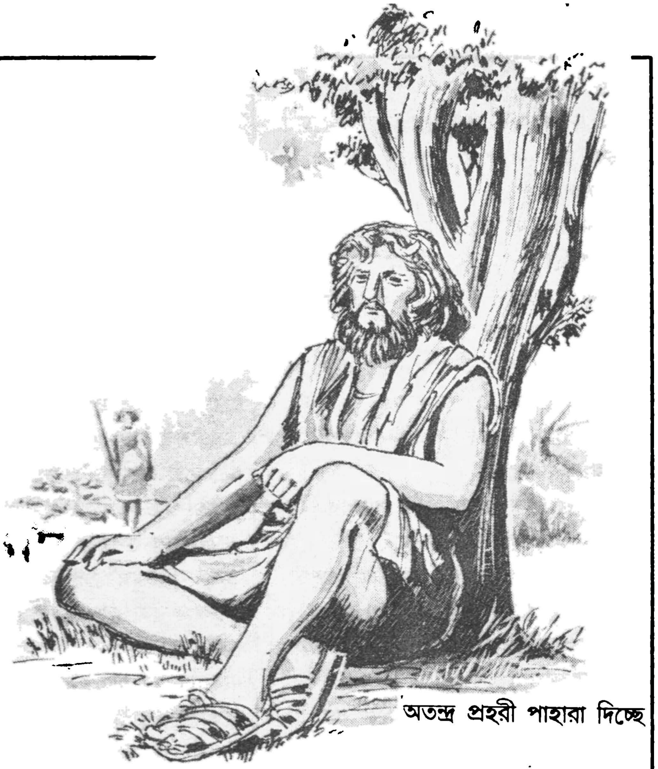

অতন্দ্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে

অনেক অনুসন্ধানের পর বনের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করা গেল।

পীশোন নদীর একটা জলধারা নরম (চুনা) পাথর কাটতে কাটতে বেশ বড় একটা নালা তৈরি করেছে। তার ওপর দীর্ঘকাল ধরে গাছপালা ঢাকা পড়েছে। গাছের ওপর আবার গড়িয়ে এসে পড়েছে পাথর।

আমি বনের ভেতর খোঁজাখুঁজি করে সেই জলধারার প্রবেশ-পথটি আবিষ্কার করলাম। মনে হলো, সেই পথেই যাবার নির্দেশ রয়েছে।

বেশ প্রশস্ত নালায় আমি ঢুকে পড়লাম। হাঁটুর একটুখানি নিচ পর্যন্ত জলে ভিজে যাচ্ছিলাম। কোথাও অন্ধকার, কোথাও ফাঁক দিয়ে অল্প আলোকরেখা দেখা যাচ্ছিল।

কিছু পথ চলার পর মনে হলো, মূল স্রোত থেকে আর একটা স্রোত ডানদিকে বেঁকে গেছে।

আমি কৌতূহলবশত ডানদিকের স্রোত ধরে এগোলাম। এই স্রোতধারার পথটি নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। হিমশীতল জলের ধারা এতক্ষণ আমার পা স্পর্শ করছিল, এখন যত এগোচ্ছি তত উষ্ণস্রোত এসে পায়ে লাগছে। আর একটা শব্দ কানে এসে বাজছিল। বেশ তোড়ে কোথাও একটা জলধারা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলে যেমন শব্দ হয়, এ ঠিক সেই রকমের একটা শব্দ। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে একটা গরম বাষ্প আমার চোখমুখ আর সারা শরীরে এসে লাগল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে বাঁদিকে একটা কঠিন পাথরের স্তম্ভ আমার হাতে ঠেকল। এখানে স্রোত একেবারে বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে। আমি বাঁদিকে মুখ ঘোরাতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলাম, আর বিকট একটা শব্দ শুনতে পেলাম।

দৃশ্যটা হলো, বাইরের আলোক-রশ্মি একটা বিরাট ছিদ্রপথে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ছিল। সেই আলোয় মেঘের মতো তাল তাল জলীয় বাষ্পকে দেখা গেল। আমি অতি সাবধানে ছিদ্রপথের দিকে এগোতে লাগলাম। পায়ের তলার জল এক লহমায় যেন শুকিয়ে গেল। ডানদিকে নিরেট অন্ধকারে ঢাকা গভীর খাদ, তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছিল স্রোতের জল।

মাঝে মাঝে বেশ উত্তপ্ত হাওয়ার সঙ্গে উঠে আসছিল এক বিকট আর্তনাদের মতো শব্দ। মনে হলো, কোথাও যেন পৃথিবীর অনেক গভীরে দগদগে আগুনের তালের ওপর গিয়ে পড়ছে জল, আর সঙ্গে সঙ্গে তা প্রচণ্ড গর্জনে নিচ থেকে ঠেলে তুলছে তাল তাল পাথরের টুকরো। কোনো এক গুহামুখ দিয়ে সেগুলো উঠে যাচ্ছে ওপরে। সেই উৎক্ষিপ্ত পাথর প্রচণ্ড কোলাহল তুলছে। জায়গাটা কাঁপছে থর-থর করে।

আমি খুব সাবধানে সেই আলোকিত ছিদ্রপথের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমি ঐ ছিদ্রপথে চোখ রাখতেই একটা সুন্দর জগৎ আমার হাতের মুঠোয় ধরা দিল। পীশোন নদী বয়ে চলেছে। ওপারে ক্ষেতের ফসল তুলছে কিষাণরা। কয়েকটি মেয়ে জল আনতে আসছে নদীর দিকে। একটা ডালপালা মেলে দেওয়া প্রাচীন গাছের তলায় বসেছে রাখাল ছেলেদের হাট। ফসল তোলা মাঠে পাল পাল গরু চরছে।

পীশোনের ডান তীরে পাহাড় আর জঙ্গল। নদী থেকে পাহাড়ের ছিদ্রপথটা সহজে দেখা যায় না। ছিদ্রপথ ঢেকে নিচের জঙ্গল অব্দি ঝুলছে শক্ত মোটামোটা লতা। পাতায় ফুলে ভরে আছে। পাহাড়ের ওপরে কোনো গাছ থেকে সম্ভবত লতাগুলো ঝুলছে। ছিদ্রপথে পাহাড়ের গায়ে গাছটাকে দেখা

যাচ্ছে না।

ঐ লতা ধরে নদীতীরে দিব্যি নেমে যাওয়া যায়। তারপর পীশোন সাঁতরে পেরোলেই মুক্তি।

কিন্তু এ নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়, বাইরে বেলা বেড়ে গেছে, সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়ালে সময় কতটা কেটে গেছে বোঝা যাবে।

আমি মূল জলস্রোতে ফিরে এসে অস্পষ্ট আলোর মুখ দেখলাম।

একসময় ঐ নালা-পথটি পেরিয়ে উঠে এলাম অন্যপ্রান্তে।

নালার জল এখন ঝর্ণার আকার নিয়ে পথের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে।

পাথরে আঁকা ছবির সঙ্গে এ অংশটা মিলে গেল দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। বাড়তি লাভ হলো, মুক্তির নতুন একটা পথ আবিষ্কার।

চতুর্থ ছবিটিতে ছিল তীরযুক্ত ধনু।

পথ চলতে চলতে কোথাও সে চিহ্ন দেখা গেল না। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। এদিকে সূর্য মধ্যাহ্নের আকাশ পেরিয়ে গেল।

হঠাৎ সামনে পঞ্চম ছবির একটা আভাস পেলাম।

পথটা এখানে সংকীর্ণ। সত্যিই একটা অজগর মোটা একটা গাছের ডালকে পাকে পাকে জড়িয়ে ঝুলে রয়েছে। লাল পাথরের মতো ভয়ঙ্কর দুটো চোখ জ্বলে রয়েছে। তার হিংস্র দৃষ্টি পথের এপারে একটা পাহাড়ী গুহার সামনে বসে থাকা ভালুকের ওপর।

ভালুক জানে, তার আক্রমণকারী সামান্য সুযোগ পেলেই তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলবে। সেও যে বিক্রমে কম নয় একথা জানাবার জন্য বসে রয়েছে একটা থাবা তুলে। দুজনের মাঝখানে পথের ধারে বিরাট একটা মৌচাক। অজস্র মৌমাছি গুঞ্জন করছে। পাহাড়ের গায়ে বনের ভিতর নানা ধরনের ফুলের সমারোহ।

হঠাৎ মগজে বুদ্ধি খেলে গেল। অমনি চতুর্থ ছবিটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল জলের মতো।

কে যেন মনের ভেতর থেকেই বলল, তোল তোমার তীর-ধনুক। দূর থেকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দাও মৌচাক।

আমি চাক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লাম। অমনি ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল মধু। মৌমাছির দল বাসা ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ল আততায়ীর সন্ধানে।

এদিকে ভালুক মৌচাক থেকে মধু ঝরতে দেখে ছুটল গাছতলায়। সে হাঁ করে ঐ ঝরে পড়া মধু খেতে লাগল।

কিন্তু ততক্ষণে মৌমাছিরা তাকে ঘিরে ধরেছে। গায়ে যারা বসেছিল, লোম ভেদ করে তারা ভেতরে ঢুকতে পারল না, বরং নিজেরাই জড়িয়ে পড়ল লোমের বোঝায়। শেষে শয়ে শয়ে মৌমাছি খুঁজতে লাগল আক্রমণের উপযুক্ত জায়গাটি। পেয়ে গেল তারা নাক-মুখ-চোখের সন্ধান।

আর যায় কোথা, প্রাণের দায়ে ছুটল গুহার দিকে। কিন্তু সেখানেও পার পেল না কামড়ের হাত থেকে। অমনি পাগলের মতো দৌড়ে ঢুকে গেল বনের ভেতর।

এদিকে অজগর কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে তার পাক খুলতে শুরু করেছে। এত বড় দেহটাকে কি টেনে নামানো সহজ! তার সারা দেহ জুড়ে তখন বিষের জ্বালা, ক্রুদ্ধ মৌমাছি দংশনের ক্ষত।

অবশেষে বহু যন্ত্রণা সহ্য করে সে নেমে গেল উৎরাইয়ের পথে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চলল ঝাঁক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছি।

কতক্ষণ পরে মৌমাছিগুলো বসে গেল বাসা আঁকড়ে। আমি সাপ আর ভালুকের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেলাম মৌচাক।

এখন ছবি সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান হয়ে গেছে। মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি, ছবির ঘটনাগুলো একে একে ঘটে যাচ্ছে, আর আমি তাতে অংশ নিচ্ছি।

ষষ্ঠ ছবিতে শিকারীর ভূমিকায় আমি নামলাম। কারণ শেষ ছবিতে একটি পাহাড়ের তলায় চিতা শুয়ে আছে। আর আমি হাবীলার লোকেদের মুখে শুনেছিলাম, পাহাড়ে একটা মাত্র চিতা আছে যা অনেকদিন থেকেই পঙ্গু।

শেষ দিকে তাকে কাঠুরিয়ারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেছে।

আমি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা শিংওয়ালা বুনো ছাগল শিকার করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম।

অদূরে সপ্তম ছবির পাশাপাশি দুটো ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। কাছাকাছি যেতেই চিতাটাকে দেখতে পেলাম।

সে গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার ও শিকারটার দিকে তাকিয়েছিল। একবার ওঠার চেষ্টা করেও বসে পড়ল।

ও শক্তিহীন, অথর্ব দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বাঘের চোখ জ্বলে, কিন্তু এর চোখের জ্যোতি দেখলাম ম্লান।

আমি ছাগলটাকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ও আগ্রহভরে সেটাকে খেতে লাগল।

আমি সেই ফাঁকে চলে গেলাম পাশের পাহাড়টাতে।

আমি দেখলাম, পাহাড়টায় ঢোকার একটা সুড়ঙ্গ-পথ আছে। সেই পথে আমি ঢুকে পড়লাম।

পাহাড়ের ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল দু'এক টুকরো আলো। আমি সেই আলোয় পথ চিনে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলাম।

কোথায় নামছি জানি না। পায়ের তলার পাথর খুব মসৃণ ছিল না, তাই নামতেও অসুবিধা হচ্ছিল না। আলোর আভাটা তখনও পায়ের তলার পথটুকুকে চিনিয়ে দিচ্ছিল।

আমি প্রায় সুড়ঙ্গে ঢোকার শুরু থেকেই বুম্ বুম্ একটা আওয়াজ পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে পায়ের তলার মাটিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

অল্প সময়ের ভেতরেই ডানদিকে একটা জোরালো আলোর রশ্মি দেখলাম। সুড়ঙ্গ-পথটা ওদিকেই বেঁকে গিয়েছিল। আমাকেও ঐ পথেই এগোতে হলো।

দু'দশ পা গেছি মাত্র হঠাৎ চোখে একটা ঝলকানি এসে লাগল। বাইরে থেকে সূর্যের আলোটা বড় একটা ছিদ্রপথ ধরে এসে পড়েছে। আর থরে থরে সাজানো সোনাভর্তি পাথরের টুকরোগুলো ঝলসে উঠছে সেই আলোর ছোঁয়ায়।

বহুকাল ধরে সাজানো এই সোনার টুকরোগুলোই হাবীলার সম্পদ। আর এটাই হলো তার সোনার ভাণ্ডার।

আমি শুনেছিলাম, সর্দার তাঁর

লোকজনকে ঐ সোনার ভাণ্ডারে চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসেন। তারাই প্রয়োজন মতো সোনা থলেতে ভরে নিয়ে আবার চোখ বাঁধা অবস্থায় সর্দারের সঙ্গে ফিরে যায়।

আমি ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম।

ছোট ছোট টিলার বেষ্টনির ভেতর একটি সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তর। আর ঐ প্রান্তরের মাঝখানটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে মসৃণ। একটা উষ্ণ জলের ফোয়ারা মাঝে মাঝে পুরো জায়গাটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে শব্দ করে ওপর দিকে জল ছুঁড়ছে আর তার মুখ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো সোনাভর্তি পাথর। সর্দারেরা বহু যুগ ধরে এই পাথর সংগ্রহ করে ভেতরে সাজিয়ে রেখেছে।

আমিও ফোয়ারার চারদিকে অনেকগুলি ছড়ানো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলাম।

আমার মনে হলো, মধ্যাহ্নকালে নালার জল ঠেলে আমি ডানদিকে যে সুড়ঙ্গটির ভেতর ঢুকেছিলাম আর বিকট আওয়াজ শুনেছিলাম, এই গরম জলের ফোয়ারাটা তারই শেষ অংশ।

আমি টিলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। খাড়াই পাহাড়ের অনেক অনেক নিচে পীশোন একটা বাঁকা তলোয়ারের মতো বইছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে অনেকখানি।

আমি হাতে এক টুকরো সোনা মেশানো পাথর নিয়ে যে পথ দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেই পথ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম।

এখানে এসে তর্তন থামল।

নোয়া বললেন, কি এক বাধার কথা বলছিলে না? যে কারণে তোমার গুরু সোনার ভাণ্ডার জয় করেও যথাসময়ে ফিরতে পারলেন না, আর তাই সর্দার হবার সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর আর সর্দারের পদ লাভ করা সম্ভব হলো না।

তর্তন বলল, ঐ যে পাহাড়ের গুহায় অথর্ব বৃদ্ধটির কথা বলেছিলাম, উনিই আমার গুরুর যাত্রা-পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।

কি রকম?

সূর্য তখন প্রায় পশ্চিম প্রান্তে ঢলে পড়েছে, আমার গুরু একটি বেগবান চিতার মতো পাহাড়ী পথে লাফিয়ে নেমে চলেছেন। তাঁকে সূর্যাস্তের আগেই পাহাড়ের তলায় পৌঁছে যেতে হবে। হঠাৎ পথের ওপর দেখলেন, একটি মানুষ পড়ে আছে। অচৈতন্য, শরীরে রক্তের দাগ। উনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন নিচের ঝর্ণা থেকে জল আনতে। তখন তাঁর মনেই রইল না যে সূর্যাস্তের আর দেরি নেই।

উনি নিজের চামড়ার থলে ভরে জল আনলেন। চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিলেন। একসময় চোখ মেলে তাকালেন বৃদ্ধটি। উনি অপরিচিত একটি মানুষকে দেখে অবাক হলেন। চেষ্টা করলেন উঠে বসতে কিন্তু পারলেন না।

হাঁটু থেকে তখনও চুঁইয়ে পড়ছিল রক্ত। আমার গুরু বৃদ্ধটিকে তুলে নিয়ে ঝর্ণার ধারে চলে গেলেন। এবার জল খাওয়ালেন বৃদ্ধটিকে। পায়ের রক্ত ধুয়ে দিয়ে ওঁকে শুইয়ে দিলেন ঝর্ণার ধারে। এবার বনের ভিতর ছুটলেন রক্ত বন্ধ করার জন্য কোনো লতা-পাতার সন্ধানে।

পাওয়াও গেল, আর ঐ পাতা পাথরে থেঁতো করে লাগিয়ে দিলেন ক্ষতস্থানে। আস্ত একটা পাতা আর লতা দিয়ে ব্যথার জায়গাটা বেঁধে দিলেন।

আর একটা শেকড় বের করে বৃদ্ধটিকে খেতে দিলেন। মুখে বললেন, এতেই আপনার সব ব্যথা চলে যাবে। এখন বলুন আপনি কোথায় যেতে চান?

বৃদ্ধ অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, ডানদিকে একটু ওপরে গেলেই আমার গুহা। তবে বাবা আমি তো পায়ে হেঁটে এখন আর ওপরে উঠতে পারব না। তুমি আমার জন্য অনেককিছু করেছ, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, এখন সন্ধ্যা নামছে, তুমি তোমার পথে চলে যাও। আমি একটু সুস্থ হলে ধীরে ধীরে উঠে চলে যাব।

আমার গুরু বললেন, আপনাকে আগে তো গুহায় পৌঁছে দিই, তারপর যেখানে যাবার যাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৃদ্ধটিকে বুকে তুলে নিলেন। বৃদ্ধ সারাটি পথ আমার গুরুকে আশীর্বাদ করতে করতে চললেন।

এখন গুরু আমাকে নিজের মুখে যেভাবে বলেছিলেন, তাঁর মুখ থেকে এবার সেভাবেই শুনব।

আমি আহত বৃদ্ধ মানুষটিকে নিয়ে তাঁর গুহায় হাজির হলাম। তাঁকে শুইয়ে দিলাম সেই গুহার মধ্যে।

তখন গুহা থেকে আলো সরে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ বললেন, এখানে আমার খাবার আর জল সবই আছে। দরকার মতো আমি সেগুলো নিয়ে নিতে পারব। তুমি অনেক উপকার করলে বাবা, তোমার বহু সময় আমি নষ্ট করে দিলাম।

আমি সেই আবছা আলোয় দেখলাম, কিছু খাবারদাবার এক কোণে মজুদ রয়েছে।

আমি গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। পশ্চিম আকাশের দিকে আমার চোখ পড়ল। লাল সূর্যটাকে আমি রক্তের ঢেউ তুলে ডুবতে দেখলাম। ঠিক তখনই আমার মনে হলো, যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি।

কিন্তু আশ্চর্য! আমার মনে সেজন্যে কোনো ক্ষোভ ছিল না। সারা মন জুড়ে তখন একটা অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ পাচ্ছিলাম।

আমি সর্দার হতে পারলাম না ঠিক কিন্তু একটি অসহায় বৃদ্ধের সেবা করতে পারলাম, এই অনুভূতিটুকু আমাকে গভীর আনন্দ দিল।

আমি গুহায় ফিরে এসে দেখি বৃদ্ধ মানুষটি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর পাশে জেগে বসে রইলাম। ভাবলাম, আজ রাতটুকু আমাকে এই গুহাতেই কাটাতে হবে।

বাইরে চাঁদ উঠেছে। গুহা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম বনের মাথায় তার আলো ঝরছে।

কতকগুলো মাঝারি আকারের বুনো জানোয়ার গুহার একটু দূর দিয়ে সারি বেঁধে নিচে নেমে গেল। ওরা নিশ্চয়ই নিচের ঝর্ণায় জল খেতে যাচ্ছে।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ, একদল আসে একদল যায়, এমনি চলল। হিংস্র কোনো জানোয়ার চোখে পড়ল না।

আমি পেছন থেকে আমার কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম। বৃদ্ধ মানুষটি উঠে বসে আমার কাঁধে হাত রেখেছেন।

আমি বললাম, কেমন বোধ করছেন?

অনেক ভাল। তোমার ওষুধ খেয়ে আমার ব্যথাট্যথা কিছু নেই। তুমি রাতে দেখছি নিচে নামনি, তাহলে এই গুহাতেই এসো দুজনে রাত কাটাই। এখানে আশা করি তেমন সুস্বাদু না হলেও তোমাকে কিছু খাবার দিতে পারব।

বৃদ্ধ বারণ সত্ত্বেও একটা পাত্রে বেশ কিছু শুকনো খাবার আর জল এনে আমার সামনে রাখলেন।

তুমি এটুকু খেলে আমি খুশি হব বাবা।

বৃদ্ধ বেশ অতিথিবৎসল।

আমি বললাম, আপনার খাবার?

সূর্য ডোবার আগেই আমি রাতের খাবার খেয়ে নিই। আজও খাবার খেয়েই আমি ঝর্ণার দিকে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে খানিকটা নিচে ছিটকে পড়ি। তারপর কিছু মনে নেই। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম জানি না, জ্ঞান ফিরলে তোমাকেই দেখতে পাই।

একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

বল।

আপনি একা সংসার ছেড়ে এই নির্জন জায়গায় পড়ে আছেন কেন?

লোভের যে একটা শাস্তি আছে তাই ভোগ করছি বাবা।

একটু যদি বুঝিয়ে বলেন।

পীশোন নদীর তীরে হাবীলা দেশে সর্দার নির্বাচনের একটা পদ্ধতি আছে। কোনো সর্দার মারা গেলে নতুন সর্দার-নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতা চলে নির্বাচিত চারজনের ভেতর। তার মধ্যে বিজয়ী একজনকে মাত্র শেষ পরীক্ষা দিতে এই পাহাড়ে আসতে হয়। যথাসময়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে এই পাহাড়েই সারাজীবন নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়। অবশ্য গুহায় থাকলেও খাদ্য আসে হাবীলার প্রাসাদ থেকে। আমি একসময় শেষ প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে এই নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছি। ওপরের একখানা গুহায় আরও একজন আছেন আমারই মতো নির্বাসিত। তাই বলছিলাম, লোভের পেছনে ছুটলে শাস্তিও তাড়া করবে তোমাকে।

আমিও আপনাদেরই মতো এমনি এক লোভের শিকার।

অবাক হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুমি কি সোনার ভাণ্ডার অব্দি পৌঁছতে পেরেছিলে? আমরা কিন্তু পারিনি।

আমি আমার চামড়ার থলে থেকে সোনার সেই পিণ্ডটা বের করলাম।

বৃদ্ধ তালটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললেন, তুমি তো কাজ শেষ করেই ফিরছিলে, তাহলে নিচে নেমে গেলে না কেন? এখান থেকে সর্দারের প্রাসাদ তো বেশি দূরে নয়। তাছাড়া তুমি যখন এখানে পৌঁছেছিলে, আমার মনে হয় তখনও সূর্যাস্তের বাকি ছিল।

বৃদ্ধ কথা বলতে বলতে কাতর হয়ে পড়লেন।

আমি বললাম, সর্দার হবার একটা মোহ আছে ঠিক কিন্তু মানুষের সেবার ভেতর যে তৃপ্তি তার কি কোনো তুলনা আছে! একজন অচৈতন্য মানুষকে পথের ধারে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও আমি আমার নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তাকে ফেলে চলে যাব, এমন অমানুষ হতে পারিনি বলে আমৃত্যু নির্বাসনের দণ্ডটা মাথা পেতে নিলাম।

এবার তর্তন বলল, হাবীলার কঠোর নিয়ম অনুযায়ী আমার গুরুও ঐ পাহাড়ের একটি গুহায় নির্বাসিত হলেন। উনি যে সুড়ঙ্গ-পথটি আবিষ্কার করেছিলেন সেই পথে পীশোন নদী সাঁতরে ওপারে চলে যেতে পারতেন কিন্তু এই দুই বৃদ্ধের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে তা তিনি করেননি।

এখন আমার গুরু ঐ বন আর পাহাড়ের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। ওখানকার জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি সবাই ওঁর চেনা। তারাও মনে হয় ওঁকে চেনে। উনি বিভিন্ন পশুপাখির গলার স্বর এবং মনের ভাব এমনভাবে চেনেন যে উনি ওদের মতো স্বরে ডাক দিলেই ওরাও সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেয়।

এক সন্ধ্যায় উনি এমনভাবে বাঘের ডাক ডাকলেন যা শুনে ঝর্নাতলায় জল খেতে জড়ো হওয়া জন্তুগুলো ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

উনি ভোররাতে অনেকগুলো পাখির ডাক ডেকে উঠলেই সামনের গাছে ঘুমন্ত সব পাখি জেগে উঠে ভোরের কলরব শুরু করে দেবে।

বড় আনন্দে আছেন আমার গুরু। উনি পশুপাখির মনের ভাব বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারেন।

পাহাড় থেকে আমার ভেড়ার পাল নিয়ে চলে আসার সময় উনি বলেছিলেন, জন্তুও ভালবাসা বোঝে, ভালবাসায় বশ হয়। তুমি সব সময় সবাইকে ভালবাসবে, তাহলে তাদের ভালবাসাও তুমি পাবে। সে কেবল মানুষ নয়, পশুপাখির বেলাতেও।

আমি আজও আমার গুরুর কথা ভুলিনি।

পর পর ছ'দিন নোয়াকে দেখতে পেল না তর্তন। পুব দিকে রাঙা আভা ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াকে দেখা যেত ইডেনের দক্ষিণ দিকের রাস্তার মোড় পেরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসতে। মাঠে ঈশ্বর-বন্দনার জন্য নেমে যাবার আগে নোয়া তর্তনের উদ্দেশে তাঁর বাঁ হাতখানা নাড়তেন। তারপর মাঠের মাঝখানে চলে গিয়ে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের মুখের কথা শুনতেন। পরে সূর্য সোনালী আলো ছড়াতে ছড়াতে বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেলে তিনি ফিরে আসতেন জলপাই গাছের তলায়। তর্তনের সঙ্গে গল্পগুজবে তাঁর কেটে যেত অনেকখানি সময়।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ছ' ছ'টা দিনই নোয়া গরহাজির। তর্তন ভাবল, একবার নোয়ার বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে। বুড়ো মানুষ, অসুখ-বিসুখে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

পরের দিন তর্তন হাজির হলো নোয়ার খোঁজে তাঁর বাড়িতে।

মাঠের একদিকে চাষের জমির প্রান্তে নোয়ার বাড়ি। সেদিকে দ্বিতীয় কোনো মানুষের বাড়ি দেখা যায় না।

তর্তন অবাক হয়ে দেখল, বিশাল আকারের একটা নৌকো তৈরি হচ্ছে নোয়ার উঠোনে। নোয়ার তিন-তিনটে

ছেলে হাতুড়ি ঠুকছে, আর নোয়া তাদের সামনে বসে কিভাবে বানাতে হবে তার ফরমাশ করছেন।

তিন শ' হাত লম্বা হলো কিনা ঠিক ঠিক মেপে দেখ।

শেম মেপে বলল, নির্ভুল তিন শ' হাত বাবা।

এবার হাম, তুমি চওড়ার দিকে মেপে বল, সঠিক কত হাত হয়েছে।

হাম দু'দুবার মেপে বলল, পঞ্চাশ হাতের থেকে একটি আঙুলও বেশি নয়।

এবার যেফৎ তুমি উচ্চতাটা মেপে আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

যেফৎ বলল, বাবা, আমি কিছু আগেই একবার মেপে দেখেছি, উচ্চতা একেবারে তিরিশ হাত।

তবু সবার সামনে একবার মাপ। যত বেশি চোখ সঠিক বলবে ততই নির্ভুল হবে তোমার কাজ। তুমিও একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

যেফৎ আবার একবার মেপে দেখল। মাথা নেড়ে জানাল, নির্ভুল তার মাপ।

জানালা ছাদের ক'হাত নিচে আছে তা কি দেখেছ?

একেবারে জানালার মাথা থেকে ছাদ পুরোপুরি এক হাত।

শেম বলল, ও যখন মাপছিল তখন আমি লক্ষ্য করেছি বাবা।

নোঙরের কাছির সঙ্গে বেঁধে ফেলল নিজেকে

হাম বলল, জানালার মাথায় কনুই রেখে ওকে ছাদে মাঝের আঙুল ঠেকাতে দেখেছি।

বেশ। মাপ মতো খাঁচাটা তৈরি হয়েছে, এখন তার গায়ে মেদ, মজ্জা, মাংস লাগাতে হবে। ও কাজগুলো করতে হবে অতি নিখুঁতভাবে। সময় বেশ কিছুটা লাগবে বইকি। তবে কাজের সময় মনে রাখবে তাঁর নির্দেশ। এক চুলও সরে যাবে না তাঁর নির্দেশ থেকে।

তিনজনেই বলে উঠল, আমরা অবশ্যই মনে রাখব তাঁর কথা।

তিনতলা তৈরি করবে আর জাহাজের পাশে থাকবে দরজা।

ওরা তিন ভায়েতেই মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

ঈশ্বরের আর কিছু নির্দেশ আমি কি তোমাদের জানিয়েছি?

শেম বলল, জাহাজের ভেতর কুটির নির্মাণ করতে হবে।

হাম বলল, জাহাজের ভেতরে ও বাইরে ভালভাবে ধুনার প্রলেপ দিতে হবে।

যেফৎ বলল, ভূচর-খেচর প্রাণীদের জোড়ায় জোড়ায় কখনো বা সাত জোড়া করে জাহাজের ভেতর তুলে নিতে হবে। এ বিষয়েও ঈশ্বরের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, আর তুমি তা বার বার করে আমাদের জানিয়ে রেখেছ।

নোয়া বললেন, খাবার মজুদের কথাটা ভুলে যেও না যেন।

তিনজনেই বলে উঠল, না বাবা, ও কথা ভোলার নয়।

তর্তন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জাহাজটাকে লক্ষ্য করল, আর শুনল নোয়ার সঙ্গে তাঁর ছেলেদের কথাবার্তা। কিন্তু এ বিষয়ে সে সুস্পষ্ট কোনো ধারণায় আসতে পারল না।

এবার তর্তন নোয়ার কাছে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে নোয়া বিস্মিত। বললেন, আরে এসো এসো, বস বস, কি মনে করে এই ভোরবেলা আমার কুটিরে?

তর্তন বলল, আজকের দিনটিকে ধরলে সাতটি সকাল তুমি ইডেনের সামনের মাঠে প্রার্থনায় বসনি। তুমি কেমন আছ জানবার জন্য প্রাণটা অস্থির হলো। তাই মাঠ পেরিয়ে ছুটে এলাম তোমার বাড়িতে।

পাশে টেনে নিয়ে তর্তনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন নোয়া। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখ কে এসেছে, তোমাদের কাছে যার গল্প করি সেই ভেড়া নিয়ে ভ্রাম্যমাণ তর্তন। ও যা গল্পবলিয়ে না,

একবার শুরু করলে সাধ্যি কার যে ওর সামনে থেকে সরে যায়।

নোয়ার স্ত্রী বললেন, তোমরা গল্প কর, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

নোয়া বললেন, তোমার হাতে গড়া পিঠে থাকলে সেটাই খাওয়াবে তর্তনকে।

আপনি কেন ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন দাদু, আমি কোনোকিছু না খেয়ে এ বাড়ি ছেড়ে উঠছি না।

নোয়ার মুখে ফুটে উঠল হাসি। তিনি ছেলেটিকে যত দেখছেন ততই জড়িয়ে পড়ছেন তার মায়ায়।

তোমার ভেড়াদের খবর কি?

ওরা বেশ কিছুকাল বন্দী হয়ে আছে এক জায়গায়। দূর দেশে যাবার জন্য ওদের পা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তোমার কি ইডেনের বাইরে ঐ জলপাই গাছটার তলায় বাসা বেঁধে থাকতে ভাল লাগে?

আমি ঐ বাগানের সংলগ্ন ঘাসের জমির দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। আমার ভেড়াগুলো যতদিন না ঘাসগুলোকে নির্মূল করে ফেলে ততদিন আমি ডেরা বেঁধে থাকি ঐ গাছতলাতেই।

এক জায়গায় চুপ করে একাটি বসে থাকতে ভাল লাগে?

তর্তন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, আমি তো একা নই। আমার ভেড়ার পাল আছে, গাছের ওপর অজস্র পাখি বাসা বেঁধে আছে। আমি তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাতেই কথা বলার চেষ্টা করি। দিব্যি আনন্দে সময় কেটে যায়। তাছাড়া দূরের গাঁ থেকে আমার বন্ধুরা তাদের ভেড়া নিয়ে চরাতে আসে, তাদের সঙ্গে আমি খেলাধুলো করি। এর চেয়ে আনন্দ আমি কোথায় পাব দাদু।

নোয়া বললেন, তুমি আনন্দে থাক, ঈশ্বরকে সব কাজে স্মরণ করবে। তিনি সর্বত্র রয়েছেন। তুমি যা কিছু দেখছ সবই তাঁর সৃষ্টি।

তর্তন বলল, আমি তাঁর কথা অনেকের মুখ থেকে শুনেছি কিন্তু কোনোদিনই তাঁকে দেখতে পাই না।

তোমার দেখার আগ্রহ বেশি হলে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখা দেবেন। কোনো দুঃখ অথবা কোনো বিপদে যদি তুমি পড় তাহলে আকুল হয়ে তাঁকে ডাকবে, তিনি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন, দুঃখ দূর করবেন।

তর্তন একটুও ইতস্তত না করে বলল, আমি কিন্তু তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না দাদু।

কেন ভাই?

তাহলে শোন, বেশ কিছুকাল আগে আমরা ঐ ইডেনের ধারেই ভেড়া চরাচ্ছিলাম। গ্রাম থেকে সেদিন আমার অনেক বন্ধু এসেছিল। আমরা সেদিন নানারকম খেলায় মেতে উঠেছিলাম।

আমাদের এক বন্ধু কখন দলছাড়া হয়ে ইডেনে উঁকিঝুঁকি মারছিল, কিন্তু কোনোভাবেই উড়ন্ত পাহারাদার আর জ্বলন্ত তরবারির চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। অজস্র ফলের ভারে ঝুলে পড়ছিল ডালগুলো। সে তখন একটা ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে জীবন-বৃক্ষের ফলকে তাক করে ঢিল ছোঁড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ভেতর থেকে একটা সাপ ছোবল মারে তার বুকে।

অল্প সময় সে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিল। তারপর তীব্র বিষের জ্বালায় সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

আমরা তখন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ি এবং কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এক বন্ধু হঠাৎ বলল, এসো, আমরা ওকে ঘিরে বসে ওর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রাণভিক্ষা করি।

তাই করলাম আমরা। ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে কারু কারু চোখে জল এসে গেল কিন্তু বন্ধু আর চোখ মেলে তাকাল না। সেই থেকে আমি ঈশ্বরের কাছে কোনোকিছু প্রার্থনা করি না। আমার ধারণা হয়েছে, যা ঘটার তা স্বাভাবিকভাবে ঘটবে, সেখানে ঈশ্বরকে জড়ানো ঠিক নয়, আর সেখানে ঈশ্বরের হয়তো কোনোকিছু করারও নেই।

নোয়া দুঃখমেশা ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, তিনি পারেন না এমন কিছু নেই, তবে তাঁর বিচার কোনপথে চলে তা আমাদের ধারণার বাইরে।

তর্তন বলল, দাদু, তোমার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমি সার বুঝেছি, আগুনে হাত দিলেই পুড়বে, গাছের থেকে পড়লে পা ভাঙতে পারে, চারদিকে সজাগ চোখ মেলে চলতে না পারলে বিপদ যে কোনো দিক থেকে আসতে পারে। এখানে ঈশ্বরকে ডেকে কোনো লাভ নেই, তাঁর করারও কিছু নেই।

তবু এ বুড়োর একটা কথা মনে রেখ ভাই। বাঁচা-মরা তাঁরই ওপর নির্ভর করছে।

মাঠ দিয়ে চলতে চলতে লোকে বিশাল আকারের জাহাজটা দেখে নানারকম মন্তব্য করছে।

কেউ বলছে, নোয়া বুড়োর বাড়ি একটা পাগলের কারখানা। দেখনি, ছেলে বুড়ো পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন বিড়বিড় করে।

আবার কেউ বলছে, সেদিন নোয়ার এক বউমার সঙ্গে আমার বউমার দেখা। দুজনে একটা পুকুরের পাড়ে বসে ঝুড়িতে শাক তুলছিল। তোলা শেষ হলে দুজনে উঠে দাঁড়াল। অমনি নোয়ার বউমা ঐ শাকভর্তি ঝুড়িখানা আকাশের দিকে তুলে কতক্ষণ ধরে রইল।

আমার বউমা বলল, কি হলো ভাই, অমন করছ কেন?

নোয়ার বউমা বলল কি জান, এতগুলো শাক দেবার জন্য সদাপ্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবাই বক্তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

অন্যজন বলছে, ঢাউস জাহাজখানায় চেপে ওরা বোধহয় দেশান্তরী হবে।

আর একজন তার ওপর মন্তব্য করছে, এ নৌকো জল, ডাঙা আর আকাশপথে দিনের পর দিন অবিরাম চলতে পারে।

অমনি মন্তব্য, ভেল্কি, ভেল্কি, বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখাচ্ছে বটে।

এক রাতে কার ডাক শুনে ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন নোয়া। জানালা দিয়ে দেখলেন, আকাশে পূর্ণ চাঁদটি জ্বলজ্বল করছে।

এবার নোয়া স্পষ্ট শুনতে পেলেন ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, তোমার জাহাজ তৈরি?

হাঁ প্রভু।

সাতদিনের ভেতর আমার নির্দেশ মতো জোড়ায় জোড়ায় পশুপাখিসহ সপরিবারে জাহাজে উঠে দ্বার বন্ধ করে দেবে। তারপর আমি ঝড়-জল, বিদ্যুৎ-প্লাবন পাঠিয়ে পুরো চল্লিশ দিনে পৃথিবীকে একেবারে প্লাবিত করে দেব। প্রাণবায়ু হরণ করে নেব ভূচর-খেচর সমস্ত প্রাণীকুলের। এরা পাপে পূর্ণ করে ফেলেছে জগৎ-সংসার।

অক্ষরে অক্ষরে নোয়া পালন করলেন ঈশ্বরের নির্দেশ।

সাত দিনের দিন দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র নোয়ার জাহাজ।

সাতদিন গত হলে শুরু হয়ে গেল মহাপ্লাবন। আকাশের বদ্ধ জলের জানালাগুলো খুলে গিয়ে অনর্গল ঝরতে লাগল জলধারা। বাঁধ ভেঙে মহাগর্জনে ছুটে আসতে লাগল সমুদ্রের বিপুল জলরাশি। শুরু হ.. গেল চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রির তাণ্ড...।

নোয়ার বাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে আসছে তর্তন। দিন-রাত্রের পার্থক্য প্রায় ঘুচে গেছে। সেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারির বুকে ঘন ঘন চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। বাজ পড়ছে মহাশব্দে মুহুর্মুহু।

বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে জল তোলপাড় করতে করতে নোয়ার বাড়ির প্রশস্ত উঠোনে এসে দাঁড়াল তর্তন।

নোয়া দাদু, নোয়া দাদু, কোথায় তুমি?

কোনো উত্তর নেই। বিশাল জাহাজখানা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের বুকে। বিদ্যুতের চমকে কখনো দেখা যাচ্ছে, কখনো বা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে নিরেট অন্ধকারে।

তর্তন দেখল, নোয়া দাদুর ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। সে একবার প্রদক্ষিণ করল সারা ঘর। চিৎকার করে ডাক পাড়ল, কেউ কোথাও আছ তোমরা? নোয়া দা..দু..উ..উ।

না, উত্তর নেই। কেবল ঝড়ের গর্জন, বাজের কানফাটা চিৎকার ত..র মহাপ্লাবনের জলকল্লোল।

তর্তন ছুটে গেল সেই বিশাল তিনতলা জাহাজটির ধারে। আলো ঝলসে উঠতেই দেখল, কোথাও কোনো ছিদ্র নেই।

সে জাহাজের তলায় আটকে থাকা একটা বাঁশের সাহায্যে একতলায় উঠে ..েল। সমস্ত জাহাজ প্রদক্ষিণ করে দেখল, এক চিলতে কোথাও ফাঁক নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক কষ্টে দোতলা, তিনতলাতেও উঠল। একই অবস্থা। বন্ধ ভেতর থেকেই। করাঘাতের পর করাঘাত করে ব্যর্থ হলো। ঝড়ের গর্জনে শুনতে পেল না নিজের হাতের শব্দ।

এখন ফেরার পথ নেই, আর ফিরবেই বা কোথায়! তর্তন একতলায় নোঙরের কাছির সঙ্গে বেঁধে ফেলল নিজেকে। কাঁধের থলেতে কাঁচা-পাকা কটা জলপাই। না, আরও কিছু আছে। গুরুর দেওয়া সেই বনৌষধি, যা শেকড়ের আকারে আঁটি বাঁধা আছে তার থলেতে। যার একটি টুকরো চিবিয়ে খেলেই কয়েক দিনের মতো নিবৃত্তি হবে ক্ষুধার।

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি আকাশ থেকে যেন উধাও হয়ে গেল গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ। শুধু তাল তাল মেঘের বুক চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের খড়্গ। আর প্রবল বেগে ঝরে পড়ছে অফুরন্ত বারিধারা। পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে মহাসমুদ্রের উদ্দাম, উত্তাল তরঙ্গ। যেন সহস্র ফণাযুক্ত মহানাগ উগরে দিচ্ছে তাদের নীল গরল।

পৃথিবীর বুকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল জল। একসময় সেই জলধির ওপর দিয়ে ভেসে গেল নোয়ার জাহাজ।

কতদিন, কতরাত্রি সে জাহাজের পাটাতনের ওপর পড়ে আছে তা জানে না তর্তন। মাঝে মাঝে প্রকৃতির নিয়মে সে ক্ষুধা পেলে চিবিয়ে নেয় একখণ্ড ক্ষুধাহারী শেকড়।

বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক নারী ভেসে যাচ্ছে—বুকে তার একটি শিশু। সে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে জল থেকে তুলে আনল, মা আর শিশুকে। জাহাজের পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিল তাদের।

নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে আবার বিদ্যুৎ চমকাল। তর্তন দেখল, মা ও সন্তানের ভেতর প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ মহাকাশে বিদীর্ণ বিদ্যুতের ভেতর থেকে শোনা গেল বজ্রগম্ভীর এক কণ্ঠস্বর, কে তুই! নোয়ার জাহাজ ধরে দাঁড়িয়ে আছিস, এখনও জীবিত!

আমি তর্তন, বাঁচার জন্য লড়াই করছি।

কেউ বাঁচবে না, ঐ জাহাজের ভেতর আবদ্ধ কটি প্রাণ ছাড়া।

তুমি কে?

আমি ঈশ্বর। সবকিছু আমারই সৃষ্টি, আবার আমিই ধ্বংসের কর্তা।

হঠাৎ তুমি ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠলে কেন?

আমি কাউকে আমার কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিই না। তবু হে উদ্ধত কিশোর, তুমি শুনে রাখ, পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে তাই আমি ভূচর-খেচরের সব প্রাণীকে ধ্বংস করছি।

তুমি একবার এখানে নেমে আসবে কি?

কি বলতে চাও ওখান থেকেই বল। আমার সর্বত্র চোখ আছে, আমি সবকিছু দেখতে পাই, আমার সর্বত্র কান আছে, আমি সবকিছু শুনতে পাই।

তুমি এই পাটাতনের ওপর পড়ে থাকা মা ও শিশুটিকে দেখতে পাচ্ছ?

ঐ তো দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে। অকারণে ঐ দুটো গলিত মৃত শবকে আগলে ধরে আছ কেন? ওতে অপবিত্র হচ্ছে নোয়ার জাহাজ।

ঈশ্বর, আমি ভাবতেও পারিনি যে তুমি এতখানি অন্ধ।

ঈশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই অতি সামান্য একটি কিশোরের কি আশ্চর্য স্পর্ধা! তবু তিনি জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, তুমি কি বলতে চাইছ অপরিণামদর্শী নির্বোধ বালক!

তুমি যতই আমাকে নির্বোধ বল, তাতে তোমার অন্ধত্বের অপবাদ ঘুচবে না।

কি রকম?

তুমি যাকে অপবিত্র গলিত শব বলছ তার মতো পবিত্র জীবন্ত মূর্তি পৃথিবীতে নেই। যেখানে মা আর সন্তান সেখানেই পবিত্রতা। তারা অমর, তাদের কখনও মৃত্যু হয় না। তুমি ভয়ঙ্কর ঘাতকের মতো তাদের দেহটাকে হত্যা করেছ মাত্র। তুমি ওখান থেকেই একবার ভাল করে চেয়ে

দেখ, মা মারা যাবার আগে তার দুটি হাত দিয়ে শিশুটিকে এমন শক্ত বাঁধনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে যা মৃত্যুর পরেও তেমনি শক্ত আর অটুট হয়ে আছে। তুমি যদি মনে কর, ঐ মা ও ছেলের প্রাণ তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ, তাহলে তুমি অহংকার আর ভুলের স্বর্গরাজ্যে বাস করছ।

সহসা বিদ্যুৎ নিভে গেল, বজ্রের শব্দ আর শোনা গেল না। সমুদ্রের জল স্থির নিস্তরঙ্গ।

শেষ রাতে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মহা-প্রলয়ের জলরাশি রহস্যময়।

পাটাতনের ওপর অঘোর নিদ্রায় শুয়ে আছে তর্তন। ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপ-কথনের পর সে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। দারুণ উত্তেজনার পর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। এখন নিবিড় তন্দ্রায় নিমগ্ন।

মাঝে মাঝে ঘুমের ভেতর স্বপ্নের মিছিল চলেছে। অগণিত ভেড়ার পাল ভেসে যাচ্ছে নোয়ার জাহাজের পাশ দিয়ে। তারা তর্তনকে দেখে প্রাণফাটা ডাক ডেকে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও, আমরা তলিয়ে গেলাম।'

তর্তনের ঘুম ভেঙে গেল। সে জলের প্রবাহে ভেড়াগুলোকে দেখতে পেল না। আবার শুয়ে পড়ল সে।

এবার একজন অন্ধ বৃদ্ধ ভিখিরীকে দেখতে পেল সে তার স্বপ্নে। ভিখিরীটি গ্রামের পথে বসে থাকত আর কপালে করাঘাত করে বলত, হে ঈশ্বর, আর কতদিন আমাকে এমন করে বাঁচিয়ে রাখবে, মরণ দাও, মরণ দাও।

লোকটিকে সে বহুদিন ভেড়ার দুধ খাইয়েছে।

তর্তন স্বপ্নের ভেতর দেখল, ঐ অন্ধ বৃদ্ধ একটা ভেসে চলা মৃত পশুকে জড়িয়ে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে বাঁচাবার।

শেষ রাতে তর্তন স্বপ্ন দেখল তার গুরুকে, তিনি অগাধ জলের ভেতর সাঁতার কেটে চলেছেন। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছেন, কেউ কাউকে চিরদিন বন্দী করে রাখতে পারে না। একদিন না একদিন তার মুক্তি হবেই।

তর্তন ভাবল, আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তার গুরু কতখানি নির্ভীক।

ভোররাতে ঘুম ভেঙে গেল তার। এতগুলি দিন-রাত্রি যুঝতে যুঝতে সে ক্লান্ত, অবসন্ন।

হাঁটু গেড়ে বসে সে মা ও সন্তানকে ভাসিয়ে দিল জলে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর দুর্দশার কথা ভেবে তার চোখ বেয়ে অশ্রু নামল অঝোর ধারায়।

তর্তন মুহূর্তে খুলে ফেলল তার কোমরের বাঁধন। তার মনে হলো, সবাই যখন মৃত্যু-পথের পথিক তখন তার একার এমন ভিখিরীর মতো বাঁচার কোনো অধিকার নেই। সে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাপ্রলয়ের অনন্ত প্রবাহে।

কতক্ষণ পরে কতকগুলো শুশুক দেখতে পেল তাকে। সে তখন মৃতপ্রায়, অচৈতন্য। সেই শুশুকগুলি পরম যত্নে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে তুলল এক পলি নির্মিত পাহাড়ে। সেই পলির পাহাড়ের ওপরেই সে ফেলল তার শেষ নিঃশ্বাস। তখন সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। শুধুমাত্র তার ছিন্ন পোশাকে আটকে রয়েছে একটি ভুক্তাবশেষ জলপাইয়ের আঁটি।

মহাপ্রলয়ের সপ্তম মাসে নোয়ার জাহাজ এসে লাগল আরারত পর্বতের ওপর। দশম মাসের প্রথম দিনে জল ক্রমশ সরে হ্রাস পেতে লাগল আর ধীরে ধীরে জেগে উঠল পর্বতের শৃঙ্গগুলি।

আরও এক মাস দশ দিন গত হলে নোয়া খুলে ফেললেন তাঁর জাহাজের বন্ধ জানালাটা। ভূমি থেকে প্রলয়ের জল যথাস্থানে সরে গেছে কিনা জানার জন্য তিনি একটি দাঁড়কাককে উড়িয়ে দিলেন। সেই কাক ভূমির জল একেবারে শুষ্ক না হওয়ায় এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াতে লাগল।

এরপর নোয়া উড়িয়ে দিলেন একটি কপোত। সেটিও শুষ্ক ভূমিতে পা রাখার জায়গা না পেয়ে ফিরে এলো জাহাজে। নোয়া হাত বাড়িয়ে কপোতটিকে ধরে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন।

পরে আরও সাতদিন অপেক্ষা করে সেই কপোতটিকে জাহাজের বাইরে ছেড়ে দিলেন।

সারাদিনের পর সন্ধ্যায় ফিরে এলো সে কপোত। তার চঞ্চুতে জলপাইয়ের একটি নবীন পাতা।

আরও সাতদিন বিলম্বের পর কপোতটিকে ছেড়ে দিলেন, সে আর ফিরে এলো না।

পরে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে নোয়া জাহাজের সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে নির্জন শুষ্ক ভূমিতে অবতরণ করলেন। তিনি প্রথমে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে হোম নিবেদন করলেন ঈশ্বরের উদ্দেশে।

ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমরা এবার পশুপক্ষী মনুষ্যাদি মিলে পৃথিবীকে প্রজাপূর্ণ কর।

মনে মনে বলতে লাগলেন, আমি আর কোনোদিন এই পৃথিবীকে এভাবে ধ্বংস করব না।

এই প্রতিজ্ঞা করার সময়ে ঈশ্বরের কি মনে পড়েছিল, সেই হৃদয়বান নির্ভীক কিশোরটির কথা!

তিনি সবাইকে ডেকে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে বললেন, আর কোনোদিন মহাপ্রলয় এনে আমি বিশ্বের জীবকুলকে বিনষ্ট করব না।

আমার এই উক্তি মনে রাখার জন্য আমি মেঘের ওপর আমার ধনু স্থাপন করব। সেই ধনু দেখলেই আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যাবে।

অপূর্ব বর্ণময় এক রামধনু উঠল। তার এক প্রান্ত স্পর্শ করল নোয়ার জাহাজ, অন্যপ্রান্ত ছুঁয়ে রইল একটি পত্রবহুল জলপাই বৃক্ষ, যার তলায় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে এক বিদ্রোহী কিশোর।

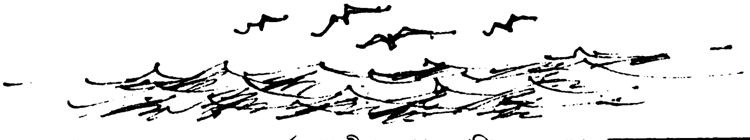

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

বিষ থেকে আশিস

ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত

আমাজন নদীর তীরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের ডালের ওপর বসেছিলেন জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। আর তাঁর পাশেই তীর-ধনুক নিয়ে ওদেশের এক আদিম অধিবাসী বসেছিলেন শিকারের প্রতীক্ষায়। গাছের নিচে স্তূপ হয়ে থাকা শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ হতেই অভিজ্ঞ সেই আদিম অধিবাসী তীর চালালেন। তীর-বিদ্ধ করলেন গুঁড়ি মেরে বসে থাকা এক জাগুয়ারকে। বাঘটার দেহ ছট্‌ফট্‌ করতে করতে নিস্পন্দ হয়ে গেল। রুদ্ধনিশ্বাসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন, সামান্য একটা তীরের বিষ কিভাবে জাগুয়ারের মতো একটি শক্তিশালী জানোয়ারকে কত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিল।

প্রায় চারশো বছর আগেকার কথা। কলম্বাস তখন আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। দলে দলে শ্বেতাঙ্গরা নতুন মহাদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তখন তাঁদের ভাব ও ভাষার আদান-প্রদানও শুরু হয়েছে। এই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তাঁদেরই একজন। বিষ মাখানো তীরের আশ্চর্য মারক শক্তি স্বচক্ষে দেখে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে সবিস্তারে প্রচার করলেন। এরপর আরও অনেক ইউরোপীয়ান দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের ঐ মারাত্মক অস্ত্রটির কথা নিজ নিজ দেশে প্রচার করলেন।

এই ঘটনার বহুদিন পর অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেল এই বিষের নাম কিউরারি। এই বিষ তীরের ফলায় মাখিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল-অধ্যুষিত এলাকার মানুষরা শিকার করত। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও ব্যবহার করত ঐ বিষতীর। আমাজন নদীর উৎসমুখে কনড্রোডেনন্‌ টোমেনটোসা নামে এক ধরনের লতানে গাছের নির্যাস থেকে এই বিষ তৈরি করে বাঁশের নলে সংরক্ষণ করে রাখা হতো। ব্যবসার জন্যও এই নির্যাস দূরদূরান্তরে পাঠানো হতো।

আমেরিকা সভ্য জগতকে অনেক কিছু দিয়েছে। যেমন তামাক, রবার, চকোলেট, আপেল। সেই সঙ্গে দিল এই ভয়ঙ্কর বিষ কিউরারি। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছিলেন, কিভাবে বেদনাহীন ভাবে নিরাপদে অস্ত্রোপচার করে রোগীকে নিরাময় করা যায়। কিউরারি নিয়ে পরীক্ষা চলল। অবশেষে প্রমাণিত হলো, কিউরারির মাংসপেশী শিথিল করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। কিউরারি রক্তের সঙ্গে মিশলেই মাংসপেশী অবশ হয়ে আসে। ফলে প্রাণীরা মারা যায়।

আগে অস্ত্রোপচারের সময় প্রতিবর্তী ক্রিয়া চলতে থাকায় সার্জেনদের অনেক অসুবিধা হতো। পেটের ও বুকের অস্ত্রোপচারের সময় অন্ত্র ও ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অস্ত্রোপচারের কাজ বিঘ্নিত হতো। রক্ত-জালিকাগুলো ছুরির মুখে হঠাৎ এসে যাওয়ায়, কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। পরবর্তী যুগে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারে কিউবারি বিষকে রূপান্তরিত করে শল্যায়নের আগে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতে থাকলেন। ফলে এই বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বাঁশের টিউবে ভরে একদা পাঠানো হতো বলে, এই ভেষজের নামকরণ হলো টিউবো কিউরারি বা টিউবারিন। বিজ্ঞানীদের এই উদ্ভাবন কিন্তু একদিনে হয়নি।

১৭৮১ সালে কনটেনা পরীক্ষা করে দেখালেন কিউরারি হৃদপিণ্ডের কাজ ব্যাহত না করেও মাংসপেশী শিথিল করতে পারে। ১৮২৫ সালে চার্লস ওয়েটর সর্বপ্রথম ইউরোপে একটা গাধার উপর কিউরারি প্রয়োগ করে অপারেশন করেন। সেই সময় তিনি গাধাটার নাকে নল ঢুকিয়ে, গ্যাস দিয়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাস কৃত্রিমভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৫০ সালে ক্লড বার্নাড দেখালেন, কিউরারির প্রভাবে মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রীর সংযোগস্থল বা মায়ো নিউরাল জংশন অবশ হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে কিউরারি বিজ্ঞানীদের কাছে এক অপরিহার্য ভেষজ। প্রতিদিন অপারেশন থিয়েটারে কিউরারি ব্যবহৃত হচ্ছে। একদিন যে বিষ ছিল শুধু প্রাণ নেওয়ার অস্ত্র, বিজ্ঞানীদের অনলস গবেষণা তাকে সঞ্জীবনী ভেষজে রূপান্তরিত করেছে। আমাজনের উৎসমুখের বন্য লতাগুল্ম আশীর্বাদী ভেষজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্মানের উচ্চাসনে।

ছবি : দিলীপ দাস

বুদ্ধু ও কালো সনপ

সুকুমার ভট্টাচার্য

ঘটনাটা ঠিক এইরকমই ঘটেছিল। বুদ্ধু আর কালো সনপ একই দিনে, প্রায় একই সময়ে পৃথিবীতে প্রথম আলো দেখেছিল। এবং জঙ্গলে। বুদ্ধু হলো এক গরীব পাহাড়ী আদিবাসীর সন্তান। এমনি গরিব যে, যাদের সহায়-সম্বল বলতে তেমন কিছুই নেই। ওদের গোষ্ঠীর কাজ হলো স্বর্ণকণা আহরণ করা। অর্থাৎ, হিমালয়ের পাদভূমি দিয়ে যে পাহাড়ী নদী তরতরিয়ে বয়ে যায়, তার বালুকাময় তীরে, বালি ছেঁকে সোনার কণা খুঁজে বার করা। তারপর সেই সোনা কাছাকাছি কোনো পাহাড়ী টাউনে গিয়ে বিক্রি করা। আর কালো সনপের পরিচয় হলো, এক বুনো হাতির বাচ্চা।

দুজনের কেউই জানে না যে, ওদের একই দিনে, প্রায় একই সময়ে জন্ম। আর এই জন্যেই বোধহয় দুটো জীবন একই সুতোয় বাঁধা হয়ে গেছিল। হিমালয়ের পাদমূলের এই যে পাহাড়ী নদী, একে এখানকার লোকেরা বলে 'টাকার নদী'। এই নদী আর তার চারপাশের জঙ্গলে ঘুরে-ফিরে ওরা দুজনেই বড় হচ্ছিল। যদিও কেউ কাউকেই দুচক্ষে দেখতে পারত না। দুজনেই দুজনকে শত্রু ভাবত। একে অন্যকে সব সময়েই চাইত প্রাণে খতম করে দিতে।

প্রথম দেখা হওয়ার দিন থেকেই এই ভাবটা দেখা দিয়েছিল দুজনের মধ্যে। অথচ তখন দুজনেই শিশু। ঘাসের মাথা-ডোবা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বুদ্ধু সেদিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে পেয়েছিল কালো মতন কি একটা জন্তুর বড়সড় মাথা। ঘাসের ডগা ছাড়িয়ে উঁচিয়ে আছে। লম্বা মতন কি যেন একটা নড়ছে এদিক-ওদিক। আসলে সেটা হলো কালো সনপের শুঁড়। যেমন সরু লম্বা তেমনি কালো তেল-চকচকে। সাপ মনে করে ভয় পেয়ে গেছিল বুদ্ধু।

তারপরেই মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। ইচ্ছে হলো ওটাকে পাকড়াও করার। তবে বাচ্চা হলেও বুদ্ধুর কিছু জ্ঞানগম্যি হয়েছিল। হুট করে কোনো ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। তাই এদিক-ওদিক তাকাল। মা যদি কাছেপিঠে থাকে তো, একটা ডাক দেবে। কিন্তু মা ছিল কিছুদূরের একটা বাঁশবনে। ওদিকে বুদ্ধুকে দেখে কালো সনপ একেবারে স্থির। অনড়। যদিও এমনটি থাকা তাদের স্বভাবের বাইরে। হাতিরা কখনই শান্ত বা চুপচাপ থাকে না। তারা যেখানেই থাকুক, তাদের অবস্থিতি টের পাওয়া যায় নানা শব্দে। কিন্তু ঠিক ওই সময় কালো সনপের স্থির হয়ে থাকার কারণ, সে বাতাস থেকে গন্ধ নিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করছিল, সামনের জীবটা ঠিক কেমনতরো। তেমন বিপদজনক কিছু কিনা? কিন্তু সে সময় একদম বাতাস ছিল না। ফলে বুদ্ধুর বিষয়ে কিছুই জানতে পারল না সে।

এদিকে মা না থাকলে কি হবে! বুদ্ধু মনে মনে অস্থির সামনের কালো

পশুটাকে পাকড়াও করার জন্যে। অতএব একেবারে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াল কালো সনপের সামনে। নিরীক্ষণ করার মতো করে এবার তাকাল বুদ্ধু।

বাচ্চা হাতির রঙ একটু অন্যরকম হয়। কিন্তু কালো সনপের গায়ের রঙ একেবারে কালো কুচকুচে। মাথার ওপর সামান্য কিছু চুল। পাতলা। অপরূপ দেখতে। এক নজরেই বলা যায় বেশ অভিজাত বংশ। পৃথিবীর আদিকালে যে সব ম্যামথরা মাটির ওপর চরে বেড়াত, ও হয়তো তাদেরই কোনো অধঃস্তন বংশধর।

ঠায় পায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অথচ এ অবস্থায় ঠিক কি করবে, সেটাও বুঝতে পারে না। শেষে লম্বা এক লাফ দিল কালো সনপের গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ার জন্যে। আর তার পরেই শুরু হয়ে গেল লড়াই। একেবারে জড়ামড়ি অবস্থায়।

চিৎকার করে গা-ঝাড়া দিল হাতি। তার গায়ের খসখসে চামড়ায় ঘষা লেগে, বুক ছড়ে গেল বুদ্ধুর। কালো সনপ শক্তির দিক থেকে অনেক শক্তিমান। খুব সহজেই বুদ্ধুকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে ধরার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে দু-পাক গড়িয়ে গিয়ে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল

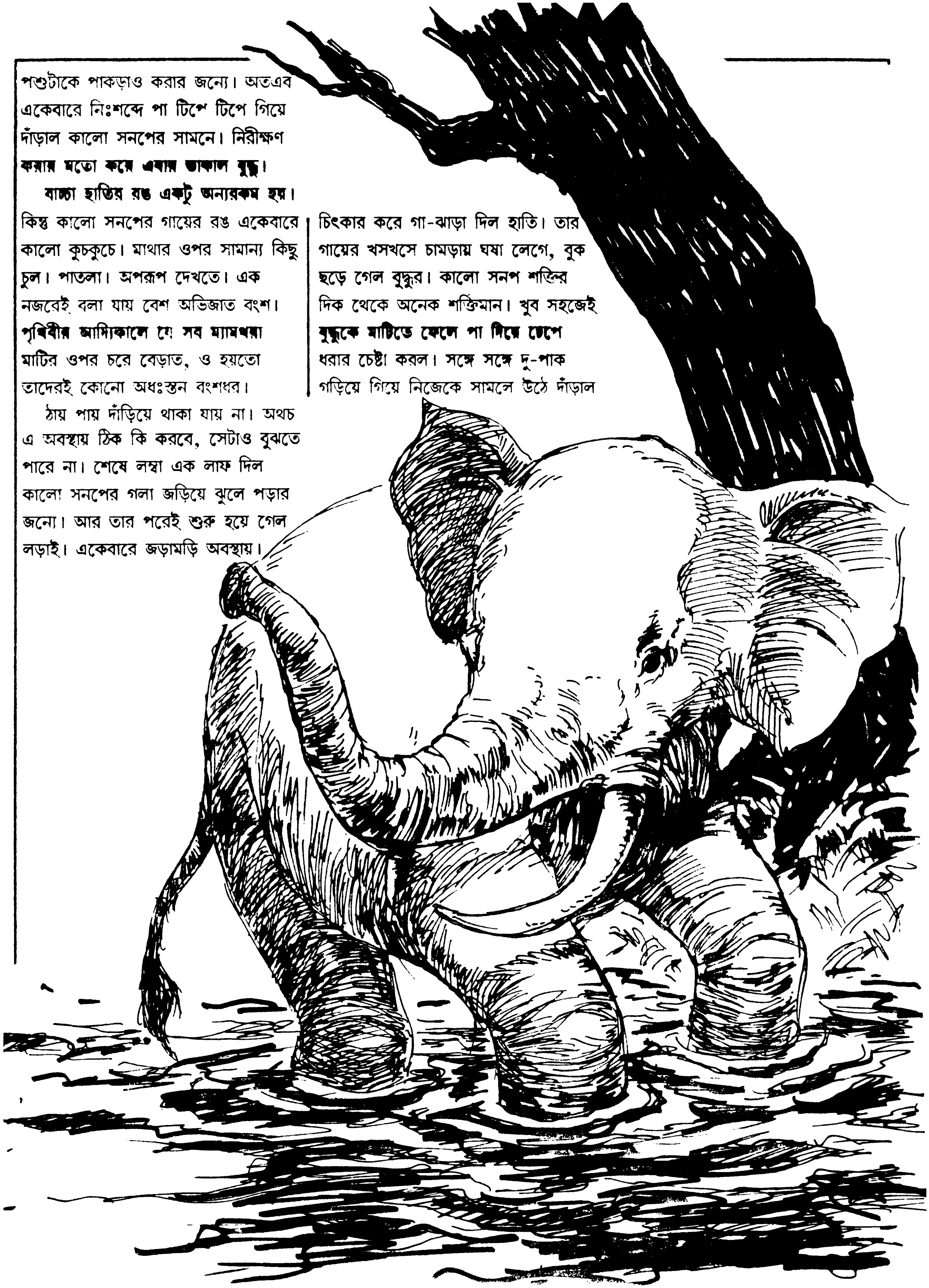

বুদ্ধু। ঠিক সেই সময় কালো সনপের মা কোথা থেকে শুঁড় উঁচিয়ে ছুটে এল। তাকে দেখেই পিছু ফিরে ছুট দিল বুদ্ধু।

কপাল ভাল। তাই সেদিন বেঁচে গেছিল বুদ্ধু। কালো সনপের মা যদি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে পিছু ধাওয়া করত, তাহলে আর রক্ষে ছিল না। নিশ্চয় কুঁড়ে পর্যন্ত ছুটে যেত, আর তাকে মাটিতে ফেলে পায়ে দলে পিষে মারত। কিন্তু তা না করে, মা-হাতিটা তার ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধু দেখেছিল, দুজনে হাঁক-ডাক করতে করতে চলে গেল অন্যদিকে।

হাঁফ ফেলে মাটিতে বসে পড়েছিল সে। অকারণে উরু বাজিয়ে খুকখুক করে হেসেছিল খুব।

যাই হোক, এই ঘটনা থেকে ছোট-বড় দুটো হাতিকেই সে চিনে নিল ভাল করে। যেহেতু মা-হাতিটার বয়েস বেশি, তাই তার গায়ের রঙ পাঁশুটে, আর তার বাচ্চার রঙ কালো। নিকষ কালো। এরপর থেকে সযত্নে ওদের চোখের বাইরে রাখার চেষ্টা করল নিজেকে।

তবুও মাঝে মাঝে যে দেখা হয় না এমন নয়। সামনে পড়ে গেলেই একে অন্যের দিকে তাকায়। এমনও হয়, একটা বালক আর বন্যপ্রাণী নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে চোখে চোখ রেখে। বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা, দুটো ভাবই মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। নতুন করে কোনো সংঘর্ষ ঘটার আগে পর্যন্ত ওই রকমই চলতে থাকে।

বুদ্ধু প্রায়ই মা ও ছেলেকে জঙ্গলে চরতে দেখে। জানতে পারে ওরা কোন ডোবায় স্নান বা জলকেলি করে। কোন মাঠে শুঁড় নেড়ে নেড়ে ধুলো ওড়ায়। ক্রমে এমনও হলো, হাতি দুটো যদি ঘাস বা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য থাকত, তাহলেও সে তার তীক্ষ্ণ চোখ আর বোধ দিয়ে তাদের অবস্থিতি টের পেত। কাদামাখা মাথা দুটো যেমন করেই আড়ালে রাখুক না কেন, বুদ্ধুর নজর এড়াত না কোনো মতেই। প্রাণী দুটোর গায়ের গন্ধটা পর্যন্ত তার জানা। ঘাস-পাতা আর কাদা, সবগুলোর মিলিত একটা গন্ধ। আর এটাও লক্ষ্য করে দেখেছে, প্রতি পদে পদে মা-হাতিটা কেমন করে শিক্ষা দেয়। কি কায়দায় চলতে হয় বাঁশ-বাগানে, কিভাবে মাটি মাখতে হয় গায়ে। আর এড়িয়ে চলতে হয় মানুষকে।

প্রথম প্রথম বুদ্ধুর নজর ছিল ওই মা-হাতিটার দিকে। ওটার বড় বড় কান আর পাঁশুটে রঙ দেখলেই সে চিনতে পারত। কিন্তু কি যে হলো, মা-হাতিটা কিছুদিন পর অদৃশ্য হয়ে গেল। ফলে কালো সনপও চলে গেল চোখের বাইরে। তার অজান্তে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

আসলে এই স্বর্ণ-আহরণকারীরা অর্থাৎ বুদ্ধুরা জাতি হিসেবে একেবারে আদিবাসী। বলতে গেলে যাদের বলা হয় গুহামানব—তাদের বংশধর। জঙ্গলের প্রাণীমাত্রই এদের কাছে শত্রুবিশেষ। সুযোগ পেলেই এরা তাদের নিধন করে। যদিও আইন আছে, হাতি মারা নিষেধ। আর এ জঙ্গলে হাতি আছেও খুব অল্প। তারা থাকেও মানুষের চোখের বাইরে।

যাই হোক, একদিন এক ব্যাপার হলো। ভোর ভোর নিজের কুঁড়ে থেকে বুদ্ধু বেরিয়ে পড়ল কাজে। অর্থাৎ নদীর পাড়ে বালির পাহাড় থেকে সোনার কণা খুঁজে বার করার কাজে। আগের দিন একটা বড় খাদের ধারে অনেক বালি জড়ো করেছিল যার কিছু বাছা আর কিছু না-বাছা। বুদ্ধু সে জায়গায় পৌঁছে দেখল, সব একাকার। বাছা, না-বাছা বালি সব মিশে গিয়ে স্তূপাকার হয়ে পড়ে। কি ব্যাপার! কে এমন করল? চারদিকে নজর করতেই দেখল কালো সনপ। পুরো একটা দিনের পরিশ্রম নষ্ট করে দিয়ে বাবু মাঝনদীতে শুঁড় দুলিয়ে স্নান করছে। রাগে গর্জন করে উঠল বুদ্ধু। কুড়ুলটা হাতেই ছিল। ছুটে গিয়ে দাঁড়াল নদীর তীরে। পরে পরেই কালো সনপকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল অস্ত্রটা।

বেঁচে গেল কিন্তু কালো সনপ। কারণ বুদ্ধুর হুঙ্কার শুনেই সে নদীর ওপর দিয়েই দৌড় শুরু করেছিল জঙ্গলের দিকে। কুড়ুলটা গিয়ে পড়ল তার পেছনের পায়ে। একটা আঙুল শুধু আলাদা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কালো সনপ। তারপরই পিছু ফিরে বীর-বিক্রমে তাড়া করল বুদ্ধুকে। বুদ্ধু তখন এমনি রাগে জ্ঞানশূন্য যে, পিট্টান না দিয়ে সোজা ছুটে গেল কালো সনপের দিকে।

কিছু পরেই দেখা গেল একজন শুঁড় দিয়ে, আর একজন তার হাত দিয়ে ধরে সবেগে টানাটানি করছে। আগুনঝরা চোখে দুজনেই তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র! তারপরই শুঁড়ের এক ঝটকায় দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল বুদ্ধু। একটা কাঁটাঝোপের ওপর। তারপর গড়াতে গড়াতে একবারে নদীর ধারে। ভাগ্যিস কাদা ছিল তাই। নাহলে আঘাতটা বেশ জবরদস্ত হতো।

বিজয়গর্বে কালো সনপ গিয়ে অদৃশ্য হলো জঙ্গলের মধ্যে।

অনেক পরে উঠে দাঁড়াল বুদ্ধু। এগিয়ে গিয়ে কিছু আগে ছোঁড়া কুড়ুলটা তুলে নিল মাটি থেকে। দেখল, সেটা রক্তে লাল। বালিতে ঘষে কুড়ুলটা পরিষ্কার করতে করতে অনুমান করার চেষ্টা করল সে কতটা আঘাত করতে পেরেছে কালো সনপকে।

ভাল করে বর্ষা নামার আগেই বালি থেকে সোনা বাছার কাজটা শেষ করা দরকার। আর সেই কারণে বাবা-মা, কাকা-খুড়ো, ভাই-বোন সবাই মিলে কাজে হাত লাগিয়েছিল। অযুত পরিশ্রমে বালি জড়ো করেছিল তারা। খাড়া করেছিল আলাদা আলাদা স্তূপ! এখন সব একাকার।

যদিও সোনা সংগ্রহ করাই এদের জীবিকা, তবু এরা খুবই দীনদরিদ্র। হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে, সারাদিনে যেটুকু সোনা পায়, তা খুবই নগণ্য। প্রতিদিন রাশি রাশি বালি জলে ধোয়াধুয়ি করে। মাঝে মাঝে একটা-আধটা কণা রোদের

কালো সনপকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল অস্ত্রটা।

আলোয় চকমকিয়ে ওঠে। তুলে নিয়ে একত্র রাখে এক পাত্রে।

আর এই কারণেই, এখানকার মানুষ নদীটায় নাম দিয়েছে টাকার নদী। হিমালয়ের ঠিক কোন জায়গা থেকে এর জলধারা নেমে আসে, তা কেউ জানে না। তবে জানে, ওই জলধারাই তাদের আহার যোগায়। ওই বালিরাশি কতকটা পাউডারের মতো মিহি। কোন আবহমান কাল থেকে এ নদীর এমনি ধারা। বুদ্ধুর মতন তার পূর্বপুরুষরা সেই প্রাচীন কাল থেকেই এই জীবিকার ওপর নির্ভর করে জীবন কাটিয়ে এসেছে। বর্ষা শরৎ আর শীত চলে যাবার পর আসে গ্রীষ্ম। সেই সঙ্গে বুদ্ধুরাও দল বেঁধে চলে আসে এই অঞ্চলে বালি ধোওয়ার কাজ করতে। সারা গরমের কালটা ওইভাবেই কাটে। পরে আকাশ কালো করে যখন বর্ষা আসে, আসে ম্যালেরিয়া, তখন জায়গাটা হয়ে পড়ে বসবাসের অযোগ্য। শুরু হয় একটানা ধারাবর্ষণ। এলোমেলো বাতাস দামাল হয় গাছগাছালির শাখায়। জঙ্গলের হয় বাড়বাড়ন্ত। নদীর ধারা বেয়ে নতুন বালির বহর এসে ঢেকে ফেলে অঞ্চলটা।

বিশেষ করে জমে হাতিদহ নামের ওই বৃহৎ দহটায়। ওটা যেমন লম্বা-চওড়া তেমনি গভীর। ওপরটায় শান্ত শীতল জল, আর নিচে অপার বালুরাশি। বলতে গেলে ওই দহটাই হলো আসল সোনার খনি। যদিও এর গভীরে পাওয়া যায় প্রচুর হাতির হাড়। ওই হাড় জমা হয়ে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। এর কারণটাও খুব অদ্ভুত। যে কোনো কারণেই হোক, বয়স্ক, বৃদ্ধ কিংবা রোগগ্রস্ত হাতিরা সেই প্রচীন কাল থেকেই দেহত্যাগের জন্যে এই দহটাই বেছে নিয়েছে। তারা মৃত্যুকে স্বইচ্ছায় বরণ করবার জন্যেই এই দহে এসে পা রাখে। তাদের ভারী দেহের ভার অনিবার্যভাবেই বালি ধরে রাখতে পারে না। একটু একটু করে অতিকায় বড়সড় দেহটা তলিয়ে যায় জলের অতলে। মৃত্যু হয়। পরবর্তী বর্ষায় তাদের দেহের আর চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও। মনে হয় কালো সনপের মা ওই দহে নেমে নিজেকে শেষ করেছে। আবার ভিন্ন মতও চালু আছে ওখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে। কেউ কেউ বলে, ওই দহের গভীরে আছে চোরাবালি। তাই যে কেউ ওখানে নামলেই তলিয়ে যায় একটু একটু করে।

রাগে গুম হয়ে বসেছিল বুদ্ধু। পরে তার লোকজন এসে পড়ল একসময়। গজগজ করতে করতে বলল, ‘দেখছ শয়তানটার কাণ্ড! সব বরবাদ করে দিয়ে গেছে। হতভাগাটা জন্মাবার আগে ওর মা যদি মরত, তাহলে আর আমাদের এমন নাকালে পড়তে হতো না।’

সকলেই বিরূপ কালো সনপের ওপর। মুণ্ডুপাত করতে করতে কাজে হাত দিল। বুদ্ধুর কাজ হলো সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সারাদিন কোদাল চালানো। আর একদলের কাজ, কাঁকর বেছে সেই বালি চালুনিতে ছাঁকা। মহিলাদের কাজ হলো, দহ থেকে কলসী কলসী জল এনে ভাল করে বালি ধোওয়া। তারপর চকচকে কোনো কিছু চোখে পড়লেই তুলে নেওয়া। সেগুলো রাখা হয় আলাদা একটা পাত্রে। যদিও সবাই জানে, জড়োকরা সব কণাগুলোই সোনা নয়। পরে সেগুলো আবার ঝাড়াই-মোছাই হবে। তারপর সামান্য যা কিছু পড়ে থাকবে, সেগুলোকে চুম্বক দিয়ে পরীক্ষা করে রাখা হবে আর একটা পাত্রে। এত কাণ্ড করার পর পরনের ধুতির ভেতর থেকে একটা পাতার তৈরি গেঁজে বার করে তার মধ্যে রাখে। বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে।

বুদ্ধুর বাবা কাজ করে, আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে। নদীর দিকে। বলে, ‘আর বেশিদিন নয়। বর্ষা এল বলে। ওপরের পাহাড়ে এরই মধ্যে বৃষ্টি নেমেছে দেখছি!’

কথাটা কানে গেল বুদ্ধুর। আকাশ-মুখো হয়ে হাতিদহর পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল। মাঝে মাঝে বালির দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করল, আর কত বালি বাকি! বর্ষা তুমুল হবার আগে

কাজ শেষ করতে পারবে কিনা!

বুদ্ধুর বাবা পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, 'সাবধানে পা ফেলবি।'

মাথা নাড়ল বুদ্ধু, 'হ্যাঁ, জানি। দেখেই হাঁটছি।'

বুদ্ধু দেখল, হাতিদহ সত্যিই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পাহাড়-ধোয়া বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে, নিচের দিককার বালি আলগা হয়ে পড়েছে। সেই মস্তান কালো সনপের পায়ের ছাপ সে দেখতে পেল। ওটা যে তারই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ হাতিটার পায়ের একটা আঙুল নেই। সে দহর পাড় দিয়ে একবার গেছে আবার ফিরে এসেছে। আর ওই ছাপ চব্বিশ ঘণ্টার বেশি নয় বলেই তার মনে হলো। কালো সনপের পায়ের ছাপের ওপর সে পা রেখে দাঁড়াল। দেখল, বালি সরছে। বুঝল, গতকাল যে বালি একটা হাতির দেহের ভার বহন করেছে, এখন সে একটা মানুষের ভার সইতে পারছে না।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখল, বালির ওপর আর কারোরই পায়ের চিহ্ন নেই। নিচের থেকে জল উঠে পাতলা আস্তরণের মতো জমে আছে ওপরে। আর তার নিচে সোনার বরণ বালুরাশি চকচক করছে রোদ্দুর পড়ে।

পিছু ফিরল বুদ্ধু। না, এবারের মতো কাজ শেষ।

ওদের আদি বাস এখানে নয়। এখান থেকে অনেক দূরের কোনো এক গাঁয়ে। যেখানে বাঁশ, ঘাস আর নানা গাছের জঙ্গল। অতএব ছাউনি তুলে তারা ফিরে যায় তাদের আপন গাঁয়ে। ইতিমধ্যে হাতি আর বৃষ্টি, দুয়ের দামালপনায় এই অস্থায়ী কুঁড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকদিন পরে ওদের বসবাসের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। জঙ্গলের আক্রমণে জায়গাটা আবার জঙ্গলের অধিকারে চলে যায়।

বর্ষা শেষ হলে আবার ওরা ফিরে আসে। আবার নতুন করে কুঁড়ে বাঁধে। এতদিনকার অনুপস্থিতির ফলে নতুন বালি স্তূপাকার হয়ে জমে থাকে। ওরা কাজ শুরু করে। হিমালয়ের প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ওদের কাজ বন্ধ হয় না। অথচ শীতবস্ত্র বলতে কিছুই নেই। পরনে শুধু একটা ধুতি আর মাথায় পাগড়ি।

আবার মানুষের হাতের কোদাল পড়ার ঝুপঝাপ আওয়াজে মুখরিত হয় নদীতীর। হাতিদহর দুই তীরে কর্মচঞ্চল মানুষ। দহের মাঝ বরাবর চঞ্চল ভোঁদড়দের খুনসুটি। নতুন তৈরি কুঁড়েগুলো থেকে গলগল করে বেরোতে থাকে ধোঁয়া। শোনা যায় হাতা-বেড়ির আওয়াজ।

বেশ কয়েক বছর পরের কথা বলছি। বুদ্ধু এখন আর ছোট ছেলেটি নেই। বড় হয়েছে। বিয়েশাদী করেছে। এমনকি একটা ছেলেও হয়েছে। যেহেতু গত বছরের শীতে তার বাবা দেহ রেখেছে, তাই সে-ই এখন দলের মাতব্বর। কাজকর্মের সব সাজ-সরঞ্জাম এখন তারই তাঁবে। সে-ই হুকুম করে সকলকে।

ওদিকে কালো সনপেরও পদমর্যাদা বেড়েছে। বলতে গেলে সে-ও এখন তার দলের দলপতি। ছোট-বড় নানা বয়েসের বারোটা হাতি তার দলে। কখনো-সখনো সে তার দলবল নিয়ে দেখা দেয়। স্নান করতে নামে হাতিদহের জলে। কোনো কোনোদিন বুদ্ধুর তৈরি আখক্ষেতের ওপর হামলা চালায়। পেট ভরে না অথচ নষ্ট করে যায়।

খবর পেয়েই ছোটে বুদ্ধু। দেখে, আখের ক্ষেত একেবারে বরবাদ। ভাবে, এ বছর আর গুড় পাওয়া যাবে না। নগদ দাম দিয়ে কিনতে হবে বাজার থেকে।

হতভাগা দত্যিটাকে যেভাবেই হোক শায়েস্তা করা দরকার। কিন্তু কিভাবে? ভাবে বুদ্ধু। একবার ভাবে বন-দপ্তরে খবর দেবে। বলবে, 'তোমরা এর বিহিত করো। গুলি করে মারো কালো সনপকে।' কিন্তু তা-ও সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র মানুষ হননকারী পশু ছাড়া, আইনত প্রাণীহত্যা নিষেধ। তার ঠাকুর্দার বাবার আমলে, বন্য হাতির দল একবার দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল। বাবার মুখে শুনেছে, সেই তখন একবার হাতিদের গুলি করে মারা হয়েছিল। আজকের দিনে ওভাবে আর কালো সনপকে প্রাণে মারা সম্ভব নয়। ব্যবস্থা যা করবার, সব তাকেই করতে হবে।

তক্কে তক্কে থাকতে থাকতে, একদিন কালো সনপের সঙ্গে বুদ্ধুর দেখা হয়ে গেল। প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় কালো সনপ তখন একেবারে ক্ষেপে গেছে। এই সময় ভাল-মন্দ কোনো কিছুর হুঁশ থাকে না তাদের। কৌতূহল মাথা চাড়া দিল বুদ্ধুর। পায়ে পায়ে কিছুটা এগিয়ে গেল, ব্যাপার বোঝার জন্যে।

চোখে কিছুই পড়ল না। শুধু কানে এল ছোট ছোট গাছ ভাঙার কড়কড় মড়মড় আওয়াজ। ডালপালা সমেত বাঁশ ঠেলে নিয়ে যাওয়ার শব্দ। এতেই সে বুঝে নিল, হাতিটা ওই বাঁশ-জঙ্গলের মধ্যেই আছে। বাবুরা যেমন ফেলে ছড়িয়ে ভক্ষণ পর্ব সারে, গাছের ডাল ভেঙে বোধহয় সেই কর্মই করছে। যেহেতু কালো সনপের ব্যাপারে তার কৌতূহল খুব বেশি, তাই কিছুটা এগিয়ে গেল। খুব সাবধানে।

তারপরই সে দেখতে পেল হাতিটাকে। কিছুদূরে দলছাড়া হয়ে একেবারে একা দাঁড়িয়ে। গাছের ডাল ভেঙে খাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই যাতে পালিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বুদ্ধু।

কিছু না হোক দশ ফুট উঁচু, গায়ের রঙ একেবারে কালো কষ্টিপাথরের মতো। সূর্যের আলোয় দুধসাদা দাঁত দুটো চকচক করছে। মুখ থেকে রসাল কি যেন বেরিয়ে লেগে রয়েছে কান আর মাঝের অংশটিতে। ওগুলো আর কিছুই নয়, গাছ-পাতার রস। হাবভাবে স্পষ্ট রাগত ভাব!

আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল বুদ্ধু। এবার দুজনের মাঝে একটা নুয়ে পড়া আধভাঙা ডাল। বুদ্ধু দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো, শয়তানটার এত কাছাকাছি হওয়া উচিত

নয়। ভেবে যেই পিছু ফিরতে যাবে, ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে উল্টো বাতাস বইতে শুরু করল। আর তার গায়ের গন্ধ পৌঁছে গেল কালো সনপের ঘ্রাণে!

আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ আরো চড়ে গেল কালো সনপের। শুঁড় উঁচিয়ে তারস্বরে গর্জন করে উঠল সে। কুলোর মতো কান দুটো চেপে এঁটে রইল ঘাড়ের দুপাশে। একটা পা দিয়ে মাটিতে এমন দাপাতে লাগল যে, দেখে বুদ্ধুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থা। পরিত্রাহি দৌড় শুরু করল। হলে হবে কি, জঙ্গলের মধ্যে আর কতদূর ছোটা যায়! কোনো গাছের ওপর উঠে না বসতে পারলে আর রক্ষে নেই। অতএব সামনে যে বড়সড় গাছটা পড়ল, সেটাতেই উঠতে শুরু করল সে।

বুদ্ধু গাছে উঠতে পারে ঠিকই, কিন্তু খুব দ্রুত নয়। মত্ত হাতিও দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো গাছের গোড়ায়। শুঁড় তুলতেই নাগাল পেয়ে গেল বুদ্ধুর পরনের ধুতিটার। হ্যাঁচকা টান টানবার আগেই বুদ্ধু কাপড়টা ছিঁড়ে দিল চটজলদি। কায়দা করা গেল না দেখে, কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল কালো সনপ। তারপর হেঁড়ে মাথাটা দিয়ে পরের পর গোঁত্তা মারতে লাগল গাছটার গুঁড়িতে। সে এমনি ধাক্কা যে বুদ্ধুর মনে হলো, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে সে জড়িয়ে রইল গাছের কাণ্ডটাকে। মনে মনে ভাবল, এখনি তার শেষ। আর বুঝি বাঁচা নেই।

কিন্তু অততেও কিছু করা গেল না দেখে, নিরস্ত হলো কালো সনপ। গাছতলা থেকে সরে গেল। সারাদিন সেখানে সে শুঁড় উঁচিয়ে অনড় হয়ে বসে রইল বুদ্ধুর নেমে আসার অপেক্ষায়। একেবারে বিকেল পর্যন্ত। সন্ধ্যে নামতে বাবু বাধ্য হয়ে সরে গেল। বুদ্ধু নেমে এল গাছ থেকে, মাথার পাগড়িটাকেই কাপড়ের মতো পরে। সোজা গিয়ে হাজির হলো বন-দপ্তরের পাহারাদারের কাছে।

সব ঘটনা বিবৃত করার পর বললে, 'শয়তানটাকে গুলি করে মারা উচিত।'

মাথা নাড়ল পাহারাদার। জবাব দিল, 'না। হাতিকে তো মারা যাবে না। ও হলো সরকারের সংরক্ষিত প্রাণী। সেই আঠারোশো সত্তর সাল থেকে।'

'কিন্তু ওটা যে মারাত্মক ক্ষ্যাপা হয়ে গেছে। কখন কাকে মেরে বসে, তার ঠিক কি?'

তবুও মাথা নাড়ল পাহারাদার, 'না। যদিও ক্ষ্যাপা হাতি মারা হয় না এমন নয়। বনে এমন হাতি এখনো চরে বেড়ায়, যাদের গায়ে গুলির দাগ আছে।'

অতএব কালো সনপের ক্ষেত্রে এই আর্জি কোনো কাজে এল না। বন-দপ্তর কালো সনপকে বেশ ভালভাবে চিনত। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধু যদি কিছু ঘুষঘাষ তার হাতে তুলে দিত, তাহলে নিশ্চয় ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। কিন্তু বুদ্ধুর সে ক্ষমতা কোথায়?

অবশ্য ওই ঘটনার পর কালো সনপের মত্ত ভাবটা কেটে গেল। ঠাণ্ডা হলো মাথা। দেখা গেল, বাবুর শরীর আর আগের মতো কাদা-মাটি লাগা নোংরা নয়। শুঁড়-কান-নাক সবই বেশ ঝকঝকে তকতকে। মোট কথা, সে স্বাভাবিক হলো। দুজনেই বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ হঠাৎ দেখাও হয়ে যায় সামনাসামনি। একে অন্যের দিকে তাকায়। দুজনের চোখেই সমীহ। কিছু না বলে, দুজনেই সরে যায় দুদিকে।

এরপর আরো একটা বছর চলে গেল। হিমালয়ের মাথার ওপর আবার জলভরা মেঘ ভিড় করে এল, গিরিশৃঙ্গের মাথায় তাদের জলভাণ্ড উজাড় করে দিতে। মাঝে-সাঝে প্রচণ্ড বারিপাত হয় সমস্ত উত্তরপ্রদেশ আর তরাই অঞ্চল জুড়ে। অন্য সমস্ত নদীর মতো টাকার নদীতেও বন্যা নামে। বুদ্ধু এখন তাদের দলের দলপতি। দলের অতগুলি মানুষের দেখাশোনার ভার তার ওপর। অতএব নদীর তীর ধরে আরও নিম্নাঞ্চলে নেমে আসে স্বর্ণ-কণার সন্ধানে। চলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের টিঁকে থাকার যুদ্ধ। যখন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন চিন্তা করে নিজের গাঁয়ে ঘরে ফিরে যাবার।

নাঃ, এবার পাততাড়ি গুটোতে হবে এখান থেকে। মনে মনে ভাবে বুদ্ধু। বালি বসতে শুরু করেছে। হাতিদহের জল পাক খাচ্ছে ওপর-নিচ। পরিস্থিতি যে বিপজ্জনক, বালিই তা বলে দিচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে সে পিছু ফিরে হাঁটতে শুরু করল। নদীর ধার ধরে কিছুটা যাবার পরেই, একটা অদ্ভুত আওয়াজ তার কানে এল। কি ব্যাপার! থমকে দাঁড়াল বুদ্ধু। তারপর আওয়াজ লক্ষ্য করে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই দেখল, কালো সনপ। বাবু সেই টাকার নদীর ধারে, বালির ওপর দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করে চলেছে। বুদ্ধু দেখল, তার ভারী কালো পায়ের চাপে বালি সরছে। সে কিছুতেই আর পা তুলতে পারছে না। বুদ্ধু বুঝল, চোরাবালি তাকে গ্রাস করতে চলেছে। একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত বালির নিচে অদৃশ্য। আর কিছু পরেই বালি পেটে গিয়ে ঠেকবে।

এখন, এখন কি হবে? রেঞ্জার বা বন-দপ্তরের পাহারাদাররা এখন কি করবেন? কি করবেন দিল্লীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতিনির্ধারকরা? একটা হাতি বেঘোরে মরতে বসেছে। কিছু পরে তার আর চিহ্ন থাকবে না। তারও কয়েক মাস পরে তার হাড়গুলো গিয়ে মিশবে পূর্বপুরুষদের হাড়ের সঙ্গে হাতিদহের গহন অতলে।

সোনালি বালির ওপর আটকে পড়া পশুর আর্তনাদে বাতাস উদ্বেল। উদ্ধার পাবার জন্যে লড়াই করছে কিন্তু কোনো চেষ্টাই কাজে আসছে না। শুধু আর্তনাদ আর দীর্ঘশ্বাস!

বুদ্ধু একভাবে তাকিয়েছিল। দেখছিল। হঠাৎ মনে হলো, এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাটা তার উচিত হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। খুব দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটে গেল মনের মধ্যে। সে এ দুর্বলতার কথা কখনো কারো কাছে প্রকাশ

করেনি কোনোদিন। পাছে তারা হাসে, পাগল ভাবে। নিজের হাতের কুড়ুলটা নিয়ে ছুটে ঢুকে পড়ল হাত কয়েক দূরের জঙ্গলটার ভেতর। বর্ষার ধারায় স্নান করা নধরকান্তি একটা গাছ সামনে পড়ল। বলতে গেলে এক কোপে সেটাকে ধরাশায়ী করল সে। খাদি খাদি করে সেটাকে টুকরো-টুকরো করল।

তারপর সেগুলোকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল কালো সনপের পায়ের গোড়ায়। কিন্তু ওই কটা খাদিতে কিছুই সুবিধে হলো না। আবার ছুটল, আরো গাছ কাটল। যদিও সে জানে, এসব গাছে হাত দেওয়া অপরাধ! বন-দপ্তর জানতে পারলে তাকে দণ্ড দেবে। তবু সে তখন মরিয়া। গাছ কাটে, আর খাদি খাদি করে বয়ে আনে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে কালো সনপের পায়ের কাছে।

অনেক পরে, অনেক চেষ্টার পর, কালো সনপ সামনের একটা পা তুলতে পারল। কোনোরকমে রাখতে পারল একটা মোটা কাঠের খাদির ওপর। আনন্দে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল বুদ্ধুর। আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। কালো সনপকে উৎসাহ দিতে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কোশিস করো, আউর থোড়া জোরসে কোশিস করো।'

ওর চিৎকারে কাজ হলো। প্রচণ্ড জোরে চেষ্টা করে আর একটা পা-ও বার করে আনল বালির বাইরে। টলোমলো অবস্থায় রাখল অন্য একটা কাঠের ওপর।

বুদ্ধুর মনে হলো, কালো সনপ প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। লড়াই করছে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে। দেহের সমস্ত শক্তি সে প্রয়োগ করল পেছনের পা দুটোকে তুলে আনার জন্যে।

পায়ের চাপে কাঠে কাঠে ঘষা লেগে রীতিমতো আওয়াজ উঠল। একসময় পেছনের পা দুটোও কালো সনপ তুলে রাখতে পারল কাঠের ওপর। তারপর অতি ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হাতিদহর পাড়ের নিরাপদ শক্ত জমিতে গিয়ে পৌঁছল। আর ঠিক তার পরে পরেই, সারা দেহটা থর-থর করে কাঁপতে থাকল। এত কাঁপুনি যে, সে আর দাঁড়াতে পারল না। বেসামাল হয়ে সেখানেই বসে পড়ল।

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধু। কুড়ুল হাতে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কালো সনপের দিকে। গাছ কাটতে গিয়ে তার নিজের হাতও যে কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, সেটুকু পর্যন্ত তার খেয়াল ছিল না।

অনেক পরে কালো সনপ কিছুটা সামলে গেল। কোনোরকমে শুঁড় তুলে বাড়িয়ে দিল বুদ্ধুর দিকে। কে জানে, তখন তার বন্য মগজে কোন ভাবের উদয় হয়েছিল!

তারপর সেই গজপ্রধান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শ্লথগতিতে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল বুদ্ধু। এবার সে তাকাল তার কুড়ুল আর নিজের রক্তলাল হাত দুটোর দিকে।

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে)

ছবি: রাহুল মজুমদার

The New Edition of A. T. Dev's

STUDENT'S FAVOURITE DICTIONARY

(Eng. To Beng. & Eng.)

- The foremost dictionary of Current English to Bengali : thoroughly revised, illustrated and expanded.
- New demy size.
- Over 40,000 entries in this edition.
- Up-to-date coverage of new words.
- Encyclopaedic appendices covering language and literature, mythological characters, biographies, quotations, world gazetteer, Greek and Russian alphabet, weights and measures, mathematical formulas, abbreviations.

Dev Sahitya Kutir (P) Ltd., 21, Jhamapukur Lane, Calcutta - 700 009

তুষার কফিনে

রাহুল মজুমদার

পাহাড়ী ঝরনাটার কাছে এসে থমকে গেল মরিস। শেষবেলায় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে ঝরনাটা। ভীমবেগে হিমশীতল জলরাশি পড়ে থাকা পাথরগুলোকে ধাক্কা মারতে মারতে ছুটে চলেছে নিচের দিকে। একা এই ঝরনা পেরোবার চেষ্টা বেশ বিপজ্জনক। আসার সময় সঙ্গে তিনজন সঙ্গী ছিল, তখনই বেশ বেগ দিয়েছিল ঝরনাটা। তার ওপর প্রায় সারাদিন অভুক্ত, খাড়া চড়াই চড়ে হতক্লান্ত। অথচ পেরোতেই হবে ; যে করে হোক আজই পৌঁছতে হবে তুষার হ্রদের পারের শিবিরে। সঙ্গে তাঁবু নেই, পেটে দানা নেই, রসদ বলতে একটুকরো চকোলেট। ঝরনা পেরোবার সম্ভাব্য পথ খুঁজতে লাগল মরিস দৃষ্টি চালিয়ে।

এ পর্যন্ত ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই জোটেনি। ফ্রান্স থেকে বেরোবার সময় ওদের উদ্দেশ্য ছিল অজিত ধৌলাগিরির মাথায় চড়া। অত উঁচু পর্বতশৃঙ্গে এই ১৯৫০ পর্যন্ত কেউই উঠতে পারেনি। ওদের বহু পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত বিফলেই গেছে। সদর্পে ওদের ফিরিয়ে দিয়েছে উদ্ধত ধৌলাগিরি। বিদ্রূপের হাসি হেসেছেন ভাগ্যদেবী। তাঁর মূল অস্ত্র ছিল ধৌলাগিরির নির্মম দুর্লঙ্ঘ্যতা আর সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ম্যাপ। এমন ভুলে ভরা ম্যাপ কখনো দেখেনি মরিসরা। ঐ ম্যাপ ভরসা করে কতবার যে ওরা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! যেখানে গিরিশিরা থাকার কথা, সেখানে উপত্যকা অথবা হিমবাহ, যেখানে হিমবাহ থাকার কথা সেখানে গিরিপ্রাচীর! ধৌলাগিরির উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরার খোঁজে গিয়ে ওরা তো এক অপূর্ব উপত্যকাই আবিষ্কার করে বসল (আজ যা 'হিড্‌ন্ ভ্যালি' নামে খ্যাত)!

ধৌলাগিরি ফিরিয়ে দিলেও ওরা ঠিক করল ৮০০ মিটার উঁচু কোনো শৃঙ্গে আরোহণের প্রথম কৃতিত্বের দাবিদার না হয়ে ওরা ফিরবে না কিছুতেই। কাছাকাছি ওইরকম শৃঙ্গ বলতে অন্নপূর্ণা (অন্নপূর্ণা-১)। শুরু হলো 'অভিযান-অন্নপূর্ণা'। কিন্তু এখানেও ঠোক্কর খেতে হলো ঐ ম্যাপে। কিছুই প্রায় মিলছে না! বেশ কয়েকদিন পশ্চিম দিক থেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ওরা ঠিক করল 'তিলিচো-লা' (লা = গিরিপথ) পার হয়ে পূর্বদিকে মানাংভোট অঞ্চলে গিয়ে অন্নপূর্ণার

অবস্থান খুঁজে বার করতে হবে; ম্যাপের ওপর আর ভরসা করা যাচ্ছে না। দলের একটা অংশ বেসক্যাম্প করে রয়ে গেল টুকুচেতে, বাকিরা দলনেতা মরিসের নেতৃত্বে এগিয়ে গেল তিলিচো-লা-এর দিকে। ন্যাড়া পাহাড়ের আলগা পাথরের রাজত্ব অতিক্রম করা যে কতোটা পরিশ্রমসাধ্য সেটা ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেল; তার সঙ্গে কুখ্যাত হাওয়ার দাপট—উড়িয়ে নিয়ে ফেলতে চায়। ১৬০০০ ফিট অতিক্রম করার পর এর সঙ্গে জুটল তুষার। সমস্ত বাধা পেরিয়ে ওরা একসময় অতিক্রম করল গিরিপ্রাচীর আর ওদের সমস্ত আশা এক ফুঁয়ে প্রায় নিভে গেল। কোথায় মানাংভোট উপত্যকা! এ তো সুবিশাল এক তুষার হ্রদ! এত বড় একটা হ্রদের কোনো হদিসই নেই ম্যাপে! সেই বিশাল হ্রদের ধারে নেমে এলো ওরা (বর্তমানে এর নাম তিলিচো তাল)। কোথায় মানাংভোট? ওই গিরিপ্রচীরের ওপারে?...ঠিক হলো মরিসের নেতৃত্বে চারজন যাবে মানাংভোটের খোঁজে, বাকিরা এখানে থেকে অন্নপূর্ণার খোঁজ চালাবে।

উল্টোদিকের গিরিপ্রাচীরের মাথায় যে গিরিপথের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তুষারপাতের মধ্যে সেখানে পৌঁছে ওরা এবার সত্যিই মানাংভোট উপত্যকার দেখা পেলো। অসম্ভব খাড়া পাহাড় ঢেউ খেলতে খেলতে নেমে গেছে দূরের উপত্যকার দিকে। হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি সময় খরচ করে ওরা পা রাখল মানাংভোট জেলার খাঙসারে। ভিড় জমে গেল ওদের দেখতে—এই প্রথম কোনো সাদা চামড়ার মানুষ দেখল এখানকার লোক। সবই হলো, শুধু অন্নপূর্ণার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। জেলা সদর মানাংয়ে গিয়েও একই অবস্থা। থোরাং-লা পেরিয়ে মুক্তিনাথ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর খবর এরা রাখে না। অন্নপূর্ণা শৃঙ্গের নাম এদের কয়েকজন শুনেছে বটে, কিন্তু সে যে কোথায় সে সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্র ধারণা বা কৌতূহল কিছুই নেই। এই ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ দিল আরেক বিপদ—গোটা এলাকায় বিক্রি করা বা দান করার মতো বাড়তি রসদ নেই। যেটুকু ৎসাম্পা (একধরনের যবের ছাতু) জুটল, তাতে একবেলা চলাই মুশকিল। তাই পরদিন ভোর ভোর ফু থার্কেকে থোরাং-লার পথে রওনা করে দিয়ে ওরা শেষ চেষ্টা চালাল। সারাদিনের অনুসন্ধানে ওরা স্থির নিশ্চিত হলো যে অন্নপূর্ণা, আর যাই হোক, এই এলাকায় নয়।

ভোরে তাই দু'মুঠো ৎসাম্পা তিনজনে ভাগ করে খাওয়ার পর মরিস বাকি দুজনকে থোরাং-লার অপেক্ষাকৃত সহজ পথে রওনা করে দিয়ে নিজে একটুকরো চকোলেট সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছিল তিলিচো তালের শিবিরের উদ্দেশে। অনেকটা পথ—তার মধ্যে উঠে যেতে হবে ৯০০০ ফিট থেকে ১৬০০০ ফিট ছাড়িয়ে, তাও এই বীভৎস ন্যাড়া পাহাড়ের খাড়া রুক্ষ গা বেয়ে। তাই যথাসম্ভব দ্রুতই পা চালিয়েছিল—দম ফুরিয়ে গেল ১৪০০০ ফিটে এসে। শেষ বসতি থাঙসার পড়ে রয়েছে অনেক নিচে। পেটের মধ্যে ক্ষিধেয় মোচড় মারছে, শরীরের সমস্ত শক্তি ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেছে। ক্লান্ত, শ্রান্ত মরিস শরীরটাকে টানতে টানতে আরো শ' পাঁচেক ফুট তুলে এনে থমকে দাঁড়িয়েছে খরস্রোতা ঝরনাটার সামনে। লাফিয়ে পেরোবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই জুতো খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো তারপর পা রাখল হিমশীতল জলে। ঠাণ্ডায় পা যেন কেটে নিতে চাইছে, স্রোত প্রতিমুহূর্তেই ফেলে দিতে চাইছে ওকে, অসম্ভব সতর্কতায়, অমানুষিক পরিশ্রমে ওপারের দিকে এগিয়ে চলল মরিস।

কিন্তু শেষরক্ষা হলো না—পা ফস্কাল। মৃত্যুভয়ে মরীয়া হয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে যখন ওপারে গিয়ে উঠল, সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপে। ভেজা জামা-জুতো যথাসম্ভব নিঙড়ে নিয়ে পরলেও হাড়সুদ্ধু কেঁপে যেতে লাগল ঠাণ্ডায়। তার ওপর সেই সময়ই নিচের থেকে তেড়ে এলো সেই কুখ্যাত হাওয়ার ঝাপ্টা। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মরিস দেখল, মুহূর্তে ধুলোর ঝড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল চারদিক। চমৎকার অবস্থা! পেটে দানা নেই, সর্বাঙ্গ ভিজে, সাড়ে চোদ্দ হাজার ফিটের ওপর সম্পূর্ণ আন্দাজে উঠতে হবে। হিসেব মতো শিবির এখনো ঘণ্টা চার-পাঁচের পথ, অথচ দিনের আলো মেরেকেটে ঘণ্টাখানেক থাকবে। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের শ্রান্তি, অভুক্তি ওকে অশক্ত করে দিয়েছে—পা টলে যাচ্ছে, চোখ খোলা রাখা মুশকিল হচ্ছে, মাথা ঘুরছে—বেশ কয়েকবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে স্রেফ মনের জোর আর ভাগ্যের জোরে।

আর এগোনো সম্ভব নয়। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, শরীরও বইছে না। এই উচ্চতায় তাঁবু ছাড়া রাত কাটানো! অন্য সময় হলে এমন অবাস্তব চিন্তা মরিস মনের কোণেও আনার কথা ভাবতে পারত না; কিন্তু এই মুহূর্তে এটাই ভয়ঙ্কর কঠিন বাস্তব। একটুকরো ঘাসের চাপড়া খুঁজে পেয়ে তার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল, জ্যাকেটটা দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে গুটিসুটি হয়ে বসে রইল। পা দুটো ঠাণ্ডায় প্রায় অসাড়, চোখ দুটো বুজে আসছে, অভুক্ত শরীরের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্রোহ করছে—পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকোলেটের টুকরোটা চেপে ধরল—এখনি এটা খেয়ে ফেলে ক্ষিধের আগুনটাকে খানিক চাপা দেবে, না কাল সকালের পাথেয় হিসেবে রেখে দেবে! মনের এই দড়ি টানাটানির খেলায় প্রথম ইচ্ছেটাই জয়ী হলো। কিন্তু তাতে ফল হলো বিপরীত—একটুকরো চকোলেট পেটের আগুনকে দাবানলে পরিণত করল। শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্রণাকে ভুলতে শেষ সিগারেটটা ধরাল মরিস।

রাত নামতেই নিস্তব্ধতা আর ঠাণ্ডা বেড়ে গেল চতুর্গুণ। অভুক্ত, শীতার্ত, অবসন্ন মরিসকে ঠাট্টা করতেই যেন শুরু হলো তুষারপাত। ম্লান হাসি হেসে চোখ বুজল ও। এখন শুধুই অপেক্ষা। মৃত্যু অথবা ভোর, কে আগে আসে তার অপেক্ষা। ভোরই আগে আসবে এই দুরন্ত আশা নিয়ে আধোজাগা অবস্থায় বসে রইল মরিস। পাহাড় কাঁপিয়ে কোথাও ধস নামল। ছুটে পালানো তো দূরের কথা, নড়ে বসার ক্ষমতাও নেই ওর, ইচ্ছেও নেই। তলা থেকে ঠাণ্ডা উঠে ওর সারা শরীরকে অসাড় করে দিচ্ছে, তুষারে

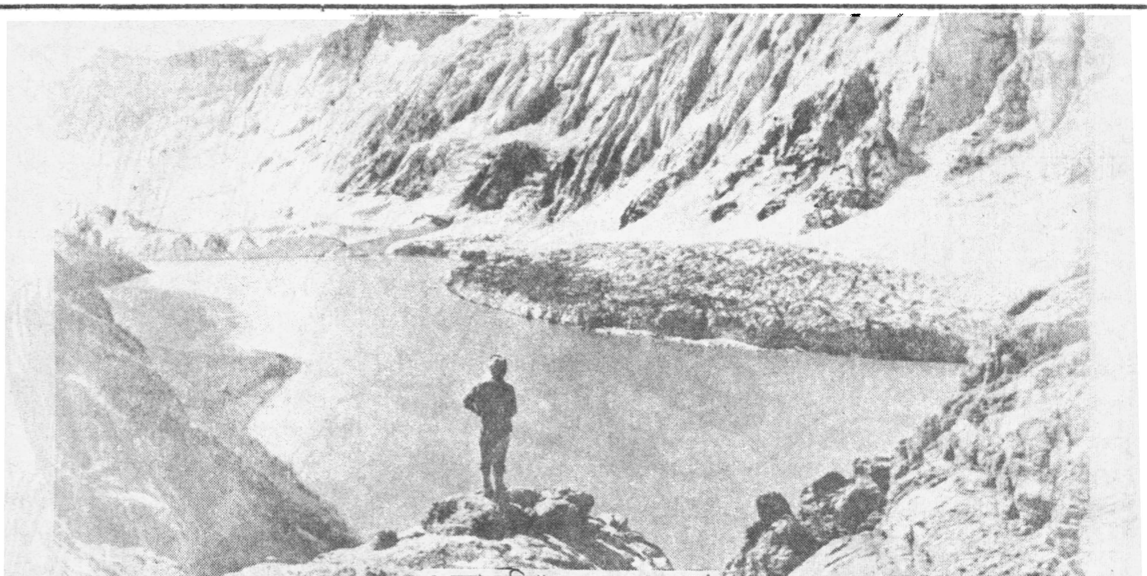

এ তো সুবিশাল এক তুষার হ্রদ!

ঢেকে ফেলেছে চতুর্দিক, গোটা অঞ্চলটা এখন যেন তুষার-মোড়া কফিন। এখন আর প্রকৃতি থেকে মরিসকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তুষার কফিনের অংশ হয়ে মরিস প্রহর গুনতে থাকল। হিমালয় যেন তাদের এই ঔদ্ধত্যের, দুঃসাহসিকতার শাস্তি দিতে উঠে পড়ে লেগেছে আর তার জন্য বেছে নিয়েছে দলনেতা মরিসকেই। সবরকম প্রতিকূলতার অস্ত্র ছুঁড়ে মারছে অসহায় এই দুঃসাহসিক মানুষটার দিকে। সেই প্রতিকূলতার সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল মরিস। কাল সকালেও যদি আবহাওয়ার উন্নতি না ঘটে তাহলে বেঁচে থাকলেও বাকি দেড় হাজার ফিট পেরিয়ে শিবিরে পৌঁছনোর কথা ভাবাই বোকামো।

সর্বশরীর অনুভূতিহীন এক জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তবু একসময় মরিস টের পেল, রাতের মেয়াদ ফুরিয়েছে, দিন আসছে ধীর পায়ে, আবহাওয়ারও খানিক উন্নতি হয়েছে—তুষারপাত বন্ধ হয়েছে।

আলো ফোটার শেষ কয়েকটা মিনিট কাটতে যেন কয়েকটা যুগ কেটে গেল। বিদ্রোহী শরীরকে মনের কড়া ধমকে কোনোমতে দু'পায়ের ওপর খাড়া করল মরিস, পা বাড়াল চড়াই পথে। প্রতি দু' পা অন্তর দাঁড়িয়ে পড়ে দম নিতে হচ্ছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রসদের অভাবে শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে গেছে। শক্তি অবশিষ্ট নেই এতটুকু, পা দুটো কিছুতেই আর কথা শুনতে চাইছে না। দূরে, নিচে মানাংভোটে সূর্যরশ্মি তার উষ্ণতার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এখানে এখনো হিমশীতলতার রাজত্ব। নিস্তব্ধতা যেন সেই শীতলতাকে আরো নির্মম করে তুলেছে। মৃত্যু প্রতি পদে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার হাত এড়াতে হলে যে করেই হোক শিবিরে পৌঁছতেই হবে। শরীরের যে অংশটুকু খোলা, সবটাই নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়, ঠোঁট আর গালের-নাকের চামড়া ফেটে চৌচির, চোখ দুটো অসম্ভব ভারী। ক্রমশ চলার থেকে বিশ্রামের সময় বাড়তে লাগল। আর কত দূর? আর কতোক্ষণ এভাবে চলতে হবে? কখন মুক্তি পাওয়া যাবে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে? শিবির পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে তো ও? মুখ থুবড়ে পড়ল মরিস। ওঠার শক্তি নেই ওর। হামাগুড়ি দিতে লাগল মৃত্যুকে পরাস্ত করার অদম্য আশায়। ...একসময় হামাগুড়ি দেবার শক্তিও শেষ হয়ে গেল, চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে এলো। মুখ গুঁজড়ে আধা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইল ও।

কতক্ষণ ঐ অবস্থায় ছিল জানে না মরিস, জ্ঞান ফিরতে কোনোমতে মাথা তুলে দেখল, গিরিপ্রাচীরের মাথা আর মাত্র হাত দশেক; তার ওপারেই কোথাও রয়েছে ওর পুনর্জীবনের আধার, ওদের শিবির। অসম্ভব অমানুষিক চেষ্টায় ওই দশ হাত অতিক্রম করল ও, তারপর আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

বোধহয় কয়েক শতাব্দী বাদে চোখ খোলার মতো শক্তি ফিরে পেলো মরিস। আরে! ওই তো শিবির! মাত্র হাত চল্লিশেক দূরে! ওই তো মালবাহকেরা বসে গল্প করছে। আঃ, কেউ এদিকে মাথা তুলে তাকাচ্ছে না কেন? চিৎকার করা বা হাত নাড়ার ক্ষমতা নেই, মাথা দিয়ে কোনোরকমে একটা নুড়ি গড়িয়ে দিলো। হায়, কেউ খেয়ালই করল না!

মুক্তির এত কাছে এসেও কি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে? ধীরে ধীরে মৃত্যু তার শীতল থাবা বসাচ্ছে ওর দেহে। ভাবনাটা ওর মস্তিষ্কে পৌঁছতেই এক মুহূর্তের জন্য ওর শরীরে যেন মত্ত হাতির বল এলো। সম্পূর্ণ শরীরটা টেনে তুলে ও ঝুলিয়ে দিলো ওদিকের ঢালে—ওর শরীরের সঙ্গে গড়িয়ে গেল আরো কিছু ছোট-বড় নুড়ি। পরমুহূর্তেই মাথাটা সীসের মতো ভারী হয়ে গেল, চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ...। জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে ওর কানে এলো ফু থার্কের উত্তেজিত গলা—'আরে, বড়া সাহিব!' একাধিক পায়ের শব্দ দ্রুত উঠে আসছে ওকে লক্ষ্য করে জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে—। পরম নিশ্চিন্তে অজ্ঞান হয়ে গেল মরিস।

ছবি : লেখক

ধলা

মঞ্জিল সেন

পড়ার টেবিল থেকে মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাবুয়া, "দ্যাখ দিদি, কি সুন্দর একটা কুকুরছানা!"

ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে মৌ-ও দেখল। সত্যিই তো একটা নাদুস-নুদুস কুকুরছানা। ধবধবে সাদা। সবে বোধহয় হাঁটতে শিখেছে তাই মায়ের নজর এড়িয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। ওদের গেটটা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

বাবুয়ার বয়স সাত আর মৌয়ের দশ। এই মফস্বল শহরেই ওদের বাড়ি। বাবার মুখে ওরা শুনেছে ওদের বড় ঠাকুর্দা অর্থাৎ ঠাকুর্দার বাবা প্রথমে এখানে এসে জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। তখন বাড়ি ছিল ছোট কিন্তু জমি ছিল অনেকটা। সেই জমিতে যেমন আছে ফুল-ফলের বাগান তেমন অনেক জায়গায় বড় বড় ঘাস আর বুনো গাছ-গাছড়ার জঙ্গলও আছে।

ওদের বাবা কলকাতার একটা আপিসে চাকরি করেন। সকাল সাড়ে আটটার ট্রেন ধরেন আর ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে সেই সাড়ে সাতটা-আটটা হয়ে যায়। তবে এখন শনিবারও ছুটি তাই সপ্তাহে বাবার দু'দিন ছুটি, অথচ ওদের ইস্কুলে ছুটি কিন্তু মাত্র একদিন—রবিবার।

আজ সেই শনিবার। বেলা আটটা বাজে তবু বাবা ঘুম থেকে ওঠেননি। ছুটির দিনে বাবা একটু বেশিই ঘুমোন। অন্যান্য দিন ভোর থেকেই বাবার ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। তার মধ্যে একবার বাজারেও যেতে হয়। মায়েরও দম ফেলার সময় থাকে না। এই শনি আর রবিবার সকাল থেকে মাকেও অতটা ছুটোছুটি করতে হয় না। ওদের দুজনেরই ইস্কুল সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়।

"কি সুন্দর বাচ্চাটা, না?" বাবুয়া আবার বলল।

"হ্যাঁ," মৌ ঘাড় দোলালো, "ধরবি?"

"মা যদি বকে?"

"মাকে বলব না, বাগানের ঘরে লুকিয়ে রাখব।"

"কিন্তু বাচ্চাটা মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? কাঁদবে না?" বাবুয়া যেন একটু চিন্তিত।

"দূর, কুকুরের বাচ্চারা একটু বড় হলেই স্বাবলম্বী হয়ে যায়।"

"স্বাবলম্বী কি?" বাবুয়া আগে কখনও কথাটা শোনেনি।

"মানে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, নিজেই খাবার যোগাড় করে খায়, মায়ের পাশে ঘুরঘুর করে না।" শেষের কথাটা অবিশ্যি ভাইকে ঠেস দিয়ে বলা।

ভাই কিন্তু সেটা গায়ে মাখল না, বলল, "কিন্তু ওর মার কষ্ট হয় না?"

"কিসের কষ্ট!" মৌ অবাক হয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায়।

"এই যে বাচ্চাটা মার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, একা একা ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য ওর মার কষ্ট হয় না?"

"দূর বোকা!" মৌ বলল, "একি মানুষের মা, এ তো কুকুরছানার মা।"

"তাতে কি হয়েছে," বাবুয়া মৃদু প্রতিবাদ না করে পারে না, "কুকুরের ছানা হলেও ওটার মা তো একজন মা।"

"তুই ছোট, ওসব কথা বুঝবি না," মৌ এককথায় ভাইয়ের মন্তব্যকে খারিজ করে দিয়ে বলল, "বাবা শুয়ে আছে, মা রান্নাঘরে, চল্ এইবেলা বাচ্চাটাকে বাগানঘরে রেখে আসি।"

দুই ভাই-বোনে চুপি চুপি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাচ্চাটা ওদের দেখে কিন্তু পালাল না বরং ওদের দিকে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল।

মৌ ডাকল, "আয়, চুক্ চুক্।"

বাচ্চাটা এবার ওর পায়ে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেশ মোটা-সোটা বাচ্চা। মৌ ওকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চাটা আপত্তি করল না। ওরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাগানঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

বাগানঘর মানে বাড়ির পেছন দিকে খড়ের চালার একটা ছোট মেটে ঘর। ওখানে বাগানের কাজে লাগে এমন সব যন্ত্রপাতি—যেমন কোদাল, নিড়ানি, হাঁসুয়া, শাবল এসব থাকে। একজন মালি আছে, সপ্তাহে তিনদিন এসে বাগানের কাজ করে দিয়ে যায়। বাগানটা পেছন দিকেই। আম, জামরুল, কাঁঠাল, আতা, পেঁপে, লেবু এসব ছাড়াও নারকেল গাছই আছে কয়েকটা। তাতে অনেক ডাব হয়। এই সব ফল বিক্রি হয়, ফলের ব্যাপারীরা বাড়ি এসে কিনে নিয়ে যায়। তবে সব বিক্রি হয় না, ওদের খাবার জন্যেও থাকে। তিন জাতের আম গাছ আছে। পেঁপে আর আতা গাছ ফলে ভরে থাকে। একটা গাছের পেয়ারার ভেতরটা লাল, খুব মিষ্টি। ওটা নাকি কাশীর পেয়ারা।

বাগানঘরের দরজাটা দরমার। ওটা খুলে ওরা ভেতরে ঢুকল। এক কোণায় কয়েকটা বস্তা আর হালকা কাঠের বাক্স ছিল। অনেক সময় ওই বাক্সে ফল ভরে, ঢাকনা এঁটে বিক্রি করা হয়। তার থেকে একটা বাক্স নিয়ে এল মৌ, ভাইকে বলল একটা বস্তা আনতে। বাক্সর তলার দিকে বস্তাটা বিছিয়ে বাচ্চাটাকে ওরা ছেড়ে দিল। বাচ্চাটা কোনো আপত্তি করল না, যেন খেলা পেয়েছে।

"এবার ওকে একটু দুধ খাওয়াতে হবে," মৌ বিজ্ঞের মতো বলল, "দুধের বাচ্চা তো।"

"পড়ার টেবিলে আমার দুধের গেলাসটা আছে, নিয়ে আসবো?" বাবুয়া সাগ্রহে বলল। ওর আবার দুধ মোটেই পছন্দ নয়, কিন্তু মা দু'বেলা ওকে দু'গেলাস দুধ গেলাবেই। দিদির বেলায় কিন্তু মা অত জোর করে না। যত অত্যাচার যেন ওর ওপর! বাবুয়া তো আর জানে না ও ছেলে বলেই মার এত পক্ষপাতিত্ব। মেয়েরা যেমন তেমন বাড়লেই হলো—যেন বানের জলে ভেসে এসেছে।

মৌ বলল, "সবটুকু আনিস না, আদ্ধেক আনলেই হবে। এই মাটির ভাঁড়টা নিয়ে যা, এটাতেই ঢেলে আনিস। যা ছুট্টে যা।"

মৌয়ের কথা ফুরুতে না ফুরুতেই বাবুয়া ছুট লাগাল, দু'তিন মিনিট পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। ছেলেমানুষ, দুধ আনতে গিয়ে খানিকটা ফেলেছে।

মৌ ভাঁড়টা নামিয়ে বাচ্চার সামনে রাখল। ওমা! ওটা চুক্ চুক্ করে নিমেষের মধ্যে শেষ করল সবটা দুধ। তারপর মৌয়ের মুখের দিকে প্রত্যাশা-ভরে তাকাল।

"আহা, বড্ড খিধে পেয়েছিল রে," মৌ বলল, "আরেকটু বেশি করে আনলেই হতো।" তারপর বাচ্চাটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "আর নেই, এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমো।"

বাচ্চাটা সত্যিই কিন্তু শুয়ে পড়ল। সামনের দু'পায়ের ওপর মুখটা গুঁজে চোখ বুজল।

ওরা পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল, দরমার দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিতে ভুলল না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘরে উচ্ছিষ্ট জমা করা ছিল। বিকেলে কাজের মেয়েটা এসে বাসন মাজবে, তখন ওগুলো ফেলে দেবে। ওরা দুজন চুপি চুপি সেই উচ্ছিষ্ট থেকে বেশ কিছুটা একটা বাটিতে তুলে বাগানঘরে চলে গেল। ভাত, মাছের কাঁটা, চেবানো ডাঁটা, একটু ডাল, সব মিলিয়ে প্রায় আধ বাটি হলো। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল, ওদের পায়ের শব্দে জেগে উঠে কেঁউ কেঁউ করে উঠল। মৌয়ের দশ বছর বয়স, ওর এক বন্ধুর বাড়িতে কুকুর আছে। ও দেখেছে তাকে দু'বেলা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে নিয়ে যেতে হয়। তাই বাচ্চাটার খাওয়া শেষ হলে ও তাকে বাইরে ছেড়ে দিল। একটু পরেই ফিরে এল বাচ্চাটা, মৌয়ের পা শুঁকে লেজ নাড়তে লাগল। খাবার-টাবার মৌ দিচ্ছিল বলেই বোধহয় ওর ন্যাওটা হয়ে পড়েছে।

অন্ধকার হতেই বাচ্চাটার বোধহয় মায়ের কথা মনে পড়ে গেল, কিংবা অন্ধকারে ভয় ধরল। রাত্তিরে ভাই-বোনেদের সঙ্গে ও মায়ের গায়ে সেঁটে শুয়ে থাকে, এখন সেই অভাবটা বোধহয় টের পাচ্ছিল। ওর কান্নার শব্দ ওদের বাবা-মাও শুনতে পেলেন। বাবা বললেন, "কি জ্বালাতন, বাগানের মধ্যে একটা কুকুরের বাচ্চা ঢুকেছে মনে হচ্ছে। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে তাড়াই কি করে!"

ওদের দু'ভাই-বোনের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

ওদের মা-ই এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন, বললেন, "অন্ধকারের মধ্যে আর ওটাকে খুঁজতে বেরুতে হবে না, কাল সকালে বিদেয় করলেই হবে।"

"সারা রাত জ্বালাবে যে," বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

"তা হোক। অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের

বাড়ির পেছন দিকে ছোট মেটে ঘর।

মধ্যে শেষে সাপের কামড় খাবে নাকি!"

এ কথার পর বাবা আর কিছু বললেন না। সত্যিই কিছুদিন আগে বাগানে একটা সাপ বেরিয়েছিল। মালিই প্রথমে দেখেছিল, একটা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিল।

রাত্তিরে ভাই-বোনের ভাল ঘুম হলো না। বাচ্চাটার কান্নার শব্দে ওদের বড় কষ্ট হচ্ছিল, তার ওপর সকাল হলেই বাবা ওটাকে বার করে দেবেন। বাচ্চাটার ওপর সত্যিই ওদের মায়া পড়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা বাচ্চাটার কান্না কিন্তু শোনা গেল না। বোধহয় সারা রাত কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেদিন রবিবার। ওদের বাবা আজও বেলা করে উঠলেন। তার আগেই ওরা বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়ে এসেছে। বাবা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেলেন তারপর বাচ্চাটাকে খুঁজতে বেরুলেন। কিন্তু অনেক খুঁজেও ওটাকে তিনি পেলেন না। পাবেন কি করে? ওটা যে বাগানঘরে বাক্সের মধ্যে আছে তা তো তিনি জানেন না। তা ছাড়া বাচ্চাটা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

"আপদ গেছে," বাবা ফিরে এসে বললেন, "নিজেই চলে গেছে।"

দু'ভাই-বোন চুপ করে রইল। সেদিন দুপুরেও ওরা বাচ্চাটাকে খাইয়ে-দাইয়ে একটু ঘুরিয়ে আবার বাক্সর মধ্যে রেখে দিল। সন্ধ্যেবেলা আবার শুরু হলো ওটার কেঁউ কেঁউ—একটানা কেঁদেই চলেছে।

বাবা বললেন, "আবার ঢুকেছে! আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।"

সেদিন রাতটাও অমন কাটল।

পরদিন সকাল থেকে বাবার আপিসের তাড়া। আটটার মধ্যে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ওদের দু'জনকেও ইস্কুলে যেতে হবে। ওদের মহা চিন্তা হলো। সকালে একটু দুধ খেয়ে সারাদিন বাচ্চাটা থাকবে কি করে! খিধে পাবে না! ইস্কুল যাবার আগে ভাই-বোন পালা করে যখন যা পাচ্ছিল বাচ্চাটাকে খেতে দিয়ে আসছিল।

ওদের মা একবার বললেন, "তোরা বারবার বাগানে যাচ্ছিস কেন রে? কি আছে ওখানে?"

মৌ সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, "কই, কিছু না তো।"

ওর ঘাড় নাড়া দেখেই মায়ের সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল কিন্তু তখন তাঁর হাতে সময় নেই তাই চুপ করে গেলেন। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে, ছেলে-মেয়ে ইস্কুলে যাবে, তাদের তৈরি করতে হবে।

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরেই ওরা কোনোমতে কিছু মুখে গুঁজে বাগানে খেলা করতে গেল। বাচ্চাটাকে বার করে ওরা তার সঙ্গে খেলা করছিল। হঠাৎ ওটা ছুট মারল, এক ছুটে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। কি সর্বনাশ! ওরা পড়ি-মড়ি ছুটল ওর পেছনে। কিন্তু বাচ্চাটা পড়বি তো পড় একেবারে মায়ের সামনে গিয়ে পড়ল।

"একি! এটা কোত্থেকে এল!" ওদের মা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "শীগগির তাড়া এটাকে...অ্যাই যা...ভাগ্ ভাগ্।"

বাচ্চাটা যেন খেলা পেয়েছে। মায়ের ধমকানিকে গ্রাহ্য না করে একবার এঘর আরেকবার ওঘর করছে, কখনও বা খাটের তলায় লুকোচ্ছে। মহা উৎসাহে ছুটোছুটি করছে। ওরা ভাই-বোন রুদ্ধনিশ্বাসে তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে।

"শীগগির একটা লাঠি নিয়ে আয়," ওদের মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, তারপরই ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে গেলেন, তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

"কি হলো? ব্যাপার কি!" তিনি দু'জনকে লক্ষ্য করেই বললেন আর তখুনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল বাবুয়া। আস্তে আস্তে ওর মুখ থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিলেন ওদের মা, তারপর বললেন, "তাই দু'জনের বার বার বাগানে যাওয়া! কিন্তু এই নেড়ি কুকুর দেখলে তোদের বাবা যে ক্ষেপে যাবেন।

উনি আসবার আগেই ভালোয় ভালোয় ওটাকে বিদেয় কর।"

বাবুয়া এবার লাফালাফি শুরু করে দিল, কিছুতেই না। ওই বাচ্চাটাকে ওরা পুষবে। কি সুন্দর বাচ্চাটা, বড় হলে ওদের বাড়ি পাহারা দেবে।

"এতটুকুন বাচ্চা, ওর কষ্ট হচ্ছে না মাকে ছেড়ে থাকতে," ওদের মা বোঝাতে চাইলেন।

"ও তো মাকে ছেড়ে চলেই এসেছে," মৌ এবার বলল।

"হ্যাঁ, ছেড়ে এসেছে," মা রাগ করে বললেন, "তুমি সবজান্তা। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাড়ি ঢুকে পড়েছিল, তোমরা আটকে রেখেছ। যাও, বাইরে রেখে এস, ও নিজেই মায়ের কাছে চলে যাবে।"

বাবুয়া আবার ফোঁপাতে শুরু করল।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "যত সব ঝামেলা। আমি ওর ঝক্কি পোহাতে পারব না।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না," মৌ তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা দু'জন ওকে দেখব।"

"আর লেখাপড়া মাথায় উঠুক," মা ঝঙ্কার দিলেন।

"আমি খুব ভাল করে পড়ব মা," বাবুয়া এবার বলল, "ওকে তাড়িয়ে দিও না।"

"জানিনে বাপু," মা গজগজ করতে করতে বললেন, "কিন্তু ওই বাগানঘরেই ও থাকবে। এখানে এলেই আমি দূর করে দেব। রান্নাঘরে ঢুকলে ঝেঁটিয়ে তাড়াব একথা বলে রাখলাম।"

"ঠিক আছে," মৌ বলল, "আমরা ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।"

ওদের বাবা রাত্রে এসে সব শুনলেন। তিনি প্রথমে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন, বাচ্চাটাকে তখুনি বিদেয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেমেয়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি নরম হলেন তবে এক শর্তে, ওই বাচ্চার জন্য যদি ওদের লেখাপড়ায় কোনোরকম বাধা পড়ে তবে আর এক মুহূর্ত ওটাকে রাখা চলবে না, তিনি নিজে ওটাকে বার করে দেবেন, কোনো কথা শুনবেন না।

এক মাসের মধ্যেই বাচ্চাটা বেশ বড় হয়ে গেল। ভাই-বোন ওকে সাবান দিয়ে স্নান করায়, নিজেদের খাবারের ভাগ দেয়। মা ওকে যা খাবার দেন তাতে ওদের মন ভরে না। মার কড়া হুকুম ওটা ঘরে ঢুকবে না তাই বাগানেই ওকে নিয়ে ওরা ছুটোছুটি করে। তারপর বাগানঘরে রেখে আসে। বাচ্চাটাও যেন বুঝতে পারে ওদের মা ওকে পছন্দ করেন না তাই তাঁকে দেখলেই ছুটে পালিয়ে যায়।

পরীক্ষায় ভাই-বোন দুজনেই ভাল রেজাল্ট করল। আসলে বাচ্চাটাকে রাখবার যে শর্ত বাবা দিয়েছিলেন, সেটা ওরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করছিল, নইলে বাবা পাছে ওকে তাড়িয়ে দেন সেই ভয় ছিল। বাচ্চাটার নাম ওরা রেখেছিল ধলা, সাদা রঙ, তাই ওই নাম।

দেড় বছর কেটে গেল। ধলা এখন রীতিমতো জোয়ান কুকুর। পাড়ার সব কুকুর ওকে ভয় করে। এ নিয়ে ভাই-বোনের মহা গর্ব। ওদের গেট দিয়ে অচেনা মানুষ ঢোকে কার সাধ্যি! এমন তেড়ে যায় যে সে পালাবার পথ পায় না। রাত্রিবেলা ও সদর দরজার সামনে শুয়ে থাকে। একদিন দুটো চোর গেট টপকে ভেতরে ঢুকেছিল। ব্যস, আর যায় কোথায়! ধলার তাড়া খেয়ে একজন কোনোমতে পালিয়েছিল কিন্তু অন্যজনকে ধলা এমন কামড়ে ধরেছিল যে সে আর পালাতে পারেনি। তারপর থেকে বাড়িতে ওর কদর অবিশ্যি বেড়েছিল। তবে মা এখনও ওকে ঘরে ঢুকতে দেন না, আসলে তাঁর একটু ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক আছে।

সেদিন ছিল রবিবার। দুই ভাই-বোন বাগানে পেয়ারা পাড়ছিল। ধলা ছিল একটু দূরে বসে। মৌ গাছে উঠেছে আর বাবুয়া নিচে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বাবুয়া চিৎকার করে উঠল। নিচের দিকে তাকিয়ে মৌয়ের হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা সাপ। বাবুয়ার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে ফণা তুলে হেলছে-দুলছে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল মৌ, গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। বাবুয়া একবারই চিৎকার করেছিল তারপর সম্মোহিতের মতো তাকিয়েছিল সাপটার দিকে, ওর নড়াচড়ার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে। এই বুঝি সাপটা ছোবল মারে।

তারপরই ঘটে গেল অদ্ভুত এক কাণ্ড। তীরবেগে ছুটে এল ধলা। যেন বাবুয়াকে আড়াল করে দাঁড়াল তারপর ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল সাপটাকে। সাপটা কিন্তু গেল না। বাবুয়াকে ছেড়ে ধলাকে নিয়ে পড়ল। সে এক দৃশ্য। ধলাকে লক্ষ্য করে সাপ ছোবল মারে আর ধলা এক লাফে পাশে সরে যায়। ব্যর্থ হয়ে সাপটা যেন আরও ক্ষেপে গেল। ঘন ঘন ছোবল মারতে লাগল কিন্তু প্রত্যেকবারই ধলা ছোট ছোট লাফে এপাশ-ওপাশ সরে গিয়ে ব্যর্থ করে দিতে লাগল ওটার ছোবল।

এদিকে ধলার ঘেউ ঘেউ শুনে মালি ছুটে এল। দৃশ্যটা চোখে পড়তেই সেও চিৎকার করে উঠল। মৌ-বাবুয়ার মা-বাবাও ছুটে এলেন। ওদের মার তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। বাবাও প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন, তারপরই অনেক চেষ্টা করে মালি আর তিনি লাঠি দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেললেন।

ধলা এবার বসে জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল। কম পরিশ্রম তো হয়নি ওর। মৌ ততক্ষণে গাছ থেকে নেমে এসেছে। সে এক নিশ্বাসে কি ঘটেছিল বলে গেল। ধলা অমনভাবে ছুটে না এলে বাবুয়ার যে আজ রক্ষে ছিল না এটা বুঝতে কারও বাকি রইল না।

ওদের মা এতদিন যা করেননি আজ তাই করলেন। এক ছুটে ধলার সামনে বসে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ধলা তাঁর বুকে মুখ গুঁজে ডাকল ভেউ ভেউ, তারপর জিভ দিয়ে গালটা চেটে দিল।

ছবি: অরিজিৎ দত্তচৌধুরী

কায়রোর পাগলা বৈজ্ঞানিক

অদ্রীশ বর্ধন

শেখসাহেব আর মণিবেগমকে অনেকদিন পর ঘরে ঢুকতে দেখে উল্লসিত গলায় বলেছিল ইন্দ্রনাথ—'আসা হোক, আসা হোক। নিশ্চয় খালি হাতে আসেননি। প্রব্লেম এনেছেন?'

'এনেছি', বলে সোফায় বসে পড়লেন সুপুরুষ শেখসাহেব। যেমন ফর্সা, তেমনি বলিষ্ঠ আকৃতি। চোখে আর মুখে হাসি সবসময়ে ভাসছে। এখন তাঁর শ্রীঅঙ্গে ক্রীমকালারের সাফারি স্যুট। এই মানুষটাই কালো গাউন চাপিয়ে যখন হাইকোর্টের এজলাসে ঢোকেন, তখন তাবড় প্রতিপক্ষও নড়ে বসে। অমায়িক অথচ ব্যক্তিত্বে ঠাসা। গমগমে গলায় দামামা ধ্বনি।

মণিবেগমকে দেখে মনেই হয় না, পুলিশে কাজ করেন। মামুলি কাজ নয়—বড় কাজ। খুব নামী অফিসার। অথচ তাঁর শান্ত চোখ আর সহজ হাসির ধারায় নেই তিলমাত্র অহমিকা। যেন বাংলার পলিমাটি দিয়ে গড়া মানুষ। হাতজোড় করে ইন্দ্রনাথকে নমস্কার করে বললেন—'প্রব্লেমটা উৎকট। মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে। তিনি নাকি যে কোনও মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারেন। তাই দৌড়েছেন আমার কাছে—শেখসাহেবের কাছে কেন গেছেন, সেটা ওঁর মুখেই শুনুন।' বলে আর একটা সোফায় বসে পড়লেন মণিবেগম।

জিজ্ঞাসু চোখে শেখসাহেবের দিকে তাকালো ইন্দ্রনাথ। তিনি তখন ইন্দ্রনাথের হাতের নস্যির ডিবের দিকে চেয়ে রয়েছেন। বললেন—'আগে একটিপ হয়ে যাক। তারপর বলছি ভদ্রলোক অযথা আতঙ্ক ব্যাধিতে ভুগছেন কিনা।'

নস্যির ডিবে এগিয়ে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—'ফিয়ার সাইকোসিস?'

নস্যগ্রহণ সমাপ্ত করে বললেন শেখসাহেব—'আঃ! মাথাটা খুলে গেল। হ্যাঁ, আলহাজেন নিশ্চয় ভয় বাতিকে

ভুগছেন। মস্ত পণ্ডিত। পয়লা নম্বর গ্রন্থকীট। উনি এসেছেন আমার চেম্বারে অদ্ভুত একটা আবদার নিয়ে। পুলিশ বোধহয় ওঁকে অ্যারেস্ট করবে। তাই আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

'কেন যে ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস করতে গেছিলেন—উত্যক্ত তো হতেই হবে।'

'ক্রিমিন্যাল মামলায় মজা আছে স্যার।'

স্মিত হেসে মণিবেগম বললেন—'মজা এখন বেরচ্ছে। একই লোক পুলিশের কাছে যাচ্ছে নিরাপত্তার আবেদন নিয়ে—উকিলের কাছে চাইছে আগাম জামিন।—কেসটা কী?'

এবার নস্যি নিতে হলো স্বয়ং ইন্দ্রনাথকেই। বললে—'ভদ্রলোকের নাম আলহাজেন?'

'চেনেন মনে হচ্ছে?'

'এই ভদ্রলোককে চিনি না, তবে নামটা জানি। তিনিও পাগল বদনাম কুড়িয়েছিলেন—হাজার বছর আগে।'

মণিবেগমের চোখ স্বাভাবিকই রইল—ঈষৎ বিস্ফারিত হলো শেখসাহেবের দুই চক্ষু—'হা-জা-র বছর আগে!'

'আজ্ঞে। আপনারা যে আলহাজেন-এর কথা বলছেন, তাঁরও মাথা খারাপ হয়েছে শুনে তাঁকে দেখতে ইচ্ছে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন শেখসাহেব আর মণিবেগম।

'এখুনি যেতে হবে?' ইন্দ্রনাথ বললে দাঁড়াতে দাঁড়াতে।

'নিশ্চয়,' জবাব দিলেন শেখসাহেব—'গাড়ি রেডি। নতুন মারুতি। আলহাজেনও বসে আছেন আপনার প্রতীক্ষায়।'

'আমার মক্কেল হতে চান বলে? আপনাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন বলে?'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন শেখসাহেব—'কেসটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই—দুজনেই। আলহাজেন মানুষটা ভাল। যদি একটু উপকার করা যায়—'

এয়ারকন্ডিশনড মারুতি এইট হানড্রেড-এর মধ্যে বসে মণিবেগম আর শেখসাহেবের কৌতূহল মিটিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

১৯৭১ সালে অনেক ঢাকঢোল পিটে ঈজিপ্টের আসওয়ান হাই বাঁধ-এর উদ্বোধন করা হয়েছিল। দু'হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিশাল হ্রদ বানানো হয়েছিল। বিধ্বংসী নীলনদকে অবশেষে বাগে আনা গিয়েছিল।

লম্বা-চওড়া বক্তৃতা মেরে যাঁরা বাঁধ-এর উদ্বোধন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই জানতেন না, হাজার বছর আগে আশ্চর্য এই ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতা দেখাতে গিয়েও পেছিয়ে এসেছিলেন লাগসই যন্ত্রপাতির অভাবে যে পাগলা বৈজ্ঞানিক—মিশরের আরবরা তাঁকে ইবনে আলহাইথাম বলে ডাকত। বিলেতের ঐতিহাসিকরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন আলহাজেন।

দূরদর্শী এই মানুষটাকে তখনকার সময়ে বলা হয়েছিল বদ্ধ উন্মাদ। পরে তাঁর কীর্তিকলাপের অর্থ বুঝতে পেরে তাঁকে কেপলার, লাওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আর আইজ্যাক নিউটনের দলে ফেলা হয়েছিল।

আলহাজেন জন্মেছিলেন ইরাকে, ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই গুলে খেয়েছিলেন গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন আর ভেষজবিজ্ঞান। ঈজিপ্টের খলিফ আল-হাকিম তাঁকে খাতির করে নিয়ে গেছিলেন কায়রোতে। তখনই আলহাজেন বুদ্ধি দিয়েছিলেন খলিফকে—দুরন্ত নীলনদকে শায়েস্তা করার একমাত্র পথ, একটা বাঁধ।

শুনে তো নেচে উঠলেন খলিফ। ঢালাও হুকুম দিলেন আলহাজেনকে—বাঁধো বাঁধ। রোখো পাগলা নীলনদকে।

বিপুল উদ্যমে কাজে নেমেছিলেন আলহাজেন। তারপরেই তাঁর মুখ গেল শুকিয়ে। এ কাজের জন্যে যে-সব যন্ত্রপাতি দরকার—সে-সব তো নেই!

পিছু হটলেন আলহাজেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিকই—কিন্তু স্বপ্ন রূপায়ণের হাতিয়ার সে যুগে তৈরিই হয়নি।

রেগে টং হলেন খলিফ। একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস ছিল ভদ্রলোকের। কেউ তাঁকে হতাশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান নিতেন।

আলহাজেন-এরও গর্দান যেত। গেল না শুধু পাগল বদনাম কুড়িয়ে ফেলেছিলেন বলে। ইসলামিক কানুন উন্মাদের ওপর নিষ্ঠুরতা বরদাস্ত করে না। পাগল যে হয়, ভগবানের করুণা থাকে তার ওপর। ফলে, আলহাজেনকে জেলে যেতে হলো—সেখানেই পড়াশুনো চালিয়ে যেতে হলো খলিফ দেহ না রাখা পর্যন্ত।

জেল থেকে বেরিয়ে ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিতদের লেখা আরবী ভাষায় কপি করে আর বিক্রি করে কোনোমতে দিন গুজরান করে গেছিলেন আলহাজেন। বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে ছিলেন গবেষণায়। আবিষ্কারও করেছেন অনেক কিছু। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দৃষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে লেখা তাঁর একটা বই—সেই বইতে যে-সব কথা লিখেছিলেন, অনেক পরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা তা জানতে পারেন।

ফটোগ্রাফি নিয়ে যে-সব তত্ত্ব লিখেছিলেন, তা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ মাথা ঘামায়নি। ঘামালে ক্যামেরা আবিষ্কারের কৃতিত্ব পেয়ে যেত মধ্যযুগের মিশর। লেন্স নিয়ে যে-সব কথা লিখেছিলেন, তা এত সঠিক যে ওঁর লেখা ল্যাটিনে তর্জমা হতে না হতেই সরাসরি মেডিক্যাল কেতাবে ঠাঁই পেয়ে গেছিল।

রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু তাঁর বিদকুটে পরীক্ষানিরীক্ষার মানে করেছিল একটাই—উন্মাদ...আলহাজেন বদ্ধ উন্মাদ।

মুসলিম দুনিয়ায় তখন কিন্তু দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পাপড়ি মেলে ধরছে। মহম্মদ দেহ রেখেছিলেন ৬৩২-এ। একশো বছরের মধ্যেই তাঁর অনুগামীরা গড়ে তুলেছিল আরব সাম্রাজ্য—ভারত থেকে স্পেন পর্যন্ত।

রাজনৈতিক কারণে তা ভেঙে পড়লেও জায়গায় জায়গায় থেকে গেল ধর্ম, অর্থনীতি আর ভাষার প্রভাব। প্রজাদের কাছ থেকে ভাল ভাল বিষয় আহরণে পটু ছিল আরবরা। সবচেয়ে মেতে উঠেছিল গ্রীক দার্শনিকদের জ্ঞান আহরণে। বিশেষ করে অ্যারিস্টটল-এর। প্রাচীন দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক পুঁথির তর্জমা করে পড়ানো হয়েছে তামাম ইসলাম দুনিয়ায়। পশ্চিম ইউরোপ যখন পুস্তকহীন তমিস্রাযুগে ডুব দিয়েছে—তখন উদারপন্থী মুর-শাসিত স্পেনের করডোবায় রয়েছে ছ'লক্ষ বইয়ের বিশাল একটা গ্রন্থাগার। সত্যি কথা বলতে কি, মুসলিম স্পেন অ্যারিস্টটলকে নতুন করে তুলে ধরেছিল খ্রিস্টান ইউরোপের সামনে।

আলহাজেন-এর সময়ে অনেক মুসলিম পণ্ডিত মৌলিক চিন্তাভাবনা করে গেছিলেন। যেমন, অভিসেনা। প্রায় আড়াইশো বই লিখেছিলেন। নানা বিষয়ের ওপর লেখা বহু পণ্ডিতের বিস্তর বই থরে থরে, একটার ওপর একটা, সাজিয়ে রাখা হয়েছিল অজস্র পাবলিক লাইব্রেরিতে। এখনকার লাইব্রেরিতে বই দাঁড় করিয়ে রাখা হয় পাশাপাশি—আরব গ্রন্থাগারে বই রাখা হতো ওপর ওপর। এক-একটা খুপরিতে পাঁচ-ছ'খানা করে...

এই পর্যন্ত শুনেই শেখসাহেব মারুতি এনে দাঁড় করালেন আধুনিক আলহাজেন-এর গাড়িবারান্দায়।

গাড়ির মধ্যে বসেই চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল ইন্দ্রনাথের। বলে ফেলেছিল—'এ যে দেখছি দ্বিতীয় তাজমহল।'

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলেছিলেন শেখসাহেব—'দ্বিতীয় নয়, তৃতীয়।'

'মানে?'

'শাহজাহানের পূর্বপুরুষ তৈমুর লঙ দামাসকাসে পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে মসজিদ—যার মধ্যে নাকি আশ্রয় নিয়েছিল ৩০,০০০ কচিকাঁচা, পুরুষ আর মেয়ে—সেই মসজিদ-এরই অনুকরণে শাহজাহান বানিয়েছিলেন তাজমহল—সাদা মার্বেল পাথরে। তাই বললাম, আলহাজেন-এর সাদা মার্বেলের এই প্রাসাদকে বলতে পারেন তৃতীয় তাজমহল। পাশেই ওঁর বেগমের সমাধি—ও পাশের কালো মার্বেলের ওই যে তাজমহল দেখছেন—ওটা রেখেছেন নিজের জন্যে।'

'নিজের জন্যে?'

হাসলেন শেখসাহেব। মণিবেগম এখন নেমে এসেছেন মারুতি থেকে—'শাহজাহান-এর ইচ্ছে ছিল তো কালো মার্বেলের আর একটা সমাধি ভবন গড়বেন যমুনার অপর পারে—নিজের জন্যে। তা হয়নি। মমতাজ মহলের পাশেই শুয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে—আজও।'

পাশাপাশি দুটো মহল। সাদা আর কালো। পড়ন্ত রোদে ঝকঝক করছে। গোটা আলিপুরে এমন দৃশ্য বিরল। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

মর্মর সোপানে পা দিয়ে বললেন শেখসাহেব—'আসুন।'

টকটকে রাঙা মুখ, ফ্রেঞ্চকাট সাদা দাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো ধবধবে সাদা চুল। চোখে রীমলেস সোনার চশমা। লেন্সের মধ্যে দিয়ে তীব্র একজোড়া চোখ অনিমেষে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে। ইনি আলহাজেন। সাদা সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি ঝকঝক করছে মাথার ওপর ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আলোয়।

বাঁধানো দাঁতের সাদা সারি বের করে বললেন—'আপনিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র? জাসুস কি এমন খুবসুরৎ হয়?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সবিনয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'আমার কপাল। চেহারাটা বাধার সৃষ্টি করবে জানলে এই লাইনে আসতাম না।'

জিভ কাটলেন আলহাজেন। এইটাই তাঁর একমাত্র মুদ্রাদোষ। বললেন—'আরে ছিঃ ছিঃ! আমি কি তাই বলেছি? ওপরওলার মরজি না হলে এমন চেহারা কেউ পায় না।'

'যেমন আপনি পেয়েছেন', বিনয়ে যেন গলে পড়ছে ইন্দ্রনাথ—'সেই সঙ্গে ধনদৌলত। মহল দু'খানা যা বানিয়েছেন—'

কাজের কথায় চলে এলেন আলহাজেন—'আপনাকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছি। টেন থাউজান্ড পার মান্থ। আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা চলছে। আমাকে ক্রিমিন্যাল সাজিয়ে অ্যারেস্ট করার চক্রান্তও চলছে।'

'কি দুষ্কর্ম করেছেন?'

ইন্দ্রনাথের সটান প্রশ্নের সটান জবাব দিলেন আলহাজেন—শেখসাহেব আর মণিবেগমের দিকে তাকিয়ে—'কিচ্ছু না।'

'তাহলে এত আতঙ্ক কেন?'

'আমার পূর্বপুরুষকে উন্মাদ বলা হয়েছিল যে কারণে—ঠিক সেই কারণে।'

চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। শেখসাহেব চোখ দুটো ছোট করলেন। মণিবেগম প্রশান্ত।

আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ—'তিনি কে?'

'নাম বললে তো চিনবেন না। ঐতিহাসিকরা চিনবেন।'

'আপনি কি কায়রোর সেই পাগলা বৈজ্ঞানিকের বংশধর?'

নিমেষে জ্বলে উঠলেন আলহাজেন। ধক্ করে জ্বলে উঠল দুই চক্ষু। পাগলের চোখ বলেই মনে হলো ক্ষণেকের জন্যে। পরক্ষণেই দুই চোখের সামনে দিয়ে হস্তচালনা করে ঘোর কাটিয়ে উঠলেন যেন। চোখের সেই তীব্র অন্তর্ভেদী চাহনি আবার ফিরে এসেছে।

কথা বললেন একটু ঝুঁকে—'মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আপনি আলহাজেন-এর নাম শুনেছেন?'

'গাড়িতে আসতে আসতে এতক্ষণ তাঁর কথাই এঁদের বলছিলাম। ঈশ্বরের কৃপা নিয়ে জিনিয়াসরা আসেন এই পৃথিবীতে—অধিকাংশই উন্মাদ আখ্যা পেয়ে যান। আলহাজেন এই দুর্ভাগ্য কুড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।'

নরম হয়ে এল আধুনিক আলহাজেন-এর প্রদীপ্ত চক্ষু। বললেন ধীর গম্ভীর গলায়—'আমি তাঁর বংশধর। তাই লোকে

বলে আমার মধ্যেও পাগলামি আছে।'

'বলুক। আলহাজেন-এর বংশলতিকা আপনার কাছে আছে?'

'প্রমাণ চাইছেন? মাইটোকনড্রিয়াল ডি-এন-এ টেস্ট করিয়ে প্রমাণ করে দেব। আলহাজেন-এর হাজার বছরের পুরোনো কঙ্কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ডি-এন-এ—মায়ের দিক দিয়ে যা একদম না পাল্টে নেমে যায় বংশধরদের শরীরে।'

'জানি। আমি প্রমাণ চাইনি। কৌতূহলে ফেটে পড়ছিলাম বলে বংশলতিকার কথা বলছিলাম। আলহাজেন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। অনন্য প্রতিভার অধিকারী। আপনার মধ্যে জিন এফেক্ট অনুযায়ী সেই প্রতিভার স্ফুরণ নিশ্চয় ঘটেছে। তাই বিপদে পড়েছেন। এই তো?'

প্রীত হলেন আধুনিক আলহাজেন। অর্ধনিমীলিত চোখে পুরো তিন সেকেন্ড চেয়ে রইলেন ইন্দ্রনাথের দিকে। ঘরের মধ্যে তখন চার ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

অবশেষে খ্রিমিখ্রিমি স্বরে বললেন শ্বেতকায় শুভ্রবসন বৃদ্ধ—'ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড। বিপদটা এসেছে এই কারণেই।'

'আপনার প্রতিভার উন্মেষ কারও সহ্য হচ্ছে না?'

'না।'

'সে কে?'

'জানলে তো বলব।'

ঠিক এই সময়ে ইন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছে হলো নস্যি নেওয়ার। নস্যি এমনই জিনিস যা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে না। সুতরাং বেরিয়ে এল নস্যির সুদৃশ্য আধার। এবার আর শেখসাহেব হাত বাড়ালেন না—শিষ্টাচার মেনে চললেন। আলহাজেন-এর আধবোঁজা চোখ কিন্তু ঘুরে গেল নয়নসুন্দর নস্যাধারের দিকে। বললেন হাত বাড়িয়ে—'বাঃ! বেশ সুন্দর তো! দিন একটিপ!...ইন্দ্রনাথবাবু, সময়

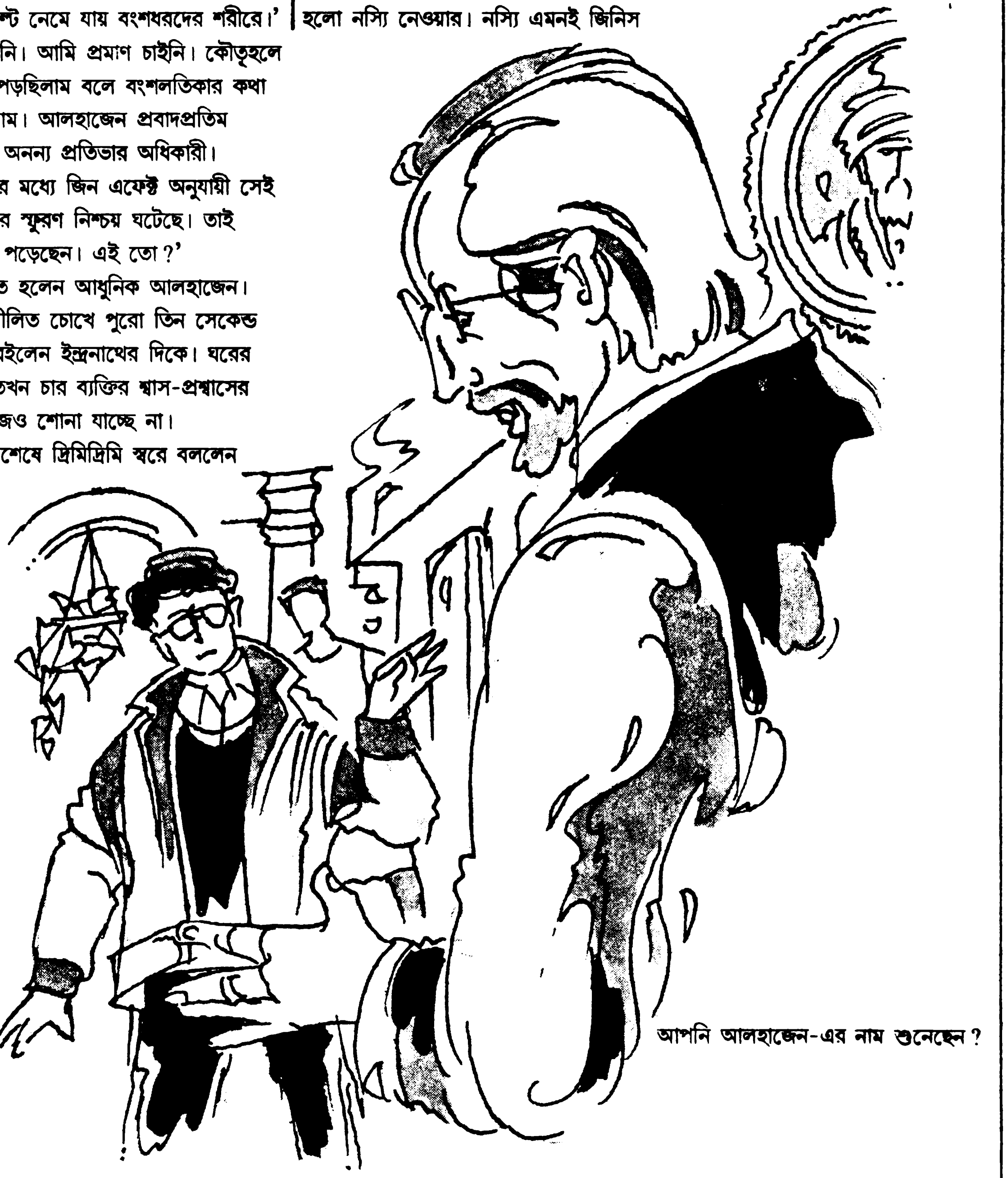

আপনি আলহাজেন-এর নাম শুনেছেন?

থাকলে নস্যির আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করা যেত। কিন্তু সময় একদম নেই। সাইকিক ভদ্রলোকের কথা কখনও মিথ্যে হয়নি—হবে না।'

নাকের কাছে নস্যি তুলেও থমকে গেল ইন্দ্রনাথ—'সাইকিক ভদ্রলোক?'

'নাম তাঁর জ্যাক বুথ। নিউইয়র্ক সিটিতে আলাপ। টিভি-তে একটা সিরিয়াল চলছিল। বাংলায় যার টাইটেল—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে। জ্যাক বুথ-এর চেহারা দেখলাম, তাঁর অলৌকিক প্রতিভাও দেখলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম চেম্বারে। এক কাঁড়ি টাকা গেল বটে, কিন্তু উনিই সোজা বলে দিলেন—মাস কয়েকের মধ্যেই আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি ঘটবে। অকালে মারা যাব। রহস্যজনকভাবে। তার আগে আমার অনেক বদনাম হবে। আমাকে ক্রিমিন্যাল সাজানো হবে। সমাজে আমার মাথা হেঁট করে দেওয়া হবে মিথ্যে কুৎসা ছড়িয়ে। তারপর হবে মৃত্যু। অদ্ভুতভাবে।'

শেখসাহেব আর মণিবেগমের দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। দুজনেই যেন দুটি মর্মর পুতুল। তাঁদের দিকে চোখ ফিরিয়ে শেষ করলেন আলহাজেন—'মাপ করবেন। আপনাদের চেয়ার এ কথা বিশ্বাস করবে না বলেই বলিনি। কিন্তু চেয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে মানবেন তো, এই পৃথিবীর অনেক ঘটনার কোনও কিনারা হয়নি—হবেও না।'

নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন দুই শ্রোতা। ঘরের হাওয়া পর্যন্ত যেন দাঁড়িয়ে গেছে। আলহাজেন-এর দ্রিমিদ্রিমি স্বরে যেন জাদু আছে।

নাকের কাছে ধরা নস্যিকে এবার নাকের গহ্বরে চালান করে দিল ইন্দ্রনাথ। বললে হৃষ্টস্বরে—'সাইকিকের প্রেডিকশন সত্যি হতে চলেছে, এরকম ঘটনা কি শুরু হয়েছে? মানে, কুৎসা রটনা?'

একটু থেমে বললেন আলহাজেন—'হ্যাঁ, শুরু হয়েছে।'

'শুনতে পারি?'

পর্যায়ক্রমে তিন শ্রোতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন আলহাজেন—'কুৎসা এমনই রটনা যে শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায়। বিশেষ করে নামী লোকের অপবাদ যখন ছড়ায়। তাই এতদিন মুখ বুঁজে ছিলাম। নিন্দার একমাত্র জবাব হচ্ছে নৈঃশব্দ। কোনও প্রতিবাদ না করা। আমিও তাই করে এসেছি। আমার মৃত্যু হয় হোক, কিন্তু কুৎসা নিয়ে যেন মরতে না হয় অথবা জেলে যেতে না হয়।'

'কুৎসাটা কি ধরনের?' নিস্পৃহ স্বর ইন্দ্রনাথের।

'চুরি', ছোট্ট জবাব আলহাজেন-এর।

'কি বস্তু?'

'বই।'

'বই?'

'আলহাজেন, অভিসেনা প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিতদের বই থাকত স্পেনের করডোবার অজস্র পাবলিক লাইব্রেরিতে। যে কোনও কারণেই হোক, একটা লাইব্রেরিকে পাবলিক করা হয়নি— লুকিয়ে রাখা হয়েছিল লোকের চোখের আড়ালে—একটা পাতালঘরে। অদ্ভুত আশ্চর্য দুষ্প্রাপ্য বইয়ের কালেকশন ছিল নাকি সেই ঘরে। সবই লোকমুখের কিংবদন্তী। আমি নাকি করডোবায় গিয়ে খুঁজে খুঁজে সেই বই উদ্ধার করেছি পাতালঘর থেকে—চুরি করে এনে ফেলেছি এই কলকাতায়। টি-টি পড়ে গেছে পণ্ডিত মহলে। বিশ্বাসযোগ্য বলে কি মনে হয় আপনাদের?'

কেউ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করার আগেই একটা বিকট চিৎকার নিনাদিত হলো শ্বেতমহলে। মরণান্তক সেই চিৎকার আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে শব্দের ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে চলল বিশাল এই বসবার ঘরেও।

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতন সটান হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আলহাজেন—'তৈমুর! তৈমুর!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পেছন পেছন দৌড়ে এল ওরা তিনজন। তখনই দেখল শ্বেতমহলের অদ্ভুত নকশা।

বহু উঁচুতে সাদা পাথরের পিঁয়াজ-অনুকরণের গম্বুজ। ঠিক নিচে একটা মর্মর সমাধি। গোল চত্বর ঘিরে সারি সারি বিশাল চৌবাচ্চা। প্রতিটা চৌবাচ্চার সামনে একটা ঘর। এ বাড়িতে দোতলা বলে কিছু নেই। ওই ঘরগুলোই বসবাসের জায়গা—দরজা খুললেই সামনে একটা করে বিশাল জলাধার। প্রতিটা জলাধারে কিম্ভূতকিমাকার উভচর আর জলজ প্রাণী কিলবিল করছে। একটার পাড়ে বসে ছ'ফুট বড় একটা অতিকায় ব্যাঙ—জাল দিয়ে ছাওয়া বলে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। তার পাশের চৌবাচ্চাটার সামনে পাথর-বাঁধাই চত্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে লম্বা-চওড়া একজন পাঠান যন্ত্রণায় ছটফট করছে। গোটা শরীরটা তেউড়ে তেউড়ে যাচ্ছে।

আলহাজেন সোজা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে। হেঁট হয়ে দেখছেন আর তারস্বরে অন্য ভাষায় যা বলে যাচ্ছেন, তার বাংলা মানে এই—'তুমি! তুমি! স্টোনফিশ ধরতে গেছিলে! বিষকাঁটার মার খেয়েছো! ঠিক হয়েছে! বদমাশ বেইমান কোথাকার!—রহমান! রহমান! জলদি আও! ফুটন্ত জল ঢালো। নইলে বিষ নামানো যাবে না!'

রান্নার জল ফুটছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িভর্তি ফুটন্ত জল এনে তৈমুরের গায়ে হড়হড় করে ঢেলে দিল পাচক রহমান। একে বিষের যন্ত্রণা—তার ওপর ফুটন্ত জল। তৈমুরের পরিত্রাহি চিৎকারে শ্বেতমহলের প্রতিটা পাথর বুঝি চৌচির হয়ে যাবে মনে হলো। কিন্তু আলহাজেনের রাঙা মুখ তখন লাল পাথরের মতন শক্ত হয়ে উঠেছে। ফুটন্ত জল ঢালার বিরামবিহীন অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন। আতীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে চলেছে তৈমুর আর ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে...

ইন্দ্রনাথ আর সহ্য করতে পারল না। চিৎকারের ওপর চিৎকার করে বললে আলহাজেনকে—'করছেন কী! ঝলসে

মারা যাবে যে!'

'ঝলসে গেলেও বেঁচে যাবে। নইলে ছ'ঘণ্টার মধ্যে মরবেই। স্টোনফিশের পাখনার কাঁটার বিষ বড় মারাত্মক। অ্যান্টি-ভেনম এদেশে পাওয়া যায় না।—রহমান! ঢালো জল!'

ঘণ্টাখানেক পরেই নিস্পন্দ হয়ে গেল তৈমুর। চোখ বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ।

হুকুম দিলেন আলহাজেন—'ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও, রহমান। জান থাকলে বেঁচে যাবে। নইলে—'

'মরবে,' বলে থেমে গেল ইন্দ্রনাথ।

ঝটিতি ইন্দ্রনাথের দিকে ঘুরে গেলেন আলহাজেন—'ইয়া আল্লা! আপনার কি প্রাণ কাঁদছে তৈমুরের জন্যে?'

'না,' খুব সহজ গলায় বললে ইন্দ্রনাথ—'প্রাণ কাঁদছে আপনার জন্যে—প্রেডিকশন না সত্যি হয়ে যায়। তৈমুর স্টোনফিশে হাত দিতে গেছিল কেন? ও তো জানত, বিষকাঁটায় কী জ্বালা।' বলে অনিমেষে চেয়ে রইল স্টোনফিশের আধারের দিকে। সে এক পেল্লায় চৌবাচ্চা। ভেতরে এবড়ো-খেবড়ো পাথর বসানো—সমুদ্রের ধারে পাথরের খাঁজ যে রকম হয়। খাঁজে খাঁজে স্থির হয়ে ভাসছে একটা করে বদখৎ চেহারার স্টোনফিশ। চৌকোনা, সারা গায়ে আঁচিলের মতন ডুমো ডুমো মাংস, শ্যাওলায় ঢাকা সারা দেহ—অতিশয় কিম্ভূতকিমাকার। সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে চলমান বিশ্বকোষের মতন বলে গেল ইন্দ্রনাথ—'এদের পাওয়া যায় প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরের উপকূলে—লোহিত সাগর থেকে উত্তর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত। এদের গায়ের রঙ পাথরের রঙের মতন—একদম না নড়ে পাথরের গায়ে গা লাগিয়ে ডুবে থাকে—জ্যান্ত বলে মনেই হয় না—ঝট করে চোখেও পড়ে না। আলহাজেন সাহেব, আপনি যোগাড় করেছেন পাঁচটা স্টোনফিশ—পাঁচটার মধ্যে চারটে সামান্য কাঁপছে—মানে, জীবন্ত। একটা যেন একদম পাথর।—রহমান!'

রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল রহমান। বলে গেল ইন্দ্রনাথ হুকুমের স্বরে—'চিমটে আছে? আনো?'

কটমট করে আলহাজেন সাহেব যখন চেয়ে আছেন, ইন্দ্রনাথ তখন চিমটে নামিয়ে একদম নিস্পন্দ স্টোনফিশকে ধরে জলের বাইরে নিয়ে আসছে। গোল চত্বরে নামিয়ে রাখার পর যখন চিমটের খোঁচা মেরে দেখা গেল, সেই স্টোনফিশ শুধু স্টোন দিয়েই তৈরি—জ্যান্ত মাছ নয়—তখন আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেলেন আলহাজেন। ইন্দ্রনাথ যখন রহমানকে দিয়ে হামান-দিস্তে আনিয়ে পাথরের স্টোনফিশকে তার মধ্যে ফেলে ভেঙে ফেলছে, তখন একটা গুলিবর্ষণের নির্ঘোষ ভেসে এল আলহাজেন-এর ঘরের দিক থেকে। ভাঙা পাথরগুলোর মধ্যে থেকে একটা পেতলের প্লেট তুলে নিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'এবার চলুন, প্রেডিকশন সত্য হলো কিনা দেখা যাক।'

পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখসাহেব। মণিবেগম নিথর। গুলিগোলার আওয়াজ তাঁর কানে সয়ে গেছে।

আলহাজেন শুয়ে আছেন মেহগনি কাঠের পালঙ্কে। চিৎ হয়ে। বুকের ওপর ধরে রয়েছেন রিভলভারের কুঁদো। ডান হাতে। গুলি ঢুকেছে বাঁ রগ দিয়ে।

শেখসাহেব দেখেই বললেন—'প্রেডিকশন সত্যি হলো।'

শান্ত কণ্ঠে বললেন মণিবেগম—'হ্যাঁ, সত্যি হলো। আত্মহত্যা এটা নয়—মার্ডার। দুটো কারণে। প্রথম, ডান হাতে রিভলভার ধরে কেউ বাঁ রগে গুলি করতে পারে না। দ্বিতীয়, নিজেকে গুলি করে রিভলভার কেউ বুকের ওপর নামিয়ে ধরে রাখতে পারে না। ইট ইজ এ মার্ডার। সাজানো হয়েছে সুইসাইডের মতন।'

শেষের কথাগুলো ইন্দ্রনাথ শোনেনি। সে তখন দৌড়চ্ছে সাদা মহলের ঘরে ঘরে। তৈমুরকে পাওয়া যায়নি। একটু আগেই সে টলতে টলতে ঝলসানো শরীর নিয়ে বেরিয়ে গেছে—কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

ঘরে ফিরে এসে বলেছিল মণিবেগমকে—'তৈমুরকে খুঁজুন। আর আগে দেখে যান কি ছিল স্টোনফিশের পেটে।'

বলে, তুলে ধরল সেই পেতলের আয়তাকার প্লেটটা। যার গায়ে খোদাই করা একটা নকশা। উর্দুতে কি যেন লেখা তলায়।

'শেখসাহেব, উর্দু নিশ্চয় জানেন। কি লেখা আছে বলবেন?'

বলে গেলেন শেখসাহেব—গমগমে গলায়। যেন এজলাসে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

আলহাজেন লিখে রেখেছেন—'অনেক মেহনৎ করে পাওয়া কোটি কোটি টাকা দামের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগার লুকিয়ে রাখলাম কালো মহলের সমাধি গহ্বরের নিচের ঘরে—মরণের পর ঠিক তার ওপরেই শোয়ানো হবে আমাকে। দুনিয়ার কেউ জানবে না। কিন্তু আমি পাব শান্তি।'

ইন্দ্রনাথ, শেখসাহেব আর মণিবেগম তিনজন তিনজনকে কথা দিয়েছেন, এই ফলক আর সেই গুপ্তধনের (!) কথা আর কাউকে বলবেন না।

আলহাজেন শুয়ে রয়েছেন ঠিক তার ওপরেই—বইঘরের ওপরে—এই মুহূর্তে।

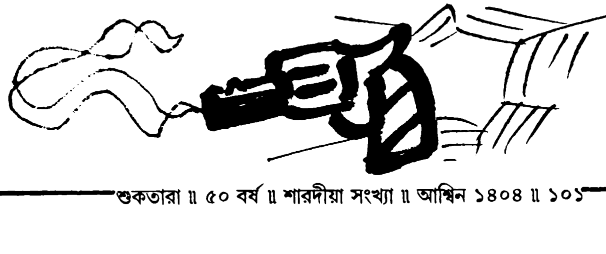

ছবিঃ সরোজ সরকার

অলৌকিক জল্লাদ

মানবেন্দ্র পাল

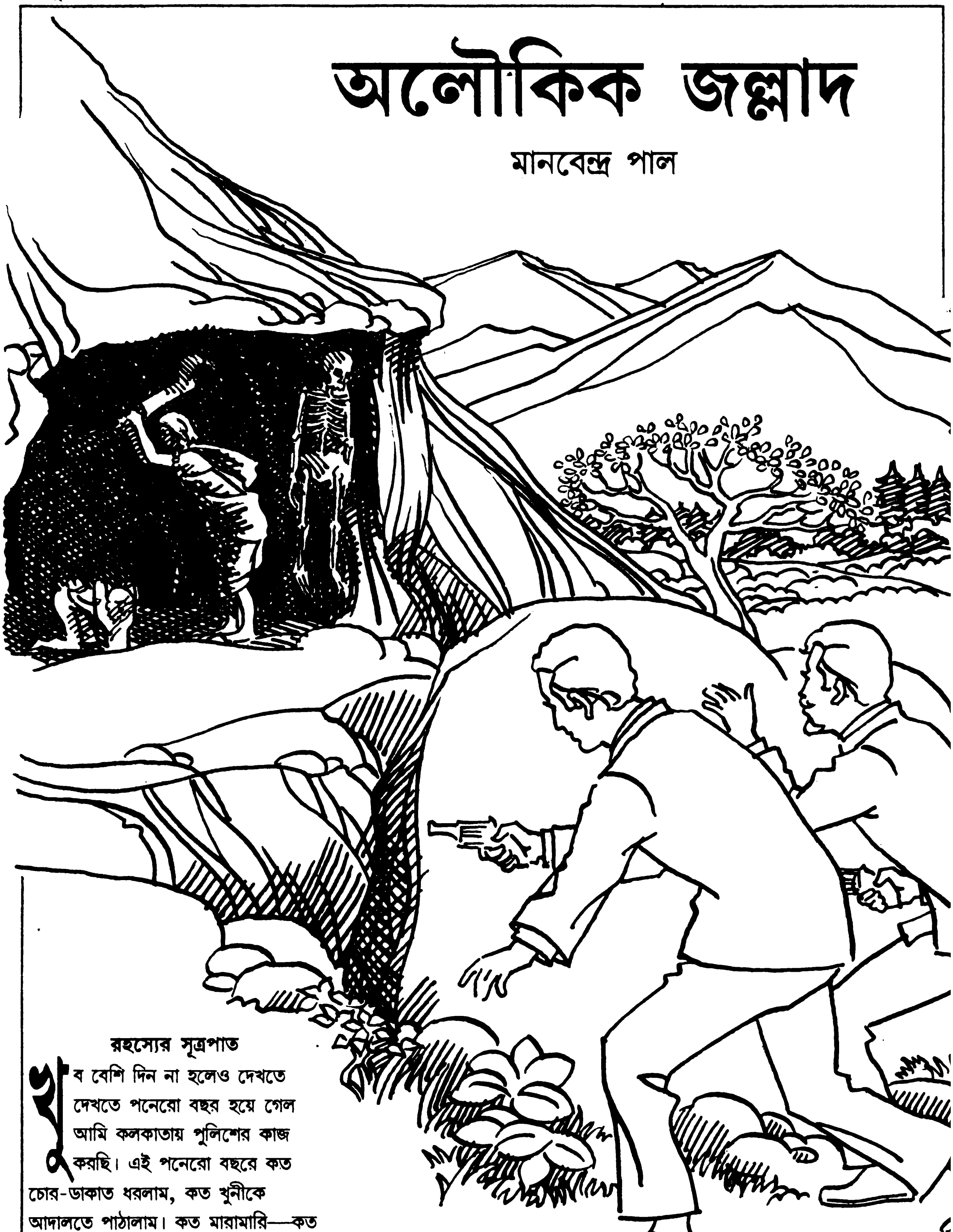

রহস্যের সূত্রপাত

খুব বেশি দিন না হলেও দেখতে দেখতে পনেরো বছর হয়ে গেল আমি কলকাতায় পুলিশের কাজ করছি। এই পনেরো বছরে কত চোর-ডাকাত ধরলাম, কত খুনীকে আদালতে পাঠালাম। কত মারামারি—কত রক্তপাত! ফলে মনটা যেমন কঠোর

তেমনি ভয়শূন্য হয়ে গেছে। সঙ্গে রিভলভারটা থাকলেই হলো।

শুধু চোর-ডাকাত-খুনী নিয়ে কারবার হলে মনে তেমন দাগ কাটত না। ওসব তো প্রায় সব পুলিশ অফিসারদের জীবনেই ঘটে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত জীবনে এমন কিছু অবিশ্বাস্য

ভয়াবহ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে যা কোনোদিন ভুলতে পারব না। এই ঘটনাগুলো লিখে রাখার জন্যেই আপাতত এক মাসের ছুটি নিয়ে নিরিবিলি দেশের বাড়িতে এসেছি।

জায়গাটা নিরিবিলি। কিন্তু বাড়িটা নিরিবিলি নয়। আমাদের এই দোতলা বাড়িটা খুবই পুরনো। বাড়ির পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত আমবাগান আর বাঁশঝাড়। এখনও গভীর রাতে শেয়াল ডাকে, খটাস বনবেড়াল ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্তে। বাড়ির পশ্চিমে একটা পচা পুকুর। তার এদিকে একটা ভাঙা শিবমন্দির। ছোটোবেলায় ঐ পুকুরপাড়ে, আসশ্যাওড়ার ঝোপে কত চোর-পুলিশ খেলেছি। তখন কি ভেবেছিলাম বড়ো হয়ে আমাকেই চোর-ডাকাত ধরে বেড়াতে হবে!

বাড়িটার সবচেয়ে আকর্ষণ বিরাট ছাদ। এই ছাদে কত ঘুড়ি উড়িয়েছি, ছোটাছুটি দাপাদাপি করেছি। আজও এ বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা ছাদেই খেলা করে।

এ বাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকে আমার মেজো আর ছোটো ভাই তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। এখন কলকাতা থেকে আমি এক মাসের জন্যে এসেছি স্ত্রী আর বারো বছরের দুষ্টু নোটনকে নিয়ে।

আমার ভাগে যে দুখানি ঘর তা উত্তর দিকে। একখানি ঘর আমার একেবারে নিজস্ব। ঐ ঘরে বসে আমি দেশ-বিদেশের যত অপরাধ-কাহিনী পড়ি। আর এখন এই ঘরে বসেই লিখছি আমার জীবনে ঘটে-যাওয়া বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা।

আমার ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে আমাদের উঠোনের ওপর নারকেল গাছটা। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি গাছটাকে। এখনও দিব্যি

আছে। নারকেল গাছটা যেন আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। গাছটাকে আমরা সবাই ভালবাসি। তারপরেই চোখে পড়ে সেই বিশাল আমবাগান আর বাঁশঝাড়ের জঙ্গল। যতদূর দেখা যায় শুধু গাছের সবুজ মাথা। যখন সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসে তখন ঐ বাগান-জঙ্গলকে কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়। কেমন ভয় করে। মনে হয় যেন কোনো অজানা আতংক ওৎ পেতে আছে গাছগুলোর ডালে ডালে।

লেখাটা শুরু করা উচিত ছিল অনেক আগেই। কিন্তু হঠাৎ নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে যাবার সুযোগ এসে গেল। এখন বর্ষাকাল। বর্ষাকালে কেউ বড়ো একটা পাহাড়ে যায় না। কিন্তু আমারই সহকর্মী কলকাতার পুলিশ অফিসার প্রণবেশ যাচ্ছে জেনে আমিও তার সঙ্গ নিলাম। সর্বসাকুল্যে ওখানে আমরা দশ দিন ছিলাম। ওখানে নানা জায়গায় ঘুরেছি। বেশ উপভোগও করেছি। কিছু ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তা তো হবেই। পুলিশ আর গোয়েন্দা যেখানেই যায়, তাদের মনোমতো একটা কিছু ঘটে থাকেই। যাই হোক মোটামুটি আনন্দ করে দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছি। একটি লাভ হয়েছে। একটি নেপালী ছেলে পেয়েছি। বছর তেরো-চোদ্দ বয়েস। খুব কাজের ছেলে। নাম রাজু সুব্বা। একে পেয়ে আমার স্ত্রী আর নোটন খুব খুশি। রাজু একে নোটনের প্রায় সমবয়সী, তার ওপর বিদেশী। তাই ওর সঙ্গে নোটনের যত ভাব তত কৌতূহল ওর বিষয়ে।

এখন সন্ধ্যেবেলা।

একটু আগেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে লিখতে বসেছি। লোডশেডিং বলে লণ্ঠনের আলোয় লিখছি। ভালোই লাগছে। কেননা এই সব খুনখারাপি, অলৌকিক কাহিনী লিখতে গেলে এইরকম লণ্ঠনের টিমটিমে আলোরই প্রয়োজন। পরিবেশটা বেশ জমে। বাড়ির বৌরা নিচে রান্না করছে আর গল্প করছে। আমার ঘরে আমি একা। লিখছি। ফাটা দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি অবাক হয়ে আমার লেখার কাজ দেখছে।

হঠাৎ পিছন থেকে নিঃশব্দ পায়ে কেউ এসে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। মুহূর্তে ঘর অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে একটি বালক-কণ্ঠের প্রাণখোলা হাসি। বুঝলাম আমার দুষ্টু ছেলে নোটনের কাজ। ভয় দেখাবার জন্যে আলো নিভিয়েছে। কিন্তু—ঘরে আরও যেন কেউ রয়েছে।

অন্ধকারেই হাঁকলাম—কে রে? কে রে?

কোনো উত্তর নেই। নোটনের হাসিও থেমে গেল।

—নোটন, তোর সঙ্গে আর কে আছে রে?

উত্তর নেই।

হঠাৎ নোটন চিৎকার করে কেঁদে উঠল—ও গো মা গো! বাবা গো!

কী হলো! নোটন অমন করে কেঁদে উঠল কেন? পুরনো বাড়ি। কিছু কামড়ালো নাকি?

অন্ধকারেই আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম। টেবিলে ধাক্কা লেগে লণ্ঠনটা পড়ে গেল। কেরোসিন তেলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আন্দাজে নোটনের কাছে যাবার চেষ্টা করলাম। তার আগেই ওর কান্না শুনে নোটনের মা, ওর কাকা-কাকীমারা আলো নিয়ে ছুটে এসেছে। দেখলাম দেওয়ালের এক কোণে দাঁড়িয়ে নোটন তখনও ভয়ে কাঁপছে।

—কি হয়েছে?

প্রথমে উত্তর দিতে পারছিল না। তারপর শুধু বলল—ঘরে কিছু ঢুকেছিল।

—ঘরে কে ঢুকবে? কখন ঢুকবে?

—আমরা ঢোকার পরই—

—আমরা?

এতক্ষণে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে দেখতে পেলাম। সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

—কিন্তু ঘরে আর কে ঢুকবে? কাকে দেখে অমন ভয় পেলি?

নোটন বলল—আমি স্পষ্ট দেখেছি দুটো জ্বলজ্বল চোখ দরজার কাছে।

এই অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে আমরা আর মাথা ঘামালাম না। দোতলার এই ঘরে জ্বলন্ত চোখবিশিষ্ট জন্তু-জানোয়ারের ঢোকা সম্ভব নয়। সদর দরজা সন্ধে হতেই বন্ধ হয়ে যায়।

এবারে রাজু সুব্বার দিকে তাকালাম। সে একে রোগা ডিগ্‌ডিগে, কম কথা বলে, তার ওপর এইরকম কান্নাকাটিতে কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। ওর চোখের স্বাভাবিক চাউনিটাও একটু অদ্ভুত রকমের। ছোটো ছোটো সরু চোখ। চোখের মণি দুটো একটু বেশি উপর দিকে ওঠা। ফলে সাদাটাই বেশি দেখা যায়। যেন চোখ উল্টে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি অন্ধ। ওর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যাবে না ও রেগে আছে না ভয় পেয়েছে কিংবা খুশি হয়েছে।

রোগা রোগা সরু হাত, দেহের তুলনায় নারকেলের মতো লম্বাটে মাথাটা বেশ বড়ো। রোঁয়া রোঁয়া পাতলা চুল। খালি-গা হলে বুকের পাঁজরাগুলো একটা একটা করে গোনা যায়। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। মনে হয় একটু ঠেলা দিলেই ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই শরীর নিয়েই সে যে কী অসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

সুব্বা বাংলা বলতে না পারলেও বাংলা মোটামুটি বোঝে। খুব কম কথা বলে। যেটুকু বলে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে। মাঝে মাঝে সে নেপালী ভাষাও বলে ফেলে। যেমন—'চা'কে বলে 'চিয়া', 'কমলালেবু'কে বলে 'সন্‌তালা'।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—যদিও আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি তবু ও আমাকে যেন এড়িয়ে চলে। ডাকলে চট্ করে আসে না। সাড়াও দেয় না। যেন শুনতেই পায়নি। কেন এমন ব্যবহার তা বুঝতে পারি না। তবে নোটনের সঙ্গে ওর খুব ভাব। দুজনে গল্প করে, খেলা করে। নোটনের মাকেও পছন্দ করে। নোটন

কখনো ওকে ডাকে 'রাজু' বলে। কখনও ডাকে ওর পদবী ধরে—'সুব্বা'।

এই ক'দিনেই আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—ও আমাকে জব্দ করতে চায়। একটা ঘটনা বলি।—প্রায়ই আমার মাথার যন্ত্রণা হয়। তার জন্যে সবসময়ে কাছে ওষুধ রেখে দিই। যন্ত্রণাটা এবার অনেক দিন হয়নি। কিন্তু নেপাল থেকে ফিরে এসে উপরি উপরি তিন দিন যন্ত্রণা হলো। প্রথম দুদিন ওষুধ খাবার জন্যে সুব্বাকে জল দিতে বলেছিলাম। বেশ দেরি করে জল এনে দিয়েছিল। ওর সামনেই ওষুধ খেয়েছিলাম। কিন্তু তৃতীয় দিন ও জল এনে দিল না। ধমক দিলে ও এমন ভান করল যেন ও আমার কথা শুনতেই পায়নি। কিন্তু আশ্চর্য ওষুধের প্যাকেটটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ওষুধ খাওয়া হলো না। সারারাত্রি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করলাম। পরের দিন দেখলাম ওষুধের প্যাকেটটা পিছনের জঙ্গলে পড়ে আছে। কেউ জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সবাইকে ডেকে দেখালাম। কিন্তু কে ফেলেছে কেউ বলতে পারল না। নোটন আড়ালে সুব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিল। সুব্বা উত্তরে মাথা নেড়ে বলেছিল—নেহি। তবুও বোঝা গেল ওষুধটা ও-ই ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু কেন? ও তো নিতান্ত ছোটো শিশুটি নয়।

আরও আশ্চর্যের কথা—পরে জেনেছিলাম সেদিন সুব্বাই চুপি চুপি একা ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। নোটন যে ওকে চুপি চুপি ঘরে ঢুকতে দেখে কৌতূহলের বশেই ঘরে ঢুকেছিল, সুব্বা তা টের পায়নি। ঘর অন্ধকার করে সুব্বা আমাকে ভয় দেখাতে যাচ্ছে ভেবে নোটন জোরে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু যে ছেলেটা আমার কথা শুনতে চায় না, ডাকলে সাড়া দেয় না, কাছে ঘেঁষে না, সে কেন ঘর অন্ধকার করে আমার সঙ্গে মজা করতে এল?

এ কথা নিয়ে বাড়িতে কারও সঙ্গে আলোচনা করিনি। নিজের কাছেও সদুত্তর পাইনি।

এ ছাড়া অন্ধকার ঘরে কেন কি দেখে নোটন অমন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল তাও ঠিক আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। সত্যিই ও ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত চোখ দেখেছিল কিনা, কিংবা কার চোখ তাও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

ভয়ংকর ঘণ্টাকর্ণ

সুব্বাকে পাবার পিছনে একটা বিশেষ ঘটনা আছে।

নেপালের কাঠমাণ্ডুতে যে হোটেলে প্রণবেশ আর আমি উঠেছিলাম, সে হোটেলটি একেবারে শহরের মধ্যে। হোটেলে বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরা কাজ করত। আমাদের যে দেখাশোনা করত সে নেপালী হলেও বাংলা বুঝত আর মোটামুটি বলতেও পারত। সে বলত—এখানে বাঙালিবাবুরাই বেশি বেড়াতে আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাংলা শিখে গেছি।

ওর নাম জং বাহাদুর। ও বাংলা জানায় খুব সহজেই ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম। শুনে কষ্ট হলো ওদের মতো যারা হোটেলে কাজ করে তারা খুবই গরিব। তাই অল্পবয়সী ছেলেরাও কাজের খোঁজে ইণ্ডিয়ায় চলে যায়। শিলিগুড়ি, কলকাতাই তাদের লক্ষ্য।

আমার তখনই মনে হলো কলকাতায় আমার বাসার জন্যে ঐরকম একটা কাজের ছেলের দরকার। কলকাতায় তো চট্‌ করে কাজের ছেলে পাওয়া যায় না। তাই জং বাহাদুরকে বলেছিলাম—তোমার মতো একটা ছেলে পেলে আমিও নিয়ে যাই।

জং বাহাদুর বলেছিল—দেখব।

তারপর ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কাঠমাণ্ডুতে দেখবার কী কী আছে?

ও এক নিশ্বাসে অনেকগুলো জায়গার নাম করে গেল—বুড়ো নীলকণ্ঠ, স্বয়ম্ভু মন্দির, দক্ষিণাকালী বাড়ি, গুর্জেশ্বরী মন্দির, দেবী কুমারী বা জীবন্ত দেবী আর পশুপতিনাথ তো আছেনই।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখানে উৎসব কী কী হয়?

ও চটপট উত্তর দিয়েছিল—ত্রিবেণী মেলা, শ্রীপঞ্চমী, মাঘী পূর্ণিমা, মহাশিবরাত্রি, হোলি, নববর্ষ—

বাধা দিয়ে বলেছিলাম—তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখন কোনো উৎসব হয় কি?

—হয় বৈকি। খুব উৎসাহের সঙ্গে ও উত্তর দিয়েছিল—নাগপঞ্চমী, ঘণ্টাকর্ণ।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—ঘণ্টাকর্ণ কি?

ও হঠাৎ চোখ বুজিয়ে দু' হাত জোড় করে কারও উদ্দেশে যেন নমস্কার করল। তার পর যা বলল তার মানে হলো—ঐ পুজোটা হচ্ছে দানব আর অশুভ আত্মাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে। এই জুলাই-আগস্ট মাসে নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে অশুভ শক্তিরা ঘুরে বেড়ায় দানবের মূর্তি ধরে। তাদের সামনে পড়লে মানুষ, জীবজন্তু কারো রক্ষা নেই। তাদের আটকাবার ক্ষমতাও কারো নেই। তাই সেই দানব-দেবতাদের পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করে সসম্মানে বিদেয় করার চেষ্টা। এই জন্যেই ঘণ্টাকর্ণ পুজো।

এই সব অশুভ আত্মা, দানব-দেবতার কথা শুনে ঘণ্টাকর্ণ পুজো দেখবার খুব ইচ্ছে হলো আমাদের। ওকে বলাতে ও খুব উৎসাহ করে কোথা দিয়ে কেমন করে যেতে হবে তার হদিস বলে দিল। শেষে গলার স্বর নিচু করে বললে,—এখানে যাবেন যান। কিন্তু কেউ বললেও যেন দক্ষিণের ঐ উঁচু পাহাড়টার নিচে যাবেন না।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? ওখানে কী আছে?

ও একটু চুপ করে থেকে বললে, ঐ পাহাড়ের নিচে একটা নদী আছে। সেই নদীর ধারে একটা গুহায় ঘণ্টাকর্ণের এক ভয়ংকর মূর্তি আছে। ওখানেও ঘণ্টাকর্ণের পুজো হয়। কিন্তু সে পুজো খুব গোপন। বাইরের লোক তো দূরের কথা—সব নেপালীরাও ওখানে যেতে পারে না। গেলে আর তাদের ফেরা হয় না।

প্রণবেশ ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বললে যে, আমাদের দেশে যেমন নির্জন জায়গায় তান্ত্রিক, কাপালিকরা গোপনে কালীপুজো করে, এও সেইরকম। তান্ত্রিক, কাপালিকরা যেমন ভয়ংকর প্রকৃতির লোক হয়, এরাও সম্ভবত সেইরকম।

যাই হোক দিন তিনেক পরে জং বাহাদুরই একটা জিপের ব্যবস্থা করে দিল। ড্রাইভার আমাদের কাছাকাছি দু'তিন জায়গায় ঘণ্টাকর্ণ পুজো দেখিয়ে আনবে।

বেঁটেখাটো ফর্সা ধবধবে নেপালী ড্রাইভার। ঠিক যেন একটা মেশিন। চমৎকার ড্রাইভ করে নিয়ে গেল পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে।

দু'জায়গায় ঘণ্টাকর্ণ পুজো দেখলাম। পাহাড়ের নিচে খানিকটা সমতল জায়গায় বেশ লোকের ভিড়। সেখানে মাদলের মতো একরকম বাজনা বাজছে দ্রিম দ্রিম করে। সারা গায়ে কালো কাপড় জড়িয়ে মুখে ভয়ংকর একটা মুখোশ এঁটে একটা মূর্তি তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। আর একজন পুরোহিতের মতো লোক ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মারছে। জানলাম এইরকম করেই নাকি পুজোর মধ্যে দিয়ে অশুভ শক্তির দানবকে তাড়ানো হয়। ঘণ্টাকর্ণের নকল ভয়ংকর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই তেমন মনে দাগ কাটল না।

এবার আমাদের হঠাৎ ইচ্ছে করল সেই পাহাড়ের নিচে নিষিদ্ধ পুজোটা দেখার। কিন্তু ড্রাইভার রাজী হলো না। ওখানকার কথা তুলতেই ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ওকে আমরা অনেক করে বোঝালাম যে, কোনোরকম ভয় নেই। ভূত, প্রেত, দানব, অশুভ শক্তি যাই থাকুক না কেন, এই রিভলভারের কাছে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বলে কোটের পকেট থেকে রিভলভার বের করে দেখালাম। তাছাড়া আমরা যে দুজনেই কলকাতার পুলিশের অফিসার তাও জানিয়ে দিলাম।

তাতেও ও যখন ইতস্তত করছিল তখন একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর কোটের পকেটের মধ্যে গুঁজে দিলাম। আমাদের পঞ্চাশ টাকা মানে নেপালের পঁচাশি টাকা। এবার কাজ হলো। গরিব মানুষ ওরা। টাকা পেলে যমের দুয়োর পর্যন্ত যেতে পারে।

অগত্যা বিমর্ষ মনে ও গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়িতে একটা কালীঠাকুরের ছবি ছিল। ড্রাইভার সেই ছবিতে বার বার মাথা ঠেকাল। তারপর গাড়ি চালাতে লাগল।

চারিদিকে জঙ্গলভরা পাহাড়। তারই মধ্যে দিয়ে খুব সাবধানে জিপটা চালিয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার। কখনো অনেক উঁচুতে উঠছে, কখনও নিচে নামছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক যাবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। ডান দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতোই সবুজ ধানক্ষেত। বাঁ দিকে যে সরু নদীটা ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে, ড্রাইভারের কাছ থেকে তার নাম জেনে নিলাম—বিষ্ণুমতী নদী। ড্রাইভার সেই নদীর উদ্দেশে নমস্কার করল।

আবার সামনে পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। পাইন গাছে ঢাকা।

হঠাৎ ড্রাইভার জোরে ব্রেক কষল। আমরা ঝাঁকানি খেয়ে চমকে উঠলাম।

কি হলো?

অমন শক্তসমর্থ ড্রাইভার ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—বিল্লি!

বিল্লি! বেড়াল! তা একটা বেড়াল দেখে এত ভয় পাবার কি আছে?

দেখলাম বনবেড়ালের মতো মস্ত একটা কালো বেড়াল পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জিপের দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে পড়ল এ দেশের সংস্কারের কথা। নেপালে কোথাও বেড়াল দেখা যায় না। এ দেশে কেউ বেড়াল পছন্দ করে না। তাদের মতে বেড়ালের চেয়ে কুকুর ভালো। বেড়াল কোনো উপকার করে না। বরঞ্চ ক্ষতি করে। সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন যে ছুছুন্দ্র (ইঁদুর), তাদের বেড়াল হত্যা করে। কাজেই বেড়াল গৃহস্থের অকল্যাণ করে। আর যদি কালো বেড়াল হয় তাহলে রক্ষে নেই। কেননা, এদের বিশ্বাস, কালো বেড়াল অশুভ আত্মার ছদ্মরূপ।

যাই হোক প্রণবেশ গাড়ি থেকে নেমে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। বেড়ালটা ফ্যাঁস্ করে কামড়াতে এসেছিল কিন্তু দ্বিতীয় বার তাড়া খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

অনিচ্ছুক ড্রাইভার আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

গাড়ি চলেছে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে। কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি নামতে লাগল। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে পথ। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। পাশেই গর্ত। স্টিয়ারিং একটু এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষে নেই। গাড়িটা ডান দিকের আরও সরু পথ ধরে চলল। পাহাড়ের গায়ে অজস্র সল্লা, চিলোনী, মহুয়া আর বাজ গাছের জটলা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবার পর এক জায়গায় সরু রাস্তাটা তিন দিকে চলে গেছে। হঠাৎ ড্রাইভার সেখানে ব্রেক কষল। আমরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই দেখি রাস্তার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভার প্রণাম করছে।

কাকে প্রণাম করছে?

মুখ বাড়িয়ে দেখি ঠিক মোড়ের মাথায় একটা মস্তবড়ো খুঁটের ওপর লাল এক টুকরো ন্যাকড়া, ওদেশের একরকম হলদে রঙের জায়ে আর জবার মতো লাল লাল গোলাপ ফুল, সরু সরু ডালসুদ্ধু পাতা। ড্রাইভার সেইগুলোর উদ্দেশেই প্রণাম করছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে যেটুকু বুঝতে পারা গেল তা হচ্ছে এগুলো আমাদের দেশে তুক করার মতো। আজকাল অবশ্য তুকতাক বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু ছোটোবেলায় আমরা গ্রামে দেখেছি। রাস্তার মোড়ে এইরকম মন্ত্রপূত তুক সাজিয়ে রেখে দিত এক শ্রেণীর হিংস্র স্বভাবের মানুষ লোকের চরম ক্ষতি করার জন্যে। এই তুক মাড়ালে সর্বনাশ হয়। এও সেইরকমের তুক। ড্রাইভার জানাল এই তুক করেছে ভয়ংকর স্বভাবের তান্ত্রিক যে এই বিশেষ ঘণ্টাকর্ণ

পুজো করে। রাস্তার মোড়ে তুক সাজিয়ে রেখে লোককে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে—কেউ যদি ভুল করেও এতদূর এসে পড়ে, তারা যেন আর না এগোয়।

কাজেই আমাদের ড্রাইভার আর এগোতে নারাজ। অগত্যা আমরা নেমে পড়লাম। জেনে নিলাম এই পাহাড়টা থেকে এক কিলোমিটার নেমে গেলে বিষ্ণুমতী নদী। সেই নদীর তীরেই—

ড্রাইভার আর কিছু বলতে চাইল না। আমরা নামতেই ও গাড়ি ঘুরিয়ে নিল যাতে দরকার হলেই স্টার্ট নিতে পারে। এমনও বিপদ হতে পারে যখন গাড়ি ঘোরাবার আর সময় থাকবে না। শুধু তাই নয়, গাড়িটা রাখল আরও এগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে। আমাদের পরিষ্কার বলে দিল বেশি দেরি হলে সে এখানে গাড়ি নিয়ে থাকবে না। কেননা বেশি দেরি হলে বুঝে নেবে আমরা আর বেঁচে নেই। নিষিদ্ধ পুজো দেখতে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু।

কথাটা শুনে আমাদের গা শিউরে উঠল। সত্যিই কি সব জেনেশুনে আমরা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছি?

যাই হোক পকেটের ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে, মুঠোর মধ্যে ধরে আমরা নামতে লাগলাম।

ঢাল পথে আমরা হুড়মুড় করে নেমে চললাম। নিস্তব্ধ পাহাড়ে পথ। দু'পাশে যেন পাথরের আকাশচুম্বী খাড়া প্রাচীর। এখানে মরে পড়ে থাকলে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

প্রায় দশ মিনিট ধরে নামার পর আমরা নিচে বিষ্ণুমতী নদী দেখতে পেলাম। তবে তো আমরা এসে পড়েছি।

পাহাড়ে নদী। জল কম। শীর্ণ। নদীর বুকে ছোটো-বড়ো নানারকমের নুড়ি।

হঠাৎ প্রণবেশ আমার হাতটা চেপে ধরল।

—কি হলো?

—ওগুলো কি? বলে প্রণবেশ নদীর ওপারে আঙুল তুলে দেখাল।

দেখলাম।

মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে

উঠল। গোটা পনেরো মাথার খুলি ছড়িয়ে রয়েছে নদীর ওপারে। মাথার খুলিগুলো আকারে ছোটো।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। এত মড়ার মাথার খুলি এল কোথা থেকে?

আমরা আরও একটু নামলাম। দশ হাত নিচেই নদী। ওপারে পাহাড়টা আলসের মতো ঝুঁকে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা গুহার মুখ।...ঐ যে কয়েকজন লোক...কী ভয়ংকর সব চেহারা! কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। অথচ ব্যস্ত। সবার গলায় ছোটো ছোটো পাতার মালা।

হঠাৎ দেখি দু'জন লোক একটা ছেলেকে ধরে নদীর দিকে আসছে। হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি। ফর্সা রঙ। সুন্দর দেখতে। বয়েস বছর দশেক। খালি গা। শীতে কাঁপছে। গলায় লাল ফুলের মালা। ছেলেটির মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার? প্রণবেশকে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম।

—স্নান করাতে নিয়ে আসছে।

—ধরে নিয়ে আসছে কেন? গলায় মালা কেন?

প্রণবেশ ম্লান হাসল। বলল—বুঝতে পারছ না?

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না। ঘণ্টাকর্ণ পুজোয় ছেলেটাকে বলি দেবে। বলি এই প্রথম নয়। ঐ যে ছোটো খুলিগুলো দেখলাম, ওগুলোও হতভাগ্য ছেলেদের।

মুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে আমরা শিকারী কুকুরের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। দুজনের হাতে মুঠোয় শক্ত করে ধরা রিভলভার।

ওরা যখন ছেলেটাকে স্নান করিয়ে ফিরছে, আমরাও তখন সাবধানে হেঁটে হেঁটে নদী পার হলাম। এখনও পর্যন্ত ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।

আমরা যথেষ্ট তফাত রেখে এগোচ্ছি। একটু দূরে গিয়ে ওরা থামল। এটা সেই ঝুলে পড়া পাহাড়ের মুখ। দেখলাম পাহাড়ের গুহায় অন্ধকারে পাথরের মস্ত একটা পিদিম জ্বলছে। ভেতরে বোধ হয় ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি। মূর্তিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সামনে পুজোর আয়োজন। একজন মোটাসোটা লোক পুজো করছে। গায়ে লাল চেলি। গলায় লাল ফুলের মালা। সামনে—ঐ যে হাঁড়িকাঠ। আর ওটা কি? একটা বেঁটেখাটো মানুষের কংকাল ঝুলছে গুহাটার বাঁ দিকে। বাতাসে কংকালটা দুলছে। এইরকম একটা কংকাল প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখার কারণ কী বুঝতে পারলাম না।

প্রায় দশ মিনিট পর লোকটা পুজোর আসন থেকে উঠল। এবার লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জীবনে কখনো তান্ত্রিক বা কাপালিক দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। বড়ো বড়ো হিংস্র ভয়ংকর চোখ। কপালে সিঁদুর ল্যাপা। পেশীবহুল হাতে রুদ্রাক্ষের মালা।

লোকটি এগিয়ে আসতেই আরও যে চার-পাঁচ জন বসেছিল তারা উঠে দাঁড়াল।

তান্ত্রিক বলিদানের নির্দেশ দিল।

এবার ছেলেটাকে ধরে আনা হলো। পাছে চেঁচায় তাই মুখটা কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা।

প্রণবেশ অধৈর্য হয়ে চাপা গলায় বলল, আর দেরি নয়। অ্যাকশান।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আর একটু দেখি। হ্যাঁ, শোনো—তুমি আটকাবে তান্ত্রিকটাকে। আর আমি সামলাব ঐ পাঁচ জনকে।

হাঁড়কাঠে ছেলেটার মাথা আটকে দেওয়া হলো। এবার স্বয়ং তান্ত্রিক বিরাট একটা খাঁড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে আমরা দু'জনে দু'দিকে রিভলভার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

প্রণবেশ একেবারে তান্ত্রিকটার মুখোমুখি। আমি একা বাকি পাঁচজনের সামনে রিভলভার ঘোরাতে লাগলাম।

এই অকস্মাৎ আক্রমণে ওরা প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। তার পরেই ওরা আমার দিকে তেড়ে এল। আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলাম। পাহাড় কাঁপিয়ে গুলির শব্দটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল। ওরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট ওরা আর এগোচ্ছে না। মাথার ওপর গাছের ডালে একটা মস্ত কাক ক্যাঁক ক্যাঁক করে ডেকে উঠল। কাক যে এত বড়ো হয় তা জানা ছিল না। বোধ হয় পাহাড়ী কাক বলেই এত বড়ো।

চকিতে প্রণবেশের দিকে তাকালাম। তান্ত্রিক আর প্রণবেশ পাঁচ হাতের ব্যবধানে মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তান্ত্রিকের হাতে খাঁড়া। কিন্তু—এ কী! প্রণবেশ নেতিয়ে পড়ছে কেন? দেখি তান্ত্রিক ভয়ংকর দৃষ্টিতে প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। বুঝলাম তান্ত্রিক হিপনোটাইজ করছে। আর প্রণবেশের হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ছে।

তখনই আমি বাঁ হাতের রিভলভারটা অন্যদের দিকে তাক করে প্রণবেশকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলাম। ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিলাম। এখন আমি একা। শুধু দু' হাতে দুটো রিভলভার। প্রণবেশ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে মাটিতে বসে পড়েছে। তান্ত্রিক সেই একইভাবে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু প্রণবেশের চেয়ে আমার মনের জোর বোধহয় বেশি। আমি ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললাম—পিছু হটো।

ওরা শুনল না। কাপালিকও ছুটে এল আমার দিকে। আমি দ্রুত দশ পা পিছিয়ে গেলাম। কাকটা আবার বিকট শব্দে ডেকে আমাদের মাথার ওপর উড়তে লাগল। ওদের ভয় দেখাবার জন্যেই আমি উড়ন্ত কাকটাকে গুলি করলাম। দু' পাক ঘুরে কালো ডানায় রক্ত মেখে কাকটা এসে পড়ল তান্ত্রিকের মাথায়। তান্ত্রিক চমকে উঠে দু' পা পিছিয়ে গেল। আমি লাফিয়ে গিয়ে ওর বুকে রিভলভার ঠেকালাম। অন্যরা ভয়ে পালাতে লাগল। মুহূর্তে পাহাড়ের আড়ালে কে যে কোথায় গা ঢাকা দিল আর তাদের দেখা গেল না। প্রণবেশও ততোক্ষণে সামলে উঠেছে। তখন উদ্যত রিভলভারের সামনে তান্ত্রিক আর ছেলেটাকে নিয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম। রিভলভারের সামনে তান্ত্রিক বাবাজি আর মেজাজ দেখাল না।

তান্ত্রিকের এই অবস্থা দেখে আমাদের এই ড্রাইভার ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বোধহয় বোঝাতে চাইল তার দোষ নেই। সে নিরুপায়। তার ওপর তাঁর যেন ক্রোধ না পড়ে।

ড্রাইভারকে বললাম—সোজা থানায় চলো।

কিন্তু—লিখতে লজ্জা করছে, শেষ রক্ষা হয়নি। মাঝপথে হঠাৎই আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে ঢুলুনি এসেছিল। তন্দ্রা ছুটলে দেখি জিপের মধ্যে ছেলেটা রয়েছে। কিন্তু তান্ত্রিক নেই। তাকে আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসিয়েছিলাম। তবু কি করে যে পালাল বুঝতে পারলাম না।

থানায় গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সব কথা বললাম। পুলিশকর্তা আমাদের সাহসের জন্যে ধন্যবাদ দিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন খোঁজখবর নিয়ে ছেলেটিকে ওর বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন।

হোটেলে ফিরে জং বাহাদুরকে সব ঘটনা বললাম। আশ্চর্য! সে মোটেই খুশি হলো না। মুখের ওপর রীতিমতো ক্রোধের ছায়া নেমে এল। যেন ওখানে গিয়ে আর ছেলেটাকে বাঁচিয়ে আমরা অন্যায় কাজ করেছি। শুধু থমথমে গলায় বলল, কাজটা ভালো করলেন না স্যার! ফল পাবেন। বলেই চলে গেল।

পরের দিন আমাদের ঘরে জল দিতে এল একজন বয়স্ক লোক। বাহাদুরের কথা জিজ্ঞেস করায় ও জানাল দু'দিনের ছুটি নিয়ে ও কোথায় গিয়েছে।

মরুক গে। যে কেউ একজন আমাদের দেখাশোনা করলেই হলো।

দু'দিন পর জং বাহাদুর ফিরে এল। দেখি কপালে ওর সিঁদুরের লম্বা তিলক। বুঝলাম কোনো ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটল যার জন্যে ছুটি নিয়ে ঠাকুরবাড়ি যেতে হলো? তখনই—কেন জানি না সন্দেহ হলো সেই তান্ত্রিকের আখড়ায় যায়নি তো?

যাই হোক ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ঢুকছি, দেখি একটা রোগা-পটকা ছেলে দরজার কাছে বসে আছে। জিজ্ঞেস করায় সে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, সে বাড়ির কাজ খুঁজছে। যদি দরকার হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারে।

জং বাহাদুরকে ডাকলাম। শুনে বলল, আপনি তো কাজের ছেলে খুঁজছিলেন। তা এ যখন না ডাকতেই এসে পড়েছে তখন নিয়ে যান।

ওর চেহারা দেখে বললাম, ওর শরীর তো এই। ও কি কাজ করতে পারবে?

এ কথা শুনেই ছেলেটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ঐ প্রবল শীতে জামা খুলে ফেলে বার কতক ভল্ট খেলো। দুবার দুমদাম করে বড়ো বালতিটা নিয়ে পাঁই পাঁই করে নিচে নেমে গেল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এক বালতি জল নিয়ে দৌড়ে এসে পড়ল। আশ্চর্য! এক ফোঁটা জল চলকে পড়েনি। দেখে যত না খুশি হলাম, তার চেয়ে বেশি হলাম অবাক। ছেলেটা কি ম্যাজিক জানে, না পাহাড়ী ছেলে বলেই এই গোপন শক্তি?

ইতস্তত করছি—জং বাহাদুর বলল, ভাবছেন কী, নিয়ে যান একে। এর কাজ দেখবেন।

ওকে নিয়ে যখন গাড়িতে উঠছি, দেখি বাহাদুর দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। সে হাসিটা যেন কিরকম! ঠিক বিদায়ের হাসি নয়।

অশুভ সংকেত

আমার বন্ধু প্রণবেশ নেপাল থেকে ফিরে কলকাতাতেই থেকে গেল। আমি রাজু সুব্বাকে নিয়ে চলে এলাম দেশের বাড়িতে। প্রণবেশকে ছুটির মধ্যে অতি অবশ্য একবার আমার দেশের বাড়িতে বেড়াতে আসতে বলেছি। ও আসবে বলেছে।

যদিও জুলাই মাস। বৃষ্টির সময়। আকাশ মেঘলা। কিন্তু ঝড়ের সময় নয়। আশ্চর্য! স্টেশনে নেমে সুব্বাকে নিয়ে রিকশা করে অর্ধেক পথ যেতেই হঠাৎ ঝড় উঠল। সে কী ঝড়! সঙ্গে সঙ্গে মেঘের তর্জন-গর্জন। স্টেশনে ফিরে যাবার উপায় নেই। ঐ ঝড়ের মধ্যেই রিকশার পর্দা দু'হাতে চেপে ধরে আমরা এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ধরে একটা কিরকম পচা ভ্যাপসা গন্ধ পাচ্ছিলাম। এখন বুঝলাম গন্ধটা আসছে সুব্বার গা থেকে। আমার ভেতরটা কিরকম ঘুলিয়ে উঠছিল। কিন্তু উপায় কি? গরিবের ঘরের ছেলে। নোংরা। ভালো করে সাবান মেখে স্নান করতে পায় না। গন্ধ তো হবেই। তাছাড়া ওর গায়ের জ্যাকেটটাও জঘন্য।

যাই হোক রিকশাটা যখন ঝড়ের মধ্যেই বাড়ির কাছে এসেছে তখন হঠাৎ আকাশের বুক চিড়ে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটিয়ে প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। জীবনে কখনও বাজ পড়া দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। আর আমার প্রথম-দেখা বজ্রটি একটা আগুনের গোলা হয়ে প্রথমে আমাদেরই বাড়ির নারকেল গাছটার ওপর পড়ল। তারপর বাড়ির আলসে ভেঙে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে ভয়ার্ত চিৎকারের মধ্যে দিয়ে আমাদের রিকশাটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমি বিহ্বল—সন্ত্রস্ত। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই বজ্রপাত! কিন্তু—আশ্চর্য, সুব্বার কোনো বিকার নেই। সে তার ড্যাবড্যাবে সাদা চোখ নিয়ে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন প্রতিটা মুহূর্ত ও আমাকে ওর লক্ষ্যের মধ্যে রাখতে চাইছে।

এইভাবেই বিশ্রী একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে রাজু সুব্বা আমাদের বাড়ি ঢুকল। 'ঢুকল' না বলে বরঞ্চ বলি আমাদের বাড়িতে নিজের অধিকার পাকা করে নিল।

এখানে এসে প্রথম ক'দিন আমার চেনাজানা প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করলাম।

হেরম্ব ভট্টাচার্যের কথা মনে ছিল না। বৃদ্ধ মানুষ। সারা জীবন ঠিকুজি, কুষ্ঠী, করেরেখা গণনা করেই কাটালেন। ভালো জ্যোতিষী বলে ওঁর খুব নামডাক ছিল। আমি এ-সবে বিশ্বাসী কোনোদিনই ছিলাম না। তাই তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু উনি আমাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমি কোথায় থাকি, কি করি না করি সব খবরই রাখতেন। বোধহয় ভেতরে ভেতরে আমার ওপর টান ছিল।

সেদিন সকালে বাজার করে ফিরছি, দেখি হেরম্ব জ্যাঠা রাস্তার ধারে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে পাঁজি দেখছেন। আমায় দেখে সোজা হয়ে বসে বললেন—সুশান্ত না? কবে এলে?

অগত্যা বারান্দায় উঠতে হলো। প্রণাম করলাম। উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কাজকর্মের কথা জিজ্ঞেস করলেন। পুলিশের অফিসার হয়েছি শুনে তিনি যেন বিশেষ খুশি হলেন না। শুধু বললেন, ওসব চাকরি বড়ো দায়িত্বজনক। বিপদের সামনে এগোতে হয়। না এগোলে দুর্নাম, এগোলে জীবন সংশয়।

হেসে বললাম, তবু তো পুলিশের কাজ কাউকে-না-কাউকে করতেই হবে। কেউ পুলিশের কাজ না নিলে চোর-ডাকাতদের ধরবে কে?

আমার কথায় হেরম্ব জ্যাঠা একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। সসংকোচে বললেন, আমি ও ভেবে বলিনি। আসলে এই সব কাজে বিপদ আছে। তুমি আমাদের ঘরের ছেলে বলেই তোমায় বললাম। নইলে আমার কি?

আমি নিতান্তই ওঁকে খুশি করবার জন্যে ভান করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, দেখুন তো আমার শীগগিরই জীবন সংশয়ের যোগ আছে কিনা।

খুশি হওয়া তো দূরের কথা, উনি যেন একটু বিরক্ত হলেন। বুঝলেন আমি মজা মারছি। তিনি আমার হাতের দিকে তো তাকালেনই না, শুধু চোখের দিকে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থেকে বললেন, ভবিষ্যৎবাণী করাটা ছেলেখেলা নয় সুশান্ত। অন্য কেউ হলে উত্তরই দিতাম না। তুমি বলেই বলছি—জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা অতি সন্নিকট।

আমি হেসেই বললাম, কবে?

উনি গম্ভীরভাবে বললেন, এক মাসের মধ্যে।

আমি আবার হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বাঁচবার উপায়?

এই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে তাঁর ডাক পড়ল। স্নানের সময় হয়েছে। তিনি ঘরে যেতে যেতে বললেন—এক মাসের মধ্যে কখনও একা থেকো না। বলেই চলে গেলেন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এক মাসের মধ্যে একা থাকার সম্ভাবনা নেই।

অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা

যদিও হেরম্ব জ্যাঠার কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম তবু প্রথম ক'দিন মাঝে মাঝেই চিন্তা করতাম—কেন তিনি ঐ রকম ভবিষ্যৎবাণী করলেন! তিনি তো অন্তত আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাবেন না। তাহলে?

কারও কারও ভবিষ্যৎবাণী তো মিলেও যায় বলে শুনেছি। তাহলে—তাহলে কি সত্যিই এক মাসের মধ্যে এমন কোনো বিপদ আসছে যাতে আমার মৃত্যু হতে পারে?

কিন্তু তা সম্ভব কি করে? বিশেষ এটা তো কলকাতা নয় যে পথেঘাটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটা শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট গ্রাম। আমার নিজের দেশ। এখানে সবাই আমার চেনাজানা। কলকাতায় হলে না হয় বোঝা যেত চোর-ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এখানে? এখানে তো আমি ছুটিতে। কোথাও ডাকাতি হলেও নিশ্চয় আমায় ছুটতে হবে না। তাহলে এখানে বাকি এই কটা দিনের মধ্যে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কোথায়?

যাই হোক দিন দুয়েকের মধ্যেই আমার মন থেকে হেরম্ব জ্যাঠার কথাটা দূর হয়ে গেল।

কয়েক দিন কেটে গিয়েছে। সুব্বা এ কয়দিনেই আমাদের বাড়ির একজন হয়ে উঠেছে। যদিও ও এখন নিয়মিত তেল মেখে সাবান-দিয়ে স্নান করে, নোটনের পুরনো জামাগুলো পরে, তবু যখনই ও আমার ঘরে ঢোকে তখনই হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে সেই বিশ্রী গন্ধটা পাই। একদিন স্ত্রীকে গন্ধর কথা বললাম। স্ত্রী অবাক হয়ে বলল—কই না তো!

আমার স্ত্রী বা বাড়ির অন্য কেউ যখন গন্ধ পায় না তখন বুঝলাম ওটা আমারই ভুল। প্রথম দিনের সেই বিশ্রী গন্ধটা এখনও আমার নাকে লেগে আছে।

নারকেল গাছটা ছিল বহুকালের। কোন ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি। এত দিন পর তার মৃত্যু হলো বজ্রাঘাতে

আমারই চোখের সামনে। দেখতে পাই পাতাগুলো কিরকম জ্বলে গেছে। একটা একটা করে বালদাসুদ্ধ পাতা সশব্দে খসে পড়ছে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করলে চলবে না। যে জীবন-কাহিনীটা লিখতে আরম্ভ করেছি, তাড়াতাড়ি সেটা শেষ করতে হবে। ছুটি ফুরোতে আর বেশি দিন নেই। আর এও জানি কলকাতায় গিয়ে কাজের মধ্যে পড়লে লেখা আর শেষ হবে না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করব বললেই তো আর শেষ করা যায় না। এই যে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ঘটনাটা ঘটল, যত সামান্যই হোক, তবু তো ভুলতে পারছি না। কেন সুব্বা চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকেছিল, কেনই বা আলো নিভিয়ে দিয়ে আমায় ভয় দেখাতে চেয়েছিল, ঘরের মধ্যে কী এমন দেখে নোটন চিৎকার করে উঠেছিল? যতই সন্তোষজনক উত্তর পাই না, ততই কৌতূহল বাড়ে, ততই কেন যেন সুব্বাকে লক্ষ্য করি। ওকে বোঝবার চেষ্টা করি। ছেলেটা ঠিক আর-পাঁচটা ছেলের মতো নয়। ওর অদ্ভুত কাজকর্মের কিছু নমুনা নেপালের হোটেলে দেখেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম বটে তবু কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এখানে এসেও একদিন ঐরকম একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল।

দুপুরবেলায় নোটন ছাদে ঘুড়ি ওড়ায়। নেপালে ঘুড়ি ওড়ে কিনা জানি না তবে সুব্বা কখনো ঘুড়ি দেখেনি। তার খুব উৎসাহ। নোটনের সঙ্গে সেও ছাদে দাপাদাপি করে বেড়ায়।

সেদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে বসে লিখছিলাম। হঠাৎ বাড়ির পিছনে মড়মড় শব্দ করে কি যেন ভেঙে পড়ল। চমকে উঠলাম। কী ভাঙল! কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? ছুটে গেলাম ছাদে। ততক্ষণে আমার স্ত্রী, আমার ছোটো ভাই আর ভাইয়ের স্ত্রীও ছাদে ছুটে এসেছে। যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম তাতে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। আমাদের বাড়ি থেকে বিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটা আমগাছ। দেখি তারই একটা ডাল ধরে সুব্বা ঝুলছে। ঝুলছে নয়, দোল খাচ্ছে। আর নোটন লাটাই হাতে করে স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

কি ব্যাপার?

ব্যাপারটা এই—নোটনের ঘুড়িটা আমগাছে আটকে গিয়েছিল। কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। তখন নাকি সুব্বা পাঁচিলে উঠে এক লাফ দিয়ে আমগাছে গিয়ে পড়ল। ঘুড়িটা খুলে নিচে ফেলে দিল। আর তার পরেই গোটা ডালটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। রাজু ততক্ষণে আর একটা ডাল ধরে ঝুলতে থাকে।

আমাদের দেখে একটু যেন হেসে সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো ডাল থেকে দোল খেতে খেতে এক ঝাঁকানি দিয়ে ছাদে এসে পড়ল।

ওর এই তাজ্জব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, হতভাগা, তুই নিজে মরবি, আমাকেও জেলে পাঠাবি? বলে ঠাস্ করে

গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম।

কিন্তু—গাল কোথায়? মনে হলো যেন এক টুকরো শক্ত কাঠে চড় বসালাম।

রাজু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না। শুধু তার সেই অদ্ভুত চোখের মণিটা ওপর দিকে ঠেলে আমার দিকে তাকাল।

বাড়ির সবাই ওর এই দস্যিপনায় বিরক্ত হয়েছিল। কিছু না বলে তারা নেমে গেল। আমি ফের ধমক দিয়ে বললাম, এরকম করলে তোমায় আমি দূর করে দেব মনে রেখো।

রাজু সুব্বা কোনো জবাব দেয়নি।

ঘটনাটার কথা ক'দিন পর আর কারও মনে রইল না। সুব্বা দিব্যি বাড়ির কাজ করতে লাগল। নোটনের সঙ্গে খেলাধুলোও চলতে লাগল। কিন্তু আমার মন থেকে কিছুতেই একটা সংশয় ঘুচল না—ঐ রোগা হালকা ছেলেটার ভারে আমগাছের শক্ত ডাল ভেঙে পড়ে কি করে? নিজেকেই বোঝাই—হয়তো ডালটা পল্‌কা ছিল, ভেঙে পড়তই। রাজু উপলক্ষ মাত্র।

একটা জিনিস ইদানীং লক্ষ্য করছি—যে রাজুকে আমি নিয়ে এসেছিলাম সুদূর নেপাল থেকে—যার আদর-যত্নের অভাব এতটুকু রাখিনি, সেই রাজু সুব্বার ওপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা জাগছে। কেন জানি না ওকে আর সহ্য করতে পারি না। মনে হচ্ছে ওকে না আনলেই হতো। ও চলে গেলেই বাঁচি। আর আমার ওপরও রাজুর রাগ যে ক্রমশই বাড়ছে তাও বুঝতে বাকি থাকে না। সেই বিরাগ এখন চাপা আগুনের মতো ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। আমাকে একলা পেলে ও ওর ড্যাবডেবে চোখের সাদা অংশটা এমন বিশ্রী বড়ো করে তাকায় যে আমার কেমন ভয় করে। সন্দেহ হয়—ও কি সত্যিই মানুষের বাচ্চা?

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে অলৌকিক উপন্যাসখানা লিখছি, তার মধ্যে রাজু সুব্বার কথা লিখব কিনা ভাবছি। ভাবছি এই জন্যে যে, হয়তো সুব্বার ব্যাপার-স্যাপারগুলো কোনো অলৌকিক কাণ্ড নয়। হতে পারে অস্বাভাবিক। তাও অসম্ভব কিছু না। কেননা সুব্বা এদেশের ছেলে নয়। কোথায় হিমালয়ের কোলে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলঘেরা নেপালে ওর জন্ম। ওখানেই তার ছেলেবেলা কেটেছে। ওখানেই ও বড়ো হয়ে উঠেছে। হয়তো ওর মা নেই, বাবা নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই। নিতান্ত পেটের দায়ে আমার সঙ্গে এসেছে। কাজেই ও যদি লাফ দিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝোলে কিংবা অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি কাজ করে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। নোটনের মতো বাঙালি ঘরের আদুরে ছেলের সঙ্গে ওকে মেলাতে গেলে ভুল হবে। এও মনে রাখতে হবে ছেলেটা চোর নয়, টাকা-পয়সার দিকে বা খাওয়ার দিকে লোভ নেই। সবচেয়ে বড় কথা নোটনের সঙ্গে ওর খুব ভাব। কাজেই ছেলেটার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকলেও ভয় পাবার মতো অলৌকিক কোনো ব্যাপার নেই। তবু আমার ডায়রিতে ওর প্রতিদিনের আচার-আচরণ লিখে রাখছি।

এই যেমন সেদিন সন্ধ্যেবেলা—আমার মেজো ভাই, ছোটো ভাই এক নেমন্তন্ন বাড়িতে গেছে। আমার স্ত্রী আর দুই ভাইয়ের বৌ নিচে রান্নাঘরে। নোটন বাইরের ঘরে পড়ছে। আমি আমার ঘরে বসে লিখছি।

পল্লীগ্রাম। এর মধ্যেই যেন নিশুতি হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকচলাচল বিশেষ নেই। বাড়ির পিছনে দীর্ঘ আমগাছের বাগানটা অন্ধকারে গা মিশিয়ে যেন কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি একমনে লিখছি। হঠাৎ পিছনের দরজার কাছ থেকে ছোটো বৌমার উত্তেজিত গলা শোনা গেল—সুব্বা, কি করছ? চমকে পিছন ফিরে দেখি আমার ঠিক পিছনে রাজু দাঁড়িয়ে আছে দু' হাত বাড়িয়ে। ওর চোখের কটা রঙের মণি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মুখের ওপর একটা হিংস্র ভাব যা কখনো দেখিনি।

—কি চাই? ধমকে উঠলাম।

সুব্বা শান্ত গলায় শুধু বলল, ম্যাচিস। ম্যাচিস অর্থাৎ দেশলাইটা চায়।

—দেশলাই নিয়ে কি করবে?

উত্তরে ও জানাল ওর ঘরে নাকি আলো নিভে গেছে। মোম জ্বালবে।

ততক্ষণে ছোটো বৌমা ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে। সুব্বাকে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কখন আলো নিভল? এই তো দেখলাম আলো জ্বলছে।

আমি কিরকম ভয় পেলাম। একটা ফয়শালা করতেই হয়। চেয়ার থেকে উঠে বললাম, চল্ তো দেখি কেমন আলো নিভেছে?

ও দোতলার সিঁড়ির ঘরে থাকে। গিয়ে দেখি সত্যিই ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ছোটো বৌমা বললে, অবাক কাণ্ড! সুব্বা এ ঘরে যখন ঢুকে আসে, আমি তার পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছি। দেখেছি ওর ঘরে আলো জ্বলছে।

বললাম, তার পরেই হয়তো আলো নিভে গেছে।

ছোটো বৌমা কঠিন সুরে বললে—না। সুব্বা বলছে আলো নিভে গেছে বলেই নাকি দেশলাই চাইতে এসেছিল। মিথ্যে কথা। আবার বলছি ও যখন এঘরে এসে আপনার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, আমি দেখেছি তখনও আলো জ্বলছিল।

আমি আর কিছু বললাম না। রাজুর হাতে দেশলাই দিয়ে ওকে চলে যেতে বললাম।

পরের দিন ছোটো বৌমা আমার ঘরে এসে চুপি চুপি বলল, দাদা, রাজুর ব্যাপার-স্যাপার আমার ভালো ঠেকছে না। ও দেশলাই নিতে আসেনি। আমি স্পষ্ট দেখেছি ও আপনার গলা টিপে মেরে ফেলতে এসেছিল।

হেসে বললাম, না-না, তাই কখনো ও পারে? কেনই বা আমাকে মারবে? তা ছাড়া ঐ তো দুখানা হাড়-বের-করা চেহারা—

ছোটো বৌমা বলল, ঐ দুখানা হাড়েই ও কিন্তু ভেল্কি দেখায় ভুলবেন না। যাই হোক আমার বিবেচনায় যত শীগগির পারেন ওকে বিদেয় করুন।

বলে চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, এ কথা আর কাউকে না বলাই ভালো। ভয় পাবে। শুধু আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। বলেই চলে গেল।

এই একটা নতুন ভাবনা শুরু হলো। সুব্বা কি সত্যিই আমায় মেরে ফেলতে চায়? কিন্তু কেন? ওকে সেদিন মেরেছিলাম বলে? ওর এত বড়ো সাহস হবে বাড়িতে এত জনের মধ্যে আমায় মারার? তা হতে পারে না। ও হয়তো সেদিনের মতো ভয় দেখাতেই এসেছিল। ছোটো বৌমা দেখে ফেলায় ধরা পড়ে গেছে।

এর ঠিক তিন দিন পরে ছোটো ভাইয়ের কাছে চিঠি এল, সামনের সপ্তাহে ছোটো বৌমার বোনের বিয়ের দিন হঠাৎ ঠিক হয়েছে। দিন দশেকের জন্যে ওরা যেন চলে আসে।

ছোটো বৌমা মহা আনন্দে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেল। যাবার সময়ে আমায় গম্ভীর মুখে বলে গেল, রাজুকে তো সরাবেন না। ওর কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন।

আমিও চাই রাজুকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু সরাবার তো স্পষ্ট কারণ থাকা চাই। তা ছাড়া ও যাবে কোথায়? নেপালের সেই কাঠমাণ্ডুতে? ওখানে কি ও একা যেতে পারে? তা হলে ওকে একা কোথায় তাড়িয়ে দেব?

ছোটো বৌমা আমায় সাবধানে থাকতে বলল। কিন্তু নিজের বাড়িতে সবার মাঝখানে কি এমন সাবধান হতে পারি?

আরও কাণ্ড

সেদিন আবার একটা কাণ্ড হলো।

দুপুরবেলা। আমি আমার ঘরে একা বিছানায় বসে লিখছি। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। হঠাৎ মনে হলো ফ্যানের হাওয়াটা কিরকম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একভাবে গায়ে লাগছে না। তাকিয়ে দেখি পাখাটা এদিক থেকে ওদিকে দুলছে।

অবাক হলাম। এ আবার কি! ফ্যানটা এমন দুলছে কেন? ভাবলাম নিশ্চয় ভূমিকম্প হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে ভূমিকম্পের কথা জানাতে গেলাম। আর ঠিক তখনই পাখাটা ভীষণ শব্দ করে আমার বিছানার ওপর খুলে পড়ল। সেই শব্দে সবাই ছুটে এল আমার ঘরে। সবাই বলল, খুব ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। কিন্তু আর কারো ঘরে পাখা এতটুকু দোলেনি। সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

আমি লক্ষ্য করলাম সবাই ছুটে এসেছে। আসেনি শুধু রাজু।

কি মনে হলো জিজ্ঞেস করলাম, সুব্বা কোথায়?

কেউ বলতে পারল না। আমি তখনই ছাদে উঠে গেলাম। দেখি হতভাগা সরু পাঁচিলের ওপর হাঁটতে হাঁটতে পেয়ারা খাচ্ছে। পেয়ারা তো সব ছেলেই খায়। কিন্তু ও গোটা পেয়ারাটা মুখে পুরে ছাগলের মতো চিবোচ্ছে। আর সারা মুখে পেয়ারার বিচিগুলো বিচ্ছিরিভাবে লেগে রয়েছে।

—এখানে কি করছ? মেজাজ গরম করেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

ও কোনো উত্তর না দিয়ে পাঁচিল থেকে নেমে বাঁদরের মতো ছাদের ওপর লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকা হলো। সে তো দেখে অবাক। বলল, যে আঁকশিতে পাখাটা ঝুলছিল সেটা ঠিকই আছে। পাখাও খারাপ হয়নি। তা হলে পড়ল কি করে?

পড়ল কি করে সে কথা আলাদা। আমার কিন্তু মনে হলো আমাকে মারবার জন্যেই যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি একাজ করেছিল। আবার কোনো শুভ শক্তি আমাকে এ যাত্রাতেও বাঁচিয়ে দিল।

ছোটো ভাইরা ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেলে বাড়িটা অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেল। ওদের জন্যে হঠাৎ মন কেমন করতে লাগল। মনে হলো ওরা না গেলেই ভালো হতো। আর তো মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আছি। সবাই একসঙ্গে থাকলে ভালোই লাগত। বিশেষ করে ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী ঐ যে আমায় চুপি চুপি সাবধানে থাকার কথা বলে গিয়েছিল, সে কথা মনে করে আমার অস্বস্তি হতে লাগল। যাক, ক'দিন পরেই তো ওরা আসছে। তা ছাড়া বাড়িতে আমার স্ত্রী, নোটন ছাড়াও মেজো ভাই, মেজো ভাইয়ের স্ত্রী রয়েছে। কাজেই আমার কোনো অসুবিধে নেই।

সুব্বা বড়ো একটা এদিকে আসে না। আমার ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে যখন যায় তখন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে এমনভাবে আমাকে দেখে যেন আমি ওর দু' চক্ষের বিষ। আমার মনেও একটা পৈশাচিক ভাবের উদয় হয়। ইচ্ছে করে ওর সরু গলাটা টিপে ধরি।

মাত্র দুদিন পরেই মেজো বৌমার বাপের বাড়ি থেকে জরুরি খবর এল—ওর বাপের বাড়ির জমিজমা ভাগ হচ্ছে। সেইজন্যে কয়েক দিনের জন্যে মেজো বৌমাকে যেতে হবে। পরের দিনই মেজো ভাই, মেজো বৌমা ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে মেজো বৌমা হেসে বলে গেল, দিদি তো রইলেন। আপনার অসুবিধে হবে না। এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসব।

যাক মেজো ভাইরাও চলে গেল। এত বড়ো বাড়িটা এখন যেন আমায় গিলতে আসছে। এখন শুধু আমার স্ত্রী আর নোটন। রাজু তো দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেই।

ওরা না থাকায় আমার স্ত্রীর কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হলো না। এত বড়ো বাড়িটা খালি হয়ে গেল, তার জন্যে তার কোনো কষ্টও নেই। জোড়া বটতলায় শীগগিরই মেলা বসবে, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসবে। তাদের দেখতে যাবে সেই আনন্দেই মশগুল।

আর নোটন? সে তো রাজুর সঙ্গে দিব্যি ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

কিন্তু আমি? আমার যে শুধু খারাপই লাগছে তা নয়—সত্যি কথা বলব, পুলিশের লোক হয়েও আমার কেমন ভয় করছে। কিসের ভয় তা ঠিক বুঝতে পারি না। ঐ একফোঁটা ছেলে রাজু সুব্বাকে? পাগল হয়ে গেলাম নাকি? ওকে ভয় পেতে যাব কেন? ওর সাধ্য কি আমার ধারে-কাছে ঘেঁষে!

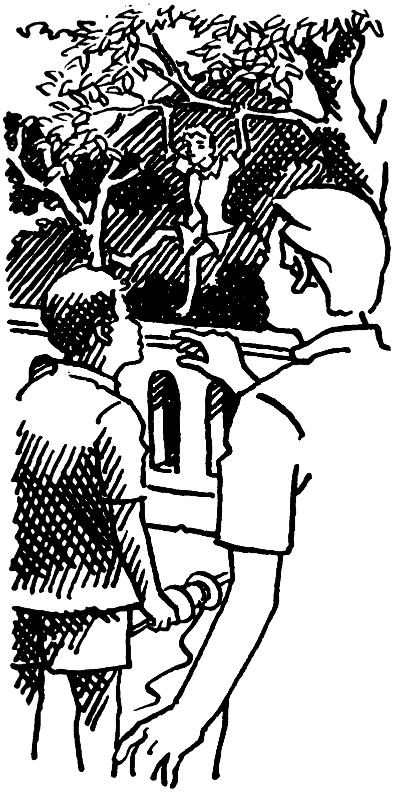

রহস্যময় রাজু

আমাদের এই গ্রামে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। বিশেষ করে এই সময়ে জোড়া বটতলায় বিরাট 'মোচ্ছব' হয়। 'মোচ্ছব' চলতি কথা। আসল কথা হচ্ছে 'মহোৎসব' (মহা উৎসব)। বহুকাল থেকে এই জোড়া বটতলায় এক পক্ষ কাল ধরে মেলা বসে। জোড়াবটের নিচে একটি ঠাকুর আছে। ঠাকুরের কোনো বিশেষ মূর্তি নেই। একটা পাথর আগাগোড়া সিঁদুর মাখানো।

এই মেলা উপলক্ষ করে পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহু লোক আসে। কাছেই বিরাট একটা দীঘি। সেখানে স্নান করে সবাই জোড়া বটতলায় পুজো দেয়। সেদিন সবাই দীঘির পাড়েই রাঁধাবাড়া করে খায়। মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক থেকে শুরু করে বাদামভাজা, পাঁপড়ভাজা সবই থাকে। মিষ্টির দোকানের তো ছড়াছড়ি। সবচেয়ে আকর্ষণের ব্যাপার—এই মেলায় দূর-দূরান্তর থেকে দুর্গম পথ পেরিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন। ভস্মমাখা দেহে, কপনিমাত্র পরে তাঁরা ধুনী জ্বালিয়ে সারা রাত ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে নাগা সন্ন্যাসীদেরও দেখা যায়। শোনা যায় তাঁরা হিমালয় থেকে নেমে আসেন।

এই সব ভিড়ভাট্টা মেলা, ঠাকুর পুজো, সাধুদর্শন আমার ভালো লাগে না। আমি পুলিশ অফিসার। আগেই বলেছি আমরা সন্দিগ্ধ স্বভাবের। পুলিশের কাজ করতে করতে মনের কোমল বৃত্তিগুলো, ভাবাবেগ সব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সবকিছুই হাস্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর আবার উল্টো। তিনি বাচ্চা ছেলেদের মতো মেলা দেখতে ভালোবাসেন। পুজো না দিলে তাঁর তৃপ্তি নেই। সাধু-সন্ন্যাসী পেলেই তাঁদের পায়ে আছড়ে পড়েন।

এখানে মেলা বসছে শুনে স্ত্রী বললেন, আমি যাব।

বললাম, যাও। দয়া করে সঙ্গে আমায় যেতে বোলো না।

স্ত্রী হেসে বললেন, তোমাকে দরকার নেই। আমি নোটন আর সুব্বাকে নিয়ে যাব।

—সেই ভালো, বলে লেখায় মন দিলাম। একটু পরে গৃহিণী ফিরে এসে বললেন, সুব্বা যেতে চাচ্ছে না।

বললাম, না গেল তো নাই গেল।

বাঃ! ছেলেটা এখানকার মেলা দেখেনি। দেখবে না?

বললাম, তার যেতে ইচ্ছে না করলে কি করবে?

স্ত্রী বললেন, তুমি একটু বল না।

বিরক্ত হয়ে বললাম, ওকে আমি কিছু বলতে পারব না।

অগত্যা গৃহিণী বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন।

হঠাৎই আমার মনে হলো—রাজু যেতে চাইল না কেন? বাড়িতে এখন ওর এমন কী রাজকার্য আছে?

বিকেলে গৃহিণী ফিরে এসে ঘটা করে মেলা দেখার কথা বললেন। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছেন। গুনে গুনে পঞ্চাশ জন সাধুর পায়ের ধুলো নিয়েছেন। খুব ভালো লেগেছে। পরে হঠাৎ গলার স্বর খাটো করে বললেন, সুব্বা তো যাব না বলল। কিন্তু ও গিয়েছিল। আমি ওকে দেখেছি। কিন্তু ও আমাকে দেখেও এড়িয়ে গেল।

এর উত্তর আমি আর কী দেব? চুপ করে রইলাম। শুধু বললাম, ও বড়ো পাকা ছেলে। দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

গৃহিণী আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন।

মেজো, ছোটো ভাইরা কেউ নেই। বাড়িটা বড্ড খালি-খালি লাগছে। কলকাতায় দুখানা মাত্র ঘরে আমার সঙ্গে শুধু নোটন আর নোটনের মা থাকে। মাত্র তিনজন। সে একরকম সয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানে এত বড়ো বাড়িতে মাত্র আমরা তিনজন আর হতচ্ছাড়া ঐ রাজুটা—মোট চারজন। বড্ড ফাঁকা লাগে। এই সময়ে প্রণবেশ যদি এসে পড়ত তাহলে খুব ভালো হতো। বলেও ছিল—আসবে। কিন্তু এল কই?

সেদিন বিকেলে ছাদে পায়চারি করছিলাম। সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু অন্ধকার হয়নি। হঠাৎ বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে এক ঝাঁক পাখির ভয়ার্ত চেঁচামেচি শুনে চমকে উঠলাম। পাখিগুলো অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন দেখবার জন্যে ছাদের ঐ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমাদের বাড়ির পিছন দিয়ে একটা

সরু ধুলোভরা রাস্তা এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেই দীঘির দিকে গেছে। পাঁচিলের কাছে গিয়ে দেখলাম রাজু ঐ রাস্তা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। আর গাছে গাছে যত পাখি ছিল, সব ওর মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরছে আর কিচ্‌মিচ্ করছে। রাজু কিন্তু সেদিকে তাকাচ্ছে না। হন্‌হন্ করে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি অবাক হলাম। এই ভর-সন্ধ্যেবেলা রাজু জঙ্গলের মধ্যে গেল কেন? কেনই বা পাখিগুলো অমন করে আর্তস্বরে চিৎকার করছিল? অনেক ভেবেও কোনো জুৎসই উত্তর খুঁজে পেলাম না।

নিচে নেমে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজুকে কোথাও পাঠিয়েছ?

স্ত্রী বললেন, না তো।

বললাম, তাহলে ওকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখলাম কেন?

স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, জঙ্গলে! জঙ্গলে কেন যাবে?

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। আর ও যখন ঐদিকে যাচ্ছিল তখন এক ঝাঁক পাখি ওর মাথার ওপর উড়ছিল আর চিৎকার করছিল।

—কী যে বল!

—ঠিক আছে। ও এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

—ও তো বাড়িতেই ছিল। দাঁড়াও দেখছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজুকে নিয়ে ফিরে এলেন, এই তো। এখানেই রয়েছে।

আমি অবাক। দশ মিনিট আগে ছাদ থেকে ওকে আমি স্বচক্ষে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছি। এর মধ্যে কখন ফিরে এল? তবে কি আমি ভুল দেখলাম? এতখানি ভুল হওয়া কি সম্ভব?

তবু জিজ্ঞেস করলাম, তুই কোথায় ছিলি?

ও ভাঙা হিন্দিতে বলল, আমার ঘরে।

—তুই পেছনের রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের দিকে যাসনি?

ও খুব সংক্ষেপে রুক্ষ গলায় বলল, নেহি।

আমার বেজায় রাগ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই রাগ প্রকাশের ছুতোও খুঁজে পেলাম। বললাম, সেদিন তোর মাইজি ওদের সঙ্গে মেলায় যেতে বলল। তুই বললি যাবি না। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে একা গিয়েছিলি। অথচ সেকথা বলিসনি। কেন? কেন একা একা মেলায় গিয়েছিলি?

ও আগের মতোই ঘাড় শক্ত করে শুধু বলল, নেহি।

আমার স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বললেন, তুই তো আচ্ছা মিথ্যেবাদী! আমি নিজে চোখে দেখলাম যেখানে সাধুরা বসেছিল সেখানে ঘুরছিলি। আর বলছিস কিনা—

ও ফের ঘাড় নাড়ল।—নেহি।

স্ত্রী বললেন, তুই ডাহা মিথ্যেবাদী। নোটনকে জিজ্ঞেস কর। সেও দেখেছে।

—নেহি—নেহি—বলতে বলতে রাজু যেন পালিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে স্ত্রী প্রথম বললেন, শোনো, রাজুকে আমার কেমন যেন লাগছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

স্ত্রী আবার বললেন, কিছু বলছ না যে?

—কি আর বলব? আমিও টের পাচ্ছি। ওর ঐ রোগা-পটকা শরীর নিয়ে দুমদাম করে কাজ করা, ছাদ থেকে লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝোলা, ছাদের সরু পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটা, হাঁটতে হাঁটতে মস্ত বড়ো হাঁ করে গোটা পেয়ারা চিবনো, ওর অস্বাভাবিক চোখ, আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকানো, মেলায় যাব না বলে লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া, সন্ধ্যেবেলায় দীঘির পথে জঙ্গলে ঢোকা, ওকে দেখে ভয় পেয়ে পাখির ঝাঁকের তাড়া করা—অথচ ও নাকি জঙ্গলের পথে যায়নি, ঘরেই ছিল—সবই রহস্যময়।

স্ত্রী শিউরে উঠে বললেন, কী হবে গো! আমার যে কেমন ভয় করছে। ওকে তাড়াও।

—ও নিজে থেকে চলে না গেলে কি তাড়ানো যায়? কোথায় যাবে?

স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এত বড়ো বাড়িতে এভাবে থাকতে আমার খুব ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটবে। কবে যে ওরা সবাই আসবে—

পরের দিন হঠাৎ আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে ওর এক ভাই এল। ওর মা খুব অসুস্থ। এখুনি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে।

শুনে চমকে উঠলাম। ওর মা অসুস্থ বলে নয়, আমাকে একা থাকতে হবে বলে।

যাবার সময়ে স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে বললেন, বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। তোমায় একা ফেলে যেতে কিছুতেই মন সরছে না। খুব সাবধানে থেকো। যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।

আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, কিচ্ছু ভেবো না। আমি একজন পুলিশ অফিসার। কেউ না থাক সঙ্গে রিভলভার আছে।

বললাম বটে কিচ্ছু ভেব না। কিন্তু নিজেই কিরকম দুর্বল হয়ে গেছি।

রিভলভার? রিভলভার কি সব ক্ষেত্রে কাজ দেয়?

গভীর রাতে পায়ের শব্দ

নোটনকে নিয়ে আমার স্ত্রী চলে যাবার পরই আমি যেন কিরকম অসহায় হয়ে পড়লাম। আমি কিছুতেই আর এ বাড়িতে টিকতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু যেন ঘটতে যাচ্ছে। একটা কথা ভেবে অবাক হলাম—কী অদ্ভুতভাবে একে একে সবাইকে চলে যেতো হলো। ছোটো ভাই গেল, মেজো ভাই গেল, শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী-পুত্রও গেল। ব্যাপারটা কি? মনে হলো কোনো অশুভ শক্তি পরিষ্কার মতলব করে একে একে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। একটি মাত্রই উদ্দেশ্য—আমাকে একা রাখা। আর তখনই আমার জীবনহানির ব্যাপারে হেরম্ব

জ্যাঠার সাবধানবাণী মনে পড়ল—এক মাসের মধ্যে জীবন সংশয় হতে পারে। এই সময়টায় যেন কখনো একা না থাকি।

কথাটায় তখন গুরুত্ব দিইনি। এখন গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। ভয় পাচ্ছি।

আবার এটাও পরিষ্কার নয়—কিসের জন্যে ভয়? এখানে আপাতত একা থাকলেও পাড়া-প্রতিবেশী আছে। দু'বেলা তারা আমার খোঁজ-খবর নেয়। আমিও যাই তাদের বাড়ি। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। বিপদের আভাস পর্যন্ত নেই, যত ভয় শুধু আমার বাড়ির ভিতরেই। এইটুকু নিশ্চিতভাবে বুঝেছি ঐ নেপালী ছোঁড়াটাই আমার কাছে অস্বস্তির কারণ। ওর হাবভাব, চাল-চলন কেমন যেন অদ্ভুত। তার চোখ দুটো ঠিক মানুষের চোখ নয়। তার চোখের দৃষ্টিতে মরা জন্তুর চাউনি। অথচ সে বাড়ির কাজকর্ম করে, আমার ছেলের সঙ্গে খেলা করে, ঘুড়ি ওড়ায়।

তাহলে? তাকে ভয় কিসের জন্যে?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারি না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি শ্রীযুক্ত বাবু সুশান্তকুমার সরকার, কলকাতার পুলিশ অফিসার—এই আমি কিন্তু এই খালি বাড়িতে টিকতে পারছি না। প্রতি মুহূর্তে এখন অকাল অপমৃত্যুর ভয় পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখছি—দুয়ারে মৃত্যুর দূত দাঁড়িয়ে।

প্রণবেশটাও যদি এই সময়ে এসে পড়ত!

ওরা চলে গেছে বেলা বারোটার সময়ে। যাবার আগে আমার স্ত্রী দু'বেলার মতো রেঁধে দিয়ে গেছে। কাজেই আজকের দিনটা চলে যাবে। কাল থেকে আমাকেই যা হোক কিছু রাঁধতে হবে।

ওরা চলে যাবার পর আমি সারা দুপুর ঘরে বসে রইলাম। আর লক্ষ্য রাখলাম সুব্বার দিকে। বাঁচোয়া সে একবারও আমার সামনে আসেনি। যদিও জানি সে বাড়িতেই আছে।

কেমন করে জানলাম ও বাড়িতে আছে? ঠিক বলতে পারি না। তবে ইদানীং টের পাই ও বাড়িতে থাকলে বাড়ির মধ্যে বাতাসটা কিরকম ভারী হয়ে থাকে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ও বাড়িতে থাকলে পরিষ্কার বুঝতে পারি এ বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট, কড়ি, বরগা, এমনকি কুয়োর জল পর্যন্ত থিরথির করে কাঁপে। আজ এখনও কাঁপছে। তাই বুঝতে পারছি ও বাড়িতেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কি করছে জানি না।

হঠাৎ আমার দম বন্ধ হয়ে এল। মাথাটা কিরকম ঝিমঝিম করতে লাগল। আমি সচকিত হলাম—পায়ের শব্দ পাচ্ছি...সে শব্দ কখনোই তেরো বছরের ছেলের পায়ের শব্দ নয়—যেন একটা ভারী বোঝা টেনে নিয়ে যাবার শব্দ। ...বুঝলাম রাজু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।

ও এল। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ও একবার দাঁড়াল। আমার ঘরের দিকে তাকাল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আমার বুকের মধ্যে রক্ত চলকে উঠল।

ও কি আমায় দেখে হাসল? ও কি হাসতে জানে? ওকে তো কখনো হাসতে দেখিনি। ওটা কি হাসি? দাঁতের মতো কতকগুলো কি যেন ওর ঝুলে-পড়া ঠোঁটের ওপর ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তারপরই শুনলাম ধুপধাপ শব্দ করে ও ছাদে চলে গেল। ছাদটা ওর বড়ো প্রিয় জায়গা।

বিকেলে জোর করে একটু বেরোলাম। কতক্ষণ আর ঘরে একা চুপটি করে বসে থাকা যায়?

কোথায় যাব? কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে কি খেয়াল হলো বাড়ির পিছনের বাগানের দিকে যে সরু রাস্তাটা গেছে, সেই রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

কাজটা ভালো করিনি। কেননা তখন সন্ধ্যের মুখ। অন্য কিছুর ভয় না পেলেও সাপের ভয় তো আছে। টর্চটাও আনিনি।

কিন্তু কেন এই অসময়ে এই পথে এলাম? বোধহয় মনের মধ্যে কালকের বিকেলের ঘটনাটা কৌতূহলী করে তুলেছিল। ঐ যে রাজু সুব্বা ঐ পথে যাচ্ছিল আর পাখির ঝাঁক ভয়ে চিৎকার করে ওকে তাড়া করছিল! বোধহয় ভেবেছিলাম ঐ পথে কী আছে তা দেখতে হবে।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক—হ্যাঁ, লোকই—আমার সামনে সামনে হেঁটে চলেছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই সন্ধ্যেবেলায় কে ওদিকে যাচ্ছে?

একটু ঠাওর করতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ও রাজুই। ঐ যে ওর নারকেলের মতো মাথা, রোঁওয়া রোঁওয়া চুল।

কিন্তু রাজু হঠাৎ এত বড়ো হয়ে গেল কি করে? আমি কি তবে ভুল দেখছি? চোখ রগড়ে স্পষ্ট করে তাকালাম। হ্যাঁ, রাজুই।

আমি ওকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু না ডেকে ওর কাছে যাবার জন্যে জোরে হাঁটতে লাগলাম। অবাক কাণ্ড—যতই জোরে এগোচ্ছি ততই ও দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে।

একটা কুকুর আসছিল সামনে দিয়ে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কুকুরটা রাজুকে দেখেই কেঁউ কেঁউ শব্দে ভয়ার্ত চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল।

কুকুরটা অকারণে ভয় পেল কেন? রাজু তো ওর দিকে ফিরেও তাকায়নি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম।

সন্ধ্যে সাতটা বাজতে-না-বাজতেই রাজুর ঘরে ওর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজের ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলাম।

রাজু তখন বাড়ি ছিল না। ও আজকাল কখন কোথায় যায় কিছুই জানায় না। ও আমাকে কেয়ারই করে না।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি। রাত নটা নাগাদ বাইরের দরজায় খিল দেবার শব্দ পেলাম। বুঝলাম শ্রীমান রাজু ফিরলেন। অমনি আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এই রহস্যময় ছেলেটার সঙ্গে আমায় একা সারারাত কাটাতে হবে! আগে মনে হতো ও আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এখন মনে হচ্ছে ও সবই করতে পারে। ওর ঐ হাড়-বের-করা শরীরে অমিত

শক্তি। যদি চোখের ভুল না হয়ে থাকে তা হলে আজই সন্ধ্যেবেলার আমবাগানের দিকে যেতে গিয়ে দেখেছি ওর অস্বাভাবিক লম্বা দেহটা। অস্বাভাবিক মানে—ওর বয়সী ছেলে অত লম্বা হতে পারে না। আর ও তো মোটেই লম্বা নয়। অথচ সে যে রাজুই তাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। এখন বুঝতে পারছি রাজু বলে যে ছেলেটাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে এনেছিলাম সে অন্য ছেলেদের মতো নিতান্তই রক্তেমাংসে গড়া বালকমাত্র নয়। ওর ভেতর একটা পিশাচ লুকিয়ে আছে। এখন আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে—প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলা আমি যখন লিখছিলাম, রাজুই তখন নিঃশব্দে পিছন থেকে এসে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল আমায় গলা টিপে মারবার জন্যে। এমনিতে সে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন হিংস্র হয়ে ওঠে তখন ওর চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। সেদিন নোটন যে জ্বলন্ত চোখ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সম্ভবত সে চোখ রাজুরই।

এরপরই ছোটো বৌমা রাজুকে দেখেছিল ঘরের মধ্যে দু'হাত বাড়িয়ে ঢুকতে। রাজু যে আমাকে মারতেই ঢুকেছিল ছোটো বৌমা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেন? কেন আমায় মারতে চায়? ও যদি সত্যিই কোনো অশুভ আত্মার দেহ হয় তাহলে ও কেন নিজে থেকেই এল আমার সঙ্গে সুদূর নেপাল থেকে এই গ্রামে? আমাকে মেরে ফেলার জন্যে? আবার সেই একই প্রশ্ন থেকে যায়—কেন? কার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হলো কেউ যেন দরজা ঠেলছে। আমি কান খাড়া করে রইলাম। তারপর পরিষ্কার শুনলাম কেউ যেন ভারী ভারী পায়ের শব্দ করে আমার ঘরের সামনে চলাফেরা করছে। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবুও মড়ার মতো পড়ে

রইলাম। একটু পরে শুনলাম পায়ের শব্দটা নিচে নেমে যাচ্ছে।

তারও কিছুক্ষণ পরে শুনলাম নিচের খিড়কির দরজাটা কেউ খুলল।

দরজা কে খুলতে পারে রাজু ছাড়া? এত রাত্রে ও কোথায় বেরোচ্ছে?

এবার আমি এক লাফে উঠে পড়লাম। সাহস সঞ্চয় করলাম। মনকে বোঝালাম—এটা বিজ্ঞানের যুগ—আর আমি এক জন নামকরা পুলিশ অফিসার। আমি ভয় করব অলৌকিক ব্যাপারকে? রাজু আর যাই হোক তবু তো সে রক্তেমাংসে গড়া একটা বালক মাত্র! সে খায়, ঘুমোয়, আমার ছেলের সঙ্গে খেলা করে। তা হলে তাকে এত ভয় কিসের?

রিভলভারটা বালিশের তলা থেকে তুলে নিয়ে আমি দরজা খুলে বেরোলাম। লাইট জ্বাললাম না।

সিঁড়ির ঘরের সামনে এসে দেখি রাজুর ঘরের দরজা ঠেসানো। আস্তে আস্তে ঠেললাম। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। সেই সামান্য শব্দেই বুকটা কেঁপে উঠল। দরজা খুলে গেল। টর্চের আলো ফেললাম। কেউ নেই।

নিচে নেমে এসে দেখলাম খিড়কির দরজা হাট করে খোলা। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম কি করি? ঠিক করলাম রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দেখি। এই তো সোজা রাস্তা—কোথায় কত দূর ও যেতে পারে?

বেরোচ্ছিলাম—তখনই মনে হলো ও যদি বাগানের রাস্তায় গিয়ে থাকে?

না, ও রাস্তায় আমি এত রাত্রে যাব না। ঐভাবে দরজাটা ঠেসিয়ে রেখেই ওপরে উঠে এলাম। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

ভেবেছিলাম যতক্ষণ না ও ফেরে ততক্ষণ জেগে থাকব। কিন্তু কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল ছিল না।

সকালে উঠে দেখি রাজু অন্য দিনের মতোই ঘরদোর ঝাঁট দিচ্ছে। ও আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। ভাবলাম ওকে জিজ্ঞেস করি কাল রাত্রে ও কোথায় গিয়েছিল? কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতেও সাহস হলো না। কটা দিন যত দূরে দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

কিন্তু নিচে নেমে আসতেই চমকে উঠলাম। উঠোনের ঠিক মাঝখানে ওটা কি?

অবাক কাণ্ড! কে একটা বলিদানের হাঁড়িকাঠ পুঁতে রেখেছে।

এর মানে কি? বাড়িতে হাঁড়িকাঠ কেন? কার এত বড়ো সাহস এটা এখানে পুঁতল?

তখনই হাঁকলাম, রাজু!

রাজু এসে দাঁড়াল। ভাবলেশহীন মুখ। ওর চোখের সাদা অংশটা ড্যাবড্যাব করে নড়ছে।

—তুই ওটা এখানে পুঁতেছিস?

—নেহি। বলে সে তখনই চলে গেল।

ওর এত দূর স্পর্ধা আমার সামনে আর দাঁড়াল না! অনুমতি না নিয়েই চলে গেল!

আমি তখনই হাঁড়িকাঠটা উপড়ে বাড়ির

বাইরে ফেলে দিলাম।

রাত্রে বাগানের পথে

নোটন আর নোটনের মা চলে গেছে মাত্র তিন দিন। কবে ফিরবে জানি না। যদি নোটনের দিদিমার খারাপ কিছু হয় তাহলে কবে ফিরবে কে জানে! ছোটো ভাইরা চলে গেছে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। বিয়ে কি এখনও মেটেনি? মেজো বৌমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হতে আর কতদিন লাগবে? আমি তো আর এভাবে একা থাকতে পারি না। অথচ আমাদের পাড়াতে প্রতিবেশীরা রয়েছে। তাদের কাছেঁ যাই আসি। ওদের এত কাছে থেকেও আমি কী নিদারুণ আতংকের মধ্যে রয়েছি, ওরা তা ভাবতেও পারে না। ওদের কিছু বলতেও পারি না। কেননা বললে ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমি এখন নিজের ঘরেই স্টোভ জ্বেলে যা হোক কিছু রেঁধে নিই। একা রান্নাঘরে যেতে সাহস হয় না। রাজুর খাবারটা রান্নাঘরে রেখে আসি। আমি যে ভয়ে ভয়ে আছি রাজু তা বুঝতে পারে।

এখন আবার মাঝে মাঝেই আর একটা প্রশ্ন জাগে, হাঁড়িকাঠটা পোঁতার কারণ কি? উত্তর পাই না। তখন আবার মন থেকে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলি।

বিকেলে একটু বেরোই। বড়ো রাস্তাটা ধরে হাঁটি। সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি এসে ঢুকি। তখন বাইরে থাকতে ভয় করে। আবার বাড়িতে থাকতেও ভয়। বাড়িতে তো সেই মূর্তিমান আতংকটি রয়েছে। সে বাড়ি থাকলেও ভয়—বাড়ি না থাকলেও ভয়। কোথায় কি মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে!

সেদিন রাত তখন সবে নটা। এরই মধ্যে পাড়া নিঝুম। আমি যৎসামান্য রাতের খাওয়া সেরে একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত দশটা নাগাদ লোডশেডিং হয়ে গেল। ব্যস্! ঘুরঘুট্টে অন্ধকার।

সন্ধ্যের পর থেকেই বাড়ির বাতাসটা ভারী হয়ে আছে। বাতাস ভারী হলেই নিশ্বাসের কষ্ট হয়। একটা চাপা কাশি গলা চেপে ধরে। এখন তাই হচ্ছে। বুঝলাম রাজু বাড়ি আছে। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। কেননা সন্ধ্যে পর্যন্ত ও ওর ঘরে ছিল না। বইটা বুকের ওপর রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মনে হলো বারান্দার দিকের জানলাটা কেউ খোলার চেষ্টা করছে। আমি রিভলভারটা হাতের মুঠোয় নিয়ে শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম।

শব্দটা থেমে গেল। তারপরই নিচের দরজাটা খোলার শব্দ। আমি লাফিয়ে উঠে রাস্তার দিকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম রাজু বেরোচ্ছে পা টিপে টিপে। আরও দেখলাম ও যাচ্ছে পিছনের রাস্তা দিয়ে বাগানের দিকে। তখনই আমি টর্চ আর রিভলভার নিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম।

আমি জানি কতবড়ো মারাত্মক ভুল করে সর্বনাশের পথে এগোচ্ছি। কিন্তু আজ আর কোনো বাধাই মানলাম না। আমার পৌরুষ অথবা নিয়তি আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল।

বিশ হাত দূরে রাজু চলেছে। আমিও নিঃশব্দে ওর পিছু পিছু চলেছি। রাজু বাগানের ভেতর ঢুকল। আমিও ঢুকলাম। শুকনো পাতায় যাতে শব্দ না হয় তার জন্যে খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগলাম। অন্ধকারে রাজু বার বার হারিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমি হুঁশিয়ার। আবার রাজুর সেই ঢ্যাঙা চেহারা। আমার গা শিউরে উঠল। কিন্তু না, আজ আমায় একটা ফয়শালা করতেই হবে। কোথায় ও যায় দেখতেই হবে। নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে দেখে নিলাম—আমি ঠিক আছি।

প্রায় মিনিট দশেক এগোবার পর দেখি এক জায়গায় আলো জ্বলছে। পরে বুঝলাম আলো নয়, আগুন। অবাক হলাম। নির্জন বাগানে আগুন জ্বালল কে?

ওদিকে রাজুর গতি দ্রুত হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওকে যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কি আমাকেও কেউ টানছে?

আর একটু এগোতেই দেখলাম একজন সন্ন্যাসী ধুনী জ্বেলে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি চট্ করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেলাম। চোখের সামনেই দেখলাম রাজু গিয়ে ওঁর পায়ের কাছে লম্বা হয়ে আছড়ে পড়ল। আর ঠিক তখনই ধুনীর আগুনের আভায় সন্ন্যাসীকে ভালো করে দেখতে পেলাম। চমকে উঠলাম—এ কী! এ যে কাঠমাণ্ডুর পাহাড়ের সেই তান্ত্রিক! কিন্তু—

কিন্তু কি করে সে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পথ চিনে চিনে আমার দেশে হাজির হলো?

আমার হাত-পা কিরকম অবশ হয়ে এল। বুঝলাম এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে আমি জ্ঞান হারাব। আর জ্ঞান হারালেই তান্ত্রিকের হাত থেকে রেহাই নেই।

আমি পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলাম। একবার রাজুর দিকে তাকালাম। দেখি একটি কংকালসার দেহ—দেহ নয়, মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

সে রাত্রে কি করে যে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম মনে করতে পারি না। তবু ওরই মধ্যে ইচ্ছে করেই বাইরের দরজায় খিল এঁটে দিয়েছি যাতে রাজু আর বাড়ি ঢুকতে না পারে। নিজের ঘরের দরজাতেও ভালো করে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ততক্ষণে কারেন্ট এসে গেছে।

ঘুমের ঘোরের মধ্যেই একটা কথা মনে হতে চমকে উঠে বসলাম। মেলার ক'দিন ঐ বাগানের মধ্যে দিয়েই লোকজন নদীর ধারে জোড়া বটতলায় পুজো দিতে গিয়েছিল। তখন বাগানে কেউ এই তান্ত্রিককে দেখেনি। সব তান্ত্রিক, সাধু, সন্ন্যাসীই ছিল নদীর ধারে। সম্ভবত ইনিও ওখানে ছিলেন।

মেলা তো শেষ হয়ে গেছে বেশ কয়েক দিন হলো। সব সাধুরাই ফিরে গেছেন। ইনি যাননি কেন? কেনই বা এখন বাড়ির কাছে আমবাগানে এসে একটা আস্তানা গেড়েছেন? রাজুর সঙ্গেই

বা চেনা হলো কি করে? রাজু মেলায় চুপিচুপি একা গিয়েছিল। সে কি তবে তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা করতে? তবে কি রাজু ঐ তান্ত্রিকেরই পাঠানো অলৌকিক জল্লাদ? আমাকে শেষ করে দেবার জন্যে অথবা আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিজেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে? রাজু শুধু ওঁকে নিশানা দিয়ে যাচ্ছে? তাহলে—তাহলে নির্জন বাড়িতে আমাকে বলি দেবার জন্যেই কি হাঁড়িকাঠ পোঁতা হয়েছিল?

সিঁড়ির ঘরে চোর?

পরের দিন সকালে দেখলাম বাইরের দরজার খিল বন্ধই আছে। বুঝলাম রাজু ফেরেনি। অথবা বাড়ি ঢুকতে পারেনি। খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

একটু বেলা হলে পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে বললাম, শুনছি একজন সাধু নাকি পিছনের বাগানের শেষের দিকে বসেছেন। একটু দেখে এসো তো। ছেলেটা তখনই যাচ্ছিল, ফের ডেকে বললাম, ওঁর কাছে যাবার দরকার নেই। দূর থেকে দেখো।

ঘণ্টাখানেক পরে ছেলেটা ফিরে এসে জানাল বাগানে কেউ নেই।

—কেউ নেই! তুমি জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলে তো?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, পোড়া কাঠ, ছাই পড়ে আছে দেখলাম।

নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, আপদ বিদেয় হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজুও।

কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—সাধুবাবা আবার এসেছেন। ধুনী জ্বালিয়ে বসেছেন। এবার অত দূর নয়, আরও কাছে।

আমি চমকে উঠলাম। ওকে বললাম, ঠিক আছে।

ছেলেটা চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। অদ্ভুত তো ঐ তান্ত্রিকটা। কেমন ধীরে ধীরে তিন মাইল দূরে জোড়া বটতলা থেকে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। কেউ বাধা

দেবার নেই। এবার তো বাড়ি এসে ঢুকবে!

তাহলে একা আমি এখন কি করব?

তখনই সাহস এনে মনকে বোঝালাম—এটা যে নেপালের নির্জন অরণ্য বা পাহাড়ের গুহা নয়, এটা যে কলকাতার কাছেই কোনো লোকালয়—একটা হাঁক দিলে দলে দলে লোক ছুটে আসবে, এটা কি তান্ত্রিক বাবাজি জানেন না? নাকি লোকবল, অস্ত্রবলের চেয়েও ওঁর কাছে আরও কোনো অব্যর্থ ভয়ংকর মারণাস্ত্র আছে যা দিয়ে আমায় শেষ করে দিতে অসুবিধে হবে না? চোখের সামনেই তো দেখলাম কী আশ্চর্য ক্ষমতায় রাজুকে অস্ত্র বানিয়ে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছিল! রাজু কি সত্যিই রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, না কোনো মৃতদেহ? তান্ত্রিকের পায়ের কাছে ও যখন আছড়ে পড়েছিল তখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম ওর দেহে প্রাণ ছিল না। একটা শুধু চামড়া-ঢাকা কংকাল যেন ঝপ্ করে পড়ে গেল।

আরও সন্দেহ হচ্ছে কাঠমাণ্ডুর হোটেলের জং বাহাদুরও ঐ তান্ত্রিকের দলেরই একজন। তান্ত্রিকের সঙ্গে সেইই হয়তো যোগাযোগ করে রাজু সুব্বা নাম দিয়ে একটা জীবন্ত কংকালকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। আর তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠল গুহার মুখে সেই ঝুলন্ত কংকালটা। বাতাসে দুলছে।

যাক, রাজু বিদেয় হয়েছে। আজ দু'দিন ও আর আসেনি। বাগানে তান্ত্রিকের কাছেও ওকে দেখা যায়নি। দেখা গেলে পাড়ার ছেলেটা বলত।

আজ রাত্রে পাড়ার একজনদের বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন ছিল। আমি একা থাকি বলে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন পাই।

রাত মাত্র আটটা।

আকাশে ঘন মেঘ থম্‌থম্ করছে। এখনি হয়তো বৃষ্টি নামবে।

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

রাস্তা ঘোর অন্ধকার। কোনোরকমে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে বাড়ি এসে তালা খুলে ঢুকলাম।

একতলার উঠোন পার হয়ে ডান দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সবে অর্ধেক উঠেছি—ওপরে সিঁড়ির ঘরে যেখানে সুব্বা থাকত সেখানে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

অবাক হলাম। তালাবন্ধ বাড়িতে কে কিভাবে আসতে পারে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোর নয় তো? ছাদ দিয়ে উঠে এসেছে?

ইস্! রিভলভারটাও কাছে নেই। এদিকে সদর দরজাটাও ভুলে খুলে এসেছি। এখন ওপরে উঠব, না পালাব? রুদ্ধ নিশ্বাসে কয়েক মুহূর্ত ধরে ভাবলাম। আর ঠিক তখনই সিঁড়ির ওপরে নজর পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমার গায়ের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। ও কার চোখ?

কিছু ভেবে দেখবার আগেই দেখি চোখ দুটো নেমে আসছে। শুধু চোখ নয়, একটা ছেলের দেহ। সে দেহে এতটুকু মেদ নেই, মাংস নেই, হয়তো বা রক্তও নেই। শুধু কালো কুচকুচে চামড়া দিয়ে ঢাকা। চিনতে পারলাম নারকেলের মতো মাথাটা দেখে।

রাজু সুব্বা!

তিন দিন পর কোথা থেকে রাজুর আবির্ভাব ?...কিন্তু—এ কি সেই রাজু, না তার প্রেতাত্মা ?

দুটো সরু সরু হাত বাড়িয়ে রাজু এগিয়ে আসছে। আগে দুবার চেষ্টা করেছিল পিছন থেকে। এবার আর চুপি চুপি লুকিয়ে নয়, একেবারে সামনে—মুখোমুখি।

পালাতে গেলাম। কিন্তু পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমি সিঁড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু করার নেই।...

রাজু মুখে একরকম অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর দুটো হাত তখন আমার গলার কাছে। আমি নিজের দু'হাত দিয়ে ওর সরু সরু হাত দুটো চেপে ধরতে গেলাম—কিন্তু বরফের ছুরির মতো ওর হাত দুটো আমার হাত অবশ করে দিল। আমি শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠলাম—বাঁচাও !

কাকে উদ্দেশ করে চেঁচালাম তা জানি না, তবে সাড়া পেলাম তখনি।

—সুশান্ত, তুমি কোথায় ? বড্ড অন্ধকার !

চমকে উঠলাম ! এ যে প্রণবেশের গলা !

আমি দ্বিগুণ জোরে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম—বাঁ—চা—ও !

সঙ্গে সঙ্গে নিচে থেকে জোরাল টর্চের আলো এসে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

—এ কী ! সুশান্ত ! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ? কি হয়েছে ?

হঠাৎ জ্বলন্ত চোখ দুটো নিভে গেল। টর্চের আলোয় রাজুকে পরিষ্কার দেখা গেল। রাজু আমাকে আর প্রণবেশকে ধাক্কা দিয়ে বিরাট এক লাফ মেরে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শেষ কথা

রাজু সুব্বাকে নিয়ে এই অলৌকিক কাহিনীও আমার ডায়রিতে লিখে রেখেছি। তবে শেষটুকু লেখা হয়নি।

পরের দিনই সবাই ফিরে এল। সকলেই আমার এ ক'দিনের ঘটনা শুনল। ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী বলল—আমি তখনই বুঝেছিলাম ও ছেলেটা মানুষ নয়, সাংঘাতিক কিছু। যাক, খুব বেঁচে গেছেন।

আমার স্ত্রী তখনো ভয়ে নির্বাক।

তখনও তিন দিন ছুটি বাকি ছিল। ভেবেছিলাম প্রণবেশকে নিয়ে এই তিনটে দিন এইখানেই কাটিয়ে যাব। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় সেই ছেলেটা এসে খবর দিল—সাধু আজও এসে বসেছে। এবার বাড়ির আরও কাছে।

শুনে সবারই মুখ শুকিয়ে গেল। এ কি আমায় শেষ না করে এখান থেকে যাবে না ?

সেদিনই আমার স্ত্রী সুটকেস গুছিয়ে নিলেন। বললেন—আর নয়। কাল ভোরের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে চলো। ওসব পাহাড়ে তান্ত্রিকদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না।

ভয়ে ভয়ে ভোরবেলাতেই একরকম পালিয়ে এলাম বলা চলে। যথাসময়ে ট্রেন এল। তাড়াতাড়ি সামনে যে বগী পেলাম তাতেই উঠে পড়লাম।

গার্ড হুইশল দিল। সবুজ ফ্ল্যাগ দুলে উঠল।

হঠাৎ নোটন চেঁচিয়ে উঠল—বাবা, দ্যাখো দ্যাখো সুব্বা !

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটা কংকাল যেন অস্বাভাবিক জোরে ছুটে আসছে ট্রেন ধরার জন্যে। অন্তত পিছনের বগীতেও যদি উঠতে পারে। কিন্তু তখনই ট্রেন চলতে শুরু করে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল। রাজু অল্পের জন্যে ট্রেনের নাগাল পেল না।

প্রণবেশ বলল—সুব্বা তোমাকে ছাড়বে না দেখছি।

নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছেছি। কিন্তু এখনও সুস্থির হতে পারিনি। কি জানি রাজু আবার এখানেও এসে না পড়ে !

ছবিঃ মদন সরকার

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ

কুইজ উৎসাহীদের সোনার খনি

ছোটদের বুক অফ নলেজ

(আদ্যন্ত পরিমার্জিত ও সংযোজিত সংস্করণ)

বইটিকে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। বিশাল জ্ঞানরাজ্যের প্রতিটি বিষয়ের সচিত্র সন্নিবেশ ঘটেছে প্রায় হাজার পাতার দামী কাগজে, ঝকঝকে অফসেটে ছাপা বইটিতে।

ছোটদের বুক অফ নলেজ বইটি অজস্র চিত্রসম্পদে সমৃদ্ধ, বিষয়বৈচিত্র্যে অতুলনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানকোষ শুধু বাংলা ভাষা কেন, কোনো ভারতীয় ভাষাতেই এর আগে প্রকাশিত হয়নি।

হাজার পাতার এই বিশাল গ্রন্থে পৃথিবী, সাগর, গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মহাকাশ, যানবাহন, ইঞ্জিনিয়ারিং, খেলাধূলা, শারীরবিজ্ঞান, লিপি ও মুদ্রণ, ভূগোল, ইতিহাস, বিশ্বসাহিত্য, চারুকলা, সংগীত, রঙ্গালয়, সিনেমা, শিল্পবাণিজ্য, স্বাধীনতা সংগ্রাম, নদনদী, ডাকটিকিট, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, বিনোদন, পরিবেশ ও পরিবেশ-দূষণ প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ ও সচিত্র আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে 'বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচী'তে ৩৬০০ শব্দ, গ্রন্থনাম, ব্যক্তিনাম স্থান পাওয়ায় বইটি অভিধান হিসেবেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাজে সাহায্য করবে। ছোট-বড় সকলের কাছেই বইটি একটি

অসাধারণ বিশ্বজ্ঞান কোষ

দাম □ ৩০০ টাকা মাত্র

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পুঁথি

সঙ্কর্ষণ রায়

সোনা খুঁজছি। ভুটান ও তিব্বতের সীমান্তে পাহাড়ী নদী-নালার বালিতে সোনার ঝলক দেখা গিয়েছে। যে পাথর থেকে সোনা বেরিয়ে এসে নদী-নালার বালিতে মিশেছে তা আছে পাহাড়ের হাড়-পাঁজরের মধ্যে। তার খোঁজে ভুটানের রাজধানী থিম্পুর উত্তরে লিংশি জং (লিংশির বৌদ্ধ দুর্গমন্দির) এবং নামসি-লা গিরিপথের মাঝখানকার এলাকায় ঘোরাঘুরি করছি।

নামসি-লা গিরিপথ যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প আছে। সেখানে অতিথি-তাঁবুতে (গেস্ট টেন্ট) থাকি, খাওয়া-দাওয়া করি জোয়ানদের (সাধারণ সৈনিক) লঙ্গরখানায়। সেনাবাহিনীর স্থানীয় অধিনেতা কর্নেল চাড্ঢার হুকুমে জোয়ানদের একজন আমার ঘোরাঘুরির সঙ্গী হয়। নাম তার ভীমবাহাদুর থাপা। সে এই জনমানবশূন্য অঞ্চলের প্রতিটি পাহাড়, পাথরের ঢিবি, নদী ও নালা চেনে। এখানকার বেশির ভাগ জায়গায় মানুষের পায়ে-চলা পথ নেই, আমি যে সব জায়গায় যেতে চাই সে সব জায়গায় সে ভাল্লুক, পাহাড়ী ছাগল ও চিতাবাঘদের পায়ে পায়ে তৈরি পথ ধরে নিয়ে যায় আমাকে।

একদিন ঘোরাঘুরি করতে করতে নামসি-লা গিরিপথের পুবদিকের চড়াই বেয়ে উঠছি, এমন সময় দেখা হয়ে গেল প্রাচীন ইতিহাসের গবেষক দীপংকর চট্টরাজের সঙ্গে। তিব্বত ও ভুটানের গুম্ফায় গুম্ফায় ঘুরে তিনি বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের ইতিহাসের উপকরণ খুঁজছিলেন। প্রথম আলাপে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি যা খুঁজছি আপনিও কি তা খুঁজছেন?

—না। আমি জবাব দিলাম, আমি খুঁজছি সোনা।

সোনা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না দীপংকর। কারণ তিনি খুঁজছেন প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি, যা তাঁর কাছে সোনার চেয়েও দামী। এই পাহাড়ের মাথায় আছে নামসি-লা গুম্ফা, সেই গুম্ফার লামাগুরু

তাঁকে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের লেখা একটি পুঁথি দেবেন বলেছেন।

লামাগুরু লামাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লামাদের গোষ্ঠীর অধিনেতা। নামসি-লা গুম্ফার লামাগুরু উত্তর ভুটান অঞ্চলের লামাদের গুরু। তাঁর সঙ্গে দীপংকরের আলাপ থিম্পুর একটি ধর্মসভায়। এই সভায় দীপংকর শ্রীজ্ঞানের ওপরে তাঁর ভাষণ মন দিয়ে শুনছিলেন দীপংকর। তাঁর তিব্বতী ভাষায় দেওয়া ভাষণ একজন বাঙালী শুনছেন দেখে লামাগুরু নিজেই দীপংকরের সঙ্গে আলাপ করেন।

লামাগুরুর সঙ্গে আলাপ করে দীপংকর জানলেন যে, দীপংকর শ্রীজ্ঞানের লেখা কয়েকটি পুঁথি আছে তাঁর কাছে। বিশেষ করে যে পুঁথিটি দীপংকরের দরকার তা-ও আছে লামাগুরুর কাছে। পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি তিনি দীপংকরকে দিতে পারেন যদি তিনি বোঝেন যে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মমতে দীপংকরের জ্ঞান আছে।

তারপর শুরু হলো দুজনের মধ্যে প্রশ্নোত্তর। বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের বিষয়ে লামাগুরুর সব কটি প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দিলেন দীপংকর।

খুশি হয়ে লামাগুরু বললেন, তুমি দীপংকরও। এক হাজার বৎসর বাদে দীপংকর শ্রীজ্ঞান তোমার মধ্যে যেন নতুন জীবন লাভ করেছেন। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং দীপংকর শ্রীজ্ঞান আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন। ধন্য তুমি, যে বিশেষ পুঁথিটি তুমি খুঁজছ, দীপংকর শ্রীজ্ঞানের হাতে লেখা সেই পুঁথিটি আমি দেব তোমাকে। প্রতিলিপি নয়, মূল পুঁথিটিই দেব আমি তোমাকে। চলে এস তুমি আমার নামসি-লা গুম্ফায়...

লামাগুরুর সঙ্গে দীপংকরের আলাপের সময় একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম হাম্‌ফ্রে স্মিথ। তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের ওপরে লেখা পুঁথি সংগ্রহ করছিলেন। লামাগুরুকে তিনি বললেন, আমারও পুঁথি চাই, বৌদ্ধতন্ত্রের ওপরে লেখা পুঁথি। ভাল দাম দিয়ে কিনে নেব।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল লামা-গুরুর মুখ। তিনি বললেন, পুঁথি বিক্রি করা অতি গর্হিত কাজ, তা আমি কখনোই করি না।

—কিন্তু ডক্টর চট্টরাজকে আপনি একটি পুঁথি দেবেন বলছিলেন...

—ওর মতো জ্ঞানী ছেলেকে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পুঁথিটি অমনি অমনিই দেব। ওকে আমি দীপংকর শ্রীজ্ঞানের উত্তরসূরী বলে মনে করি...

—ওর চেয়ে আমি কম জ্ঞানী নই। প্রাচ্যবিদ্যায় পাণ্ডিত্যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি আছে আমার...

—তোমাকে দেখে কিন্তু আমার প্রাচীন পুঁথির ব্যবসায়ী বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি কিছুই দেব না...

নিমেষে টকটকে লাল হয়ে উঠল হাম্‌ফ্রে স্মিথের মুখ। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে আপনমনে গজরাতে থাকেন তিনি। আগুনের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর চোখ দুটি...

হামফ্রে স্মিথের জ্বলন্ত দৃষ্টি এই পাহাড়ের পাথরে পাথরে চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে যেন দেখতে পাচ্ছেন দীপংকর। এক জায়গায় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে নিকটেই আছেন হাম্‌ফ্রে, এসেছেন এখানে, ইতিমধ্যে হয়তো গুম্ফার কাছে পৌঁছেও গিয়েছেন...

—এ সব আপনার কল্পনা মিস্টার চট্টরাজ। আমি বললাম, আমরা তিনজন ছাড়া এখানে আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না...

—আছে স্যার, আছে—হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল ভীমবাহাদুর, বাতাসে গন্ধ পাচ্ছি...একজন নয়, অন্ততপক্ষে পাঁচজন...

—আর এক পাও এগোবে না।—ওপরে একটা পাথরের আড়াল থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, আমি হাম্‌ফ্রে স্মিথ এবং আমার সঙ্গীরা সকলেই সশস্ত্র। গুম্ফার দিকে এগোবার চেষ্টা করলেই আমাদের পিস্তলের গুলি তোমাদের তিনজনেরই মগজ বিঁধে ফেলবে। আশা করি বুঝতে পারছ যে নামসি-লা গুম্ফা এখন আমাদের দখলে। লামাগুরুকে বন্দী করে গুম্ফার পুঁথিপত্র সব আজই সরিয়ে ফেলব এখান থেকে...

—বলুন মিস্টার রায়, এখন আমাদের কি কর্তব্য ?—দীপংকর কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করেন।

—পশ্চাদপসরণ।—আমি জবাব দিলাম, ওদের সঙ্গে লড়তে তো পারব না...

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা নেমে এলাম পাহাড়ের নিচে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুসরণ করে নেমে এল কয়েকটি পাথর। বুঝতে পারি যে হাম্‌ফ্রে ও তার সঙ্গীরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে।

এমন সময় শুরু হলো বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ পাহাড়কে কাঁপিয়ে তোলে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের শব্দকে অনুসরণ করে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে আগুন লেগেছে পাহাড়ের চূড়ায়।

পাহাড়ের নিচে একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নিই আমরা তিনজন। ভীমবাহাদুর বললে, ওপর থেকে ধস্ নেমে আসতে পারে, কাজেই এর মধ্যে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকাই ভাল...

খানিকক্ষণ বাদে সব শান্ত হয়, গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরে আসি। ক্যাম্পের কাছাকাছি ভুটানীদের গ্রামের গাঁ-বুড়োর একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন দীপংকর, সেখান থেকে তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে এলেন অতিথি-তাঁবুতে। তাঁবুর বারান্দায় বসে পড়ে বললেন, গাঁ-বুড়োর ওখানে একা একা থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম এখানে...

—বেশ করেছেন।—আমি বললাম, আমিই আপনাকে এখানে এসে থাকার কথা বলব ভাবছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দীপংকর বললেন, সব কিছুই বোধ হয় ধ্বংস হয়েছে, পুঁথিপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে...

—পাহাড়ের ওপরে গিয়ে দেখলে বুঝতে পারব।—আমি বললাম, না দেখে আন্দাজে হা-হুতাশ করা উচিত নয়...

পরদিন সেনাবাহিনীর জোয়ানদের কয়েকজনকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে গুম্ফার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই। গুম্ফার বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, মহাকাল ও বিভিন্ন দেবতার মূর্তিগুলি গলে গিয়ে পিণ্ডে পরিণত হয়ে ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। গুম্ফার সব জিনিসপত্র, পুঁথিপত্র ইত্যাদি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে মনে হলো।

অনেক কষ্টে উদ্ধার করা হলো লামাগুরু, তিনজন লামা, হাম্‌ফ্রে স্মিথ ও তাঁর সঙ্গীদের মৃতদেহ। আগুনের দাহের স্বাক্ষর আছে তাঁদের সর্বাঙ্গে, লামাগুরু ছাড়া আর কাউকেই চেনা যাচ্ছে না।

মৃতদেহগুলির দিকে তাকিয়ে দীপংকর বললেন, এই বিস্ফোরণের জন্য এদের মধ্যে কে দায়ী? নিশ্চয়ই হাম্‌ফ্রে স্মিথ নন, লামাগুরু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি সব কিছু নষ্ট করে আত্মঘাতী হবেন তা কখনোই হতে পারে না। সম্ভবত এ লামাগুরুর কাজ। কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না প্রাণপণ চেষ্টা করেও। মৃতদেহ তো কথা বলে না...

—কথা বলছেন তিনি, স্পষ্ট শুনছি তাঁর গলার স্বর।—সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন দীপংকর।

ঘুম ভেঙে যায় আমার। ক্যাম্প খাটে শুয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি যে তাঁবুর মধ্যে অস্থির পায়ে পায়চারি করছেন দীপংকর।

আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ডাকছেন আমাকে তিনি, বলছেন পুঁথিগুলি বাঁচাবার জন্য মেরেছেন হাম্‌ফ্রেকে, আত্মঘাতী হয়েছেন নিজে...

—ও কি বলছেন আপনি!—আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

—ঠিকই বলছি। বলছেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রাখবেন, দেবেন আমাকে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের পুঁথি, তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে বলছেন....

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন দীপংকর। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোবার পোশাক পরে তাঁকে আমি অনুসরণ করি।

বাইরের অন্ধকারে একটি স্বয়ংপ্রভ ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছেন। অস্ফুট আলো ফুটে ওঠে তাঁর চলার পথে। নামসি-লা গিরিপথের মধ্য দিয়ে গুম্ফার পাহাড়ের ওপরে প্রসারিত হয় এই আলো। ছায়ামূর্তির পেছনে পেছনে এই আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাই আমরা।

—দাঁড়াও—ছায়ামূর্তি বললেন, এস আমার সঙ্গে...

এগিয়ে যান দীপংকর। চোখের নিমেষে গুম্ফার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মিলিয়ে যান আলোয় গড়া মানুষটি।

—পেয়েছি।—উত্তেজিত কণ্ঠে দীপংকর বললেনঃ সেই পুঁথি...পাথরের চাতালের ওপরে রাখা ছিল...

ছবি : বিজন কর্মকার

ব্যারেন

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দামানের ব্যারেন মশাই
খোশ মেজাজে ছিলেন সদাই।
দেড়শো বছর পরে হঠাৎ
ক্ষেপে গেলেন ফঠাৎ।

ঘুমভাঙা সেই অগ্নিগিরি
ছাই ওড়ান ঝিরিঝিরি।
ছোঁড়েন পাথর আগুন গ্যাস
ঠিক যেন এক ভিসুভিয়াস।

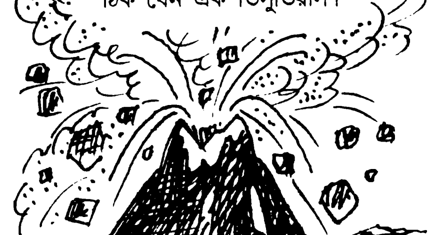

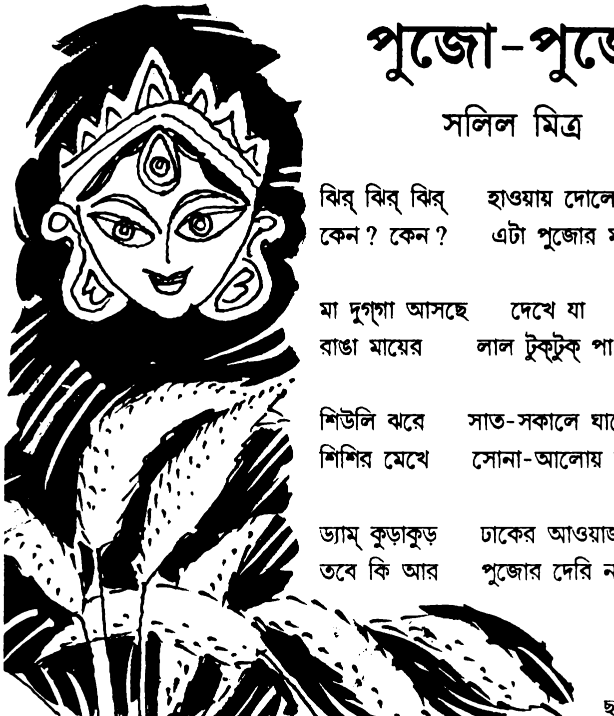

পুজো-পুজো

সলিল মিত্র

ঝির্ ঝির্ ঝির্ হাওয়ায় দোলে কাশ!
কেন? কেন? এটা পুজোর মাস!

মা দুগ্‌গা আসছে দেখে যা
রাঙা মায়ের লাল টুক্‌টুক্ পা!

শিউলি ঝরে সাত-সকালে ঘাসে—
শিশির মেখে সোনা-আলোয় হাসে!

ড্যাম্ কুড়াকুড় ঢাকের আওয়াজ পাই—
তবে কি আর পুজোর দেরি নাই?

ছবিঃ সুফি

মধ্যরাতে চিতার আতঙ্ক

পরেশ দত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন মিঃ হাগ অ্যালেন। মাথায় গুরুতর জখম নিয়ে ভর্তি হন এক হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে বাহিনীতে আর ফিরে যাননি। যুদ্ধের পর মিঃ অ্যালেন মধ্যপ্রদেশের মান্ধিখেরাতে একটা এস্টেট কিনে চাষবাসে মন দিলেন। সঙ্গে থাকত বিধবা বোন বাব।

এস্টেটের চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ক্ষেত। শহরে যেতে গেলে জঙ্গলের পথে প্রায়ই হাঁটতে হয়। একবার জব্বলপুর থেকে এস্টেটে ফেরার পথে রাত এগারোটা বেজে গেল। মিঃ অ্যালেন প্রায় নিরস্ত্র। জানতেন না জঙ্গলের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে এক জীবন্ত বিভীষিকা—চিতা।

নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই জব্বলপুর থেকে ফিরছেন মিঃ অ্যালেন। মুটকুলি থেকে এস্টেট প্রায় দু'মাইল হাঁটা পথ। রাত তখন এগারোটা। রাতের অন্ধকারে পথ চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জনশূন্য গ্রামের রাস্তা। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ তখন বিছানায়। থমথমে অন্ধকার রাত। গ্রামের মাঝ বরাবর আসতে মিঃ অ্যালেনের সঙ্গে দেখা হলো এক চাষীর। গরুর গাড়িতে শস্য বোঝাই করছে। প্রত্যূষে যাত্রা করবে। মিঃ অ্যালেন মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বললেন। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিনি ঘরে ফিরছেন শুনে চাষী চিন্তিত হলো। সে তাঁকে একটা লণ্ঠন ও কুড়ুল দিল। খুশি মনে দুটোই সঙ্গে নিলেন মিঃ অ্যালেন। লণ্ঠনের আলোয় পথ চলতে সুবিধা হবে আর কুড়ুলটা হাতে ঝুলে থাকলে নিজেকে খানিকটা নিরাপদ মনে হবে।

গ্রামের শেষে ফাঁকা মাঠ। মাথার ওপর নিবিড় কালো আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। তারার আলোয় অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। মাইল খানেক চলার পর মাঠ শেষ হয়ে শুরু হলো ঘন জঙ্গল আর নিরেট অন্ধকার। অন্ধকার এত গাঢ় যে কিছুই নজরে আসে না। লণ্ঠনটা কোনো কাজের নয়। তার কাচ কোনোদিনও পরিষ্কার করা হয়নি। ময়লা জমা কাচের ভেতর দিয়ে শুধু লণ্ঠনের শিখাটাই যা দেখা যায়।

কয়েকশো গজ চলার পর চাপা মচমচ শব্দ শুনতে পেলেন মিঃ অ্যালেন। নিশ্চয় কোনো বুনো জন্তু। অন্ধকারে তাঁকে দেখে দারুণ অবাক হয়েছে। ডান দিকের কোনো এক জায়গা থেকে হরিণের তীক্ষ্ণ, সতর্ক

ডাক শুনলেন। কিছু দূর থেকে চিতল হরিণের সাড়া পাওয়া গেল। মিঃ অ্যালেন সবসময় বন্য প্রাণীদের ডাক সতর্ক হয়ে শোনেন। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। শুনতে চেষ্টা করলেন, আর কোনো জন্তু বা চিতলের সাড়া পাওয়া যায় কিনা। কারো সাড়া পেলেন না ঠিকই তবে দু'বার বার্কিং ডিয়ারের ডাক শুনলেন। ওরা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। বার্কিং ডিয়ারের ডাক ক্রমশ খুব কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। মিঃ অ্যালেনের মনে হলো হরিণটা কোনো কারণে খুব ভয় পেয়েছে। হরিণের পেছন দিক থেকে বাতাস বইছে। বিপজ্জনক কোনো কিছুর গন্ধ হরিণের নাকে আসছে। হরিণ এগিয়ে এসে ফের ডাকল। মিঃ অ্যালেন নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। স্থির করতে পারলেন না, সামনে এগিয়ে যাবেন কিনা।

মিঃ অ্যালেন জানেন বিপদের গন্ধ পেলে, হরিণেরা অনেক সময় মানুষের সাহায্য চায়। মিঃ অ্যালেন সন্দেহ করলেন, কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বেশ শব্দ করে হাঁটা শুরু করে দিলেন। লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেলেন। তখনো হরিণটার পেছন থেকে প্রবল বেগে বাতাস বইছে। মিঃ অ্যালেন দাঁড়িয়ে মৃদু শিস দিলেন, হরিণের ডাক ডাকলেন।

দু'মিনিট সব চুপচাপ। হঠাৎ কিছুটা দূরে মৃদু শব্দ হলো। ধীরে ধীরে শব্দটা কাছে এগিয়ে এলো। আচমকা পাতার ভেতর থেকে একটা জন্তু উঁকি দিল। তারপর দ্রুত মিঃ অ্যালেনের কাছে এগিয়ে এলো। লণ্ঠনের কাছাকাছি আসাতে মিঃ অ্যালেন দেখলেন, একটা খুব ছোট বার্কিং ডিয়ার। সবে শিং গজাচ্ছে।

'কী হয়েছে রে?' মিঃ অ্যালেন তাকে কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলেন, 'জঙ্গলের মধ্যেও কী নিজেকে বাঁচাতে পারছিস না?'

বাচ্চা হরিণটার নাম সাম্মী। জন্মের পর থেকেই তিনি তাকে চেনেন। গ্রামের একটি লোক তাঁকে এসে জানিয়েছিল, বাচ্চাটাকে ফেলে মা-হরিণ চলে গেছে। আসলে কিন্তু তা নয়। কিছু লোভী মানুষের শিকার হয়েছিল মা-হরিণটি। তাকে মেরে নিজেদের উদরপূর্তি করেছিল তারা। আর বাচ্চাটা আশ্রয় পেয়েছিল মিঃ অ্যালেনের কাছে।

হরিণশিশুটির লম্বা লম্বা ঠ্যাং, দীর্ঘ কান। প্রথম দিন থেকেই ফিডিং বোতলে দুধ খেত। দারুণ খিদে। প্রথম কয়েক মাস সে বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করে খুশি ছিল। ক্রমশ বয়স বাড়তে মাঠে যেতে শুরু করল। বিপদের ভয় না থাকলে মিঃ অ্যালেনও তাকে দূরে যেতে মানা করতেন না।

সেই রাতে মিঃ অ্যালেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই সাম্মী রাতের বেলা জঙ্গলে যাতায়াত করছে। সকালে ঘরে ফিরে আসে, ঘুমিয়ে পড়ে বারান্দার ধারে।

মাঝরাতের জঙ্গলে বিপদের গন্ধ পেয়েছে সাম্মী। বুঝেছে এখন ঘরে ফেরাই নিরাপদ। মিঃ অ্যালেন তার গলাটা স্কার্ফ দিয়ে বাঁধতে সে আপত্তি করল না। তাঁর পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটতে লাগল। শ'খানেক গজ এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সাম্মী। স্কার্ফে টান পড়ল। গায়ের জোরে না টানলে এবার আর তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মিঃ অ্যালেনকে পিছুতে হলো। সাম্মীর গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। মিঃ অ্যালেনের হাঁটুর কাছে ঘেঁষে এল সে। মাথা উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল। বড় বড় চোখে ত্রাসের ছায়া। মিঃ অ্যালেন টানটান হয়ে কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গাছের ভেতর দিয়ে বাতাসের শনশন শব্দ ছাড়া কোনো দিকে আর কোনো সাড়া নেই।

শেষ পর্যন্ত সাম্মীকে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে চললেও সে খুব আড়ষ্টভাবে এগোতে লাগল। মাথাটা উঁচুতে তুলে সভয়ে বাঁ দিকে তাকাতে তাকাতে সে চলল। মিঃ অ্যালেন হঠাৎ শুনলেন, পেছনের বাঁ দিকে শুকনো পাতায় মড়মড় শব্দ। কিন্তু সেটা যে কিসের শব্দ স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। অগত্যা সাম্মীকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই।

মিঃ অ্যালেন সন্দেহ করলেন, খুব কাছেই কোথাও একটা চিতা লুকিয়ে রয়েছে। সে খুব বেপরোয়া। মানুষের গতিবিধির সঙ্গে সে পরিচিত। অন্ধকারে বেমালুম গা ঢাকা দিতে পারে। মিঃ অ্যালেন লণ্ঠনটা তুলে ধরে দোলাতে লাগলেন। পাতার শব্দ আর শোনা গেল না। কিছুই গোচরে এল না। সাম্মীকে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

কিন্তু সাম্মী কেন অমন ভয় পেল? ভাবছিলেন মিঃ অ্যালেন। পরমুহূর্তে রক্ত হিম করা প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনলেন। ঘন ঝোপঝাড় তোলপাড় করে একটা বিশাল জন্তু একদিকে ছুটে গেল। কয়েক সেকেন্ড শব্দটা শোনা গেল। স্থির হয়ে শুনলেন মিঃ অ্যালেন। লণ্ঠনটা মাটির দিকে নামালেন। সাম্মীকে তড়িঘড়ি ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনো সে সামনে এগোতে রাজী নয়। মাটিতে পেছনের পায়ের খুর চেপে বসিয়ে দিল। তাকে নাড়ানো শক্ত। নিরুপায় হয়ে পেছন থেকে তাকে ঠেলতে লাগলেন মিঃ অ্যালেন। এভাবে কিছুক্ষণ পরিশ্রম করার পর তিনি ঘেমে উঠলেন। মেজাজও চড়ে গেল।

মিঃ অ্যালেন দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবলেন, কেন এত শক্তিক্ষয় করছেন তিনি। চিতা ধারে-কাছে কোথাও নেই। থাকলেও সাম্মীর কোনো ক্ষতি করবে না। অতএব সাম্মীকে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাম্মীর গলার বাঁধন খুলে দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সে তখনো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার শরীরের পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে। তাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে মিঃ অ্যালেন তার পিঠ চাপড়ালেন, কানে হাত বুলিয়ে

দিতে লাগলেন। কিন্তু সাম্মী সেদিকে লক্ষ্যও করল না। ঘাড় শক্ত করে সামনের দিকে সোজাসুজি কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আচমকা পিছু হটল। মিঃ অ্যালেনের হাত থেকে স্কার্ফটি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত কণ্ঠে ডেকে উঠল।

সাম্মী হঠাৎ এমন ভীষণ জোরে টানাটানি শুরু করল যে মিঃ অ্যালেনকে ডানদিকে এক পাক ঘুরে যেতে হলো। সাম্মীকে ঠেলাঠেলি করার সময় একদিকে তার মাথাটা ঘুরে গেল। তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লণ্ঠনের আবছা আলোয় দেখলেন, সেই বিভীষিকা মূর্তি—সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ভয়ংকর চিতা।

হঠাৎ থাবা থেকে মাথা তুলল চিতা।

মিঃ অ্যালেন এতক্ষণে বুঝলেন সাম্মী কেন ভয়ে কাঁপছিল। কিছুতেই সামনে এগোতে চাইছিল না। মৃত্যুদূতের মতো ভয়ংকর চিতাটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘাপটি মেরে জঙ্গলে বসেছিল।

শেষ পর্যন্ত সাম্মীই মিঃ অ্যালেনকে রক্ষা করল। চিতা তখন লাফাবার উদ্যোগ করছে। সাম্মী স্কার্ফে জোর টান মারতেই মিঃ অ্যালেন পেছনে ঘুরে গেলেন।

এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! শূন্যে লাফ দিয়েও চিতাটা মিঃ অ্যালেনের নাগাল পেল না। চোখের পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল। মিঃ অ্যালেন চিতার ধারাল থাবা থেকে বেঁচে গিয়েও মনে করলেন, চিতাটা ইচ্ছা করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

নিমেষে লণ্ঠনের আলোর বাইরে চলে গেল চিতা। তারপর ঝোপের মধ্যে প্রবল ঝড় তুলল। মিঃ অ্যালেনের মনে হলো, চিতাটা যেন ভয়ানক রাগে একেবারে ফেটে পড়ছে। তার থাবার নাগালের মধ্যে যা কিছু পাচ্ছে, তাই উন্মত্তের মতো ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে। নিশুতি রাতের স্তব্ধ জঙ্গল ভয়ে কেঁপে উঠছে। হিংস্র শব্দ তখন মিঃ অ্যালেনের পেছন দিক থেকে আসছে। নিদারুণ আতঙ্কে সাম্মী তখন প্রাণ বাঁচাতে দারুণ অস্থির হয়ে পড়েছে।

আচমকা সাম্মী তীরবেগে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। মিঃ অ্যালেনও তার সঙ্গে ছুটতে বাধ্য হলেন। স্কার্ফের খুঁটটা তখনো তাঁর হাতে। যত শীঘ্র সম্ভব উন্মত্ত হিংস্র চিতাটার কাছ থেকে দূরে পালাতে চাইলেন তিনি। জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছে মিঃ অ্যালেন তাঁর চলার বেগ কমালেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে, ধীরেসুস্থে বাড়ি পৌঁছলেন। মিঃ অ্যালেন গোশালায় সাম্মীকে বাঁধলেন। অন্য সময় হলে সাম্মী নানারকম শব্দ করে প্রতিবাদ জানাত, কিন্তু তখন কিছু করল না।

মিঃ অ্যালেনকে দেখে তাঁর বোন কফি ও স্যান্ডউইচ বানাতে গেলেন। সেই অবসরে মিঃ অ্যালেন ভাবতে লাগলেন, চিতাটার কথা। তিনি তখনো উত্তেজিত। নেহাত কপাল জোরে তিনি বেঁচে গেলেও কোথায় যেন একটা গুরুতর গরমিল আছে। চিতাদের স্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে এই চিতাটির কোনো মিল নেই।

কফি ও স্যান্ডউইচ শেষ করে মিঃ অ্যালেন ফের জঙ্গলের দিকে যাওয়া মনস্থ করলেন। পায়ে হাল্কা রবারের জুতো পরে নিলেন। বাড়তি টর্চে নতুন ব্যাটারি ভরে রাইফেলের সঙ্গে জুড়ে নিলেন। মাঝরাতে নিবিড় অন্ধকার জঙ্গলে চিতার কাছাকাছি যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর। তিনি নিশ্চিত জানেন চিতাটা খুব বেপরোয়া ও বিপজ্জনক। সম্ভবত জখমী উপোসী চিতা। এত ক্ষুধার্ত যে খাবার জন্যে যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। চিতাটা তখনো নিশ্চয় জঙ্গলের ধারে-কাছে কোথাও আছে। চিতাটা আগের মতো শব্দ করলে সে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার আগে তিনিই তাকে খুঁজে পাবেন।

জঙ্গলে যাবার সময় মিঃ অ্যালেন সঙ্গে তিনটি কুকুর নিলেন। শিকারী কুকুর দেখলে চিতাটা ভয় পাবে।

খোলা মাঠের ওপর দিয়ে জোরে পা চালিয়ে দিলেন মিঃ অ্যালেন। কিছুটা গিয়ে গতিবেগ কমালেন। একশো গজ দূরের জঙ্গলের সীমানায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইলেন। নিবিড় অন্ধকার, নিশুতি রাত। টর্চ জ্বালালেন না। মধ্যরাতের অন্ধকার লক্ষ লক্ষ কীট-পতঙ্গের ডাকে সজীব হয়ে উঠেছে। বাঁ দিকের জঙ্গলের কোনো একটা গাছে বাঁদরের ডাক শুনলেন। জঙ্গলের প্রহরীরা মিঃ অ্যালেনদের দেখতে পেল। কেন তাঁরা জঙ্গলে এসেছেন বুঝতে পারল। গাছের ডাল ঝাঁকিয়ে তারা বন্ধুর মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। বাঁদরদের আচরণে মিঃ অ্যালেন বুঝলেন চিতাটা কাছাকাছি জঙ্গলে নেই। তিনি ধীরেসুস্থে

যেতে পারেন।

নক্ষত্রের আলোয় অন্ধকার ফিকে। তাছাড়া চোখ তখন অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। আবছা দেখা যাচ্ছে কয়েক গজ দূরের পথ। পথের দু'দিকে গাছের সারি। গরম বালির ওপর ঝরা পাতার স্তূপ। পা টিপে টিপে এগিয়ে চললেন মিঃ অ্যালেন। মিনিট দশেক চলার পর কান খাড়া করে রইলেন। কোনো শব্দ নেই। ধারে-কাছে কোনো বাঁদরও নেই। মিঃ অ্যালেন কিছুক্ষণ আগে যেখানে বিপদে পড়েছিলেন সেই জায়গাটার কাছাকাছি এসে পড়েছেন। আরও পঞ্চাশ গজ চলার পর একটা শব্দ শুনে মিঃ অ্যালেন থমকে দাঁড়ালেন।

কিছুটা এগিয়ে ফের একটা শব্দ শুনলেন। এবার নিঃসন্দেহে চিতাটার কাছাকাছি এসে পড়েছেন। এখন আর উন্মত্ত লাফালাফির শব্দ নয়। শোনা যাচ্ছে একটানা ছপ-ছপ-ছপ আওয়াজ।

মিঃ অ্যালেন কাছে এসে পড়েছেন। অথচ চিতাটা এখনো কিছু জানতে পারেনি। কুকুরদের নিয়ে তিনি ফের সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন। আর কয়েক পা এগোলেই চল্লিশ গজ দূরত্বে পৌঁছবেন। পেছনে কুকুরেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। রাইফেলের গুলির শব্দের জন্যে অপেক্ষা করছে।

কুকুরদের নিয়ে মিঃ অ্যালেন নিরাপদে এগিয়ে চললেন। টর্চ জ্বালার আগে চিতার শব্দ থেকে অনুমান করার চেষ্টা করলেন, সে জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে। সামনে নিরেট অন্ধকার। ঝোপঝাড়। আগের মতো ছপ-ছপ-ছপ শব্দ। শব্দ নির্ভুল হলে চিতাটা ঠিক ওই জায়গাতেই রয়েছে। মিঃ অ্যালেন রাইফেল তুলে টর্চের সুইচ টিপলেন। তীব্র আলোয় ঝলসে উঠল বড় কাঁটাঝোপ। দারুণ ঘন। কিন্তু ওখানে চিতার কোনো চিহ্ন নেই। টর্চ জ্বেলে রেখে কাঁটাঝোপের ওপর দ্রুত আলো ঘোরালেন। এবার হয়তো চিতাটা বেরিয়ে আসবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁদের ওপর। কিন্তু কিছুই ঘটল না। চিতা আলোর দিকে ফিরেও তাকালো না। শুধু বার বার শোনা গেল সেই একটানা ছপ-ছপ-ছপ শব্দ।

শব্দটা খুব সুস্পষ্ট, কিন্তু কোন দিক থেকে আসছে সেটা? মিঃ অ্যালেন ফের কাঁটাঝোপের ওপর আলো ফেললেন। হঠাৎ টর্চের আলোতে কিছু দূরে কী একটা সরে যেতে দেখা গেল। তবে প্রতিফলিত আলোয় কিছু স্পষ্ট নয়। চিতাটা নিশ্চিত ওই ঝোপটার পেছনে বসে আছে।

মিঃ অ্যালেন ভাবলেন কিভাবে চিতাটার কাছে পৌঁছনো যায়। তিনি ভেবে অবাক হলেন, টর্চের জোরাল আলোতেও চিতাটা নড়েচড়ে বসছে না। সামনে আলো দেখলেই চিতা নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। সামান্য মাত্র শব্দেও চিতা লাফিয়ে পড়ে। মিঃ অ্যালেন টর্চ জ্বালিয়ে রেখে ছোটোখাটো শব্দ করলেন। চিতা তবুও কাছে এগিয়ে এলো না। শুধু থেকে থেকে শোনা গেল সেই অদ্ভুত ছপ-ছপ-ছপ-ছপ।

আরো দু'পা এগিয়ে চমকে উঠলেন মিঃ অ্যালেন। সামনেই দেখলেন, চিতাটা মাটিতে শুয়ে, সামনের দুটো থাবা বাড়িয়ে রেখে তার মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছে তার মাথাটা। টর্চের আলো নাড়িয়ে চিতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা শরীর লক্ষ্য করলেন। রাইফেলের ট্রিগারে মিঃ অ্যালেনের আঙুল চেপে বসল। কিছুটা ইতস্তত করলেন তিনি। ভাবলেন এটা কী ধরনের চিতা? প্রায় পনেরো মিনিট তীব্র আলো তার চারদিকে ঘোরাফেরা করছে, মুখের ওপরেও সোজাসুজি আলো পড়ছে, তাঁদের চলাফেরার শব্দ নিশ্চয়ই সে শুনেছে—আশ্চর্য! তবুও স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে!

মিঃ অ্যালেন অবাক হয়ে চিতার গোল গোল দাগওয়ালা দেহের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন। চিতা কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসেছে। পেছনের একটা পায়ে তখনো কয়েকটা পাতা জড়িয়ে রয়েছে। শুকনো পাতার ওপর তার ল্যাজ ঝাপটানোর শব্দই এতক্ষণ তিনি শুনেছেন।

সামনের ঝোপে মাত্র বিশ পা দূরে মাটিতে শুয়ে রয়েছে চিতা। মিঃ অ্যালেনের গা ছমছম করে উঠল। হঠাৎ থাবা থেকে মাথা তুলল চিতা। মিঃ অ্যালেনের আঙুল আবার ট্রিগারের ওপর চেপে বসল। কিন্তু তখনো সে মিঃ অ্যালেনের দিকে লাফাবার উদ্যোগ করছে না। খুব ধীরে ধীরে তার মাথাটা নড়ল। তারপর তাঁদের দিকে সামনাসামনি তাকাল। কিন্তু কই? চিতা তো গর্জন করল না! চিতা পুরোপুরি মিঃ অ্যালেনের দিকে তাকাতে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। নিদারুণ আতঙ্কে চিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী ভয়ঙ্কর বীভৎস মুখ! যেন জ্যান্ত শয়তান।

অজানিতে ট্রিগারে চাপ দিয়েছিলেন মিঃ অ্যালেন। দেখলেন তাঁর সামনের জীবন্ত আতঙ্ক রাইফেলের বুলেটের শব্দে আচমকা শূন্যে লাফ দিল। যখন তার পাগুলো বাতাসে ছুঁড়ছে, তখনই ফের গুলি করলেন তিনি। চিতা মাটিতে পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কুকুরগুলো চিতার দিকে ছুটে যাবার আগেই তিনি তাদের আটকালেন। চিতার শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে কাছে এগিয়ে গেলেন। চিতার দেহে তখন আর প্রাণ নেই।

চিতার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে মিঃ অ্যালেন হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন সারা মুখ পাখি-মারা ছররার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। অজস্র ক্ষতচিহ্ন। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এমন জঘন্য, নৃশংস কাণ্ড খুব কমই দেখেছেন। চিতাটি সম্ভবত দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। হরিণের ডাক শুনে দীর্ঘকাল উপোসী চিতা খাবার পাবার আশায় সাম্বীর দিকে শেষবারের মতো লাফ দিয়েছিল। চিতাটা আসলে মিঃ অ্যালেন ও তাঁর কুকুরদের দেখতেই পায়নি। দেখলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেত।

ছবি : বিজন কর্মকার

দুষ্টু প্রজাপতি

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা আছো তো?
ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ছোট্ট তনুটা মাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করে। পাশে মা থাকলেই সে নিশ্চিন্ত, রাক্ষস-খোক্কসেও কিছু করতে পারবে না, দৈত্য-দানোও কিছু করতে পারবে না।

ওদিকে মা-ও ঘুমের মধ্যে 'আছি' বলে মেয়ের গায়ের ওপর হাত তুলে দেয়। পাশে শোওয়া তনুর বাবারও মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। সে অবাক হয়ে মা ও মেয়ের এইরকম ঘুমের মধ্যেকার কথাবার্তা শোনে। ওরা কিন্তু মোটেই জেগে নেই, তবু তারই মধ্যে ওরা জড়ানো গলায় কথা বলে।

কখনো আবার প্রথম কথা বলে মা-ই। বলে, না-বলে যাবি না তো? উত্তর আসে, না।

ছোট্ট তনুর এখন ছ-বছর বয়স, কিন্তু যখন ও সবে চার পার হলো, তখনই শুরু হলো বাপ-মায়ের ছুটোছুটি। ভালো একটা স্কুলে ওকে ভর্তি করতেই হবে। যে-স্কুলটা ওদের প্রথম পছন্দ, তাদের ওখানে ভিড় কম নয়। বেশ বাছাই-টাছাই করেই ওরা ছাত্রী নেবে। তনুকেও নিয়ে গেল ওর বাপ-মা। নিচের হলঘরে সবাই ভিড় করেছে। ডাক পড়লে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে দোতলায়। একজন শিক্ষিকা তাকে নিয়ে যাবে ওপরে, বাপ-মায়েরা দাঁড়িয়ে থাকবে নিচে। অনেক বাচ্চা কান্নাকাটি লাগায়, ওপরে যেতে চায় না। কিন্তু তনুর যখন ডাক এলো, তখন সে কাঁদলো না, সিঁড়িতে পা রেখে মার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালো, বললে, মা, আছো তো ?

মা বললে, আছি। ভয় নেই, তুই যা।

ওপরে উঠে গেল। কী কী তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, জানা গেল না। কিন্তু কিছু পরে তাঁদের গলার হাসির হুল্লোড় শোনা গেল। মা-বাবার বুক উঠলো

কেঁপে, এইরে! নিশ্চয় আজে-বাজে কিছু বলে ফেলেছে!

কিন্তু না, পরে জানা গেল, অভিনব ব্যাপার ঘটেছে। ওঁরা তো কবিতা বা ছড়া জিজ্ঞাসা করবেনই। যাঁরা পরীক্ষা নিচ্ছেন, তাঁরা 'ক্ষান্ত বুড়ির দিদিশাশুড়ীর তিন বোন থাকে কালনায়' শুনে শুনে হয়রান। কিংবা, 'বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে'ও শুনে শুনে তাঁদের কান ঝালাপালা। কিন্তু তনু শোনালো এমন এক কবিতা, যা তাঁরা আগে শোনেননি। তনু গম্ভীর মুখে কবিতা অনুযায়ী হাব-ভাবের সঙ্গে শোনালো, 'একদিন থিয়েটার দেখে/পিসীমাকে শিবপুরে রেখে/ফিরিতে হইয়া গেল রাত/ঘুমে ভরে আসে আঁখিপাত/তারপরে বাড়ি ফিরে দেখি/আমার শোবার ঘরে—একী!/খাটে শুয়ে এক টাইগার/টানিতেছে বর্মা সিগার/ভালুক কালো কুচকুচ/টেবিলে বসিয়া নাড়ে পুছ/চেয়ারেতে গোদা হনুমান/বসে বসে চিবাইছে পান/মেঝেয় শুয়ে লম্বা কুমির, মাপিতেছে দৈর্ঘ্য ভূমির!'

একে এই কবিতা, তার ওপর ওর ভাবভঙ্গি, পরীক্ষকরা তো হেসে কুটোপাটি!

বলা বাহুল্য, ওকে ভর্তি করতে বাপ-মায়ের আর একটুও অসুবিধে হলো না। মেয়েকে বাবা দিয়ে যায় স্কুলে তার অফিসে যাবার সময়, তিনটের পর মা গিয়ে নিয়ে আসে। বাচ্চাদের ক্লাস তো? ওদের নাচও শেখায়। মা জানতে চাইলো কী নাচ শিখলি? মেয়ে অমনি ডান হাতখানি মাথার ওপরে তুলে একপাক ঘুরে যেতে যেতে বললে, যে হাত দিয়ে ভাত খাও, সেই হাত ওপরে তুলে একপাক ঘুরে যাও!

তাদের স্কুলে খেলার ছলে পড়ানো হয়। মেয়ে পড়ার নামে মজা পেয়ে যায়। কিন্তু প্রতি ব্যাপারে মার সায় চাই। যেমন, দ্যাখো মা, তিনটে লাল বর্ণের সঙ্গে তিনটে হলুদ বর্ণ মিশিয়ে দিয়েছি, 'ছয়' হলো না?

মা বললে, ঠিক।

কিন্তু একটু পুরানো হবার পর যখন খাতায় বা সেলেটে 'এক'-এর সঙ্গে 'দুই' বা 'তিন' যোগ করার পালা এলো তখন শিক্ষিকা দেখতে চাইলে সে হাত দিয়ে খাতা বা সেলেট ঢেকে ফেলে বললো, তোমায় দেখাবো কেন? মাকে দেখাবো। মা আমাকে পড়ায়, আমাকে গল্প বলে।

এই গল্প বলা হলো মায়ের প্রধান কাজ। বিশেষ করে ঘুমোবার আগে রোজ তাকে গল্প বলতে হবে, নতুন নতুন গল্প। রাক্কস-খোক্কস, দানা-দৈত্যি তো আছেই, রাজপুত্রেরও গল্প বলতে হবে। সেই যে রাজপুত্র সদাগরপুত্রকে নিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে যমপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে ছুটলো, সেই গল্প তার রোজ শোনা চাই-ই। আবার মাঝে মাঝে কী হয়, মা রান্নাঘরে গেছে রান্না করতে, মেয়ে গেলাসে জল ভরে মাকে খাওয়াতে ছুটলো। ঐ যে মা শিক্ষা দিয়েছে, রোজ চার-পাঁচ গেলাস অন্তত জল খেতে হবেই—ঐ শিক্ষাটা মায়ের ওপর সে মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে। বলে, মা, তুমি খাও। না খেলে শরীল ভালো থাকবে না!

মা ভ্রূ কুঁচকে বললে, এই 'শরীল' বললি কেন রে? 'শরীর' বল।

মেয়ে ভুল হয়েছে মনে করে কাঁচুমাচু করে কথাটা শুধরে নেয়।

কিন্তু এটুকুতেও তনুর পরিচয় নয়। কোথায় কার বাড়িতে ঠাকুরের ছবি দেখে এসেছে, বাবাকে বলে সেই ছবি আনিয়ে ঘরের কোণে রেখে দিয়েছিল। তারপর রোজ তার সামনে জল-বাতাসা দিত। শুধু এতেই মন ভরে না, মার ছবির সামনে আবার চোখ বুজে চুপচাপ মিনিটখানিক বসে থাকত। এসব দেখা দিয়েছিল অবশ্য বয়স পাঁচ ছাড়াবার পর। মা বললে, হ্যাঁরে, চোখ বুজে তো ধ্যান করিস, মার কাছে কিছু চাস না?

একটু অবাক হয় তনু, এ-কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবু হার মানবার মেয়ে সে নয়, কিছু একটা উত্তর সে দেবেই। একটু ভেবে বললে, চাইবো কেন? বাবা তো যা চাই, সব এনে দেয়। তুমিও বাবাকে বোলো, সব এনে দেবে।

বাবা শুনে বললে, নাও, বোঝো এবার। আমার সঙ্গে বাজারে গিয়ে নিজে কিছু চায় না, সব খুঁটিয়ে দেখে, আর উদ্ভট কথা বলে। সেদিন আমাকে কী বলেছে শুনবে? বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওর চোখে পড়ে গেল, একটা লোক পাঁঠার ছাল ছাড়াচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, ওটা কী বাবা? সব কিছু শুনে আর দেখে তখন কিছু বললো না, বললো রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি আসতে আসতে, আচ্ছা বাবা, ঐ যে লোকটা পাঁঠা কাটলো, ওকে যদি কেউ কাটতে যায়? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, ও-কথা বলছিস কেন? উত্তরে ও বললো, বারে, তুমিই তো কাগজ পড়তে পড়তে মাকে বলো, একটা লোককে কাটলে তা খুন করা হয়। তা এ লোকটাও তো খুন করছে, পুলিশ ওকে ধরছে না কেন? বলতে বলতে তোমার মেয়ে কেঁদে ফেললো।

সেই থেকে মেয়ে আর মাংস খায় না। দেখাদেখি ওর মা-বাবাও মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মাছের ব্যাপারটা এখনো ঠিক বোঝেনি বলে মাছের কাটাকুটি নিয়ে কিছু বলে না, কিন্তু যেদিন বুঝবে, সেদিন আবার মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবার বায়না না ধরে বসে!

ওর বাবা মেয়েকে মাঝে মাঝে ছবির বই কিনে নিয়ে এসে পড়তে দেয়। তনু তখন আহ্লাদে আটখানা। মার কাছে গিয়ে হানা দেয়। বলে, মা, দেখো, দেখো, কত ছবি! ঘোড়ার ছবি দেখবে? এই দেখো। ঘোড়া ছুটছে! বাঘের ছবি দেখবে? তা-ও আছে।

মা তখন একটা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু মেয়ে আগ্রহ করে ছবি দেখাচ্ছে, না দেখলে সে দুঃখ পাবে, তাই কাজে একটু ক্ষান্ত দিয়ে মেয়ের সঙ্গে ছবি দেখায় মন দিলো। বললো, তোর বাবা দেখছি জন্তু-জানোয়ারের ছবি নিয়ে এসেছে!

আর কিছুর ছবি নেই? মেয়ে আর একখানা বই এনে বললে, এটা দেখো, এতে নদীর ছবি আছে। নদীর ওপরে পোল আছে।

ওটা যে পোল, তুই কী করে জানলি? নিচের ইংরেজি লেখা তুই বুঝতে পারলি?

তনু বললে, বারে! বাবা দেখিয়ে দেয়নি?

তোর বাবাকে একদিন বল, চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে। দুনিয়ার কিছুই তো দেখলি না? এই ফুলবাগানের বাড়ি আর স্কুল।

ফুলবাগানের কথায় তনুর আর একটা বইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সে ছুটে সেই বইটা নিয়ে এলো। এটা ফুলের বই। দ্যাখো মা, কতো ফুল!

মা বললে, দেখি? বাঃ! এটা তো বড়ো ভালো।

মার অবশ্য সবই দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওর বাবা যখন বইগুলো আনে কাল রাত্রে, তখন তনু ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মা যে আগেভাগেই দেখেছে, তা তনুকে জানতে দেয় না। জানালে মাকে প্রথম দেখানোর আনন্দ থেকে ওকে বঞ্চিত করা হবে।

ফুলের মধ্যে দেখা গেল গোলাপের দিকে তনুর ঝোঁক বেশি। টকটকে লাল গোলাপ, গোলাপী রঙের গোলাপ, ছোট গোলাপ, বড় গোলাপ! রঙেরই বা বাহার কতো! দেখতে গিয়ে মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মন চলে গেল দেশ-গাঁয়ের দিকে, যেখানে তার বাপের বাড়ি। কতোদিন সেখানে যাওয়া হয় না। আসল কথা, তার মা-বাবা তো সেখানে থাকে না! থাকে শুধু তার মেজদা। মেজদা, মেজো বউদি আর তাদের বাগান। মেজদার বাগানের খুব শখ! ওখানকার স্কুলে মাস্টারী করলে হবে কী, তার মন পড়ে থাকে বাগানের ওপর। কতো যত্ন আর মমতা তার বাগানের ওপর, তার আর বলার কিছু নেই! এবার পুজোয় কলকাতায় না থেকে ওখানে গেলে কেমন হয়! এবার আলিপুরে মা-বাবার কাছে গিয়ে কথাটা পাড়তে হবে। শেষ যখন সে দেশ-গাঁয়ে যায়, তখন তনুর বয়স এক বছর ছাড়িয়েছে মাত্র, সবে হাঁটতে শিখেছে। বাড়ির সামনে পিছনে যে চওড়া বারান্দা আছে, তাতে থপ থপ করে হাঁটতো। বাগানে গিয়ে তনুকে সে মাটিতে ছেড়ে দিতে ভরসা পেতো না। কখন কোন গোলাপে গিয়ে হাত দেবে কে জানে! মেজদার প্রাণ হচ্ছে ঐ গোলাপগুলি। তাদের কী নাম! মেজদা গোলাপগুলির পাশে কাঠি পুঁতে, কাঠির ডগায় পিজবোর্ডের টুকরো বেঁধে তার ওপর নাম লিখে রেখেছে। কোনোটার নাম 'অগ্নিশিখা', কোনোটার নাম 'অভিসারিকা'। এছাড়া ইংরেজি নাম তো আছে। 'ববি টক', 'গোল্ডেন স্টার'—আরও কতো কী? ছ-একর জমি নিয়ে বাগান। তার কায়দা কতো! এখান দিয়ে নালি বয়ে যাচ্ছে, ওখান দিয়ে নালি বয়ে যাচ্ছে, তার ভিতর দিয়ে পাইপের জল যাতায়াত করছে। বাগানে টিউব-ওয়েলই আছে দুটো। কাজের দিন লোকও কম আসে না খাটতে! রবিবার সব শুনশান। ওদিন তাদের ছুটি। সেদিন বাড়ির কাজের লোক কানাই ছাড়া আর কেউ নেই। বেড়ার ধারে ধারে বড়ো গাছও আছে। ভিতরেই গোলাপদের ছায়া দেবার জন্য গাছও আছে। সে-গাছে পাখিরা এসে 'পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা' বলে যখন খুব মিষ্টি সুরেলা গলায় তান ধরে, আর পঞ্চম থেকে নিখাদ পর্যন্ত সেই সুর গমকে গমকে উঠতে থাকে, তখন সেই সুর যেন মানুষকে পাগল করে দেয়। নাঃ! এবার পুজোয় মা-বাবাকে বলে কয়ে দেশের বাড়ির বাগানে তনুকে নিয়ে যেতেই হবে।

তনুর বাবার কিন্তু সেটা ইচ্ছে ছিল না। সে এবার ঠিক করেছিল তার অফিসের এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের মধুপুরের বাড়িতে যাবে। সে-বাড়ির বাগানেও ফুল কম নেই। আসল কথা, তনু জ্ঞান হয়ে অবধি কোনো ট্রেনেই চড়েনি, এমনকি অমন যে আমাদের কলকাতার বড়ো গঙ্গার ব্রীজ, তাই পার হয়নি সে।

তনুর মা বললে, বারে ! আমাদের দেশ-গাঁয়ে যেতেও তো ঐ গঙ্গা পার হতে হবে, ট্রেনেও চড়তে হবে!

আর দূর, তনুর বাবা বললে, তোমাদের ট্রেনে উঠলে তো ঘণ্টা দুয়েক পরেই এসে যাবে স্টেশন, হুড়মুড় করে নেমে পড়তে হবে। আর মধুপুর? সেখানে যেতে হলে অনেকক্ষণ থাকতে হবে ট্রেনে, কতো কী দৃশ্য দেখবে তনু। নদীও দেখবে, পাহাড়ও দেখবে।

মধুপুর না হয়ে শেষ পর্যন্ত তনুর মার বাপের বাড়ির দেশই কপালে নাচছে দেখা গেল। সঙ্গে তনুর দাদু-দিদিমা তো গেলেই, আরো গেল তনুর মায়ের ছোড়দা, ছোট বউদি আর তাদের মেয়ে টিলটিল। তার বয়স এখন বারো, তার সঙ্গে তনুর এমন ভাব যে, দিদির সঙ্গ পেলে আর সে কিছু চায় না। এই সঙ্গে তনুর মায়ের বড়দা, বউদি আর তাদের ছেলে শৌনক গেলে আরো মজা হতো। কিন্তু তারা আগে-ভাগে টিকিট কিনে রেখেছে হরিদ্বার যাবে বলে। তাই তাদের যাওয়া হলো না ওদের সঙ্গে।

ট্রেনে যেতে যেতে তনু যা দেখে, তাতেই অবাক হয়। কিন্তু মায়ের দেশের বাড়ি পৌঁছে যখন তনু তার দিদি আর মায়ের সঙ্গে বাগানে গেছে, তখন ফুল তো বটেই, প্রজাপতির মেলা দেখেও কম অবাক হলো না। তনুর বাবা তাকে একটা প্রজাপতির বইও কিনে দিয়েছিল। রঙিন সব প্রজাপতি। হলদে, কালো, লাল কতো রঙ আর নকশারই প্রজাপতি সে-সব! তনুর মনে হলো, সেই বইয়ের পাতা থেকে প্রজাপতিগুলো ডানা মেলে উড়ে এসে এই বাগানে ঠাঁই করে নিয়েছে। ওরা গোলাপগুলির কাছে গিয়ে বসছে, আবার উড়ে উড়ে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। তনুর মা ওদের দুই বোনকে বাগানে ছেড়ে দিয়ে তার মার কাছে গিয়ে গল্প করতে বসলো। এই গল্প আরম্ভ হয়েছিল ট্রেনে, তখনো তার জের

চলছিল। যেন, তনুর মা আর দিদিমা দুই বন্ধু। একে অপরের সঙ্গ পেলে আর ছাড়তে চায় না। কতো সুখদুঃখের গল্প, কতো যাকে বলে 'মনের কথা'র বিবৃতি। তনু আর টিলটিল গোলাপ দেখবে কী, ওপরের গাছগুলিতে তখন 'পিউ কাঁহা'দের গানের জলসা বসে গেছে! ওদের সঙ্গে ছিল কানাই, সে বাগানেরই একটি ঘরে থাকে। সে বললে, কেউ বলে 'পিউ কাঁহা', কেউ বলে 'চোখ গেল'! ওদের সুরে সুর মেলাও, দেখবে দুটো কথাই মিলে যায়। 'পিউ কাঁহা'ও মিলে যায়, 'চোখ গেল'ও মিলে যায়।

টিলটিল এখানে আগেও এসেছে, কানাইকে সে খুবই চেনে, বললে, আচ্ছা কানাইদা, আগে আগে দেখতাম বাগানে কতো লোক। তারা সব কোথায়?

কানাই বলে, তাদের এই পাঁচ দিন পুজোর ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ দিনে এমন কোনো কাজ নেই, আমিই চালিয়ে দেবো।

তনুর চোখ ছিল বাগানের ফুলের দিকে। রাশি রাশি ফুল এধারে ওধারে ফুটে আছে। তার সঙ্গে রয়েছে প্রজাপতির মেলা। সে টিলটিলকে বললে, গোলাপ ফুলের গায়ে গায়ে কাঠি পুঁতে ইংরেজিতে কী লেখা রয়েছে রে দিদি?

দিদি বললে, ওদের নাম। পড় না, খুব পড়তে পারবি।

কানাই বললে, তা তোমরা নাম পড়ো, আমি অন্য কাজে গিয়ে লাগি।

টিলটিল বললে, কানাইদা, এতো এতো ফুল! কী হয় কানাইদা? বিক্রি হয়?

কানাই বললে, তা তো হয়ই। কিন্তু বাবুর আসল ব্যবসা ফুল নয়, ফুলের বীজ। বাবু এ ফুলের সঙ্গে ঐ ফুল মিশিয়ে নানারকম 'ফুল' তৈরি করেন। সেইসব নতুন নতুন ফুলের নাম ঐ দ্যাখো না সব লেখা রয়েছে। সেইসব ফুলের বীজ পৃথিবীর নানান দেশে চালান যায়। বাবু আবার অন্য দেশ থেকেও নতুন ফুলের বীজ আনান। সেগুলি তো এখানে

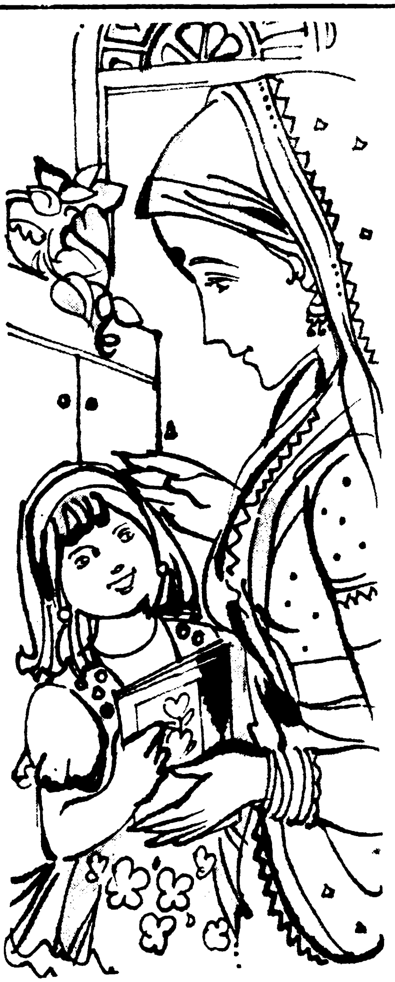

ফোটান-ই, আবার তাদের সঙ্গে এদেশের কোনো ফুল মিশিয়ে নতুন ফুল তৈরি করেন। ঐ দ্যাখো না, তোমার পাশের ঐ গাছটা! দ্যাখো ওর ফুল? একটা ফুলের গোড়ার দিকে টকটকে লাল, আর মাথার দিকে ফিকে লাল। ফুলগুলোর পাপড়ি দ্যাখো, কেমন ছোট ছোট, কিন্তু পাপড়িগুলোর বাহার দ্যাখো? এর নাম 'রেবেকা ফ্লেয়ার'! বাইরে থেকে আনা।

ওরা দু'বোনে নামটা পড়বার জন্য ঝুঁকে পড়লো। তনু বানান করে পড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু টিলটিল চট করেই পড়ে ফেললো। সে ক্লাস সিকসে পড়ে কিনা, তার ওপর 'ইংরেজি মাধ্যম' ইস্কুলে, তাই তার পড়তে আর কতক্ষণ লাগে? তনু ওটা পড়তে পড়তে সে আরও একটা ফুলের নাম পড়ে ফেললো, 'রেড অ্যারো'—মানে লাল তীর। বাঃ! এ ফুলটাও কতো সুন্দর! এর পাপড়িগুলো অতো ছড়ানো নয়, একটু ছুঁচলো ভাব আছে, তাই বোধহয় নাম হলো লাল তীর।

কানাই ততক্ষণে চলে গেছে, টিলটিল ফুলের নাম পড়তে ব্যস্ত, একটু দূরে আরও দু'রকমের গোলাপ—'প্রিনসেস অ্যালিস' আর 'প্রিনসেস ডি মোনাকো'। সেগুলি পড়ছে টিলটিল একটু নিচু হয়ে, কিন্তু তনু দেখছে অন্য জিনিস! ওখানে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল একদল হলদে প্রজাপতি, তাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল অন্য ধরনের এক প্রজাপতিকে। প্রজাপতিটা ওদের থেকে একটু বড়ো, কিন্তু তার দুটো ডানায় কী সুন্দর নকশা! কে যেন ডানাদুটিকে তুলি দিয়ে খুব সুন্দর করে এঁকে দিয়েছে।

তনু বললে, এই দিদি, দেখ দেখ!

দিদি তখন একটি গোলাপের নাম পড়ছিল 'মিনি পার্ল', তা থেকে মুখ তুলে বললো, কী রে?

কী সুন্দর প্রজাপতি, না?

টিলটিল দেখলো, দুটি ডানার ওপরে মা যেমন আলপনা দেয় তেমনি খুদে আলপনা এঁকে দিয়েছে কে যেন। দূর থেকে কালো দেখালেও ডানায় যে রঙটা বেশি দেখা যাচ্ছে, সেটা ঠিক কালো নয়, ঘোর খয়েরী—যেন খয়েরী ভেলভেটের রঙ। তার পাশে খয়েরী নকশাটাকে ঘিরে ধরেছে গাঢ় হলদে মোটা একটা লাইন, তার পাশে আবার ধবধবে সাদা সরু লাইন টানা।

দেখতে দেখতে টিলটিল তনুকে বললে, এই, তোর কাছে প্রজাপতির ছবিওয়ালা একটা বই আছে না? তাতে এরকম প্রজাপতি দেখিসনি?

তনু এরই মধ্যে তার বইয়ের কথা ভাবছিল, বললে, না রে দিদি, তাতে এরকম ছবি নেই! প্রজাপতি তখন উড়ে আর একটা গোলাপ গাছে বসে, ফুটন্ত গোলাপের পাপড়িতে মুখ ঠেকিয়ে যেন কানে কানে কথা বলছে। টিলটিল

দেখলো, গোলাপটির নাম লেখা রয়েছে, 'হ্যাপি টক'। হাওয়ায় ফুলটা যেন একটু একটু দুলছে। কথা তো বলতে পারে না, তাই হাওয়ায় দুলে দুলে যেন প্রজাপতি-বন্ধুর সঙ্গে 'সুখী-সুখী কথা' বলছে। নাম হ্যাপি টক তো? সেজন্য সুখী-সুখী কথা তো বলবেই!

টিলটিল ওদের রকম দেখতে দেখতে কী যেন ভাবছিল, হঠাৎ তার চোখে-মুখে একটা দুষ্টুমির ভাব ফুটে উঠলো, বললে, এই তনু, প্রজাপতিটাকে ধরবি? ধরে না একটা ভালো খাতা কিনে তার একটা পাতায় ওর ডানাদুটো আঠা দিয়ে আটকে রাখবো। কী সুন্দর নকশা! নতুন একটা জিনিস হবে, তাই না?

কিন্তু তনু কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেল, বললে, ইস! ওর লাগবে না! ও ব্যথা পাবে।

টিলটিল বললে, শুধু ব্যথা পাবে, ও তো মরেই যাবে! খাতায় আঠা দিয়ে জুড়লে ও কি বাঁচবে?

তাহলে? না দিদি, ওকে মারিস না। ও তো কোনো দোষ করেনি! কেমন এসে হ্যাপি টক-এর সঙ্গে কানে কানে কথা বলছে।

টিলটিল বললে, ঠিক বলেছিস। ওকে মারা হবে না। ওকে ধরে না আমরা একটু আদর করবো। আমরাও হ্যাপি টক-এর মতো ওর সঙ্গে কথা বলবো।

এ প্রস্তাবে তনু খুব খুশি। সে আহ্লাদে একেবারে হাততালি দিয়ে উঠলো। কিন্তু হাততালির শব্দে কী হলো? হ্যাপি টক-ও হাওয়ায় আর দুললো না, প্রজাপতিও উড়ে পালালো।

ঐ যাঃ! উড়ে গেল যে! টিলটিল বললো, এই তনু, আয় আমার সঙ্গে। ওকে ধরতেই হবে।

প্রজাপতিটা কিন্তু উড়ে একেবারে পালিয়ে গেল না, ঘুরে ঘুরে এ-ফুলে বসে, আবার ওদের তাড়া খেয়ে অন্য ফুলে যায়। কখনো 'ম্যাডাম ভাওলেট'-এ যায়, সেখান থেকে যায় 'ফেস্টিভ্যাল ফ্যানফেয়ার'-এ। তারপরে যায় 'ব্ল্যাক বিউটি'র কাছে। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে 'গোল্ডেন টাইমস'-এ চলে গেল। সেখান থেকে 'রেশমী'র কাছে। তারপরে গেল 'রাজর্ষি'র কাছে। সে তাড়া খেয়ে বাগানের বাইরে যাচ্ছে না, এ-গোলাপ থেকে সে-গোলাপে গিয়ে বসছে। কতো সময় যে কেটে গেল, ওরা ছুটতে ছুটতে একেবারে হয়রান হয়ে গেল, তবু ওকে ধরা গেল না। টিলটিল আর তনু হাঁপিয়ে গেছে, আর নড়তে পারছিল না, একটা বড়ো গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। টিলটিল তনুকে বললে, বড্ড দুষ্টু ঐ প্রজাপতিটা। ওর নাম দিলুম 'দুষ্টু প্রজাপতি'।

ওদিকে দেরি দেখে খুঁজতে খুঁজতে তনুর মা আর তনুর দিদিমা এসে হাজির। তারা এসে ওদের দুজনকে ধরে নিয়ে গেল।

যদিও পুজোর দিন, ছেলেমেয়েরা গাঁয়ের এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বাগানের ফুলের মেলার জন্য এই ছোট্ট মেয়েরা আর কোথাও গেল না, বাগানেই ঘুরে বেড়ায়। তনুর মা বা দিদিমা বা টিলটিলের মা, ওরা দুপুরে একটু গড়িয়ে নিতে চায়। এবং গড়াতে চায় বলে মেয়েদুটিকেও সঙ্গে রাখতে চায়। একদিন হলো কী, টিলটিল তার মায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়লেও, তনু ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে পড়লো। তার ওপর হাতখানা উঠিয়ে দিয়ে তনুর মা ঘুমোচ্ছিল। তনু উঠে মার হাতখানা সরিয়ে বাইরে এলো। তখন 'ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঠ্যালা'র সময়। সে বাইরের রকে এসে বাগানের দিকে তাকালো। বাগানে তখন ফুল ছাড়া আর কিছু নেই বা কেউ নেই। কানাইদাকেও দেখা যায় না, বড়ো গাছে বসে পাপিয়ারাও 'চোখ গেল' বলে ডাক ছাড়ছে না, নিথর-নিস্তব্ধ চারদিক। আসলে তনু একটা স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন দেখছিল যে, ঐ দুষ্টু প্রজাপতিটা হঠাৎ বড়ো হয়ে তাদের সমান উঁচু হয়ে গেছে। দেখা গেল অমন রঙিন ডানার পোশাকের আড়ালে রয়েছে সুন্দর একটা ছেলে। সে বললে, আমাকে মেরে ফেলার চিন্তা করেছিলে না তোমরা?

তনু স্বপ্নের মধ্যেই উত্তর দিলো, আমি নয়, দিদি। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

সে বললে, আমি জানতে পারি। যে যা চিন্তা করে আমার সম্বন্ধে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তা জানতে পারি। কিন্তু এ-ও বলবো, তুমিই দিদিকে বাধা দিয়েছিলে। তাই যে মুহূর্তে তুমি তা করেছিলে, সেই মুহূর্ত থেকেই আমি তোমার বন্ধু হয়ে গেছি। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। যাবে তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায়? আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি।

কোথায়?

সে বললে, এসো না আমার সঙ্গে? বাইরে। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। ভারী সুন্দর জায়গা!

তনু বললে, তাহলে দিদিকে ডাকি? দিদি যাবে না?

সে বললে, না। একা তুমি এসো। যদি জায়গাটা তোমার ভালো লাগে, তখন এসে দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও, আমি বাধা দেবো না। এসো তুমি। সে ভারী সুন্দর জায়গা।

বাগানের মধ্যে?

হ্যাঁ, বাগানের মধ্যে তো বটেই! এই দুপুরবেলা, কেউ যখন কোথাও থাকে না, এমনকি কুকুরগুলোও যখন এধারে-ওধারে এলিয়ে পড়ে ঘুমোয়, তখন বাগানটা আমাদের রাজত্ব হয়ে যায়। এসো তুমি! আজ তুমি আমাদের অতিথি। আমি যাই আগে আগে। আমাকে তুমি 'সুখী-সুখী কথা' নামের গোলাপফুলদের কাছে গেলে পাবে।

ঘুম ভেঙে গেল। মা-ও ঘুমুচ্ছে, সবাই ঘুমুচ্ছে, ও ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এলো। সেখান থেকে পায়ে জুতো গলিয়ে একেবারে বাগানে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল 'সুখী-সুখী কথা'দের কাছে। ওমা, অবাক কাণ্ড! সেই দুষ্টু প্রজাপতিটি ঠিক সেখানে গোলাপের পাপড়িতে মুখ ঠেকিয়ে বসে আছে। যতো বড়ো হয়ে সে ওকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল, তত বড়ো নয়,

আগের মতো ছোট্টটি। সে কাছে যেতেই প্রজাপতি উড়তে লাগলো, যেন বলতে লাগলো, এসো আমার সঙ্গে এসো।

প্রজাপতির পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলো তনু। ছুটতে ছুটতে বাগানের শেষ প্রান্তে এসে গেল। কম পথ নয়, তনু হাঁপাচ্ছে। একটা কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক ছিল ওখানে। প্রজাপতি সেই ফাঁক দিয়ে গলে ওকে বুঝিয়ে দিলো, এখন দিয়েও আসা যায়। কথাটা বুঝে তনু ঐ ফাঁকটা গলিয়ে বাইরে এলো। এবার একটা জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। প্রজাপতি পথ দেখিয়ে তার আগে আগে উড়তে লাগলো। তনু থামলে সে-ও থেমে যায়। থেমে একটা গাছের ডালে বসে। তারপর আবার বলে, এসো, ভয় কী? তোমাকে আমাদের রাজপুত্তুরের দেশে নিয়ে যাবো।

তনুর মায়ের বলা সেই রাজপুত্রের দেশ বুঝি। উৎসাহিত হয়ে তনু ওর পিছন পিছন আরও ছুটতে লাগলো। দেখতে দেখতে ওরা এসে পড়লো এক নদীর ধারে। এর আগে নদী কখনো দেখেনি তনু। ছবিতে নদী দেখেছে, এইবার ট্রেনে ওঠবার আগে নদীর পোল দেখেছে, কিন্তু এরকম করে নদী দেখা তার হয়নি। নদীর বুকে একটা চর দেখা যাচ্ছে। সেখানে কতো গাছ, কতো ফল, কতো ফুল। একটি কুঁড়েঘরের চালে লাউ ফলে আছে। প্রজাপতি বললে, ওখানেই আমরা যাবো। ওখানেই থাকে রাজপুত্তুর আর তার ভাই সওদাগরপুত্তুর। চলো।

বলে প্রজাপতি জলের ওপর দিয়ে উড়ে সেই দ্বীপের দিকে যেতে লাগলো। কিন্তু ও তো উড়তে পারে না। ও যাবে কী করে? প্রজাপতি বললে, কোনো ভয় নেই, জলের ধারে চলে এসো। এসেছো তো? জুতোজোড়া ওখানে খুলে রাখো, তারপর হেঁটে এসো জলের ওপর দিয়ে। না না, নদীকে বলা আছে, ও তোমাকে কিচ্ছু বলবে না, অনায়াসে হেঁটে আসতে দেবে।

ওদিকে বাড়িতে হৈ-হৈ পড়েছে। তনুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তনুর মা তো পাগলের মতো হয়ে গেছে। সারা বাগানে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সবাই, তনু নেই। দাদু-দিদিমা-মামা থেকে শুরু করে কানাই পর্যন্ত। কেউ তনুকে খুঁজে পাচ্ছে না। টিলটিলের কী মনে হলো, সে সেই কাঁটাতার গলে জঙ্গলে ঢুকলো। মাটির ওপর আবছা আবছা ছোট ছোট জুতোর দাগ না? সে চিৎকার করে কানাইকে ডেকে নিলে। কানাই আর সে জঙ্গল পেরিয়ে নদীর পাড়ে এলো। জলের কাছে তনুর জুতোজোড়া আবিষ্কার করলো টিলটিলই প্রথম। বারো বছরের মেয়ে, ওর কি বুঝতে বাকি থাকে কী হয়েছে? হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। কানাই ওকে অতি কষ্টে শান্ত করতে করতে বাড়ি এলো। সেই জুতো হাতে করে তনুর মা 'তনু রে' বলে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাড়িসুদ্ধ রব উঠলো কান্নার।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দাদুর হাত ধরে হেঁটে আসছে স্বয়ং তনু। কী হয়েছিল? তনু সব খুলে বললে। দুষ্টু প্রজাপতিটা তাকে নদীর ভিতরকার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। বলেছিল, জুতো খুলে রেখে জলে নেমে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঠিক আসতে পারবে। নদীকে বলা আছে—নদী কিছু বলবে না। তনু বললে, আমিও জল দিয়ে হেঁটে আসবো ভাবলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, আসবার সময় মাকে তো বলে আসা হয়নি? তাই প্রজাপতিকে বললাম, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি মাকে বলে এখুনি ফিরে আসছি। কিন্তু খালি পায়ে জঙ্গলের ও রাস্তা দিয়ে আসতে পারলাম না, পায়ে যদি কাঁটা ফুটে যায়! তাই আমি ঘুরপথে বাড়ির ফটকের দিকে চলতে লাগলাম। ওদিকেই তো দেখা হলো দাদুর সঙ্গে। দাদু আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল যে।

টিলটিল একটু পরে সেই 'সুখী-সুখী কথা' গোলাপের কাছে ছুটে গেল, কিন্তু দুষ্টু প্রজাপতিটিকে তখন আর দেখা গেল না।

ছবিঃ সরোজ সরকার

শিউলি শরৎ

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

সুতো লাটাই হাতে
উঠে গেলুম ছাতে
উড়িয়ে দিলুম ঘুড়ি
মনটা গেল চুরি।

উড়তে উড়তে ঘুড়ি
কাটলো মেঘের ভুরি
ভুরির ভেতর কী
ঝলমলে নীলটি।

নীলের ভেতর দিল
উড়তে থাকে চিল
সূর্যিঠাকুর পাশে
শিউলি শরৎ হাসে।

ঢ্যাম্ কুড়াকুড় ঢ্যা
নাড়লো কড়া কে
ছড়িয়ে খুশি সবার ঘরে
দুর্গা এসেছে।

ছবিঃ সুফি

সোনার শহরের সন্ধানে

নীলাঞ্জন নন্দী

১৫৩৬ সালের এপ্রিল মাস! দক্ষিণ আমেরিকার 'সান্টা মার্টা' (অধুনা কলম্বিয়া) থেকে বারোশো জন ইউরোপীয় অভিযাত্রীর একটা দল পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলো। অভিযাত্রী দলের নেতা গ্রানাডা রাজ্যের ছত্রিশ বছর বয়েসের বদমেজাজী ডেপুটি গভর্নর "গন্‌জালো জিমেনেজ দ্য কুয়েসাডা"। জাতে খাঁটি স্প্যানিশ, এই আধ-পাগলা লোকটির অভিযানের পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো একটাই। 'মাগ্‌দালেনা' (Magdalena) নামক নদের উৎসমুখের সন্ধান। অর্থাৎ, আন্দিজ পর্বতমালার বুক চিরে 'পেরু' পর্যন্ত নতুন কোনো রুট বা পথের খোঁজ। সেই সঙ্গে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার।

দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে-বাতাসে তখন শুধুই ধ্বংসের ধোঁয়া। গাদাবন্দুকের নলে আগুনের কমলা-হলুদ ঝলকানি নিমেষে কেড়ে নিচ্ছে শত শত নিরপরাধ সাধারণ মানুষের প্রাণ। গোটা মহাদেশটা জুড়ে স্প্যানিশ-শাসনের দাপট। স্পেনীয় চাবুকের নির্মম আঘাত! কুয়েসাডার ১৫৩৬-এর অভিযানের আগেই ঝরে গেছে হাজার হাজার তাজা প্রাণপুষ্প।

১৫২১ সালে নিষ্ঠুর ও ক্ষমতালোভী হারনান্ কোর্তেজ মেক্সিকোর 'অ্যাজটেক' (AZTEC) সভ্যতার প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন করে দেন। আবার ১৫৩৩-এ জগদ্‌বিখ্যাত 'ইনকা' (INCA) সভ্যতার পুরোটাই ধ্বংস করে দেন ফ্রান্সিস্‌কো পিজারো; পেরুর মাটি রক্তের ধারায় লাল হয়ে যায়। এর ঠিক তিন বছর পরেই অভিযানে বেরোলেন কুয়েসাডা।

কুলি এবং মালবাহকেরা বাদে প্রায় সবাই অশ্বের পিঠে চেপে প্রবেশ করলেন দক্ষিণ আমেরিকার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। চলার পথে ঘন হয়ে আসা গাছপালা ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কেটে ফেলতে ফেলতেই এগিয়ে যেতে হয় তাঁদের। এভাবেই কেটে যায় এগারোটা মাস। ইতিমধ্যে কুয়েসাডার দলের প্রায় হাজারখানেক সদস্য মারা গেছেন। মৃত্যু এসেছে নানাভাবে। জঙ্গলের মধ্যে এক ঘোলাটে জলের নদী অ্যামাজন (AMAZON)-এর ত্রাস—মাংসাশী মাছ 'পিরান্‌হা'র আক্রমণেই মারা যান প্রায় দেড়শো অভিযাত্রী। কুমীরের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় আরও শ'খানেক সদস্য ও অশ্বের। ভীষণ গভীর জঙ্গলে দক্ষিণ আমেরিকার বিভীষিকা 'অ্যানাকোন্ডা' (ANACONDA) নামক দৈত্যাকার (প্রায় ৩৩ ফিট) সাপের খাদ্যেও রূপান্তরিত হন অনেকেই। এছাড়া 'জাগুয়ার' (দক্ষিণ আমেরিকার চিতাবাঘ), বিষাক্ত পোকামাকড় ইত্যাদির কামড়েও প্রাণলীলা সাঙ্গ হয় অনেকেরই। ঘন জঙ্গলের বুকে লুকিয়ে থাকা অজ্ঞাত জংলীদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে, বিষাক্ত তীরের আঘাতে মারা পড়েন কম করেও ছ'শো জন। দুর্ঘটনাগুলি এভাবেই অভিযাত্রীদের নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিলো। এতগুলি মানুষের মৃত্যু অভিযানের আসল উদ্দেশ্য থেকে সবাইকেই বিচ্যুত করে ফেলেছিলো। মানসিকভাবে তাঁরা ভেঙে পড়েছিলেন। দলের নেতা কুয়েসাডা যখন যাত্রাভঙ্গ করে ফিরতি পথ ধরার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, ঠিক তখনই দলটি একটি অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লো। জঙ্গলের সীমানার বাইরে এক নয়নাভিরাম প্রান্তরে। অঞ্চলটির নাম 'কুন্ডিনামার্কা'

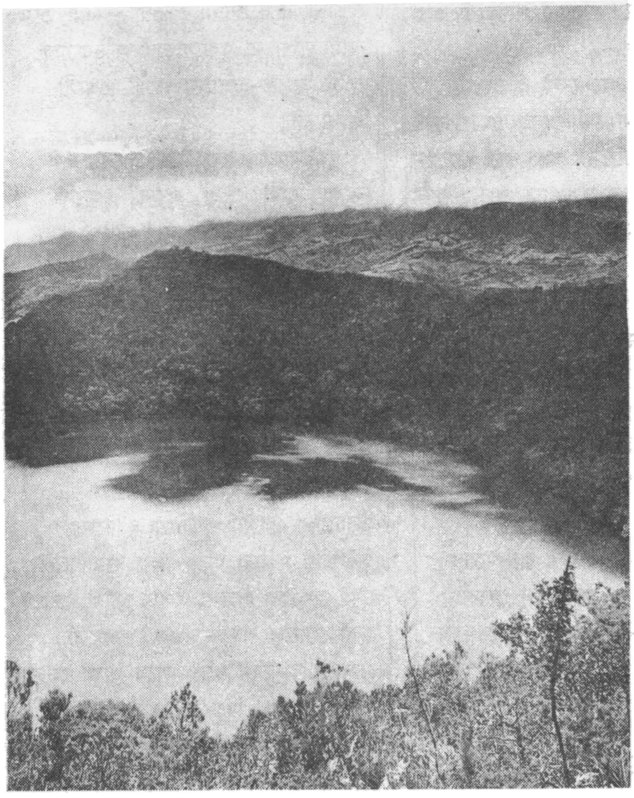

কলম্বিয়ার লেক গুয়াটাভিটা: এরই অতলে লুকিয়ে রয়েছে এল ডোরাডোর সব রহস্য।

'Cundinamarca Plateau''!

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় জর্জরিত অভিযাত্রী দল চোখের সামনে যা দেখলো তার তুলনা হয় না। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ শস্যে ভরা ক্ষেত। ভুট্টা, গম আর আলুর অফুরন্ত ভাণ্ডার। ক্ষেতগুলির মাঝে চমৎকার ছোট্ট কয়েকটি বাড়ি, খড়-ছাওয়া মাটির কুটির। লুপ্ত আদিবাসী 'চিবচা'দের গ্রাম। প্রতিটি বাড়ির দরজায় পর্দা ঝুলছে। প্রখর রৌদ্রের আলোয় সেই পাতলা নিখাদ সোনার চাদরগুলি ঝলসে দিচ্ছে অভিযাত্রীদের চোখ। বাড়ির সদরে সোনার পর্দা!

এতগুলি সঙ্গী-স্বজন হারিয়ে নিরুদ্যম কুয়েসাডা যেন নতুন আশার আলো দেখতে পেলেন। লোভে চক্চক্ করে উঠলো তাঁর চোখ!

অভিযাত্রীদের দলটি এসে পড়লো সেই ছোট্ট গ্রামে। চোখে তাঁদের একমাত্র সন্ধানের ঝিলিক—'এল ডোরাডো'! চিবচারা সাধারণ মানুষ। যুদ্ধে তাঁরা বিশ্বাসী নন, তাই হঠাৎই এই আগন্তুকদের প্রত্যক্ষ করে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তাঁরা আশ্চর্যই হলেন।

গ্রামবাসীদের অনেকেই অশ্বারোহী আগন্তুকদের আগমনে কিছুটা ভয় পেয়েই গ্রাম ছেড়ে পালালেন। যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা অভিযাত্রীদের সসম্মানে খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি আরও নানা উপহার সামগ্রীও প্রদান করলেন। সেই উপহার সামগ্রীর বেশির ভাগটাই সোনা।

আসলে চিবচারা সোনা পেতেন অন্য স্থানীয় আদিবাসীদের পান্না এবং নুন যোগান দিয়ে। সোনার তেমন একটা অসামান্য মূল্য ছিলো না, অন্তত তাঁদের কাছে। তাঁরা সোনা ভালোবাসতেন তার মসৃণতা, রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং নম্রতার জন্যেই। চিবচাদের গ্রামের স্বর্ণকারেরা চমৎকার সব গয়না বানাতেন সোনার, সেটা সম্ভব ছিলো, কারণ সোনা নরম ধাতু বলেই। সোনার অলংকারে সজ্জিত হতেন চিবচাদের নারীরা এবং ওঁদের দেবতার মূর্তিও।

ইউরোপীয় সেই অভিযাত্রীদের দল কয়েকদিন পরেই স্বমূর্তি ধারণ করলো। চিবচাদের মধুর ব্যবহার অথবা অতিথিপরায়ণ স্বভাবের কোনো মূল্যই ছিলো না তাঁদের কাছে। তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য। একটাই লক্ষ্য "সোনা"!

কুয়েসাডার সোনা সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে চিবচাদের দলপতি বিপদের গন্ধ পেলেন। তর্কাতর্কি গড়ালো চড়-চাপড়ে। চড়-চাপড় হাতাহাতিতে। অতঃপর যুদ্ধ।

শান্তিপ্রিয় চিবচাদের বল্লম আর মুগুর অভিযাত্রী দলের শক্তিশালী বন্দুকের সামনে দাঁড়াতেই পারলো না। শয়ে শয়ে চিবচা মারা পড়তে লাগলো।

অসহ্য বারুদের বাতাস ভারী করা গন্ধে যেন মরণের উৎসব লেগে গেলো। অভিযাত্রী দলের একজন মারা গেলো বল্লমের খোঁচায়। এদিকে চিবচাদের মারা গেলো প্রায় সবাই।

চিবচাদের গ্রাম তথা গোটা অঞ্চলটাই তখনও কুয়েসাডার দখলে।

'অন্য আদিবাসীদের নুন এবং পান্নার যোগান দিয়ে সোনা পাওয়া'—এই তথ্যে সন্তুষ্ট হলো না কুয়েসাডা। অভিযাত্রীর দলটি 'ছেলে-ভুলানো গল্পে' বিশ্বাসী ছিলো না।

কুয়েসাডা এবারে অত্যাচারের পথ নিলো। নারী, শিশু, পুরুষ, এমনকি বৃদ্ধেরাও বাদ পড়লো না! অকথ্য অত্যাচার এবং দিনের পর দিন প্রায় অভুক্ত থাকার পর এক বৃদ্ধ চিবচা অবশেষে মুখ খুললো। সে শোনালো 'এল ডোরাডো'র কাহিনী। তার ইতিহাস আর বৃত্তান্ত। সে বললো—স্প্যানিশ ভাষায় 'এল ডোরাডো' মানে সোনার মানুষ বা The Golden Man! চিবচাদের গ্রামের পুবদিকে দু'দিনের হাঁটাপথে পাওয়া যাবে লেক্ গুয়াটাভিটা। সেই লেকের জলের তলায় নাকি রয়েছে সেই সোনার শহর—এল ডোরাডো। যেখানে অনুমান মতো জমে থাকা সোনার মূল্য আজকের দিনে প্রায় আঠারোশো কোটি ডলারেরও বেশি। কিন্তু আজও কেউ সেই বিশাল সম্পদের কোনো সন্ধানই পায়নি। হয়তো কোনোদিন পাবেও না! বৃদ্ধ চিবচা কুয়েসাডাদের শুনিয়ে গেলো তার কাহিনী।

বৃদ্ধ জানালো—বহু বছর পূর্বে স্থানীয় একটি জাতির সর্দার প্রতি বছরই একটি বিশেষ দিনে প্রচুর সোনা ও হীরে, পান্না ইত্যাদি লেক্ গুয়াটাভিটার জলে নিক্ষেপ করতো জলদেবতার উদ্দেশ্যে! বসনহীন দেহে আঠা মেখে তার উপরে সোনার গুঁড়ো মেখে দলপতি ঝাঁপ দিতেন লেকের জলে। সোনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টুকরোগুলি মিশে যেতো লেকের শান্ত জলে। তারপরে ধীরে ধীরে লেকের তলায় জমতে থাকা সোনার ভাণ্ডারের অংশবিশেষে সেই গুঁড়োও সামিল হয়ে যেতো।

উপরোক্ত ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন করা যেতেই পারে। কারণ, অত্যাচারে অতিষ্ঠ সেই চিবচা বৃদ্ধের কাহিনীটি যে পুরোপুরি সত্যি তার কোনো প্রমাণ নেই। হয়তো ভুয়ো কোনো কাহিনী শুনিয়ে অভিযাত্রীদের দলকে কোনো বিপদসঙ্কুল পথে চালিত করে নিজের গ্রাম থেকে তাড়াতে চেয়েছিলো সেই বৃদ্ধ। এমনও তো হতে পারে! বৃদ্ধের গল্প বলার সেই দিন থেকে আজ অবধি এল ডোরাডো এক আধা-সত্য হয়েই রয়ে গেলো। শত শত মানুষ সোনার লোভে সেই এল ডোরাডোর সন্ধানে বেরিয়ে আর ফেরেনি। কত অভিযাত্রী যে এই সোনার শহরের টানে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বলাই বাহুল্য, কুয়েসাডার দলও এল ডোরাডো খুঁজে পায়নি। খুঁজে পায়নি অনেকেই। যার মধ্যে জার্মান নিকোলাস ফেডারম্যান, স্প্যানিশ সেবাস্টিয়ান ডি বেলাকাজার ইত্যাদিরা অন্যতম।

এঁদের মধ্যে অনেকেরই প্রাণ গেছে জঙ্গলের শ্বাপদদের হাতে বা সাপেদের দৈত্য আনাকোন্ডার আক্রমণে।

১৫৪০ সালের গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ একটি দিনে তৎকালীন রাজার ভাই হারানান পেরেজ লেক গুয়াটাভিটাকে শুষ্ক করার উদ্যোগ নিলেন। রাজার সৈন্যসামন্ত সহ সাধারণ মানুষেরাও সামিল হলেন

সেই কাজে। লেকটিকে ঘিরে শ্রমিকের দল তাঁদের হাতে ধরা কুমড়োর খোলটিকে জল কমাবার এক সহজ উপায় ভেবেছিলেন। সেই কুমড়োর খোলায় কতটুকু আর জল ধরে? তিন মাস একটানা কাজ চলার পর দেখা গেলো জলের উচ্চতা মাত্র দশ ফিট কমেছে। এই দশ ফিট কমাতে কমাতে নরম মাটি বেরিয়ে পড়লো। সেই নরম মাটির বুকে প্রোথিত প্রায় তিন-চার হাজার ছোট ছোট সোনার দুল, আংটি ইত্যাদি অধিকাংশই শোভা পাচ্ছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ামে। আজ পর্যন্ত লেক গুয়াটাভিটার মাঝখানে কেউ যেতে পারেনি। যদি সত্যিই এল ডোরাডো থাকে এবং তার সঙ্গে জুড়ে থাকা অজস্র কাহিনী সত্য হয়, তবে এটা জানতেই হবে যে লেকের মাঝখানেই রয়েছে সেই অমূল্য এল ডোরাডো। হারনান পেরেজ সাফল্য পাননি।

প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর অধুনা কলম্বিয়ার বোগোটার এক ধনী ব্যবসায়ী প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত করলেন লেক বরাবর একটি খাল কাটার জন্যে। খাল কাটতে হবে চারদিকের পাহাড় জুড়ে।

খাল কাটা হলো। এবারে দেখা গেলো জলের উচ্চতা কমেছে প্রায় ষাট ফুট। মুরগির ডিমের মতো বড় একটি পান্না এবং অসংখ্য সোনার দুল মিললো এবার। সন্ধানকার্য চালাবার কয়েকদিন পর ঘটলো আর এক বিপত্তি।

লেক গুয়াটাভিটার পিছনে কাটা হচ্ছিলো একটি বাড়তি খাল। তাছাড়াও সে সময় তারা লেকের আশেপাশে তৈরি করেছিলো টানেল বা মাটির তলার সুড়ঙ্গপথ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই সুড়ঙ্গের দেয়াল ভেঙে পড়লো। দেয়াল চাপা পড়ে মারা গেলো হাজার হাজার শ্রমিক। এই ঘটনাটি ঘটার পর এল ডোরাডোকে অনেকেই ভয় পেতে শুরু করে। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে—এই এল ডোরাডো অভিশপ্ত! ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে এক বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযানের আয়োজন করলেন জার্মান অভিযাত্রী বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ্ অ্যালেকজান্দার ভন্ হামবোল্ট।

লেক গুয়াটাভিটা অঞ্চলে তন্নতন্ন করে প্রায় ছ'মাস সন্ধানকার্য চালিয়ে অবশেষে ব্যর্থ হন হামবোল্ট। এল ডোরাডোর হদিস তিনি পাননি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হামবুর্গে ফিরে যেতে হয় তাঁকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯১২ সালে এল ডোরাডোর খোঁজে এক অভিযান চালিয়েছিলেন খোদ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। তখনকার দিনে সেই অভিযানের খরচ ঠেকেছিলো প্রায় ষাট লক্ষ মার্কিন ডলারের কোঠাতে। খুবই ব্যয়সাধ্য ছিলো সে অভিযান।

দেড়শোটি লিকুইড ব্যাটারিচালিত পাম্পের সাহায্যে লেক গুয়াটাভিটার সবটুকু জল শুষে নেওয়াই ছিলো ব্রিটিশদের পরিকল্পনা। কিন্তু সত্তর-আশি ফিট জলরেখা কমতে না কমতেই বিগড়ে গেলো প্রায় সবকটি পাম্প! উন্মুক্ত লেকের নরম মাটিতে গেঁথে থাকা যে গয়নাগাঁটিগুলি পাওয়া গেলো, তা নিতান্তই সামান্য। বড়জোর হাজার দশেক ডলারের হবে। অভিযানের খরচই উঠলো না। উল্টে আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেলো!

বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরু থেকেই লেক গুয়াটাভিটা অঞ্চলে ক্যামেরায় ছবি তোলা অথবা যথাযোগ্য সরকারি অনুমোদনপত্র ছাড়া ঘোরাফেরা করাও নিষিদ্ধ করা হলো। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে লেকটিকে এক অসামান্য ঐতিহাসিক মূল্যের জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন কলম্বিয়ার তৎকালীন দেশনেতা গোঞ্জালেজ!

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীর দোরে এসে দাঁড়িয়েছি। এল ডোরাডোর খোঁজে অভিযান আজ আর হয় না। তবুও সেই সোনার শহরের খোঁজে আজও চকচক্ করে ওঠে অনেকের চোখের তারা। এল ডোরাডো সত্যি কি মিথ্যে জানি না! কেউ জানে না! কেউ না!

লেক গুয়াটাভিটার গভীর থেকে উদ্ধার করা সোনার শহর এল ডোরাডোর স্বর্ণালঙ্কার এবং খাঁটি সোনার মুখোশ ও শিরস্ত্রাণ।

যেমন জানে না 'অ্যাট্‌লান্টিস্', 'যাংগ্রিলা' অথবা 'গার্ডেন অফ্ ইডেন'-এর সত্যাসত্যও, তবুও এরা বেঁচে আছে গল্পকারদের কল্পনায়। দেশী-বিদেশী অসংখ্য লোককাহিনীতেও। কিংবদন্তীসম নানান ঘটনায়! এল ডোরাডোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'ম্যাকেনাস গোল্ড'-ও (Mckenna's Gold) পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছিলো। যদিও অনুমান মাত্র, তবুও বলি—হয়তো কলম্বিয়া সরকারই গোপনে বারংবার অভিযান চালিয়েছেন লেক গুয়াটাভিটার অতলে। হয়তো কিছুই পাননি! কিংবা হয়তো কোনো অভিযান হয়েইনি। হয়তো লেক গুয়াটাভিটার মধ্যিখানে শান্ত, গভীর জলের তলায় আজও পড়ে রয়েছে সোনার সে শহর। Pure Golden City! যার নাম—'এল ডোরাডো'।

ছবি : লেখক

মেজদাদার কারবার

দীপঙ্কর বিশ্বাস

॥ সূচনা ॥

ব্যবসা-ট্যবসার কোনো পরিকল্পনাই আমাদের মাথায় ছিল না। হরিদ্বারের সেই মহাজ্ঞানী সাধুবাবাই ব্যবসার পোকাটা আমাদের মগজে গুঁজে দিল। পোকাটা মনের ভেতর নড়েচড়ে ডিগবাজি খায় ; মগজটাকে ওলটপালট করে আর থেকে থেকেই নতুন ব্যবসার রূপ নিয়ে বাইরে এসে তুলকালাম লাগায়।

মেজদা, সেজদা, ঢাকনাদা, গণেশ আর আমার হরিদ্বার বেড়াতে যাবার একাধিক কারণ ছিল। একনম্বর, সেজদাকে এক ধন্বন্তরি কোবরেজ বলেছে যে ঠিক এই সময়ে হরিদ্বারের মতন চেঞ্জে, জিলিপি খেতে খেতে পায়চারি করলে, তোত্‌লামো কমতে বাধ্য। দুনম্বর, ঢাকনাদা, গণেশ আর আমি, তিনজনে সবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি। রেজাল্ট বেরোলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে কারুর বাড়ি থেকেই হরিদ্বার তো দূরের কথা, হাওড়া যেতে চাইলেও তাড়া করবে।

ঢাকনাদা মেজদার বন্ধু। একেবারে জান, মান, প্রাণের বন্ধু। লোক খুব ভালো ঢাকনাদা, শুধু একটু বেশি খায়, বেশি ঘুমোয় আর বেশি ভুলে যায়। ঢাকনাদা প্রথমে মেজদার সঙ্গে পরীক্ষা দিল। গেজেটে নাম নেই। গম্ভীর মুখ করে ধপ করে বসে পড়ল ঢাকনাদা, "বসে বসে পড়লে বুঝলি—এমন বসে পড়তে হয়। দুলে দুলে পড়তে হবে।" সেজদার সঙ্গে পরীক্ষা দিল ঢাকনাদা। মুখ আরো গম্ভীর হলো। "নাঃ; দুলে পড়লে দেখছি ঢুলে পড়তে হয়। আসল ব্যাপারটা বুঝেছি। চশমা নেই।" চশমা নিল ঢাকনাদা। পরীক্ষা দিল ছোড়দার সঙ্গে। রেজাল্ট বেরোতে চশমাটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঢাকনাদা। কিন্তু ধৈর্য হারাল না। চোদ্দজন সাধুবাবার সাড়ে তেরোটা তাবিজ, কবচ, মাদুলি সর্বাঙ্গে

এমন পরে ফেলল ঢাকনাদা, যে শুতে কষ্ট হয়। একটা আবার হাফ মাদুলি। মহাতান্ত্রিক শ্রীগন্ধমাদনেশ্বরেন্দ্রনারায়ণের কাগজে মোড়া ফুল। পড়ার সময় মোড়কটা বাঁ বগলে চেপে রাখতে হয়। এবার ঢাকনাদা পরীক্ষা দিয়েছে গণেশ আর আমার সঙ্গে। বাবা গন্ধমাদনেশ্বরেন্দ্র-নারায়ণ গন্ধমাদন তুলতে পারলেও ঢাকনাদাকে টেনে তুলতে পারেন কিনা সেটাই দেখার।

হরিদ্বার দেখে আমাদের সকলের মন ভরে গেছে। টল্‌টলে কাচের মতন গঙ্গা, চন্‌চনে ক্ষিদে—সব মিলিয়ে একদম ফার্স্ট ক্লাস। আমরা রেজাল্টের খাঁড়া পড়ার

আগে জীবনটা উপভোগ করে নিচ্ছি। সেজদা রোজ সকালে উঠে "জলে চুনতাজা, তেলে চুলতাজা" কথাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বারবার বলে তোত্‌লামো কমেছে কিনা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। কিন্তু এখনও জ্...জ্...জ্...জলে নেমেই ডুবে যাচ্ছে সেজদা।

সেদিন হরকিপৌড়ির পাশে পকৌড়ি আর বাদামভাজা চিবোতে চিবোতে ঘুরছি, হঠাৎ দেখি বিশাল ভিড়। উঁকি মেরে নজরে পড়ল এক ডিগডিগে সাধুবাবা কম্বলের আসনে ধ্যানস্থ। ইয়া জটা, ইয়া গোঁফদাড়ি। ঢুংঠাং করে পয়সা পড়ছে, সেদিকে তাকাচ্ছে না মোটে। চোখ পিটপিট করেও না। জানা গেল সাধুবাবার নাম শ্রীশ্রীডিগডিগেপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

কোথাও কিছু নেই, সাধুবাবা হঠাৎ তার চিমটেখানা ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল আর সেটা হাওয়ার মধ্যে পাক খেয়ে ঠকাস করে এসে পড়ল মেজদার মাথায়। আমরা হায় হায় করে উঠলাম, মেজদা চোখ কপালে তুলে ভির্মি যাবার উপক্রম। মেজদার চটকা কাটার আগেই কম করে দশজন শিষ্য মেজদাকে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল। ডিগডিগেজী প্রায়ই নাকি এমনটা করে। চিমটে যার মাথায় পড়ে সে বিশাল সৌভাগ্যবান হয়ে ওঠে। শিষ্যরা মেজদাকে ধরে বসিয়ে দিল বাবার সামনে। আমরাও সেঁধিয়ে পড়লাম ভিড়ের ভেতর।

সৌভাগ্যের ছিটেফোঁটা যদি মেলে, সেই আশায়। আস্ত এক কমণ্ডলু জল আমাদের গায়ে ঢেলে দিল ডিগডিগেজী। ভিজে জাব হয়ে গেলাম আমরা সবাই। মেজদা আর আমাদের হাত দেখে ডিগডিগেপ্রসাদ লাফিয়ে উঠল। জায়গা থাকলে হয়তো এক চক্কোর নেচেও নিত। "বিজলেস হোবে। বড়িয়া বিজলেস। বাড়ি গাড়ি সব হোবে। রূপেয়া রাখতে ট্যাঙ্কি লাগবে।"

আমরা পাঁচজনে চমৎকৃত হয়ে পাঁচজনের দিকে তাকালাম। মুহূর্তে স্বপ্ন নেমে এলো সক্কলের চোখে। ব্যবসার স্বপ্ন, টাকার স্বপ্ন, সুখের স্বপ্ন। লাল, নীল, হলুদ হরেক স্বপ্ন। প্রথমে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু প্রণামী দেবার পরেই বিশ্বাসটা গাঢ় হয়ে জমে বসল। আমরা "হুররে" বলে লাফিয়ে উঠে পরস্পরকে পালা করে জড়িয়ে ধরলাম।

সেজদা উত্তেজিত হলো, "ব্যা...ব্যা... ব্যা...ব্যা...।"

ঢাকনাদা আঁত্‌কে উঠলো, "কি সাংঘাতিক সাধুরে বাবা! দু মিনিটে অমুকে একটা আস্ত ছাগল বানিয়ে দিল!!! এমন তো কামাখ্যায় হয়!!! ভেড়া বানিয়ে দেয়!!!"

মেজদা বলল, "নাঃ! অমু মনে হয় ব্যবসার ব্যবস্থা করার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে।"

আমি আর সেজদা এক ঘরে থাকি বলে, আমি সেজদা হাঁ করলেই ওর কথা বুঝতে পারি। এটা বহুকালের বহু অভ্যাসের ফল। আমি বুঝিয়ে দিলাম, "না গো। সেজদা জানতে চাইছে ব্যথা করছে কিনা মেজদার মাথায়? অত জোরে চিমটেটা পড়ল তো, তাই।"

সন্ধ্যের ভেতরেই আমরা বুঝতে পারলাম, শ্রীশ্রীডিগডিগেপ্রসাদ ব্রহ্মচারী আমাদের কানে কি সাংঘাতিক ইঞ্জেকশন ফুটিয়ে দিয়েছে। T.A.B.C., কলেরা, ডিপথিরিয়ার ইঞ্জেকশনের চেয়ে হাজার গুণ বেশি জোরাল। ব্যবসা নামের পোকাটা কান বেয়ে আমাদের মগজে পৌঁছে ঘুরঘুর করে ঘুরতে শুরু করেছে। পোকাটা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হতে লাগল। আমাদের হরিদ্বার দেখা গেল ঘুচে। নিজেরাই খেয়াল করলাম যে বেড়ানোর দিকে নজর না দিয়ে, মালাই রাবড়ি খাওয়া ফেলে আমরা শুধুই চিন্তা করে চলেছি আর জটলা পাকাচ্ছি।

সক্কলের কলকাতা পানে মন, হরিদ্বারে তিষ্ঠনো দায়। ডিগডিগেজীর কথা মতন আমরা ব্যবসায় হাত ছোঁয়ালেই সোনা। অতবড় মহাপুরুষ, যে টাকার দিকে আড়চোখে পর্যন্ত তাকায় না, তার কথা তো আর মিথ্যে হতে পারে না। ঠিক হলো কলকাতা ফিরেই আমরা ব্যবসার বৈঠকে বসব। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্। বেকার 'সময়' নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। টাকা আর আমাদের মাঝের দূরত্বটা শুধুই সময়ের।

॥ আলোচনা ॥

আমাদের বাড়ির ছাতের চিলে-কোঠাতেই আমাদের আড্ডাখানা। বাবা, জ্যাঠাদের উপদ্রব নেই। পিসি, কাকারাও কেউ আসে না। ঘরে কটা চেয়ার, একটা টেবিল আর আমাদের নিজেদের টাকায় কেনা একটা ক্যারম বোর্ড। কলকাতায় পৌঁছোনর দিনই আমরা হাজির হলাম আমাদের আড্ডায়, বাজে তখন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা। শ্রীশ্রীডিগডিগেপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর একটা বেশ বড়ো সাইজের ছবি আমরা হরিদ্বার থেকে নিয়ে এসেছিলাম। সকলে মিলে ধরাধরি করে সেটা দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলাম। মেজদা একটা মালা পরিয়ে দিল ছবিতে। ঢাকনাদা কটা ধূপ জ্বালিয়ে ছবির কোণে গুঁজে দিল। গণেশ পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছোট সাইজের নারকেল বার করে আছড়ে ভেঙে বলল, "শুভ কাজ নারকেল ফাটিয়ে শুরু করতে হয়।"

নারকেল আর বাতাসা প্রসাদ পেয়ে আমরা ঝটপট বসে গেলাম আমাদের ব্যবসার প্রথম মিটিং-এ। পাঁচজনেই মনে মনে ব্যবসার জল্পনা-কল্পনা পুষে রেখেছিলাম, একে একে খোলসা করতে লাগলাম।

গণেশ বলল, "আমার মামাবাড়িতে সেজমামার পোলট্রির ব্যবসা আছে—"

ঢাকনাদা গণেশকে থামিয়ে দিল, "Tree মানে গাছপালার ব্যবসা খুব ঝামেলার। ওসব গ্রামে-গঞ্জে চলে। প্রচুর জায়গা-জমির দরকার।"

বাধা দিল মেজদা, "ইংরিজিতে কতো পেয়েছিস টেস্টে? অ্যাঁ? পোলট্রি হলো পশুপাখি পালনের ব্যবসা। গাছের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। হাঁস-মুরগী আর তাদের ডিম তৈরি করে বিক্রি করা। সহজ কাজ। লাভ প্রচুর। কতো লোক বাড়ির ছাতে করেই লাল হয়ে গেছে—"

আমি একটা খাতা নিয়ে বসেছিলাম, মিটিং-এর দরকারি পয়েন্টগুলো নোট করার জন্য। লিখতে লিখতে বললাম, "মন্দ না—ভেবে দেখা যেতে পারে।" সেজদা একটু মুখ খুলেছিল। "ব্য... ব্য...ব্য..."

ঢাকনাদা একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "আচ্ছা? তোত্‌লারা কি ব্যবসা করে?"

সেজদা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইল, "ক্...ক্...কে ত্...ত্... তোত্‌লা?"

"তুই নিজে। সর্বক্ষণ তোতলাস্ আবার জিজ্ঞেস করছিস কে তোত্‌লা?"

সেজদাকে এইরকম নিষ্ঠুর কিছু বললে আমার মনে খুব কষ্ট লাগে। আমি সেজদার হয়ে বলে উঠলাম, "সেজদা মোটেই সর্বক্ষণ তোত্‌লায় না। দিব্যি খায়, দায়, পড়ে, খেলে, ঘুমোয়। তোত্‌লায় তো শুধু কথা বলার সময়টুকু। তাও সবসময় না—"

সেজদাও ঝাল ঝাড়ল, "ঠি...ঠিক বলেছে। ত্-তোঁত্‌লারা কিন্তু পাশও করে।"

ঢাকনাদা হঠাৎ পাল্টা আক্রমণে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

গণেশ আমার সঙ্গে তাল মেলাল, "ওঃ। কানা, খোঁড়া, কবি, বৈজ্ঞানিক, উন্মাদ, উদ্ভট সক্কলে ব্যবসা করছে—"

মেজদা বলল, "Customer কিন্তু deal করতে দেব না। তুমি একবার রে-রে করলেই, তেড়ে যাচ্ছ ভেবে Customer পালাবে।"

সেজদার মুখ দেখে বুঝলাম প্রচণ্ড অভিমান হয়ে গেছে। ব্যবসায় থাকবে কিনা কে জানে?

মেজদা আর আমি আমাদের ব্যবসার পরিকল্পনাগুলো বললাম। বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর সেগুলোও নোট করা হলো। সেজদা হিমালয়ের মতন গম্ভীর মুখ

করে বসে রইল। গণেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে শুনছিল। কিছু বলেনি। হঠাৎ সকলের তাক লাগিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা শতচ্ছিন্ন চটি বই টেনে বার করল গণেশ। বইটার নাম—

'হাতে নাতে কুটির শিল্প
কম পুঁজিতে চোখ বুজিয়া
আশ্চর্য লাভ।'

গণেশদের বাড়িতে একটা বইয়ের ভাগাড় আছে। সেখান থেকেই বইটা জুটিয়েছে গণেশ। প্রচুর ব্যবসার সম্পূর্ণ খসড়া বর্ণনা করা আছে বইটাতে। অনেক বেজে গেছে, আমরা গণেশকে request করলাম সূচীপত্রটা ঝটপট পড়ে শোনাতে। গণেশ যতোই পড়তে থাকল, আমরা ততোই শিহরিত হয়ে উঠতে লাগলাম। আয়ুর্বেদিক জর্দা, সস্তায় ঘুঁটে, ভৃগুমুনির টুথপেস্ট, মনোহারী ঝাঁটা ইত্যাদি। শুনতে শুনতে আমাদের মনে হচ্ছিল একটা পালকি এগিয়ে আসছে। টাকার তৈরি পালকি। ভেতরে একগাল হাসি নিয়ে বসে আছেন লক্ষ্মীঠাকুর স্বয়ং। সময়ের এই এক দোষ। কাজ করতে গেলেই বড়ো তাড়াতাড়ি পালায়। রাত হয়ে গেছে। আমরা সভা ভঙ্গ করতে বাধ্য হলাম।

সারারাত আমাদের মনের ভেতর খটখট করে হেঁটে বেড়াতে লাগল, সরল ফিনাইল, তরল আলতা, মেটে সিঁদুর, গেঁটে বাতের মলম, জ্যাম-জেলির মতন আরো অনেক কিছু।

স্বপ্নে দেখলাম আমি ধু-ধু প্রান্তরে আমাদের তৈরি এক শিশি জেলি মাথায় ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ঘোড়ার শব্দ। একদিক থেকে উদয় হলেন গাণ্ডীবধারী অর্জুন; আরেকদিক থেকে দানবীর কর্ণ। এলেন পিতামহ ভীষ্ম। হাতে ব্রহ্মাস্ত্র মুখে হুইসিল। বললেন, "হুইসিল বাজালেই, যে জেলির শিশিটা আমায় এক বাণে এনে দিতে পারবে তাকে এই ব্রহ্মাস্ত্রটা দেব।" অর্জুন আর কর্ণ ধনুর্বাণ রেডি করলেন। ভীষ্ম বাজালেন হুইসিল। আমি দেখলাম দু দুটো বাণ আমার দিকে ছুটে আসছে। ভয়ে চোখ বুজলাম। হঠাৎ কচাৎ কচাৎ করে দুটো আওয়াজ হলো আর অট্টহাসিতে সারা আকাশ ভরে গেল। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুদর্শন চক্র দিয়ে দুটো বাণই কেটে বাবু "হ্যা হ্যা" করে হাসছেন। সুদর্শন চক্রটা পকেটে পুরে মাথার চুলটা আঁচড়ে নিলেন কেশব। তারপর আমার মাথার ওপর থেকে জেলির শিশিটা তুলে নিয়ে চেটে ফিনিশ করেই হাসতে হাসতে অদৃশ্য হলেন চিরসখা। কর্ণ আর অর্জুন হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন। ভীষ্ম ভীষণ রেগে দাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে শ্রীকৃষ্ণের ওপর রাগের ঝালটা ঝাড়লেন আমার ওপর এক বিশাল চড়ে। চড় খেতেই ভীষ্মের মুখটা পাল্টে হঠাৎ সেজদার মুখ হয়ে গেল, বলল, "হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে সোজা হয়ে শো।"

॥ প্রথম পদক্ষেপ ॥

আমাদের ব্যবসার স্থগিত মিটিং কথামতন শুরু হলো পরের দিন দুপুর একটায়। আবার বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি। সকলেই একমত যে ব্যবসার প্রথম পদক্ষেপটা খুব বুঝে-শুনে নেওয়াই উচিত। প্রথমেই লস্ খেয়ে হাত পোড়ালে, মনোবল এমন ভেঙে যাবে যে আর এগোনোই যাবে না। চারজনের চার রকম পরিকল্পনা। মেজদার অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম, ঢাকনাদার আধুনিক শ্যাম্পু, গণেশের আয়ুর্বেদিক ঘুঁটে, আর আমার মনোহারী ফিনাইল। সেজদার অভিমান এখনও কাটেনি। Pacific Ocean-এর মতন নীরবে ঘাপটি মেরে বসে আছে সেজদা। ব্যবসায় থাকবে কিনা কে জানে। ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর মেজদা বলল, "অনেকক্ষণ একই কথা হলো, কোনো সমাধান নেই। ক্যারমটা পাড়। একটু খেলা যাক। মনটা ফ্রেশ হয়ে যাবে। তাজা মন নিয়ে আবার লাগা যাবে আলোচনায়।" সবে এক বোর্ড খেলেছি কি খেলিনি, এমন সময় ঘরের দরজায় উঁকি দিল আমার দুই দিদি, বড়ো আর মেজ। দুজনের কোলে দুটো বাচ্চা। আমার দুই ভাগ্নে গুলু আর টনি। বড়দির বড়ো ছেলে পান্তু, বড়দির হাত ধরে দাঁড়িয়ে। পাঁচজনের মুখে পাঁচগাল হাসি। আমাদের বয়স অল্প হলে কি হয়, আমাদের কিছু দাদা-দিদির কিন্তু প্রচণ্ড বয়েস। বড়দি, মেজদিকে সহজেই মাসিমা কাকীমা বলে চালানো যায়। বড়দার তো এতো বয়েস যে অনায়াসে বাবা-জেঠাদের মতন মাথার মাঝে টাক রাখতে পারে। আমাদের ব্যবসার আলোচনা যে বাড়িময় ছড়িয়েছে, তার আভাস আমরা সেই প্রথম পেলাম। মেজদি টনিকে ক্যারম বোর্ডের ওপর ধপ্ করে বসিয়ে দিয়ে বলল, "তোদের জন্য একটা দারুণ starting business-এর আইডিয়া, আমি আর বড়দি অনেক মাথা খেলিয়ে ভেবে এসেছি। কোনো investment নেই, শুধুই লাভ আর লাভ। মেজদির কথা শুনে আমরা ক্যারম বোর্ডের ওপর ছেলেখেলা করার অপরাধটা হজম করে নিলাম, "কি বিজনেস?"

"তোদের তো এখনও অনেকদিন ছুটি। তোরা একটা ক্রেশ খোল না।"

আমরা পাঁচজনে পাঁচজনের সঙ্গে চোখ পাল্টালাম। ক্রেশ কথাটা সবার কাছেই নতুন। মেজদা শুধোল, "ক্রেশটা আবার কি? ক্রশ জানি, ক্রুশ জানি, ক্রোশ জানি—"

আমি যোগ করে দিলাম, "আক্রোশও জানি, কিন্তু ক্রেশ!!!"

আমাদের সপ্রশ্ন মুখগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে বড়দি বলল, "ক্রেশ জানিস না? ক্রেশ হলো বাচ্চাদের লালন-পালন করার জায়গা। এককথায় মা-বাবা ছাড়া শিশুপালন কেন্দ্র। শিশুর পাল থেকে পয়সা রোজগার আর কি—"

"তাকে তো অনাথাশ্রম বলে।"

"ক্রেশ হলো স্বল্প সময়ের অনাথাশ্রমের মতন। অর্থাৎ মা-বাবারা কাজে বেরোলো, ক্রেশের হেফাজতে দিয়ে গেল তাদের মিষ্টি মিশুকে শিশুদের। ক্রেশের লোকেরা তাদের দেখাশোনা করল। ভুলিয়ে রাখল। কাজের শেষে যার যার শিশু নিয়ে ঘরে ফিরল মা-বাবারা। বিনিময়ে প্রচুর টাকা দিল ক্রেশকে।"

মেজদা বলল, "বোঝা গেল। পোলট্রিরই মতন। পশুপালনের বদলে শিশুপালন। তার থেকে রোজগার। শিশুর পাল থেকে পয়সা।"

"এক পয়সাও পুঁজি লাগবে না। তোদের আড্ডার ঘর আছেই। একটু শুধু নজর রাখা।"

"দারুণ আইডিয়া তো!!" বলল গণেশ।

আমরাও সকলে গণেশের মতন উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই দারুণ আইডিয়া। আড্ডার ঘর আমাদের আছেই। আমরা নিজেদের মতন থাকবো, আড্ডা দেব, ক্যারম খেলব। তফাতের ভেতর শুধু ঘরের মেঝেতে খেলে বেড়াবে মিষ্টি নিষ্পাপ শিশুরা। কটা ঘণ্টা কাটলেই মা-বাবারা ফিরে এসে টাকা দেবে। অনেক টাকা। No investment। একটু শুধু নজর রাখা, ব্যস। আমার মনে একটা মৃদু খটকা লাগল। গণেশকে কানে কানে বললাম, "শিশুরা যদি এতোই সহজ হবে, তাহলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেপে মেপে গিয়ে বেকার শিশুপাল বধ করলেন কেন?"

গণেশ বলল, "আহাহা সে তো শিশুর পাল। কয়েকটা নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে তার অনেক...।"

বড়দি একটা দয়ালু মুখ করল, "Ideaটা তোদের যখন পছন্দ, তখন ট্রায়াল দেবার একটা সুযোগ করে দিচ্ছি আমরা। গুলু আর টনিকে তোরা ঘণ্টা তিনেকের জন্য রাখবি। আমরা একটা সিনেমা যাচ্ছি। পাস্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, ওটা একটু দুরন্ত। কিন্তু গুলু আর টনি ভারি শান্ত আর মিষ্টি। ঠিক যেন ক্ষীরের পুলি। ঘরে যে আছে তা তোরা টেরই পাবি না।"

মেজদি বলল, "ঘণ্টা তিনেক মোটে রাখবি। ব্যস। আমরা ফিরে এসে তোদের দশ দশ কুড়ি টাকা দিয়ে, যে যার ছেলে ফেরত নিয়ে নেব। তবে একটা কথা—টনি আর গুলুকে তোদের সম্পূর্ণ নিজেদের জিম্মায় রাখতে হবে। মা বা অন্য কারুর সাহায্য নিলে কিন্তু টাকা দেব না। আমাদের শো শুরু হয়ে যাবে, আমরা আসি।" দিদিরা বিদায় নিল।

ক্যারম খেলায় ছেদ অনেক আগেই পড়েছে। মেজদা আর ঢাকনাদা বলল, "এই দারুণ আইডিয়াটা কিন্তু আমাদের মাথায় আসেনি। কদিন কিছু বাচ্চা রাখলেই অন্য ব্যবসার পুঁজি তুলে নেওয়া যাবে। আজকাল কতো মায়েরা অফিসে কাজ করে। একটা ভালো সাইনবোর্ড

বাড়ির সামনে লটকে দিলেই দেখবি পটাপট শিশু হাজির।"

॥ শিশু সরল জীব ॥

আমি ঝটপট একটা শতরঞ্চি এনে ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম। কতোগুলো খেলনা আর জিনিস, যা হাতের কাছে ছিল তাই দিয়ে আমরা গুলুকে বসিয়ে দিলাম শতরঞ্চিতে। খাসা ছেলে গুলু, যা পেল তাই নিয়ে সুন্দর খেলা শুরু করে দিল। টনিকে ক্যারম বোর্ড থেকে নামানো হয়নি। মেজদা আর ঢাকনাদা ওকে দেখছিল। হঠাৎ ওরা আর্তনাদ করে উঠল। আমি আর গণেশ উঠে দেখলাম, টনি ক্যারম বোর্ডের ওপর যা করেছে তাতে ক্যারম বোর্ডের মা থাকলে সর্দির আশঙ্কা করত। টনিকে কোলে নিয়ে ক্যারম বোর্ডের জল ঝেড়ে, ছাতের রোদে শুকোতে দিলাম আমরা। টনির মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। গণেশ বলল, "অভিমান করেছে বোধহয়। সিংহাসনচ্যুত হয়ে।" গণেশের কথা শেষ হলো না। ডুকরে চিৎকার করে উঠল টনি। ভাগনাদের কান্না শুনতে আমি খুবই অভ্যস্ত। কিন্তু এতো মন দিয়ে শুনতে হয়নি আগে কখনও। দাড়িওলা ড্রাইভারেরা যে সব বিরাট-বিরাট লরি দিয়ে অনায়াসে লোক চাপা দেয়, তাদের হর্ন অনেকটা টনির কান্নার মতন। বাপ্‌রে...গলার কি জোর! লরির হর্ন থামে কিন্তু টনির কান্না থামে না। লরির হর্ন এতো কাছ থেকে শুনতেও হয় না।

আমরা পাঁচজনে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। টনি পরিত্রাহি চিৎকার চালাতেই লাগল। মেজদা বলল, "এক্ষুণি চুপ করানো দরকার। নাহলে কেউ এসে পড়বে, আমরা আর টাকা পাবো না।" ঢাকনাদা টনির মুখে একটা হাত চাপা দিল তাতে আওয়াজটা একটু কমল। হরেকরকম মজার মজার মুখ করতে পারে ঢাকনাদা। টনির মুখের সামনে গিয়ে সেইসব উদ্ভট মুখ করতে লাগল ও। মনে হলো বিকৃত মুখের ঢাকনাদাকে বেশ পছন্দ করেছে টনি। কান্না-টান্না থামিয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল ঢাকনাদার দিকে। মেজদা বলল, 'এতোক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল ঢাকনা। তোর স্বাভাবিক মুখ দেখে টনি ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। তুই এইভাবেই থাক।"

ঢাকনাদাকে দেখে টনি উৎফুল্ল ছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি যে এতোক্ষণ ধরে ঢাকনাদাকে আরেকজনও নিরীক্ষণ করছিল। সে আমাদের অন্য শিশু, গুলু। গুলুর চিৎকার করে কান্না শুরু হওয়াতে আমরা খেয়াল করতে বাধ্য হলাম। গুলুর বোধহয় ঢাকনাদার এমন মুখ পছন্দ না। গুলুর গলার জোর টনির চেয়ে মোটেই কম না। তবে আওয়াজটা লরির হর্নের মতন না। ভীমের মতন পালোয়ানেরা যে ক্লাসিকাল গান শুনে পালায় তাকে বলে ভীমপালশ্রী। গুলুর কান্নার আওয়াজটা ঠিক সেই রকম। আমি বললাম, "ঢাকনাদা, গুলু ভয় পাচ্ছে। শীগগির স্বাভাবিক মুখ করো।"

ঢাকনাদার স্বাভাবিক মুখ দেখেই আবার হর্ন বাজিয়ে দিল টনি।

মেজদা বলল, "এ তো ভারি মুশকিলে পড়া গেল....।"

গণেশ জিজ্ঞেস করল, "শিশুদের স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেয় কেন বলতে পারবে?"

মেজদা খেঁকিয়ে উঠল, "গণেশ, এটা বড়ো বড়ো বাজে কথা আলোচনার সময় নয়। এটা ব্যবসার প্রথম ধাপ। আমি দেখি খেলনাপাতি কি পাওয়া যায়।"

গণেশ বলল, "স্বর্গের শান্তি বজায় রাখতেই মনে হয় শিশুদের মর্ত্যে পাঠায়।"

মেজদা খুঁজে খুঁজে দুটো প্লাস্টিকের টেবিল টেনিস র‍্যাকেট এনে গুলু আর টনির হাতে ধরিয়ে দিল। তাতে দুজনেরই

কান্না থামল। বাজে কথা বলেনি গণেশ, নিমেষে বোঝা গেল শান্তি বলে একটা জিনিস ঘরে ফিরেছে। ঢাকনাদা বলল, "আমার মনে হয় দুজনেরই খুব ক্ষিদে পেয়েছে জানিস। আমি রচনা বইয়ে পড়েছি, বাচ্চারা ক্ষিদে না পেলে অমন পিলে চমকানো চিৎকার করে না।"

"ধ্যুৎ। ওদের পিলে এখনও গজায়ইনি, চমকাবে কি করে!"

"দাঁতও গজায়নি মনে হয়।"

"যতোক্ষণ হাঁ করে কাঁদছিল ততক্ষণ দেখলি না কেন হতভাগা উঁকি মেরে?"

"কি বাজে বকছিস!! মুখের ভেতর উঁকি মেরে কখনও পিলে দেখা যায়? আচ্ছা আচ্ছা ডাক্তারেরাও পারে না।"

"আঃ। আমি দাঁতের কথা বলছি। গজিয়েছে কিনা। অতক্ষণ কাঁদল, তখন দেখলি না কেন?"

"আবার একটু কাঁদতে বললে হয় না!"

"ওদের ক্ষিদে পেয়েছে এটা ঠিক। কি করে বোঝা যাবে কি খাবে?"

"দেখ শিশু অত্যন্ত কচি, কোমল, সরল প্রাণী। দাঁত উঠলে একরকম খায়, না উঠলে অন্যরকম।"

"কিন্তু দুধ সর্বদা খায়।"

"এই দুপুর দুটোর সময় দুধ কোথায় পাবো? তার চেয়ে মুখে আঙুল দিয়ে দেখ দাঁত উঠেছে কিনা।"

গণেশ গুলুকে কোলে করে দন্তের আদ্যন্ত তদন্তের প্রয়াস নিল। আমি বললাম, "ছেলে ভুলোনো আওয়াজগুলো কর না, যাতে অন্যমনস্ক হয়ে ভুলে থাকে।"

"ঠিক বলেছিস।" বলে গণেশ গুলুকে ভোলাতে লাগল, "হনুলুলু, গুলুঘুলু, কথাকলি নামাবলী..." তারপর গুলুর মুখে একটা আঙুল পুরে দিল। সেকেন্ড খানেকও কাটল না, গণেশ "বাবাগো" বলে একটা পাঞ্জাব মেলের মতন আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল। কি হয়েছে তা নিয়ে বেকার প্রশ্ন আমরা তুললাম না। গণেশ প্রথম আঙুল, মানে তর্জনীটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মুখে পুরে দিল। এবার নিজের মুখে।

মেজদা বলল, "ওই আঙুলটা বোধহয় গুলুর তেমন পছন্দ না। অন্য আঙুল দিলেই পারতিস।"

গণেশ গম্ভীর গলায় বলল, "একটু মলম দিতে পারবি?"

মেজদা আর ঢাকনাদা একসঙ্গে ভর্ৎসনার গলায় বলে উঠল, "ছিঃ। গণেশ। একটা অবোধ অসহায় শিশু একটু কামড়েছে বলে, ওর মুখে মলম গুঁজে দিবি? তুই কি পিচাশ না নিশাচর না বোম্বেটে!!!"

"আঃ। আঙুলে লাগাবো।" বলে গণেশ আঙুলটা চুষতেই থাকল।

ঘরের শান্তি কিন্তু আর নেই। গুলু আর টনি টেবিল টেনিসের র‍্যাকেট পেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, তাদের সম্বিত ফিরেছে। তারা একসঙ্গে জোর গলায় জানিয়ে দিচ্ছে, "ঘরের শান্তি আর নেই।"

মেজদা আর ঢাকনাদা গণেশকে খেঁকিয়ে উঠল, "তুমি কাঁদিয়েছ, তুমি এবার থামাও তোমার হরেক কসরৎ দেখিয়ে।"

গণেশ সত্যিই হাজারো কসরৎ জানে। ক্যারাটে, কুংফু, জুডো, ট্যাকেন্ডোর মতন আরো অনেক। গণেশ ঝটপট লেগে পড়ল। নন্দী, ভৃঙ্গীর মতন হাত-পা নেড়ে হরেকরকম মুখ বানিয়ে গুলু আর টনির কান্নার সামাল দেবার চেষ্টা চালাল সে। গণেশ চিৎ হলো, উপুড় হলো, আর্চ করল, হাতের ওপর দাঁড়াল কিন্তু কান্না থামল না। গণেশ উঠে দাঁড়াল (পায়ের ওপর) মাথায় এভারেস্ট জয় করার সমস্যা নিয়ে, টেবিলে। নানারকম অঙ্গভঙ্গি শুরু করল টেবিলের ওপর। গুলু আর টনি শতরঞ্চিতে বসে একমনে হাঁ করে বিচারকের ভঙ্গিতে দেখতে লাগল। মুখে হাসি নেই, কান্নাও নেই। মুখের ভাব কান্না থেকে হাসির রেললাইনের মাঝবরাবর। টনি আর গুলুকে অবশেষে হাসাতে পারল গণেশ। টেবিলের ওপর শীর্ষাসন করে। শীর্ষাসনে, মানে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে টাল সামলানো ভারি শক্ত। আচ্ছা আচ্ছা যোগীরাই পারে না। গণেশও পারল না। ঠিকরে পড়ল মাটিতে, টেবিলের ওপর থেকে, দেওয়ালে কপাল ঠুকে। ঠিক সেই মুহূর্তে গুলু আর টনি হাসিতে ফেটে পড়ল। দুজনেই হাততালি দিয়ে উঠল। হাসি উপচে পড়ল ওদের সর্বাঙ্গে। গুলু গণেশকে এই প্রথম request করল "আবাল কলো"। গণেশ পড়াতে আমরা দুটো আলু খুঁজে পেলাম ঘরের ভেতর। গণেশের মাথায় লুকোনো ছিল। পেলাম গণেশের কপালে। গণেশ শতরঞ্চির ওপর জিরোতে লাগল। টনি আর গুলুর মুখ আবার রেললাইন ধরে চলল কান্নার দিকে। পৌঁছোল ইস্টিশনে। বাজল ঘণ্টা, বাজল সিটি। আবার লরির হর্ন আর ভীমপালাশ্রী।

মেজদা, ঢাকনাদা আর সেজদাকে বলল, "তোরা একটু ঘোড়া ঘোড়া খেল না। বাচ্চারা ওই খেলাটা খুব পছন্দ করে। দেখবি ঠিক চুপ করে থাকবে। আমরা ততক্ষণ essay বই খুলে দেখি দাঁতওলা বাচ্চার কি খাওয়া উচিত। সেটা যোগাড় করে আনি।"

সেজদা আর ঢাকনাদা রাজী হয়ে গেল ঘোড়া ঘোড়া খেলতে আর খেলাতে। মেজদা ছুটল রচনার বই আনতে। জ্ঞানের অভাবেই ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পারছি না আমরা। দেখা যাচ্ছে ছেলেদের সঙ্গে খেলা আর যাই হোক ছেলেখেলা নয়। রচনা বই নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরল মেজদা। ঘরের ভেতর তখন বেশ নিশ্চিন্দি। সেজদা আর ঢাকনাদা চার হাত-পায়ে, মন দিয়ে ঘরময় হামাগুড়ি মেরে চলেছে। গুলু আর টনি পিঠে বসে র‍্যাকেট দিয়ে ওদের বেদম পেটাচ্ছে। দুজনেরই মুখে উছলে পড়ছে সরল হাসি। মেজদা একগাল হেসে বলল, "পিটিয়ে ঘোড়া বানাচ্ছে। ছেলে দুটোর বেশ বুদ্ধি আছে তো। তবে পারবে না।" ঢাকনাদা আর সেজদা আড়চোখে কটমট করে তাকাল। তার বেশি কিছু করার নেই।

রচনার বই খুলে মেজদা আর আমি দেখতে লাগলাম। স্পষ্ট লিখেছে, "শিশু অতি সরল জীব...এরা কামড়ালে কিছু মনে করতে নেই। কামড় ফেরত না দিয়ে উল্টে আদর করাই উচিত...।' বইটা উল্টে-পাল্টে আমাদের মনে হলো যে দাঁতওলা শিশুরা নির্বিঘ্নে জেলি মাখানো পাঁউরুটি খেতে পারে। বাড়িতে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ হয়েছে, সকলে শুতে

লেকিন ভাগেগা কাঁহারে?

গেছে। আমি জেলি আর পাঁউরুটি নিয়ে দ্রুত ফিরলাম উপদ্রুত এলাকায়। ঘরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আমার মন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ঢাকনাদা আর সেজদা ঘোড়াঘোড়া খেলা ছেড়ে উবু হয়ে হাঁটুর পরিচর্যা করছে। গুলু আর টনি ঘোড়া হারিয়ে, শোকে অধীর হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে, কান্নার আগের দমটা নিচ্ছে। আমি আর মেজদা একসঙ্গে খ্যাঁক করে উঠলাম, "আচ্ছা—এতো অধৈর্য হলে কখনও ব্যবসা হয়?"

ওরা দুজনেও হাঁ হাঁ করে তেড়ে উঠল, "হাঁটু দিয়ে অতো হাঁটাহাঁটি করা সম্ভব না। ব্যবসা করব বলে কি সারাজীবন হামাগুড়ি দিয়ে কাটাতে হবে নাকি? পনের মিনিট কেটে গেছে। ছাল-চামড়া উঠে হাঁটুর শিককাবাব হয়ে গেছে বহুক্ষণ আগে। বাকি হামা তোমরা দাও।"

ঘোড়া হারানোর শোক যে সাংঘাতিক তা গুলু আর টনি আমাদের জোর গলায় জানিয়ে দিল। আমার মনটা ওদের দুঃখে সত্যিই নড়ে উঠল। মহামান্য রানা প্রতাপকে ঘোড়া হারানোর শোক, জোঁকের মতন চেপে ধরেছিল। চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুরাও ঘোড়া হারালে কপাল চাপড়ায়। এরা তো শিশু। মেজদা দু স্লাইস পাঁউরুটিতে জেলি মাখিয়ে সেজদার হাতে দিল, "মুখে পুরে দে।"

সেজদা নিমেষে পুরোটা মুখে গুঁজে দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেজদা ঝাঁঝিয়ে উঠল, "হতভাগা গিরগিটি কোথাকার। তোর নিজের মুখে পুরতে কে বলেছিল!!"

"ব্...বুঝবো ক্...কি করে। হামাগুড়ি দিলে আমার বেদম খিদে পায়। মার কাছে শুনেছি।"

রচনা বইয়ে ভুল লেখে না। "শিশুরা কথা বলে সব বোঝাতে না পারলেও নিজেরা সব বোঝে। ইহাদের অভিমান অতিশয় প্রখর।"

গুলু সেজদার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা আধো আধো আধা বাক্যবাণ ছাড়ল, "আমার পাঁউলুটি", তারপরেই অভিমানভরা ভীষণ আর্তনাদ করে উঠল। শিশুরা যে সমব্যথী তা টনি আমাদের জানাল, আরো সাংঘাতিক আর্তনাদ জুড়ে। টনি কথা বলতে পারলে নিশ্চয়ই সেজদাকে যা তা বলত। আমরা আবার জেলি-পাঁউরুটি খাওয়াতে গেলাম ওদের। অভিমানের বশে কেউ একটু মুখ তুলল না পর্যন্ত। মেজদা আর ঢাকনাদা সেজদার দিকে তেড়ে গেল, "তোর জন্যই হতভাগা এই বিপত্তি।" "এতো লোভ কিসের রে? রক্তচোষা বাদুড়ের মতন বাচ্চার খাবার খেয়ে ফেলিস!" গুলু আর টনি একটানা কেঁদেই চলল। আমাদের মনে হলো ব্যবসার প্রথম পদক্ষেপেই হড়কে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। আমি বললাম, "মেজদা, মান বাঁচাতেই হবে। ব্যবসা বাঁচাতেই হবে। লস্ দিয়ে শুরু করা অসম্ভব। সাড়ে চারটে বাজে। আর মোটে ঘণ্টা খানেক বাকি। একটাই উপায় আছে। গণেশ টনিকে কোলে নিক। আমি গুলুকে নিচ্ছি। দুজনে দুদিকে বেড়াতে চলে যাবো। ঘণ্টা খানেক বেড়িয়েই ফিরে আসব। বেড়ালে ওরা খুব ভালো থাকবে। দুজন একসঙ্গে থাকলে, একজন কাঁদলেই অন্যজন কাঁদছে। সেটাও কমবে। তাছাড়া বাড়ির কেউ টেরটি পাবে না।"

মেজদা-টেজদারা আমার কথায় রাজী হয়ে গেল।

॥ শিশু বিহার ॥

আমি গুলুকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। গণেশ টনিকে নিয়ে বেরোল। গুলু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ওর কান্নায় সেটা টের পেলাম। বেচারার দোষ নেই। আমাদের যেমন অজস্র ভাগনা, ভাগনী, ভাইপো, ভাইঝি, ওদেরও তেমন প্রচুর মামা, মাসি, কাকা, পিসি। তাছাড়া ওর যা বয়স, তাতে নিশ্চয়ই স্মৃতিশক্তি বেশি গজানোর সুযোগ পায়নি এখনও।

গুলুর কান্না শুনে মনে হলো বন্ধ ঘরে ওর লজ্জা করছিল কাঁদতে। এখন খোলা রাস্তায়, পার্কের পাশে অনেক স্বস্তিতে চেঁচাচ্ছে। আমি গুলুকে নিয়ে যেতে যেতে ক্রমাগত বোঝাচ্ছিলাম, "মাথা ঠাণ্ডা রাখো প্রাণগোপাল, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।" এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে একটু ঝুলঝাড়া কাটিং দেখতে, "ছোট ছেলেদের অত কাঁদতে দিতে নেই ভায়া। দাঁতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে, মশা কামড়াতে পারে।"

আমি জবাব না দিয়ে আরো জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে বোঝাতে থাকলাম, "মাথা ঠাণ্ডা রাখো প্রাণগোপাল...।"

এগিয়ে এলো একপাল কলেজের মেয়ে, "ওমা, কি মিষ্টি বাচ্চা—কি

Sweet—এই বিশ্রী বদ ছেলেটা, কোলে নিয়ে, ওকে খালি কাঁদাচ্ছে। কান্নাটাও কি মিষ্টি—বল!"

আমি থামলাম না। "মাথা ঠাণ্ডা রাখো প্রাণগোপাল—" বলে সান্ত্বনা দিতে দিতে এগিয়ে চললাম।

এবার এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা। গুলুর গাল টিপে দিয়ে বললেন, "মা-বাপেরও বলিহারি—এমন ফুটফুটে কাঁদিয়াল ছেলে—তার এমন বুড়ুটে নাম! প্রাণগোপাল!! ওর নাম হওয়া উচিত ছিল বীরেন্দ্রকেশর বা অনিকেত বা—"

আমি আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না। খ্যাঁক করে উঠলাম, "আঃ...। প্রাণগোপালটা ওর নয়, আমার নাম। নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছিলাম আমি। ওর ভালো নাম পার্থসারথি। ডাক নাম গুলু। অবশ্য ওর নাম হওয়া উচিত কুরুক্ষেত্র।" পার্থসারথির বিকার নেই। নির্ভয়ে কান্না চালিয়ে চলল।

এগোতে এগোতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা দারুণ আইডিয়া এসে গেল। বিপদের সময় বাঁচানোর জন্য দুটি জিনিসের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। এক পুলিস। আরেক ভগবান। ভগবান ভারি ঝামেলার বস্তু। পাত্তা পাবার ঝক্কি অনেক। ফুল, বেলপাতা, ঢাক, ঢোল, পেসাদ, ঘণ্টা, মন্তর-টন্তর লাগে। তার চেয়ে পুলিস ঢের ভালো। সন্ধান পাবার জন্য অত ঝামেলা করতে হয় না। শিশুরা পুলিসকে ভয়ও করে। চুপ করে যায়, দেখেই। পরিত্রাহি ক্রন্দনরত পার্থসারথিকে নিয়ে আমি হাঁটা দিলাম চৌমাথার দিকে, যেখানে একটা তো বটেই, বেশি পুলিসও থাকে।

দূর থেকে পুলিসকে দেখতে পেলাম আমরা। দিব্যি ভারিক্কি মার্কা পুলিস। বড়ো বড়ো গোঁফ আছে। হাতে খৈনি ডলছে। ঠিক যেমন চেহারাটি পুলিস কথাটির সঙ্গে মনের ভেতর পায়চারি করে। আমি গুলুকে ভয় দেখালাম, "ওই যে—পুলিস দেখেছো তো—এক্ষুণি ধরে নিয়ে যাবে।"

পুলিস দেখে গুলু কান্না থামাল। একমনে পুলিসকে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে সে শুধোল, "ছোটদেল পুলিচ্ হয় না?"

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম, যে বড়-ছোট সকলের জন্য একরকমেরই পুলিসি ব্যবস্থা। গুলু অনেক খেটে আমায় বোঝাল যে ও জানতে চায়, ছোট, মানে ওর মতন পুলিস হয় কিনা। উত্তরটা আমার ঠিক জানা ছিল না। তাই বললাম, "পুলিসের সামনে দুষ্টুমি করলে পুলিস ধরে নিয়ে যায়।" সেই একই কথা, যা পুলিস আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক মা তাদের ছেলেদের বলেছে। গুলুর মুখ দেখে মনে হলো পুলিসের পেছনে দুষ্টুমির ফলটাও ও জানতে চায়। আমরা তখন কর্মরত পুলিসের বেশ কাছে চলে এসেছি।

আমার কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে গুলু আমাকে হঠাৎ ভীষণ চমকে দিল। ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়ে, "আমি একটা পুলিচ নেবো!!" বলে খুব জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর সেই লোমহর্ষক গলায় কাটা রেকর্ডের মতন কেঁদেই চলল। আমি ভাবতে লাগলাম, ওকে পুলিস দেওয়া সম্ভব কিনা! উচিত কিনা!!

পুলিসের নজর ঘুরল, গাড়ির হেডলাইটের মতন ত্যারছা হয়ে আমার দিকে। চৌমাথায় প্রচুর লোক। তাদেরও অনেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল। আমি যে হাড়কাঁপানো ভয়টা পেলাম সেটা অমূলক নয়। সকলের চোখে পষ্ট দেখলাম একই অভিব্যক্তি, "ছেলেধরা না হয়ে যায় না। বেটাকে ধরে আচ্ছা করে ধোলাই লাগাতে হবে।"

এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, পাকা গোঁফ আর লাঠি নেড়ে। পেছনে বেশ কটা লোক, তারও পেছনে পুলিস, "বলি ছেলেটা কার?"

"আমার ভাগনে।"

"অ্যাঁ...। ভাগনে না হাতি। ভাগনে অমন চেঁচায় নাকি?"

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম গুলুর দিকে। নাঃ। বৃদ্ধের দোষ নেই, বেশি খাইয়ে বড়দি যা বহর করেছে গুলুর, তাতে সংশয় জাগতেই পারে। গুলুর চিৎকারে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল, "আমি পুলিচ নেবো...ওঁ ওঁ ওঁ...।"

একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক সান্ত্বনা দিলেন, "ছিঃ। বাবা! পুলিস কি একটা নেবার জিনিস—কতো ভালো ভালো জিনিস রয়েছে দুনিয়ায়, তার একটা চাও না।"

পুলিসটা এবার ভিড় ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে এলো। বেড়াল যেমন ধীর, নিশ্চিন্ত পায়ে বেওয়ারিশ মাছের দিকে এগোয়, চলাটা সেরকম। আমার বুকটার ভেতর থেকে আমি দুটো টিপ্ টিপ্ শব্দ পেলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "স্যার, হামকো ভাগনা হায়।"

চারদিকের ক্ষিপ্ত জনতা এবার বাক্যবাণে আমায় জর্জরিত করল, "ভাগনে হায় না কচু হায়।"

"উঁহুঃ, ভাগনা কখনও মামাকা কোলমে অত কাঁদতা হায়?"

"সিপাইজি, আপ উসকো তুরন্ত পকড় লিজিয়ে।"

"এঃ। ভাগনে হলে কখনও মামার কোল ছেড়ে অমন ভাগতে চায়!"

"ভাগনে না ঘণ্টা। যথার্থ মামা হলে ভাগনের দুঃখের ও ভাগ নিত। তা না কচি ছেলেটাকে সটকে এনে কাঁদাচ্ছে।"

"এক লম্বর কা ছেলেধরা হায়। দারোগাজি, আপ লড়কাকো বাঁচাইয়ে।"

এই কাতর অনুনয়টাই পুলিসের মর্মস্থলে পৌঁছোল। পুলিস আমার ঘাড়ের ওপর এগিয়ে এলো। আমি নার্ভাস গলায় আবার বললাম, "হামকো ভাগনা হায়, স্যার।"

পুলিস খুব সিরিয়াস মুখ করে বলল, "আভি তো তুমকো ভাগনা হি হোগা। লেকিন ভাগেগা কাঁহারে? তেরা সামনে খাড়া হায় মহাবীর কনস্টেবল।"

ডায়ালগের মাঝপথে বাদ সাধল গুলু। হঠাৎ "পুলিস নেবো"র রেকর্ডটা আরেকবার বাজিয়ে, একটা বিশাল লাফ মেরে ঝুলে পড়ল পুলিসের গলা জড়িয়ে।

অতর্কিত আক্রমণে পুলিস থতমত খেয়ে কোনোক্রমে টাল সামলালো। পুলিসের কোলে গুলুর কান্না উবে গিয়ে সর্বাঙ্গে উথলে উঠল মোক্ষলাভের হাসি।

সিপাইজি সক্কলকে আশ্বাস দিল যে, আমার পেছন পেছন আমার বাড়ি গিয়ে,

বাচ্চাকে মা-বাবার কাছে পৌঁছে, আমার যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করে, তবে নিরস্ত হবে। জনতার ভেতর থেকে দুয়েকজন কিছু লাস্ট মিনিট সাজেশন দিল, "দেখতে বহুত বেয়াড়া লাগতা হায়।"

"পকেটমে বোমাটোমা থাকতে পারতা হায়।"

"আপ হুইসিল বাজাকে আরো পুলিস বুলাইয়ে। একলা মাৎ যাইয়ে।"

পুলিসজি প্রেস্টিজের খাতিরে জানাল যে তার সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। আমার মতন বেয়াড়া ছেলেধরা, একা সামলানোর অভ্যাস তার আছে। পুলিসের নির্দেশ মতন আমি চললাম আগে আগে বাড়ির দিকে। হাসিখুশি গুলু কোলে পুলিস আমার পেছনে পেছনে।

আমাদের বাড়ির দু পা আগেই ঘোষেদের রোয়াক। সেখান থেকে বড়দা এলো আমাদের দেখে, অবাক মুখ নিয়ে। বড়দা নামজাদা লোক। এলাকার সব্বাই চেনে। সিপাইজি বড়দাকে চিনত। গুলুও দেখলাম বড়দাকে চেনে আমার চেয়ে অন্তত চোদ্দগুণ বেশি। গুলু একলাফে বড়দার কোলে চলে গেল। পুলিসটা খচ করে আমার হাত চেপে ধরেছিল। আমি বড়দার নিজের ভাই শুনে পরক্ষণেই ছেড়ে দিল।

পুলিস পাঁচ টাকার রসগোল্লার সাইজের হাঁ-টা একটু পরে বন্ধ করে নম্র স্বরে জানতে চাইল যে ভাঞ্জা, মানে ভাগনা আমাকে দেখলে অমন পালাতে চায় কেন? বড়দার সত্যিই বুদ্ধি আছে। ঠিক বলে দিল। "ওর শার্টটা দেখুন না। এখানে হাতি, ওখানে ড্রাগন, সেখানে বাঘ, তার পাশেই ডাইনোসর। আমারই ভয় লাগে—ও তো একটা শিশু।"

সাঁৎলানো ইলিশমাছ নাকের ওপর দিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লে বেড়ালের মুখের ভাবটা যেমন হয় তেমন একটা ফ্যালফ্যালে মুখ করে পুলিস বিদায় নিল। আমি আগে খেয়াল করিনি, এবার করলাম। ঠিকই বলেছে বড়দা। গুলু বোধহয় শার্টের ভয়ই পাচ্ছিল। Three dimensional শার্টটা পাল্টে একটা নিরামিষ শার্ট পরে চট করে ফিরলাম। গুলু সত্যিই নিমেষে আমার কোলে চলে এলো। আমি তিন লাফে ছুটলাম আমাদের আড্ডায়। চিলেকোঠার ঘরে। এতক্ষণে হয়তো বাকিরাও ফিরেছে।

গুলুকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি দুই দিদিই সিনেমাপর্ব শেষ করে হাজির। মেজদির কথা শুনে আমি থমকে গেলাম, "সে কিরে টনি একটাও কথা বলেনি!! কি আশ্চর্য!!! ওর কথার জ্বালায় বাড়িতে তিষ্ঠনো দায়।"

আমি বড়দিকে বললাম, "গুলুকে বেড়িয়ে আনলাম। বেড়ানোটা বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো।"

গুলু একলাফে বড়দির কোলে সেঁধোল। গণেশ বেচারিকে দেখে আমার মায়া লাগল। তরকারির ঝোলের লাউডাঁটার মতন নেতিয়ে পড়েছে। ধকলে।

মেজদি টনিকে জিজ্ঞেস করল, "বলো তো বাবুসোনা কেমন ছিলে মামুদের সঙ্গে?"

মেজদির কোলে চড়ে একগাল হেসে, গণেশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে এই প্রথম কথা বলল টনি, "ওই লোকটা ভীষণ বোকা, কিন্তু দানে না মা। বেলালকে বলে ম্যাওম্যাও, কাক্‌কে বলে কা-কা। কুকুলও তেনে না। বলে ভৌ-ভৌ।"

গণেশ অন্যমনস্ক হবার প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। আমি ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। গণেশ নিচু গলায় বলল, "বাবাঃ! দুটো শিশুকে শিশুকে কিছুক্ষণ রেখেই বোঝা গেল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কেন শিশুপাল বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কথাটা অবশ্য তোর আগেই মনে হয়েছিল।"

আমরা দশ দশ কুড়ি টাকা পেলাম ঠিকই কিন্তু অল্প সময়ের ভেতর সাব্যস্ত হলো যে ক্রেশের কাজটা বড়ো খাটনির আর ভয়ের। পোষাবে না। ওর চেয়ে "হাতেনাতে কুটিরশিল্প"র দাঁতের মাজন, জুতোর পালিশ, মাজার মালিশ, হাজার ওষুধের মতন হাজারো জিনিস আমাদের এবং ব্যবসার পক্ষে অনেক বেশি উপাদেয় এবং উপকারী হবে।"

॥ আরো আলোচনা ॥

ব্যবসার প্রথম প্রচেষ্টা শিশুপালনের ধাক্কা সামলাতে আমাদের পুরো একটা দিন সময় লাগল। ধকলটা শারীরিকের চেয়ে বেশি মানসিক। প্রথম প্রচেষ্টার ফল তেমন উজ্জ্বল না হওয়ার আত্মগ্লানি। সঙ্গে স্যাঁতানো মেজাজ। একটা দিন রেস্ট নিয়ে, দুপুরবেলা আবার আমরা বসলাম ছাতের ঘরে, আমাদের আড্ডায়। ব্যবসার পরের পদক্ষেপের জন্য জরুরী মিটিং। ঢাকনাদা ছাড়া সকলেই হাজির। গণেশকে আমরা "হাতেনাতে কুটিরশিল্প কম পুঁজিতে..." বইটা আনতে বলেছিলাম। গণেশ শতচ্ছিন্ন বইটাকে একটা ফাইল-বন্দী করে নিয়ে এসেছে। বইটা পড়তে শুরু করল গণেশ, "ভূমিকা। গুহামানবের প্রথম আবিষ্কার কুটির। সময়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে একদিন গুহামানব গুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তার এক হাতে কাটারি অন্য হাতে হ্যারিকেন।"

মেজদা বাধা দিল, "গুহামানবের হাতে কাটারি আর হ্যারিকেন! ঠিক করে পড়।"

"যা লেখা আছে ঠিকই পড়ছি। এই দেখো না।"

"তোমার বেকার বাগড়া দেওয়া স্বভাব। তখন কি অন্ধকার ছিল না নাকি?"

মেজদা চুপ করে গেল, গণেশ পড়ে চলল—"জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে মানুষ জুটিয়ে আনল লতাপাতা দড়িদড়া, বাঁশ মই তক্তা পেরেক। গড়ে তুলল কুটির। ঝড়-ঝঞ্ঝা, দেবতা-অপদেবতা, সাপ, ব্যাঙ, বাঘ, হনুমানের থেকে নিশ্চিন্ত নিভৃত আশ্রয়। এখন আর গুহামানবের মতন গুহার দেওয়ালে বাঘ, হরিণ, ষাঁড়, টিকটিকি আঁকা নয়, মানুষ এবার মন দিল কুটিরশিল্পে।"

"এ তো মানব সভ্যতার বিবরণ রে—" আমি বাধা দিলাম।

"আহাহা এসে গেছি। দু লাইন ভূমিকা থাকবে না! মানুষ বংশপরম্পরায় আবিষ্কার করে চলল নেলপালিশ, দাঁতের মাজন, মোমবাতি, মোটরগাড়ি, কুমড়োর মেঠাই, এটম বোমার হাজারো ফর্মূলা। সব লিখে রাখতে লাগলো বেদে-টেদে। সেইসব বহুমূল্য প্রাচীন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ফর্মূলা এই বইয়ে..."

ঢাকনাদা হঠাৎ ব্যাঘ্রগতিতে ঘরে ঢুকে

কুটিরশিল্পের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত ঘটাল—"একটা দারুণ প্রস্তাব এনেছি। ছোটমামা চার বছর পর বিদেশ থেকে ফিরেছে। মামাবাড়িতে একমাস থাকবে। আমাকে অনেক করে যেতে বলছে ওর সঙ্গে। তোরাও চল না। আমি সকলের বাড়িতে বলে রাজী করাবো।"

"কিন্তু ব্যবসার কি হবে?"

"দুদিনে এতে কিছু এসে যাবে না। তাছাড়া নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে নতুন পরিকল্পনাও মিলতে পারে।"

আমরা সবাই এক কথায় রাজী হলাম ঢাকনাদার মামাবাড়ি তারকেশ্বরে বেড়াতে যেতে।

॥ সব ব্যাঙই দাদুর ॥

সব ব্যাঙই যে দাদুর তা আমাদের আগে জানা ছিল না। বড়ো ব্যাঙ, মেজ ব্যাঙ, সেজ ব্যাঙ, ছোট ব্যাঙ সবই দাদুর। বড়োদাদুর, মেজদাদুর, সেজ-দাদুর, ছোটদাদুর। একথা আমাদের জানালেন ঢাকনাদার মেজদাদু। বললেন, "ব্যাঙের অনেক নাম হে, ভেক, মণ্ডূকের মতন দাদুরও ব্যাঙের আরেক নাম।" গণেশ বলল, "সব ব্যাঙই দাদুর, দিদিমার তাহলে কোনো ব্যাঙই নেই!"

মেজদাদু একটু মুচকি হেসে টিপটিপে বৃষ্টির ভেতর বাগানের কাদামাখা রাস্তা দিয়ে চটি ফটর ফটর করতে করতে বাড়ি গিয়ে ঢুকে পড়লেন। আমরা পাঁচজনে ঢাকনাদার মামাবাড়ির বাগানে আমগাছের তলায় ভিজতে ভিজতে ব্যাঙেদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

কতো রকমের ব্যাঙ। ব্যাঙেদের পুরো গ্যাঙ। আমরা খাস কলকাত্তার ছেলে। ঢাকনাদার মামাবাড়িতে আষাঢ় মাসে আসার আগে জানতাম না, যে কলকাতার এতো কাছে এতো ব্যাঙ মেলে। টোনা ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, ঝোলা ব্যাঙ, চুনো ব্যাঙ, ঝুলো ব্যাঙ, হুলো ব্যাঙ, ফুলো ব্যাঙেদের সঙ্গে আরো অনেক রকম ব্যাঙের মেলা। মেলাই ব্যাঙ নিজেদের মেলে দিয়েছে সর্বত্র। ব্যাঙের গ্যাঙ গ্যাঙর গ্যাঙ-এর সঙ্গে আরো হরেক রকম আওয়াজ করছিল। দাড়িওলা লোকেরা তানপুরা নিয়ে কালোয়াতি গানের সময়, বা টিকিওলা লোকেরা চেঁচিয়ে সংস্কৃত পড়ার সময়, যে সব বিকট আওয়াজ করে, ব্যাঙেদের আওয়াজগুলো সেরকম। আ-আ-আ-আ ওং...হিং...টিং...টং...টং...টং গর্-র্-র্-র্ কটাং কটাং ঘং...। সেই সঙ্গে কতো রকমের লাফ। হাইজাম্প, লংজাম্প, পোলভল্ট। ব্যাঙে ব্যাঙে ছয়লাপ। ছয়লাফও বলা চলে। আমাদের মুখের ভাব দেখে ঢাকনাদা বলল, "কিরে, এতেই ঘেবড়ে গেলি! কাল তোদের নিয়ে যাবো মামাদের আসল ধানক্ষেতে। দেখবি ব্যাঙ কাকে বলে। একদম থিক্‌থিক্ করছে।"

সেজদা ঢাকনাদাকে শুধোল, "ব্যা... ব্যা...ব্যা..."

মেজদা ধমকে উঠল, "কাজের সময় ফের ব্যা ব্যা করে।"

সেজদার সেল্ফ স্টার্টারটাই শুধু খারাপ। ঠেলেঠুলে সেন্টেন্সকে একবার স্টার্ট করে দিতে পারলে দিব্যি গড়গড়িয়ে চলে। এবার সফল হলো সেজদা, "ব্-ব্য-ব্যাঙ কোনো কাজে লাগে না? ক্-কাজে লাগানো যায় না, ঢ্-ঢাকনা?"

"ব্যাঙ আবার কি কাজে লাগবে? পোকামাকড় মশার বাচ্চা খেয়ে ফেলে। ম্যালেরিয়া কমায় এই যা।"

"ব্যাঙ কিন্তু সবচেয়ে বেশি হাইজাম্প দিতে পারে," বাধা দিল মেজদা, "নিজের উচ্চতার পাঁচগুণ!"

"তাতে কাজে লাগার কি হলো?"

"আঃ। বলতে দিবি তো বাকিটা। অত উঁচু লাফানোর জন্যেই তো ব্যাঙের পা দুটো খুব পুরুষ্টু আর অত ভালো খেতে।"

"ভালো না ছাই। খেতে না পেলে লোকে গিরগিটি পর্যন্ত খায়। তখন গিরগিটিই ভালো লাগে খেতে।" জানাই আমি আর গণেশ।

"খেতে না পেলে নয়। তোরা কোনো খবরই রাখিস না। গত বছর শুধু ভারতবর্ষ থেকেই আমেরিকা আর জাপানে ব্যাঙের ঠ্যাং এক্সপোর্ট হয়েছে মোট দু কোটি। এতো ব্যাঙ দেখার পর থেকেই একটা বিজনেস প্ল্যান পাক দিচ্ছে মাথার ভেতর। ভাবতে হবে।"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "এবার বাড়ি ফেরা ভালো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। যদি সাপে-টাপে...।"

মেজদা, ঢাকনাদা আর গণেশ একসঙ্গে খ্যাঁক করে উঠল, "তোর জন্যে যদি একটু একমনে চিন্তা করা যায়! তোর কি ধারণা এই এক হাঁটু কাদা ভেঙে কেউটে সাপ আসবে তোকে কামড়াতে!! তুই কি কেউটের জামাই? কামড়ালে হেলে সাপই কামড়াবে। এখানে ব্যাঙের মতন হেলে সাপও প্রচুর।"

শ্বশুর না হয় হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ। শ্বশুরকে কেউটে বললে কার না রাগ হয়? আমি রাগত স্বরে বললাম, "ব্যাঙের ঠ্যাঙের সঙ্গে হেলের লেজের কথাও ভেবো। এক্সপোর্ট করবে।"

॥ জল্পনা ও প্রস্তুতি ॥

ব্যবসার পরিকল্পনায় উৎসুক আমরা পাঁচজন সন্ধ্যেবেলায় ঢাকনাদার মামাবাড়িতে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে গেলাম গম্ভীর আলোচনায়। গভীর অঙ্কে। অল্প আলোচনার পরেই আমরা মানসচক্ষে দেখলাম আলিবাবার সেই গুপ্ত গুহা। গুহার ভেতর সোনা-দানা-হীরে-জহরতের সঙ্গে সারি সারি তাজমহল। গুহার দরজা খোলার সেই অলৌকিক মন্ত্র আমাদের কব্জায়। "চিচিং ফাঁক"-এর বদলে "ব্যাঙের ঠ্যাং"।

মেজদা বলল, "দু কোটি ঠ্যাং মানে এক কোটি ব্যাঙ। তার এক পার্সেন্টি, মানে এক লাখ ব্যাঙ নিশ্চয় যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তার এক পার্সেন্টি মানে এক হাজারও যদি আমরা সাপ্লাই করতে পারি তো মন্দ হবে না। আমি কাগজে দেখেছি মহাজনেরা একটা ব্যাঙের জন্য

তিন থেকে পাঁচ টাকা দেয়। ব্যাঙপিছু দু-টাকা থাকলেও দু হাজার টাকা লাভ।

পরদিন বিকেলবেলা আমরা পৌঁছোলাম মামাবাড়ির বড় ক্ষেতে। কি বিশাল ক্ষেত রে বাবা। শেষ দেখা যায় না। ছোট ছোট ধানগাছেরা মাথা উঁচিয়ে আছে জলের তলা থেকে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর সমবেত নৃত্যরত ভেককুল। মেজদা বলল, "গোটা দশ-বারো ব্যাঙ ধরে নে। আমার পকেটে একটা ভালো প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে। কিছু কাঁচামাল নিয়ে কলকাতায় ফিরব। ব্যাঙ ধরার বউনিটাও হয়ে যাবে আর কাঁচামাল সঙ্গে থাকলে ব্যবসার পরের ধাপগুলো সুবিধের হবে।"

ঢাকনাদা বলল, "একদম ঠিক বলেছিস।"

সেজদা হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল পেছনের দিকে। হাত তিনেক দূরে মাটির ওপর বসে রয়েছে একটা বেশ বড়োসড়ো সোনা ব্যাঙ। ইঞ্চি চারেক লম্বা। গণেশের শরীরটা নিমেষে টান টান হয়ে উঠলো, ধনুকের ছিলার মতন। পরক্ষণেই গণেশ ইয়াংফু বলে, একটা ক্যারাটে মার্কা বিশাল লাফ লাগাল। গণেশের লাফানো-ঝাঁপানোর অভ্যাস আছে। একলাফে বহুদূর পৌঁছোত। কিন্তু গণেশের পায়ের তলায় মাটি ছিল না। অন্তত শক্ত মাটি ছিল না। হাত দুয়েক দূরে ক্ষেতের ভেতর ধপাস করে চিৎপাত হলো গণেশ। আমরা কাদায় চান করে ভূত হয়ে গেলাম। সোনা ব্যাঙটা আকস্মিক কোলাহলে বিরক্ত মুখে তুড়ুক করে একলাফে একটু দূরে গিয়ে বসল। ড্যাব ড্যাব করে চোখ রাঙিয়ে, শাসনের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। গণেশ উঠে বসল। নাকে কাদা, মুখে কাদা, চোখে জিঘাংসা। তারপরেই আবার সেই ভীষণ লাফ। পায়ের তলায় কাদা। অতএব একই ফল। অভীষ্ট ব্যাঙবাবাজী আড়চোখে একবার গণেশের দিকে তাকিয়ে "মেলা ঝামেলা" বলার মতন মুখ করে তিন লাফে হাওয়া হয়ে গেল।

ঘনশ্যাম যে এতোক্ষণ আমাদের নিরীক্ষণ করছিল তা আমরা খেয়াল করিনি। ঘনশ্যাম ক্ষেত পাহারা দেয়। ওর থাকবার ঘর ক্ষেতের একপাশে। "বাবুরা কি লড়াই খেলছ? না কি কবাডি? অনেক্ষণ হলো, আর ভিজলি ঠাণ্ডা নাগবে।"

ব্যাঙ ধরা যে খুব সহজ না, তা পরিষ্কার হয়েছিল, ঘনশ্যামকে আমাদের অথৈ সমুদ্রে লাইট হাউসের মতন মনে হলো। মেজদা আর ঢাকনাদা হাউমাউ করে জিজ্ঞেস করল, "ঘনশ্যামদা, তুমি ব্যাঙ ধরতে পারো?"

ঘনশ্যাম চোখ দুটো কপালে তুলে শুধোল, "ব্যাঙ ধরে কি হবে? তার চেয়ে বাগানে গিয়ে আম-জাম পাড়ো না। ব্যাঙ খাওয়া যায় না। আম খাওয়া যায়।"

"কি মুশকিল! ব্যাঙ ধরতে পারো কিনা সেটা বলো না!"

"হাতজালতি দিয়ে নিশ্চয়ই পারবো, কিন্তু ব্যাঙ দিয়ে কি করবে তোমরা?"

"এই ব্যাগটা নাও। এতে গোটা কুড়ি ওইরকম সাইজের ব্যাঙ ধরে দিও।" চার ইঞ্চি একটা ব্যাঙ দেখিয়ে দিল মেজদা।

ঘনশ্যামের হাঁ-টা আরো বড়ো হলো, "কিন্তু—"

আমি ঝটপট একটা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে দিলাম, "তোমাদের বড়োবাবু গো—আমাদের বড়োমামা, ওর সেজশালা কলকাতায় থাকে—তার ভারি ব্যামো—কোবরেজ বলেছে ব্যাঙের রস দু বেলা আধগেলাস করে খাওয়াতে...তাই তো..."

"তাই বলো। ব্যাঙের রস খুব ভালো ওষুধ। আমি ভাবছিলাম তোমরা সব কলকেতার ছেলে, ব্যাঙের মাংস-টাংস খেয়ে বসবে না তো—। সন্ধ্যেবেলা আমি ব্যাঙ নে গে দে আসবখন।"

ঘনশ্যামের কথার দাম আছে। সন্ধ্যের ভেতর সে উনিশটা ব্যাঙ ব্যাগে ভরে পৌঁছে দিল। কিন্তু ঘনশ্যামের মুখ থমথম করছে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে আর ব্যাঙ লাগলে টাকা নিয়ে ধরে দেবার লোক আছে, কিন্তু তার পক্ষে আর একটাও ব্যাঙ ধরা সম্ভব না। তাকে আছাড় খেতে হয়েছে সাড়ে তেরোবার। আমরা সংখ্যাটা বিশ্বাস করলাম না। ঘনশ্যামের খুঁড়িয়ে হাঁটা আর আচার-আচরণ পরিষ্কার জানাচ্ছে, আছাড়ের সংখ্যা ঢের বেশি। সকলে মিলিয়ে দশটা টাকা ঘনশ্যামের হাতে দিতে হাসি ফুটল ওর মুখে। আমরা ঘনশ্যামকে জানালাম যে আরো অনেক ব্যাঙ লাগবে আমাদের। দরদাম ঠিক করে তবে কলকাতায় ফিরব। ঘনশ্যাম পরদিন সকালে ব্যাঙ ধরার লোকেদের সঙ্গে আলাপ করাবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল।

প্লাস্টিকের থলেতে ব্যাঙেরা হাওয়ার অভাবে বাঁচবে না তা আমরা জানতাম। ঢাকনাদা একটা বালিশের খোল সরিয়ে, তার সর্বত্র ছোট-বড়ো ফুটো করে রেখেছিল। আমরা ব্যাঙগুলোকে চুপিচুপি বালিশের খোলে পুরে মুখটা বন্ধ করে বাগানের আমগাছে ঝুলিয়ে রেখে এলাম। মেজদা বলল, "আমাদের বাড়িতে একটা খালি অ্যাকোয়েরিয়াম আছে। সেটায় রাখবো। কলকাতায় পৌঁছে।"

পরদিন, টিপটিপে বৃষ্টির ভেতর আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘনশ্যামের সঙ্গে, ব্যাঙ ধরার লোকের সন্ধানে। ক্ষেতের ওপর দিয়ে, আল আর কাদা ভেঙে আমরা পৌঁছোলাম জেলেপাড়ার প্রান্তে নীলকণ্ঠর ঝুপড়ির সামনে। ব্যাঙ আমাদের সঙ্গেই ছিল, ইঞ্চি ছয়েকের একটা নমুনা দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হাজার পিস-এর দাম কত লাগবে?"

নীলকণ্ঠ এক টাকা পিস দর দিল। আমরা ঘনশ্যামকে জানালাম যে দর বড় বেশি। ঘনশ্যাম আমাদের নিয়ে চলল রতনের বাড়ি। রতন নীলকণ্ঠের কথা শুনে নব্বই পয়সায় নামল। আমরা চললাম অনন্তর বাড়ি। অনন্ত আশি পয়সায় রাজী হলো। জগন্নাথ সত্তর পয়সায়। হরিচরণ ষাটে। আমরা আরো অনেক ঘুরে দেখলাম। ষাটের কমে কেউই ব্যাঙ ধরতে রাজী নয়।

আমরা ছ'জনে ফিরছি, এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঝাপলা গাছের পাশ থেকে টুক করে বেরিয়ে আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল। লোকটার নাম অবনী। ঘনশ্যামের আধচেনা। সে আমাদের চুপি চুপি বলল, "আমি তোমাদের চল্লিশ পয়সা করে ব্যাঙ ধরে দেব। এদের বলবে না কিন্তু। এই হতভাগাগুলো জানে না

এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা পুকুর আছে, নাম ব্যাঙডোবা। সেখানে ব্যাঙ থিকথিক করছে। তোমাদের নিয়ে যাবোখন। কিন্তু হাজার ব্যাঙ ধরতে সময় লাগবে। কম করে তিন দিন সময় দিতে হবে।"

॥ অদ্বিতীয় পদক্ষেপ ॥

সন্ধ্যেবেলা তারকেশ্বর লোকালে ফিরতে ফিরতে সকলেই ব্যবসার বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। গণেশ বিজ্ঞের মতন বলল, "কাঁচামাল যোগাড়ের পর, ব্যবসার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো মাল যাচাই করে দেখা, মানে ব্যাঙের ঠ্যাং..."

মেজদা বাধা দিল, "উঁহু ব্যবসার অদ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো খরিদ্দার সংগ্রহ করা।"

ঢাকনাদা সায় দিল, "ঠিক। খদ্দের না জুটলে কাঁচামাল কিনবে কে?"

সেজদা সোচ্চার হলো, "ক্...কা...কা ...র ব্...বা...বা...বা"

ঢাকনাদা বলল, "কাকার বাবা কিনবেন। তিনি তো বহুকাল মারা গেছেন।"

"ন্...না। ক্...কা-কা...কা-র ব্...বা...বা-র খ্...খ...খ..খ।"

মেজদা বলল, "কাবাব খাবি? ব্যাঙের? তা খাস অখন। কিন্তু এক্ষুণি না।"

সেজদা ব্যবসার ব্যাপারে খুব কমই কথা বলেছে, এগুলোও না বললে চলত। অতিরিক্ত সাবধানতায়, বেশি তোতলাচ্ছে সেজদা। আমি বোঝাতে বাধ্য হলাম, "নাগো। সেজদারও মতে কারবারে খরিদ্দারই আসল।"

পরের পনের দিনে আমাদের ব্যবসার কাজকর্ম কিছু এগোল, যার সারাংশ এইরকম। আমাদের বাড়িতে খালি অ্যাকোয়েরিয়ামে স্বল্প জলে উনিশটা ব্যাঙের দৌরাত্ম্য দেখে বাড়ির লোকের হৃদকম্প। মেজদার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ। কারণ ব্যাঙগুলো মেজদা জুলজির প্র্যাকটিক্যালে লাগবে বলেছে। ব্যাঙ সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ। কোলা ব্যাঙ নালার থেকে ধরে আনা মশার বাচ্চার থেকে লুচি কিংবা পাঁউরুটি খেতে অনেক বেশি ভালোবাসে। ব্যাঙ ভারি উপকারী বস্তু। ঘরে দু-চার পিস থাকলে একদম মশা কামড়ায় না। সারারাত ব্যাঙেরা বাড়ির লোকেদের জাগিয়ে রাখা পছন্দ করে; অবশ্য নিজেরাও স্বার্থপরের মতন ঘুমিয়ে পড়ে না। জেগে থেকে গান শোনায়। ব্যাঙের ঠ্যাং অত্যন্ত সুস্বাদু। অনেক অনুরোধে দিদিরা রেঁধে দিতে রাজী হয়। আমরা পাঁচজনেই খেয়ে দেখেছি। মুরগী আর পায়রার মাঝামাঝি খেতে। এক নতুন তথ্য মিলেছে। ব্যাঙের ঠ্যাং যারা খায় তারা ঠিক থাকে। কিন্তু আশেপাশের লোকে ওয়াক তোলে। ব্যাঙ সরীসৃপ হলেও টিকটিকির লেজের মতন এদের আর ঠ্যাং গজায় না। পাঁচজনে চারটে করে ঠ্যাং খেলে হাতে থাকে নটা ব্যাঙ।

ব্যবসার খরিদ্দার ধরা ভারি শক্ত। ব্যাঙ ধরার চেয়ে ঢের বেশি। প্রথমে চিনে চিনে চীনে বার করতে হয়, যে চীনে রেস্টুরেন্ট চালায়। যে চিনে রাখে ব্যাঙের খরিদ্দারদের। খদ্দের ধরার জন্য বুট-জুতোই ভালো। তালতলা থেকে তিলজলা, হন্টনের হানটানে চটি টেঁকে না। হান্টারদের মতন জুতোই জুতসই। ঘুরে ঘুরে তিলজলার এক প্রাচীন চীনা, "চ্যাং"-এর কাছে সন্ধান পাওয়া গেল ব্যাঙ-এর ঠ্যাংএর খরিদ্দারের। "চ্যাং' ব্যাঙের ঠ্যাং-এর expert। খরিদ্দার অচিন, অচীনও বটে। খরিদ্দার জাপানী। নাম যাঘামাচি জামাকাচি।

যাঘামাচি জামাকাচির প্রশংসায় ফেটে পড়ল চ্যাং। জাপানে 'বেশিশিখি' বিদ্যালয়ের জুলজির মাস্টার জামাকাচি। ওরিয়েন্টাল মার্শাল আর্ট, জুডো, কুংফু, ক্যারাটে, সুমো—সব শেখা আছে জামাকাচির। একলা তিরিশটা লোককে কিলিয়ে চাওমিন বানিয়ে দিতে পারে। তার ওপর ভারি মিঠে গান করে। খুব মিষ্টি গলা। ইস্কুলের গরমের ছুটির সময় ব্যাঙ সাপ্লাইয়ের বিজনেস করে জামাকাচি। ইন্ডিয়ার ব্যাঙ অত্যন্ত সুস্বাদু। গতবছরে শুধু ইন্ডিয়া থেকেই সে ব্যাঙ তুলেছে দশ লাখ। আমরা মনে মনে জামাকাচির একটা হিরো মার্কা চেহারা কল্পনা করে নিলাম। পড়াশোনা জানে, মারপিট জানে, ব্যবসা জানে, গান জানে—নাচটা নির্ঘাৎ চ্যাংকে দেখাতে ভুলে গেছে জামাকাচি।

ব্যাঙ-এর ঠ্যাং-এর কথা সব শুনে আর ব্যাঙ-এর নমুনা পেয়ে, বেশ আগ্রহ দেখাল চ্যাং। ব্যাঙপিছু তিন টাকা করে দেয় জামাকাচি। আমাদের থাকবে দুই আর চ্যাং-এর এক। তার কমে সে কিছুতেই রাজী নয়। প্রথম রফাটা হলো হাজার ব্যাঙ-এর। মেজদা চুপি চুপি বলল, "মন্দ কি? to start with—যাবতীয় খরচ-খরচা বাদ দিয়েও ব্যাঙপিছু দেড় টাকা করে থাকবেই। এক হাজার ব্যাঙ-এ দেড় হাজার টাকা।"

আমরা চ্যাং-এর প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে চ্যাং তার ডাবের মতন মুখটা কুমড়োর মতন গম্ভীর করে "হুস" করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। "কিন্তু একটা কথা আছে। জামাকাচি জুলজি পড়া মানুষ। কোন জলের ব্যাঙ, সেটা নিজে দেখে নেবে। রোগ-টোগ আছে কিনা। হাতে নিলেই বুঝবে সে। অবশ্য—" একটু ভাবল চ্যাং, "জামাকাচি কখনও জলা দেখতে গিয়ে অপছন্দ করেনি। বাংলার ব্যাঙ, বাংলার ডোবা তার ভারি পছন্দ।"

জামাকাচি কবে ভারতে আসবে জিজ্ঞেস করাতে চ্যাং বলল, "সেকি!! তোমাদের বলিনি বুঝি!! জামাকাচি এখন আছে কেরালায়। কেরালা, অন্ধ্র, উড়িষ্যার ব্যাঙ বম্বে পাঠিয়ে সামনের মাসের সতের তারিখ এখানে আসবে। এখানকার ব্যাঙদের সঙ্গে নিয়ে আবার চলে যাবে বম্বে।"

বম্বে কেন? সে সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেসভরা চোখ দেখে একরাশ কুমড়োর বিচির মতন দাঁত বার করে হাসল চ্যাং, "বম্বেতেই জামাকাচি সব ব্যাঙ জড়ো করে। তারপর তাদের ঠ্যাং খুলে নিয়ে, বরফে জমিয়ে ফেলে জাপান পাঠায়।"

জানা গেল, পশ্চিম বাংলায় অন্তত দশজন বাঁধা ব্যাঙ সাপ্লায়ার আছে। তাদের কাছেই বেশি ব্যাঙ নেয় জামাকাচি। কিন্তু সে সর্বদাই নতুন সাপ্লায়ারের খোঁজও করে। নতুন নতুন জলের ব্যাঙ-এর স্বভাবের ওপর সে রিসার্চ করে তো—তাই।"

চ্যাং আবার ভাবল, "আজই আমি

ফোনে কথা বলব জামাকাচির সঙ্গে। তোমরা কাল বিকেলে এসে খবর নিয়ে যেও।”

পরদিন যখন তিলজলায় পৌঁছোলাম তখন জমাট রোদ, নীল আকাশ। আগের দিনের টিপটিপে বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশ উড়ে গিয়ে দৃশ্যপট আর মেজাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। আমরা খেয়াল করলাম চ্যাং-এর মতন অনেক মুখ চারপাশে বেরিয়ে পড়েছে। মেজদা সভয়ে বলল, “চ্যাংকে চিনতে পারব তো রে!! এদের নামেরও তো তেমন ফ্যাচাং নেই। বরাহমিহির, কালিদাস না, সবই চিং, চ্যাং, চুং-এর এদিক-ওদিক। বড়ো জোর ফ্যাচাং।”

গণেশ আর ঢাকনাদা বলল, “প্রথমবার যখন চিনে বের করতে পেরেছি তখন দ্বিতীয়বারও চীনে পাবো। বড়ো জোর দুচার বার ভুল হবে। তারজন্য কিছু গালমন্দ আর এক আধটা রদ্দার জন্য তৈরি থাকলেই হলো।”

ঠিকই বলেছিল ওরা। দু-চারবার ভুল করে চীনে ভাষায় গালাগাল খাবার পরেই, একগাল হাসি ডাবের মতন মুখে পুরে উদয় হলো চ্যাং।

“সব ব্যবস্থা রেডি। সামনের মাসের সতেরো তারিখ উড়িষ্যা থেকে ধউলি এক্সপ্রেসে হাওড়া পৌঁছোবে জামাকাচি। তোমরা তাকে নিয়ে চলে যেও তোমাদের জায়গায়। জল দেখে জামাকাচির পছন্দ হলে তোমরা এক হাজার ব্যাঙ ডেলিভারি দেবে। হাতে হাতে পেমেন্ট।” পকেটে হাত ঢোকাল চ্যাং। তিনশো টাকা বার করে এগিয়ে দিল আমাদের দিকে। “নতুন জায়গা থেকে ব্যাঙ নিতে খুবই উৎসুক জামাকাচি। এই তিনশো টাকা অ্যাডভান্স করে দিতে বলেছে। ওর যদি ব্যাঙ পছন্দ নাও হয়, টাকা তোমাদের ফেরত দিতে হবে না। ওটা তোমাদের খাটাখাটনির পারিশ্রমিক। জাপানীরা এইভাবেই কারবার করে। তবে বলেছি না, জামাকাচি কখনও জল দেখে না বলেনি।”

আমাদের চোখে মুহূর্তের ভেতর স্বর্গ নেমে এলো টাকার রূপ ধরে। মেজদার হাতে ধরা তিনটে একশো টাকার নোটের ওপর আমি পষ্ট দেখলাম অশোকস্তম্ভটার

চারপাশে পাক খেয়ে একটা পরী উড়ে বেড়াচ্ছে। মেজদার মাথাটা খুব ঠাণ্ডা আর ভাবেও খুব তাড়াতাড়ি। নোটগুলো মোটেই note করেনি এমনভাবে মেজদা বলল, “মিস্টার চ্যাং, আমরা পাঁচজনেই তারকেশ্বর স্টেশনে থাকবো। দুদিন আগে থেকে আমাদের ওখানে থাকতেই হবে। কারণ হাজার ব্যাঙ ধরতে সময় লাগবে। তদারকি আছে। তুমি তো বলছ জামাকাচির পছন্দ হলেই যাবে। তাই আগেভাগে ব্যাঙ যোগাড় করা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি দিয়ে দেব। বেকার দেরি হবে না। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। যাঘামাচি জামাকাচিকে তারকেশ্বর লোকালে তুলে দিতে হবে। আমরা ওকে তারকেশ্বরে নামিয়ে নেব।”

একটু চিন্তা করে রাজী হলো চ্যাং, “আমাকে তো হাওড়া স্টেশনে যেতেই হবে, জামাকাচির সঙ্গে দেখা করতে।”

।। ঘোরতর কারবার ।।

অবনী ব্যাঙডোবা দেখিয়ে বলেছিল, “হাজার পিস ব্যাঙ ধরতে অন্তত তিন দিন সময় লাগবে।” আমরা পাঁচজন চোদ্দ তারিখ সকালবেলা, ফার্স্ট তারকেশ্বর লোকালে হাজির হলাম ঢাকনাদার মামাবাড়ি। অবনীকে খুঁজে পেতে মোটেই অসুবিধে হলো না। মেজদা অবনীর হাতে করকরে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ধরিয়ে বলল, “হাজার ব্যাঙের দাম চারশো টাকা—পঞ্চাশ টাকা আগাম। ব্যাঙ কিন্তু চার ইঞ্চি থেকে ছ' ইঞ্চির ভেতর হওয়া চাই।”

হাতে নোট পড়তেই অবনীর মুখটা গদগদ মুচকি হাসিতে ভরে উঠল। বড়দার কাছ থেকে গোটা তিনেক বেশ বড়ো চালের বস্তা যোগাড় করেছিলাম, সেগুলো অবনীকে ধরিয়ে দিলাম ব্যাঙ রাখার জন্যে। অবনী কথা দিল যে সতের তারিখ ব্যাঙডোবার ধারে বস্তা ভর্তি ব্যাঙ রেডি থাকবে। জাপানী সাহেব জামাকাচি দেখার পর রিকশা বোঝাই করে, মাল স্টেশনে পৌঁছে দেবে অবনী। আমরা জানালাম যে অবনীকে প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য আমরা কাছেপিঠেই থাকবো।

সতেরো তারিখে যাঘামাচি জামাকাচিকে তারকেশ্বর স্টেশনে খুঁজে নিতে আমাদের মোটেই অসুবিধে হলো না। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল।

জামাকাচির সম্পূর্ণ রূপটা আমরা যেমন ভেবেছিলাম ঠিক তেমন না। রোগা, লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারার ওপর কোঁকড়া চুল লাগানো একটা জাপানী মাথা। পরনে সাফারি স্যুট, তাতে বিস্তর পকেট ছড়ানো, এদিক-ওদিক। হাতে একটা ঝকঝকে অ্যাটাচি কেস।

ঢাকনাদাই প্রথম জামাকাচির সঙ্গে, নিজস্ব ইংরিজিতে আলাপ জমাল হ্যান্ডশেক-ট্যান্ডশেক করে। আমাদের সঙ্গে জামাকাচির আলাপ করিয়ে দিল ঢাকনাদা। গণেশের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতেই জামাকাচি বলে উঠল, “অ্যাই রোগাসোগা বোকামতো।”

গণেশ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি টিপ্পনিটা না কেটে পারলাম না, “দিব্যি বাংলা শিখেছে জামাকাচি।” অল্পক্ষণের ভেতর জানা গেল জামাকাচির বাংলা জ্ঞান ওর ইংরিজি জ্ঞানের মতনই প্রবল। আমাদের জাপানী ভাষার জ্ঞানের থেকে অল্প বেশি। ভাষা জানুক আর নাই জানুক জামাকাচি যে ভারতবর্ষের গ্রাম সম্বন্ধে ভালোই জানে তা বোঝা গেল ওর জুতো দেখে। কাদায় চরতে হবে জেনে সরাসরি গামবুট পরেই এসেছে জামাকাচি। আমরাও কাদার জন্য রেডি। প্যান্ট হাঁটু অবধি গোটানো, পায়ে হাওয়াই স্লিপার।

তারকেশ্বর স্টেশন থেকে মাইল তিনেক সাইকেল রিকশ চলার পাকা

রাস্তা। তারপর আধমাইলটাক ক্ষেতের ওপর দিয়ে এগোলেই ব্যাঙডোবা। আমরা বেলাবেলি দেখে এসেছি—অবনীর ব্যাঙ ধরা কমপ্লীট। জাল আর বস্তায় ব্যাঙেরা গ্যাঙর গ্যাং করছে।

খদ্দের বলে কথা—একটু আদর-আপ্যায়ন না করলে চলে—চা-টা খাইয়ে তোয়াজ-টোয়াজ করে আমরা ব্যাঙডোবার কাছে পৌঁছোলাম প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, ছ'জনের মাথায় তিনটে ছাতা। সারা রাস্তা মেজদা আর জামাকাচি গল্প করছিল। জামাকাচি জাপানীতে আর মেজদা বাংলা-ইংরিজি মিলিয়ে। ওদের কথাবার্তা আমাদের কাছে, (মনে হয় ওদের নিজেদের কাছেও) দুর্বোধ্য।

চারদিক ফাঁকা। সবুজ গাছগাছালি, সবুজ ধানক্ষেত। নামেই ব্যাঙডোবা আসলে বেশ বড়ো পুকুর। তার পাশে অবনী একা দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমরা জামাকাচির সঙ্গে অবনীর আলাপ করিয়ে দিলাম। জামাকাচি অবনীর আগাপাছতলা নিরীক্ষণ করে বলল, "অ্যাই রোগাসোগা বোকামতো।"

সেজদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আমার কানের ওপর, "ভ্-ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোককে দ্...দেখলে ওই একই কথা মনে হবে। কিন্তু জ্...জামাকাচি নিজে কি!!"

আমাদের কথামতন অবনী একটা ইঞ্চি পাঁচেক ব্যাঙ হাতের ওপর ধরে এগিয়ে দিল। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম জামাকাচির মুখের দিকে। জামাকাচি যে খুব প্রসন্ন হলো তা নয়। অবনী আরো বড়ো একটা ব্যাঙ দেখাল, তাতেও জামাকাচি প্রসন্ন হলো না। অবনী, আরো বড়ো, প্রায় সাত ইঞ্চি একটা ব্যাঙ দেখাল। এতোক্ষণে মনে হলো জামাকাচির পছন্দসই ব্যাঙ মিলেছে। জামাকাচি অ্যাটাচি খুলে একটা পলিথিনের প্যাকেট ভর্তি গুঁড়ো এগিয়ে দিল অবনীর দিকে। অবনীর ফ্যালফ্যাল করে তাকানো দেখে মেজদা আমাকে চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কি?"

একটু ভাবতেই ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আমি বুঝিয়ে দিলাম, "আরে—দেখে নিচ্ছে ওদের ব্যাঙের খাবার এই ব্যাঙ খায় কিনা।"

গণেশ বলল, "না হলে তো ব্যাঙগুলো উপোসে মরবে।"

কথাগুলো ওদের যুক্তিপূর্ণ মনে হলো। মেজদা বলল, "ঠিক কথা। জাপানী খাবার, মানে কাঁচা মাছ-ফাছ খেলে আমরা কদিন টিকবো?"

আমরা অবনীকে একরকম আদেশই দিলাম প্যাকেট খুলে খানিকটা খাবার ব্যাঙটাকে খাইয়ে দিতে। জাপানী খাবারটা বোধহয় তেমন সুস্বাদু না। অবনী ব্যাঙটাকে খাওয়াতে যেতেই বেশ খানিক ধস্তাধস্তি হলো। খাবার অল্প চেখেই ব্যাঙটা বিশাল এক লাফে প্রাণ বাঁচাল ব্যাঙডোবায় সেঁধিয়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে জামাকাচির ঘাড়ে উড়ে এসে পড়ল একটা বিশাল কেঁদো কোলা ব্যাঙ। জামাকাচি আর আমরা সকলে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদের গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সব ব্যাঙধরিয়েরা, যাদের সঙ্গে আমরা শুধু দর কষেছিলাম। নীলকণ্ঠ, অনন্ত, রতন, জগন্নাথ এবং হরিচরণ। প্রত্যেকের পাশে একেক বস্তা ব্যাঙ। ওদের চুপি চুপি এসে দাঁড়ানো আমরা খেয়ালই করিনি। মুহূর্তে এটুকু পরিষ্কার হলো যে জামাকাচির সরেজমিনে আসাটা ভালোই রটেছে। ওরা নিজেরা দল বেঁধে আসেনি। যে যার নিজের নিজের ব্যাঙের দল বেঁধে এনেছে বস্তায়। জামাকাচিকে দেখিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে।

নিমেষে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল বেধে গেল। অবনীকে নিয়ে ছ'জন ছটা ব্যাঙের স্যাম্পল হাতে আষ্টেপিষ্টে ঘিরে ফেলল জামাকাচিকে। সক্কলের ব্যাঙ দেখতেই হবে। একসঙ্গে। ধাক্কাধাক্কিতে আমরা পিছিয়ে গেলাম, আছাড় খেলাম কাদায়। উন্মত্ত জনতার বস্তার মুখগুলো তেমন বাঁধা ছিল না। সুযোগ আর স্বাধীনতা পেয়ে শয়ে শয়ে ব্যাঙ সকলের সর্বাঙ্গে লাফাতে লাগল।

জামাকাচির ঘাড়ের ওপর আর পকেটে পকেটে অন্তত তিরিশটা ব্যাঙ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। জামাকাচি আমাদেরই মতন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। মুখ ফ্যাকাশে, নড়বার ক্ষমতা নেই, পুরো স্ট্যাচু। আমাদেরও তথৈবচ অবস্থা। প্রত্যেকের জামাপ্যান্টের ভেতর কম করে সাতটা ব্যাঙ। অনন্ত একটু দূরে পড়ে গিয়েছিল। ফাঁক পায়নি জামাকাচিকে আঁকড়ে ধরার। কিন্তু তারও তো ব্যাঙের নমুনা দেখানো দরকার। অনন্ত হঠাৎই হাতের পেল্লায় কোলা ব্যাঙখানা সপাটে ছুঁড়ে দিল জামাকাচির দিকে দেখার জন্য। আমরা ব্যাঙটা দেখে মুগ্ধ হলাম। এতোবড়ো ব্যাঙ আমরা জীবনে দেখিনি। জামাকাচিকে এই ব্যাঙটা দেখতে হলো বড়ো কাছ থেকে। কম করে এক কিলো ওজনের ব্যাঙটা আছড়ে পড়ল গোলার মতন জামাকাচির মুখের ওপর। ওটাকে গোলা ব্যাঙ বললে কিছু ভুল হবে না। জামাকাচি আগের অতর্কিত জাপটাজাপটিতে ভীষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছল। হঠাৎ এই বিশাল ব্যাঙাঘাতে তার সংবিৎ ফিরে এল। চকিতে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়েই, "বাবারে, বাবাগো, বাবা গেছি" বলে ভিড় ঠেলে এক সাংঘাতিক লাফে জামাকাচি ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যাঙডোবায়। খদ্দের পালাচ্ছে দেখে জামাকাচির পেছনে পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছ'জন জেলে আর তাদের পেছনে হাজার তিনেক ব্যাঙ। আমরা পাঁচজনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ব্যাঙডোবার পাড়ে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যের আঁধার তখন হু হু করে নেমে আসছে। ব্যাঙডোবায় হুটোপাটি করে জামাকাচির খোঁজ চলল বহুক্ষণ। প্রায় আধঘণ্টা পরে হাল ছেড়ে সকলে উঠে পড়ল। জামাকাচিকে পাওয়া গেল না।

আমাদের হঠাৎ অজানা আতঙ্ক পেয়ে বসল। জামাকাচির কি হলো? ডুবে গেল? ডোবার মতন জল কি ডোবায় আছে? কাছে পেয়ে ব্যাঙে খেয়ে ফেলল জামাকাচিকে? ব্যাঙে কি জাপানী খায়? হাজারো প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়াল আমাদের সম্মুখে।

অবনী এগিয়ে এলো আমাদের দিকে, "বাবুরা যদি আমার টাকা কটা মিটিয়ে দেন তো—"

অবনীকে সাড়ে তিনশো টাকা দেবার

প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু কিছু টাকা না দিলে কি ও আমাদের ছাড়বে? সব কটা লোকে এখন অবনীর দলে গিয়ে আমাদের ঠ্যাং খুলে নেবে। কিন্তু সমস্ত দোষই অবনীর। জামাকাচির আসার খবরটা ও ছাড়া আর কেউই রটাতে পারে না। অন্য কেউ জানতো না। ছিঃ। একটা টাটকা জাপানীকে ব্যাঙের পেটে পাঠিয়ে দিল, লজ্জা নেই—কাল কাগজে বড়ো বড়ো করে ছাপা হবে—"তারকেশ্বরের ব্যাঙডোবায় এক আস্ত জাপানীকে পাঁচ হাজার ব্যাঙে রোষের বশে কষে চিবিয়ে খেয়েছে—"

অনন্ত আমাদের দিকে এগিয়ে এল, হাতে পাঁকলাগা একটা জামা। আমরা ভালো করে দেখলাম জামাকাচির জামা। কিন্তু ভেতরে জামাকাচি নেই। আমার আশঙ্কাটা হঠাৎই বিশ্বাসে পরিণত হলো। জামাকাচি আর আমাদের ভেতর নেই। আমি মানসপটে দেখলাম পুলিস। খবরের কাগজের খবর পড়ে চ্যাং ছুটেছে পুলিসের কাছে। থানায়। চ্যাং-এর কাছে আমাদের বাড়ির ঠিকানা আছে। পুলিস নিয়ে সোজা আমাদের বাড়ি। জাপানী হত্যার দায়ে আমার হাতে হাতকড়া। আমি আর ভাবতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ঠিক করলাম নষ্টের মূল অবনীকে আমি ছাড়বো না। গর্জে উঠলাম ঘ্যাঁক করে, "লজ্জা করে না অবনী—একটা টাটকা তাজা জাপানীকে ব্যাঙের পেটে দিতে—কাল যখন পুলিস আসবে, প্রথমেই তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে। শীগগির ডোবায় নেমে আবার খোঁজ। এখনও হয়তো খানিকটা বেঁচে আছে।"

পুলিসের কথায় মন্তরের মতন কাজ হলো। অবনীর সঙ্গে সকলে জলে নেমে পড়ল জাপানী খুঁজতে।

মেজদা এক গুঁতো মারল আমার পাঁজরায়। "খুব ভালো বলেছিস। চল, আর একদম সময় নেই। অবনী তিন দিন খেটেছে—অন্তত একশো টাকা না দিলে ঠ্যাং খুলে নেবে। পাঁচজনের মিলিয়ে ভাড়া বাদ দিয়ে মোটে সাত টাকার মতন পকেটে আছে। আর মামাবাড়ি না। সোজা কলকাতা। ওরা মামাবাড়িতেও খোঁজ করবে। জাপানী হত্যার শাস্তি এমনিও পেতে হবে, অমনিও পেতে হবে। এর ওপরে ঠ্যাং ভাঙার ফাউ না পেলেও চলবে।"

।। ঘোরতম কারবার ।।

যেই কথা সেই কাজ। আমরা পাঁচজনেই লাগালাম বেদম ছুট। আছাড় খেতে খেতে ক্ষেতের ওপর দিয়ে ধেয়ে চললাম পাঁচ মূর্তি। পাঁচজনেই ফুটবল খেলি। দৌড়ে তিন-সাড়ে তিন মাইল ঠিক বেরিয়ে যাবো।

আমাদের পালাতে দেখে অবনী তাড়াতাড়ি ডোবা থেকে উঠে আমাদের তাড়া করল, বেশ খানিকটা পেছনে। খানিক দৌড়ে, অবনী হাঁফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হলো।

জামাকাচির কতোগুলো ব্যাপার যেন ঠিক ঠিক মিলছিল না। আমরা ছুটতে ছুটতেই সেগুলো আলোচনা করছিলাম। গণেশ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, জামাকাচি ব্যাঙের expert, কিন্তু ব্যাঙকে অত ভয় করে কেন?"

"পেতেই পারে। যে সাপ ধরে সে কি সাপকে ভয় পায় না?"

"যারা ভগবান নিয়ে কারবার করে তারা কি ভগবানকে ভয় করে না?"

"যারা বৌ নিয়ে ঘর করে তারা কি বৌকে ভয় পায় না?"

"তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ক্যারাটে-ফ্যারাটে জানা সত্ত্বেও ও লাফ মেরে ডুব দিল কেন?'

গণেশ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "মনে নেই—আমি কাদায় পড়েছিলাম প্রথম দিন! ওই ক্যারাটের লাফ দিতে গিয়েই তো ও-ও পড়ল। ক্যারাটে-ফ্যারাটে কাদায় অচল।"

প্রশ্ন আমারও ছিল, "আচ্ছা, বাবারে, বাবা গেছি, এসব কি জাপানী কথা?"

মেজদা ধমকে উঠল, "কতোগুলো মৌলিক আর্তনাদ সব ভাষাতেই এক। জাপানী বাচ্চা 'মা-মা' বলে না কেঁদে কি ফুজিয়ামা ফুজিয়ামা বলে কাঁদে?"

"একদম ঠিক বলেছে। জাপানী দরজা কি ক্যাঁচকোঁচ না করে বুড়িপিসি বুড়িপিসি করে?"

"নাকি জাপানী বেড়াল ম্যাও ম্যাও ছেড়ে হিরোশিমা হিরোশিমা বলে ডাকে?"

যার যেরকম দম। আমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমার বেশ খানিক আগে ঢাকনাদা আর সেজদা তারও বেশ খানিক আগে মেজদা, তারও আগে গণেশ। তারকেশ্বর স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে আমরা দেখলাম সাতটা দশের তারকেশ্বর লোকাল সবে ছেড়েছে। টিকিট কাটা সম্ভব না। গণেশ দৌড়োতে দৌড়োতে পেছন ফিরে উঠতে ইশারা করে একটা কামরায় সেঁধিয়ে গেল। সেজদা, মেজদা, ঢাকনাদা যে যেমন পারল অন্য কামরায় চটপট চড়ে পড়ল। আমি কোনো রকমে শেষ কামরায় ঝাঁপিয়ে উঠে ধপ্ করে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে কাতলা মাছের মতন হাঁফাতে লাগলাম।

সন্ধ্যের পর তারকেশ্বর লোকাল মোটামুটি ফাঁকাই ফেরে কলকাতা, কিন্তু এতো ফাঁকা না। আমি দেখলাম কামরাটা একেবারে জনমানবশূন্য। কামরার মেঝেতে বিশ্রী নোংরা কাদাজল ছড়িয়ে আছে। সেইজন্যেই মনে হয় অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার কামরাটায় ওঠেনি। পেটের ভেতর প্রচণ্ড ক্ষিদেয় ইঁদুর, ছুঁচো ডন বৈঠক মারছে। তাদের বহুগুণ ছাপিয়ে, মনের ভেতর ডন বৈঠক মারছে একটা ডাইনোসর। একটাই চিন্তা, জামাকাচিকে সত্যিই ব্যাঙে খেয়ে নিল!! আস্ত লোকটাকে!!!

কালকের ভেতর বাড়িতে পুলিস। তারপর কদিন বাদে? ফাঁসি? না যাবজ্জীবন?

হঠাৎ আমার ঘাড়ের কাছে হাতের মতন কি একটা পড়ল। ফাঁকা কামরা, জনমনিষ্যি নেই। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি আঁতকে উঠে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।. তারকেশ্বর জাগ্রত দেবতা—ভূতেদের রাজা। আমাকে ফাঁকায় একা পেয়ে নির্ঘাৎ একপিস ভূত পাঠিয়েছে। জাপানী মারার শাস্তি দিতে। আর নিস্তার নেই। চোখ বুজেই আছি। আমি জানি ভূতের সঙ্গে আমি একা পারবো না। অগত্যা চোখ বুজেই আছি, হঠাৎ হাতটা উঠে গেল আর পাশের সিটে থপ করে একটা আওয়াজ হলো। সন্তর্পণে

চোখ খুলে দেখি আমার পাশে সিটের ওপর গম্ভীর হয়ে বসে আছে ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা এক কোলা ব্যাঙ। খাঁচার প্রাণটা খাঁচায় ফিরে এলো। যাক, ভূতের চেয়ে ব্যাঙ ঢের ভালো। স্বস্তি ফিরে আসছিল হঠাৎই বাঙ্কের ওপর নজর পড়তে আত্মারাম আবার খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। সামনের বাঙ্কের ওপর থেকে একটা লাল কাপড় জড়ানো মুণ্ডু উঁচু হয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি আর পারলাম না। ভয়ে "বাবাগো" বলে জামার পেছন দিকটা মাথায় তুলে মুড়ি দিয়ে ফেললাম। মিনিট দুয়েক মুড়ি দিয়ে থেকে আমার কেমন সন্দেহ জাগল। ভূত হলে ঘাড় মটকাতে এতো সময় নিত না তো। আমি জামা নামিয়ে আবার তাকালাম বাঙ্কের ওপর। মুণ্ডটা, আমার ঘাড়ে ব্যাঙ পড়াতে যেন মজাই পেয়েছে।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লাল গামছা জড়ানো জিনিসটা তড়াক করে উঠে বসল। মাথা থেকে খসে পড়ল গামছা। এতো আনন্দ আমি জীবনে পাইনি। এতো সুন্দর জিনিস স্বপ্নেও দেখিনি। গামছার মাঝে উঁকি মারছে জলজ্যান্ত যাঘামাচি জামাকাচি। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলাম জামাকাচিকে। নিমেষে ছেড়েও দিলাম। জামাকাচির পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার। সারা গায়ে বিকট পাঁকের গন্ধ।

আমি ইশারায় জামাকাচিকে সব প্রশ্ন করলাম। জামাকাচি ইশারায় যা উত্তর দিল তা সংক্ষেপে এই। জামাকাচি খুব ভালো সাঁতার জানে। ব্যাঙডোবায় জলের ভেতর আলো-আঁধারিতে অতোগুলো লোকের ঝটাপটির ভেতর সে একজনের গামছা খুলে নেয়। তারপর জামাটামা ছেড়ে গামছা মুড়ি দিয়ে পাড়ে উঠে সোজা ইস্টিশন। জামাকাচি জাপানী জিনিস। অ্যাটাচি ফেলে আসেনি মোটেই। বরং জলের ভেতর সেটা খুলে গেছল বলে তাতে চড়ে সাতটা ব্যাঙ আর বেশ কিছু পাঁক এসে জুটেছে। কামরায় পাঁক আর ব্যাঙ দেখে কেউ চড়েনি। শেষ ব্যাঙটা একটু আগে আমার ঘাড়ে লাফিয়েছে। একটু গর্বের হাসি হাসল জামাকাচি, "অ্যাই বোকামতো।" জামাকাচির সঙ্গে আরো একটু গল্প করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কেউ বোকা বলাটা আমি ভীষণ অপছন্দ করি। অন্যসময় হলে একটা মারপিট লেগে যেত কিন্তু আমি আর জামাকাচি দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত। স্টেশন আসতেই আমি নেমে পড়লাম বাকিদের সন্ধানে।

সকলেই স্টেশনে নেমেছিল বাকি সকলের খোঁজে। আমি দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লাম গণেশের কামরায়। আমার পেছনে পেছনে বাকিরা। কামরাটা মোটামুটি ভর্তি তবে ভিড় নেই। আমরা পাশাপাশি বসতে পেলাম গণেশের কোনাকুনি। প্যাসেজের এদিকে। গণেশের গায়ে গা লাগিয়ে বসে এক গোমড়ামুখো জাপানী ভদ্রলোক। তার সঙ্গে একমনে নিজের ইংরিজিতে বকে চলেছে গণেশ। প্রথমটায় আমাদের খেয়ালই করল না মোটে। মেজদা বলল, "আজি দেখছি তারকেশ্বরে জাপানী গিজগিজ করছে।"

ট্রেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে আমাদের দিকে নজর পড়ল গণেশের। সে উঠে এসে নিজেকে গুঁজে দিল আমাদের মাঝে।

"কি অত বকছিলি জাপানীটার সঙ্গে?"

"এই সাত-পাঁচ আরকি। তেমন বিশেষ কিছু না।" মৃদু হাসল গণেশ।

দিব্যি গালা আমি একদম পছন্দ করি না। কিন্তু জামাকাচির কথা সব শুনে ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। আমাকে বেশ কটা দিব্যি গালিয়ে ছাড়ল। "জামাকাচি বেঁচে আছে" কথাগুলো মগজে ঢুকতেই ঢাকনাদা আর মেজদা আনন্দে এমন লাফিয়ে উঠল যে দুজনেরই মাথা বাঙ্কে ঠুকে গেল। ওদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা ফেরিওলাকে ঘিরে, হাত ধরাধরি করে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল ঢাকনাদা আর মেজদা। মেজদার গলা দিয়ে একটা উল্লাসের গান বেরিয়ে পড়ল।

"জামাকাচি বেঁচে আছে ড্যাং ডারা ড্যাং।
বেঁচে আছে ডোবাভরা ব্যাঙেদের গ্যাং।
বেঁচে গেছি আমরা
আমাদের চামড়া
বেঁচে গেছে সকলের সবকটা ঠ্যাং।"

যাত্রীরা সব গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইল। আমাদের পাগল ভাবল

নিউ বেঙ্গল প্রেস-এর উপহার

• রবিদাস সাহারায় •
সম্পাদিত

শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প

বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সৃষ্টি করা ভূতের গল্পের মধ্যে পঞ্চাশটি পুরনো ও নতুন দিনের গল্পের বাছাই করা সংকলন। ঝকঝকে ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা প্রচুর ছবিসহ প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মত একখানি বই।

পুলিশের ডায়েরী থেকে

• সুভাষ ধর •

লেখকের পুলিশে থাকাকালীন নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও লোমহর্ষক ঘটনার কাহিনী।

একটি ঘরের রহস্য

• অনিল ভৌমিক •

মোটু, শান্ত আর শেলী তিনজন কিশোর গোয়েন্দার প্রচেষ্টায় কি ভাবে একটি খালি বাড়ির অপব্যবহার বন্ধ হল তার ঘটনাবহুল কাহিনী।

হাসির বারোটা

• দীপঙ্কর বিশ্বাস •

'মজানো দশ' এর পর লেখকের নতুন বারোটা দমফাটা হাসির গল্পের সংকলন।

নামকরণ অভিধান

• চিত্তরঞ্জন মাইতি •

বহু নতুন অর্থবহুল নাম সঙ্কলিত

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

নির্ঘাৎ। ফেরিওলা তেড়েমেড়ে উঠল। ঢাকনাদা তাকে গানে গানেই বোঝাল,

"আনন্দে দাদাভাই
দিম্‌তানা নাচি গাই
পায়ে ঠোকা খেলে দাদা
ভেবো নাকো ল্যাং।"

লোকটা এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল। গণেশ বসেই রইল। আনন্দ হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমাদের মতন আত্মহারা নয়।

আমি হাঁফ ছাড়লাম, "বাবাঃ! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জাপানী হত্যার কেলেঙ্কারির হাত থেকে রক্ষা পেলাম। জেল-টেল হতেই..."

গণেশ আমায় মাঝরাস্তায় থামিয়ে দিল, "ওই জাপানী ভদ্রলোক ট্রেন মিস করেছিল হাওড়ায়। তারকেশ্বর পৌঁছেছে লেট্‌-এ। ওকে যাদের রিসিভ করার কথা ছিল তাদের সঙ্গে ওর দেখাই হয়নি। বেচারা তিন ঘণ্টারও বেশি দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যাচ্ছে। ওর নাম কি হতে পারে বলতে পারবি?"

আমাদের ব্যবসা পণ্ড হওয়ায় খারাপ মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে জাপানী হত্যার জেল, ফাঁসি থেকে রেহাই পাওয়ার আনন্দে। আমি বললাম, "ওর নাম নেড়ামাথা বুড়িপিসি-টিসি কিছু হবে—"

গণেশ ট্রেনের ছাতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, "না-রে ওর নাম—" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো গণেশের বুক থেকে, "যাঘামাচি জামাকাচি।"

"ওদের সকলেরই নাম কি যাঘামাচি জামাকাচি নাকি?"

"না-রে এই হলো আসলে যাঘামাচি জামাকাচি।"

আমার হাঁ-টা আমি দেখতে পাইনি। বাকি তিনটে হাঁতে চড়াই পাখি অনায়াসে বাসা বাঁধতে পারবে।

"তবে...?" মেজদার প্রশ্ন শেষ হলো না। গণেশ বলে চলল।

"জামাকাচির দিনটাই খারাপ। এক জাপানী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তারকেশ্বর স্টেশনে। সে লোকটা জাপানী সার বেচে। চাষীদের কাছে সারের নমুনা দেখিয়ে অর্ডার সংগ্রহ করে। তাকেও মিস্ করেছে জামাকাচি। লোকটার নাম বলতে পারবি?"

আমাদের সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কটা প্রবল আশঙ্কা জাগছিল। আমরা কিছু না বলে গণেশের দিকে তাকালাম।

"ওর নাম রোগাসোগা বোকামতো।"

"তাই ও খালি খালি 'অ্যাই রোগা-সোগা বোকামতো' বলছিল?"

"ওটা অ্যাই না। ইংরিজির আই মানে আমি। উচ্চারণটা জাপানী।"

মানুষের হাঁ আর বাড়ে না বলে আমরা হাঁ আর বাড়াতে পারলাম না। গণেশ বলল, "জামাকাচিকে দেবার মতন, একটা অন্তত ভালো খবর হলো বোকামতো বেঁচে আছে।"

আমি সকলকে উদ্দেশ করে শুধোলাম, "তাহলে ব্যবসার পরের ধাপ?"

গণেশ বলল, "সেটাই তো জামাকাচির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।"

মেজদা হাই তুলল, "আজকের মতন বাড়ি গিয়ে চান করে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া। সারা গায়ে যা নোংরা আর ব্যথা।"

ঢাকনাদা বলল, "বেশি সময় নষ্ট করা কিন্তু চলবে না। 'হাতেনাতে ব্যবসা'...না কি যেন বইটা...দেখে পরের পদক্ষেপটা—"

আমি সায় দিলাম, "হ্যাঁ, সস্তার ঘুঁটে, আয়ুর্বেদিক ফিনাইল, আধুনিক শ্যাম্পু-ট্যাম্পুগুলো মনে হয় এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো হবে।"

সেজদা বহুক্ষণের পর কথা বলার প্রয়াস নিল, "ব্...ব্...ব্যাঙের ক্...কা ...কা..র্ ব্..বা...বা...র্-শ শ্..."

"না অমু। ব্যাঙের কাবাব সস দিয়ে খাওয়া হলো না এবার।"

"না না। ওর ব্যাঙের কাকা-বাবাদের জন্য বোধ হয় মন কেমন করছে।"

আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম "না গো সেজদা বলছে 'ব্যাঙের কারবার শেষ'।"

ছবিঃ রাজা সরকার

হঠাৎ দেখি

কার্তিক ঘোষ

গাছের মাথায়
রোদ ফুটেছে
রোদের গায়ে গন্ধ...
শালিক, টিয়া,
কাঠবেড়ালির
ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ।
কোথাও কোনো
খুনসুটি নেই
ভাব হয়েছে ছিষ্টি...
গাছ হয়েছে
বন্ধু সবার
কোথায় গেলি বৃষ্টি?
বৃষ্টি বলে,
যাচ্ছি দাঁড়াও—
শিলং ছেড়ে কালকে...
টাপুস টুপুস
বোলপুরে আর
ভরদুপুরে শালকে।
হঠাৎ দেখি
কোথ্থেকে কী
হাত ধরে সব মেঘরা...
যাচ্ছে কোথায়?
টুসির কাছে—
মেদ্‌নীপুরের এগরা!

ছবিঃ সুফি

অভিরূপের পৃথিবী

তারাপদ রায়

আর দশটি বারো-তেরো বছরের কিশোরের সঙ্গে অভিরূপের চেহারায়, আকার-প্রকারে, চলনে-বলনে যথেষ্টই সাদৃশ্য আছে।

অভিরূপের উচ্চতা পৌনে পাঁচ ফুট, এখনকার হিসেবে কমবেশি একশো তেতাল্লিশ সেন্টিমিটার, এই বয়েসি অন্য বালকদের সাধারণত যেমন হয়। খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়।

অভিরূপ মানে অভিরূপ রায়। সে ফর্সাও নয়, কালোও নয়। ভালো ভাষায় বলা যায় শ্যামবর্ণ। অভিরূপের দিদিমা বলেন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

অভিরূপের ওজন এক মণের কাছাকাছি। মানে সাঁইত্রিশ থেকে চল্লিশ কেজির মধ্যে। দোহারা চেহারা।

অভিরূপ সম্পর্কে এত কথা বলার দরকার ছিলো না। কিন্তু আমাকে বলতে হলো শুধুমাত্র এইটুকু বোঝানোর জন্যে যে আমাদের এই গল্পের অভিরূপ, যাকে বাড়ির লোকেরা অভু বলে ডাকে, সেই অভিরূপ বা অভু চলনে-বলনে নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু সে সাধারণ নয়।

অভিরূপ রায় বা অভু মোটেই সাধারণ নয়, যদিও সে দেখতে শুনতে তার সমবয়সী আর পাঁচজন-দশজন কিশোরেরই মতো। সে যে আলাদা রকমের, সেটা দেখে বোঝা কঠিন। ভিতরে ভিতরে অভিরূপ রায় সম্পূর্ণ আলাদা, সে সকলের ব্যতিক্রম। তার পায়ের নিচে কল্পনার সরষে, সেই সরষেগুলো টেনিস বলের সাইজের। তার মাথার মধ্যে সোনালি ঈগলের বাসা। অ্যাটলান্টিক সাগরের ওপরের আকাশে মহাশূন্য নীলে সেই সোনালি ডানার পাখি উড়ে বেড়ায়, কি যেন খোঁজে।

অভিরূপের মনের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া। সেটা কখনো বাংলার পাড়াগাঁয়ের সেই পুরনো কালবোশেখি। আবার কখনো মেক্সিকো উপসাগরের বা প্রশান্ত-অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের টরনাডো, হ্যারিকেন কিংবা টাইফুন।

ঝড় প্রতিদিন ওঠে না তাই রক্ষা। অভু কিংবা অভিরূপ রায় অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির কিশোর। তাকে দেখলে বোঝা যাবে না যে তার মাথার মধ্যে রয়েছে সোনালি ঈগলের বাসা, তার মনের মধ্যে ঝড়ের সঙ্কেত। তার দুই পায়ের নিচে কল্পনার সরষে, টেনিস বলের আকারের।

এবার গল্প আরম্ভ হচ্ছে।

এ এমনই গল্প যার কোনো কোনো অংশে লিখতে হবে 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে' আবার কোনো অংশে লিখতে হবে 'নিতান্ত অলীক কল্পনা'। এর বাইরেও কিছু অংশ থাকবে যার শিরোনাম হতে পারে 'হাবিজাবি'।

হাবিজাবির ব্যাপার থাক। প্রথমে সত্য ঘটনা অবলম্বনে শুরু করি। আর তারই সঙ্গে জুড়ে রয়েছে অলীক কল্পনা।

অভিরূপ রায় রানাঘাটের বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা জগদীশ রায়ের পৌত্র। জগদীশবাবু সুপরিচিত মিষ্টির দোকান 'আদি সর্বজায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিক ও পরিচালক।

জগদীশবাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলে এই মিষ্টির ব্যবসা শুরু হয়েছিলো। পুরুষানুক্রমে জগদীশবাবুরা রানাঘাটের পান্তুয়াকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করেছেন। পান্তুয়ার সেই স্বাদ, কিছুটা এখনো আছে। তবে একদা এই পান্তুয়ার কি অসামান্য আকর্ষণ ছিলো, যারা খেয়েছে তাদের জিবে সেই পান্তুয়ার স্বাদ আজীবন লেগে আছে।

রসে টইটম্বুর, লাল টুকটুকে, গোল-গোল ক্ষীরের বল নরম করে ভাজা, ঠিক মধ্যিখানে এক কুচি এলাচদানা—সে স্বাদ ভোলা যায় না।

আর সেই আমলে রানাঘাট ছিলো বিরাট জমজমাট স্টেশন। তখনো পূর্ববঙ্গ আলাদা দেশ হয়ে যায়নি। আসাম, পূর্ববঙ্গ আর উত্তরবঙ্গ যাওয়ার বড় জংশন স্টেশন ছিলো রানাঘাট। এখান থেকে রেলযাত্রীরা হাঁড়িভর্তি পান্তুয়া কিনে নিয়ে যেতো।

এ সব অবশ্য অনেককাল আগেকার কথা। আমাদের অভিরূপ কেন, সে সময় অভিরূপের বাবা পর্যন্ত জন্মাননি। তবে অভিরূপের ঠাকুরদা তখন যুবক, সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছেন। কিন্তু আর বেশি পড়তে চাননি। উচ্চশিক্ষার আজকালকার মতো সুযোগ-সুবিধে তখন ছিলো না। স্কুল পেরিয়ে জগদীশবাবু সরাসরি পৈতৃক মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়লেন।

জগদীশবাবু বাধ্য হয়ে পারিবারিক প্রয়োজনে মিষ্টির ব্যবসায়ে ঢুকেছিলেন। তাঁর অনেক রকম স্বপ্ন ছিলো। তখনকার সেকেন্ডারি পরীক্ষার নাম ছিলো ম্যাট্রিক বা ম্যাট্রিকুলেশন, বাংলায় প্রবেশিকা। সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটা পঞ্চাশ নম্বরের হাফ পেপার ছিলো ভূগোলে। সেই হাফ পেপারে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় জগদীশ রায় একচল্লিশ পেয়ে লেটার পেয়েছিলেন। সেটা সে আমলে সোজা ব্যাপার ছিলো না। এত লেটারের ছড়াছড়ি ছিলো না তখন।

জগদীশবাবুর খুব শখ ছিলো ভূগোল নিয়ে পড়াশুনো করবেন। ভূগোল পড়তে খুব ভালোবাসতেন তিনি। ম্যাপ বই খুলে খুলে দেখতেন।

কোথায় ধূ-ধূ মরুভূমিতে দিকচিহ্নহীন রাতে আকাশের তারা দেখে বুঝে নিতে হয় কোনখানে আছি। কোথায় জলপাই বনের মধ্যে শিরশির করে বয়ে যায় সমুদ্রের বাতাস। কোনো দিন মধ্য রাতে সমুদ্রের ঝড়। ছুটে আসে টাইফুন, হ্যারিকেন। কোথায় মাইলের পর মাইল আঙুরক্ষেতে, শিশিরভেজা রোদে, মুক্তোর মতো ঝলমল করছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল। তারও থেকে অনেক দূরে চুনাপাহাড়ের গোপন বাসায় ঈগল পাখি ডিম পাড়তে আসে।

বিভূতিভূষণের আরণ্যক, চাঁদের পাহাড় বারবার পড়েছেন জগদীশবাবু। অনেক জায়গা তাঁর মুখস্থ। একসময় ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রমণ কাহিনীগুলো গোগ্রাসে পড়তেন জগদীশবাবু।

অভিরূপ যে তার সমবয়সী আর দশটি ছেলের থেকে মনেপ্রাণে অনেকটা আলাদা তার কারণ তার ঐ ঠাকুরদা জগদীশ রায়। জগদীশবাবু তাঁর নাতির মনে একটা ছাপ ফেলেছেন, অনেক কিছু জানার এবং দেখার একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছেন।

বহুদূর সাইবেরিয়া থেকে শীতের হাঁস উড়ে আসে সিকি পৃথিবী অতিক্রম করে। জগদীশবাবু অভিরূপের ছোটবেলায় বাড়ির ছাদে উঠে তাকে সেই হাঁস দেখাতেন। একবার সন্ধ্যার আকাশে ধূমকেতু দেখা গিয়েছিলো, জগদীশচন্দ্র অভিরূপকে দেখিয়েছিলেন, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো নাতিকে বুঝিয়েছিলেন ধূমকেতু জিনিসটা কি।

অভিরূপ নানা রকম বই পড়াশোনা করে। কিছু কিছু বই সে নিজে যোগাড় করে স্কুল-লাইব্রেরি থেকে, পাড়ার হরিশচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার থেকে। জগদীশবাবুও নাতিকে অনেক বই আনিয়ে দেন। নিজে বাজারের বইয়ের দোকানে গিয়ে, রেলস্টেশনের স্টলে খুঁজে জগদীশবাবু নিজের পছন্দমতো বই কিনে আনেন। নিজে পড়েন, নাতিকে পড়ান। দোকানের কাজকর্ম সেরে অবসর পেলেই তার সঙ্গে আলোচনা করেন।

অভিরূপ ঠাকুর্দার কথা শোনে আর ভাবে।

আজ এই শীতের দিনে এই বিশাল পৃথিবীর কত জায়গায় নিঃশব্দে বরফ ঝরে পড়ছে। বরফ ঝরার কোনো শব্দ হয় না। বৃষ্টি পড়ার মতো টাপুর-টুপুর কোনো আওয়াজ নেই। ঠাণ্ডায় গুটিসুটি হয়ে ঘরের একপাশে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে মানুষ শুয়ে থাকে, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে সারারাত বরফ পড়ে চারদিক ছেয়ে গেছে। যতদূর দেখা যায় ধূ-ধূ সাদা বরফের চাদর। দুয়েকদিনের মধ্যে সকালবেলা বাড়ির বাইরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখে দরজা খোলা যাচ্ছে না, বরফের স্তূপ দরজা আটকিয়ে দিয়েছে। তখন তারা কোদাল, বেলচা, শাবল বের করে। দরজা ফাঁক করে শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বরফ ভাঙে, তারপর কোদাল, বেলচা দিয়ে বরফ সরায়, বাড়ি থেকে বেরোনোর পথ বার করে।

জগদীশ রায়ের কথা শুনে মনে মনে অভিরূপ ভাবে, সে যদি কোনোদিন সুযোগ পায়, ঐভাবে বেলচা দিয়ে বরফ সরাবে। ঠাকুরদাকে সে জিজ্ঞেস করে, 'দাদু, আমাদের এখানে কখনো বরফ পড়বে না?'

নাতির প্রশ্ন শুনে জগদীশবাবু হাসেন। বলেন, 'না অভু, তা পড়বে না। আর পড়লেই বা কি ভালো হতো! আমাদের শীতের জামাকাপড় নেই, বরফজমা ঠাণ্ডায় আমরা শীতে কুঁকড়ে মরে যেতাম। বরফে

চাপা পড়ে আলু, কপি, সিম, বরবটি সব মরে যেতো।'

ঠাকুরদার কথাটা অভিরূপ মনে মনে মেনে নেয়। বরফের ব্যাপারটা যতটা মজার মনে হতো, তা নয়।

তবে মরুভূমি? মরুভূমি, চারদিকে ধূ-ধূ করছে বালি, গনগনে গরম হাওয়া, হঠাৎ মরুঝড়! উটের সারি দল বেঁধে চলেছে। কখনো কখনো মরীচিকার মায়াবী হাতছানি। এরই মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় খুঁজে পাওয়া গেলো একটা ছোট মরূদ্যান। গাছে গাছে সুমিষ্ট পাকা খেজুর, পুকুরে সুপেয় জল। পাশেই বেদুইনদের বস্তি। রাতের বেলা খেজুরবীথির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে বেদুইনরা অতিথি সৎকার করলো ঝলসানো মাংসের কাবাব আর হাতে গড়া মোটা মোটা মকাইয়ের রুটি দিয়ে। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত নাচ আর গান। ভোরবেলা ঘুমজড়ানো চোখে বিছানা থেকে উঠে দেখা গেলো, দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পিরামিডের সারি।

অভিরূপের ঠাকুরদা জগদীশবাবু নাতিকে বোঝান একালে আর সেই বেদুইন নেই। তাদের সেই অতিথি-পরায়ণতার গল্পও এখন আর মেলে না। বেদুইনদের আরব্য গ্রাম থেকে মিশরের পিরামিড চোখে পড়বে না, সে অনেক অনেক দূর। আর সেই বেদুইনরা যারা টগবগে, বিশালকায় আরবি ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুরন্ত ছুটে বেড়াতো, তারা এখন বড় বড় আমেরিকান মোটর গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। প্লেনে উঠে হিল্লিদিল্লি, বিলেত-আমেরিকা চলে যায়।

ঠাকুরদার কাছে বাস্তব বিবরণ শুনে অভিরূপ কিন্তু নিরাশ হয় না। তার কিশোর মনের কল্পনার দৌড় এত সহজে থেমে যেতে পারে না।

অভিরূপ আরো বেশি, অনেক বেশি করে বই পড়ে। অধিকাংশই ভ্রমণ কাহিনী।

সেই জন্যেই হয়তো ইস্কুলের পরীক্ষায় সে খুব একটা সুবিধে করতে পারে না। ফেল করে না। এই মোটামুটিভাবে পাশ করে যায়। তবে যাকে স্ট্যান্ড করা বলে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি হওয়া, সেটা তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

তা নিয়ে অভিরূপের দুঃখ নেই। সে ইতিমধ্যেই নিজের একটা পৃথিবী রচনা করে ফেলেছে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দৈনিক সে তার মনগড়া পৃথিবী ঘুরে আসে।

অভিরূপদের স্কুল ছুটি হয় বিকেল চারটেয়। অভিরূপের স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার অনেকগুলো রাস্তা। সোজা রাস্তাটা ইস্কুলের সদর দরজার সামনের ডান দিক দিয়ে অভিরূপদের পাড়ায় গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি না থাকলে অভিরূপ কোনো দিনই বাড়ি ফেরার পথে সোজা রাস্তাটা ধরে না। সোজা রাস্তায় গেলে মিনিট দশ-বারো লাগে অভিরূপের বাড়ি পৌঁছাতে। সকালবেলায় ইস্কুলে আসার সময় তাড়াতাড়ি থাকে বলে সে সোজাসুজিই আসে। কিন্তু বিকেলে যতটা পারে ঘুরে যায়। গরমের দিনে অনেকক্ষণ সময় পায়। তবে শীতের দিনে ছুটির পর দিনের আলো মাত্র আধঘণ্টা পাওয়া যায়। বড় বড় গাছের ছায়া ঢাকা মফঃস্বলের চাপা রাস্তায় দিন শেষ না হতেই অন্ধকার ঘন হতে থাকে।

ইস্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটু এগোলেই একটা বড় মোড়। এখান থেকে ইচ্ছে করলে অভিরূপ তিনটে রাস্তা ধরতে পারে।

সামনের পশ্চিমমুখী রাস্তাটা একটু বেশি ঘোরা হয়। তবে একটা সুবিধে আছে, বিকেলের আলো পশ্চিম দিক বলেই একটু বেশিক্ষণ থাকে, অন্ধকার হতে দেরি হয়।

এই পশ্চিমমুখী রাস্তাটা গেছে সাইবেরিয়ার পাশ দিয়ে। সাইবেরিয়া মানে বহুকালের পুরনো একটা বিশাল মজাদীঘি। আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা বলে সরফরাজ দীঘি। দুশো বছর আগে সুবে বাংলার নবাব এই দীঘি কাটিয়েছিলেন। দীঘির চারপাশে আম, জাম, কাঁঠাল গাছ

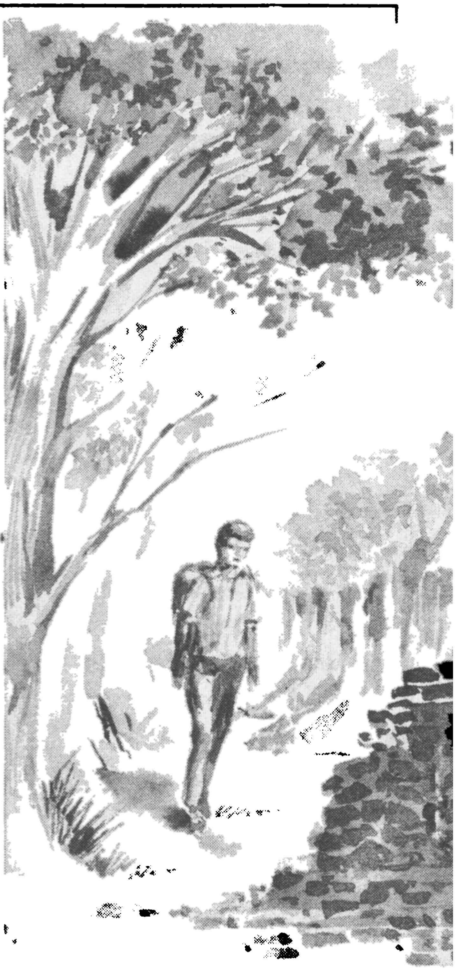

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

আর সেই সঙ্গে খেজুর আর তালের গাছ লাগিয়েছিলেন। আর চার কোনায় চারটে বটগাছ।

সে সব গাছ এতকাল পরে আর প্রায় কিছুই নেই। দূরে-কাছে একেকটা হেলে পড়া আমগাছ, বাজপড়া পোড়া তালগাছ শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করার জন্যে এখনো বেঁচে আছে। আর একটা দুশো বছরের পুরনো অক্ষয় বটগাছ আছে অনেক দূরে দীঘির শেষ প্রান্তে।

সরফরাজ দীঘি হলো অভিরূপের সাইবেরিয়া। এদিক-ওদিকে দু' চারটে বুনো গাছ, ঘোড়ানিম, যজ্ঞডুমুর। বুড়ো আম-কাঁঠাল, আচমকা এক জোড়া শিরীষ। আরেকটা গাছ প্রচুর এঁকেবেঁকে দীঘিটার ওপরে অনেক দূর চলে গেছে।

এটা একটা অপরিচিত গাছ, অভিরূপ এই গাছের নাম জানে না। এই গাছের ডালে ডালে সাত রাজ্যের বাদুড় পাখির বাসা। বাদুড় যে পাখি নয় সেটা অভিরূপ জানে। সন্ধ্যার সময় নিশাচর বাদুড়-মায়েরা বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে চরতে বেরোয়। তখন বাদুড়ের বাচ্চাগুলো কাঁদে, ঠিক মানুষের বাচ্চার কান্নার মতো শোনায়। অভিরূপের গা ছমছম করে ওঠে। এই গা-ছমছমানি রোমাঞ্চের জন্যেই সাইবেরিয়া অর্থাৎ সরফরাজ দীঘি অভিরূপকে বেশি করে টানে।

এখানে অবশ্য পাখিও প্রচুর। শীতকালে প্রতি বছর সত্যিই সাইবেরিয়া থেকে গগনচারী হাঁসের দল সরফরাজ দীঘিতে এসে নামে। আশেপাশের গাছগুলোয় আর শেষ প্রান্তের অক্ষয় বটের বাসায় হাঁসেরা সাময়িক বাসা বাঁধে।

শুধু বিদেশি হাঁস নয়, এই মজে যাওয়া বিশাল জলায় গাংশালিক উড়ে উড়ে বেড়ায়। বকের দল সারি বেঁধে আসে। ডাকতে ডাকতে এক ঝাঁক টিয়াপাখি চক্কর খায় দীঘির আকাশে। সারাদিন ধূলিধূসর ছাতাং পাখিরা ঝগড়া করে, হুটোপাটি করে।

একটা ছোট ঝোপের মধ্যে বেজির বাসা আছে। কয়েকটা গোসাপ জিব লিকলিক করে মধ্যে মধ্যে কোথা থেকে চলে আসে। ওপারের ধুতরো আর ভাঁটফুলের ঘন ঝোপে খেঁকশেয়ালের বাসা আছে। সূর্য ডুবতে না ডুবতে তারা বেরিয়ে পড়ে।

অভিরূপ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

তবে সাইবেরিয়া নয়, অভিরূপের সবচেয়ে পছন্দ উত্তরমুখী রাস্তাটা যেটা গেছে চূর্ণী নদীর ধার দিয়ে। শুধু ভৌগোলিক কারণে নয়, ঐতিহাসিক কারণেও এই পথটা অভিরূপের প্রিয়। এই রাস্তাটা গেছে মহেঞ্জোদরো আর হরপ্পার মধ্য দিয়ে। রাস্তাটার একদিকে পরিত্যক্ত ইঁটখোলা, ভাঙাচোরা টুকরো ইঁট, অর্ধদগ্ধ ইঁটের পাঁজা, পুকুরের আকারের বড় বড় গর্ত, তার কোনো কোনোটায় জল জমে রয়েছে। এই পাশটা হলো মহেঞ্জোদরো।

রাস্তার ওপাশটা হরপ্পা। একটা প্রাচীন দিনের ভাঙা মন্দির। চটা উঠে যাওয়া ফাটা চাতালের পাশে পুরনো দিনের গোল ইঁদারা। ইঁদারার খাঁজে খাঁজে নিম আর অশত্থের চারা গজিয়েছে।

অভিরূপের এই মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা আর সাইবেরিয়ার কথা তার ঠাকুরদা জগদীশবাবু জানেন। শুধু জগদীশবাবুই জানেন, আর কাউকে অভিরূপ এসব কথা বলে না।

অভিরূপের কথা জগদীশবাবু খুব মন দিয়ে শোনেন। শুধু মাঝেমধ্যে বলেন, 'সন্ধ্যের পর ওসব দিকে যেয়ো না। সাপ বেরোয়, বুনো জন্তু বেরোয়।'

অভিরূপের কথা উঠলে পাড়ার লোকেরা, বাড়ির লোকেরা বলে, 'খুব খেয়ালি ছেলে। রাতদিন মাথা গুঁজে বই পড়ে। আর কোথায় একা একা ঘুরে বেড়ায়।'

অভিরূপের সহপাঠীরা, ইস্কুলের মাস্টারমশায়েরা অভিরূপের পৃথিবীর কোনো খবরই রাখে না।

তা না রাখুক, অভিরূপ তার কল্পনার পৃথিবীতে বড় হতে হতে একদিন আসল পৃথিবীকে খুঁজে পাবে এ বিশ্বাস জগদীশবাবুর আছে।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সেই ছেলেবেলাকার

রূপক চট্টরাজ

জবর খবর আজকে
শিকেয় তুলে কাজকে
লিখতে হবে ছড়া,
পাড়াগাঁয়ের দিনরাতে
শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে
একটু মিঠেকড়া।
খাঁ-খাঁ রোদ দুপুরে
খাল বিল পুকুরে
কত ছিপ ফেলেছি,
মাঠে ঘাটে পড়ে রই
সারাদিন হই-চই
কত খেলা খেলেছি।
হা-ডু-ডু, ভলিবল
লুকোচুরি, ফুটবল
কখনও বা সাঁতরাই,
মারামারি ভাই-ভাই
ঘুষোঘুষি ঠাঁই-ঠাঁই
পড়ে পড়ে কাতরাই।
আম, আখ, নারকেল
জামরুল, কদবেল
চুরি করে খেয়েছি।
পিঠে, পুলি, রসকড়া,
পানতুয়া, ছানাবড়া
সব কিছু পেয়েছি।
মনে মনে ভাবি তাই
আজ সেথা ছুটে যাই
ঘুরে আসি একবার,
চোখ ফেটে জল আসে
সোনামাখা দিন ভাসে
সেই ছেলেবেলাকার।

ছবিঃ সুফি

২৫ বছর পরে

গৌরী দে

একগাদা চিঠির মধ্যে চোখে পড়ল একটা পুরনো খাম। অন্তত সাত-আট বছর আগের তৈরি তো বটেই। খামটার গায়ে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা আমার নাম দেখে রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে চিঠি পড়তে শুরু করলুম। কাগজটাও ময়লা। নিচে নাম লেখা 'সুমিত চন্দ্র'। খুব পরিচিত মনে হলো নামটা কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, সুমিত চন্দ্রের সঙ্গে আমার কবে কোথায় পরিচয় হয়েছিল। ভাবলুম চিঠিটা পড়ি—যদি বোঝা যায়।

ভাই মনোজিৎ,

নির্বান্ধব অবস্থায় পড়ে আছি বছরের পর বছর। আমি খুব অসুস্থ। সব সময় মাথার যন্ত্রণা হয়। শিমুলতলার এই বিশাল বাড়িটায় থাকার মধ্যে শুধু আমি আর আমার বোন। তাও বোন মৃত্যুশয্যায়। আমার পাশে এই দুর্দিনে কারোর থাকা দরকার। কিন্তু কে থাকবে? হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। চিরকালই তুমি ডানপিটে—ভয়ডর বলে তোমার কিছু নেই। তুমি এই সময় আমার পাশে থাকলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব। আমাকে চিনতে পেরেছো তো? আমি...মোটা..."

এইটুকু পড়েই চিনতে পারলুম সুমিতকে। আমার স্কুলের বন্ধু। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব ছিল। সুমিত ছিল ফর্সা গোলগাল নাদুসনুদুস ভালমানুষ। ওকে আমরা বন্ধুরা নাম দিয়েছিলুম "মোটা"। সেই নামেই ও আমাদের কাছে পরিচিত ছিল বলেই সুমিত নামটা চট্ করে মনে করতে পারিনি।

খামটা ভাল করে দেখতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিটা শিমুলতলা থেকে পোস্ট করা হয়েছে এক বছর আগে। খামের দামটা বেড়েছে। কিন্তু সেভাবে স্ট্যাম্প দেওয়া হয়নি। ভাবলুম—তাই হয়তো পড়েছিল ডাকবিভাগে। তারপর দয়া করে কেউ সেটা পাঠিয়েছে। এতদিনে সুমিতের কি অবস্থা হলো কে জানে?

ঠিক করলুম কালই রওনা হব। ক্ষতি কি! বন্ধুর উপকারও করা হবে, বেড়ানও হবে। ক'দিনের ছুটি নিয়ে যাত্রা করলুম শিমুলতলার দিকে। পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। চিঠির তলায় ঠিকানা ছিল, স্টেশনে নেমে একটা রিকশাওলাকে ঠিকানাটা বলতেই সে কেমন করে যেন আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, ঐ যে বাবু অটো দাঁড়িয়ে আছে ওদের বলুন।

অগত্যা অটো ধরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলুম যখন তখন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। অটো থেকে নেমে সুটকেসটা হাতে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলুম। অটো চলে গেল। আমি দেখলুম আমার সামনে এক বিশাল বাড়ি। বাড়ির চারধারে পাথর, মরা গাছ, শুকনো কুয়ো, মাঝখানটা একটা টিপির মতো উঁচু। তার ওপর বাড়িটা। কি রং ছিল বাড়িটার এককালে আজ আর বোঝা যায় না। বাইরের অন্ধকার নেমে আসছে বাড়িটার ওপর, ছাতের পাঁচিলে বিরাট ফাটল। তার গা চিরে বিশাল অশ্বত্থ গাছের শেকড় নেমেছে। মনে হচ্ছে বুঝিবা ভেঙে পড়ল, গা ছমছম করতে লাগল। এ কোথায় এলুম! নাকে ভেসে এল একটা অশুভ রহস্যময় গন্ধ।

একবার মনে করলুম ফিরে যাই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সাহসী বলে আমার একটা সুনাম ছিল—সেই কথা মনে পড়তেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলুম বাড়িটার দিকে। সদর দরজা ভেজানো ছিল হাত দিয়ে খুলতে যাব, নিজে থেকেই খুলে গেল। সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে।

বোধ হয় কাজের লোক। বললুম
—সুমিত আছে? আমি ওর বন্ধু।
লোকটা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। ওর পিছু নিলাম। মনে হলো লোকটা বোবা। দালানের পর দালান, ঘর ফেলে এগিয়ে চলেছি তো চলেছি। শেষে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। আমিও ঢুকলুম। ইলেকট্রিকের আলো নেই। মোমবাতিও জ্বলেনি। দেখলুম একটা ইজিচেয়ারের ওপর একটা মানুষের দেহ। এতক্ষণে চোখটা অন্ধকারে সয়ে গেছে—দেখলুম চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে একটা কঙ্কালসার দেহ। এই কি সুমিত? সেই কঙ্কালসার দেহে ঠোঁটটা নড়ে উঠল। বলল—মনোজিৎ এসেছ?

২৫ বছর আগে দেখা সেই সুমিতের সঙ্গে এই সুমিতের কত তফাৎ! সমস্ত চুল উঠে গেছে, চোখের কোল ঢুকে গেছে, সেই ফুলো গাল ভেঙে ঢুকে গেছে গর্ত তৈরি করে। বললুম—সুমিত? এ তোর কি চেহারা হয়েছে রে?

সুমিত হাসল। দেখলুম সে হাসিতে দাঁতহীন সুমিত আরও বীভৎস হয়ে উঠল। বলল—আজ দশ বছর ধরে ভুগছি। মাথার যন্ত্রণায় পাগল হতে বসেছি।

বললুম—চিকিৎসা করাসনি?

সুমিত বলল—করিয়েছি—কোনো কাজ হয়নি।

—কলকাতায় আমার কাছে চলে গেলি না কেন?

—পারিনি বোনের জন্যে। বিয়ের পরই নিঃসন্তান অবস্থায় সে ফিরে আসে। তারপরই কঠিন রোগে পড়ে। তাকে একা ফেলে যেতে পারিনি।

বললাম—কোথায় সে? কেমন আছে?

সুমিতের গলাটা কেঁপে উঠল, বলল—পাশের ঘরে। ঘণ্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল। এই প্রায় অন্ধকার ঘরে একটা মৃতপ্রায় মানুষ আর পাশের ঘরে একটা মৃতদেহ—কি করে রাত কাটাব? বললুম—তোমাদের হ্যারিকেন নেই?

ও বলল—জোর আলো আমি সহ্য করতে পারি না, চোখে যন্ত্রণা হয়। ঐ টেবিলের ওপর একটা সরু মোমবাতি আর দেশলাই আছে, একটু কষ্ট করে জ্বেলে নাও।

পেছন ফিরে লোকটাকে খুঁজলুম। সুমিত বলল—চলে গেছে। ওরা কেউ রাতে থাকে না।

উঠে গিয়ে ঘরের কোণে সরু মোমবাতিটা জ্বাললুম। ঘরটায় সামান্য আলো হলো। চোখ চলে গেল পাশের ঘরের দিকে। সেই ক্ষীণ আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল পাশের ঘরের খাটের ওপর সাদা চাদর ঢাকা একটা দেহ।

বললুম—সৎকার করতে হবে তো?

সুমিত বলল—কাল সকালের আগে হবে না। এত রাতে লোকজন পাব কোথায়? তুমি যাও, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়জামা ছেড়ে ঐ টেবিলে খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে নাও।

বললুম—তুই খাবি না?

ও বলল—আমার হজম হয় না বলে ডাক্তার বিকেলের মধ্যে খেয়ে নিতে বলেছে। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে নাও।

সব কাজ সেরে খাটে এসে বসলুম। সুমিতও এসে বসেছে খাটে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলব কি, সমস্তক্ষণ চোখটা ঐ পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে। আমার সামনেই মধ্যিখানের দরজা। তাই সোজাসুজি ঐ দিকেই চোখটা আটকে যাচ্ছে। প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগল। বুঝতে পারছি না কি করব, এমন সময় সুমিত বলল—দেখো আমরা এঘরে কথা বলছি—ওঘরে সুনীতির বোধহয় শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। এক কাজ করি, দরজাটায় একটা তালা দিয়ে দি।

অবাক হয়ে বললুম, তালা কেন?

সুমিত বলল—ওটা ভাল বন্ধ হয় না। বহু দিনের দরজা তো, ফাঁক হয়ে থাকবে। একটা তালা লাগিয়ে দিলে খুলে যাবে না।

সত্যি বলতে কি খুব খুশি হলুম। মনে মনে সুমিতকে ধন্যবাদও দিলুম। সুমিত উঠল, একটা বিরাট তালা দিল দরজাটা বন্ধ করে। চাবিটা এনে রাখল বালিশের তলায়। কিন্তু দরজাটা বেশ ফাঁক হয়ে রইল। কি করা যাবে। পুরনো দরজা। মনটাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতে লাগলুম। এমন সময় খস্‌খস্‌ শব্দ। কানখাড়া করে শুনল সুমিত। কে যেন আসছে মনে হলো।

সুমিত তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়াল খাট থেকে নেমে। পাশের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম ঘটল। পরিষ্কার দেখলুম—সাদা চাদর ঢাকা সুনীতির মৃতদেহটা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বন্ধ দরজার দিকে। সুমিত চিৎকার করে বলে উঠল—এ তো সুনীতির পায়ের শব্দ। এ শব্দ আমি চিনি। সে আসছে। আমি জানতুম সে আসবে, তাই তো দরজাটা বন্ধ করে রেখেছি।

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারের মধ্যে সাদা চাদর ঢাকা দেহটা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সুমিত পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। বলছে—সুনীতি, কালই আমি তোমার সৎকার করব বোন—তুমি একটু শান্ত হও।

আমি খাটের পেছনে নেমে দাঁড়িয়েছি। পালাতে চাইছি, পা দুটো আটকে গেছে ভারী হয়ে, নাড়াতে পারছি না। সুনীতি ক্রমাগত দরজা নাড়াচ্ছে। পরিষ্কার দেখলুম দরজার তালাটা ভেঙে পড়ল। হাট করে দরজা খুলে গেল। দমকা বাতাসে নিভন্ত মোমবাতি দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুনীতির চাদরে ঢাকা শবটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সুমিতের ওপর। একটা চিৎকার। তারপর সব শেষ।

ততক্ষণে ঘরের দরজা খুলে আমি ছুটতে আরম্ভ করেছি। পাগলের মতো ছুটছি তো ছুটছি। কতক্ষণ ছুটেছি জানি না। দিনের আলো চোখে পড়তে জ্ঞান এল। দেখলুম একটা বড় মাঠের মধ্যে আমি একা শুয়ে আছি। বুঝতে পারলুম এখানেই কালকে অটোটা আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল। পাশে সুটকেসটাও পড়ে আছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই বিশাল বাড়িটা আর নেই—তার বদলে পড়ে আছে ইট-কাঠ-পাথরের বিরাট ধ্বংসস্তূপ।

[redacted] ছবিঃ প্রণবকুমার হাজরা

রহস্যময় চুরি

অজেয় রায়

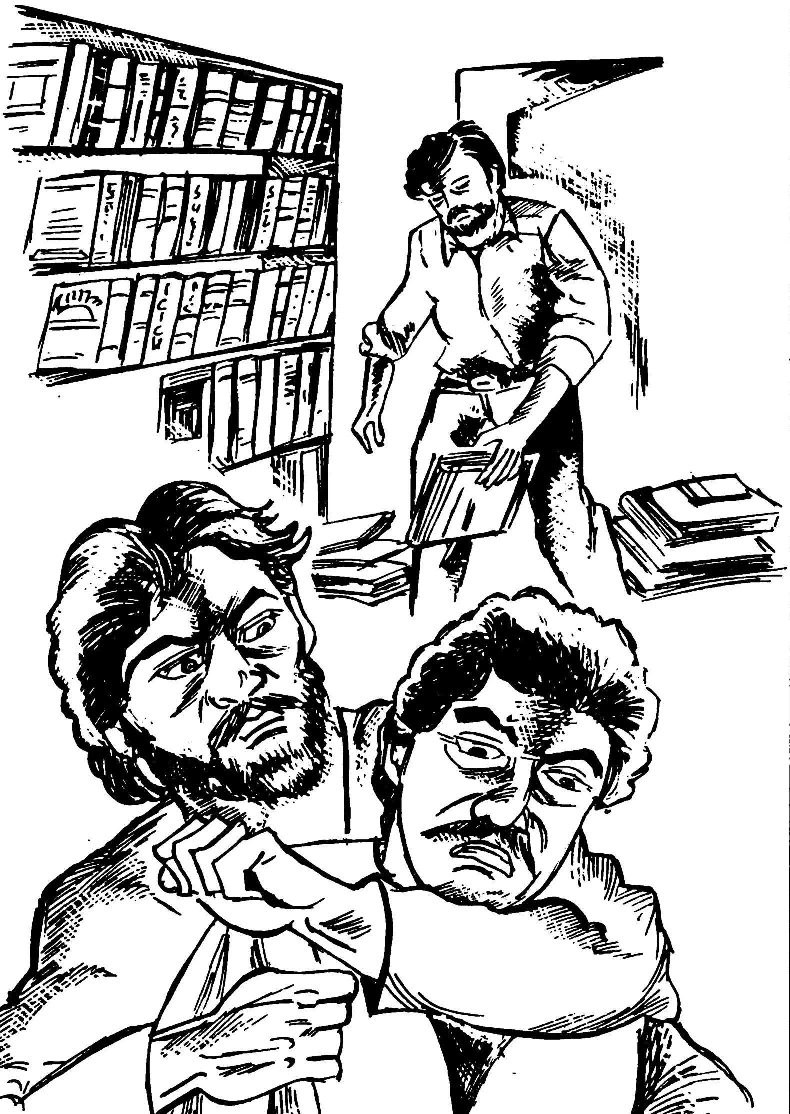

'একটু সতর্ক থাকবেন। দরজাগুলোয় তালা দেবেন। বেশ মজবুত তালা। ওপর-নিচে সব কটা ঘরে। দু'-তিন দিনের মধ্যে আমি আসব ফের। হয়তো এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। আচ্ছা চলি আজ। নমস্কার।'

বসন্তবাবু ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে থাকেন। দীপক ঝুমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পথে যেতে যেতে ঝুমা বলে, 'সরকারবাবুকে অমন ঘাবড়ে দিলে কেন? বেশ ভয় পেয়েছেন মনে হলো।'

'কারণ আছে,' দীপক জবাব দেয়, 'যা সন্দেহ করছি তা যদি ঠিক হয়, সাবধান না হলে মুশকিল'—

দীপক নিজের মনে কি সব ভাবতে ভাবতে চলে। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঝুমার ঝাঁকড়া চুল হাতে নেড়ে দিয়ে বলে—'তোর চোখ দারুণ রে! ওই সাদা টিপগুলো আমার নজরেই পড়েনি। হয়তো পড়তোই না, তুই না দেখালে।'

ঝুমা খুশিতে একগাল হাসে।

এবার দীপক আর ঝুমার নবগ্রামে আগমনের কারণটা জানাই।

সেদিন সকালে দীপক নবগ্রামে এসেছিল একজন পরিচিতর আমন্ত্রণে, সঙ্গে ভাইঝি ঝুমা। নবগ্রাম বোলপুর শহর থেকে ঘন্টাখানেকের বাস জার্নি। নবগ্রামে দীপক আসেনি আগে। দুপুরের খাওয়াও সারে সেখানে। আড্ডা দেয়। ঝুমা দীপকের বন্ধু শিবুর বোনের সঙ্গে টো টো করে সারা গ্রাম। ওখানেই দীপক শোনে যে গত রাতে সরকার বাড়িতে চোর এসেছিল। তবে নাকি নিতে পারেনি কিছু।

খবরটা শুনেই দীপকের সাংবাদিক কৌতূহল চাড়া দেয়। খোঁজ নেওয়া যাক—চুরি ঠেকাল কি ভাবে? ক্রেডিটটা কার? কী নিতে এসেছিল মনে হয়? কিঞ্চিৎ রহস্যের সন্ধান পেলে মন্দ কি? এর সঙ্গে প্রশ্ন জোড়া যায় ইদানীং এ অঞ্চলে চুরি এত বাড়ছে কেন? পুলিশ করছেটা কি? ছোট একটা স্টোরি হয়ে যেতে পারে বঙ্গবার্তায়। সম্পাদক ক'দিন ধরেই খোঁচাচ্ছেন তাকে, একটা ইন্টারেস্টিং কিছু লেখা দিতে। সেই মতলবেই বিকেলে সে ঢুঁ মারে সরকার বাড়িতে।

সরকাররা ওই গ্রামের ভূতপূর্ব জমিদার। অতি প্রাচীন পরিবার। যদিও এখন তাদের বলা যায় বড়জোর অবস্থাপন্ন গেরস্থ। তবে ও বাড়িতে নাকি অনেক দামী দামী জিনিস আছে, অনেক কালের সংগ্রহ। বাড়িটায় এখন দুই শরিকের বাস। বিশেষ সদ্ভাব নেই দু'পক্ষে।

সরকার বাড়িটা প্রকাণ্ড। তবে এখন বাড়ির অনেক অংশের দশা জীর্ণ। খোঁজ করতে, যাঁর ঘরে চুরির চেষ্টা হয়েছিল সেই বসন্তলাল সরকার বেরিয়ে আসেন।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশের কোঠায়। পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে, গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, মাঝারি লম্বা। মুণ্ডিত মস্তক। ওঁর মাথা নেড়ার কারণটা জানে দীপক। বসন্তলাল সরকারের পিতৃবিয়োগ হয়েছে সদ্য। মাত্র তিন দিন আগে শ্রাদ্ধ চুকেছে প্রয়াত গোবিন্দলাল সরকারের। এখনো বাড়ির উঠোনে ও চারধারে বড় বড় উনুন, ডাঁই করা ঝুড়ি কাঠ ইত্যাদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নানা চিহ্ন ছড়ানো। বাড়িটায় মনে হলো দুটি ভাগ। বসন্ত সরকার যে দিকটায় থাকেন সেই দিকটা তো প্রায় খালি লাগল। খাঁ খাঁ করছে যেন সেই অংশ।

দীপক এক ঝলকে দেখে নেয় যে বাড়ির অপর অংশ থেকে অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ দেখছে তাকে আর ঝুমাকে। নানা বয়সী মুখ। টাক মাথা বয়স্ক পুরুষ থেকে একেবারে কচিকাঁচা ছেলে-মেয়েরাও উঁকি মারছে। তবে তারা কেউ বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে বসন্ত সরকারের এলাকায় এল না।

নমস্কার করে বসন্তবাবুকে নিজের পরিচয় দেয় দীপক—'আমি সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা কাগজের রিপোর্টার। শুনলাম, আপনার বাড়িতে কাল চোর পড়েছিল?'

'হ্যাঁ, ছিঁচকে চোর। নিতে পারেনি কিছু।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানান বসন্তকাল।

'তবু ব্যাপারটা কি ঘটেছিল? কি করে টের পেলেন? ঢুকেছিল ঘরে? একটু ডিটেলসে বলেন যদি? চুরি তো হচ্ছেই সব জায়গায়। কিন্তু চুরি করতে দেবার আগে চোর তাড়ানো তো একটা নিউজ। কি নিতে এসেছিল মনে হয়? স্পেশাল দামী কিছু?'

'সেটা ঠিক বুঝছি না,' জানান বসন্তলাল, 'তেমন দামী জিনিস বলতে আমার কাছে কিছু ক্যাশ টাকা ছিল। এই হাজার তিনেক। আর বাবার ঘরে অবশ্য কিছু দামী জিনিস আছে। তবে বেশি নয়। মায়ের গয়না ব্যাংকে ভল্টে রাখা আছে। মা মারা গেছেন বছর পাঁচেক। তারপর থেকে বাবা একাই ছিলেন এখানে। অনেকবার আমার কাছে নিয়ে রাখতে চেয়েছি। যাননি। ভরতই ওঁর দেখাশুনা করত। ভরত আমাদের পুরনো কাজের লোক।'

'আপনি কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

'বেনারসে। প্রায় পনেরো বছর ওখানেই আছি। চাকরি করি ওখানে। আমার ফ্যামিলিও ওখানে থাকে। চলুন বৈঠকখানায় বসি। ইটি কে?' ঝুমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন বসন্তলাল।

'ভাইঝি ঝুমা। ক্লাস এইটে পড়ে। আমার সঙ্গে এসেছে নেমন্তন্ন খেতে। এখানে আমার চেনা শিবু ঘোষের বাড়িতে। ফেমাস সরকার বাড়ি দেখার ইচ্ছে, তাই সঙ্গে এল। সত্যি আপনাদের বাড়িটা দেখার মতন বটে। কি সুন্দর কারুকার্য করা থাম খিলান জানলা দরজা।'

'হুঁ, অতীত গৌরব। এসব রক্ষা করা কি সোজা ব্যাপার?' ম্লান হেসে বলেন বসন্তবাবু, 'বাবা চলে গেলেন। আমাদের অংশটা তো এবার প্রায় বন্ধই থাকবে। আমার দেশে আসা হয় খুব কম। বছরে বড়জোর দু' বার। চার-পাঁচ দিনের জন্যে। আমি একমাত্র সন্তান।'

'চুরির চেষ্টা কোথায় হয়েছিল?' জানতে চায় দীপক।

'দোতলায়। আমার ঘরের পাশে লাইব্রেরি ঘরের দরজার কড়া ভাঙছিল। আমি খুটখাট শব্দ পেয়ে কে—বলে চেঁচিয়ে উঠতেই শুনি একটা লোক ছুটে পালাল দোতলার বারান্দা দিয়ে। আমি দরজা খুলে বেরুতে বেরুতেই লোকটা উধাও। কড়াটা প্রায় খুলে ফেলেছিল। কাল রাতে বেশ গরম ছিল। তার ওপর নানা চিন্তায় ঘুম আসছিল না। তাই শুনতে পাই শব্দটা। আমার ডাক শুনে নিচ থেকে ভরতও বেরোয় ঘুম ভেঙে। কিন্তু ধরতে পারেনি চোরটাকে।'

'লাইব্রেরি ঘর! আপনাদের লাইব্রেরি আছে?' অবাক হয় দীপক।

'ওই মানে একটা ঘরে প্রচুর বইয়ের কলেকশন। আমার ঠাকুর্দার খুব বইয়ের শখ ছিল। বাবারও তাই ছিল। যে ঘরে বইগুলো আছে ওটাকেই আমরা লাইব্রেরি ঘর বলি। আমি যে ঘরে শুয়েছিলাম আর বাবার ঘর—দুটোর মাঝে লাইব্রেরি ঘর।'

'লাইব্রেরি ঘরে দামী কি আছে?' দীপক জানতে চায়।

'কিচ্ছু নেই বই ছাড়া। তবে ওই ঘর দিয়ে একটা দরজা আছে বাবার ঘরে ঢোকার। দরজাটায় ছিটকিনি দেওয়া থাকে বাবার ঘরের দিক থেকে। বাবার ঘরে কিছু রুপোর বাসন, কটা রুপোর ফুলদানি আছে। আর আছে কিছু দামী কাপড়-চোপড়—ভাল ভাল শাল কয়েকখানা ট্রাংকের ভেতর। ওই ঘরে সিন্দুকে আছে কটা সোনার গয়না আর গিনি। বাবার ঘরে বাইরের দরজায় মজবুত তালা দেওয়া ছিল। লাইব্রেরি ঘরের তালা-কড়া দুটোই কমজোরি। মনে হয় লাইব্রেরি ঘর দিয়ে বাবার ঘরে ঢোকার মতলবে ছিল চোরটা, মাঝখানের দরজার ছিটকিনি খুলে। নইলে মিছিমিছি লাইব্রেরি ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করবে কেন?'

'দোতলায় আপনাদের ঘরগুলো একবার দেখতে পারি?' অনুরোধ জানায় দীপক।

'অবশ্যই। আগে একটু চা খেয়ে যান,' বলেন বসন্তলাল।

বলতে বলতেই চা এবং সঙ্গে টা-ও এসে গেল। প্রৌঢ় ভরত নিয়ে এল। ঝুমা চা খায় না। তবে অনেকগুলো নারকেল নাড়ু আর নিমকি পরম তৃপ্তিতে সাঁটাল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বসন্তবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বাইরে থেকে কেন? চোর আমাদের বাড়িতেই আছে।'

'মানে?' দীপক অবাক।

বসন্তবাবু বললেন, 'ওই যে আমাদের অন্য শরিকদের দেখলেন, আমার জ্যাঠতুতো দাদার ফ্যামিলি। ওদের স্বভাব মোটেই ভাল নয়। টুকটাক সরায় সুযোগ পেলেই। বাবাকে খুব ভয় পেত। বাড়াবাড়ি করার ভরসা পেত না। বাবা গত হবার পরেই এ বাড়ির কটা জিনিস দেখছি উধাও হয়েছে।'

'আপনি ছিলেন তখন?'

'না। বাবা হঠাৎ অসুস্থ হলেন। খবর পেয়ে পৌঁছে বাবাকে আর জীবিত দেখতে পাইনি। তারপর হৈচৈ-এ গেল কটা দিন। পরে আবিষ্কার করলাম, বাবার ঘরে একটা ভারি সুন্দর পেতলের ঘড়া ছিল, সেটা নেই। ভরত ডাক্তার আনতে, ওষুধ আনতে ছোটাছুটি করেছে। কে যে

সরালো খেয়াল করতে পারেনি। কানুদার ফ্যামিলির লোকেরা তখন বাবার ঘরে অবাধে ঢুকেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওদের ঘরেই ঘড়াটা পাচার হয়েছে। আবার বারান্দায় ছোট্ট সুন্দর একটা শ্বেতপাথরের টেবিল ছিল, সেটাও হাওয়া হয়েছে এই হট্টগোলের সময়ে। যাকগে এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আমি ঝগড়া করতে চাই না। যাবার আগে দামী জিনিস সব ঘরে পুরে তালা দিয়ে যাব। ভরতকে ভার দেব আমার অংশ দেখাশোনা করতে। ও খুব হুঁশিয়ার আর বিশ্বাসী। ভাগ্যিস একতলায় ভাঁড়ার ঘরটা তালা বন্ধ ছিল। আর ওঘরের চাবি থাকে ভরতের কাছে। তাই বাসনগুলো বেঁচে গেছে। প্রচুর পেতল-কাঁসার বাসন আছে ওঘরে। ভরত লাগোয়া ঘরে শোয়।'

দোতলায় এক সার দক্ষিণমুখো ঘর। সামনে রেলিং দেওয়া টানা বারান্দা।

বসন্তবাবুর বাবার ঘরের দরজা থেকে একবার ভেতরে উঁকি দেয় দীপক। প্রথমেই নজর কাড়ে বিশাল এক শূন্য পালঙ্ক, লম্বা একখানা আরাম কেদারা আর একটা বিশাল চকচকে কাঠের টেবিল।

এরপর তালা খুলে তারা লাইব্রেরি ঘরে ঢোকে। বসন্তবাবু দেখালেন— 'দেখুন, দরজার কড়াটা প্রায় খুলে ফেলেছিল। কাটছিল বা ঠুকছিল কিছু দিয়ে। ওই শব্দটাই কানে আসে আমার।'

লাইব্রেরি ঘরটা মাঝারি আয়তনের। ঘর জুড়ে প্রচুর বই। তিন দিকে দেয়াল ঘেঁষে উঁচু কাঠের র‍্যাক। ঘরের মধ্যিখানেও উঁচু তিনটে র‍্যাক। আর এক ধারে দেয়ালের গায়ে রয়েছে দুটো কাচের পাল্লা দেওয়া বড় কাঠের আলমারি। র‍্যাক আলমারি সবকটাতেই ঠেসে বই আর পত্রিকা সাজানো। নানা আকারের। অনেক বই আর পত্রিকা চমৎকার করে বাঁধানো। ঘরটা মোটামুটি সাফসুফ।

দক্ষিণের দরজার দু'পাশে দুটো জানলা। আরও একটা বন্ধ দরজা রয়েছে ঘরে। প্রয়াত গোবিন্দলাল সরকারের ঘরের দিকে।

কৌতূহলী দীপক র‍্যাকগুলোর এখান-ওখান থেকে টেনে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকে। ইংরেজি-বাংলায় হরেকরকম সাবজেক্টের বই। গল্প-উপন্যাস তো রয়েছেই। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আরে সংস্কৃত বইও দেখছি!'

বসন্তলাল বললেন, 'আমার ঠাকুর্দা বেশ ভাল সংস্কৃত জানতেন।'

'বইগুলো বেশ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।' মন্তব্য করে দীপক।

'হ্যাঁ। বাবার প্রাণ ছিল এই লাইব্রেরি। খুব যত্ন নিতেন বইয়ের। প্রায় প্রতি দিন ঢুকতেন। পড়তেন। ঘর ঝাড়পোছ করাতেন। বইয়ের ধুলো ঝাড়াতেন। পোকা মারার ওষুধ দিতেন নিয়মিত। খুব চেনা নইলে কাউকে বই ধার দিতেন না বাইরে নিয়ে যেতে। কেউ পড়তে চাইলে সাধারণত এই ঘরে বসেই পড়তে হতো। ওই টেবিলে।' বসন্তলাল দেখালেন, জানলার গায়ে একটা ছোট টেবিল আর দুটো চেয়ার। 'বাবা সে সব বই আবার নিজের হাতে তুলে রাখতেন ঠিক ঠিক জায়গায়।'

'কিন্তু দুটো বই টেবিলে কেন?' দেখায় দীপক, 'কেউ পড়তে নামিয়েছিল। আপনার বাবা বোধহয় বই দুটো যথাস্থানে রাখার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই না?'

'না না, তা নয়,' বসন্তবাবু লজ্জিতভাবে জানান, 'ওই বই দুটো নামিয়েছিলেন গৌরাঙ্গবাবু। বাবা গত হবার পর। ভুলটা আমার। ঠিক জায়গায় তুলে রাখিনি। আসলে শ্রাদ্ধের কাজে তখন এত ব্যস্ত ছিলাম।'

'কে গৌরাঙ্গবাবু?'

'গৌরাঙ্গগোপাল সেন। বহরমপুরে থাকেন। একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার। আমি ওঁকে আগে কখনো দেখিনি। বাবা মারা যাবার পাঁচ দিন বাদে এখানে উপস্থিত হন। কি একটা প্রাচীন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থের খোঁজে। বাবার সঙ্গে ওনার নাকি আলাপ হয়েছিল বহরমপুরে। শুনেছিলেন যে আমাদের বাড়িতে কিছু আয়ুর্বেদের বই আছে। কারণ আমার ঠাকুর্দা আয়ুর্বেদিক চর্চা করতেন। তাই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। আমার বাবার অবশ্য শখ ছিল হোমিওপ্যাথি। দু' সাবজেক্টেরই বই আছে এখানে। বাবা যে হঠাৎ মারা গেছেন জানতেন না গৌরাঙ্গবাবু। খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন যে ভেবেছিলেন, বইখানা পেলে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নেবেন। অথবা বিক্রি করতে না চাইলে যথাসম্ভব নোট করে নেবেন। বইটা পেলে ওঁর প্র্যাকটিসে উপকার হয়। অদ্দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, তাই বললাম, দেখুন খুঁজে যদি পান?'

'গৌরাঙ্গবাবু পেয়েছিলেন সেই বই?'

'নাঃ পাননি। ঘণ্টা দুই ধরে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে চলে গেলেন। উনি যাবার পর দেখি ওই বই দুটো টেবিলে পড়ে। ভেবেছিলাম তুলে রাখব। একজন ডাকল, চলে গেলাম তখন, তারপর ভুলে গেছি।' বলতে বলতে বসন্তবাবু বই দুটো তুলে র‍্যাকে গুঁজে দিলেন দায়সারাভাবে।

'এই লাইব্রেরি, মানে বইগুলো নিয়ে কি করবেন?' প্রশ্ন করে দীপক।

'তাই ভাবছি', জানাল বসন্তবাবু, 'গৌরাঙ্গ সেন মশাইও তাই জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তো বেশি আসতে পারব না। মাসের পর মাস বইগুলো বন্ধ ঘরে পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। পোকায়-ইঁদুরে কাটবে। ভরত কি আর যত্ন করতে পারবে বইয়ের? আমি মশাই গল্প-উপন্যাসের ভক্ত। তেমনি কিছু ইংরিজি-বাংলা বই নিয়ে যাব বেনারসে। ভেবেছি, বাকি গল্পের বই বেশির ভাগ বিলিয়ে দেব কাছাকাছি লাইব্রেরিতে। কিন্তু এছাড়াও অন্য ধরনের, বিচিত্র সাবজেক্টের গাদা বই আছে—আর পত্রিকা। কিছু খুব পুরনো। ওই বইগুলো নিয়েই মুশকিল। ক'জন এসব বই বা পত্রিকার কদর বুঝবে? সত্যি বলতে কি আমি নিজেই ওগুলোয় রস পাই না। বেশির ভাগ ওরকম বই-পত্রিকা উল্টেও দেখিনি। তবে বাপ-ঠাকুর্দার আদরের জিনিস, ফেলে রেখে নষ্ট করতে মন চায় না। একটা প্ল্যান করেছি তাই। অমনি বই আর পত্রিকাগুলো বিক্রি করে দেব। বিজ্ঞাপন দেব কাগজে। যারা ইনটারেস্টেড তারা কিনবে। এই যেমন গৌরাঙ্গবাবু কিনতে চাইছিলেন। দাম কি পাব তাই নিয়ে লোভ নেই। আসলে সমঝদার লোকের হাতে

তুলে দিতে চাই। যাঁরা যত্ন করে রাখবেন বইগুলো। পড়বেন। রিসার্চের কাজে লাগবে। একটা সৎগতি হবে।

'আমার আর চার দিন বাদে চলে যাবার কথা। আরও পনেরো দিন বেশি ছুটির অ্যাপ্লাই করেছি। এখানকার জমি-জায়গা দেখাশোনার ব্যবস্থা করতে হবে, বাড়িটা খানিক সারাতে হবে। বইগুলোরও ব্যবস্থা করে যেতে চাই। আমার ফ্যামিলি অবশ্য বেনারস পাঠিয়ে দিয়েছি। ছেলের বি.এ. পরীক্ষা সামনে। ছুটি না মিললে কয়েক মাস বাদে ফের আসতে হবে।'

'কাকু দেখ, ওই বইগুলোয় টিপ দিয়েছে!'

ঝুমার কথায় দীপক নজর করে, তাই তো! সামনের র‍্যাকে একদম নিচের তাকে পর পর সাতটা বই পেছন করে খাড়া রাখা। বইগুলো উত্তমরূপে শক্ত মলাটে বাঁধাই। নানান সাইজের। বেশির ভাগই মোটা মোটা। ওই সাতটা বইয়ের মলাটের পিঠে একটা করে গোল সাদা দাগ। যেন চকের গাঢ় ফোঁটা বা ঝুমার ভাষায় টিপ।

'হুঁ, ফোঁটা দিয়েছে।' আনমনাভাবে বলে দীপক।

বসন্তলাল কিন্তু সেই বইগুলো দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করেন—'আরে সেদিন এইখানে ওই ফোঁটাওলা বইগুলো কি দেখেছি? উঁহু, মনে পড়ছে না।'

কথাগুলো কানে যেতেই দীপক সচকিতভাবে বলে, 'দেখেননি কোনো দিন?'

'মানে, যেদিন গৌরাঙ্গবাবুকে লাইব্রেরি খুলে দিয়েছিলাম।'

'তারপর আর কেউ ঢোকেনি এ ঘরে?'

'ঢুকেছে। মানে আমি নিজে, আজ সকালে। চোরে কিছু নিয়েছে কিনা দেখতে। তবে বইগুলো সেভাবে নজর করিনি।'

কৌতূহলী দীপক ওই ফোঁটা দেওয়া বইগুলো একে একে টেবিলে নামিয়ে পাতা উল্টে দেখতে থাকে। আর মন্তব্য করে—'আরে এ দুটো দেখছি বিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকার সেট।

'এই ইংরিজি বইটা তো হিমালয়ের পাখি নিয়ে। হাতে আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি রয়েছে কত! বাব্বাঃ একশো বছরেরও আগে পাবলিস্‌ড। লন্ডন থেকে ছাপা।

'এটা দেখছি সংস্কৃত বই। কাব্যগ্রন্থ। সঙ্গে বাংলা তর্জমা।

'আর এটা তো ইংরিজিতে তিব্বত ভ্রমণ কাহিনী। বিদেশী লেখক। দুটোই খুব পুরনো বই। বাঃ আপনার বাবা-ঠাকুর্দা কত রকম বই পড়তেন!'

বসন্তলাল গর্বিত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র নেশা। কোনও বদখেয়াল ছিল না। কলকাতা আর এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে যেতেন বই যোগাড় করতে, কিনতে।'

দীপক ঘুরে ঘুরে নজর করে যে এমনি সাদা ফোঁটা দেওয়া বই আর নেই। সে একটুক্ষণ গুম্ মেরে থেকে বলল, 'আমি এই কটা বইয়ের নাম, লেখক, ছাপার বছর—এই সব নোট করে নিই যদি আপত্তি আছে? একজনকে দেখাতে চাই।'

'না না, আপত্তি কিসের?' বসন্তবাবু সম্মতি জানান।

দীপক পকেট থেকে নোটবই বের করে দরকারি তথ্যগুলি লিখে নেয়।

সে আর বেশিক্ষণ থাকে না সরকার বাড়িতে। বসন্তবাবুকে সতর্ক থাকতে বলে ঝুমাকে নিয়ে বিদায় নেয়।

দীপক আবার হাজির হয় সরকার বাড়িতে দু'দিন বাদে সকালে। এবার সঙ্গে দশাসই গৌরবর্ণ সুপুরুষ এক ভদ্রলোক। তিনি মাঝবয়সী। মাথায় পাতলা চুল ধবধবে সাদা। দীপক সঙ্গের আগন্তুকের সঙ্গে বসন্তবাবুর পরিচয় করিয়ে দেয়—'ইনি পুরন্দর মজুমদার। প্রাচীন দুর্লভ পুস্তক ব্যবসায়ী এবং এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ওঁকে একবার আপনাদের লাইব্রেরির বইগুলো দেখাতে চাই। ওখানে বসেই দেখবেন। কোনও বই বাইরে নিয়ে যাবেন না। যদি আপত্তি না থাকে?'

'না, আপত্তি কিসের? আপনি তো থাকবেন সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আমিও থাকব।'

'তাহলেই হলো। আমি কিন্তু আপনাদের বেশি অ্যাটেন্ড করতে পারব না। কিছু দরকারি কাজ আছে বাড়িতে। আপনার সম্বন্ধে শিবু বলছিল সেদিন। আপনি নাকি নামকরা জার্নালিস্ট। বোলপুরে সবাই চেনে।'

এক ঝলক হেসে প্রশংসাটা হজম করে দীপক প্রশ্ন করে—'ইতিমধ্যে চুরির অ্যাটেমপ্ট আর হয়েছে?'

'না।' জানালেন বসন্তলাল।

সেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি পুরন্দর মজুমদার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন প্রায় গোটা লাইব্রেরির বই। দীপক সাহায্য করে তাঁকে। দুপুরে দীপকের পরিচিত শিবু ঘোষের বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে আসে দুজনে। বসন্তবাবু অবশ্য অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটি রাখেননি। তিন-চারবার চা এবং সঙ্গে ভাল মতোই টা পাঠিয়ে দিয়েছেন লাইব্রেরি ঘরে। নিজেও বার তিনেক এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন দীপকদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছেন পুরন্দরবাবুকে—'কি, রেয়ার বই আছে কিছু?'

পুরন্দরবাবু সোজাসুজি উত্তর দেননি। মাথা নেড়ে স্মিত হেসেছেন শুধু। তবে তিনি বসন্তবাবুকে প্রশ্ন করেছেন কয়েকটি—'গৌরাঙ্গ সেনের ঠিকানা জানেন?'

'না সরি', জবাব দেন বসন্তবাবু, বলেছিলেন, বহরমপুরে বাড়ি। পুরো ঠিকানাটা জানা হয়নি। ভুলে গেছিলাম জিজ্ঞেস করতে। যা ব্যস্ত ছিলাম সেদিন।'

'গৌরাঙ্গবাবুর চেহারাটা কেমন?'

'এই লম্বা রোগা। নাকটা খাড়া। রং শ্যামবর্ণ। মাথায় বেশ চুল, কুচকুচে কালো। মোটা কালো গোঁফ। চোখে চশমা।'

'বয়স?'

'এই আমারই বয়সী।'

'হুম্।' পুরন্দরবাবু একটু চিন্তা করে বলেন, 'আচ্ছা উনি যখন বই খুঁজছিলেন তখন কি একা ছিলেন?'

'ঠিক একা নয় সবসময়। আমার ছোট ছেলে তখন মেঝেতে মাদুর পেতে বসে একখানা বই দেখেছিল অনেকক্ষণ। বড় সাইজের বই। ভারতের ফেমাস ফোর্টগুলো

সম্বন্ধে। অনেক ছবি আছে। ওই বইটা'—র‍্যাকে আঙুল দেখান বসন্তলাল, 'অন্য ঘরে লোকজন তাই এই ঘরেই বসেছিল। তবে আমার ছেলে মাঝে মাঝে ঘুরে এসেছে বাইরে। টানা থাকেনি।'

'গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে কি কোনও ব্যাগট্যাগ ছিল?'

'আজ্ঞে ছিল। তবে ব্যাগ আমি ও ঘরে অ্যালাউ করিনি। এ ব্যাপারে বাবার একটা কড়া নিয়ম ছিল। থলি-ব্যাগ নিয়ে কেউ লাইব্রেরি ঘরে যেতে পারবে না। মানে কম পরিচিত লোক কেউ। স্রেফ খাতা-পেন নিয়ে ঢুকতে হবে। কারণটা হলো, একবার অচেনা একজন ব্যাগসুদ্ধ লাইব্রেরিতে ঢোকে বই দেখার নাম করে। সে চলে যাবার পর আবিষ্কার হয় যে বাবার একখানা দামী ডিক্‌শনারি উধাও হয়েছে। তারপর থেকে এই কড়াকড়ি। আমিও বাবার নির্দেশ ফলো করি।'

বিকেলে ফেরার আগে দীপক বসন্তবাবুকে বলল, 'এই ক'খানা বই আলাদা করে অন্য ঘরে রাখবেন। আপনার নিজের ঘরে ট্রাংকে রাখতে পারেন, ন্যাপথলিন দিয়ে।'

'এগুলো কি দামী বই?'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম দাম হবে?'

'সেটা পরে পুরন্দরবাবু জানাবেন।'

'আর ফোঁটার মতন সাদা দাগ দেওয়া বইগুলো?'

'থাক যেমন আছে।'

'ওগুলোও কি দামী?'

'নাঃ তেমন কিছু নয়।'

'আমি কি লাইব্রেরির কিছু বই বিক্রির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারি?' জানতে চান বসন্তবাবু।

'অনায়াসে। আপনার মত ঠিক। সমঝদার লোকের হাতে বা তেমন তেমন লাইব্রেরিতে ঠাঁই পাওয়া উচিত ওই বইগুলোর। আপনিও দু' পয়সা পাবেন। যা তা জায়গায় গেলে বা এখানে থাকলে বইগুলো কাজে লাগবে না। বেকার পড়ে থেকে নষ্ট হবে। আমি শীগগিরি আবার আসব। বাড়িতে কোনও চুরি হলে আমায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবর পাঠাবেন। এই গ্রামের শিবু ঘোষ আর নিতাই বসাক বোলপুরে যায় চাকরি করতে। ওরা আমার বাসা চেনে। খবর দিয়ে দেবে।'

নবগ্রাম থেকে ফেরার পথে দীপক পুরন্দরবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই গৌরাঙ্গগোপালটি কে মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে কেষ্ট হালদার। বেশ মিল আছে। তবে কেষ্টর চুল তো কাঁচাপাকা। গোঁফ নেই। চশমা নেই।'

'সে তো চুলে কলপ, ফলস্ গোঁফ আর চশমা লাগানো যায়।'

'তা বটে।'

'এই কেষ্ট হালদারটি কে?'

'একটি জোচ্চর। পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা করে কিন্তু ভারি অসৎ। লোকের বইয়ের কালেকশন দেখতে যায়। আর দামী পুরনো বই সুযোগ পেলেই লুকিয়ে ব্যাগে ভরে নিয়ে আসে। অর্থাৎ স্রেফ চুরি করে। তাই চেনা কেউ আজকাল ওকে বই দেখাতে চায় না। ভীষণ বদনাম হয়ে গেছে। থাকে কলকাতায় বাগবাজারে।'

'এই চুরিটা কি জন্যে মনে হয়?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না। প্লেন ছিঁচকে চুরি হতে পারে। আবার হতে পারে কেষ্ট হালদারের কীর্তি। কোনও লোকাল চোরকে ভাড়া করেছিল বই সরাতে। সেদিন নিজে সরাতে পারেনি, তাই। সোজাসুজি কেনার চেয়ে হয়তো এতে সস্তায় হতো। যাকগে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ব্যবস্থা তো একটা করে এলুম।'

'কিন্তু দুটো বই টেবিলে কেন?'

দিন চারেক বাদে বহুল প্রচারিত এক বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বই বিক্রির উদ্দেশ্যে বসন্তলাল সরকারের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল দীপকের। আর তার পরদিন সকালে শিবু এসে জানাল যে সরকার বাড়িতে চুরি হয়েছে গতকাল রাতে। দীপককে খবর দিতে বলেছেন বসন্তবাবু।

দীপক তক্ষুণি নবগ্রামে রওনা দিল।

বসন্তবাবু জানালেন, 'পুলিশ সকালে এসেছিল। দেখেশুনে গেছে। তবে বিশেষ গা করল বলে মনে হলো না।'

'কি কি খোয়া গেছে?'

'চোর ফের লাইব্রেরি ঘরের তালা খোলে। আশ্চর্য, সেই সাদা গোল দাগ দেওয়া সাতখানা বই-ই চুরি গেছে। আর গেছে একটা কাঁসার ঘটি। ঘটিটা দোতলার বারান্দায় ছিল রাত্তিরে।'

'আর কিছু না?'

'না। বলছেন, ওই বইগুলো তেমন

মূল্যবান নয়?'

'অফকোর্স নয়। তবে মার্কা মারা, সাদা দাগ দেওয়া আসল বইগুলো খোয়া গেলে লোকসান হতো বৈকি।'

'আসল মানে?' বসন্তবাবু ভ্যাবাচ্যাকা।

'আসল মানে যে সাতটা বই আপনার হেফাজতে রাখতে দিয়ে গিছলাম। র‍্যাকে রাখা সাদা টিপ বা ফোঁটা দেওয়া আগের সাতখানা ভল্যুম আমরা সরিয়ে ফেলি। আমরা মানে আমি আর পুরন্দরবাবু। আগের ভল্যুমগুলো থেকে চক-খড়িতে দাগানো ফোঁটা মুছে দিয়ে রেখে যাই আপনার কাছে। তার জায়গায় ঠিক অমনি রঙের চকের ফোঁটা দিয়ে, প্রায় তেমনি আকারের পাঁচটা বাঁধানো বই আর দুটো পত্রিকার সেট রেখে দিই র‍্যাকের তাকে ঠিক ওই জায়গায়। বলতে পারেন অবিকল চিহ্ন দেওয়া নকল ভল্যুম। ওগুলো অবশ্য নেহাতই এলেবেলে বই আর কিছু অতি সাধারণ বাঁধানো পত্রিকার সেট। ওসব বই বা পত্রিকা মোটেই দুর্লভ নয়। অনায়াসে আরও ঢের যোগাড় করা যায়। তাই ওগুলোর দামও নেহাৎ তুচ্ছ। ওদের জন্যে এত মেহনত করা পোষায় না। ভল্যুমগুলো খুলে কেষ্ট হালদার বেবাক বোকা বনে যাবে।'

'কে কেষ্ট হালদার?'

'ওই যিনি গৌরাঙ্গ সেন।'

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন প্লিজ।'

দীপক সংক্ষেপে জানায় কেষ্ট হালদার ওরফে গৌরাঙ্গ সেন সম্বন্ধে পুরন্দরবাবুর কাছে যা যা শুনেছে। কেন চেনা কেউ ওকে আজকাল বইয়ের ঘরে ঢুকতে দেয় না। তাই অচেনা জায়গায় নাম ভাঁড়িয়ে ঢোকে। আবার ছদ্মবেশেও যায়। যেমন মনে হয় এখানে এসেছিল গৌরাঙ্গ কবরেজ সেজে।

'রাতে কি ওই কেষ্ট হালদারই চুরি করতে এসেছিল?'

'তা মনে হয় না। এ কোনও পাকা চোরের কাজ। নির্ঘাৎ কেষ্ট হালদার তাকে ফিট করেছিল চিহ্ন দেওয়া বইগুলো চুরি করে আনতে। তা আপনি চুরি টের পেলেন কখন?'

'প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তখন রাত প্রায় দুটো। চোর দোতলার গায়ে পেয়ারা গাছ বেয়ে নেমে পালাবার সময় ভরতের কুকুরটা তাকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে। আমরা সেই ডাকে জেগে উঠি। চুরি আবিষ্কার করি। ওঃ আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব?'

হেসে দীপক বলল, 'পুরন্দরবাবুরও কিন্তু ধন্যবাদ প্রাপ্য। আমি খানিক আঁচ করলেও পুরন্দরবাবু পরীক্ষা করে চুরির আসল রহস্য ধরতে পারেন। বই আর পত্রিকাগুলোর মূল্য বোঝেন। চোর ঠকানোর বুদ্ধিটা অবশ্য এই মিঁয়ার।' নিজেকে দেখায় দীপক। তারপর বলে, 'হ্যাঁ, পুরন্দরবাবু আমার মারফৎ আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়ে গেছেন। ওই সব বই আর পত্রিকার সেট মিলিয়ে সাতখানা ভল্যুম তিনি কিনতে চান। মানে যেগুলো চুরি যাবার কথা, আপনার কাছে গচ্ছিত আছে। মোট দাম দেবেন পনেরো হাজার টাকা। কি রাজী?'

'পনেরো হাজার!' বসন্তবাবুর মুখ দেখে মনে হলো যে টাকার অঙ্কটা তাঁর প্রত্যাশার চেয়ে ঢের বেশি। তিনি সাগ্রহে বললেন, 'হুঁ, রাজী আছি।'

দীপক জানাল, 'পুরন্দরবাবু বলেছেন যে আপনাদের লাইব্রেরি থেকে তিনি আরও কয়েকটা বই কিনতে পারেন। তবে আপাতত এই সাতখানা নিতে চান। মনে রাখবেন, পুরন্দরবাবুর থেকে যাঁরা এই সব দুর্লভ বই-টই কেনেন তাঁরা কিন্তু সত্যিই সমঝদার।'

'হ্যাঁ, ওঁকেই দেব। ওঁর দাবিই সব চাইতে আগে।' বসন্তবাবু দৃঢ় কণ্ঠে আশ্বাস দেন।

সেদিন সন্ধ্যায় দীপক 'বঙ্গবার্তা'র সম্পাদকের অফিসে উঁকি মারতেই সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি স্বভাবসুলভ গ্যাঁক গ্যাঁক কণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন—'এই যে ইয়ং ম্যান, দু'দিন যে পাত্তা নেই? সেদিন বললে, শীগগিরি একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি দেবে কাগজে। তার কি হলো?'

দীপক কামরায় ঢুকে সম্পাদকের সামনে বসতে বসতে বলল, 'দেব দেব, একখানা জম্পেশ স্টোরি দেব। হেডিংটাও ভেবে ফেলেছি—রহস্যময় চুরি!'

হাঁড়িপানা মুখে ভাঁটার মতো দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কুঞ্জবিহারী বললেন, 'ব্যাপারখানা কি বল দিকি?'

দীপক সংক্ষেপে সরকার বাড়িতে বই চুরির ঘটনা বর্ণনা করে। অতঃপর মিচকে হেসে জানায়, 'আমার স্টোরিতে আরও একটু যোগ হবে। থানায় খোঁজ পেলুম, আজ দুপুরে নাকি নিউ বোলপুর হোটেলের এক বোর্ডার, নাম গৌরাঙ্গগোপাল সেন, তার নিজের রুমে, জনৈক আততায়ীর আক্রমণে রীতিমতো আহত হয়েছে। গৌরাঙ্গগোপাল আগেও এই হোটেলে উঠেছে। এবার এসেছিল গতকাল। হোটেলের লোকজন আততায়ীকে ধরে ফেলে পুলিশে দেয়। লোকটা নাকি দাগী চোর। নবগ্রামের পাশের গাঁয়ে থাকে। আততায়ী বলেছে যে গৌরাঙ্গগোপাল তাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিয়ে চুক্তি মতো টাকা না দিতে চাওয়ায় সে রাগের মাথায় ওকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়েছে। তবে খুনটুন করার মতলব ছিল না তার। সন্দেহজনক কাজটা যে কি সে খুলে বলছে না। পুলিশ তদন্ত করছে।

'এরপর হাসপাতালে যাই গৌরাঙ্গর সন্ধানে। দেখলাম, বেচারার অতি করুণ অবস্থা। মুখে-মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো, নেতিয়ে পড়ে আছে বেডে। গোঁফ উধাও। কাছে গিয়ে যেই আস্তে ডেকেছি—কেষ্টবাবু। অমনি সে চমকে চোখ খুলল। একেবারে বিস্ফারিত দৃষ্টি। আমি মুচকি হেসে কেটে পড়েছি।'

'হাঃ হাঃ'—অট্টহাসি দিলেন কুঞ্জবিহারী। তারপর ঝাঁটা গোঁফ নাচিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাল দিলেন, 'বাঃ জমবে খাসা। কালই কিন্তু লেখাটা চাই।'

ছবিঃ রাজা সরকার

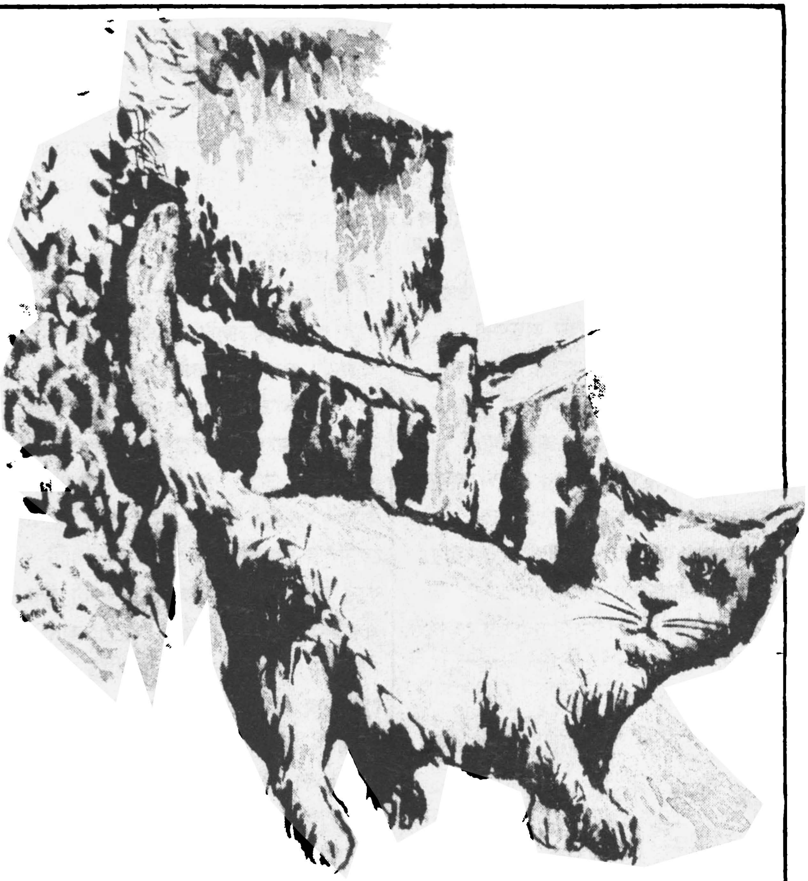

অভিমান

রমেন দাস

গোবিন্দদের বাড়িটায় কখনো রোদ পড়ে না। এটা না-শহর, না-গ্রাম। চারদিক গাছপালায় ঢাকা। সবুজ, সুন্দর। নিজেদের বাড়ির বর্ণনা দিয়ে গোবিন্দ নিজেই বলে,·এটা আফ্রিকার জঙ্গলের একটা ছোটখাটো সংস্করণ।

বন্ধুরা গোবিন্দর রঙ্গরসের কথা জানে। আর তার কথা বেশ কৌতূহল নিয়ে শোনেও। গোবিন্দ আফ্রিকার জঙ্গলের সঙ্গে নিজেদের বাড়ির মিল খুঁজে পেলেও, অমিলটাও খুঁজে বার করে! বলে, আফ্রিকার জঙ্গল হিংস্র বাঘ-সিংহের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু আমাদের বাড়ি বাঘের মাসি আর সিংহের পিসিদের জন্য খ্যাত।

গোবিন্দর এ বক্তব্যের বেশ যুক্তি আছে। কেননা, কম করেও তিন ডজন বেড়াল তাদের বাড়ির সর্বক্ষণের বাসিন্দা। আশেপাশের পাঁচ বাড়ির লোকের কাছে ওদের বাড়ির পরিচয় 'বেড়াল ভবন'। ওর বাবা স্কুলশিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের পশুপাখির সুখ-দুঃখের কথা শোনাতেন। শেখাতেন পশুপ্রীতি। নিজেও মনেপ্রাণে পশুপাখি দরদী ছিলেন। তাঁর রেশ ধরেই গোবিন্দর পশুপাখির প্রতি টান।

কোথাও কোনও কুকুর অথবা বেড়ালের কষ্ট দেখলে গোবিন্দর মন কেঁদে উঠে। কাছে অথবা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের অবস্থা দেখে। প্রয়োজনে কিছু খাবার কিনে এগিয়ে দেয়। পথেঘাটে বেওয়ারিশ কোনও বেড়ালছানা দেখলে দুঃখে কাতর গোবিন্দ তা তুলে বাড়ি নিয়ে যায়। দুধেভাতে 'মানুষ' করে।

গোবিন্দদের বাড়ির বেড়াল সদস্য কত—চট করে তার হিসেব পাওয়া মুশকিল। বাইরের লোক তা বুঝতে পারবে না। কিন্তু গোবিন্দ প্রতিটি বেড়ালের খুঁটিনাটি খোঁজখবর রাখে। তারই দেওয়া এক একটা বেড়ালের এক একটা নাম। লাট্টু, ধুবলি, পুষি, টুসি, মক্কা, দুলি আরও কত কী। এক একজনের আবার এক এক রকম আবদার। গোবিন্দ প্রতিটিকে নামে চেনে। তাদের আর্জি-আবদার, পছন্দ-অপছন্দর কথা জানে। নাম ধরে ডাকলেই মক্কা-পুষি-টুসিরা ছুটে গিয়ে তার কোলে ওঠে। গোবিন্দর কোলে কে আগে জায়গা করে নেবে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

গোবিন্দর বেড়ালপ্রীতি বাড়ির সকলে মেনে নিলেও বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে তা অসহ্য। বাড়িতে পা দিয়েই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়রা যে অতিষ্ঠ হয় গোবিন্দ তা জানে। কিন্তু তাতে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তার বিশ্বাস, আত্মীয়-বন্ধুদের ভালবাসায় খাদ আছে। কিন্তু নিরীহ বেড়াল বাহিনীর ভালবাসা নিখাদ।

বেড়ালদের ভালবাসার টানে গোবিন্দ বাড়ির খরচ কমিয়ে তাদের বরাদ্দ বাড়িয়েছে। দুলির প্রিয় দুধভাত। মক্কার চুনো মাছ ছাড়া চলে না। আবার লাট্টু-পুষির চাই কাটাপোনার টুকরো। এ সব কিছুরই আয়োজন করে গোবিন্দ। বেড়ালের ব্রেকফাস্ট নিয়মিত যোগান দিতে হয়। তাতেও পছন্দ-অপছন্দের তালিকা আছে। 'ক্রিমক্রেকার' বিস্কুট না হলে দুলির মুখভার হয়। কারোর চাই দুধে ভেজানো পাঁউরুটি, অথবা সামান্য মুড়ি। বিভিন্ন বেড়ালের ভিন্ন ভিন্ন রুচি-আবদার রাখতে গোবিন্দ একদিনও মুখ ভার করে না। তাদের খাইয়েই নিজে আনন্দ আর তৃপ্তি পায়। দুলি-মক্কাদের আদর করতে করতে বলে, ওরা অবলা জীব। ওদের দুঃখের কথা তো আর মুখ ফুটে বলতে পারে না। বুঝে নিতে হয়। হালে গোবিন্দ

চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। তার অবসর সময় কাটে বেড়াল-সঙ্গীদের নিয়েই।

গাছগাছালিতে প্রায় ঢাকা বাড়ির বারান্দায় বসে গোবিন্দ কী যেন ভাবছিল। তখনও দুপুরের স্নান-খাওয়া হয়নি। চারদিকে খাঁ-খাঁ করা রোদ। কিন্তু তাদের বাড়ির মধ্যটা কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার ভাব। সবুজ পাতার ঝোপঝাড় ভেদ করে তেজি রোদ সেখানে ঢুকতে পারে না। অথচ পাশের আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়িটার ছাদ-দেওয়াল জুড়ে কেমন রোদের মেলা । আলোয় উজ্জ্বল ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখতে কী সুন্দর। ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ির চারপাশে একটিও গাছ নেই। নেই সবুজের কোনও আস্তরণ। দোতলার বারান্দায় সাজানো শুধু মরসুমী ফুলের টব। গোলাপ-ডালিয়া-চন্দ্রমল্লিকা আরও কত বিচিত্র ফুলের বাহার।

উঁচু বাড়িটার লোকগুলোর নাক যেন ইদানীং আরও উঁচু হয়েছে। আশেপাশের পুরনো বাসিন্দাদের প্রতি কেমন যেন তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব। গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়ানো গাড়ি। সুন্দর গেট। প্রায় সব সময়ই বন্ধ। বাইরের লোকজনের সঙ্গে বাড়ির কারোর কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ছবির মতো সুন্দর বাড়িটার নির্জনতা গোবিন্দকে ভাবিয়ে তোলে। বুঝতে পারে না, বাড়ির লোকগুলো কেন নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে এমনভাবে নিষ্প্রাণ হয়ে থাকেন।

সেদিন ভরদুপুরে কোথা থেকে একটা হুলো বেড়াল গোবিন্দদের বাড়ির জানালার ধারে গোঁ-ধরে বসেছিল। মস্তবড় বেড়াল। হলুদ-সাদা রঙের বেড়ালটির ভয়ে বাড়ির আর সব বেড়াল আতঙ্কিত, চুপচাপ। যে যেমন পারল, বেড়ালগুলো খাটের নিচে, রান্নাঘরে লুকালো। গোবিন্দর সতর্ক চোখ বুঝল, কোনও হুলো বেড়ালের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই বাড়ির বেড়ালগুলো ভয়ে জড়োসড়ো। জানালার পাশে গিয়ে গোবিন্দ উঁকি দিয়ে দেখল, পাশের বাগানে বিরাট এক হুলো বেড়াল। চোখে চোখ পড়তেই হুলোর চাউনি কেমন যেন করুণ মনে হলো। গোবিন্দ ওর চোখের ভাষা বুঝল—ক্ষিধেয় কাতর হয়ে এখানে ছুটে এসেছে।

গোবিন্দর মায়া হলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর অদ্ভুত একটা শব্দ করে হুলো বেড়ালটাকে ডাকল। কী আশ্চর্য! গোবিন্দর দরদী ইশারায় হুলো বেড়ালটা নির্ভয়ে এগিয়ে এল। গোবিন্দর আনন্দ হলো। দু'টুকরো ভাজা মাছ এগিয়ে দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে তা সাবাড় করল। গোবিন্দ বুঝল, বেশ তৃপ্তি করেই বেড়ালটা খেয়েছে। এবার একটা বাটি করে জল দিল। চুকচুক করে সবটা জল এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিল। হুলো আর সরল না। ওখানে বসেই মিউমিউ রবে গোবিন্দর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর ওখানেই ঘুরঘুর করতে লাগল।

শীতের ছোট দিন। পাশের ডোবাপুকুরের জলে অনেক আগেই গাছের ছায়াগুলো অস্পষ্ট হয়েছিল। রোদের শেষ আভায় পুকুরের জল গৈরিক হয়ে উঠেছিল। গাছে গাছে শালিক পাখিদের কাকলি শুরু হলো। অন্ধকারের আঁচলে বাড়ি-বাগান সবকিছুই ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ল। তখনও করুণ স্বরের মিউমিউ আর্তনাদ। হতভাগা বেড়ালটা এখনও যায়নি?—গোবিন্দ যেন হঠাৎই চমকে উঠল। কিছুটা উদ্বেগও ফুটে উঠল চোখেমুখে। অন্ধকার আর একটু ঘন হলে নির্ঘাৎ শেয়ালের পেটে যাবে বেড়ালটা! আর দেরি করতে পারল না গোবিন্দ। টর্চটা জ্বালিয়ে গোবিন্দ তা বাগানের দিকে ধরল। টর্চের আলোয় হুলোর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। গোবিন্দ বেড়ালটার চোখের ভাষা বুঝতে পারল। আর কিছু নয়। এই মুহূর্তে সে একটু আশ্রয় চায়!

অনেকদিন কেটে গেছে। গোবিন্দর বাড়ির বেড়াল পরিবারের সঙ্গে হুলো বেড়ালটা মিলেমিশে একাকার। অন্য বেড়ালরা ওকে আর ভয় পায় না। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা। অন্যগুলোর মতো হুলো বেড়ালও গোবিন্দর কোলে-পিঠে চড়ে, আবদার-আর্জি করে। এমনি এক দুপুরে আচমকা চেঁচামেচি শুনে গোবিন্দ বারান্দায় আসে। দেখে পাশের দোতলা ফ্ল্যাটবাড়ির বারান্দায় দাঁড়ান বাড়ির গৃহিণী। তার রাগের কারণ পাশের বাড়ির নোংরা হুলো বেড়ালটা তাদের বাড়ির কার্নিশে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। লাঠি দিয়ে তাড়া করতেই এক লাফে সে গোবিন্দদের ঘরে ঢুকে পড়ল।

গোবিন্দ বারান্দায় বসেছিল। চেঁচামেচি শুনে ওদিকটায় তাকাতে সেও বেড়ালটাকে পালিয়ে আসতে দেখেছে। এসেই শান্তশিষ্টভাবে হুলো তার পায়ের কাছে চুপচাপ বসে পড়েছে।

হুলো বেড়ালটাকে গোবিন্দর পায়ের কাছে মাথা গুঁজে বসে থাকতে দেখে পাশের ফ্ল্যাটের গৃহিণীর চিৎকার আরো বেড়ে গেল। প্রথমটায় নিরীহ গোবিন্দ দু'হাতে দু'কান চেপে ধরল। তবুও চেঁচামেচি চিৎকার থামল না। তারপর রাগ-ক্ষোভ-লজ্জায় তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। হুলো বেড়ালটাকে হাতের কাছে পেয়ে তার সব রাগ-ক্রোধ গিয়ে পড়ল তার উপর। এরপর পায়ের কাছ থেকে হুলো বেড়ালটাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলে রাগতভাবে গোবিন্দর স্বগতোক্তিঃ এই আপদটার জন্য আমাকে এত অপমান সইতে হচ্ছে! ধমকের সুরে একথা বলেই গোবিন্দ কটমট করে বেড়ালটার দিকে তাকাল। হুলো বেড়ালটা গোবিন্দর চোখে চোখ রাখতে আর সাহস পেল না। মুখে কোনো শব্দও করল না। নিঃশব্দে চোখের পলকে সেখান থেকে সে সরে গেল। তারপর থেকেই হুলো বেড়ালটা নিখোঁজ— উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার আর সন্ধান মিলল না।

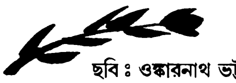

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

গণেশ হলো ময়ূরেশ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কৈলাসে সেদিন এক হুলস্থূল কাণ্ড। ভয়ে একবারে সিঁটিয়ে আছে সবাই। ভাবছে আবার একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড না ঘটে যায়। মা পার্বতী দু' চোখে আঁচল চাপা দিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। এককোণে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দী আর ভৃঙ্গী। বাবা মহাদেবের অবশ্য কোনও হুঁশ নেই। সিদ্ধিতে বুঁদ হয়ে বসে আছেন তিনি। আর যাদের জন্য এই ধুন্ধুমার কাণ্ড সেই কার্তিক আর গণেশ একবারে মারমুখী। লড়াই তাদের একটা ময়ূর নিয়ে।

কার্তিক বারবারই বলে, এই সুন্দর ময়ূরটার ওপর আমাকে ছাড়া আর কাউকে মানায় না। ওটা আমায় দে।

গণেশ বলে, হ্যাংলা কোথাকার। যা দেখবে তাই চাই। ডিম ফাটিয়ে ময়ূরটাকে বের করলাম আমি। অমন দুর্দান্ত ময়ূরটাকে বশ মানালাম আমি। আর উনি বলছেন কিনা ময়ূরটা ওঁর চাই।

চাই-ই তো। এমনি না দিলে কেড়ে নেব আমি।

একবার চেষ্টা করেই দেখ না। মেরে তোর চেহারাটাই বদলে দেব আমি।

গণেশের একথায় কার্তিক একটু ভয়ই পায়। আসলে ভাইকে জানে তো ও। দেখতে ওরকম হলে কী হবে, শক্তিতে ওর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। তাই একটু দূরে সরে গিয়ে বলে, সবসময় গায়ের জোর দেখানো ভাল নয় তা জানিস। ইচ্ছে করলে আমিও তোকে উড়িয়ে দিতে পারি। নেহাৎ ভাই বলে কিছু বলি না।

তা বেশ তো, তাহলে লাগতে

এসেছো কেন? যাও না নিজের জায়গায়।

যাবই তো। তবে যাবার সময় নিয়ে যাব এই ময়ূরটাও।

সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ায় গণেশ। খবরদার, হাত দেবে না ওটার গায়। ওটা আমার। ওটাকে আমি বাহন করেছি। ব্যস এবার সরে পড় এখান থেকে।

দু' ভায়ের ঝগড়া থামাতে না পেরে মা পার্বতী কেঁদেই চলেছেন। ভয়, শেষে এই ময়ূর নিয়ে না দুই ছেলে মিলে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে। দুজনেই যে তাঁর পাগল ছেলে তা তো তিনি বেশ ভাল করেই জানেন। তাই তিনি কার্তিককে বলেন, কেন শুধু শুধু ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছিস। ময়ূরটা তো ওই এনেছে। ও যদি না দেয় তাহলে কি তুই জোর করে নিবি?

কার্তিক বলে, আনলই বা ও। তাতে হয়েছে কি? একটু উদার হতে নেই! ওর নিজেরই তো উচিত ছিল ওটা এনে আমাকে দেওয়া।

কেন, ওর কি কোনও শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই! যাক, ও নিয়ে আর ঝগড়া না করে তুই তোর কাজে যা।

মার কথা শুনে মুখটা গোমড়া হয় কার্তিকের। চোখটা ছলছল করে বলে, তোমরা কেউ আমাকে ভালবাসো না। সব সময় ওর পক্ষ নাও তোমরা। বেশ, আমি আর থাকব না তোমাদের কাছে। আমি আবার সেই নলবনেই চলে যাব। কৃত্তিকা মায়েদের কাছেই আমি বেশ ছিলাম।

ছেলের কথায় ভয় পেয়ে মা এবার গণেশকে বলেন, তা ভাই যখন চাইছে তখন ওটা ওকে দিয়ে দিলই তো পারিস।

গণেশও এবার মুখ ব্যাজার করে বলে, তা তো বলবেই। কার্তিক সুন্দর। তাই যা কিছু ভাল সব ওকে দিতে হবে। কেন আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

পার্বতী তাড়াতাড়ি গণেশের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, তা কেন বাবা? তোকে আমি কত তপস্যা করে পেয়েছি বল তো? তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেল। ময়ূরটা ওকে দিয়ে দে।

মার কথায় গণেশ একটু শান্ত হয়। বলে, বেশ, তুমি যখন বলছ, তখন ময়ূরটা আমি কার্তিককেই দিয়ে দেব। তবে আজকে নয়। তুমি তো জান মা, সিন্ধু অসুরটা কী বাড় বেড়েছে। পৃথিবীটা একেবারে ওলটপালট করে দিচ্ছে। ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তারপর আমি ময়ূরটা দিয়ে দেব কার্তিককে।

গণেশের সে কথায় রাজী হয় কার্তিক। কৈলাসে নেমে আসে শান্তি। স্বস্তি পান পার্বতী। নন্দীভৃঙ্গীও আবার বগল বাজিয়ে বসে যায় সিদ্ধি ঘুঁটতে।

মা পার্বতী ঘরের কাজে হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন, সত্যি সত্যি অসুর সিন্ধুর উৎপাত বড্ড বেশি যেন বেড়েছে। মানুষ, দৈত্যদানো, অসুর-পিশাচ তো বটেই স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত তার ভয়ে তটস্থ। বৈকুণ্ঠ এখন ফাঁকা পড়ে আছে। তপস্যায় তুষ্ট করে সিন্ধু বিষ্ণুকে আটকে রেখেছে নিজের রাজধানীতে। এই তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁরাও ছিলেন কৈলাস ছাড়া।

সেদিন বিষ্ণুর অবস্থা দেখে শিব এসে বললেন, চল পালাই। নাহলে কোনদিন ওই অসুর ব্যাটা তোমাকে আর আমাকে না ওর রাজধানীতে আটকে রাখে।

কৈলাস থেকে যেতে যেতেই একটা সুন্দর জায়গা দেখতে পান পার্বতী। জায়গাটার চারিদিকে ফুল আর ফুল। গাছে গাছে ফল। বইছে নদী। কাকের চোখের মতো তার জল। গাছের ডালে ডালে কত না পাখি। শিস দিয়ে তারা কত সুরে গাইছে গান। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা পশু। কিন্তু হিংসা নেই কারো মনে। পার্বতী তাই শিবকে বলেন, এসো, এখানে না হয় কিছুদিন থেকে যাই। শিব রাজী হয়ে যান এককথাতেই। তাই শিব-পার্বতী ঘর বাঁধেন সেখানে।

ঘর তো বাঁধলেন, কিন্তু সিন্ধু অসুরের কি হবে?

শিব বলেন, দেখ পার্বতী, তুমি এক কাজ কর। সিন্ধুবধের জন্য তুমি এখানে তপস্যা কর।

শিবের কথায় তপস্যা শুরু করলেন পার্বতী। একদিন-আধদিন নয়, বারো বছর ধরে চলল তপস্যা। বারো বছর তপস্যার পর আবির্ভূত হলেন গণেশ। হেসে বললেন, ভয় নেই মা। আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। আর তারপর আমিই বধ করবো ওই সিন্ধু অসুরকে।

কিছুদিনের মধ্যেই পার্বতীর হলো এক সন্তান। ১১ দিন বয়সের সময় শিব তার নাম রাখলেন গণেশ। সমস্ত গণ-এর অধিকারী করে দেন তাকে। গণেশের জন্মে দেবতারাও খুশি। তাঁরা বুঝতে পারেন, এই ত্রেতা যুগে তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হওয়ার সময় হয়ে এসেছে।

সত্যি সত্যি, ত্রেতা যুগের ওই সময়টা দেবতাদের মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। তাঁদের সময় ভাল না যাওয়ার মূলে ছিল সিন্ধু। অবশ্য তাঁদেরও যে কিছু দোষ ছিল না তা নয়। ক্ষমতা পেয়ে তাঁরা যেন বড্ড বেড়ে গিয়েছিলেন। কাউকেই তাঁরা তোয়াক্কা করছিলেন না। হিতাহিত জ্ঞানটা তাঁদের চলে গিয়েছিল। কাকে কি দেওয়া উচিত বা অনুচিত সেই বোধটাও যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নাহলে এমন হবে কেন?

তখন মিথিলা নগরীর রাজা ছিলেন চক্রপাণি। উগ্রা তাঁর রানী। রাজধানী গণ্ডকীতে শান্তিতে ছিলেন তাঁরা। তবুও সুখ নেই মনে। অ-সুখের কারণ, রাজার নেই কোনও ছেলেপুলে। বিশাল রাজত্ব, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে সে রাজ্য কে ভোগ করবে, কে শাসন করবে, এই ভেবেই ঘুম নেই চক্রপাণির চোখে।

শেষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কথায় রানী উগ্রা একবছর ধরে করলেন সূর্যের উপাসনা। সেই উপাসনার ফলেই রানী হলেন সন্তানসম্ভবা। দিন যায়। রানীর শরীর থেকে যেন তেজ ফেটে বেরতে থাকে। প্রতিদিনই শরীরের তাপ বাড়তে থাকে। গায়ে হাত দিলে হাত পর্যন্ত পুড়ে যায়। নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকেন তিনি।

রানী উগ্রা সেই প্রচণ্ড তেজ আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন না। একদিন শেষে লুকিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে তিনি গর্ভের সন্তানকে ফেলে রেখে চলে আসেন।

মাটিতে পড়েই সে শিশু তীক্ষ্ণ চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার কান্নায় কেঁপে ওঠে জগৎ। সমুদ্রের মধ্যে যেসব প্রাণী ছিল তারা ভয়ে পালাতে থাকে সেখান থেকে। তখন বরুণ দেবতা এসে সেই

সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন রাজা চক্রপাণির প্রাসাদে। রাজার হাতে সেই সন্তানকে দিয়ে বলেন, এটি তোমাদেরই ছেলে। তোমরা এর নাম রাখ সিন্ধু।

সিন্ধু বড় হয়। যত দিন যায় ততই দুর্দান্ত হয়ে ওঠে সে। বয়স একটু বাড়তেই সিন্ধু শুরু করে সূর্যের উপাসনা। উপাসনায় তুষ্ট সূর্য বর দেন সিন্ধুকে। সে হবে অজেয়, অপ্রতিরোধ্য। একমাত্র গণেশের কাছে হার মানবে সে। মৃত্যুও হবে তারই হাতে।

বর পেয়ে দারুণ খুশি সিন্ধু। খুশি রাজাও। ছেলের হাতে রাজত্ব দিয়ে রানীকে নিয়ে তিনি যান বনে। তপস্যার মধ্য দিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবার জন্য।

সিংহাসনে বসেই সিন্ধু শুরু করে অভিযান। পৃথিবী এবং পাতাল জয়ের পর স্বর্গের দিকেও হাত বাড়ায় সে। সহজেই দেবতাদের হারিয়ে স্বর্গও দখল করে নেয় সে। বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাদের বাধ্য করে তার রাজধানীতে থাকতে।

সব মিলিয়ে সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। সব সময় ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন দেবতারা। সিন্ধুর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়তে থাকে। এসে যায় তার পতনেরও সময়।

প্রথম দিকটায় শিব-পার্বতী কৈলাস ছেড়ে পালিয়ে গেলেও গণেশের জন্মের পরই তাঁরা আবার ফিরে আসেন কৈলাসে।

কৈলাসে আর সব শিশুর সঙ্গে খেলাধূলা করে দিন কাটে গণেশের। সেদিন গণেশ তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটা অসুরকে তাড়া করতে করতে চলে আসে একটা বিশাল আমবাগানে। অনেকটা এলাকা জুড়ে বাগান। পাকা আমে ভর্তি সব গাছ। আমের গন্ধে মৌমাছি ঘুরছে এখানে-সেখানে। গণেশ আর তার বন্ধুবান্ধবরাও গাছে উঠে আম খেতে শুরু করে।

দুরন্ত চঞ্চল সব শিশুর দল। যত না আম খায়, তার চেয়ে হুল্লোড় করে বেশি, আম খেয়ে তার আঁটিগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে এদিকে-সেদিকে।

একটা গাছের ডালে বিরাট একটা ডিম নিয়ে বসে ছিল এক মহিলা। ছেলেদের চিৎকার-চেঁচামেচি, তাদের ছোঁড়া আমের আঁটির আঘাতে বিরক্ত সে মহিলা গাছ থেকে নেমে তাড়া করে ছেলেদের।

ওদিকে গণেশ তরতর করে গাছে উঠেই ওই বিরাট ডিমটা দু'হাতে ওপরে তুলে চাপ দেয়। ফটাস করে ফেটে যায় ডিম। আর সেই ডিম থেকে বেরিয়ে আসে খুব সুন্দর অথচ বড়সড় একটা ময়ূর। ডিম থেকে বেরিয়েই সেই ময়ূরটা খিদের জ্বালায় সেই ছেলেগুলোকে খাবার জন্য ছুটে যায়। গণেশও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পিঠে। বেশ করে তার ডানা দুটোকে ধরে দুমড়ে-মুচড়ে গণেশ শান্ত করে ময়ূরটাকে।

ময়ূরটা বুঝতে পারে, এর কাছে ট্যাঁ-ফুঁ করা চলবে না মোটেই। তাই বশ মেনে যায় সহজেই। ওদিকে সেই মহিলা এবার গণেশের সামনে হাতজোড় করে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি সেই—তুমিই সেই পরম দেবতা।

মহিলার কথায় গণেশ যেন একটু আশ্চর্য হওয়ার ভান করে। বলে, কে আপনি, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহিলা বলে, আমার নাম বিনতা। কশ্যপ ঋষির স্ত্রী আমি। গরুড়, সম্পাতি, জটায়ু—এরা আমারই ছেলে। এই ময়ূরও আমারই সন্তান। আমার স্বামী কশ্যপ ঋষি বলেছিলেন, যে এই ডিম ফাটিয়ে একে বশ করবে, সেই হবে এর প্রভু।

সেই থেকে আমি অপেক্ষা করছি, কবে তুমি আসবে। এই ডিম ভেঙে আমার সন্তানকে এই পৃথিবীর আলো দেখাবে। বছরের পর বছর কেটে গেছে। আজ আমার প্রতীক্ষা সার্থক হলো। দুষ্টু অসুর সিন্ধু আমার ছেলেদের বন্দী করে রেখেছে পাতালে। দয়া করে তুমি তাদের মুক্ত করে দাও।

বিনতাকে অভয় দেয় গণেশ। তারপর সেই ময়ূরকেই বাহন করে গণেশ। সমবেত ঋষি এবং স্বয়ং মহাদেব তখন গণেশের নাম দেন ময়ূরেশ।

গণেশ সেই ময়ূরে চেপে কৈলাসে ফিরতেই শুরু সেই ঝামেলা। আর সেই ঝামেলার শেষে গণেশ কথা দেয়, সিন্ধু অসুরকে মেরে তারপর ময়ূরটিকে সে দিয়ে দেবে কার্তিককে।

কার্তিকের সঙ্গে রফা হওয়ার পর গণেশ সেই প্রকাণ্ড বড় ময়ূরে চেপেই রওনা হয় সিন্ধু অসুরকে মারার জন্য। দুজনের মধ্যে শুরু হয় তুমুল লড়াই। গণেশের কাছে দাঁড়াতেই পারে না সিন্ধু। ময়ূরের ঠোকর আর গণেশের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণটাই চলে গেল তার।

এবার পৃথিবীতে ফিরে এল শান্তি। বন্দী দেবতারা পেলেন মুক্তি। বিষ্ণু তাঁর বাহন গরুড়কে নিয়ে চলে এলেন বৈকুণ্ঠে। সম্পাতি, জটায়ু এরাও পেল মুক্তি। সবকিছু হয়ে উঠল স্বাভাবিক। আর তখনই গণেশ কৈলাসে ফিরে ময়ূরটাকে দিয়ে দিল কার্তিককে। তারপর পার্বতীকে প্রণাম করে বলল, মা, আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমি আবার চললাম আমার জায়গায়।

গণেশ চলে গেল তার জায়গায়। মা পার্বতী অনেক কাঁদলেন। শিব এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? ও তো ওইখানেই ছিল—এখনও তাই আছে। যখন তুমি ডাকবে তখনই ও আসবে তোমার কাছে। তেমনই তো কথা আছে, তাই না?

চোখ মুছতে মুছতে মা বলেন, হ্যাঁ।

হেসে শিব বলেন, তাহলে আর কান্না কেন?

গণেশ এভাবে চলে যাওয়াতে কার্তিকেরও খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ময়ূর পাওয়ার আনন্দে সে দুঃখটা সে ভুলে গেল সহজেই। গণেশের কাছ থেকে পাওয়া সেই ময়ূরটা নিয়ে সেদিন থেকেই কার্তিক হলো ময়ূরবাহন। আরও একটা নাম হলো তার— শিখিবাহন।

ছবি ঃ অমিত চক্রবর্তী

গগনদা দি গ্রেট

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

গরানহাটা গন্ধেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাবের পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট গগন গড়গড়ি কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের ডগা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'কী বললি! তোর ভয় করছে!'

গগনদা এইভাবে চাইলে তাবড় তাবড় প্লেয়ারের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, গন্ধেশ্বরীর স্ট্রাইকার ভোট্‌কা তো কোন ছার। তবু শুকনো মুখে জোর করে একটু হাসি আনার চেষ্টা করে বলল, 'না, মানে গত বছর ভদ্রেশ্বরের জুনিয়ার টিমটা যা খেলে গেল, তারপর—'

'বল বল—তারপর? থামলি কেন, বলে যা!'

'ওই ভদ্রেশ্বরে গিয়ে খেলা তো—লোকাল সাপোর্ট পাবে ওরা, সেই কথাই বলছিলাম আর কি।'

'সেই কথাই বলছিলাম আর কি!' নাক-মুখ কুঁচকে একটা বিদিকিচ্ছিরি ভঙ্গি করলে গগনদা, 'বলি এসব কথা কি তোদের ভাবার কথা? এসব তো ভাববো আমি! কোনও প্লেয়ার সম্বন্ধে কিছু বলার থাকলে আমায় বল।'

কথা যোগাচ্ছিল না ভোট্‌কার মুখে, তাকে রক্ষে করবার জন্যে ঢ্যাঙা স্বপন বলে উঠল, 'আসলে ওদের অফেন্সটা এখন দারুণ খেলছে গগনদা, বিশেষ করে ওই ছেলেটা—এ বছর ম্যাক্সিমাম স্কোর করছে, দুর্জয় পাকড়াশি!'

'দুর্জয়! মানে সেই পাঁচ ফুটের ছেলেটা?' রাগ করতে গিয়েও খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ফেলল গগনদা, বলল, 'হ্যাঁরে, তোরা কী র‍্যা! ডিফেন্সে তোদের মতো দুটো তালগাছ রেখেছি আমি কী জন্যে? বল সেন্টার করলে ওই পাঁচ ফুটি তার নাগাল পাবে?'

'আহা ওপরের বলের কথা কে বলেছে'—গন্ধেশ্বরীর সবেধন গোলকিপার বেটুয়া বললে, 'বল নিয়ে ছোটে দেখেছো? চোখের পলকে কর্নার ফ্ল্যাগ থেকে পেনাল্টি বক্স। একবার মারতে দিয়েছো কি জালের কোণে বল।'

'তাই নাকি! তা তুমি তখন কী করবে? উচ্চিংড়ের মতো লাফ মেরে গ্যালারি-শো দেবে?'

'রাগ করছো কেন গগনদা!' ডিফেন্সের রকেট দত্তগুপ্ত অভ্যেসমতন দুবার ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক টেনে বলল—'ছেলেটা দারুণ গেম দিচ্ছে সেই কথাই বলা তোমায়।'

'কেতাত্থ হলুম।' গগনদা সোজা হয়ে বসে বললে, 'আচ্ছা, তোরা হঠাৎ এমন পাগলের মতো কথাবার্তা শুরু করেছিস কেন বল তো? কথাটা হচ্ছে, পরশুদিন ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেডের সঙ্গে আমাদের খেলা, এই তো?'

'হুঁ'—আলতো করে ঘাড় নেড়ে আমাদের সবচেয়ে মিচকে-পোড়া ফাজিল ঘোঁতন আড়চোখে চেয়ে বললে, 'খেলাটা আমাদের খেলতে হবে ভদ্রেশ্বরে গিয়ে।'

'হবে! তাতে হলোটা কী!' মাথার কদমছাঁট চুলে অনাবশ্যক একবার হাত চালিয়ে নিয়ে গগনদা বললে, 'তোদের খেলা তোরা খেলবি—হারলে হারবি, জিতলে জিতবি।'

'কী যে বলো গগনদা'—জনু, মানে জনার্দন পালচৌধুরী বোকার মতো হেসে বললে, 'তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছো—আমরা হেরে ফিরবো!'

'এ্যাই—এই কথাটাই তো শুনতে চেয়েছিলুম এতোক্ষণ ধরে!' জনুর মাথায় একটা হালকা টোকা মেরে গগনদা বললে, 'আমি যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন আমার তো একটা চিন্তা আছে, নাকি! বলি এ্যাদ্দিন টিম নিয়ে হিল্লি-দিল্লি করছে কে, অ্যাঁ! গাদাগুচ্ছের কাপ আর শিল্ড তোরা উঠিয়ে নিয়ে এসেছিস কার লিডারশিপে! আজকে হঠাৎ মাথায় অতো চিন্তাভাবনা গজিয়ে উঠল কেন!'

'শুধু ওই দুর্জয়ের জন্যে গগনদা'—ঢ্যাঙা স্বপন কথা বলতে গিয়ে একবার ধ্যাতানি খেয়েছিল, তবু বললে, 'ফার্স্ট ডিভিশনে তো খেলছেই, পরের বছর ঠিক বেঙ্গলের হয়ে খেলবে, দেখো!'

'তো?'

'মানে, সেইজন্যেই বলছিলাম ছেলেটা যাতে দুমদাম কিছু করে না ফেলে—'

'চোপ!!' এক হুঙ্কারে ওকে থামিয়ে দিল গগনদা, বলল, 'খুব বেড়েছিস। এবার চুপ কর তো! ভাবনায় ভাবনায় সব হেদিয়ে ম'লো। বলি তোদের গগনদা আছে, না মরে গেছে?'

'ছি ছি গগনদা, এসব অলুক্ষণে কথা—'

'থাম! আমার লক্ষণ-অলক্ষণ দেখাতে এয়েছে! যা যা, পরশু খেলা, সব প্র্যাকটিসে যা। আমায় অনেক কাজ এখন সারতে হবে।'

মাথা নিচু করে গুটি গুটি সব এগুচ্ছিলাম, বেটুয়ার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে গগনদা বলল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'ওই যে তুমি বললে—'

'দাঁড়া দাঁড়া, তোকে একটু এনার্জি টনিক দিতে হবে না!' গগনদা আমাদের দিকে ফিরে চোখ কটমট করে বলল—'তোরা দাঁড়ালি কী জন্যে? যা, পালা!'

এ কথা শোনার পর দাঁড়িয়ে থাকবার মতো বুকের পাটা আমাদের নেই। যেতে যেতে শুধু আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে ঘোঁতন বললে, 'বেটুয়ার জন্যে এখন ইস্পেশ্যাল স্ট্র্যাটেজি তৈরি হবে, একেবারে হাতে গরম।'

হাতে গরম স্ট্র্যাটেজি যে বেটুয়া হজম করতে পারেনি, তার প্রমাণ খেলার দিন সকালেই পাওয়া গেল। পেটের অবস্থা রীতিমতো খারাপ, এখন-তখন ছুটতে হচ্ছে নাকি বড় বাথরুমে। এই ছেলেকে কেমন করে মাঠে নামানো হবে সে কথা ভেবেই আমাদের মাথা খারাপ, অথচ নির্বিকার একমাত্র গগনদা। যতো বার কিছু বলতে যাই বলে, 'আরে ওষুধপত্তর তো সব দেওয়া হয়েছে, নাকি! দুপুরের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখ না!'

এইরকম গোঁয়ার্তুমি আগেও অনেকবার দেখিয়েছে গগনদা, তাতে ফলও অনেক সময় ভালোই হয়েছে, কিন্তু এবারে একেবারে ভরাডুবি হয়ে গেল। হাওড়া স্টেশনে যখন ট্রেনে উঠছি তখন আমাদের প্রধান চিন্তা এতোটা রাস্তা বেটুয়া যাবে কী করে, ইলেকট্রিক ট্রেনে তো আর বাথরুম-টাথরুম থাকে না। অথচ ট্রেনে উঠেও বেটুয়ার জন্যে কোনো চিন্তা নেই গগনদার, বার বার আকাশের দিকে চাইছে আর বলছে, 'একটু বৃষ্টি হলে বড়ো ভালো হতো রে—খেলাটা জমতো ভালো।'

গগনদার মুখের ওপর কথা আমরা কেউই বলি না, বিশেষ করে আমার তো আবার ভদ্র ছেলে বলে একটু-আধটু খাতিরও আছে গগনদার কাছে, সেই আমার পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'বৃষ্টির কথা ছেড়ে বেটুয়ার কথা ভাবো একটু। বৃষ্টি হলে আর আমাদের কী লাভ হবে ছাই! ভোট্‌কাটা তো পেছল মাঠে দাঁড়াতেই পারে না।'

ভগবান কিন্তু গগনদার কলাই খেলেন। গাড়ি বেলুড় পেরোবার পরই ঝমাঝম শুরু হয়ে গেল বেশ কয়েক পশলা। বেশিক্ষণ নয় বটে, কিন্তু যা হলো তা মাঠ ভেজাবার পক্ষে যথেষ্ট।

বেটুয়াকে নিয়ে গগনদাকে চিন্তিত দেখলাম খেলা শুরু হবার মিনিট পনেরো আগে। দলে রিজার্ভ কোনো গোলকিপার নেই, চিন্তা হবারই কথা। আমায় ডেকে গগনদা বললে, 'গোবরা, ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেডের কর্মকর্তা যে-কোনো একজন, আর রেফারিকে ডেকে নিয়ে আয় তো। বলবি প্রেসিডেন্ট একটু কথা বলতে চায়।'

বলতেই দুজন সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো, গগনদার নাম খেলাধুলোর আসরে মোটামুটি পরিচিত বলেই হয়তো। গগনদা বেটুয়ার অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে বললে, 'হয়তো দরকার হবে না, তবে বেগতিক বুঝলে ওকে শর্টস্ চেঞ্জ করার একটু সময় দেবেন। অবশ্য খেলার সময়ে সেটা ইনজুরি টাইমের মতো অ্যাড করতে পারেন।'

একটু আমতা আমতা করেও রাজী হয়ে গেলেন রেফারি। খেলা শুরু হয়ে গেল।

খেলবো কি ছাই, মন তো পড়ে রয়েছে বেটুয়ার দিকে। তবে তারই মধ্যে দেখলাম, খেলে বটে দুর্জয় ছেলেটা। দৌড়য় একেবারে মেঠো ইঁদুরের মতো, যখন-তখন মুভমেন্ট পালটে ফেলে। যে মুহূর্তে মনে হয় পাস দেবে বোধহয়, একটা হালকা মোচড়ে বল নিয়ে হাওয়া। কবার যে এইভাবে বোকা বানাল তার শেষ নেই।

রকেট আর স্বপন অবশ্য ওদের কাজটা মোটামুটি ভালোভাবেই সমাধা করছিল। দু'-একবার ফাউল-টাউল যে করছিল না তা নয়, তবে নিতান্ত বেগতিক বুঝলেই তবে।

একেবারে ফাঁকায় বল পেয়ে গেল দুর্জয় খেলার কুড়ি-একুশ মিনিটের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে নিয়ে একেবারে হু হু করে পেনাল্টি বক্সে। স্বপন-রকেট দুজনেই বেশ খানিকটা দূরে। অবধারিত গোল বুঝতে পেরে অসহায়ভাবে আমি তাকিয়ে আছি ফ্যাল ফ্যাল করে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেল। বেটুয়া নিজেকে চাঙ্গা করে

তোলবার জন্যেই বোধহয় সজোরে দুই উরুতে চাপড় দিল একবার, আর পরক্ষণেই—

দু' মিটারের মধ্যে কেউ ছিল না দুর্জয়ের, অথচ কী যে হলো তার, বলটা শট করার আগের মুহূর্তে পিছলে পড়ে গেল বলের ওপর। বাড়ানো বল টুক করে তুলে নিয়ে বেটুয়া বিজয়ী বীরের মতো চাপড় দিতে লাগল তাতে।

উত্তেজনার জন্যেই বোধহয় এই প্রথম শর্টস পালটাবার দরকার হলো বেটুয়ার। গগনদা ওকে নিয়ে গিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। একেবারে আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় বেচারি দুর্জয় প্রথম থতমত খেয়ে গিয়েছিল যে ফার্স্ট হাফটা আগের মেই খেলা আর খেলতেই পারল না তেমন। বরং ফাঁকতালে আমরাই একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম: বল নিয়ে বাঁ দিকের উইংকে বাড়াতে যাচ্ছিলাম, ডিফেন্ডার কী ভেবে ডান দিকে ঝুঁকতেই সুযোগ পেয়ে গেলাম আমি, সোজা ঢুকে গেলাম ভেতরে।

অবশ্যি গোল-টোল করা আমার প্রায় সাধ্যের বাইরে। নিজেদের হাফ থেকে পেনাল্টি বক্স পর্যন্ত বল টানার মতো স্ট্যামিনা আমার নেই। কিন্তু ওদের ডিফেন্ডার তো সে কথা জানে না, ফলে পেনাল্টি বক্সের মধ্যেই ফাউল করে বসল আমায়। একেবারে ফাঁকতালেই একটা গোল পেয়ে গেলাম।

দুর্জয় ছেলেটা যে সত্যি কেমন খেলে সেটা আমরা টের পেলাম সেকেন্ড হাফে। দম দেওয়া পুতুলের মতো সারাক্ষণ ছেলেটা একেবারে চরকিবাজি করে গেল। এই দেখছি ডান দিকে, তো পরক্ষণেই বাঁ দিকে। এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে তো পরের মুহূর্তেই ডিফেন্সে। আমাদের গোটা দলটাকেই প্রায় দাঁড় করিয়ে রাখল বলা যায়। দু'-দুটো পেনাল্টি কান ঘেঁষে মিস করল ওরা, রেফারি দিয়ে দিলে কিছুই করার ছিল না।

এর মধ্যে সেই ব্যাপারটাও ঘটে গেল দু'বার—সেই আশ্চর্য অঘটন। সামনে শুধু গোলকিপার বেটুয়া অসহায়ের মতো উরু চাপড়াচ্ছে, আর শট করতে গিয়ে কেমন ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল দুর্জয়। আমাদের সাপোর্টার ওখানে নেই, ওরাই দেখছি নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। দুর্জয় একবার রেফারির কাছে গিয়ে কী বলল-টললও, কিন্তু বেটুয়া শর্টস্ পালটাবার পর খেলা শুরু হয়ে গেল।

তবে শেষবারের ঝঞ্ঝাটটা এতো সহজে মিটল না। সেটা হলো খেলা শেষ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে। এক গোলে হারছে ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড, অভাবনীয় রেজাল্ট। একটা মিনিট কাটলেই গ্রেট গগনদাকে আমরা থ্রি চিয়ার্স জানাতে পারবো। তার চেয়েও বড়ো কথা পেটে একেবারে আগুন জ্বলছে—কচি-আলুর দম, ডিম সেদ্ধ যা হোক কিছু দিক, চোখে একেবারে অন্ধকার দেখছি।

কিন্তু ভাগ্যে সেটা থাকলে তো! শেষ মুহূর্তে আবার দুর্জয়ের দুরন্ত কিকের চেষ্টা এবং আবার অধঃপতন।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয় সাইড লাইনে ছুটে গিয়ে দলের সাপোর্টারদের কীসব বলেছে। হৈ হৈ করে গোটা দল মাঠে ঢুকে পড়ে আর কি! রেফারি কোনো রকমে সেন্টারে বল বসিয়েই লম্বা হুইসিল বাজিয়ে দিলেন। খেলা শেষ, আমরা এক গোলে জিতেছি।

এবং তারই সঙ্গে পুরস্কার হিসেবে ঝাঁকে ঝাঁকে বড়ো বড়ো ইট—গাইডেড মিসাইলের মতো মাথার এপাশ-ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'গোবরা, ঘোঁতন, স্বপন—পালা!' এইটুকু শুধু বেরিয়ে এসেছে গগনদার খ্যানখেনে গলা থেকে। তারপরই যে যেমন অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই দৌড়—শুধু স্টেশনটা কোনদিকে সেইটুকুই খেয়াল রাখতে হয়েছিল।

তার জন্যে অবশ্য চিন্তা ছিল না, গ্রেট গগনদার মাথা বিপদের সময়েই ভালো খোলে, এ আমরা চিরকাল দেখে আসছি। ঠিক স্টেশনের রাস্তায় আমাদের গাইড করে নিয়ে এসেছে, তারপর হাওড়াগামী একটি ট্রেনকে নড়ে উঠতে দেখে আমাদের ওই অবস্থাতেই ঠেলেঠুলে পুরে দিয়েছে, চলন্ত গাড়িতে নিজেও শেষ পর্যন্ত উঠে বসেছে।

কিন্তু তখন আমাদের খাবি খাওয়ার মতো অবস্থা। গায়ে-মাথায় ঘামের বন্যা ছুটছে, জিভ আধখানা করে বেরিয়ে এসেছে, আর চেহারার অবস্থা ঠিক কেমন আয়না থাকলে বুঝতে পারতাম।

মিনিট পাঁচেক কুকুরের মতো ওইভাবে হ্যা হ্যা করে হাঁফাবার পর ঢ্যাঙা স্বপন বললে, 'ব্যাপারটা কী হয়েছিল এবার বলো তো গগনদা?'

গগনদা হাতের ইঙ্গিতে তখন ঝালমুড়ি-ওয়ালা ডাকছে, বললে, 'দাঁড়া, আগে পেটে কিছু পড়ুক, তারপর বলছি।'

গগনদা সত্যিই গ্রেট। দু' টাকা করে বড় ঠোঙা, প্রত্যেকের দু' ঠোঙা করে বরাদ্দ হয়ে গেল, এমনকি বেটুয়ার পর্যন্ত। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'গগনদা, ওর জন্যে না হয় শশা-টসা কি অন্যকিছু—'

'থাম তো!' আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রথম ঠোঙাটা গগনদা বেটুয়ার হাতেই তুলে দিল। রকেটের এসব ব্যাপারে মাথা খেলে একটু কম, সে গগনদার দিকে চেয়ে বলল, 'এটা কেমন হলো?'

'এটাই ঠিক হলো'—গগনদার ঠোঁটে চাপা হাসি, আড়চোখে বেটুয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'নাকি রে, বেটুয়া?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও'—জনু বললে, 'তার মানে বেটুয়ার পেট খারাপটা—'

'স্ট্যাটেজি। তোদেরও বলতে বারণ করেছিলুম।'

'কিন্তু কেন?'

'নইলে বার বার শর্টস্ পালটাবার চান্স পাওয়া যায় না যে।'

'কী হবে পালটে?'

'কী হবে!' অর্থপূর্ণ হাসি হেসে এক খাবলা মুড়ি মুখে পুরে দিল গগনদা, তারপর খচাম খচাম করে চিবোতে চিবোতে বলল, 'রীতিমতো অর্ডার দিয়ে তৈরি করা। সেইজন্যেই তো বৃষ্টি হওয়ার একটু দরকার ছিল।'

'ধুত্তেরি ছাই, মাথা-ফাতা ঘুলিয়ে যাচ্ছে'—ভোট্‌কা একটু গলা চড়িয়েই বললে এবার, 'ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলবে?'

'খোলসা করার কিছু নেই'—একটা

খালি ঠোঙা দলা পাকিয়ে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে গগনদা বললে, 'তোরা দুর্জয় সম্বন্ধে য়্তোটা জানিস, আমি তার চেয়ে বেশি জানি, অবশ্যি জানতে আমাকে হবেই, এটাই আমার কাজ। ভিজে মাটির চেয়ে শুকনো মাটিতে ছেলেটা ভালো খেলে, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হলো ওর এক দাদা হাইড্রোফোবিয়া, মানে জলাতঙ্ক রোগে মারা যায়। সেই থেকে জলে ওর একটা অদ্ভুত ভয় আছে। সেইটাকেই কাজে লাগালুম আমি। বেটুয়ার প্যান্টের পকেটে আছে দুটো বড় ব্লাডার, ফুল উইথ ওয়াটার। পাশের দুটো বোতাম আসলে দুটো ভাল্‌ব্‌। উরু চাপড়াবার সময় ঢাকনা খুলে দু'পাশে চাপ দিলে কী হবে? পিচকিরির মতো জল আছড়ে পড়বে সামনে। হঠাৎ শট নেবার সময় এই ব্যাপারটা ঘটলে সে ঘাবড়ে যেতে পারে, পা পিছলোতে পারে, আরো অনেক কিছুই হতে পারে—বিশেষ করে জলে যার ভয় আছে তার। অবশ্যি একেবারে দায়ে পড়লে তবেই এটা বেটুয়াকে করতে বলেছিলুম। ছোঁড়াটা প্রথমবার কিছু বুঝতেই পারেনি, দ্বিতীয়বার খানিকটা আন্দাজ করেছিল, আর তৃতীয়বার—'

একেবারে হাঁ করে শুনছিলাম আমরা। গগনদা আমাদের সেই মুখগুলো একটু জরিপ করে নিয়ে বললে, 'দূর ব্যাটা বুদ্ধু কোথাকার! এমন মুখ-চোখ করে আছিস যেন ভদ্রেশ্বর হাফ ডজন পুরে দিয়েছে আমাদের। একটু চেঁচামেচি কর—ফুর্তি কর!'

সঙ্গে সঙ্গে লিডারশিপ নিয়ে নিল ভোট্‌কা, চিৎকার করে বললে, 'থ্রি চিয়ার্স ফর গঙ্গেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাব।'

আমরা সবাই গলা মেলালাম সেই সঙ্গে। সেই হুঙ্কার মিলিয়ে যাবার আগেই শুনতে পেলাম ঘোঁতনের গলা মিনমিন করছে—'থ্রি চিয়ার্স ফর গগনদা দি গ্রেট।'

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সার্থক অভিযান

বসন্ত ভট্টাচার্য

শক্তিগড়ের হাবু-নদু
গুপী-বাঘার বংশধর
দিচ্ছে এবার মাধ্যমিক
পড়ার নামেই গায়ে জ্বর।

ভূতের বরে কোশ্চেন সব
ওদের হবে আগাম জানা
খাতা ভরে লিখবে সবই
একশো পেতে কোথায় মানা!

দেশসুদ্ধু বলছে সবাই
এবার হবে জোড়া ফার্স্ট
হাবু-নদুর কারসাজিতে
ফার্স্ট বয়েরা হবে লাস্ট!

পুলিশ এসে ঘন ঘন
হাবু-নদুর নামটি হাঁকে
গুপী বাঘার বংশধরের
মান-ইজ্জৎ ধুলোয় ঢাকে।

বোর্ড কর্তা মিটিং করে
গলদঘর্ম হয়ে মরেন
কোশ্চেন আউট হয় না যেন
গুণীন ওঝা সবকে ধরেন।

অমাবস্যার আঁধার রাতে
ভূতের জুতো গলিয়ে পায়
কোশ্চেন আনার অভিযানে
হাবু-নদু যাত্রা লাগায়।

হাওয়ার বেগে ছুটলো খবর
আউট হচ্ছে কোশ্চেন
লক্ষ টাকার কারবারেতে
কিছু মানুষ ধনী হলেন।

মূল আসামীর সন্ধানেতে
সিপাই ছোটে হেথা-হোথায়
মাঝ পথেতে খুইয়ে জুতো
হাবু-নদু রইলো কোথায়?

দুই খোকা

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিস টেনিস লিয়েন্‌ডার
বিওন বোর্গ আর ম্যাকেন্‌রো কে
ইতিহাসে অতীত রেখে
ওলিম্পিকের ঘাসের ওপর
এগিয়ে চলার নিশানদার॥

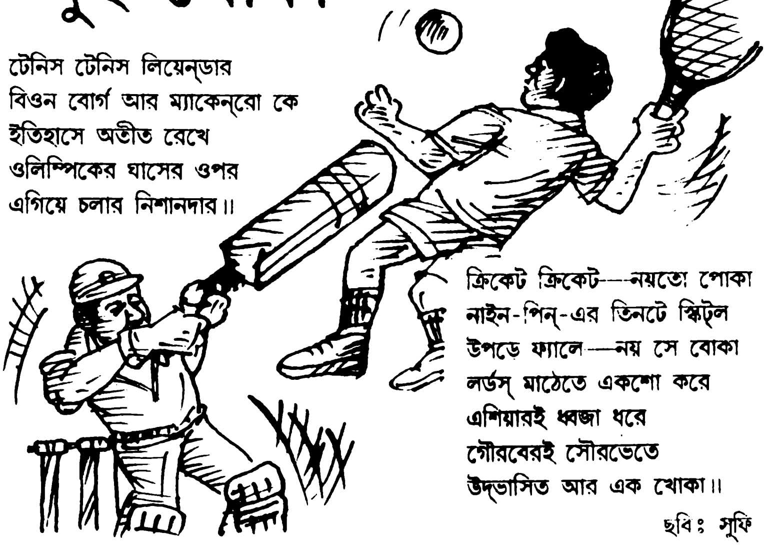

ক্রিকেট ক্রিকেট—নয়তো পোকা
নাইন-পিন্‌-এর তিনটে স্কিট্‌ল
উপড়ে ফ্যালে—নয় সে বোকা
লর্ডস্‌ মাঠেতে একশো করে
এশিয়ারই ধ্বজা ধরে
গৌরবেরই সৌরভেতে
উদ্‌ভাসিত আর এক খোকা॥

ছবিঃ সুফি

সুমনা মাসির দিনকাল

পবিত্র সরকার

'দুর্ঘটনা-প্রবণ' কাদের বলে জান? এই যারা ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খায়, চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ার উলটে পড়ে যায়, রাস্তায় চলতে গিয়ে হঠাৎ খন্দে পা ফেলে পা মুচকে বসে।

চারপাশে সব লোক দিব্যি চলছে-ফিরছে, বাজার করছে, অফিস যাচ্ছে, বিকেলে শেয়ালদা থেকে সস্তায় লিচু কিনে বাড়ি ফিরছে, কারও কিছু হচ্ছে না। সবাই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে ছেলেপুলে নিয়ে আরামে বসে টিভি দেখছে, তারপর দুখানা রুটি আর কুচো চিংড়ি দিয়ে পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি খেয়ে ঘুমোতে যাচ্ছে।

কিন্তু 'দুর্ঘটনা-প্রবণ' লোকেদের কোনো শান্তি নেই। সকলে যখন টিভি দেখছে তখন হয় তারা ডাক্তারের কাছে পা ব্যান্ডেজ করতে ছুটছে, না হয় গলায় দড়ি বেঁধে তাতে ব্যান্ডেজ করা হাত ঝুলিয়ে চোখের জল ফেলছে, না হয় কপালের কাটা জায়গায় রক্ত বন্ধ করতে চুন-হলুদ লাগাচ্ছে আর ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে, না হয়—

থাক আর শুনে কী হবে। 'দুর্ঘটনা-প্রবণ' লোকেরা কীরকম হয় সে তোমরা অনেকেই জান, নিশ্চয়ই নিজেরাও দেখেছ দু'চার জন বাছাই-করা এরকম লোক। ভগবান বলে যদি কেউ থাকে, তার কারখানায় এদের আলাদা করে তৈরি করা হয়। কারখানার কারিগররা সারাদিন মানুষ তৈরি করে করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের চোখে ঝিমুনি, হাতের কাছে মালমশলাতেও টান পড়ছে, হাতুড়ি-বাটালি-ছেনি-সাঁড়াশি ধরবার জোর পায় না—তখন এইরকম দু'চারটে আধা-খ্যাঁচড়া মানুষ তৈরি করে কারখানার ছাপ্পা লাগিয়ে বলে, 'যা ব্যাটারা। নেহাৎ তৈরি করতে হলো বলে তোদের বানিয়ে ফেললুম, অনেক খুঁত রয়ে গেল। তাই তোদের কপালে অনেক দুঃখু আছে, সংসারে অনেক ধাক্কাটাক্কা খেতে হবে তোদের। আমাদের দোষ নেই। দিনের শেষে আর শরীরে দিচ্ছিল না।'

এই বলে এই লোকগুলোকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়ে ভগবানের কারখানার কারিগররা নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে টিভি দেখতে বসে।

আর ওইসব অবহেলায় আধা-খ্যাঁচড়া তৈরি লোকেরাই নিশ্চয়ই পৃথিবীতে 'দুর্ঘটনা-প্রবণ' হয়ে জন্মায়।

এই আমার সুমনা মাসিকেই দ্যাখো না। এমন দুর্ঘটনা-প্রবণ মহিলা আমাদের চেনাশোনার মধ্যে আর নেই।

সুমনা মাসি রোজ বাঙ্গুর থেকে বাঘা যতীনে একটা ইসকুলে পড়াতে যান। রোজই আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি, আজ মাসি আস্ত ফিরবেন তো! সপ্তাহে একটা অ্যাকসিডেন্ট তাঁর একেবারে বাঁধা। আজ মিনিবাসে উঠতে গিয়ে আছাড় খেলেন, থুতনি-টুতনি কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। ডাক্তারখানায় গিয়ে থুতনি সেলাই হলো, ধনুষ্টংকার যাতে না হয় তার জন্যে এ.টি অর্থাৎ অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া হলো, বাড়িতে এনে সেই সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথিক আর্নিকা টু হানড্রেড খাওয়ানো হলো, তার ওপরে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো।

ব্যস্, ক'দিন স্কুল বন্ধ। সুমনা মাসি বাড়িতে খাটে বন্দী, বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত যে, যে-ক'দিন শুয়ে থাকবেন সে-ক'দিন আর দুর্ঘটনা ঘটবে না।

পাগল! 'দুর্ঘটনা-প্রবণ' লোকেদের বিষয়ে এমন নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় আছে?

খাটে শুয়ে আছেন, এমন সময় পাড়ার কোনো ভাবী বাইচুং গলিতে বলে শূট করল, বল এসে সুমনা মাসির শোবার ঘরের জানলার কাচে লাগল, কাচের একটা বড়ো টুকরো তাঁর কানের পাশ দিয়ে মেঝেতে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

গায়ে লাগেনি, রক্ষে। কিন্তু এই যে লাগতে লাগতে বেঁচে যাওয়া, এও তো এক দুর্ঘটনা। এরকম দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে। শুয়ে আছেন খাটে, তাতে কী। হয়তো ছাদ থেকে চুনবালি প্লাস্টারের একটা চাপলা খসে পড়ল মাথার কাছ দিয়ে।

আর সবই হয় সুমনা মাসির বেলায়, বাড়ির আর কারও বেলায় নয়।

অনেকদিন ধরে ছাদ সারাই করা হয়নি, বৃষ্টিতে ছাদের শিকগুলোতে মরচে ধরেছে, নিচের প্লাস্টার ফুলে ফুলে উঠছে। পড়বে-পড়বে করছিল, কিন্তু পড়ল তখনই, যখন সুমনা মাসি এস্-বাসের দুর্ঘটনার ধাক্কায় ঘরে খাটে শুয়ে আছেন।

অর্থাৎ দুর্ঘটনাগুলোও তাক করে থাকে কখন তারা সুমনা মাসির ওপরে, বা তাঁর আশেপাশে ঘটবে।

এই তো, ভবেশ মেসো যে রোজ নৈহাটি যান ব্যাঙ্কের কাজে, কই তাঁর তো কিছু হয় না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে লোকেরা লাইনের ওপর বসে পড়ে ট্রেন বন্ধ করে বটে, কিন্তু সে সময় ভবেশ মেসো মুখে খবরেরকাগজ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ছেলে সত্যেশ যাদবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়, সে তো দিব্যি আস্ত হাত-পা নিয়ে বাড়ি ফেরে। মেয়ে সুচেতনা যায় সরোজিনী নাইডু কলেজে, সেও হইচই করতে করতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফেরে।

এ তিনজনকেই নিশ্চয়ই ভগবানের কারখানার কারিগররা সকাল-সকাল তৈরি করেছিল। মানে চা-জলখাবার খেয়ে টগবগে ফুর্তির মধ্যে এদের বানানো শেষ করে দিয়েছিল।

ফলে বাড়িতে সুমনা মাসির হেনস্থার অন্ত নেই। কাউক্কে তিনি কিছু বলতে পারেন না। ভবেশ মেসো যখন বাজার থেকে বুড়ো ঝিঙে, পোকা বেগুন আর পাথরের মতো বিচিওয়ালা পটল কিনে আনেন, সুমনা মাসি বলতে পারবেন না, 'তুমি বড্ড জ্বালাও।' ছেলে সত্যেশ যখন কফি-হাউসে আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, সুমনা মাসি মুখ খুলতে পারবেন না। মেয়ে সুচেতনা যখন পরীক্ষার মুখে সিনেমা পত্রিকা থেকে আর চোখই সরাতে চায় না, তখনও তাঁকে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে।

যদি বলেন, 'আর কত জ্বালাবি আমাকে তোরা', তখনই বাপ-ছেলে-মেয়ে কোরাস ধরে নামতা পড়ার মতো বলবে—

বাবা। আচ্ছা, তোমরা সবাই বলো তো এ বাড়িতে কে বেশি জ্বালায়?

ছেলে ও মেয়ে। কে? কে? জনগণ বলুন কে জ্বালায়।

বাবা। গত ২৪শে জুন, ১৯৯৩ কার পায়ের ওপর দিয়ে রিকশ চলে গিয়েছিল?

ছেলে ও মেয়ে। কার? কার?

বাবা। গত ৭ জানুয়ারি, ১৯৯৪ কাকে বাঘা যতীনের মোড়ে ষাঁড়ে তাড়া করেছিল?

ছেলে ও মেয়ে। কাকে? কাকে?

বাবা। গত ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৫ কে বেড়ালের ল্যাজে পা দিয়েছিল বলে বেড়াল তার বুড়ো আঙুল কামড়ে দিয়েছিল?

ছেলে ও মেয়ে। কে? কে?

বাবা। গত ৭ মার্চ, ১৯৯৭ কার হাত থেকে নিজের পায়ের ওপর শিলনোড়ার শিল পড়ে গিয়েছিল?

ছেলে ও মেয়ে। কার? কার?

সুমনা মাসি এই স্লোগানের আক্রমণে রেগেমেগে নিজের ঘরে গিয়ে জোরে দরজা বন্ধ করেন। কিন্তু দরজার খিলে হাত চেপে গিয়ে তাঁর ভয়ংকর লাগে, হাতে রক্ত জমে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে ছেলেমেয়ে, মেসো সব ছুটে আসে, এসে রেফ্রিজারেটর থেকে বরফ বার করে তাঁর হাতের চেটোতে ঘষতে থাকে।

এই সুমনা মাসির জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল এবার, যাকে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়াই বলা যায়।

আমার আর এক মাসি, সান্ত্বনা মাসি, প্রায় বিশ বছর হলো আমেরিকায় আছে। সে হঠাৎ চিঠি লিখে পাঠাল, 'দিদি, সারা জীবন বাঙ্গুর-বাঘা যতীন করেই কাটালে, পৃথিবীর কিছুই দেখলে না। আমরা প্লেনের টিকিট পাঠাচ্ছি, তুমি কিছুদিন এসে আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাও। আমরা যতটা পারি তোমাকে ঘুরিয়ে দেশটা দেখিয়ে দেব। কতদিন তোমাকে দেখি না, বড় দেখতে ইচ্ছে করে।'

চিঠি পেয়ে সুমনা মাসি অনেকক্ষণ ধরে চোখের জল ফেললেন। ছোটোবোনকে খুব ভালবাসতেন তিনি, তাঁর মনটা হু-হু করে উঠল। তিনি ভবেশ

সুমনা মাসি মেঝেতে পড়ে আছেন।

মেসোকে বললেন, 'আমি যাব সান্তর ওখানে, তোমরা ব্যবস্থা করো।'

ভবেশ মেসো বললেন, 'মাথা খারাপ! তুমি প্লেনে উঠলেই প্লেন প্রশান্ত মহাসাগরে ভেঙে পড়বে, তখন?'

সুমনা মাসি বললেন, 'পড়ুক।'

ছেলে সত্যেশ বলল, 'প্রশান্ত মহাসাগরে পড়লে হাঙরে তোমার পা কামড়াবে।'

সুমনা মাসি। কামড়াক।

সুচেতনা ফুট কাটল, 'তারপর যদি ওই হাঙরসুদ্ধ একটা তিমি তোমাকে গিলে নেয়?'

সুমনা মাসি বললেন, 'নিক।'

তারপর একটু চটে গিয়ে বললেন, 'এতসব কথার মানে কী? তোমাদের এক পয়সা খরচ নেই—আমার বোনই টিকিট পাঠাচ্ছে প্লেনের। সারা জীবন সংসারের জোয়াল ঘাড়ে বইলাম, আমার কি একটু ছুটি পাবার অধিকার নেই! যাও, মরি মরব, তবু আমি যাব। যাবার আগে লিখে দিয়ে যাব, আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। তাতে হবে তো?'

ভবেশ মেসো, সত্যেশ, সুচেতনা সকলেই বুঝল, ভীষণ বিপদ। তার ওপর খরচের খোঁটা দিচ্ছে মাসি, সেও গায়ে লাগছে। ফলে তিনজনকে রাজী হতেই হলো। ব্যাজার মুখে একদিন সুমনা মাসিকে সিঙ্গাপুর এয়ারওয়েজের প্লেনে তুলে দিয়ে এল তারা। পই পই করে বলে দিল, সিঙ্গাপুরে এক রাত হোটেলে কীভাবে থাকতে হবে, বিদেশে ইংরিজি বলতে হলে কখন কখন 'প্লিজ' বলতে হবে, চৌবাচ্চায় পানের পিক ফেলা চলবে না। একটা কাগজে বড়ো বড়ো করে ইংরিজিতে লিখে দিল, 'ইনি এই প্লেনে সিঙ্গাপুর থেকে সান ফ্রান্সিস্‌কো যাবেন। একা যাচ্ছেন, আগে কখনও বিদেশে যাননি, এঁকে সাহায্য করবেন।' ছেলে লিখে দিতে চেয়েছিল 'ইনি এক দুর্ঘটনা-প্রবণ মহিলা'—কিন্তু ভবেশ মেসো আপত্তি করলেন।

কিন্তু তিনজনেই ভয়ে কাঁটা হয়ে রইল। প্রায় ছাব্বিশ ঘণ্টা পরে যখন সান্ত্বনা মাসির ফোন এল যে দিদি নিরাপদে পৌঁছেছে তখন তিনজনেরই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

এবং তারপর থেকে চমৎকার সব খবর এসে পৌঁছোতে লাগল। সুমনা মাসি বাসে, প্লেনে সারা মার্কিনদেশ চষে বেড়াচ্ছেন। যত আত্মীয়স্বজন, ছেলের বন্ধু, মেয়ের বন্ধুর স্বামী, ভবেশবাবুর ব্যাঙ্কের এজেন্টের ভাগ্নে আর ভাগ্নে-বউ—এইরকম সব ছিল ওদেশে—প্রত্যেকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নায়াগ্রাতে গেলেন, কিন্তু জলস্রোতে পড়ে না গিয়ে দিব্যি মজা করে ঘুরে এলেন। ইয়েলোস্টোন পার্কে গেলেন, কিন্তু বল্গা হরিণ শিং উঁচিয়ে তাঁকে গুঁতোতে এল না। ডিজনিল্যান্ডে গিয়ে নানা রকম 'রাইডে' চড়লেন, কিন্তু কোথাও গাড়ি ভেঙে দুর্ঘটনায় পড়লেন না। ছেলেমেয়েকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় চিঠি লিখলেন—'জীবনে এত আনন্দ আর পাইনি রে।'

বাড়িতে এরাও খুশি। সত্যি, ভদ্রমহিলা নানা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট চোট-টোট নিয়ে সংসারের জন্যে এত বছর খেটেই গেছেন। যাক রিটায়ারমেন্টের মুখে যে নিশ্চিন্ত আনন্দে একটা মাস কাটিয়ে আসতে পারলেন, এ বড়ো ভালো হলো। যেদিন ফিরবেন, সেদিন এয়ারপোর্টে রাত সাড়ে দশটার সময় তিনজনেই সুমনা মাসিকে আনতে গেল। সে সুমনা মাসিকে যেন আর চেনাই যায় না। বয়স যেন বিশ বছর কমে গেছে, গায়ের রং ফরসা হয়েছে বেশ, চোখমুখ ঝকঝক করছে, ভবেশবাবুর নিজের পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো বউকে চিনতেই বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। সত্যেশ আর সুচেতনাও ভাবছিল, এ কী তাদের সেই পুরোনো মা, না অন্য কেউ। এ তো রীতিমতো স্মার্ট মহিলা, মুখে ইংরিজি 'ও ইয়া', 'এক্সকিউজ মি', 'ও খে!' এসব কী বেরোচ্ছে!

সেদিন আমেরিকার গল্প শুনতে শুনতে কারও ঘুম নেই। নানা জায়গার ছবি আর ফটো, অনেক টুকিটাকি উপহার এনেছেন, সেগুলোও দেখতে দেখতে রাত প্রায় শেষ হতে চলল। শেষে ভবেশবাবু ধমকে বললেন ছেলেমেয়েকে, 'যাও, এবার মাকে একটু বিশ্রাম দাও, ভদ্রমহিলার একটু ঘুম দরকার।' তারপর ছেলেমেয়ের সামনেই সুমনা মাসির কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'ব্রাভো ম্যাডাম, অভিনন্দন! এই দুর্ঘটনাহীন একটি মাস আমাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

ছেলে আর মেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুমোতে গেল যার যার ঘরে। সুমনা মাসি শাড়ি বদলাতে কলঘরে গেলেন। হঠাৎ দড়াম করে শব্দ আর 'উরে বাবারে' চিৎকার।

সকলে ছুটে এসে দেখে সুমনা মাসি কলঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন, উঠতে পারছেন না।

পা পিছলে পড়ে তাঁর কোমরের হাড় ভেঙে গেছে।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বুড়োবুড়ি

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এক বুড়ো এক বুড়ি। খুব গরীব ওরা। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করে। আর খাওয়া জোটে ভিক্ষে করে। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে কোনোরকমে বেঁচে আছে। তবে ভিক্ষে কি রোজ পাওয়া যায়! কোনোদিন হয়তো সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। আবার কোনোদিন হয়তো শরীর ভাল নয় বলে আর বেরুতেই ইচ্ছে করল না।

ফলে কোনোদিন হয়তো ওদের খাওয়া জোটে, কোনোদিন জোটে না। যে দিন খাওয়া জোটে সে দিন বুড়োবুড়ি খুব খুশি। গুনগুন করে গানও গায়। আর যে দিন জোটে না, সে দিন ওরা মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। নিজেদের কপালের কথা ভাবে।

তা একদিন ওরা ঘরে মুখ গোমড়া করে বসে আছে, এমন সময় এক পুতুলঅলা ওদের বাড়ির দরজায় এসে ডাক দিলো, ‘পুতুল নেবে গো, পুতুল? ছোট পুতুল, বড় পুতুল, ভালো ভালো পুতুল?’

বুড়ো বুড়ির দিকে তাকাল, ‘দেখ তো কে এলো?’

বুড়ি দরজা খুলে দেখল এক পুতুলঅলা। সাজগোজ করা পোশাক, মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁশি, কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তার মধ্যে সব পুতুল।

বুড়োও তখন এগিয়ে এসেছে, পুতুলঅলাকে দেখেই বলল, ‘না ভাই, পুতুল দিয়ে কি করব? আমাদের দরকার নেই।’

পুতুলঅলা নাছোড়বান্দা, ‘নাও না গো, সারাদিন আজ আমি একটাও বিক্রি করতে পারিনি। নাও না একটা।’

‘মহাজ্বালা!’ বুড়ি বলল, ‘কি করে নেব। আমাদের কাছে তো একটাও পয়সা নেই। তুমি বাপু অন্য কোথাও যাও।’

পুতুলঅলা বলল, ‘বাকিতেই না হয় একটা নাও। পয়সা না হয় কাল দেবে। সারাদিন আজ আমার একটাও বিক্রি হয়নি। সবাই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।’

বুড়ি বলল, ‘সারাদিন তোমার পুতুল বিক্রি হয়নি তো আমরা কি করব? তা ছাড়া বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে এক কথা ছিল, যাও যাও।’

পুতুলঅলা ছাড়বার পাত্র নয়, একটা পুতুল বার করে দেখাল, ‘দেখ দেখ, কি সুন্দর।’

বুড়ো পুতুলটা হাতে তুলে নিল, নেড়ে-চেড়ে দেখল, সত্যিই সুন্দর। 'কিন্তু নিতে পারি একটা শর্তে।'

পুতুলঅলা বলল, 'বেশ, বলুন কি শর্ত?'

বুড়ো বলল, 'পয়সা তোমায় কাল দিতে পারব না। পয়সা দেব পরশু। যদি রাজী থাক তো বল।'

'বেশ তাই দেবেন। পরশুই দেবেন।' বলতে বলতে পুতুলঅলা একটা ভালো দেখে পুতুল বার করল ঝুলি থেকে। 'দেখুন এটা পছন্দ হয়, নাকি—'

বাহ্ বেশ দেখতে তো পুতুলটা। বুড়ি পুতুলটাকে হাতে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ভালো না?'

বুড়ো বলল, 'দেখতে তো ভালোই, তবে এসব আমাদের ঘরে পোষাবে না। যাদের খাওয়া-দাওয়ার অভাব নেই, তারাই এ রকম পুতুল নিয়ে খেলা করতে পারে। আমাদের মতো গরীব ঘরে এ রকম পুতুলের দাম কি বলো।'

পুতুলঅলার মুখে অল্প অল্প হাসি। 'এ পুতুল আপনাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। রাখুন না, টের পাবেন।'

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, 'ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে, কি রকম? কি বলতে চাও তুমি?'

পুতুলঅলা আবার হাসল, 'আমি আবার কি বলব। সময়েই সব দেখতে পাবেন। আমি এখন যাই। কাল একবার আসব, যদি পয়সা যোগাড় হয়, তাহলে কালই দিয়ে দেবেন। আর না হলে পরশু।'

বলেই পুতুলঅলা বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

পুতুলঅলা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ গো বুড়ি, পুতুল তো রাখলে, এখন ওকে কোথায় রাখবে?'

বুড়ি বলল, 'ঘরের এক কোণে ফেলে রাখব। কাল যখন পুতুলঅলা পয়সা নিতে আসবে, তখন আবার ওকে ফিরিয়ে দেব।'

'ফিরিয়ে দেবে?'

'তো কি করব। পয়সা কোথায় পাব, যে ওকে দেব। অত করে বলল বলেই না রাখলাম।'

'ঠিক আছে, সেই ভালো।'

পুতুলটা ওরা ঘরের একপাশে রেখে দিল।

পরের দিন।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল বুড়ির। বুড়ো তখনও ঘুমুচ্ছে। ঘুমোচ্ছে, ঘুমাক, বুড়ি আর ডাকল না ওকে।

নিজেই উঠে গিয়ে দাঁত-মুখ ধুলো। ঠাকুর প্রণাম করল। তারপর হঠাৎ পুতুলের দিকে তাকিয়েই অবাক, 'ওমা কাল তো আমরা একটা পুতুল কিনেছিলাম। এ যে দুটো পুতুল। ঠিক একই রকম দেখতে।'

বুড়ির বিস্ময় আর কাটে না। 'দুটো হলো কি করে? তবে কি—'

শেষমেশ বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'ও বুড়ো, ওঠো ওঠো...'

বুড়ো পাশ ফিরে শুল, 'আহ্ কি বকবক শুরু করলে?'

'আহ্, ওঠো না। কাল আমরা একটা পুতুল কিনেছিলাম না। হ্যাঁ গো? দেখ না।'

একটু ঘাড় তুলে দেখবার চেষ্টা করে বুড়ো, 'তাই তো, দুটো হলো কি করে?'

বুড়ো এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। তারপর পুতুল দুটোর কাছে এগিয়ে আসে। হাতে তুলে নেয় পুতুল দুটো, নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বুড়োই বলল, 'এ পুতুল বিক্রি না করে ঘরে রেখে দেওয়াই ভালো। কাল হয়তো দেখব, দুটো পুতুল থেকে চারটে পুতুল হয়ে গেছে।'

বুড়ির চোখ খুশিতে ভরে উঠল, 'কি মজা, কি মজা, পরশু হয়তো দেখব, চারটে থেকে আটটা।'

বুড়ো বলল, 'তারপরের দিন ষোলটা।'

বুড়ি বলল, 'তারপরের দিন আরো কত? আমি আর গুনতে পারছি না গো। বলো না, অ্যাঁ?'

বুড়োও খুশিতে আটখানা, 'এমনি ভাবে বাড়তে বাড়তে যখন অনেক পুতুল হয়ে যাবে, তখন আমরা দু'জনে মিলে পুতুল বিক্রি করতে বেরুব, পুতুল চাই গো পুতুল? ছোট পুতুল, বড় পুতুল, ভালো ভালো, হরেক রকম পুতুল?'

'তখন পুতুল বেচে আমাদের অনেক টাকা হবে। তাই না?'

'আমাদের আর খাওয়া-দাওয়ার অভাব থাকবে না। হুররে কি মজা।'

'খাবো-দাবো আর দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব। কি মজা কি মজা!'

বুড়োবুড়ির আর আনন্দ ধরে না।

কিন্তু।

বুড়ি হঠাৎ বলল, 'তা না হয় হলো, এদিকে পুতুলঅলা তো আজই পয়সা নিতে আসবে, কি করে ওকে সামলাব!'

বুড়ো বলল, 'সামলাবার কি আছে? একটু বুদ্ধি খরচ করলেই হয়ে যায়।'

বুড়ি তাকিয়ে থাকে।

'কি বুঝলে না? পুতুলঅলাকে পয়সা দিচ্ছি ভারি। পয়সা না ছাই।'

'পয়সা দেবে না?'

'কি ভাবে দেব। বলে দেব, ভাঙা পুতুল দিয়ে গেছ, তার আবার দাম হয় নাকি?'

'ভাঙা পুতুল।' বুড়ি কেমন অবাক চোখে তাকায়। 'মিথ্যে বলবে?'

'কেন মিথ্যে কেন? ভাঙতে পারে না বুঝি? দাও, একটা পুতুল দাও, আমি ভেঙে দেখাই।'

বুড়ি বলল, 'সেই ভালো। পুতুলঅলা এলে ওকে একটা ভাঙা পুতুলই দেখাতে হবে।'

'কি রকম বুদ্ধি বার করেছি বলো।'

পুতুল দুটো আবার ওরা ঘরের একপাশে যত্ন করে রেখে দিল।

তারপর সেই দিনই পুতুলঅলা এলো পয়সা চাইতে। বাড়ির দরজায় এসে ডাক দিলো, 'কৈ গো মাঠান, পুতুলের দাম দেবেন বলেছিলেন, দাম দিন।'

বুড়ি চোখ ইশারা করল বুড়োকে, 'শুনছ পুতুলঅলা এসেছে।'

বুড়ো দরজা খুলে বেরুল। দেখল, সেই পুতুলঅলা, মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁশি, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। 'এই যে পুতুলঅলা, কি পুতুল আমাদের দিয়ে গেলে, এ যে এক্কেবারে মেকি জিনিস।'

'মেকি জিনিস!' পুতুলঅলার চোখে অল্প অল্প হাসি।

'মেকি নয়তো কি? ও বুড়ি, পুতুলটা

এনে একবার দেখাও তো। তোমার পুতুল তুমি নিয়ে যাও।'

'কেন, কি হয়েছে বলুন না?'

'ভাঙা পুতুল নিয়ে আমরা কি করব। এ তুমি নিয়েই যাও।'

বুড়ি একটা ভাঙা পুতুল হাতে নিয়ে এসে পুতুলঅলাকে দেখাল, একেবারে দু' টুকরো হয়ে আছে পুতুলটা।

পুতুলঅলা বুড়োবুড়িকে একবার ভালো করে দেখে নিল, তারপর ভাঙা পুতুলটা ঝুলিতে ভরে নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতেই হাঁটা ধরল রাস্তায়।

হুররে, কি মজা, বুড়োবুড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ভাবল, বিনি পয়সায় হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেল ওরা।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বুড়ির। ঘুম ভাঙতেই পুতুলটার কাছে এগিয়ে বুড়ি দেখল, হায় হায় পুতুলটা ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি, 'ও বুড়ো, দেখ, দেখ। কপাল পুড়েছে আমাদের।'

বুড়ো বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে বসল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'আজ তো চারটে পুতুল হওয়ার কথা, তাই না? এ তো দেখছি একটাই পুতুল গো, তাও আবার ভাঙা।'

'দেখি দেখি!' বুড়োও অবাক, 'হায় হায়, কি সর্বনাশ হলো আমাদের!'

বুড়োবুড়ি মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বুড়ি বলল, 'আমরা খুব বেশি লোভ করেছিলাম গো, তাই বুঝি এরকম হলো।'

বুড়ো ছলছল চোখে তাকাল, 'পুতুলঅলাকে না ঠকানোই উচিত ছিল আমাদের। কাউকে ঠকালে যে নিজেই ঠকতে হয় আমরা তা শিখলাম।'

বুড়োবুড়ি তারপর মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ইষ্টি-বিষ্টি-মিষ্টি

পঙ্কজ সাহা

ইষ্টিকুটুম বিষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম শোনো
পানের বরজ চুনের বাটি ওল্টালো ঘরকুনো

ইষ্টিকুটুম কোথায় যাস
বিষ্টিকুটুম আষাঢ় মাস
মিষ্টিকুটুম ছাই কি পাঁশ

ইষ্টিকুটুম বিষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম ডুমডুম
ইস্টিশানে লজ্জাবতী কপালজোড়া কুমকুম

মিষ্টিকুটুম হাসে
শাঁওন-ভাদর মাসে
বিষ্টিকুটুম আসে
কার সে ঘরে আসে
ইষ্টিকুটুম যারে
কাজলী নদীর পারে।

হায়, শিকারি!

ইন্দ্রজিৎ গুহ

মা হয়েছেন গত
গুরুদশার নিয়মকানুন
মানছি না আর ততো।
বলেন যা সব গুরুজনে
রাখছি না তা কিছুই মনে
ওসব মানে কে আজ!
খেয়াল-খুশি বজায় রেখে
করছি নিজের কাজ।

বিশ্ব সাধন ছোটু নটু
পাখ-শিকারে সবাই পটু,
সাতসকালে সদলবলে
হৃদয়পুরে যাই,
ভেড়ির জলে পাখপাখালি
রুই-কাতলের ঘাই।

সূয্যি ওঠে পুব আকাশে
দুলছে ডিঙি ভোর বাতাসে,
গর্জে ওঠা নটুর টোটা
বিঁধলো আমার গায়,
জেলে মাঝি আঁতকে উঠে
করলো যে 'হায় হায়'!

লক্ষ্য ছিল বালিহাঁসে
ফস্‌কে গিয়ে লাগল না সে
লাগল আমার পিঠে,
ফিন্‌কি দিয়ে রক্তধারা
পড়লো ছিটে ছিটে।

রুদ্রপ্রয়াগ ঠাকুরাণি
করবেটকে গুরু মানি,
দোনলাটা ঝুলিয়ে কাঁধে
শিকার খেলার সাধ,
আসল কথা হয়নি বোঝা
এ যে মরণফাঁদ!

টোটার ঘায়ে ঘায়েল হয়ে
মৃত্যুস্রোতে যাই যে বয়ে,
বাঁচার তাগিদ যুদ্ধ করে
তাই তো বেঁচে থাকি,
জখম পাখির আর্ত সুরে
মাকে আমার ডাকি।।

ছবিঃ সুফি

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

অস্ত্র-জলার মৃত্যু-ফাঁদ

সঞ্জীব সিংহ

বিক্রম মুখার্জি

স্নেহাস্পদেষু,

তুমি আমার ছেলের সঙ্গে পড়েছো। তাই 'তুমি' সম্বোধন করছি। কিছু মনে করো না।

আমার ছেলে অমলকে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। তোমাদের ব্যাচে সেকেন্ড হয়েছিল। পরে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে। ভারতীয় সামরিক মন্ত্রকের ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে ওকে থাকতে হতো বালুসারিতে। এসবই তুমি জানো। এমনকী ওর মৃত্যুসংবাদও নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। সব কাগজেই খবরটা বেরিয়েছিল। কিন্তু যা বেরোয়নি তেমন কিছু কথা আমি তোমাকে সাক্ষাতে বলতে চাই।

ওর মা আগেই চলে গেছেন। প্রিয়তম সন্তানও গেল ভারি অদ্ভুতভাবে। আমিও আর বেশিদিন নেই। যাবার আগে তোমার বন্ধুর একটি ডায়েরি তোমাকে দিয়ে যেতে

চাই। তুমি রহস্য ভালবাস। হয়তো আগ্রহ পাবে।

এই বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছা মেটাতে একবারটি কি একটু কষ্ট করে এখানে আসতে পারবে? ইতি—

ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাম : একচক্রা

জেলা : বীরভূম

শমির চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে বিক্রমদা আরেকবার পড়লেন। চাপা দিয়ে রাখলেন সামনের সেন্টার টেবিলে। নিজের মনে বললেন, 'যেতে তো একবার হবেই রে শমি। বন্ধুর বাবা বলে নয়, একজন বৃদ্ধ এভাবে ডাকলে কি না গিয়ে থাকা যায়?'

'অমল গঙ্গোপাধ্যায়।' শমি বলল, 'খুব চেনা চেনা লাগছে নামটা। আমাদের বাড়িতে কি কখনও এসেছিলেন?'

বিক্রমদা বললেন, 'বার তিনেক কী চারেক, এসেছিল বোধহয়। কলেজে পড়ার সময় একবার এসে দিন তিনেক ছিল। তোর মনে থাকার কথা নয়। তখন তুই ছোট। সেবার আমাকে পার্ট টু-তে খুবই হেল্প করেছিল। কাগজে খবরটা পড়ার পর থেকেই এত খারাপ লাগছে।'

উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালেন বিক্রমদা। বিষণ্ণ সকাল। ভোর থেকেই আকাশে মেঘ। মাঝেমধ্যে একটু বৃষ্টি হচ্ছে। থামছে। হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে।

খবরটা বেরিয়েছিল দিন সাতেক আগে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তরুণ বিজ্ঞানী। বালুসারিতে ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র থেকে মাইল তিনেক দূরে ডুমুরদহ জলায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, এইসময় একটি স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তাঁর ওপর ভেঙে পড়ে। সামরিক মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত চলছে।

পুরনো কাগজটা টেনে বের করেছে শমি। একঝলক চোখ বুলিয়ে বলল, 'এভাবে কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গার ওপর ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়তে পারে?'

জানলার ধার থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন বিক্রমদা, 'অবশ্যই পারে। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে আঘাত হানার জন্যই ছোট ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হয়। কিন্তু কাউকে মারার জন্য এতটা কষ্ট কেউ করবে? এটাই একটু অদ্ভুত লাগছে।'

বিক্রমদা থামলেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'সম্ভাবনা আরও একটা রয়েছে। দুর্ঘটনার। হয়তো কারও ভুল থেকে...। যদিও এধরনের গাফিলতিকে ক্ষমা করা যায় না। আসলে...' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ছোট্ট করে। মুচকি হেসে বললেন, 'এটা ছাড়ার পর থেকে চিন্তাভাবনার স্পিড কি একটু কমে গেছে?'

তেমন কোনও লক্ষণ অবশ্য শমি এখনও পর্যন্ত দেখতে পায়নি। মাস ছয়েক হলো সিগারেট একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন বিক্রমদা। এখন শুধু পকেটে একটা প্যাকেট থাকে। বিক্রমদা বলেন,

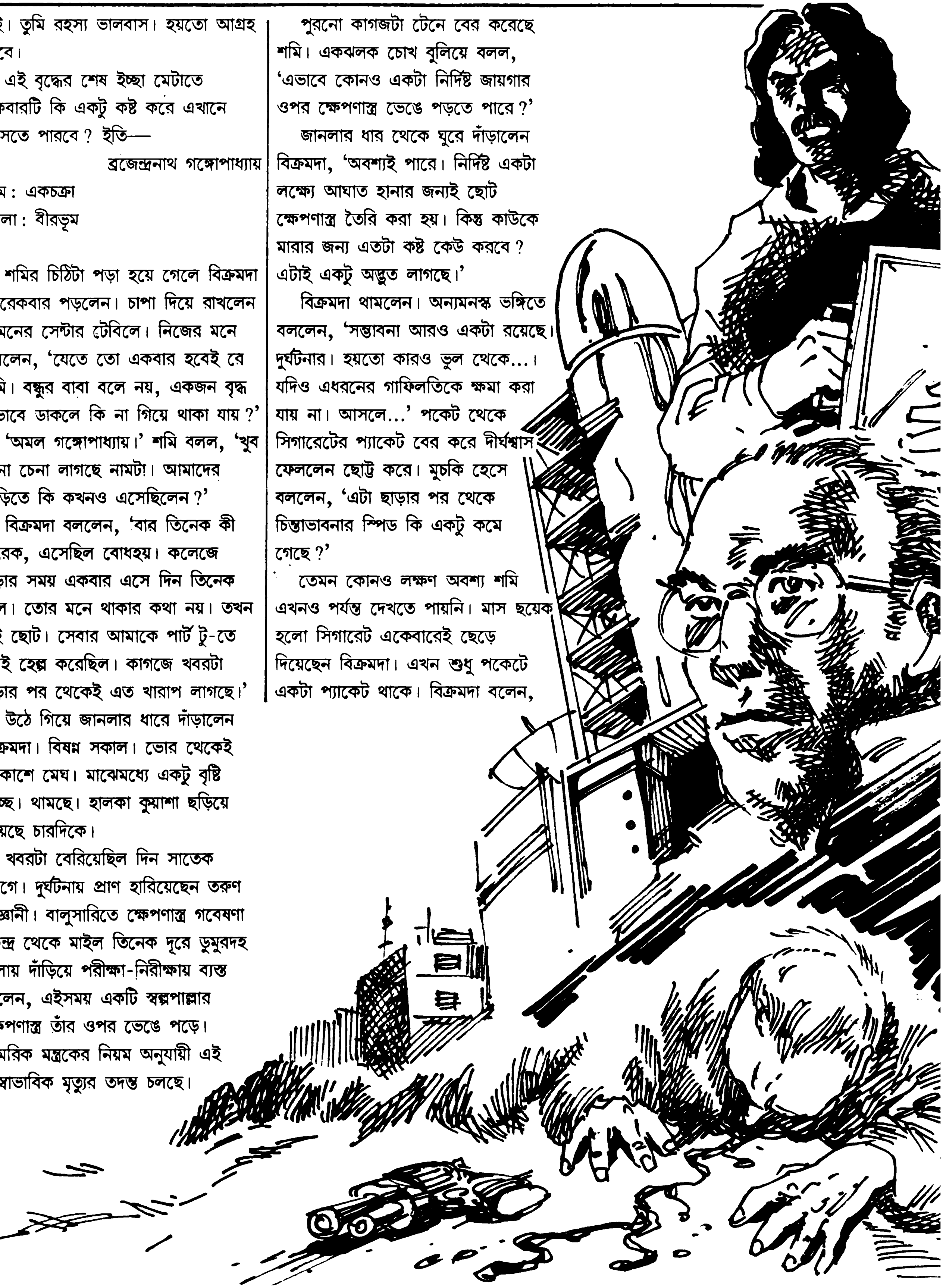

'হাজার হোক এতদিনের সঙ্গী, দুম করে পরিত্যাগ করাটা ঠিক নয়।' তবে চিন্তাভাবনার স্পিড কমে যাওয়ার কথাটা যে নেহাতই ইয়ার্কি করে বলা, তা শমি জানে। সিগারেট ছাড়ার পর কি বিক্রমদা প্রোফেসর পালের পাসওয়ার্ডের মতন জটিল রহস্য সমাধান করেননি?

বিক্রমদা সোফায় বসে শমির হাত থেকে সবে কাগজটা নিয়েছেন, এমন সময় ডোরবেল বাজল।

দরজা খুলতেই বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে ঘরে ঢুকে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি। পুরনো দিনের বড় কাঠের ছাতা। মাথার সব চুল সাদা হলেও এখনও বেশ শক্তসমর্থ রয়েছেন।

উঠে দাঁড়ালেন বিক্রমদা। খুব একটা অবাক হননি এভাবেই বললেন, 'কাল অনেক রাতে পৌঁছেছেন বোধহয়?'

শমির এনে দেওয়া শুকনো তোয়ালেতে মুখ-মাথা মুছতে মুছতে বৃদ্ধ হাসলেন, 'তুমি বোধ-করি আন্দাজ করেছিলে আমি আসব।'

বিক্রমদাও হাসলেন, চিঠিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'ঠিকানাটা বার দুয়েক কেটে লিখেছেন দেখে মনে হয়েছিল, চিঠিটা ফেলার আগে দু'বার ভেবেছেন—আদৌ ফেলবেন কিনা। ভেতরের চিঠিটাও সম্ভবত লেখার পর দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে। তারপর আবার কী ভেবে তুলে নিয়ে পোস্ট করেছেন। এসবের তো একটাই অর্থ, আপনি নিজে আসতে চেয়েছিলেন।'

ব্রজেন্দ্রনাথ এবার যখন হাসলেন, শমি খেয়াল করল ভদ্রলোকের সবকটি দাঁত বাঁধানো। বিষণ্ণ হেসে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, 'মোটামুটি ঠিকই ধরেছ। মানুষের সব আচরণ সবসময় লজিক মেনে চলে না। তবে কিছুদূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যায় অবশ্যই।' ভদ্রলোক কথা বলেন থেমে থেমে। অন্যদিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হবে অন্যকিছু ভাবতে ভাবতে কথা বলছেন।

বিক্রমদা চুপ করে রইলেন। বলে চললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সত্যি কথা বলতে কী, চিঠি ঠিক সময় পৌঁছবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ ছিল। তারপর ধরো দরকারটা আমার।'

বাধা দিলেন বিক্রমদা, 'না, না, কাকাবাবু। আপনি ডাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। প্রয়োজনে মানুষকে যতটা পারা যায় সাহায্য করব বলেই তো...।'

'আই নো ইট, আই নো ইট।' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, 'তবুও...। পার্ট টু পরীক্ষার আগে অমল তোমার এখানে এসে ছিল না? ও কি এঘরেই থাকত?'

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন। ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে। কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে রেখে ব্রজেন্দ্রনাথ যখন মাথা তুললেন, শমি দেখল বৃদ্ধর চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। এবার তাঁর গলা খুবই কঠোর শোনাল। কেটে কেটে বললেন, 'ছাত্রাবস্থায় আমারও স্বপ্ন ছিল বৈজ্ঞানিক হব। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রর আদর্শে নিজেকে অনুপ্রাণিত করেছিলাম। কিন্তু হয়নি। অল্পবয়সে বাবা মারা গেলেন। অতবড় সংসারের জোয়াল কাঁধে এসে পড়ল। হয়ে গেলাম টুলো পণ্ডিত! তবে ভেবো না এটা আমার খেদোক্তি। যা হয়নি তার জন্য খেদ করা আমার স্বভাবে নেই। নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, আমি পারিনি তো কী হয়েছে, আমার ছাত্ররা নিশ্চয়ই পারবে। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন বোধহয়...। যদিও এখন সন্দেহ হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই।' থামলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। চায়ে চুমুক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঈশ্বর থাকলে অমলকে নিশ্চয়ই এভাবে খুন হতে হতো না। অমল আমার স্বপ্ন সত্যি করেছিল। তা হয়তো এভাবে বিনষ্ট হতো না।'

বিক্রমদা বললেন, 'অমল যে খুন হয়েছে সে ব্যাপারে আপনি তাহলে নিশ্চিত?'

এতক্ষণে সরাসরি বিক্রমদার দিকে তাকালেন ব্রজেন্দ্রনাথ। জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চিত। প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়েই আমি তোমার কাছে এসেছি। অমল মারা যাওয়ার পর চার দিন দেরি করার কারণ তো এটাই। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

'ওটা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'রিপোর্টে কী বলছে?'

'ইট্স এ ক্লিয়ার কেস অফ পয়জনিং।'

'পয়জনিং!'

যে বিক্রমদা চট করে বিস্ময় প্রকাশ করেন না, সেই বিক্রমদার ভুরুও কপালে উঠে যেতে দেখল শমি।

ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, বিষক্রিয়া। কী বিষ তাও জানা গেছে। আর্সেনিক।'

বিক্রমদা বললেন, 'কিন্তু তাহলে ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়ার ঘটনাটা?'

'ওটা আরেকটা রহস্য। এটা ঠিকই যে বিষক্রিয়া না হলেও হয়তো অমল মারা যেত। যেখানে দাঁড়িয়ে ওর মেজারমেন্ট নেওয়ার কথা, সেখান থেকে ঠিক তিন কিলোমিটার দূরে ওই ক্ষেপণাস্ত্র পড়ার কথা। তিন কিলোমিটার আগেই কেন ভেঙে পড়বে সেটা?' ব্রজেন্দ্রনাথ থেমে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিলেন। বললেন, 'ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়ার অন্তত আধঘণ্টা আগেই ওর মৃত্যু হয়েছিল। এবং সেটা বিষক্রিয়ায়।'

বিক্রমদা বললেন, 'অর্থাৎ অপরাধী কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি।'

'এগজ্যাক্টলি!' ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, 'অপরাধী এমনও ভেবে থাকতে পারে যে ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়ার ফলে অমলের মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলেই চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পোস্ট-মর্টেমের দাবি জানাই।'

বিক্রমদা বললেন, 'পোস্ট-মর্টেম হতোই। ইন এনি কেস, ইটস অ্যান

আনন্যাচারাল ডেথ।' বিক্রমদা একটু থেমে সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনি কি এমন কোনও আশঙ্কা করেছিলেন? আই মিন, অমলের দিক থেকে কোনও ইঙ্গিত?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ, 'ছিল। একটা ইঙ্গিত ছিল। মৃত্যুর আগের দিন রাতেই অমলের ফোন পেয়েছিলাম।'

'কী বলেছিল ও?'

'লাইনটা খুবই ডিসটার্ব করছিল। তবু তার মধ্যেই খুব দূর থেকে যেন ও বলল, বাবা, এখানে আর ভাল লাগছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে...। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন? কী হয়েছে? অমল বলেছিল, খুব নোংরা হয়ে গেছে চারদিক। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। ওটাই ছিল ওর শেষ কথা। তারপর লাইন কেটে যায়।'

বিক্রমদা উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার সামনে। বাইরে বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, 'রহস্যের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অমলের খুব কাছেই পড়েছিল চৈতন্যমঙ্গল। আমাদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত, অতীব প্রাচীন পুঁথি।'

'পুঁথি?' ঘুরে দাঁড়ালেন বিক্রমদা।

'হ্যাঁ।' অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাল ব্রজেন্দ্রনাথের মুখ। বললেন, 'তুমি কি হাড়াই পণ্ডিতের নাম শুনেছো? লতায়-পাতায় অনেক দূর বিস্তৃত আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। শুধু এটুকু জেনে রাখ, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল। সেই সময় বীরভূমের একচক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত আর তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ ভক্তিবাদী বৈষ্ণবীয় চিন্তা প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। সেই আমলের একটি পুঁথি এখনও রক্ষিত আছে আমাদের কাছে।'

'কিন্তু সেটা অমলের কাছে গেল কী করে?'

'অমলই নিজের কাছে নিয়ে রেখেছিল। গ্রামের বাড়িতে ওই পুঁথি দু'বার চুরির চেষ্টা হওয়ার পর ও নিজের কাছে নিয়ে যায়। এ নিয়ে বাড়িতে তুমুল অশান্তি হয়েছিল।'

'শরিকদের আপত্তি?'

বিক্রমদার প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ, 'শরিক বলতে তেমন আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আপত্তি তুলেছিল আমার দ্বিতীয় পুত্র। অমলের যমজ ভাই বিমল।'

আবার ভুরু কুঁচকে গেল বিক্রমদার, 'অমলের যমজ ভাই ছিল? এটা জানতাম না তো। অমল কখনও বলেনি।'

ব্রজেন্দ্রনাথ সামান্য হাসলেন, 'ছিল' নয়, এখনও আছে। তবে কোথায় আছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।'

বিক্রমদাকে জিজ্ঞেস করতে হলো না, চোখের প্রশ্নচিহ্ন দেখে অনুমান করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। মাথা নামিয়ে বললেন, 'ওই ছেলের পরিচয় দিতে মন চায় না। মাঝেমধ্যে টাকার দরকার হলে আসে। তারপর আবার দেখা পাওয়া যায় না পাঁচ-ছয় মাস। শুনেছি বেশ কয়েকবার জেলও খেটেছে। টাকার জন্য অমলকেও জ্বালাতন করত। এখনকার বাজারে ওই প্রাচীন পুঁথির দাম যে আকাশছোঁয়া, সেটা জানার পর থেকেই ওর লোভ আরও বেড়ে গিয়েছিল।'

বাইরের বৃষ্টি একটু ধরেছে। হালকা রোদের রেখা এসে পড়েছে জানলার কাচে।

বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'অমলের ডায়েরিটা কি এখন আছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, এই যে।' ঝোলা থেকে একটি হালকা বাদামী চামড়ার জ্যাকেটে মোড়া মাঝারি সাইজের ডায়েরি বের করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

'এটা আমি রাখছি।' বিক্রমদা পাশের টেবিলে রাখলেন ডায়েরিটা।

উঠে এসে বিক্রমদার হাত ধরলেন ব্রজেন্দ্রনাথ, 'তাহলে তোমার সাহায্য পাচ্ছি?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বাইরের রোদ এসে যেন পড়ল ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল বৃদ্ধর। বললেন, 'তোমার আত্মবিশ্বাস দেখে আমার বুক ভরে গেল। সাবাস ক্যাপ্টেন। তোমার ওপর ভরসা করা যায়।'

॥ ২ ॥

সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে বালুসারি হাওড়া থেকে ঘণ্টা ছয়েকের পথ। ছোট জায়গা। গঞ্জমতন। আগে অবশ্য এটুকুও ছিল না। ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র হওয়ার পর তৈরি হয়েছে দু'-একটা চায়ের দোকান। মণিহারি টুকিটাকির দোকান গজিয়ে উঠেছে। স্টেশনের কাছে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। ওখানে একটি বাসস্ট্যান্ডও রয়েছে। লোকাল বাস। মাত্র দুখানা! একটা এলে আরেকটা ছাড়ে। হাটের দিনগুলোতেই বেশি ভিড়। অন্যান্য দিন লোক হলে তবে ছাড়ে!

লাল মোরাম বিছানো স্টেশানটি কিন্তু বেশ ছিমছাম। কাঠের বেঞ্চে সবুজ রঙ হয়েছে সম্প্রতি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা কাঠচাঁপা, কৃষ্ণচূড়া গাছ। সমুদ্র খুব দূরে নয় বলেই সবসময় একধরনের এলোমেলো হাওয়া বইছে।

বিক্রমদা ট্রেনে আসতে আসতেই বলে রেখেছিলেন, 'দেড় কিলোমিটার রাস্তা হেঁটেই মেরে দেব, বুঝলি, ওই বাসে কিন্তু ওঠা নেই।'

হাড়-পাঁজর বের করা বাসের চেহারা দেখেই হাসি পেল শমির। এই বাস যে চলে, সেটাই তো যথেষ্ট!

'বাসটা কতদূর যায়?' অনেকক্ষণ ধরেই জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল শমি, শেষ পর্যন্ত করেই ফেলল।

বিক্রমদা বললেন, 'একেবারে সমুদ্রতীর পর্যন্ত। জায়গাটার নাম বোধহয় বালিয়াচক। শুনেছি ওখানে একটা জেলেদের গ্রাম রয়েছে।'

আসার পথেই বালুসারি সম্পর্কে অনেককিছু জেনে গেছে শমি। ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা ও পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে জায়গাটাকে বেছে নেওয়ার কারণ

শমিদের দেখতে পেয়ে হইহই করে উঠলেন

একটাই—বিরাট জলাভূমি। এমনিতে নাম ডুমুরদহ হলে হবে কী, লোকের মুখে মুখে নাম হয়ে গেছে অস্ত্র-জলা। লম্বায়-চওড়ায় প্রায় পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। গোটা এলাকাটা সংরক্ষিত। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। জলা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেও আশেপাশে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও লোকালয় থাকা চলবে না। এটাই নিয়ম।

গবেষণা কেন্দ্রের লাগোয়া বিজ্ঞানীদের কোয়ার্টার। একটি অতিথি-আবাস। বৈধ অনুমতিপত্র থাকলে গবেষণা কেন্দ্রের কাজ ঘুরে দেখতেও কোনও বাধা নেই।

গেটের বাইরে রয়েছে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান। চালান এক বয়স্কা মহিলা। অনেক দিন আগে ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো ভেঙে পড়ে এঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন মেজর পারেখ। দূর থেকে শমিদের দেখতে পেয়ে হইহই করে উঠলেন। প্রায় ছুটে গিয়ে প্রথমে জড়িয়ে ধরলেন বিক্রমদাকে। তারপর বুকে টেনে নিলেন শমিকে।

বছর পাঁচেক আগে শিলিগুড়িতে কম্যান্ডো ট্রেনিং শিবিরে বিক্রমদা যখন ট্রেনার ছিলেন তখন থেকেই মেজর পারেখের সঙ্গে আলাপ। একদিক থেকে মেজর পারেখ বিক্রমদার ছাত্র। আবার দারুণ বন্ধুও। আগের দিন ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর বিক্রমদা যখন খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছিলেন যে মেজর পারেখ এখানকার সিকিউরিটির চার্জে রয়েছেন, তখনই বলেছিলেন, 'যাক্‌গে, ঝামেলা অনেক কমে গেল।' একসময় আর্মিতে ক্যাপ্টেন থাকার সূত্রে কিছু বাড়তি সুবিধে নিশ্চয়ই পেতেন বিক্রমদা। কিন্তু চেনা লোক বেরিয়ে যাওয়াটা অবশ্যই আরও বাড়তি পাওনা।

মেজর পারেখ আগের থেকে একটু মোটা হয়েছেন। আগে গোঁপ ছিল না। এখন গোঁপ রাখছেন। চুলের ছাঁট অবশ্য একইরকম। দুজনকে টেনে নিয়ে গেলেন নিজের কোয়ার্টারে। অতিথি-আবাসে থাকতে চেয়েছিলেন বিক্রমদা। শুনেই এককথায় উড়িয়ে দিলেন মেজর পারেখ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আর ইউ ম্যাড, ইয়ার ইতনে দিনকে বাদ আয়ে হো, মেরে পাশ রহোগে।'

এরপর আর কথা চলে না। মেজর পারেখের কোয়ার্টারটি বিশাল। স্ত্রী-পুত্র থাকে দিল্লিতে। ওখানে শ্রীমতী পারেখ চাকরি করেন। ছেলে স্কুলে পড়ে। এককথায় নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন পারেখ, 'নো লাইফ, ইয়ার।'

চান-টান সেরে ফ্রেশ হওয়ার পর বিক্রমদার অনারে লাঞ্চ চলে এল ক্যান্টিন থেকে। খেতে খেতে পারেখ হিন্দিতে বললেন, 'অন্যান্য দিন ক্যান্টিনেই গিয়ে খেয়ে আসি। একা-একা খেতে ভাল লাগে না।'

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পুরনো দিনের গল্প হতে লাগল। যে জন্য এখানে আসা, সেই কারণটা দিব্যি ভুলে যেতেই বসেছিল শমি।

প্রসঙ্গটা তুললেন বিক্রমদা, 'অমলকে চিনতে? আলাপ-পরিচয় ছিল?'

পারেখ কাঁধ ঝাঁকালেন, 'নট দ্যাট এক্সটেন্ট। ওই এক জায়গায় থাকতে থাকতে যতটা মুখচেনা হয়ে যায়। দেখা হলে 'হাই-হ্যালো'। বড়জোর—'ইটস টু হট অর কোল্ড' জাতীয় কথাবার্তা। তবে গাঙ্গুলি খুবই ইনট্রোভার্ট ছিল। হাউ ডু ইউ নো হিম?'

বিক্রমদার কাছে একসঙ্গে কলেজে পড়ার গল্প শুনে জিভ দিয়ে দু'বার ছিক-ছিক শব্দ করে দুঃখপ্রকাশ করলেন পারেখ। বললেন, 'ভেরি আনফরচুনেট! এধরনের অ্যাকসিডেন্ট,—ওয়ান ইন এ মিলিয়ন হয় কিনা সন্দেহ।'

শমি বুঝল মেজর পারেখ এখনও পোস্ট-মর্টেমের খবর জানেন না। অবশ্য খুব কৌতূহলী না হলে জানার কথাও নয়।

বিক্রমদা খবরটা দিতে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল পারেখের মুখ। বিড়বিড় করে বললেন, 'ভেরি আনফরচুনেট!' তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, 'তুমি যখন আসবে বললে তখনই বুঝেছিলাম— সাম প্রবলেমস আর দেয়ার। তবে কেস এতটা সিরিয়াস বুঝতে পারিনি। কিন্তু বিষ দেবে কে? কখনই বা দেবে?'

বিক্রমদা হাসলেন, 'সেটা জানা গেলে তো হয়েই যেত। তবে বিষ কখন দেওয়া হয়েছে সেটা জানা কঠিন নয়।'

'কখন?'

'ন্যাচারেলি ব্রেকফাস্টে। আর্সেনিক এমনিতেই একটু দেরিতে কাজ করে। খুনী চেয়েছিল অমল জলাতে পৌঁছানর পর যেন মারা যায়। এবং তারপর ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়লে সব প্রমাণ লোপাট করে এটাকে একটা দুর্ঘটনার চেহারা দেওয়া সম্ভব হবে।'

'হরিব্‌ল্‌!' পারেখ বললেন, 'হু ক্যান প্ল্যান দ্যাট ওয়ে, মাস্ট হ্যাভ গট সামথিং স্পেশাল ইন হিজ ব্রেন বক্স!'

'নো ডাউট!' উঠে গিয়ে বেসিনে হাত ধুতে শুরু করলেন বিক্রমদা।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি পারেখের। বললেন, 'ভাল কাজে এরা বুদ্ধিটা লাগায় না কেন বল তো?'

হেসে ফেললেন বিক্রমদা, 'লাইফ ইজ নট সো সিম্পল পারেখ। জীবন সরলরেখায় চলে না। নইলে অমলের মতো সাতে-পাঁচে না থাকা, মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানীকে মেরে কার লাভ?'

শমি বলল, 'খুন যখন হয়েছে, তখন মোটিফ তো থাকবেই।'

'অবশ্যই। কিন্তু তাহলে অমলের পাশে প্রাচীন পুঁথি কেন পড়েছিল?'

পারেখ হাসলেন শমির দিকে তাকিয়ে, 'নাও, ইয়ং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফাইন্ড দ্য মোটিফ বিহাইন্ড ইট!'

শমি বলল, 'এরকম হতে পারে, দামী পুঁথিটাকে কাছছাড়া করতে চাইতেন না অমল গাঙ্গুলি। যমজ ভাই বিমলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সবসময় কাছে রাখতেন।'

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, 'এটা একটা সম্ভাবনা। তবে খুবই দুর্বল। এখানে প্রতিটি কোয়ার্টারই ওয়েল গার্ডেড। চুরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। এরকম একটা সুরক্ষিত জায়গা বলেই তো দামী পুঁথিটা ও নিজের কাছে এনে রেখেছিল।'

'তাহলে?' বিভ্রান্ত দেখাল শমিকে।

সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিক্রমদা। বললেন, 'সেটাই তো খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। প্রশ্ন অনেকগুলো। এক, মৃত্যু যে কাছেই তা কীভাবে বুঝেছিল অমল? দুই, কে বা কারা মারতে চেয়েছিল অমলকে? তিন, অমলের সঙ্গে প্রাচীন পুঁথিটা ছিল কেন?' পায়চারি করতে করতে থামলেন বিক্রমদা। নিজের মনে বললেন, 'তিন নম্বর প্রশ্নটাই সবকিছুকে অকারণে জটিল করে দিচ্ছে।'

অনেকক্ষণ ধরেই শমির ভেতরে এক ধরনের কৌতূহল পাক খাচ্ছিল। এবার বলেই ফেলল, 'ডায়েরি থেকে কিছু জানা যাচ্ছে না?'

'অমলের ডায়েরি...,' অন্যমনস্ক দেখাল বিক্রমদাকে। বললেন, 'জানা যাচ্ছে কতগুলো নাম। সম্ভবত, তাঁরা অমলের সহকর্মী বিজ্ঞানী। সবার সঙ্গেই কথা বলতে হবে। ডায়েরিতে রয়েছে কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রামের পাসওয়ার্ড। ফ্লপি নাম্বার। এই জায়গায় একটু পারেখের হেল্প লাগবে। কারণ, কম্পিউটারের কাজটা করতে হবে লুকিয়ে, রাতের অন্ধকারে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে।'

পারেখ হাসলেন, 'নো প্রবলেম। খুনী যদি ধরা পড়ে তাহলে ওই সামান্য অপরাধ নেগলিজিবল। ও নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।'

বিক্রমদা পারেখকে বললেন, 'আরেকটা ব্যাপার। আমি কেন এসেছি সেকথা কাউকে বলার দরকার নেই। কেউ কৌতূহলী হলে বলবে আমি তোমার গেস্ট। দু'-একদিন থাকব। সব ঘুরে দেখব। বিকেলের দিকে ডুমুরদহ জলায় বেড়াতে যাব—ব্যস্‌! ফরাসিতে একটা শব্দ আছে—'তুরিস্ত ভ্যার'। যার মানে হলো সবুজ প্রকৃতি-প্রেমিক। আমরাও তাই। আর ট্যুরিস্ট হিসেবে যেখানে-সেখানে ঘুরলেও কেউ কিছু মনে করবে না। যদিও আমার সন্দেহ আছে, আদৌ কতদিন পরিচয় লুকিয়ে রাখা যাবে! তবু চেষ্টা করা যাক।'

'ওকে বস্‌।' টেবিলে চাপড় মেরে বললেন মেজর পারেখ। শমি দেখল, অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় চকচক করছে অতবড় মানুষটার চোখ।

॥ ৩ ॥

'এখানকার লোকের বিশ্বাস জলাতে দানব রয়েছে। রাতের অন্ধকারে কেউ কেউ নাকি দেখেছে সেই দানবকে। বিশাল তার চেহারা। লম্বা গলা। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরোয়।' চোখ গোলগোল করে একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন মেজর পারেখ।

সত্যিই ভারি রহস্যময় এই অস্ত্র-জলা। এপার-ওপার দেখা যায় না। বড় বড় বেতবন শুধু হাওয়ায় দুলছে। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কালো অতল জল। ঘন বেতবনের ফাঁক দিয়ে সত্যিই যদি একটা জল-দানব মাথা বাড়ায়? ভাবলে গা শিরশির করে। কিছুক্ষণ আগেই মেজর পারেখের জিপে শমিরা জলার ধারে এসে পৌঁছেছে।

শমি বলল, 'ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সময় যে আগুন বেরোয় তাই দেখেই বোধহয় এসব গল্পকথা জন্ম নিয়েছে, তাই না?'

পারেখ কাঁধ ঝাঁকালেন, 'হতে পারে।'

বিক্রমদা বললেন, 'ঠিক কোথায় অমলের বডিটা পড়েছিল, জানো পারেখ?'

'নো আইডিয়া।' কাঁধ ঝাঁকালেন পারেখ। 'আমাদের মেডিকেল ইউনিট থেকে দুজন ডাক্তার প্রথম এসেছিলেন। ওঁরাই প্রথম বডিটাকে তুলে নিয়ে যান। যতদূর জানি, অমল তখনও বেঁচেছিল। ভুবনেশ্বরে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই প্রাণ হারায়।'

'কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল কি অমল?'

'নট টু মাই নলেজ।'

'ওর পাশে পুঁথিটা কে প্রথম দেখতে পায়?'

খুব একটা ভাবতে হলো না মেজর পারেখকে। বললেন, 'ডক্টর বিশ্বাস অথবা ডক্টর রাউত। বেটার ইউ টক টু দেম।'

মাথা নাড়লেন বিক্রমদা। বললেন, 'পুঁথিটা ঠিক কীভাবে পড়েছিল সেটা জানা জরুরি।'

শমি জানে বিক্রমদার মাথায় কিছু

একটা আইডিয়া এসেছে। কিন্তু সেটা কী? এই কেসটার আগাগোড়াই মাথায় ঢুকছে না শমির। পুরোটাই মস্তবড় হেঁয়ালি। ক্ষেপণাস্ত্র, পুঁথি, বিষক্রিয়া...। বিক্রমদা কীভাবে এগোচ্ছেন, তাও আপাতত জানার কোনও উপায় নেই।

গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে জলার খুব কাছে চলে এসেছিল শমি। খেয়ালই করেনি, বিক্রমদারা কথা বলতে বলতে অন্যদিকে সরে গেছেন। এখানে পায়ের তলায় মাটি ভিজে ভিজে। চোরাবালি নেই তো? হঠাৎ খুব একা লাগল, ভয় করল শমির। সন্ধ্যে নামছে। বেতবনের ঘন সবুজ রঙে কালচে ছোপ ধরছে। আকাশের রঙ বদলে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। গোলাপী রঙের একটা মেঘের আকৃতি যেন ঠিক জলদানবের মতোই! সবচেয়ে আশ্চর্য, এত গাছপালা চারদিকে, অথচ একটাও পাখি নেই। অন্য জায়গায় এইসময় পাখিরা ঘরে ফেরে। কিচিরমিচিরে কান পাতা যায় না। তাহলে পাখিরাও বোঝে কোন জায়গাটা খারাপ, এড়িয়ে চলতে হয়!

ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল শমির। বাঁ দিকে জলার মুখে পরপর অনেকগুলো মোটা গাছের গুঁড়ি অন্ধকার করে রেখেছে জায়গাটাকে। সেখান থেকে দুটো পা বেরিয়ে আছে না? ভুল দেখছে না তো? চোখ কচলে আরও একবার ভাল করে দেখল শমি। কোনও ভুল নেই। মানুষেরই পা। পাশে দুটো চটি খুলে পড়ে আছে। জলায় লাশ? আবার!

এত জোরে বুক টিপটিপ করছে যে শমির মনে হচ্ছে কেউ বোধহয় শুনতে পাবে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পিছিয়ে গেল শমি।

একটু দূরেই বসে মাটিতে ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে কিছু একটা দেখছিলেন বিক্রমদা। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মেজর পারেখ। ঊর্ধ্বশ্বাসে কাছে গিয়ে শমি বলল, 'গাছের আড়ালে...দুটো পা...।'

চমকে গিয়ে পারেখ বললেন, 'ডেডবডি?'

কোনোরকমে দম নিয়ে শমি ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিক্রমদা ঘাবড়াননি। বসেই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক দেখেছিস?'

মাথা নাড়ল শমি, 'পরিষ্কার দেখেছি। দুটো পা উল্টে রয়েছে। চিৎ হয়ে কেউ পড়ে থাকলে যেমন দেখায়। চটি দুটো খুলে পড়ে আছে পাশে।'

'লেট্‌স সি।' বিক্রমদা উঠলেন। বললেন, 'ভাল করে কাছে গিয়ে দেখে এলি না কেন?'

আবার কাছে গিয়ে? শমি আর কিছু বলল না। ওর গলা এমনিতেই শুকিয়ে কাঠ। এখনও বুক টিপটিপ করছে।

'কোথায় দেখেছিলি?'

বিক্রমদার প্রশ্নে হতভম্ব দেখাল শমিকে। সত্যিই তো! কোথায় দেখেছিল? দুটো বাঁক ঘুরলেই জলার মুখ' এটাই তো সেই জায়গাটা। বড় বড় গাছপালার মোটা গুঁড়ির কোল ঘেঁষে অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে।

ঝুঁকে পড়ল শমি। 'এই দ্যাখো পায়ের ছাপ!'

ভিজে মাটিতে সত্যিই খালি পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চটি পরা ছাপও রয়েছে।

বিক্রমদা হেসে বললেন, 'জীবিত বা মৃত যেই হোক, সে-লোক খুব দূরে এখনও যায়নি।'

বলতে না বলতেই গলা পাওয়া গেল মেজর পারেখের।

'গুড ইভনিং ডঃ বিশ্বাস! হোয়াট আ সারপ্রাইজ!'

বেতবনের আড়াল থেকে যে মানুষটা বেরিয়ে শমিদের সামনে পড়ে থতমত খেয়ে গেছেন, তাঁকে দেখতে ছোটখাটো। আলো-আঁধারিতে তাঁকে প্রৌঢ় মনে হচ্ছে। কাঁচাপাকা চুল মাথায়। এক হাতে বই, গোটানো ছোট্ট মাদুর। অন্য হাতে একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

আমতা আমতা করে ভদ্রলোক বললেন, 'ও মেজর পারেখ! গুড ইভনিং। আমি তো প্রায়ই আসি। আপনি এখানে—এখন?' চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ডঃ বিশ্বাস তাকালেন শমিদের দিকে।

পারেখ বললেন, 'মিট মাই ফ্রেন্ডস—ক্যাপ্টেন বিক্রম মুখার্জি অ্যান্ড হিজ কাজিন শমি। আমরা সবাই জলা দেখতে এসেছিলাম।'

ডঃ বিশ্বাস বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন, 'হঠাৎ সবাই জলা দেখতে আসছে! রিডিকিউলাস।'

'আর কে এসেছে?' বিক্রমদার প্রশ্নে মুখ তুললেন ডঃ বিশ্বাস। বললেন, 'সেভারেল পিপল। আই কান্ট নেম দেম।'

'আপনি দেখেছেন তাদের?'

'উঁহু। যারা আসে তারা দেখা দিতে চায় না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আমি বুড়ো মানুষ, কোথায় খুঁজব?'

'আপনি কি অনেকদিন ধরেই আসছেন এখানে?' হাঁটতে হাঁটতে আলতো করে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন বিক্রমদা।

'হ্যাঁ, অনেকদিন। কতদিন ধরে এখানে আছি। তা প্রায় তিন বছর হতে চলল। আসলে পেশায় ডাক্তার হলেও আমার প্যাশন বটানি। এই জলায় অনেক প্রাচীন উদ্ভিদের দেখা মেলে।'

'সত্যিই কি জল-দানব আছে এখানে?' প্রশ্নটা না করে থাকতে পারল না শমি।

সস্নেহে শমির পিঠে হাত রাখলেন ডঃ বিশ্বাস। হেসে বললেন, 'থাকলেই বা ক্ষতি কী? ভাবতে তো ভালই লাগে—তাই না? তবে মানুষের চেয়ে বড় দানব কি কখনও জন্মেছে পৃথিবীতে?' হঠাৎ চুপ করে গেলেন ডঃ বিশ্বাস।

গল্প করার ভঙ্গিতেই বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছুদিন আগে জলাতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল শুনলাম।'

ডঃ বিশ্বাস ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, 'কে বলল অ্যাকসিডেন্ট!'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী, যার যাবার সে

গেছে। যার থাকার সে আছে।'

ভদ্রলোক হেঁয়ালি করতে ভালবাসেন। বিক্রমদাকে গম্ভীর দেখাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'অমল গাঙ্গুলিকে আপনি চিনতেন?'

'চিনব না?' বেশ অবাক শোনাল ডঃ বিশ্বাসের গলা। বললেন, 'এ তল্লাটে অমন মেধাবী ছেলে আর এসেছে নাকি? শুধু মেধাবীই নয়, সৎ। বিনয়ী। আর সেজন্যই এযুগে অচল।'

'সৎ ছিল বলেই কি অমলকে এভাবে চলে যেতে হলো?'

ডঃ বিশ্বাস চট করে একবার বিক্রমদার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর গলা অন্যরকম শোনাল, 'আপনি কি পুলিশের লোক? অমলের মৃত্যুর তদন্ত করছেন?'

মেজর পারেখ 'না, না' বলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। থামালেন বিক্রমদা। হাসলেন, 'ধরুন যদি তাই-ই হয়। আপনি কি সাহায্য করবেন?'

কঠোর শোনাল ডঃ বিশ্বাসের গলা, 'না।'

বেয়াড়া মুহূর্তেও মাথা যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে বিক্রমদার। হাসিহাসি মুখেই বললেন, 'পুলিশের ওপর দেখছি আপনার খুব রাগ! ধরুন আমি যদি পুলিশের লোক না হই, নেহাতই অমলের শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু হই, তাহলে?'

ডঃ বিশ্বাস বললেন, 'পুলিশের ওপর আমার কোনও রাগ নেই। যেটা আছে সেটা হলো—অবিশ্বাস। অনাস্থা।'

বিক্রমদার মুখে তখনও হাসি, 'আপনি মনে হয় ভুল করছেন ডঃ বিশ্বাস। পুলিশে তেমন লোকও কিন্তু আছেন—যাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এনিওয়ে আমার উত্তরটা কিন্তু পেলাম না।'

সামান্য অসহায় শোনাল ডঃ বিশ্বাসের গলা, 'আমার হেল্পের দরকার হবে না বোধহয় আপনার। আপনাকে যদি অমলের বাবা অ্যাপয়েন্ট করে থাকেন তাহলে আমার ধারণা, তিনি মাঝপথেই উইথড্র করে নিতে বলবেন।'

এবার কঠোর শোনাল বিক্রমদার গলা, 'কিন্তু আমি তো কোনও কেসের মাঝখানে নিজেকে সরিয়ে নিই না ডঃ বিশ্বাস। এখানেও সে প্রশ্ন উঠছে না।'

মাথা নাড়লেন ডঃ বিশ্বাস, 'প্রশ্নটা উঠবে। আপনি যদি অমলের শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তাহলে...', কথার মাঝখানে আচমকা থেমে গেলেন ডঃ বিশ্বাস। তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'বাস্তব কখনও-সখনও খুব অপ্রিয় হয়, জানেন তো ক্যাপ্টেন মুখার্জি?'

জবাব দিলেন না বিক্রমদা। শমি দেখল বিক্রমদার মুখে চাপা হাসি। এই হাসির মানে কী জানে না শমি। হাসির তো কতরকমই মানে হয়!

॥ ৪ ॥

'ডঃ বিশ্বাস কী পরেছিলেন বল্ তো? চটি না জুতো?'

বিক্রমদার আচমকা প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল শমি। বলল, 'এই-রে, খেয়াল করিনি তো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া একটু আগেই শেষ হয়েছে। কোথা থেকে যেন মন্ত্রবলে একজন রাঁধুনি যোগাড় করে ফেলেছেন মেজর পারেখ। তাঁর সাফ কথা, দুপুরে উপায় ছিল না বলেই নেহাত ক্যান্টিনের খাবার খাইয়েছিলাম। নইলে তো আমার কিচেনে সব ব্যবস্থাই আছে।

যে রাঁধল তার নাম তরণী। খাসা হাত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বানিয়ে ফেলল—মুরগী-কষা, মশলা-কড়াইশুঁটি আর গরম গরম বেগুনভাজা। আয়োজন যত এলাহী হোক, বিক্রমদা রাতে কখনও চারটের বেশি রুটি খান না। একটু লজ্জা-লজ্জা যে শমির করছিল না, তা নয়, তবু তারমধ্যেই তিনটে রুটি বেশি খেয়ে ফেলল! মেজর পারেখ জানালেন, এখানকার জল সাংঘাতিক হজম করায়। এবার থেকে ছুটিছাটায় এখানে চলে আসবে।

খেয়ে একটু বেরোলেন মেজর পারেখ। সিকিউরিটির ইনচার্জ হিসেবে রাতের দিকে একবার সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিতে হয় তাঁকে। বলে গেলেন, 'এখনই আসছি।' আর তার একটু পরেই বিক্রমদার প্রশ্ন, 'কী পরেছিলেন ডঃ বিশ্বাস?'

শমি মনে করতে পারল না দেখে বিক্রমদা বললেন, 'জুতো। প্রাচীন আমলের ফিতে দেওয়া একটি বুট জুতো।'

চমকে গেল শমি, 'তাহলে চটি পরা কার পা দেখেছিলাম আমি? সেই পায়ের ছাপও তো ছিল মাটিতে!'

বিক্রমদার মুখে মিটিমিটি হাসি, 'এগজ্যাক্টলি। ছিল যে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এবং সেটা যে ডঃ বিশ্বাসের নয়, সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ থাকা যেতে পারে।'

'তাহলে কার?'

'কারও একটা হবে। তবে সে যেই হোক, জলায় তার নিয়মিত যাতায়াত আছে। নইলে অত তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যেত না।'

'কিন্তু সে লুকিয়েই বা পড়বে কেন?' শমির এখনও গোটা ব্যাপারটা খুব ধোঁয়াটে লাগছে।

বিক্রমদা উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা লুকিয়ে পড়ে?' জবাবটাও নিজেই দিলেন, 'যারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়। কথা হচ্ছে, লোকটা কে? ডঃ বিশ্বাসের ওপর কি সে নজর রাখছিল?' গম্ভীর দেখাল বিক্রমদাকে।

শমির হঠাৎ কী মনে হলো, বলে ফেলল, 'ডঃ বিশ্বাসও কিন্তু কিছু একটা লুকিয়ে রাখছেন। কেন বল তো?'

উঠে পড়লেন বিক্রমদা। পায়চারি করতে করতে বললেন, 'ভদ্রলোক অনেক কিছুই জানেন...। আবার সেটার ইঙ্গিতও দেন হেঁয়ালি করে। নাঃ, একটা ভুল হয়ে গেল, বুঝলি শমি...।'

বিক্রমদাকে সামান্য অস্থির দেখাল। কী ভুল? বুঝতে পারল না শমি। লম্বা পা ফেলে ইন্টারকমের দিকে এগিয়ে গেলেন বিক্রমদা। দরকার হলে কোন নম্বরে পাওয়া যাবে বলে গিয়েছিলেন পারেখ।

বিক্রমদার গলায় উত্তেজনার আঁচ পেল শমি, 'হ্যালো, ক্যান আই স্পিক টু মেজর পারেখ প্লীজ? ইয়া, ফ্রম হিজ রেসিডেন্স।'

কিছুক্ষণ চুপ। বিক্রমদা দ্রুত বললেন, 'পারেখ, কাম ফাস্ট। ইটস আরজেন্ট।'

পারেখের আসতে মিনিট পাঁচেক লাগল। বিক্রমদা সেই ফাঁকে শমিকে বললেন, 'চট করে জামা-প্যান্টটা পরে নে।'

বিক্রমদা কোথায় যাবেন, কিছুই বুঝতে পারছে না শমি। শুধু এটুকু বুঝছে, খুবই জরুরি এই রাতের অভিযান।

রেডি হতে হতেই পারেখ এসে গেলেন, 'হোয়াটস আপ? এনিথিং হ্যাপেনড!'

বিক্রমদা বললেন, 'ডঃ বিশ্বাস কোথায় থাকেন? হেঁটে এখনই পৌঁছনো যাবে?'

অবাক চোখে ঘাড় নাড়লেন মেজর পারেখ। 'খুব দূরে নয়।'

'তাহলে এখনই চলো।'

কেন, কী ব্যাপার কিছুই বললেন না বিক্রমদা। বাইরে হাল্কা কুয়াশা। স্থির হয়ে জড়িয়ে রেখেছে রাস্তার আলোকে। চওড়া পিচঢালা শুনশান রাস্তার ধারে বড়বড় গাছের পাতা থেকে টুপটাপ শিশির পড়ার শব্দ। হিমেল হাওয়ায় শমির মনে হলো শীত আসতে বেশি দেরি নেই। চারতলা কোয়ার্টারগুলোর বেশির ভাগই অন্ধকার। লোকজন শুয়ে পড়েছে।

এরকমই একটা কোয়ার্টারের সামনে থামলেন মেজর পারেখ। বললেন, 'তিনতলার ডানদিকে।'

আলো জ্বলছে। একমাত্র ওই একটা ঘরেই। জেগে আছেন ডঃ বিশ্বাস?

গেটে চাবি। বিক্রমদা বললেন, 'কাউকে ডেকে তুলতে হবে।'

পারেখ বললেন, 'দরকার নেই। মাস্টার কি রয়েছে আমার কাছে।'

গেট খুলে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন বিক্রমদা। চোখমুখ থমথমে, তিনতলার মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন বিক্রমদা। আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে যে অল্প আলো আসছে তাতেই বোঝা গেল কালো রক্তের রেখা এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এসেছে দরজার তলা দিয়ে।

বিড়বিড় করে আরও একবার নিজের মনে বললেন বিক্রমদা, 'দেরি হয়ে গেল। সত্যি বড় দেরি হয়ে গেল।'

আলতো চাড়ে খুলে গেল দরজা। সামনের ঘর খাঁ-খাঁ করছে। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, দেখেই বোঝা যায় কেউ খোঁজাখুঁজি করেছে কিছু একটা। উল্টে রয়েছে ছোট সেন্টার টেবিল।

পরের ঘরটা অন্ধকার। আলো না জ্বললেও এই ঘরের আলোতেই বোঝা গেল বিছানায় ডঃ বিশ্বাস উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। মাথা ঝুলে রয়েছে খাট থেকে নিচে মেঝের দিকে। মাথা থেকেই সম্ভবত রক্ত বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেছে বাইরের দিকে। একটা হাতও ঝুলে রয়েছে। আর ঠিক সেই হাতের নিচে পড়ে রয়েছে কুচকুচে কালো ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল।

'সুইসাইড?' ফিসফিস করে বললেন মেজর পারেখ।

বিক্রমদা আর ভেতরে ঢুকলেন না। বললেন, 'চেষ্টা করা হয়েছে তেমনই যাতে মনে হয়। আমার ধারণা হাতের ছাপ-টাপ যাতে না পাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও সচেতন ছিল খুনী। শুধু একটাই ভুল করেছে—তাড়াহুড়োয় আমাদের সাড়া পেয়ে ঘর অগোছালো রেখে, দরজা বন্ধ না করেই পালিয়ে গেছে।'

'কিন্তু পালাবে কোথায়?' পারেখ বললেন, 'নিচে গেট তো বন্ধ ছিল।'

'সেটা কোনও সমস্যাই নয়। অনেক জায়গা রয়েছে। ওপরের ছাদ রয়েছে। জমাদারের সিঁড়ি রয়েছে।' বিক্রমদাকে চিন্তিত দেখাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওপরে কে কে থাকে?'

'একদিকে ডঃ রাউত। উল্টোদিকে সায়েন্টিস্ট শীলা বর্মন।'

'চলো একবার দেখা যাক ওরা কোনও শব্দ পেয়েছিল কিনা!'

ডঃ বিশ্বাসের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে দরজায় তালা মারা। 'কেউ থাকে না বোধহয়?' বিক্রমদার প্রশ্নে মাথা নাড়লেন পারেখ, 'প্রায় ছয় মাস হতে চলল ফাঁকা পড়ে আছে।'

ডঃ রাউতের ঘুম খুব গভীর। তিনবার কলিংবেল বাজানোর পর দরজা খুললেন। ঘুম ঘুম গলায় বিরক্তি, 'কী ব্যাপার!'

মেজর পারেখ বললেন, 'সরি টু ডিসটার্ব ইউ ডঃ রাউত। আপনাকে একবার সেকেন্ড ফ্লোরে যেতে হবে।'

'কেন?'

'আপনার কলিগ ডঃ বিশ্বাস মারা গেছেন।'

'হোয়াট! আমার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা সিঁড়ির মুখে দেখা হয়েছে। হি ওয়াজ অ্যাজ হেলদি অ্যাজ এ...।'

বিক্রমদা মাঝপথে থামালেন ডঃ রাউতকে। বললেন, 'হি ওয়াজ শট ডেড।'

'সে কী কথা, চলুন দেখি।'

পারেখের সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন ডঃ রাউত। উল্টোদিকের দরজায় বেল টিপলেন বিক্রমদা। নেমপ্লেটে লেখা আছে শীলা বর্মন অ্যান্ড গিরিশ বর্মন।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভদ্রমহিলা সম্ভবত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন।

'ইয়েস।' অবাক হওয়ার ভান করলেন শীলা বর্মন।

বিক্রমদা এককথায় খবরটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোনও গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন?'

'কখন?'

'এই ধরুন ঘণ্টাখানেক আগে।'

'নো চান্স। আমার ঘরে টিভি চলছিল।'

একটুও ভণিতা না করে বিক্রমদা এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি সন্ধ্যেবেলায় ডঃ বিশ্বাসের ঘরে গিয়েছিলেন?'

পাল্টা প্রশ্ন করলেন শীলা বর্মন,

'হোয়াই শুড আই আনসার ইউ? হু আর ইউ?'

কার্ডটা বের করলেন বিক্রমদা।

'ক্যাপ্টেন বিক্রম মুখার্জি।' বিড়বিড় করে পড়লেন শীলা বর্মন। কাজ হলো। গলা নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। আমার হাজব্যান্ডের প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল তাই ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। আই সাপোজ, ইউ আর ইনভেস্টিগেটিং হিজ ডেথ?'

বিক্রমদা কোনও জবাব দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'উল্টোদিকে ডঃ রাউত ছিলেন না বোধহয়।'

'না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস বর্মন।'

বিক্রমদা নামতে শুরু করলেন। শমি জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'কী করে জানলে ভদ্রমহিলা ডঃ বিশ্বাসের ঘরে গিয়েছিলেন?'

'পারফিউমের গন্ধটা পেলি না? ওই একই গন্ধ রয়েছে ডঃ বিশ্বাসের ঘরেও।'

ডঃ বিশ্বাসের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজর পারেখ। ডঃ রাউত বেরিয়ে এসে বললেন, 'সুইসাইডই মনে হচ্ছে। পোস্ট-মর্টেম হলে বলা যাবে। ফরেনসিকে খবর দিয়ে দেখা যাক হাতের ছাপ-টাপ কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

বিক্রমদা বললেন, 'পিস্তলে শুধু ডঃ বিশ্বাসেরই হাতের ছাপ পাওয়া যাবে।'

'না, না, এতটা সিওর হওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।' বললেন ডঃ রাউত।

বিক্রমদার গলা খুবই কঠোর, ঠাণ্ডা শোনাল, 'সিওর না হলে প্রমাণ করা যাবে না এটা সুইসাইড। তাই না ডঃ রাউত?'

ডঃ রাউত অবাক হয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি এটাকে মার্ডার সন্দেহ করছেন? কিন্তু বিশ্বাসের মতো এমন নির্বিরোধী, ভাল মানুষকে কে মারবে? আশ্চর্য!'

হাত পেছনে পেঁচিয়ে ধরলেন বিক্রমদা

॥ ৫ ॥

'মরে গিয়ে অনেকগুলো জট খুলে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন বিক্রমদা। আগের দিন রাতে শুতে শুতে বেশ দেরি হয়েছে। সকাল নটায় শমির ঘুম ভাঙিয়েছেন বিক্রমদা। এখন প্রায় দশটা বাজতে চলেছে।

বিক্রমদাকে দেখে মনে হবে ছুটি কাটাতে এসেছেন। হাবেভাবে কোনও তাড়া নেই। সোফাতে আধশোয়া ভঙ্গিতে চোখ বোলাচ্ছেন আগের দিনের খবরের কাগজে। এখানে কাগজ পৌঁছয় প্রায় বিকেলে। তাও আবার আনতে হয় স্টেশনে গিয়ে।

শমি বলল, 'অনেক কিছু জানতেন বলেই কি মরতে হলো ডঃ বিশ্বাসকে?'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

মেজর পারেখ বললেন, 'অমলের খুনীরা খুবই ডেসপারেট। দেখা যাচ্ছে, যে কোনও ভাবেই হোক ওরা সব সূত্র মুছে ফেলতে চায়।'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু ওরা এভাবে যত সূত্র মুছতে চাইবে ততই তো সুবিধে।'

'কেন?'

'যত ডেসপারেট হবে, তত ভুল করার সম্ভাবনাও বাড়বে। তার চেয়েও বড় কথা, অমলের খুনীরা যে এখানকারই লোক, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না।'

'অমলের ডায়েরিতে কাদের নাম রয়েছে?'

'অনেকেরই। সবচেয়ে বেশিবার রয়েছে ডঃ বিশ্বাসের নাম। একটা কোনও গোপন তথ্য ছিল যা ডঃ বিশ্বাসকে জানিয়েছিল অমল। ডঃ বিশ্বাস সাবধান করে দিয়েছিলেন অমলকে।'

'কিন্তু নিজে সাবধান হননি।'

'না। কারণ, ডঃ বিশ্বাস ভেবেছিলেন অমলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার ঝুঁকি নেবে না খুনীরা। ভুল ভেবেছিলেন।'

মেজর পারেখ বললেন, 'এই গোপন তথ্যটা কি ক্ষেপণাস্ত্র-গবেষণা সংক্রান্ত?'

বিক্রমদাকে গম্ভীর দেখাল, 'এখনও পর্যন্ত তেমনই মনে হচ্ছে। কারণ, মৃত্যুর আগের দিন ডায়েরিতে অমল যে কথাটা লিখেছে—সেটা আপাতদৃষ্টিতে হেঁয়ালি মনে হলেও মোটেই অর্থহীন নয়।'

'কী লিখেছিল অমল?' পারেখের প্রশ্নে সবে মুখ খুলতে যাচ্ছেন বিক্রমদা এমন সময় কলিংবেল বাজল। ডঃ রাউত 'গুড মর্নিং এভরিবডি।'

বিক্রমদা হেসে বললেন, 'ভালই হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে।'

অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন রাউত। বললেন, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একটু দেখা করে যাই। গতরাতে সেভাবে আলাপই হয়নি!'

পারেখ বললেন, 'চা না কফি, ডঃ রাউত?'

'নো চয়েস।'

এবার কফি এল। বিক্রমদা বললেন, 'অমলের বডি আনতে তো ডঃ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনিই গিয়েছিলেন, তাই না?'

ডঃ রাউত হেসে বললেন, 'ইয়েস।' তারপরেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে যোগ করলেন, 'অমলের পর রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন ডঃ বিশ্বাস। এবার আমার টার্ন নয় তো?'

জবাব না দিয়ে বিক্রমদা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা যখন যান, অমল তো তখনও মারা যায়নি। কিছু বলেছিল?'

'হ্যাঁ, জল চাইছিল। যদিও খুবই জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর গলা, তার মধ্যেই ওর ভাই বিমলের নাম করে। পুঁথিটা দেখিয়ে একথাও বলে, এটাকে ওর হাত থেকে বাঁচান।'

'মানে ওর ভাইয়ের হাত থেকে?'

'ন্যাচারেলি।'

'অমলের মৃত্যুর জন্য আপনি ওর ভাইকে সন্দেহ করছেন?'

'কোনও সন্দেহ আছে?' ডঃ রাউতকে উত্তেজিত দেখাল, 'ওর ভাই ছাড়া আর কে অমলের ব্রেকফাস্টে বিষ দেবে? অমল যেদিন মারা যায় তার আগের রাতে ওর ভাই এখানে ছিল। ডু ইউ নো দ্যাট? এছাড়া বিমলের পাস্ট রেকর্ডও খুব খারাপ। ডাকাতি আর খুনের অভিযোগে ও জেল খেটেছে।'

বিক্রমদা ঘাড় নাড়লেন, 'অর্থাৎ ওর ভাইয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই অমল পুঁথিটা সঙ্গে নিয়ে জলায় গিয়েছিল?'

'ঠিক তাই, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই।' জোর দিয়ে বললেন ডঃ রাউত।

'তাহলে ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়ার ঘটনাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'দ্যাটস অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। পিওর অ্যাকসিডেন্ট। এর আগেও তো একবার এমন ঘটেছিল।' সামনের পাটিতে সোনা বাঁধানো দাঁত ঝকঝক করে উঠল রাউতের।

হাসলেন বিক্রমদা। মজার গলায় বললেন, 'তাহলে আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী কেসটায় কোনও জটিলতাই নেই দেখা যাচ্ছে। অমলের যমজ ভাই বিমল সকালের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল অমলের মৃত্যুর জন্য। অমল নির্জন জলায় গিয়ে মারা গেলে পুঁথিটা ও নিয়ে পালিয়ে যেত। বেশ ভাল কথা। তাহলে অমল মারা যাওয়ার পর পুঁথিটা কেন পড়েছিল ওর পাশে? বিমল যদি ওর ভাইকে অনুসরণ করে জলায় গিয়েও থাকে, তাহলে পুঁথিটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে?'

'আহাঃ, আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?' অধৈর্য শোনাল ডঃ রাউতের গলা, 'সেদিন জলায় অমলের বডির কাছেই ক্ষেপণাস্ত্র ভেঙে পড়েছিল। সেই বিস্ফোরণ দেখে বিমল নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যায়। তখনই হয়তো পালিয়ে গিয়ে থাকবে।'

উঠে পায়চারি করতে শুরু করলেন বিক্রমদা। বললেন, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে মানছি। কিন্তু গতরাতে ডঃ বিশ্বাসের মৃত্যু? তাহলে ধরে নিতে হয় এই দুটো মৃত্যুর মধ্যে কোনও যোগাযোগই নেই!'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডঃ রাউত। 'সেটা আমার জানার কথা নয়। তবে আমার মনে হয়, অমলের ভাইকে ধরতে পারলেই সব রহস্যের সমাধান ঘটবে। হি ইজ দ্য মেন কালপ্রিট। আর নইলে ও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কেন? নিশ্চয়ই কিছু একটা দোষ করেছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' ইস্পাতের মতো কঠিন, ঠাণ্ডা শোনাল বিক্রমদার গলা, 'বিমল পালিয়ে গিয়ে থাকলে অন্য কোনও কারণে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ওর চেয়েও সাংঘাতিক, বিপজ্জনক কোনও অপরাধীর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার সাহস ওর হয়নি।'

উঠে পড়লেন ডঃ রাউত। আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'চলি। অনেক গল্প হলো। একদিন সন্ধ্যের দিকে আসুন আমার বাড়িতে। চায়ের নেমন্তন্ন রইল।'

বিক্রমদা ভদ্রতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হয়তো দরকারেই যাব বিরক্ত করতে।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম!'

ডঃ রাউত চলে যেতে উঠে পড়লেন বিক্রমদাও। মেজর পারেখকে বললেন, 'এবার একবার অমলের কোয়ার্টারে যাওয়া দরকার। ওটা নিশ্চয়ই তালাবন্ধ হয়েই পড়ে আছে?'

'ন্যাচারেলি! সেদিন সকালে গাঙ্গুলি তালা মেরে বেরিয়েছিল। আমরা পরে জায়গাটা সিল করে দিই।'

'অমলের কোয়ার্টার ডঃ বিশ্বাসের কোয়ার্টার থেকে কতদূরে?'

'একেবারে উল্টোদিকে।'

'চলো দেখা যাক।'

ডঃ বিশ্বাসের মতো অমল গাঙ্গুলিও থাকতেন তিনতলায়। এই কোয়ার্টারে কোনও ঘরই ফাঁকা পড়ে নেই। দরজা-জানলা বন্ধ থাকায় ঘরটায় সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। বুকসেল্ফে, রাইটিং টেবিলে, টেবিলল্যাম্পের ওপর একপুরু ধুলো জমেছে।

জানলা খুলে দিলেন বিক্রমদা। 'সেদিনের পর থেকে নিশ্চয়ই জিনিসপত্রে হাত দেওয়া হয়নি?'

বিক্রমদার প্রশ্নে সামান্য হতভম্ব দেখাল পারেখকে। বললেন, 'যতদূর জানি কেউ হাত দেয়নি। অন্তত দেওয়ার তো কথা নয়। কেন বল তো?'

বিক্রমদা গম্ভীর, চিন্তিত। শমিকে বললেন, 'দ্যাখ্ তো বাথরুমে জমাদারের সিঁড়িতে যাওয়ার দরজাটা খোলা আছে কিনা?'

উঁকি মেরে শমি বলল, 'হ্যাঁ, খোলা।'

'ঠিকই ধরেছিলাম। কেউ একজন ঢুকেছিল। নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারে।' নিজের মনে বললেন বিক্রমদা, 'মেঝের ধুলোতে পায়ের ছাপ। রাতের অন্ধকারে বুঝতে পারেনি এত ধুলো রয়েছে।'

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ভাবছেন বিক্রমদা। শমিকে বললেন, 'কিছুতে হাত দিস না। ঘরের মধ্যে বেশি হাঁটাচলা করিস না।'

শমিকে না বললেও চলত। ও জানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এক্সপার্টদের খবর দেওয়ার কথা ভাবছেন বিক্রমদা।

ডাইনিং রুমের মুখোমুখি ঘরটাই বেডরুম। দরজা আধ ভেজানো। বিক্রমদা ভেতরে আর ঢুকলেন না। ঘরের আলো জ্বাললেন দরজার পাশের সুইচ টিপে।

ঘরটা দেখলেই বোঝা যায়, ঘরের মালিক খুব একটা গোছানো প্রকৃতির নয়। মেঝেতে জামা-প্যান্ট পড়ে আছে। দেখে মনে হবে কেউ দ্রুত জামাকাপড় ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে গেছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা জামা-প্যান্টের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন বিক্রমদা। চিড়বিড় করে বললেন, 'আশ্চর্য তো!'

কী আশ্চর্য, কিছুই বুঝল না শমি। জামা-প্যান্ট দুটোই এমনিতে বেশ ময়লা। তার ওপর আবার ধুলো পড়ায় চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে!

বেরোনর আগে বিক্রমদা আরও একবার পায়ের ছাপগুলো দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস বেরোল পকেট থেকে।

শমি জানে একটা ছোট্ট সূত্র, কোনোকিছুর সঙ্গে মিল বা অমিল মনের জানলা খুলে দেয়। খোলা জানলা দিয়ে আলো আসতে শুরু করে। অন্ধকার কেটে যায়। তেমন কোনও সূত্র কি পেয়েছেন বিক্রমদা? মুশকিল হলো, বিক্রমদার চোখমুখ দেখে কখনই বোঝা যায় না, জল কোনদিকে গড়াচ্ছে। কোনও কেসে খুব আটকে গেলেও বিক্রমদাকে কখনও মেজাজ খারাপ করতে দেখেনি শমি। শেষ হাসি যে বিক্রমদাই হাসবেন এ ব্যাপারটা যেন তাঁর আগে থাকতেই জানা আছে!

যদিও এই কেসটা শুরু থেকেই শমির কাছে জটিল ধাঁধার মতো। খুন হয়েছে দুটো। প্রথমে তরুণ বিজ্ঞানী অমল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে মারার জন্য দু'ভাবে চেষ্টা হয়েছিল। প্রথমে তাঁর খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কম্পিউটারে হিসেবের সূক্ষ্ম গরমিল ঘটিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে পড়েছিল একটি প্রাচীন পুঁথি। যে মহামূল্য পুঁথি অমল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের কাছছাড়া করতেন না—যমজ ভাই বিমলের ভয়ে। অমল খুন হওয়ার আগের দিন বিমল এখানে ছিল। সন্দেহ বিমলের ওপর পড়তেই পারত যদি পুঁথিটা না পড়ে থাকত অমলের মৃতদেহের পাশে। অমলের ডায়েরিতে কী রয়েছে? ডঃ বিশ্বাস কি এই রহস্যে জড়িত? তাই তাঁকে খুন হতে হলো? কী জানতেন ডঃ বিশ্বাস, যাঁর জন্য তাঁর মুখ বন্ধ করতে হলো? অমলের যমজ ভাই বিমল দোষ না করলে কেন পরের দিন থেকে ফেরার হয়ে যাবে? অমলের ঘরে কে ঢুকেছিল রাতের অন্ধকারে? তার পায়ের ছাপে কী সূত্র পেলেন বিক্রমদা? নির্জন জলায় কারা যায়? কাদের দেখেছিলেন ডঃ বিশ্বাস?

জলার কথা মনে পড়তেই যেন হঠাৎ শমির মাথায় বিদ্যুৎ চমকাল। আরে, তাই তো, পায়ের ছাপটা কেন এত মনোযোগ দিয়ে দেখছেন বিক্রমদা, এবার বোঝা গেল।

উত্তেজিত হয়ে শমি বলল, 'বিক্রমদা এই পায়ের ছাপই কি জলাতে...', শমি কথা শেষ করার আগেই বিক্রমদা হেসে বললেন, 'তুই তো দেখছি ইন্ডিয়ান রেলের চেয়েও লেটে রান করছিস! যাক্, তবু দেরিতে হলেও যে বুঝেছিস, এটা একটা গুড সাইন।'

পারেখ বললেন, 'তাহলে তো জলাতে একবার যাওয়া দরকার।'

বিক্রমদার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। এই চাউনির মানে কী জানে শমি। শিকার ফাঁদে পড়েছে। বিক্রমদা আর দেরি করতে চান না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন বিক্রমদা, 'কিন্তু এখনই নয়। রাতে, রাতের অন্ধকারে।'

॥ ৬ ॥

যতদূর চোখ যায়, শুধু অন্ধকার। আকাশে সরু একফালি চাঁদ থাকলেও তাতে সামান্য আলো তো নেই-ই, উল্টে যেন অন্ধকার আরও বেড়ে গেছে! জলায় পৌঁছনর অন্তত আধ কিলোমিটার রাস্তার আগেই জিপের স্টার্ট বন্ধ করে দিতে বলেছেন বিক্রমদা। দম বন্ধ করে যেন এই রাস্তাটুকু হেঁটে এসেছে শমি। অন্ধকারে মিশে, শব্দ না করে, গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটার কায়দাটা এখন শমিও শিখে গেছে, বিক্রমদার সঙ্গে থেকে থেকে। মেজর পারেখ আর বিক্রমদার কাছে অবশ্য এসব জলভাত! কম্যান্ডো ট্রেনিংয়ে আরও অনেক কঠিন জিনিস শিখতে হয়।

বিক্রমদার নির্দেশে সবাইকে পরতে হয়েছে কালো পোশাক। ঠাণ্ডার মুখে মুখে সাপের ভয় ততটা নেই, তবু পা ঢাকা উঁচু হান্টিং-শু পরে নিয়েছে প্রত্যেকেই।

সকালবেলা অমল গাঙ্গুলির কোয়ার্টার থেকে ফেরার পরেই গোটা দুপুর কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন বিক্রমদা। নিজে থেকে না বললে এই সময় হাজার জিজ্ঞেস করেও কোনও উত্তর মিলবে না, জানে শমি।

তবে এই সুযোগে শমি নিজেও একটু গোয়েন্দাগিরি করে নিয়েছে। উল্টেপাল্টে দেখার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল বলেই অমল গাঙ্গুলির ডায়েরিটা ও দেখে নিয়েছে এই ফাঁকে।

মৃত্যুর আগের দিন ডায়েরিতে কী লিখেছিলেন অমল গাঙ্গুলি? ওটা দেখার জন্যই কৌতূহলে ছটফট করছিল শমি। বিক্রমদা বলেছিলেন, হেঁয়ালি বলে মনে হলেও আসলে মোটেই অর্থহীন নয়। কী

ছিল সেই লেখাতে?

যা দেখেছিল, তাতে যে শমি খুব একটা বুঝতে পেরেছিল, এমন কথা বলা যাবে না। লেখা আছে 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বেশিদূর নয়!' শমি আরও দেখেছিল 'বস্তু' শব্দটাকে আন্ডারলাইন করা হয়েছে। 'তর্কে' শব্দটাকে কেটে দেওয়া হয়েছে। আর পুরো শব্দটার শেষে ব্র্যাকেটে লেখা রয়েছে কিছু দুর্বোধ্য নম্বর। কম্পিউটার বা ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত কি এই নম্বরগুলো?

কিছুই মাথায় ঢুকত না শমির, যদি না বিক্রমদা পেন্সিল দিয়ে 'বিশ্বাস' শব্দটার আগে একটা 'ডঃ' যোগ করতেন। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পুরো বাক্যটা দাঁড়ায় এরকম—'ডঃ বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বেশিদূর নয়।' এর মানে কী এমন দাঁড়ায়—ডঃ বিশ্বাসকে কিছু একটা রাখতে দিয়েছিলেন অমল গাঙ্গুলি? কিন্তু তাহলে পরের শব্দগুলোর মানে কী?

তবে এখন শমির মনে হচ্ছে অমল গাঙ্গুলি ডঃ বিশ্বাসকে কিছু রাখতে দিয়ে থাকলে তা এই জলারই ধারেকাছে কোথাও আছে। সেই 'বস্তু' খুঁজে বের করার জন্যই কি নির্জন জলায় রাতের অভিযান? এখানে আসার আগে বিক্রমদা এত চুপচাপ ছিলেন যে শমি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসাই পায়নি। আর এখন তো কথা বলা যাবে না। যার যা কিছু বলার, সারতে হবে আকারে-ইঙ্গিতে।

জলার কাছে পৌঁছে গেছে শমিরা। হাওয়ায় দুলছে কালো বেতবন। কোনও শব্দ না হলেও যে কানে তালা ধরে যায়, তা এই প্রথম জানল শমি!

একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল ভারি অদ্ভুত শব্দে। প্রতিধ্বনি ভেসে এল। আবার চুপচাপ।

সতর্ক ভঙ্গি বিক্রমদার। কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছেন। শমি এবার শব্দটা পেল। খুব চাপা। ভটভট...ভটভট..., অনেকটা জেনারেটর চললে এমন আওয়াজ হয়। শব্দটা যেন এগিয়ে আসছে। শমির বুকেও এত জোরে ধুকপুক করছে যে মনে হচ্ছে কেউ শুনতে পাবে।

আওয়াজটা এগিয়ে আসছে অন্ধকার বেতবনের আড়াল থেকে। ছলাত... ছলাত শব্দে জল এসে ধাক্কা খাচ্ছে জলার ধারে। মিশমিশে কালো অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটানা এমন শব্দ কতক্ষণ চলেছিল জানে না শমি। হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গেল লাল-নীল নানারঙের আলোয়।

জ্বলে উঠেই নিভে গেল আলোটা।

ফিসফিস করে বিক্রমদা বললেন, 'গেট রেডি পারেখ!'

'ইয়েস বস্।'

দাঁতে দাঁত চেপে বিক্রমদা বললেন, 'শমি, এখান থেকে নড়বি না। যাই হোক...।'

পরের দুটো শব্দেই গা শিরশির করে উঠল শমির। 'যাই হোক' মানে? কী হতে পারে? কীসের আশঙ্কা করছেন বিক্রমদা? শমির হঠাৎ মনে হলো, এখন কলকাতায় আলো-জ্বলা রাস্তায় কত মানুষ, টুকরো কথা, হাসির শব্দ। আর এখানে, শুধু গা ছমছমে অন্ধকার।

একটানা ভটভট আওয়াজটা থেমেছে। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ নানারঙের আলোটা আরেকবার জ্বলল। নিভে যাওয়ার পর ভেসে এল মানুষের গলা। কেউ একটা হিন্দিতে কিছু একটা বলছে। 'কাঁহারে' শব্দটা আলাদাভাবে বুঝতে পারল শমি। কেউ কাশল। বেতবনের আড়াল থেকে এবার জলের মধ্যে ছপছপ শব্দ তুলে কেউ একজন এগিয়ে আসছে।

একজন নয়, দুজন। দুজনেই বেশ লম্বা-চওড়া, অন্ধকারে দেখে মনে হলো পাঠান স্যুট পরে আছে দুজনেই। জল থেকে ডাঙায় উঠে দুজনেই পা থেকে জল ঝাড়ল কিছুক্ষণ ধরে। দুজনেরই হাবভাব বেশ নিশ্চিন্ত ধরনের। আর একটু এগোতে দেখা গেল পেছনের লোকটার হাতে বেঁটে নল-ওয়ালা একটি অদ্ভুত ধরনের অস্ত্র। সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হাতে ছোট অ্যাটাচির মতো জিনিস।

শমিদের উল্টোদিকে গাছের আড়াল থেকে এবার একটি অন্ধকার ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। সামনে দাঁড়ানো পাঠান স্যুটের হাতের অ্যাটাচি চলে গেল সেই ছায়ামূর্তির হাতে। বিনিময়ে কিছু দেওয়া হলো কিনা তা অবশ্য দেখা গেল না এতদূর থেকে। শমি শুধু এটুকু বুঝল ছায়ামূর্তির পিঠ চাপড়ে দিল লম্বা-চওড়া লোকটা।

এরা কারা, কী ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছে না শমি। শুধু এটুকু আঁচ করছে, এরা বিপজ্জনক। আর প্রয়োজনে পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যে এরা নির্মম হতে পারে, তার উদাহরণ তো শমি আগেই পেয়েছে।

ভটভট শব্দটা যে নৌকোর সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। মোটরচালিত নৌকোটি রয়েছে বেতবনের আড়ালে। লোক দুটো ঘুরে দাঁড়াল ফিরে যাওয়ার জন্য।

ঠিক এই সময় যে ঘটনা ঘটল, তার জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না শমি।

প্রথমে আগুন দেখল, তারপর যে চাপা আওয়াজটা হলো সেটা যে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের তা খুব ভাল করেই জানে শমি। যে পাঠান স্যুটের হাতে অস্ত্র ছিল, সে যেন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল জলে। আরেকজনও জলে ঝাঁপাল, কিন্তু সেটা গুলি খেয়ে কিনা বোঝা গেল না।

'কাম অন পারেখ।'

চেঁচিয়ে উঠেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন বিক্রমদা। মেজর পারেখও উঠে পড়লেন নিমেষের মধ্যে।

হতভম্ব শমি বসে আছে। যে গাছের আড়াল থেকে ছায়ামূর্তি বেরিয়েছিল, সেদিকেই ছুটেছেন বিক্রমদারা। গুলির শব্দও এসেছিল ওদিক থেকেই।

ভটভট শব্দটা আবার শুরু হয়েছে। তবে এবার সরে যাচ্ছে দূরে। অন্ধকারে যারা এসেছিল তারা সরে যাচ্ছে আরও দূরে।

বিক্রমদা বলে রেখেছেন 'নড়বি না। যাই ঘটুক।'

'দম বন্ধ করে বসে রইল শমি। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ও আগে কখনও পড়েনি। কোথায় গেলেন বিক্রমদারা? পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর আবার চারদিক জুড়ে নেমে এসেছে কানে তালা ধরানো নৈঃশব্দ্য। রাতচরা পাখিরা আবার ডেকে উঠল। এবার যেন অনেক দূর থেকে।

প্রতিটি সেকেন্ডকে এই সময় মনে হয় এক-একটি ঘণ্টা। বিক্রমদার জন্য চিন্তা হচ্ছে শমির। কেন এভাবে বিপদে জড়িয়ে পড়েন বিক্রমদা? মেজর পারেখকে বলে কয়েক জন নিরাপত্তারক্ষীকে তো অনায়াসেই নিয়ে আসা যেত!

ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ কেটেছে জানে না শমি। চমকে উঠল পিঠে হাত পড়ায়। বিক্রমদা! অন্ধকারে শমি দেখল বিক্রমদা হাসছেন। আস্তে বললেন, 'কীরে, চিন্তা হচ্ছিল?'

চিন্তা হলেও চোখে-মুখে প্রকাশ করা যাবে না। এটাই বিক্রমদার শিক্ষা। বিক্রমদা বলেন, 'যার সঙ্গে টক্কর দিতে নেমেছিস, সে যদি একবার বুঝে যায় যে তুই ভয় পেয়ে গেছিস তাহলেই কিন্তু লড়াইটা অর্ধেক হেরে গেলি।'

শমি ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'গুড। ভেরি গুড।'

'ধরতে পারলে না?'

'নাঃ, ব্যাড লাক। অন্ধকারে যে কোথায় লুকিয়ে পড়ল।' বিক্রমদা তখনও হাসছেন। বললেন, 'চিন্তা নেই। এবার ঠিকই ধরা পড়বে।'

শমি বলল, 'লোকটা মরে গেল?'

অন্যমনস্ক দেখাল বিক্রমদাকে, 'কোন্ লোক?'

সামনে জলার অন্ধকার বেতবনের দিকে হাত তুলল শমি। মাথা নাড়লেন বিক্রমদা, 'ওটাকে পাহারা দেওয়ার জন্যই তো থেকে যেতে হলো। পারেখ গেছে ফোর্স আনতে।'

শমি না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারল না, 'আরও আগেই ফোর্স নিয়ে এলে না কেন? তাহলে তো হাতেনাতেই ধরা যেত।'

'উঁহু। তাহলে ওরা সতর্ক হয়ে যেত।'

'কারা?'

'যারা বিদেশে গোপন সামরিক তথ্য পাচার করছে।'

'অমল গাঙ্গুলি, ডঃ বিশ্বাসকে খুন হতে হলো কি সেজন্যই?'

'এ ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহই নেই। শুধু একটাই খটকা...' আচমকা চুপ করে গেলেন বিক্রমদা। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যদি দেখা যেত তাহলে শমি নিশ্চিত দেখতে পেত বিক্রমদার ভুরু কুঁচকে গেছে।

এখনও কী খটকার কথা বলছেন বিক্রমদা? জানে না শমি। গোপন তথ্য পাচারের জন্য নির্জন অন্ধকার জলাকে বেছে নিয়েছিল অপরাধীরা। তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য খুন হতে হয়েছে অমল গাঙ্গুলি আর ডঃ বিশ্বাসকে। এর মধ্যে আর কী রহস্য দেখতে পাচ্ছেন বিক্রমদা?

॥ ৭ ॥

রাতে শুতে শুতে বেশ দেরি হয়েছিল। ক্লান্ত ছিল, তাই ঘুমোতে বেশি দেরি হয়নি শমির। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল বৃষ্টির শব্দে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝেমধ্যে বাজের শব্দ। শমি দেখেছিল টেবিলল্যাম্প জ্বলছে, বিক্রমদা জেগে আছেন। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল শমি, খেয়াল নেই। ও কি স্বপ্ন দেখেছিল? রাতের অনেক ঘটনাই দিনের আলোয় অচেনা লাগে। অবিশ্বাস্য মনে হয়। যেমন এখন, সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই কেন শমির বৃষ্টির কথা মনে পড়ল? ঝকঝকে রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

'গুড মর্নিং শমি।' হাসছেন মেজর পারেখ। হাতে চায়ের কাপ।

লজ্জা পেয়ে গেল শমি। সবাই উঠে পড়েছে। ও একাই কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল? তড়াক করে উঠে পড়ল শমি। চা নিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং মেজর পারেখ। বিক্রমদা উঠে পড়েছেন?'

পারেখ হাসলেন, 'তোমার দাদা সেই সকালেই বেরিয়েছে। এবার চলে আসবে।'

বিক্রমদা এলেন আরও আধঘণ্টা পর। ততক্ষণে শমি রেডি। পারেখ বললেন, 'নাউ বয়েজ, লেট্স হ্যাভ আওয়ার ব্রেকফাস্ট ফার্স্ট।'

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ভোরে উঠে পড়লেও বিক্রমদাকে দেখে বোঝার উপায় নেই। খেতে খেতে শমিকে বললেন, 'কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, জানিস তো?'

শমি হেসে বলল, 'আমি তো সকালে উঠে ভাবলাম বোধহয় স্বপ্ন দেখেছি।'

বিক্রমদা বললেন, 'স্বপ্ন আর সত্যি ঘটনা কখনও-সখনও এক হয়ে যায়। তখন দুটোকে আলাদা করা যায় না। ঠিক যেমন হয়েছে অমলের ক্ষেত্রে।'

শমি হেসে বলল, 'খটকা?'

'উধাও।' হাসলেন বিক্রমদা, 'এইমাত্র অমলের বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হলো। এবার শুধু একজনের সঙ্গেই কথা বলা বাকি।'

'কে?'

'গিরিশ বর্মন। শীলা বর্মনের স্বামী। ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার দিন প্রোগ্র্যাম-ইনচার্জ ছিলেন ভদ্রলোক।'

গবেষণা কেন্দ্রর কম্পিউটার রুম লম্বায় বেশ বড়। পরপর কম্পিউটার মনিটর, কি বোর্ড। ইঞ্জিনীয়াররা বসে কাজ করছেন। মেজর পারেখ সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'ওয়েল, আই ওয়াজ ইন চার্জ!' গম্ভীর গলার কথাটা বলে যে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর হাইট হবে অন্তত ছয় থেকে সাড়ে ছয় ফুট। যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। রোমশ হাতের থাবাগুলো বিশাল। মোটা গোঁপ, বড় বড় চুল প্রায় কাঁধের কাছে নেমে এসেছে। কিন্তু এতবড় চেহারায় একটাই খুঁত। শমি দেখল ভদ্রলোক বাঁ পা-টা সামান্য টেনে টেনে হাঁটেন।

'মাইসেল্ফ, আই অ্যাম গিরিশ বর্মন।'

ভদ্রলোক যে বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন, সেটা তাঁর হাবেভাবেই স্পষ্ট। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন ভাল লাগল না শমির।

বারবার দুঃখপ্রকাশ করলেন বিক্রমদা। বললেন, 'এই সময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিঃ বর্মন। চলুন কোথাও গিয়ে বসা যাক।'

বেলার দিকে বলেই ক্যান্টিন ফাঁকা। জানলার ধার দেখে চেয়ার টেনে বসলেন বিক্রমদা। কফির অর্ডার দিলেন মেজর পারেখ।

'শীলা বর্মন আপনার স্ত্রী?'

বিক্রমদার প্রশ্নের জবাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বললেন গিরিশ বর্মন।

'সেদিনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?'

গিরিশ বর্মন বিরক্ত মুখে বললেন, 'পুলিশকে আমি যা জানাবার জানিয়েছি। ব্যাপারটায় আমার কোনও হাত ছিল না।'

'আমিও বলছি না আপনার হাত আছে। কিন্তু কম্পিউটারে সেদিনের প্রোগ্র্যাম রেডি করেছিলেন তো আপনিই। তাই কিছুটা হলেও দায়িত্ব কিন্তু থেকেই যায়, তাই না মিঃ বর্মন?'

মাথা নাড়লেন গিরিশ বর্মন, 'সেদিন নয়। তার আগের দিনই এসব কাজ হয়ে যায়। যে সায়েন্টিস্ট প্রোগ্র্যামের দায়িত্বে থাকেন, তিনি আমার প্রোগ্র্যাম চেক করে নিয়ে তবে ফিল্ডে যান। তবে আমার প্রোগ্র্যামে কখনও কোনোদিন ভুল হয়নি। এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'অমল গঙ্গোপাধ্যায় কি সেদিন নিজে চেক করে ফিল্ডে গিয়েছিলেন?'

'না, বোধহয়।' আমতা আমতা করলেন গিরিশ বর্মন।

'আপনিও চেক করেননি?'

'ন্যাচারেলি না। ওই যে বললাম আগের দিনেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল আমার। ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সময় সেটা কোথায় পড়বে সেটা অবশ্য অঙ্ক করে বের করাই থাকে। আমি শুধু সেটা কম্পিউটারে বসিয়ে দিই।'

'আপনার প্রোগ্র্যাম অনুযায়ী ক্ষেপণাস্ত্র পড়ার কথা ছিল জলার মাঝখানে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এবার সেটা যে তিন কিলোমিটার আগেই ভেঙে পড়ল, তার জন্য কাকে দায়ী করবেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন গিরিশ বর্মন, 'আই ডোন্ট নো। আমি আগেই বলেছি, আমার প্রোগ্র্যাম ঠিক ছিল। এখনও সেই একই কথা বলছি।'

'কিন্তু মিঃ বর্মন,...' বিক্রমদার গলা ঠাণ্ডা, কঠিন শোনাল, 'আপনার কম্পিউটার প্রোগ্র্যামে যদি আগেই ভুল না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই পরে কেউ অদল-বদল ঘটিয়েছিল।'

'আই হ্যাভ নাথিং টু সে।'

'বাট আই থিংক ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সামথিং টু সে! দুটোর মধ্যে যে কোনও একটা সত্যি—হয় আপনার প্রোগ্র্যামে গণ্ডগোল ছিল, নয়তো পরে কেউ গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আপনি কোনটাকে ঠিক বলছেন?'

উত্তর দিলেন না গিরিশ বর্মন। মুখ বেঁকিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন।

বলে চললেন বিক্রমদা, 'আমি ধরে নিচ্ছি, আপনার প্রোগ্র্যামে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। পরে কেউ কম্পিউটার খোলে এবং সেই প্রোগ্র্যামে পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটাই প্রশ্ন, প্রত্যেক বিজ্ঞানীর কম্পিউটার প্রোগ্র্যামের জন্য নিজস্ব পাসওয়ার্ড থাকে যা অন্য কারও জানার কথা নয়। তাহলে আপনার পাসওয়ার্ড সে জানল কী করে?'

বিক্রমদা থামলেন। সময় দিলেন গিরিশ বর্মনকে। আবার শুরু করলেন, 'তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, আপনার পাসওয়ার্ড সে জেনে গিয়েছিল, তা হলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কেন আপনি রিড অ্যান্ড রাইট প্রোটেকশন নেননি? যতদূর জানি, কম্পিউটারে গোপন তথ্য রেকর্ড করে রাখার ক্ষেত্রে এই প্রোটেকশন নেওয়া থাকলে পাসওয়ার্ড জানলেও কম্পিউটার খুলে সেই প্রোগ্র্যাম টেনে আনা যায় না।'

গিরিশ বর্মন চুপ। মাথা নামিয়ে শুনছিলেন বিক্রমদার কথা। মাথা যখন তুললেন, শমি স্তম্ভিত হয়ে গেল চোখের চাউনি দেখে। এমন রক্তজলকরা খুনে চাউনি চট করে দেখা যায় না।

গিরিশ বর্মন বললেন, 'আমি জবাব দিতে নিশ্চয়ই বাধ্য নই।'

'না, এখানে বাধ্য নন। তবে আদালতে বাধ্য। এবং আদালতে আরও একটা প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে মিঃ বর্মন।'

থেমে বর্মনের হিংস্র চোখে চোখ রেখে বিক্রমদা বললেন, 'কেন আপনি অমলের ঘরে রাতের অন্ধকারে ঢুকেছিলেন তার জবাবও কিন্তু আপনাকেই দিতে হবে। আপনার পায়ের ছাপে বিশেষত্ব রয়েছে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। আর সেই একই ছাপ জলাতেও পাওয়া গেছে।'

আচমকা রাগে ফেটে পড়লেন গিরিশ বর্মন। চেঁচিয়ে বললেন, 'ইয়েস, আই ওয়েন্ট টু হিজ রুম। কিন্তু কারণটা কি আপনারা জানেন?' থামলেন, প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন বর্মন। সেই হিংস্র দৃষ্টি। নাটকীয়ভাবে গলা নামিয়ে বললেন, 'অমল গাঙ্গুলি একটা চোর। ডু ইউ নো দ্যাট? ও আমার প্রোগ্র্যাম রেকর্ড করা ফ্লপি চুরি করেছিল। ইয়েস, আই ওয়েন্ট টু হিজ রুম টু কালেক্ট মাই কম্পিউটার ফ্লপি।'

'একটা কথা কিন্তু আপনি বললেন না মিঃ বর্মন। সেই ফ্লপিতে রেকর্ড করা ছিল অনেক গোপন সামরিক তথ্য! আর যেটা পাচার করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল রাতের অন্ধকারে নির্জন জলা। আর সেই জলাতেই মৃত্যুর ফাঁদ পাতা হয়েছিল অমলের জন্য।'

'হোয়াট ননসেন্স!'

হাসলেন বিক্রমদা, 'ওই যে বললাম, আপনি এখন জবাব দিতে বাধ্য নন। ওই ফ্লপি খোঁজার জন্য আপনি নির্জন জলায়

ডঃ বিশ্বাসকে ফলো করে গেছেন। হয়তো আমরা সেদিন না গেলে নির্জন জলাতেই হারিয়ে যেতেন ডঃ বিশ্বাস। ঠিক যেভাবে আপনারা সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অমলকে।'

'কী যা-তা বলছেন! আপনি লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি।' টেবিল চাপড়ে উঠে দাঁড়ালেন গিরিশ বর্মন।

বিক্রমদার মুখটা তখনও হাসিহাসি। মজার গলায় বললেন, 'আপনি প্রমাণ চান?'

এই একটা প্রশ্নে দপ্ করে নিভে গেলেন গিরিশ বর্মন। শুকনো মুখে বললেন, 'আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। সেই ফ্লপি আপনি কোথায় পাবেন?'

মাথা নাড়লেন বিক্রমদা, 'ঠিক-ই ধরেছেন। আমি প্রমাণ করতে পারব না। কারণ, ওই ফ্লপি আপনি জোর করে উদ্ধার করেছেন ডঃ বিশ্বাসের কাছ থেকে। আপনি একা নন, সঙ্গে আপনার স্ত্রী-ও ছিলেন। আছে আরও অনেকে। কিন্তু,...'

'কিন্তু কী?' চোখমুখ লাল হয়ে গেছে গিরিশ বর্মনের।

'আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন যে শুধু ওই ফ্লপি সরিয়ে ফেললেই আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর এতদিনের কুকীর্তি চাপা পড়ে যাবে?'

'তার মানে?'

'মানে খুবই সহজ-সরল মিঃ বর্মন। গোপনে আপনাদের তথ্য পাচার ধরে ফেলেছিল অমল। প্রমাণ হিসেবে আপনার একটি ফ্লপি ওকে সরিয়ে ফেলতেও হয়েছিল। আমার ধারণা ফ্লপিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে সেটা রেকর্ডও করে ফেলেছিল অমল। ফ্লপি মুছে দেওয়া যায়, নষ্ট করে দেওয়া যায়। কিন্তু হার্ড ডিস্ককে কীভাবে আপনি নষ্ট করবেন মিঃ বর্মন?'

কুৎসিত হাসি ফুটল গিরিশ বর্মনের মুখে, 'এটা আপনার অনুমান। অমল গাঙ্গুলি হার্ড ডিস্কে স্টোর করে রাখলে সেটাও আর জানা যাবে না—কারণ,...।'

সেদিকেই ছুটেছেন বিক্রমদারা

'কারণ, সব প্রমাণ আপনারা মুছে ফেলতে চেয়েছেন। এমনকী গতকাল রাতে বিদেশী এজেন্টদেরও সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর অমল এবং ডঃ বিশ্বাসকে তো আগেই কৌশলে মেরে ফেলা হয়েছে।—সবদিক থেকেই আপনারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। কি তাই তো?' উঠে দাঁড়ালেন বিক্রমদা। বললেন, 'আপনারা অনেক ভেবেচিন্তে আঁটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিলেন। কোনও প্রমাণও রাখেননি। কিন্তু আপনারা বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন যে অমলের একটি যমজ ভাই রয়েছে।'

বিভ্রান্ত দেখাল গিরিশ বর্মনকে। আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনি কী বলতে চান?'

হাসলেন বিক্রমদা, 'ভাবুন মিঃ বর্মন, ভাবুন। মাথা খাটান। অভিনব পদ্ধতিতে অমলকে মারার রাস্তা বের করেছিলেন। এবার নিজেদের বাঁচার রাস্তাটা খুঁজে পান কিনা দেখুন।'

আর কোনও কথাই বললেন না গিরিশ বর্মন। লম্বা লম্বা বিশাল পা ফেলে ঝড়ের গতিতে ক্যান্টিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিক্রমদা আর মেজর পারেখের মধ্যে চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বেরিয়ে গেলেন মেজর পারেখও।

আড়মোড়া ভাঙলেন বিক্রমদা। আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বুঝলি শমি, এই প্রথম একটা কেসে আমাকে প্রায় কিছু করতেই হলো না! বলতে পারিস একাই অপরাধীদের ধরিয়ে দিল অমলের যমজ ভাই বিমল।'

অধৈর্য গলায় শমি বলল, 'কিন্তু এখানে বিমল আসছে কী করে? ও তো পালিয়ে গিয়েছিল। ও কি ধরা দিয়েছে?'

মুচকি হাসলেন বিক্রমদা, 'ধীরে বৎস ধীরে। সবকিছু একবারে জেনে যাওয়াটা ঠিক নয়। ওতে বদহজম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চলো ওঠা যাক্। আপাতত পারেখের কোয়ার্টারে গিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমাদের কোনও কাজ নেই।'

পাশে হাঁটতে হাঁটতে শমির রীতিমতো রাগ হলো বিক্রমদার ওপর। অকারণে এই সাসপেন্স তৈরি করার অভ্যাসটাকে বাদ দিলে বিক্রমদার বাকি সবই ভাল।

॥ ৮ ॥

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ফোন বাজল ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়। ফোনের পাশেই বসেছিলেন বিক্রমদা। সতর্ক, সংযত ভঙ্গি। এই ভঙ্গিটা খুব চেনা

শমির। এখন বিক্রমদাকে হাজার প্রশ্ন করলেও কোনও জবাব পাওয়া যাবে না। মনে মনে যুক্তির জালকে গুছিয়ে নিচ্ছেন বিক্রমদা।

ফোন তুললেন বিক্রমদা। দু'বার হুঁ, হাঁ বলার পর শেষ করলেন 'এখনই যাচ্ছি' বলে। শমিকে বললেন, 'চল্।'

কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখনও জানে না শমি। সেটা অন্তত জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। ওরা নিচে নেমে দেখল জিপ আসছে। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ভয়ে ভয়ে একবার জিজ্ঞেস করল শমি।

'স্টেশনে।' বলার পর সেই যে চুপ করলেন বিক্রমদা, মুখ খুলেন একেবারে স্টেশনে পৌঁছনর পর।

জিপ গিয়ে দাঁড়াল নিঝুম ওয়েটিং রুমের সামনে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন পারেখ। সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'সব রেডি।'

দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যের সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস আসছে হাওড়ার দিক থেকে। যাবে ভুবনেশ্বর। বালুসারিতে দাঁড়াবে ঠিক দু'মিনিট। ধূ-ধূ ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে কোনও প্যাসেঞ্জারই নেই? অবাক হলো শমি। না, একজন আছে। ওয়েটিং রুম থেকে বেরোচ্ছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। লাঠিতে ভর দিয়ে, হাতে একটি ছোট্ট ব্রিফকেস।

প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে। বিক্রমদা এগিয়ে গেলেন, 'আপনার তো এই ট্রেনে যাওয়া হবে না ডঃ রাউত।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন—কিন্তু নিমেষে তাঁর হাত পেছনে পেঁচিয়ে ধরলেন বিক্রমদা।

মেজর পারেখ এসে টান দিতেই সাদা দাড়ি চলে এল হাতে।

'এসবের মানে কী?' চেঁচিয়ে উঠলেন রাউত।

'মানে এখনই বুঝবেন।' বলে মুখ ঘোরালেন বিক্রমদা, 'আসুন কাকাবাবু, আয় অমল।'

শমি দেখল ট্রেন থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে পাতলা, ছিপছিপে চেহারার চশমা পরা এক যুবক। দুলে উঠল সুপারফাস্ট। সিগনাল সবুজ হয়েছে। মিলিয়ে গেল ট্রেনের জানলায় উঁকিঝুঁকি মারা কৌতূহলী মুখগুলো।

চশমা পরা যুবককে অবাক হয়ে দেখছিল শমি। অমল গাঙ্গুলি তাহলে মারা যাননি?

আবার যাওয়া হলো ওয়েটিং রুমে। সেখানকার বাথরুমে পাওয়া গেল ডঃ রাউতের ছেড়ে যাওয়া জামাকাপড়। জিপে যেতে যেতে বিক্রমদা অমল গাঙ্গুলিকে বললেন, 'প্রথমবার একটা ভুলের জন্য তোর জীবনটাই যেতে বসেছিল। আবার একটা ভুল করতে যাচ্ছিলি।'

সবকিছু গুলিয়ে গেছে শমির। বিশেষ করে অমল গাঙ্গুলিকে দেখার পর। যার মৃত্যুরহস্য সমাধান করতে এতদূর ছুটে আসা—সে কিনা পাশেই বসে আছে?

বিক্রমদা হেসে বললেন, 'এবার ভেবে দ্যাখ, তোকে দেখার পর শীলা আর গিরিশ বর্মনের মুখের অবস্থা কী হবে!'

জিপ চালাতে চালাতে পারেখ হেসে উঠলেন। বললেন, 'এতক্ষণে ওরা লক-আপে।'

মৃদু হাসলেন অমল গাঙ্গুলিও। বললেন, 'তুই ব্যাপারটা বুঝলি কী করে?'

বিক্রমদা বললেন, 'ওই পুঁথিটার জন্য কিছুটা, আর বাকিটা তোর ভাই বিমলের ছেড়ে যাওয়া জামাকাপড় দেখে। তোকে মারার চক্রান্তে যে এখানকার কিছু লোকই জড়িত, তার ইঙ্গিত তো রয়েছে তোর ডায়েরিতেই। সুতরাং সেটা খুঁজে বের করা খুব শক্ত হতো না। ডঃ বিশ্বাসের একটা হেঁয়ালিভরা কথায় আমার প্রথম সন্দেহ হয়। ডঃ বিশ্বাস বলেছিলেন—"যে থাকার সে আছে, যার যাবার সে গেছে।" তোর ডায়েরিতেই দেখেছি, ডঃ বিশ্বাসের সঙ্গেই তোর সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। বর্মন দম্পতি, ডঃ রাউতদের একটা চক্র যে গোপন তথ্য পাচার করছে সেটা জানার পর ডঃ বিশ্বাসকে তুই খবরটা প্রথম জানিয়েছিলি। গিরিশ বর্মনের ফ্লপি সরিয়ে ডঃ বিশ্বাসের কাছে রাখতেও দিয়েছিলি। কিন্তু তুই ভাবতে পারিসনি ওরা জেনে যাবার পর এত তাড়াতাড়ি তোকে মারার চেষ্টা করবে। আসলে তোকে না সরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ওরা নিশ্চিন্তে তথ্য পাচার করতে পারছিল না। আগের দিন রাতে যে বিদেশী এজেন্টদের হাতে তথ্য তুলে দেওয়া হবে, সেই প্রোগ্রাম অনেক আগে থাকতেই ঠিক ছিল। এবার গিরিশ বর্মনের ফ্লপি থেকে তুই খবরটা জেনে যাওয়ার পরেই আর ওরা ঝুঁকি নেয়নি। কি তাই তো?' অমল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়লেন।

বিক্রমদা বলে চললেন, 'ঠিক এরকম পরিস্থিতিতেই একদিন আচমকা উদয় হয় বিমল। ও জানত গোঁপটা কেটে ফেললে আর তোর চশমাটা পরে ফেললে ওকে তোর থেকে আলাদা করা মুশকিল। পুঁথিটা নেওয়ার জন্য মরিয়া বিমল এবার আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তোকে ঘুমন্ত অবস্থায় বেঁধে ফেলেছিল। ওর প্ল্যান ছিল অমল সেজে পুঁথিটা নিয়ে পালাবে। কারণ এখানে ঢুকতে এবং বেরোতে গেলে পাস লাগে। সেই পাসে তোর সই না থাকলে যে ওকে আটকে দেবে তা ও জানত। আগের দিন রাতে বিমল শুনেছিল সকালে গাড়ি আসবে তোকে জলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবার বাকিটা তোর মুখ থেকেই শোনা যাক্।'

অমল বললেন, 'বেচারা বিমল। প্রথমে আমার জন্য পাঠানো বিষ মেশানো ব্রেকফাস্ট খায়, ও জানত না একটার পর একটা ফাঁদ পাতা রয়েছে আমার জন্য। ঘুম ভেঙে যখন দেখলাম ও আমাকে বেঁধে রেখে পুঁথিটা নিয়ে পালাচ্ছে তখন সত্যি কথা বলতে কী, খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম বাবার কাছে কীভাবে মুখ দেখাব। তারপর বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল। ততক্ষণে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছি। দেখলাম দৌড়োদৌড়ি চলছে। হইচই কানে এল। এমনকী পরে বিমলের বডি নিয়ে আসা হলো 'আমি'

ভেবে! জানলার ফাঁক দিয়ে তাও দেখেছি। আসলে তখন তো আর কেউ আমার ঘরে আসার কথা ভাবেনি। তাই লুকিয়ে থাকতে পেরেছিলাম। পরে রাতের অন্ধকারে পালালাম। বুঝতে পেরেছিলাম ওরা আমাকে যেমন করেই হোক খুন করবে। তাই আর ঝুঁকি নিইনি। তিন-চার দিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরি। ভেবেছিলাম ভালই হলো, ওরা জানবে আমি মৃত, নতুন ভাবে জীবন শুরু করব। তারপর আবার মনে হলো, এটা কাপুরুষের মতো আচরণ হয়ে যাবে। বিশেষ করে যারা দেশের গোপন তথ্য বাইরে পাচার করছে, তাদের এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তবু মনস্থির করতে করতে আরও দু'-একটা দিন কাটল। বাইরে থেকে ফোন করলাম ডঃ বিশ্বাসকে। ওটাই ভুল হলো। ডঃ বিশ্বাস এমনিতেই আবেগপ্রবণ মানুষ। তাঁকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। ডুমুরদহ জলায় একটা গাছের কোটরে গিরিশ বর্মনের ফ্লপিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। ডঃ বিশ্বাসকে বলেছিলাম ওটা আপনার কাছে যত্ন করে রেখে দিন। ভুল করে ডঃ বিশ্বাস সরাসরি কথা বললেন ডঃ রাউতের সঙ্গে। ডঃ রাউত যে পাচারচক্রের নেতা, তা আর উনি জানবেন কী করে? ব্যস, তাঁকে খুন হতে হলো। তারপর বাড়িতে বাবাকে ফোন করে জানতে পারলাম কেসটা তুই টেক-আপ করেছিস। তারপর যখন এখানে আসার প্ল্যান করছি তখনই তো সকালে তোর ফোন গেল।'

বিক্রমদা বললেন, 'শেষটা এত নাটকীয় করে তোলার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য অবশ্যই ডঃ রাউতের। গিরিশ বর্মনকে জেরা করার সময় একটা ছোট্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলাম তোর যমজ ভাই বিমল সম্পর্কে। ডঃ রাউত সেটা শোনার পরেই প্রখর বুদ্ধিতে বুঝে নিয়েছিল কিছু একটা বড়সড় গণ্ডগোল হয়ে গেছে কোথাও। তোর খাবারে আর্সেনিক দেবার বুদ্ধিটাও ডঃ রাউতেরই। ডাক্তার হিসেবে ও জানত আর্সেনিক কতক্ষণে কাজ করবে। ও ঠিক করেছিল পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট চেপে দিয়ে তোর মৃত্যুকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখাবে। বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ডঃ বিশ্বাস। তাই তাঁকে মরতে হলো। আর তোর জন্য পাতা মৃত্যু-ফাঁদে পা দিয়ে বিমল ওদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে দিল।'

বিক্রমদা থামলেন। দম নিয়ে বললেন, 'এই চক্রে আর কারা জড়িত সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব এবার পারেখদের।' বিক্রমদা ঘুরলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। নরম গলায় বললেন, 'বিমল যেভাবে প্রাণ দিয়ে অমলকে বাঁচিয়ে দিল, তাতে ওর সারাজীবনের অপরাধকে ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে। তাই না কাকাবাবু?'

বিক্রমদার কথায় সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না। শুধু শমি পাশে ছিল বলে খেয়াল করল, নীরবে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে বৃদ্ধর গাল বেয়ে।

ছবিঃ অরিজিৎ দত্তচৌধুরী

ব্যস্ত তুমি ব্যস্ত আমি

অশোক সী

তোমায় দাদা দেখতে এলুম
অনেক দিনের পর বটে,
খোঁজ-খবরটা আগের মতন
এখন কী আর রোজ ঘটে!
ব্যস্ত তুমি ব্যস্ত আমি
ব্যস্ত নানান ঝঞ্ঝাটে,
আগের মতন সময় কোথা
তাই উঠেছে সব লাটে!
বলছি কী এই পরশু দিনের
কথাই দাদা কই ধরো,
আসছিলাম তো তোমার কাছেই
বিশ্বাস করো কী নাই করো!
তিন সত্যি করছি দাদা
বেরিয়েছিলাম সত্যি হে,
পড়লো মনে জরুরী কাজ
ঠিক রাস্তার মধ্যি যে!
ইলেকট্রিকের বিল যে দেওয়ার
সেদিন ছিলো লাস্ট ডেট-ই,
তোমার কাছে হলো না আসা
আটকে গেনু সেই ঠেক-ই!

রাখিনি কাজ আজকে দাদা
বুঝলে তা এই ফাঁকতালে,
তোমার খবর-টবর নিতেই
এলাম যে এই সক্কালে!
আরে আরে! দাঁড়াও দাঁড়াও!
তোমার হাতে ব্যাগ নাকি?
আমারও তো পড়লো মনে
বাজার করার কাজ বাকি!
আসার সময় বাড়ির থেকে
গছিয়ে দিলো ব্যাগটা যে,
গুছিয়ে রেখে পকেটে তা
ভুলেই গেছি কাজটা হে!
আর কথা নয়! চলি দাদা
আসবো পরে এক সময়,
ব্যস্ত তুমি ব্যস্ত আমি
দেখার সময় তাই কী হয়?

ছবিঃ সুফি

অদ্ভুত যত ভূত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ছোটমামার সঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে যাচ্ছিলুম। ছোটমামার ছিপটা বড় মাছধরা হুইল। আর আমারটা নেহাত পুঁটিধরা কঞ্চির ছিপ। বঁড়শিও খুদে।

ভাদ্র মাসের দুপুর বেলা। কদিন বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। ঝলমলে রোদে গাছপালা ঝোপঝাড়ে সবুজ রঙের জেল্লা বেড়েছে। আমার মনও খুশিতে চঞ্চল। ছোটমামা বলেছেন, বুঝলি পুঁটু? আজ থেকে তোর ট্রেনিং শুরু। তোর ডাকনাম পুঁটু। তাই দেখবি, পুঁটিমাছেরা তোর বঁড়শির সঙ্গে ভাব জমাতে ভিড় করবে। ওরা কিন্তু বড্ড চালাক। ফাতনা নড়লেই ছিপে খ্যাঁচ মারবি।

খ্যাঁচ কী মামা?

ধুর বোকা! খ্যাঁচ বুঝিস না? ঠিক আছে। তোকে হাতেকলমে শিখিয়ে দেব।

গ্রামের শেষদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেখানে আদ্যিকালের ভাঙা শিবমন্দির ঘিরে প্রকাণ্ড বটগাছ এবং ঝোপজঙ্গল গজিয়েছে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল মোনা ওঝার সঙ্গে।

মোনার মাথায় জটা। মুখে গোঁফ-দাড়ি। ওপর পাটির একটা দাঁত ভাঙা। তাই গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে দগদগে সিঁদুরের ঘটা সত্ত্বেও হাসলে তাকে খুব অমায়িক ও সরল মানুষ মনে হয়। কিন্তু যখন সে গম্ভীর হয়ে থাকে, তখন তাকে দেখলে বড্ড গা ছমছম করে। তার চোখ দুটো যে বেজায় লাল!

মোনা ওঝা আমাদের দেখে কেন কে জানে ফিক করে হাসল। তারপর বলল, ছোটবাবু, ভাগনেকে সঙ্গে নিয়ে ছিপ ফেলতে বেরিয়েছেন বুঝি? ভালো! তা কোথায় ছিপ ফেলবেন?

ছোটমামা বললেন, সিঙ্গিমশাইয়ের মাঠপুকুরে।

মোনা বলল, ওই পুকুরে আর মাছ আছে নাকি? এই তো গতমাসে সিঙ্গিমশাই জেলেদের সব মাছ বিক্রি করে দিয়েছেন। সারাদিন জাল ফেলে-ফেলে জেলেরা মাছের ছানাপোনাসুদ্ধ ছেঁকে তুলে নিয়েছে।

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, সে কী মোনাদা! সিঙ্গিমশাইয়ের কাছে আজ সকালে যখন ছিপ ফেলার জন্য পারমিশন চাইতে গেলুম, উনি বললেন, দুটোর বেশি ধরো না যেন।

মোনা ওঝা হেসে কুটিকুটি হলো। মিথ্যে! একেবারে মিথ্যে! বুঝলেন ছোটবাবু? চোরের জ্বালায় মাত্র আড়াইশো-তিনশো গ্রাম ওজন হলেই

পোনামাছগুলো বিক্রি করে দেন সিঙ্গিমশাই। তাছাড়া আপনার হুইলে ধরার যোগ্য মাছ কি ওখানে কখনও ছিল? তবে হ্যাঁ। এই খোকাবাবুর ছিপে ধরার মতো পুঁটিমাছ থাকলেও থাকতে পারে।

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, মিথ্যুক! হাড়কেপ্পন! আমাকে খামোকা হয়রান করল! টাউন থেকে শখ করে এত দামী হুইল কিনে আনলুম। সকাল থেকে কতরকমের চার আর টোপ তৈরি করলুম!

মোনা বলল, এক কাজ করুন ছোটবাবু! একটু কষ্ট করে দোমোহানির ঝিলে চলে যান। ঝিলে কিন্তু প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মাছ আছে। ঝাঁপুইহাটির কালীবাবু এই তো দু'হপ্তা আগে একটা পাঁচ কেজি রুই তুললেন। আমার চোখের সামনে, ছোটবাবু! মা কালীর দিব্যি!

ছোটমামা একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, কিন্তু বড্ড দূরে যে!

দূর কী বলছেন? নাক বরাবর ধানক্ষেতের আল ধরে হেঁটে গিয়ে ওই বাঁধে উঠুন। মাত্র আধঘণ্টা হাঁটতে হবে। বলে মোনা আমার দিকে তাকাল। কী খোকাবাবু? যেতে পারবে না মামার সঙ্গে?

কী আর বলব? মাথাটা একটু কাত করলুম শুধু। পুঁটিমাছ ধরার ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠেছে যে!

ছোটমামা হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন, আয় পুঁটু! মোনাদা ঠিকই বলেছে। মাছ পাই বা না পাই, একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাক্ না। তা ছাড়া তোর ট্রেনিংটা ওইরকম ঝিল জঙ্গলে শুরু করাই উচিত।

ছোটমামাকে অনুসরণ করলুম। পিছন থেকে মোনা ওঝা বলল, তবে একটা কথা ছোটবাবু! সূর্য ডোবার পর আর ওখানে কিন্তু থাকবেন না। সঙ্গে খোকাবাবু আছে বলেই সাবধান করে দিলুম।

ছোটমামা বললেন, ছাড় তো বুজরুকের কথা। আমরা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি। তাই না পুঁটু?

ওঁর কথায় অগত্যা সায় দিতেই হলো। যদিও মোনা ওঝার কথাটা শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল।...

বাঁধের নিচে ঝিলটা বাঁকা হয়ে একটু দূরের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু ছিপ ফেলার মতো ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল না। ঝিলে ঘন দাম, পদ্ম আর শালুক ফুলের ঝাঁক। কোথাও শোলাগাছ গজিয়েছে দামের ওপর। ছোটমামা অনেক খোঁজাখুঁজি করে ছিপ ফেলার মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা আবিষ্কার করলেন। তারপর বললেন, বুঝলি পুঁটু? এখানেই ঝাঁপুইহাটির কোন কালীবাবু ছিপ ফেলেছিলেন মনে হচ্ছে। এই দ্যাখ, একটুকরো ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে। হুঁ! সিগারেটের ফিল্টারটিপও অজস্র। কালীবাবু খুব সিগারেট খান বোঝা যাচ্ছে।

ঝিলের উত্তর পাড়ে এই জায়গাটা ছায়ায় ঢাকা। কারণ বাঁধে একটা বটগাছ আছে। তার লম্বা ডালপালা ঝিলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ছোটমামা ঝটপট চার ফেলে ছিপ সোজা রাখার জন্য ঝোপ থেকে একটা আঁকশির মতো ডাল ভেঙে আনলেন। এক হাঁটু জলে নেমে সেটা কাদায় পুঁতে বললেন, তোর ছিপটা ছোট্ট তো! ওটা হাতে ধরে থাকতে পারবি। আমারটা যে হুইল ছিপ। ডগাটা আঁকশির মাথায় রাখলে তবে ছিপটা সোজা থাকবে।

মাঝে মাঝে শিরশিরে বাতাস বইছিল। রোদে হাঁটার কষ্টটা শীগগির দূর হয়ে গেল। মামা-ভাগনে দুজনে দুটো ছিপ ফেলে বসে রইলুম। ঝিলের ওপারে ঘন বাঁশবন। সেখানে একঝাঁক পাখি তুমুল হল্লা করছিল। জলমাকড়শারা জলের ওপর তরতরিয়ে ছোটাছুটি করছিল। একটা লাল গাঙফড়িং ছোটমামার ছিপের ফাতনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করছিল। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে একটা জলপিপি পাখি পিঁ পিঁ করে ডাকতে ডাকতে দূরে ঝিলের জলে কোথাও বসল।

এতক্ষণে মনে পড়ল, ছোটমামা আমাকে 'খ্যাঁচ মারা' শেখাবেন। কিন্তু কথাটা তুলতেই উনি চাপা স্বরে বললেন, আমার চারে মাছ এসে গেছে। বুজকুড়ি দেখতে পাচ্ছিস না? মাছটা টোপ খেলেই আমি ছিপটা যেভাবে জোরে তুলব, সেটাই খ্যাঁচ। তুই লক্ষ্য রাখিস।

আমার ছিপের ফাতনা দু'বার কেঁপে আবার স্থির হয়ে গেল। 'খ্যাঁচ মারা' ব্যাপারটা না দেখা পর্যন্ত কী আর করা যাবে?

কিছুক্ষণ পরে দেখি, ছোটমামার ছিপের ফাতনা নড়তে শুরু করেছে। ছোটমামা ছিপের হুইলবাঁধা গোড়ার দিকটা চেপে ধরে নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তারপর ফাতনাটা যেই ডুবে গেল, অমনি ছোটমামা জোরে ছিপটা তুলে ফেললেন। সাঁই করে একটা শব্দ হলো। কিন্তু কী অবাক! ছোটমামার বঁড়শিতে বিঁধে যে জিনিসটা ছিটকে আমাদের পেছনে গিয়ে পড়ল, সেটা তো মাছ নয়!

ছোটমামা ছিপ ফেলে এক লাফে পেছনে বাঁধের গায়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারপর ফ্যাসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন, কী সর্বনাশ! এটা দেখছি একটা মড়ার খুলি!

কথাটা শুনেই আমি ওঁর কাছে চলে গেলুম। ছোটমামা একটা শুকনো কাঠি দিয়ে বঁড়শি ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, কোনো মানে হয়?

খুলিটা দেখেই আমার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। তারপর দেখি, খুলিটা লাফাতে লাফাতে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোটমামা গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে আছেন। আমি তো ভয়ের চোটে এমন ভ্যাবলা হয়ে গেছি, যেন আমার পা দুটো মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকানো।

ছোটমামা বিড়বিড় করছিলেন, এ কী রে পুঁটু? এ কী রে! এ কী হচ্ছে? অ্যাঁ?

তারপর দেখলুম খুলিটা লাফাতে লাফাতে গিয়ে জলে পড়ল। জলের ওপর কিছুদূর পর্যন্ত বুজকুড়ি উঠে সেগুলো ভেঙে গেল। ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন, এ কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বল্ তো পুঁটু?

বললুম, ছোটমামা! আমার বড্ড ভয় করছে। চলুন। আমরা এখান থেকে এখুনি চলে যাই।

ছোটমামার এই এক স্বভাব। হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন। বললেন, ধুস্! একটা মড়ার খুলি দেখে ভয় পাব আমরা? কী বলিস পুঁটু? বলেছিলুম না

আমরা অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি?

বলে উনি আবার বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেললেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলি তো 'খ্যাচ মারা' কাকে বলে?

তারপর বসে আছি তো আছি। কিন্তু আর ফাতনা নড়ে না। আমি জলের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাতে গিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি। কে জানে বাবা! এবার যদি আমার বঁড়শিতে টোপ খেতে আসে খুলিটা!

তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, মড়ার খুলিটা একেবারে জ্যান্ত।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমাদের বাঁদিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর কে ভরাট গলায় বলে উঠল, তারা তারা তারা! তারা তারা তারা! ব্রহ্মময়ী মাগো!

আমরা চমকে উঠে ঘুরে বসেছিলুম। দেখলুম, মোনা ওঝার মতোই জটাজূটধারী একটা মাথা ঝোপের ওপর দেখা যাচ্ছে। তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন এক সাধুবাবা। পরনে হাঁটু অব্দি পরা লাল কাপড়। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে কমণ্ডলু। তিনি অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন, বাড়ি কোথায় গো তোমাদের?

ছোটমামা বললেন, বাবুগঞ্জ।

অতদূর থেকে তোমরা এখানে ছিপ ফেলতে এসেছ? ভালো করোনি।

কেন বলুন তো?

এটা শ্মশানকালীর এলাকা। ওই দেখছ ঘন গাছপালা। সেখানেই মায়ের মন্দির। তার পাশে শ্মশান। তোমরা এখানে বেশিক্ষণ থেকো না বাবারা!

ছোটমামা হাসতে হাসতে বললেন, আপনি যা-ই বলুন সাধুবাবা! একটা মাছ না ধরে এখান থেকে নড়ছি না।

ওরে পাগল! এ ঝিলে আর মাছ কোথায়? যা দু' চারটে ছিল, কবে মারা পড়েছে।

মাছ না পাই, মড়ার খুলিই বঁড়শি বিঁধিয়ে তুলব।

সাধুবাবা চমকে উঠে বললেন, তার মানে? তার মানে?

ছোটমামা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে একটা জ্যান্ত মড়ার খুলি টোপ খাচ্ছিল। এক খ্যাঁচ মেরে তাকে ডাঙায় তুললুম।

তারপর? তারপর?

খুলিটা থেকে বঁড়শি ছাড়িয়ে নিতেই ওটা লাফাতে লাফাতে জলে গিয়ে পড়ল।

তোমরা তবু ভয় পেলে না?

ছোটমামা বললেন, নাহ্। আমরা অ্যাডভেঞ্চারে এসেছি যে সাধুবাবা! আমাদের অত সহজে ভয় পেলে চলে?

সাধুবাবা চাপা স্বরে বললেন, কিন্তু তোমরা কি জানো ওই খুলিটা কার?

ছোটমামা তাচ্ছিল্য করে বললেন, তা কেমন করে জানব? জানার দরকারই বা কী?

সাধুবাবা গম্ভীর মুখে বললেন, দরকার আছে। ওই খুলিটা পাঁচু নামে একজন চোরের। তোমরা তার নাম শোনোনি মনে হচ্ছে। পাঁচু ছিল এই তল্লাটের এক ধূর্ত সিঁদেল চোর। সে অনেকদিন আগেকার কথা। একরাত্রে পাঁচু গেরস্থবাড়িতে সিঁদ কাটতে বেরিয়েছে। এমন সময় পড়বি তো পড় একেবারে বঙ্কু দারোগার মুখোমুখি। বঙ্কুবিহারী ধাড়া ছিলেন দুঁদে দারোগা। পাঁচুকে দেখে তিনি টর্চ জ্বেলে 'পাকড়ো পাকড়ো' বলে তাড়া করলেন। তাঁর সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিল। তারাও পাঁচু চোরকে তাড়া করল। তারপর ঠিক এইখানে এসে যখন পাঁচুকে তিনজনে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছেন, অমনি পাঁচু লাফ দিয়ে ঝিলের জলে পড়ল। দারোগা পিস্তলের গুলি ছুঁড়লেন। তখন পাঁচু জলে ডুব দিল।

ছোটমামার মন ফাতনার দিকে। শুধু বললেন, হুঁ।

গল্পটা আমি মন দিয়ে শুনছিলুম। তাই বললুম, তারপর কী হলো সাধুবাবা?

সাধুবাবা শ্বাস ছেড়ে বললেন, পাঁচু ডুব দিল তো দিল। আর মাথা তুলল না। তখন দারোগাবাবু দুই কনস্টেবলকে পাহারায় রেখে থানায় ফিরে গেলেন। রাত পুইয়ে সকাল হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় পাঁচু? আসলে কী হয়েছিল জানো? ঝিলের জলের তলায় ঘন দাম আর শ্যাওলা আছে। বেচারা পাঁচু তাতে আটকে গিয়ে আর মাথা তুলতে পারেনি। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়েছিল।

এবার ছোটমামা বললেন, তারপর জেলে ডেকে এনে জাল ফেলে পাঁচুর মড়া তোলা হয়েছিল বুঝি?

সাধুবাবা হাসলেন। ওরে পাগল! দেখতে পাচ্ছ না ঝিলের জলের অবস্থা? কত দাম, শ্যাওলা আর কত রকমের জলজ উদ্ভিদ! জাল ফেললে সেই জাল কি আর তোলা যেত? ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে যেত না? তাই কোনো জেলেই জাল ফেলতে রাজী হলো না। পাঁচুর মড়া জলের তলায় আটকে রইল। তারপর এতদিনে তার খুলিটা তোমাদের বঁড়শিতে আটকে গিয়েছিল। বুঝলে তো?

ছোটমামা আনমনে আবার বললেন, হুঁ।

সাধুবাবা বললেন, তো শোনো বাবারা! আবার যদি পাঁচুর খুলি তোমাদের ছিপে ওঠে, তাহলে খুলিটা আমাকে দিয়ে যেয়ো। কেমন? ওই যে দেখছ জঙ্গল! ওর মধ্যে আছে শ্মশানকালীর মন্দির। ওখানে আমাকে পেয়ে যাবে। খুলিটার বদলে আমি তোমাদের একটা মন্ত্র শিখিয়ে

দেব। সেই মন্ত্র পড়ে বঁড়শিতে ফুঁ দিলেই তোমরা প্রচুর মাছ ধরতে পারবে। যাই হোক, এখন আমি যাই। মায়ের পুজোর সময় হয়ে এল।

বলে সাধুবাবা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ‘তারা তারা তারা’ বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ততক্ষণে দিনের আলো কমে এসেছে। গাছপালায় পাখিদের হল্লা গেছে বেড়ে। ছোটমামাকে বলতে যাচ্ছি, এবার বাড়ি চলুন ছোটমামা—এমন সময় ছোটমামার হুইল ছিপের ফাতনা আচমকা ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা খ্যাঁচ মারলেন। আর অবাক হয়ে দেখলুম, আবার সেই মড়ার খুলিটা আমাদের পিছনে ঝোপের ভেতরে ছিটকে পড়ল। ছোটমামা দৌড়ে গিয়ে এবার খুলিটা চেপে ধরলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, এবার? এবার কী করে পালাবে বাছাধন?

বললুম, ছোটমামা! চলুন। খুলিটা সাধুবাবাকে দিয়ে আসবেন।

তাই চল্। বলে ছোটমামা পা বাড়ালেন।

বললুম, ছিপ দুটো পড়ে রইল যে?

থাক্ না। ফেরার সময় নিয়ে যাব।

ঝোপঝাড়ের পর উঁচু উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল। এখনই জঙ্গলের ভেতর আবছা আঁধার জমেছে। ছোটমামা বললেন, পুঁটু! শ্মশানকালীর মন্দির তো দেখতে পাচ্ছি না!

এই সময় কানে এল কারা চাপা স্বরে কথা বলছে। ছোটমামা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দেখলুম, খানিকটা খোলামেলা জায়গায় চারজন লোক একটা খাটিয়া নিয়ে বসে আছে। খাটিয়াতে একটা মড়া।

খুলি হাতে নিয়ে ছোটমামা যেই বলেছেন, এখানে শ্মশানকালীর মন্দিরটা কোথায় বলতে পারেন? অমনি লোকগুলো লাফ দিয়ে উঠে ‘ওরে বাবা! এরা আবার কারা?’ বলে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল। ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, যা বাবা! ওরা হঠাৎ অমন করে পালিয়ে গেল কেন? এই খুলিটা দেখে ভয় পেল নাকি?

তারপর তিনি মড়ার খাটিয়ার কাছে গেলেন। গলা অব্দি চাদর ঢাকা মড়ার মাথাটা বেরিয়ে আছে। ছোটমামা বললেন, বেশ শৌখিন লোক ছিল মনে হচ্ছে। বুঝলি পুঁটু! চুলগুলোর কেতা দেখছিস? চোখে সোনালি ফ্রেমের দামী চশমা। গোঁফটার কেতাও আছে। দেখে কিন্তু মড়া বলে মনেই হয় না! আমার ধারণা হার্ট অ্যাটাকে মারা পড়েছে। আহা! এমন শৌখিন লোকের মারা যাওয়া উচিত হয়নি!

ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি এটা শ্মশান। এখানে-ওখানে চিতার পোড়া কাঠ আর ছাই। ভাঙা কলসিও পড়ে আছে। এই মড়াটার জন্য কোনো কাঠের পাঁজা দেখতে পেলুম না। খাটিয়ার কয়েক হাত দূরে ঝিলের জল আবছা দেখা যাচ্ছিল। মনে হলো, লোকগুলো মড়াপোড়ানো কাঠের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু একটা খুলি দেখে ওরা অত ভয় পেল কেন?

ছোটমামা মড়াটা দেখতে দেখতে আনমনে বললেন, কিন্তু শ্মশানকালীর মন্দিরটা কোথায়?

তারপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ছোটমামার হাত ফসকে খুলিটা ঠকাস করে খাটিয়ার মড়ার নাকের ওপর পড়ল। অমনি মড়াটা আর্তনাদ করে উঠল, উহু হু হু! গেছি রে বাবা! গেছি! তারপর লাফ দিয়ে উঠে খুলিটা দেখামাত্র জ্যান্ত মানুষের মতো দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল। আবছা আলোয় দেখলুম, পরনে ধুতি, গায়ে নকশাদার সিল্কের পাঞ্জাবি। ছোটমামাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললুম, ছোটমামা! ছোটমামা! আমার বড্ড ভয় করছে।

ছোটমামা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খুলিটা চেপে ধরলেন। কারণ এই সুযোগে খুলিটা আবার পালিয়ে যাচ্ছিল।

এতক্ষণে সেই সাধুবাবার কণ্ঠস্বর কানে এল। তারা! তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী মা গো!

তারপর একটু তফাতে গাছের ফাঁকে আগুনের আঁচ দেখতে পেলুম। ছোটমামাকে সেটা দেখিয়ে দিলুম। উনি হন্তদন্ত হয়ে সেদিকে এগিয়ে চললেন। গাছপালার ভেতর একটা জরাজীর্ণ মন্দির দেখা গেল। তার উঁচু চত্বরে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন সেই সাধুবাবা।

ছোটমামা বললেন, সাধুবাবা! সাধুবাবা! এই নিন পাঁচু চোরের খুলি।

সাধুবাবা ঘুরে খুলিটা দেখে সহাস্যে বললেন, পেয়েছিস ব্যাটাচ্ছেলেকে? দে! শীগগির দে!

ছোটমামা খুলিটা দিতে যাচ্ছেন, আবার সেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ছোটমামার হাত ফস্কে খুলিটা সজোরে গিয়ে সাধুবাবার বুকে পড়ল। সাধুবাব চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করলেন, উ হু হু! গেছি রে বাবা! গেছি!

তারপর দেখলুম, তাঁর জটার পেছনে আগুন ধরে গেছে। কারণ তিনি জ্বলন্ত ধুনির ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। জটায় আগুনের আঁচ টের পেয়ে সাধুবাবা লাফ দিয়ে চত্বর থেকে নেমে দৌড়ে গেলেন। তারপর আবছা আঁধারে ঝপাং করে জলের শব্দ হলো। বুঝলুম, সাধুবাবা আগুন নেভাতে ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়েছেন।

এদিকে খুলিটাও সুযোগ বুঝে গড়াতে শুরু করেছে। ছোটমামা খুলিটা ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারছিলেন না। ওটা কখনও লাফিয়ে-লাফিয়ে এগোচ্ছে, কখনো গড়িয়ে চলছে। আমরা যেখানে ছিপ ফেলেছিলুম, সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই জলের ভেতর থেকে একটা কংকালের দুটো হাত ভেসে উঠল এবং খুলিটা লুফে নিয়ে আবার জলে ডুবে গেল। এতক্ষণে ছোটমামা ভয় পেয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, পুঁটু রে! আর এখানে থাকা ঠিক নয়। ছিপ তুলে নে। মোনা ওঝা ঠিকই বলেছিল রে!

দুজনে ঝটপট ছিপ গুটিয়ে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাঁধের ওপর উঠলুম। তারপর বাঁধের পথে বাড়ি ফিরে চললুম। কিছুদূর চলার পর ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, সবই হলো রে পুঁটু। সাধুবাবার কাছে মাছধরা মন্ত্রটা শেখা হলো না।...

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

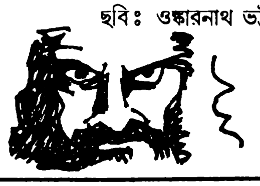

জীবরামের

মামার মামার মামার গল্প

হিমানীশ গোস্বামী

তোমরা মামার বাড়ির গল্প অনেক শুনেছ নিশ্চয়। সেসব এখন কেবলই গল্পকথা—এখন মামাদের সংখ্যাও কত কমে গেছে। দুঃখের কথা, এখন অনেকের মামা নেই, মেসো নেই, মাসি নেই, এমনকি কাকা-পিসিরও সংখ্যা কমে গেছে। এদিকে জীবরাম কিন্তু এ-ব্যাপারে খুবই ভাগ্যবান। তার মামা আছে, মামার মামা আছে, আবার মামার মামার মামারও সন্ধান পেয়েছে সে শিলিগুড়িতে গিয়ে। শিলিগুড়িতে ওর মামার মামা বললেন, ওরে শুভংকর, তোরা একটু ভুটানে যা তো, ওখানে মিতুন মামার খুব অসুখ, খবর এসেছে। বাড়িতে কেউ নেই, তুই আর জীবরাম ওখানে চলে যা। গিয়ে একটু মিতুন মামাকে সেবা করে আয়।

মামার মামাই জীবরামকে বেশ মজায় রেখেছিল। এবারে মামার মামার মিতুন মামার কথা শুনে প্রথমে সে বিকটভাবে হাসল। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! মামার মামার মামা! সে ভুটানে যাওয়ার কথায় খুশি হয়ে উঠল খুবই। ভুটানের কাছে গেছে সে। জলঢাকা নদী পেরিয়ে খানিকটা ঢুকেছে ভুটানের ভেতরে। তবে

বেশি দূর নয়। এবারে একেবারে থিম্পু! আর সঙ্গে থাকবে তার মামা শুভংকর! এর চাইতে মজাদার আর কি হতে পারে! সঙ্গে থাকবে ক্যামেরা আর একরাশ গোয়েন্দা কাহিনী। আর তারা ঘুরে বেড়াবে পথে পথে জঙ্গলে জঙ্গলে। কিন্তু মিতুন মামার অসুখ যে। আবার সেবা করা! ঐ শুনেই তো জীবরাম আর শুভংকরের মুখ শুকিয়ে গেল। সেবা করার কায়দা-কানুন তাদের জানা নেই। তবে এটা জানে সে ভারি হাঙ্গামার ব্যাপার আর বিরক্তিকর। ছুটির আনন্দ একেবারে মাটি না হলেও অনেকটাই মাটি!

হাসিমুখেই থাকে থাপা। জিপ চালায় চমৎকার—আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ বেয়ে জিপ যখন চলে তখন তীব্র একটা আনন্দ অনুভূতি হয়। ঐ রকম আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথেও থাপা তার ওস্তাদি দেখানোর জন্যই বোধহয় মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং হুইল থেকে দুটো হাতই ছাড়িয়ে নেয়। সে সময় শুভংকর আর জীবরাম ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। তবে অন্য সময় থাপা বেশ চমৎকার সঙ্গী। ওর বাংলা শেখার ব্যাপারে ভারি মুশকিলও হয়। আসল কথাটা অনেক সময়েই বোঝা দায় হয়ে ওঠে। ওর বাংলা যে কত উদ্ভুট্টি ধরনের হতে পারে তার একটা প্রমাণ দিই। একবার ওকে দিনাজপুর থেকে চার বস্তা চাল আনতে বলা হয়েছিল। আসল দিনাজপুর নয়, দিনাজপুর সীমান্ত। পশ্চিম বাংলা থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে রোজ বেশ কিছু চাল চালান যায়। বিহার থেকে এক রকম প্রায় লাল রঙের চাল আসে সেটা সব সময় পাওয়া যায় না—চালের রং প্রায় লাল। খেতেও চমৎকার, দামও অনেক বেশি। তা জীবরামের মামার মামারা বছরে একবার ঐ রকম চাল কয়েক বস্তা বাংলাদেশে যাওয়ার আগেই ওখান থেকে কিনে নেন। হরি ঘোষ ঐ সীমান্ত অঞ্চলের একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর চালের ব্যবসা তো আছেই, এ ছাড়া আছে প্রচুর গোরু। যাই হোক থাপা কিন্তু হরি ঘোষ মশাইকে চালের আড়ৎদার বলে না, বলে চালিয়াৎ! হরি ঘোষের প্রায় চারশো গোরু আছে। একটা বিশাল বাড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তকতকে ঝকঝকে জায়গা। সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। গরমকালে বিদ্যুতের পাখা চলে। গোরুদের জন্য কত আদরযত্ন! হবে নাই বা কেন, কত দুধ হয় ওদের। কমপক্ষে গড়ে দিনে পাঁচ হাজার লিটার! ওখানে একটা মাখন তৈরির বিরাট বন্দোবস্ত করাও হচ্ছে। থাপা বলে কী চমৎকার গোরুদের জন্য ব্যবস্থা! গোরুদের জন্য মাথার উপর ফ্যান আবার মুখের কাছেও ফ্যান! গোরুদের জন্য আলাদা চাল আছে, ভাঙা চাল—তা থেকে গোরুদের ভাত আর ফ্যান তৈরি করে রোজ খাওয়ানো হয়। পরিষ্কার ব্যবস্থা। থাপা যখনই কোনও চমৎকার পরিষ্কার জায়গা দেখে, তখন সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আহা কি চমৎকার, ঠিক যেন হরি ঘোষের গোয়াল!

জিপ চালাতে চালাতে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ থাপা বলল, দেখ দেখ চড়ুইভাতি! কোথায় চড়ুইভাতি! কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মানুষজন নেই। কাছে দুটো কুটির কেবল দেখা যাচ্ছে, তার ধারে-কাছেও কেউ নেই। থাপা বলল, চড়ুইভাতি দেখলে না শুভবাবু? শুভংকর বলল, না থাপা কাকা, দেখতে পাইনি। তখন থাপা জিপগাড়িকে থামিয়ে পিছিয়ে নিয়ে এল খানিকটা, তারপর বলল, ঐ তো দেখ, এখনও চড়ুইভাতি চলছে। এবারে বোঝা গেল ব্যাপারটা। বোধহয় কুটিরের বাসিন্দারা বাসি ভাত বেড়ার এদিকে ফেলে দিয়েছিল, তার উপর বসে এক গাদা চড়াই পাখি বসে তা খাচ্ছে। চড়ুইভাতিই বটে!

জীবরামের খুব ভাল লাগল এই ভেবে যে থাপা হচ্ছে তার মনের মতো মানুষ! ঠিকই তো চড়ুই পাখিরা ভাত খাচ্ছে যখন, তখন সেটাকে চড়ুইভাতি বলাই তো যায়!

পথে যখন থাপা বলল মিতুন মামার টানাটানির সংসার তখন শুভংকর একটু আশ্চর্যই হলো। সে আগে অবশ্য কখনও এই মৃত্যুঞ্জয় দাদুর বাড়িতে যায়নি, তবে শুনেছে উনি ওখানে ভাল চাকরিই করেন ভুটানের ভূতত্ত্ব বিভাগে। বছর তিনেক আগে সেখানে গিয়েছেন, ভাড়া নিয়েছেন বিশাল একটা বাংলো। তাহলে টানাটানির সংসার হলো কেমন করে? এই সমস্যার একটা সমাধান থাপাই করল—মিতুনবাবু রোজ রাত্রে দারুণ দারু টানাটানি করেন।

থাপা আরও জানাল, উনি—অর্থাৎ মিতুনবাবুর বাংলো খুব ভাল, যেন হরি ঘোষের গোয়াল! শুনে ভয়ে শিউরে উঠেছিল ওরা দুজনেই। হরি ঘোষের গোয়াল মানে তো যাচ্ছেতাই নোংরা একটা ব্যাপার। ওটা কথার কথা—কিন্তু তাই বলে মিতুনবাবুর বাড়িটা হরি ঘোষের গোয়াল হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে বুঝতে পারল ব্যাপার ঠিক অন্যরকম। চমৎকার তকতকে ঝকঝকে বাংলো বাড়িটা। কত ফুল ফুটে রয়েছে বাগানে। মালি কাজ করছে। একটু দূরে রান্নাঘর—তা থেকে ভারি মন-খুশি-করা গন্ধ বেরুচ্ছে। আরও ভাল লাগল তাদের এটা দেখে যে মামার মামার মামা মৃত্যুঞ্জয়বাবু দিব্যি ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন। ওদের দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। তারপর যখন শুনলেন তাঁর অসুখের কথা শুনে ওরা সেবা করতে এসেছে তখন তিনি হো হো হা হা করে এমন বিকট হাসি হাসলেন যে জীবরামরা বেশ চমকিতই হলো।

মিতুনবাবু তখন কি ভেবে বললেন, এ নিশ্চয় থাপার কাজ! তিনি থাপাকে ডেকে পাঠালেন—থাপার জন্য আউট হাউসে একটা ছোট কুঠি আছে। থাপা এখানে প্রায়ই আসে যখন, তখন ওখানেই থাকে। থাপা এসে দাঁড়ায় তলব পেয়ে। বলে হুজুর বলান।

—বলান আবার কি?

—আজ্ঞে কহান। থাপা বলল। বিদেশ করুন।

—যাচ্ছেতাই! উঃ কী কথা! বলান না বলুন, কহান না কহেন, বিদেশ না আদেশ?

থাপা তার দু' কান ধরে মলল আর জিভ কাটল। বলল, শোধ হলো বহুত!

—শোধ হলো, মানে? মৃত্যুঞ্জয়বাবুর হুংকার।

—আজ্ঞে দোষ হলো খুব।

—বেশ তোর দোষ হলো খুব। কিন্তু

তুই শিলিগুড়িতে গিয়ে কী বলেছিস, আমার অসুখ করেছে?

—তা তো বলা যায়নি। থাপা বলল।

—বলা যায়নি, মানে?

—অসুখ তো বলিনি হুজুর। পরশু সকালে আমি এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে দারোয়ান রামভজনকে পুছলাম কী ব্যাপার, আপনার দরজা খুলল না কেন। রামভজন বলল, হাঁ হুজুর, রামভজন বলল, আপনি ভাংচুর হয়ে শুয়ে আছেন।

—কী কী বললে আমি ভাংচুর হয়ে শুয়ে আছি? যত সব শয়তান! রামভজনকে বলো আসতে।

খবর পেয়ে রামভজন এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল, হুজুর!! ফেটে পড়লেন মৃত্যুঞ্জয় বাবু, বললেন কী বলেছ তুমি এই হতভাগা থাপাকে, আমি নাকি ভাংচুর হয়ে শুয়ে আছি?

—না হুজুর!

থাপা গর্জন করে বলে উঠল, না হুজুর বলাচ্ছ এখন। সত্য বাক্য বোলাও না রামভজন?

রামভজন চুপ করে রইল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু গর্জন করে বললেন, চুপ করে রয়েছ কেন, জবাব দাও!

রামভজন বলল, হুজুর, পরশুর আগের রাতে আপনি চার গেলাস ভাং পিয়েছিলেন। জোরালো ভাং। ঐ ভাং আমরা এক গেলাস খেলেই চুর হয়ে পড়ি। আপনি চার-চারটে গ্লাস বেবাক ফাঁকা করে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য আপনি চুর হন। তাই বলেছিলাম ঐ শালা থাপাকে। সে ভুল বুঝেছে! বাংগালা বলতে চেষ্টা করতে গিয়ে হুজুর ওর মাথার ঠিক থাকে না।

থাপা লজ্জা লজ্জা মুখ করে কেমন বোকা বোকা ভাবে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতো ফিক ফিক করে হাসতেও লাগল। বলল, রামভজন বাংলা বোঝে না, ও বুঝবে কি বাংলার মর্ম!

সকাল তখন এগারোটা। হঠাৎ থাপা বলল, হুজুর, একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই বলে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে টিপ করে একটা প্রণাম করল। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, হুজুর, আরও একঠো ভুল হো গয়া সাব। বলে তাড়াতাড়ি থেমে থাকা জিপের পেছনের আসনে রাখা এক ঝুড়ি মিষ্টি আর রান্না করা খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে এল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু থাপার উপর ভারি চটে গিয়েছিলেন। ভাবছিলেন, আহা ভাগ্নেরা ভেবেছে আমি কোনও দুর্ঘটনায় পড়ে হাড় ভেঙে পড়ে আছি এখানে। যাই হোক সে দিন ছিল রবিবার, ছুটির দিন। এখন চান-টান করে খাওয়ার সময়। তিনি খানসামাকে ডেকে বললেন, অতিথিদের খেতে দেওয়ার জন্য যেন ভাল বন্দোবস্ত করা হয় রাতে। এখন তো আর কিছু করার সময় নেই। তাছাড়া টিফিন ক্যারিয়ারে ওরা অনেক কিছু এনেছে।

খাওয়ার আগে মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর বাগান দেখালেন। এত ভাল বাগান চট করে চোখে পড়ে না। কত রকম ফুল—গোলাপই বেশি। অনেক গোলাপই বুনো। পাহাড়ের গায়ে লতার মতো আঁকড়ে আঁকড়ে থাকে। তা ছাড়া কত অর্কিড। এরপর দেখালেন তাঁর কিচেন গার্ডেন। বললেন, এখানে কত রকম সবজি হয় তার ঠিক নেই। বাজারে যেতেই হয় না। কত টোমাটো, কত ক্যাপসিকাম। আর দেখ পটলও হয়েছে। সত্যি, বড় বড় পটলের রাশি, মাচার উপর উঠে গেছে লতা।

ঐ পটল দেখে হেসে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। জীবরাম তো অবাক। অবাক শুভংকরও। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, ঐ থাপা বড় বিচ্ছিরি লোক। ও একবার কি করেছিল জান? তারপর তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বললেন, আচ্ছা সে গল্প হবে খাওয়া-দাওয়ার পর। তারপর তিনি কী ভাবতে লাগলেন আর মাঝে মাঝেই হাসতে লাগলেন।

(২)

খাওয়া-দাওয়া হলো যা তা আর কহতব্য নয়। কহতব্য নয় মানে খারাপ কিছু নয়, একটু বেশি ভাল। ভাত সরু চালের, সঙ্গে ভারি চমৎকার ঘি, আর ইলিশ মাছ ভাজা। আবার লুচি আর ধোঁকা। দু'রকম মাছ আর মাংসের কিমার ঝাল ঝাল ঝোল। তারপর দই আর মিষ্টি। খাওয়ার পর আর কথা নয়, ঘুম। ঘুম ভাঙল যখন তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখন আবার চা-এর সঙ্গে চিজ দেওয়া টোস্ট। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, শোনো একবার কি হয়েছিল। আমার শ্বশুরবাড়ি আলিপুরদুয়ারে। গত বছর থাপা এখানে এসেছিল একবার, ও প্রায়ই আসে আর আমি বাগান থেকে যা পারি পাঠিয়ে দিই শিলিগুড়িতে ভাগ্নেবাড়িতে। আবার কিছু কিছু পাঠাই আলিপুরদুয়ারেও। শ্বশুর-মশাইয়ের সর্দির ধাত, মধু খেলে ভাল থাকেন, আর এখানে বেশ ভাল কমলা মধু পাওয়া যায়। কখনও কখনও ওকে দিয়ে মধুও পাঠাই। গত বছরও পাঠিয়েছিলাম। সেবারেও ও ভাংচুর কথাটা ব্যবহার করেছিল। ফলে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল। এখানে একজন ডাক্তার আছেন তাঁর নাম একশরণরূপ বক্সি। নতুন এসেছেন, ভারি চমৎকার লোক। এখানে রোগী পান না তেমন, আর বেশি দরকারও নেই তাঁর। প্রায়ই আমি ওঁর কাছে যাই দাবা খেলতে। ডাক্তারের নাম অদ্ভুত, এরকম নাম আগে শুনিনি, নামটা বড়ও, একশরণরূপ বক্সি। তাই কেউ বলে ডাক্তার বক্সি, কেউ বা মজা করে বলে ডাক্তার ই. আর. বক্সি! যাই হোক লোকটি বেশ মজার—আর দাবাও মোটামুটি ভাল খেলেন। একবার উত্তরপ্রদেশে খেলে রাজ্যে পনেরো নম্বরে ছিলেন দুশো প্রতিযোগীর মধ্যে, সে দিক দিয়ে ভালই বলতে হবে। আমরা এখন যেখানে সেখান থেকে থিম্পুর দূরত্ব ঠিক আঠারো মিটার। মানে এক মিনিটের পথ। সেখানেই ডাক্তার বক্সির বাড়ি। ওখানে বিজয়ার দিন ডাক্তার বক্সির সঙ্গে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ছিল, তারপর সিদ্ধির একটা আসর। স্রেফ আমার আর ডাক্তার বক্সির ব্যাপার। সেখান থেকে রাত একটার সময় কোনওমতে টলতে টলতে যেই দাওয়া থেকে নেমেছি অমনি একেবারে বেহুঁশ। ডাক্তার বক্সিরও সেই একই অবস্থা। তিনি বারান্দা থেকে কেবল বলছেন হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া! আমার কানে সেটা ক্ষীণভাবে ঢুকছে। রাত তখন একটা কি দেড়টা। ডাক্তার বক্সির হুক্কা হুয়া শুনে থাপা কি করল জানো? সে

আমার বাংলোর বারান্দায় শুয়েছিল—হঠাৎ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, ওরে শেয়াল, আজ আমাকে নিদ্রা দিতে দিবি না? দাঁড়া তোর চিক্কার (চিৎকার) করা বাহির করিতেছি! বলে একটা লাঠি নিয়ে শেয়াল মারতে এসে দেখে ডাক্তার বক্সি হুক্কা হুয়া করছেন আর আমি সটান ঘাসের উপর শুয়ে আছি। থাপা তখন রামভজনকে ডেকে এনে দুজনে ধরাধরি করে বাংলোয় নিয়ে এসে আমার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দেয়। এটুকু বেশ হলো—কিন্তু তার পরদিন মানে আর কয়েক ঘন্টা পর বেলা আটটা নাগাদ তিন বোতল মধু, গোটাকয়েক ফুলকপি আর আধ বস্তা ক্যাপসিকাম নিয়ে আমাকে জানাল সে চলে যাচ্ছে, আমার অনুমতি চায়। আমার তখনও ঘোর কাটেনি তাই কি যে বললাম হাঁ কিংবা না তাও খেয়াল নেই। ও কি বুঝল কে জানে, ও জিপ নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

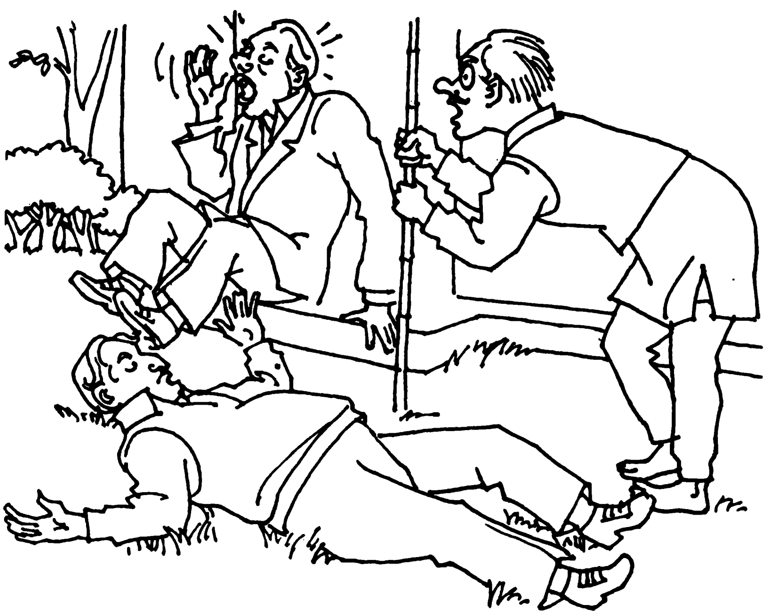

আমি সটান ঘাসের উপর শুয়ে আছি

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, তারপর হলো গিয়ে কেলেংকারি। সে আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বলেছে আমি নাকি ইয়ারবক্সির সঙ্গে দারু পান করে পটল তুলেছি! কি হয়েছিল বলি—সেদিন ডাক্তার একশরণরূপ বক্সির নেমপ্লেটে লেখা থাকত ই. আর. বক্সি! ও তাই বলেছে আমি নাকি ইয়ারবক্সির সঙ্গে দারু পান করেছি। আমি ডাক্তারের জন্য একটা থলেতে করে কিছু পটল নিয়ে গিয়েছিলাম—সেটি দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বেহুঁশ হবার আগে ঐ পটলভর্তি থলেটা তুলে ডাক্তার বক্সিকে দিই। এখন থাপা গিয়ে বলেছে আমি ভাংচুর হবার পর পটল তুলেছি! বোঝো ঠেলাখানা। তার উপর আরও বলেছে মৃত্যুঞ্জয়বাবু থিম্পুতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন!

—এটা কেমন কথা হলো? জীবরাম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল। জীবরাম নিজে অনেক মজার কথা বলেছে এবং লোকদের জব্দও করেছে কিন্তু থাপার কথা শুনে সে থ হয়ে গেছে! জীবরাম বলল, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ! ওর কি মাথা খারাপ? বাংলা শেখার এই অপচেষ্টা কেন?

জীবরাম রেগে গুম হয়ে গেল। পরে বলল, থাপা অতি সাংঘাতিক লোক। মিথ্যে কথা বলার দরকার কি?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, থাপা কিন্তু মিথ্যে কিছু বলেনি, তবে সত্যিটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে বলতে পার!

—মানে? শুভংকর বলল। বেশি সত্যি আবার হয় নাকি?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু হাসলেন। বললেন, থিম্পু শহরটা শুরু হয়েছে আমার এই বাংলো থেকে অতি সামান্য দূরে। ওখানে একটা পাথরের চিহ্নও আছে। এখন ব্যাপার হয়েছিল এই যে আমাকে যখন ওরা বেহুঁশ হওয়ার পর ধরে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন নাকি আমি থিম্পুর সীমানার ভেতরে একটা নিশ্বাস ফেলেছিলাম। তারপরই ওরা আমাকে থিম্পুর বাইরে নিয়ে আসে। তা হলে বুঝলে কি হলো?

জীবরাম বলল, ঠিক তো! আপনি থিম্পুতে শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন! কী সাংঘাতিক ওর মাথা! ও বোধহয় এই সব কথা ইচ্ছে করে ফাঁদে!

শুভংকর বলল, লোককে তুই যেমন কথার ফাঁদে ফেলিস, তেমনি ও তাই করে। মানে গল্প ফাঁদে! ওর উপর কি রাগ করা উচিত?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, একবার একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছিল—সেবারও ব্যাপারটা আমারই ভাগ্যে ঘটেছিল। রটে গিয়েছিল আমি মরে গিয়েছি। সে এক কাণ্ড!

—সে এক কাণ্ড? কী হয়েছিল মিতুন দাদা? শুভংকর প্রশ্ন করল।

—সে এক ভঙ্গ কাণ্ডের ব্যাপার। একটু দুষ্টু হাসি হাসলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। শুনেছি জীবরাম কথা বলে লোককে খেপিয়ে তোলে—অনেক গল্প শুনেছি তোমার। এবার শোনো কাণ্ড ভঙ্গের ব্যাপার। শুনবে সে কথা?

আর কথা কি, কে না গল্প শুনতে চায়? দুজনেই বলল, নিশ্চয়—বাঃ চমৎকার।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, তখন আমি মধ্যপ্রদেশের এক জংলা অঞ্চলে পোস্টেড। প্রচুর কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা বলে একদল আছি ঘাঁটি গেড়ে। এর মধ্যে অদ্ভুতভাবে একটা পাখি খাঁচা সমেত পেয়ে গেলাম। আমাদের এক কর্মী সেটাকে পুষেছিল, সে অসুস্থ হয়ে ভূপালে চলে গেলে ওটা আমার হেফাজতে থাকে। পাখিটার নাম আত্মারাম। নামটা বেশ চমৎকার, না?

—বেশ নাম। জীবরাম বলল। খাঁচার মধ্যে আত্মারাম—বাঃ!

—তারপর শোনো কি হলো। আমরা জঙ্গলে আছি এর মধ্যে শুনলাম দু'-তিন কিলোমিটার দূরে একটা চিতার খুব উৎপাত শুরু হয়েছে। রোজই একটা করে ভেড়া চুরি করে খেয়ে যাচ্ছে। ভীত গ্রামবাসীরা আমার কাছে এসে বলল, হুজুর, আমাদের রক্ষা করুন। আমরা ভেড়ার ব্যবসা করি, এভাবে ভেড়া মারা গেলে মরে যাব। হুজুর, আপনি একদিন রাইফেল দিয়ে ঘড়াম করে গুলি করে ব্যাটার জান খতম করুন।

আমার কাছে রাইফেল ছিল না মোটেই, ছিল একটা বন্দুক, তাও অতি সাধারণ একনলা। ওতে বুলেট ভরা যায় কিন্তু বাঘ মারার ক্ষমতা ছিল না সেটার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার বন্দুক। বাঘের চোখে বা মাথার পেছনে অথবা মুখের মধ্যে গুলি হঠাৎ লেগে গেলে তবেই বাঘ মরতে পারে, না হলেই বিপদ। তাই আমি ম্লান হেসে বললাম, ও আমার রাইফেল নয়, পাখিমারা বন্দুক। কিন্তু গ্রামবাসীরা ছাড়ে না কিছুতেই, তাই বাধ্য হয়ে রাজী হলাম। ওরা একটা গাছের উপর চমৎকার একটা মাচা বেঁধে দিল। তাতে তোশক, পাশবালিশ আর অনেক রকম খাদ্যের ব্যবস্থাও করে রেখেছে। ঠিক তলায় ওরা একটা ছোট মাচা বেঁধে তার উপর একটা ভেড়াকে বেঁধে রেখেছে। রাত্রে চিতাবাঘটা এসে যেই ভেড়াকে খেতে যাবে অমনি আমার সঙ্গী একটা স্পটলাইট ফেলবে আর বাঘ তাকাবে, তার চোখ স্থির হয়ে যাবে আর আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপব!

—তারপর? জীবরাম বলল।

—তারপর বিশেষ কিছু বলার নেই। কে যে মাচায় ভেড়া বেঁধেছিল কে জানে। রাত দুটো নাগাদ চাঁদের ঝাপসা আলোয় দেখি ভেড়া নেই সেখানে। বুঝলাম শিকার করা আর হলো না। বাঘ এলেও শিকার করতে পারতাম কিনা সন্দেহ! যাই হোক এই সময় আমার কেমন যেন ঘুম পেয়ে গিয়েছিল, আমি আর নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারলাম না। অত খাদ্য খেয়ে ঘুমটা বেশ জমাটই বেঁধেছিল। আমি ঘুমিয়ে রয়েছি, হঠাৎ একটা কি দুঃস্বপ্ন দেখে আচমকা গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলাম। পরে বুঝলাম গাছটির কাণ্ড ভেঙে ঐ কীর্তি হয়েছিল। তখন কি জানতাম ঐ চিতাবাঘটা কোত্থেকে একটা ভেড়া খেয়ে ঠিক আমার মাচার নিচের মাচায় শুয়ে দিব্যি আরাম করে ঘুমিয়ে ছিল। আমি পড়লাম তার উপরে। বেচারা বাঘ আচমকা আমার মতো বিশাল এক বপুর চাপে হুঁয়াও করে এক লাফে কোথায় যে পালিয়ে গেল তার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তারপর থেকে ঐ চিতার খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

যাই হোক এবারে জীবরামের ভাল লাগবে শুনতে এই সব ঘটনার কয়েকদিন পর বিলাসপুর রেলস্টেশনের রেলের ওয়েটিং রুমে বসে আছি, হঠাৎ কানে গেল কয়েকজন বাঙালি নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন। সেখানে আমার নামটাও শুনে কান খাড়া করলাম। কী থেকে কী হয় দেখ। একজন বলছিলেন মৃত্যু যে কিভাবে লোকের হয় তা আগে থেকে কেউ জানতে পারে না। একজন কয়লা দফতরের অফিসার মৃত্যুঞ্জয়বাবু শিকারের জন্য গাছে বন্দুক নিয়ে বসেছিলেন, সঙ্গে ছিল তাঁর পোষা পাখি। খাঁচায় ভরা।

হঠাৎ জীবরাম বলল, হ্যাঁ, পাখিটাকে খাঁচাভরা অবস্থায় ক্যাম্পে রেখে এলে বনবেড়াল এসে খেয়ে যেতে পারে এই ভয়ে আপনি সেটাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

তারপর শোনো ভদ্রলোকের কথা। মৃত্যুঞ্জয়বাবু ঘুমোতে ঘুমোতে গাছ থেকে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল। ময়না তদন্ত হলো আর তারপর তিনি চিতায় উঠলেন!

হা হা করে হেসে উঠল জীবরাম আর শুভংকর। জীবরাম বলল, ভারি চমৎকার!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, কথার প্যাঁচে আমি তো খতম হলাম। মানে, আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হলো! আমার ময়না তদন্ত হলো। কী হয়েছিল বলতে পারো?

না। ওরা বলতে পারল না। মৃত্যুঞ্জয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, বলা একটু কঠিন। পাখিটা ছিল ময়না। ওর নাম আত্মারাম। ও খাঁচা ছাড়া হয়ে কোথায় উড়ে গেল সেটা নিয়ে খোঁজ-খবর করা হয়েছিল, সে রাত্রে অবশ্য নয়, পরদিন সকালে। যাই হোক আমার ময়না তদন্ত হয়েছে বলা যায় বলো, বলা যায় না?

—নিশ্চয়ই! হাসতে হাসতে বলল জীবরাম আর শুভংকর!

—তারপর ধরো চিতায় ওঠার ব্যাপারটা। আমি তো ঘুমন্ত চিতার উপর পড়ে গিয়েছিলাম সত্যিই। চিতায় ওঠা বলা খুব অসঙ্গত হয়নি মোটেই।

তারপর একটু থেমে বললেন, ঐ থাপাও এই রকম সব কথা বলে। বলে বোধহয় মজা পায়। শুনেছি ও নাকি বাংলা শেখার জন্য একটা অভিধান কিনেছে, কিছু সহজ সহজ বাংলা বইও কিনেছে!

—সর্বনাশ করেছে! বলল জীবরাম।

তারপরই একটা কাণ্ড ঘটল। খাওয়ার সময়, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা চামচিকে। সচকিত হয়ে ওরা খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চামচিকেটা অন্ধের মতো উড়তে উড়তে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মুখের সঙ্গে লাগাল এক ধাক্কা! তারপরই সে ফের জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল গভীর অন্ধকারে কোথায়।

—চামচিকেটা মারা গেল! বলল জীবরাম।

—কোথায় মারা গেল, দেখলি না উড়ে চলে গেল?

জীবরাম বলল, একটু শুদ্ধ করে বলি—চামচিকেটা মৃত্যুমুখে পড়েছিল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন বেশ বলেছ! আমার মুখে পড়েছিল বই কি! একে তো মৃত্যুমুখে পড়া বলাই যায়।

—এটা বলাই বাহুল্য। বলল শুভংকর। আমরাও বাড়িতে গিয়ে বলতে পারব আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়েছিলাম!

জীবরাম যোগ করল— মৃত্যুভয়ে মোটেই ভয় না পেয়ে!

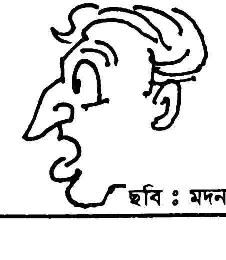

ছবি : মদন সরকার

শয়তানের পদচিহ্ন

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

১৮৫৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। বৃহস্পতিবার।

ইংলন্ডের দক্ষিণ ডেভন অঞ্চলে সেদিন শীত যেন আর সহ্য করা যাচ্ছিল না। দিনের বেলাতেই কনকনে ঠাণ্ডা একেবারে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তার ওপর বিকেলের দিকে পুরো আকাশটা সীসের মতো ধূসর হয়ে গেল। রাতে যে প্রচণ্ড তুষারপাত হবে, তা বুঝতে আর কারো বাকি রইল না।

তুষারঝড়টা অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেল বেশ তাড়াতাড়িই—লিম্পস্টোন গ্রামের লোকেদের তখনো রাতের খাওয়াই শেষ হয়নি। ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কায় সমস্ত বাড়ির বন্ধ জানলা-দরজাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সারা রাত ধরে তাণ্ডব চালিয়ে অবশেষে ভোরের দিকে থামল সেই ঝড়। সূর্য উঠলে দেখা গেল, চারিদিকে সাদা বরফের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, যতদূর চোখ যায় ততদূর। বহু বছরের মধ্যে এ অঞ্চলে এরকম তুষারপাত হয়নি।

ছবির মতো সুন্দর লিম্পস্টোন গ্রামের সকালবেলাটি সেদিনও একই ভাবে শুরু হয়েছিল। পুরুষরা কাজে বেরোবার জন্য তৈরি হতে লাগল। মেয়েরা রান্নাবান্না, ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তবে বাড়ির দরজা খুলে সামনের দিকে তাকিয়েই সবাই বুঝতে পারল যে, অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে বাড়ির সামনে জমে থাকা পাহাড়প্রমাণ বরফের স্তূপ সরিয়ে ফেলতে হবে। এই বরফের স্তূপ সরাতে গিয়েই হঠাৎ এক গ্রামবাসীর নজরে এল, টাটকা বরফের ওপরে অনেক পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। আগে কয়েকজন গ্রামবাসীও ছাপগুলো দেখতে পেল। প্রথমে তারা ভেবেছিল ছাপগুলো নিশ্চয়ই কোনো পাখি-টাখির হবে। কিন্তু ভালভাবে ছাপগুলো লক্ষ্য করে বিস্ময়ে তারা একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল। ছাপগুলোর আকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং সেগুলো সোজা এক লাইন বরাবর চলেছে। যতদূর চোখ গেল এবং যেখানে চোখ গেল, সর্বত্রই সেই চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত চিহ্নের

খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের সমস্ত লোকই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। দেখা গেল এই পায়ের ছাপ তার সামনের কোনো বাধাই গ্রাহ্য করেনি। যা কিছু সামনে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই অবলীলাক্রমে চলে গিয়েছে। একদম সোজা লাইনে, ঠিক একটির পেছনে একটি পড়েছে সেই পায়ের ছাপ। খাড়া দেওয়াল, বাড়ির ছাদ, উঁচু খড়ের গাদা—সব কিছু বেয়েই সেগুলো সোজা ওপরে উঠেছে, সোজা নেমেছে। সবচাইতে বিস্ময়কর হলো ছাপগুলোর চেহারা। একমাত্র গাধার ক্ষুরের সঙ্গেই সেগুলোর মিল আছে বলে মনে হলো। কিন্তু এমন গাধার কথা কে কবে শুনেছে, যে ঠিক একইভাবে সোজা এক লাইনে পা ফেলে চলতে পারে, আর বাড়ি ও দেওয়ালের খাড়া গা দিয়ে ওঠানামা করতে পারে?

লিম্পস্টোনের হতভম্ব বাসিন্দাদের আর সেদিন স্নান-খাওয়া, কাজকর্মের কথা মনে রইল না। কমবয়সী ছেলেরা ঐ দাগের পাশ দিয়ে দৌড় লাগাল, ছাপগুলো কতদূর গিয়েছে দেখবার জন্য। একটু পরেই তারা ফিরে এসে জানাল, ছাপের সারি গ্রাম থেকে বেরিয়ে একদিকে এক্সমাউথ আর অন্যদিকে টপস্যাম-এর দিকে চলে গিয়েছে। পরিষ্কার বোঝা গেল, গত রাতে 'কিছু একটা' বরফে ঢাকা লিম্পস্টোনের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে এবং সে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও থামেনি। কিন্তু প্রশ্নটা হলো সেই 'কিছু একটা'-টা কী?

গ্রামের প্রবীণ লোকেরা এবার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁরা লক্ষ্য করে দেখলেন, অনেক বাড়ির ঠিক সামনের দরজা পর্যন্ত ছাপগুলো এগিয়ে এসেছে, তারপর আবার পিছিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই পায়ের ছাপ যারই হোক না কেন, সে কোনো মানুষের মুখোমুখি হতে চায়নি। শুধু তাই নয়, গ্রামের গির্জা আর তার পুরো এলাকাটিতে কোনো ছাপ পড়েনি—তার মানে যার পায়ের ছাপ সে ইচ্ছে করেই ঐ জায়গাটিকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে। যেখানে চাপের দাগগুলি খুব পরিষ্কারভাবে পড়েছে, সেখানে সেগুলো প্রায় আড়াই ইঞ্চি চওড়া, দেখতে ঠিক ঘোড়ার ছোট ক্ষুরের মতো। এক প্রবীণ গ্রামবাসী ছাপগুলোকে খুব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরে বাস্! এ তো একেবারে চেরা ক্ষুর বলে মনে হচ্ছে!' কথাগুলো তিনি অবশ্য কিছু ভেবে বলেননি, কিন্তু তাঁর কথা শুনে সকলেরই চোখ-মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তাঁরা। একমাত্র শয়তানের পায়েই নাকি আছে চেরা ক্ষুর! তাহলে! তাহলে কি স্বয়ং শয়তানই গতরাতে এখানে ঘুরে বেড়িয়েছে!

এই রহস্যময় পদচিহ্ন কত দূরে গিয়েছে, তা নিয়ে এবার খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, চারিদিকে প্রায় একশো মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই পদচিহ্ন এবং তা কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। শুধু তাই নয়, কাছেই যে এক্সে নদীর দু' মাইল চওড়া খাঁড়ি আছে, তারও দু'দিকেই পড়েছে এই পায়ের ছাপ। ছাপগুলো খাঁড়ির একদিকে জলের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে, আবার অন্যদিকে ঠিক সেই জায়গায় জলের ধার থেকেই আবার শুরু হয়েছে—যেন কেউ ঐখানটিতে জলের ওপর দিয়েই হেঁটে পার হয়েছে। আশেপাশের যে সব গ্রামের ভেতর দিয়ে এই পায়ের ছাপ চলে গিয়েছে, তারা সবাই এ বিষয়ে একমত হলো যে, কোনো মানুষ বা প্রাণীর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব নয়, এটা বুদ্ধির অগম্য কোনো ভৌতিক রহস্যময় ঘটনা। বলা বাহুল্য, সেদিন অর্থাৎ শুক্রবার ঐ সব গ্রামের লোকেরা সন্ধ্যার পর কেউই বাড়ির বাইরে বেরোল না। সমস্ত দোকান, বাজার, আড্ডায় এই ছাপগুলোকে 'শয়তানের পায়ের ছাপ' বলা হতে লাগল।

দু' তিন দিন এভাবেই কেটে গেল। তারপর কয়েকজন সাহসী স্থানীয় লোক ঠিক করল, তারা এর শেষ দেখে ছাড়বে। কয়েকজন সশস্ত্র শিকারী কুকুরের পাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পুবদিক ফর্সা হতেই যাত্রা শুরু করে সারাদিন ঐ পায়ের ছাপ ধরে তারা এগিয়েই চলল। মাঝখানে এক্সে নদীর খাঁড়িও পেরিয়ে গেল। কেন্টন, স্টারক্রশ—এই সব গ্রামের মধ্য দিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে উওলিশ-এর কাছাকাছি এক জঙ্গলের সামনে যখন তারা এসে পৌছল, তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দেখা গেল পায়ের ছাপের সারি সোজা গিয়ে ঢুকেছে সেই জঙ্গলের ভেতর।

এই সময় হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এদের সঙ্গের কুকুরগুলো এতক্ষণ দিব্যি চলছিল। এধার-ওধার ঝোপঝাড়ে ঢুকে গন্ধ শুঁকে খুশিমনেই এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে গিয়েই তাদের হাবভাব একেবারে আমূল বদলিয়ে গেল। দু' পায়ের মধ্যে ল্যাজ গুঁজে, প্রাণপণে আর্তনাদ করতে করতে একটু পিছিয়ে থাকা অনুসন্ধানকারী দলটির কাছে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ফিরে এল তারা। কি এক অজানা আতঙ্কে তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানকারীরা আরো একটু এগিয়ে গেল, কুকুরগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কুকুরগুলো সর্বশক্তি দিয়ে মাটি আঁকড়ে শুয়ে পড়ে কুঁইকুঁই করতে লাগল। একচুলও নড়ানো গেল না তাদের। তখনো তারা থরথর করে কাঁপছে।

পায়ের ছাপগুলো জঙ্গলের মধ্যে যেসব গাছপালার ঝাড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল, সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে এক শিকারী চাপা গলায় বলে উঠল, 'ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। আমরা যা খুঁজছি, তা-ই কি আছে ওখানে?'

এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আর কোনোদিনই পাওয়া গেল না। এতক্ষণে চারিদিক অন্ধকার করে রাত নেমেছিল। রাতের অন্ধকারে ঐ জঙ্গলে ঢুকতে রাজী হলো না কেউ। এর পরের কয়েকদিনও ঐ জঙ্গলের দিক কেউ মাড়াল না। আস্তে আস্তে বরফ গলা শুরু হলো আর তার ওপরের পায়ের ছাপগুলোও মিলিয়ে গেল চিরদিনের মতো।

জঙ্গলের ভেতর ঢুকলে তারা কিসের মুখোমুখি হতো?—কোনোদিনই তা আর জানা যাবে না।

ছবি : বিজন কর্মকার

বাহাদুর বেড়াল

আমাদের একজন ম্যাজিশিয়ান প্রয়োজন, বাহাদুর! তুমি কি ম্যাজিকের কৌশল দেখাতে পারবে?
গ্র্যাণ্ড থিয়েটার
ছোটদের হরেক অনুষ্ঠান!
ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো!
বাড়ি ফিরে
টুপি থেকে বের করার জন্যে আমার কোন পায়রা অথবা খরগোস নেই। আমাকে নেংটি দিয়ে ওটা করতে হবে।
এতেই মজা হবে!
থিয়েটার
কিঁচ কিঁচ
কিঁচ কিঁচ
এখন আমি এই নেংটিটাকে অদৃশ্য করে দেবো!
তৈরি হও, ভাই সব!
আর বাহাদুরও যথারীতি এবার গায়েব হয়ে যাবে ভাই সব!
স্টেজের বাইরে—
মারো টান— হেঁইও!
ইঁয়াও!
হিঃ হিঃ! খিক্ খিক্!
হতচ্ছাড়া নেংটির দল, ওদের আমি খুন করবো!
আপনার ছুরিগুলি ধার নিচ্ছি, ভেল্কিরামজী!
হিঃ হিঃ! ম্যাজিশিয়ান বাহাদুর তার ছুরি নিক্ষেপের খেলাও যথারীতি দেখাচ্ছে!
আর এতে ও মোটেই সুবিধের নয়!

মঙ্গলে বসতি গড়বে মানুষ?

অমিয় কুমার হাটি

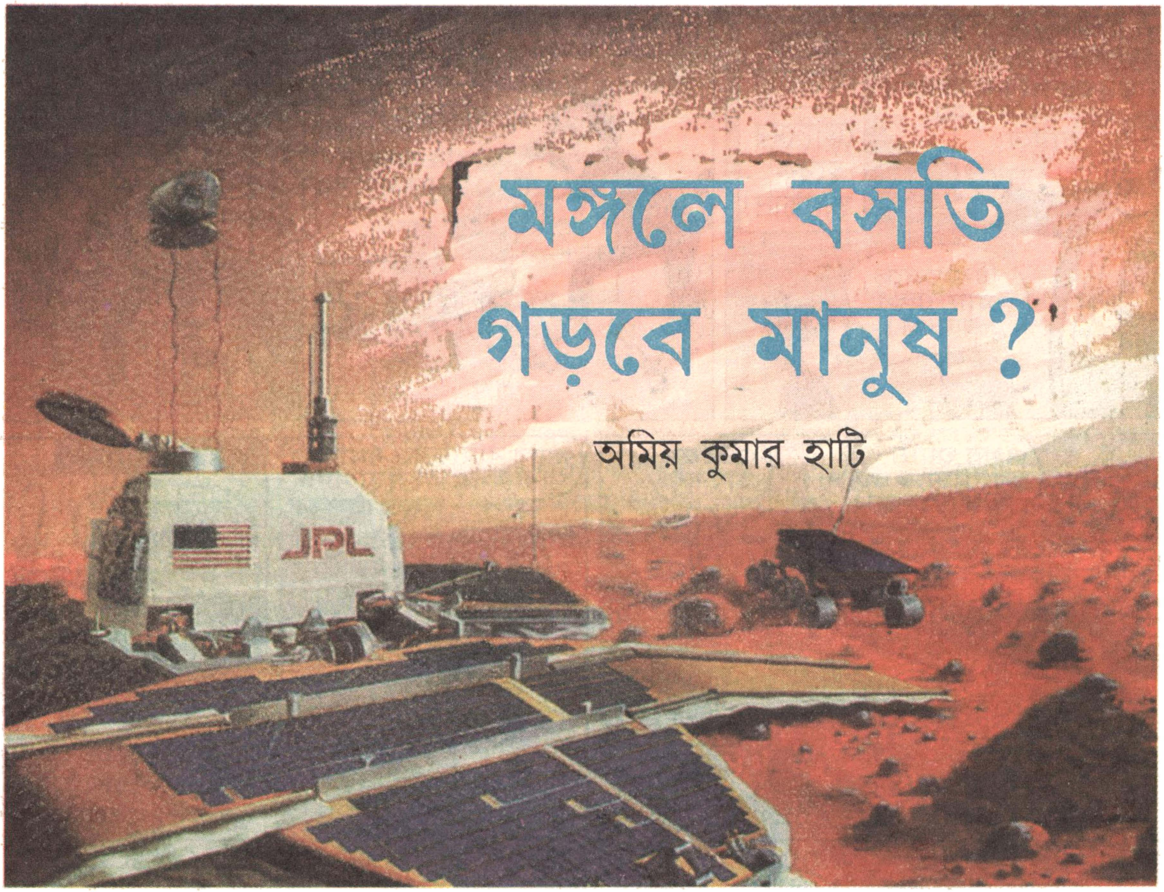

একুশ বছর পর আবার। ৪ জুলাই, ১৯৯৭। পৃথিবীর আকাশ ছাড়িয়ে সাত মাসেরও বেশি সময় মহাকাশ পাড়ি দিয়ে প্রায় ৫০ কোটি কিলোমিটার পেরিয়ে একটা মহাকাশযান —পাথ ফাইন্ডার মঙ্গলগ্রহে নেমেছে। ছ' চাকার একটি যন্ত্রমানব সোজার্নারকে ছেড়ে দিয়েছে মঙ্গলের গায়ে। তার পাঁচজোড়া ক্যামেরার চোখ—দেখবে মঙ্গলে কী আছে। তার সেই চোখ দিয়ে আমরাও এখন ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছি মঙ্গল গ্রহকে।

মঙ্গল। লাল গ্রহ। গ্রহটিকে নিয়ে মানুষের ভীষণ ভয়। ওখানে আছে নাকি বুদ্ধিমান প্রাণী। সবুজ তাদের রঙ। ছোটখাট চেহারা। তবে অসাধারণ বুদ্ধি। ওরা পৃথিবীতে আসবে, লড়াই করবে, জয় করবে পৃথিবী। মানুষ এঁটে উঠতে পারবে না!

কিন্তু যন্ত্রমানব কী দেখল খুঁটিয়ে? এক

■ নাসার চোখে লাল গ্রহ মঙ্গল

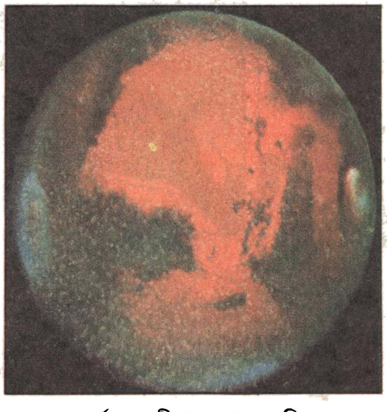

ঊষর এবড়ো-খেবড়ো মরুভূমি। নুড়ি পাথর কিংবা ছোট-বড় পাথরের চাঁই বিশাল এলাকাটায়—১৬০ কিলোমিটার লম্বা, ৯৭ কিলোমিটার চওড়া। অনেক গভীর গহ্বর। এরই একটা অ্যারিস ভ্যালি—বিস্তীর্ণ অথচ অগভীর এক গুহামুখ—৪.৮ কিলোমিটার লম্বা, ৩.২ কিলোমিটার চওড়া। আছে পাহাড় একটা, ১২০০ ফুটের মতো উঁচু। থাকতে পারে আরও উঁচু পাহাড় আরো কোথাও। ঐ যন্ত্রমানব প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করেছে দুটো পাথর—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বার্নাকল বিল' ও 'যোগী'। এ পর্যন্ত জানা গেছে মঙ্গলের ঐসব পাথরের সঙ্গে পৃথিবীর পাথরের মিল রয়েছে। আছে ভাল রকম সিলিকা যা পাওয়া যায় স্ফটিক, চকমকি পাথর, বালি প্রভৃতিতে। তিনভাবে হতে পারে—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, চাপের ফলে পাথর গলে যাওয়া ও পরে জমাট বাঁধা এবং

জলপ্রবাহের পর পলি জমা।

তাহলে কি মঙ্গলে জল ছিল কোনোদিন? হয়তো বা। দেখা গেছিল, মনে হয়েছিল আছে বড় বড় খালের লম্বা দাগ—বুদ্ধিমান প্রাণীরা শহরে শহরে জল পৌঁছে দিতে নাকি কেটেছিল ঐ সব খাল।

কিন্তু কোথায় সে সব শহর, ঘরবাড়ি, প্রাণী? মঙ্গলে হয়েছিল ভয়ানক বন্যা। ১০০ কোটি বছর আগে। তাতেই কি তবে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে সব প্রাণ? গত বছর কয়েকটা উল্কাপিণ্ড এসে পড়েছিল কুমেরুতে—চারশো কোটি বছরের পুরনো—তাতে ফসিলের আকারে পাওয়া গেছিল আদি কোনো প্রাণীর চিহ্ন। এই নিয়ে তখন তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে আশ্চর্য মিল ধরা পড়েছে এবারে মঙ্গলের বুকে পরীক্ষা করা পাথরের। তাহলে প্রাণ যদি এসেও ছিল কোনোদিন, প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি সেখানে।

এবারের মঙ্গল অভিযান থেকে শুধু ছবি আসবে। পরবর্তী অভিযানে ২০০৫ সালে নিয়ে আসা হবে পাথর প্রভৃতি। কিন্তু যেহেতু একদা প্রাণ ছিল বলে সন্দেহ, যদি কোনো মারক ভাইরাস থেকে থাকে ঐ সব পাথরে? তারও বিশেষ ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখা হয়েছে—আমেরিকার উটা ও ফোর্টডেট্রিকে টানা সুড়ঙ্গ আছে। রাসায়নিক অস্ত্র থেকে রক্ষা পাবার জন্য। পাথর রাখা হবে সেখানে।

সে ভবিষ্যতের কথা। আজ মঙ্গল বড় নিষ্করুণ। মাঝে মাঝে চলে ধুলোর হু হু ঝড়ের মাতন। তাই গ্রহটি লাল। এখন পৃথিবীর মানুষই গিয়ে সেখানে বসতি গড়ে তুলতে পারে। আগামী দু' তিন শতকের ভিতর মঙ্গলই হয়তো হবে নয়া পৃথিবী! ওখানকার আবহাওয়াকে মানুষ পৃথিবীর মতো করে নিতেও পারবে হয়তো। অনেক বাসযোগ্য ভূমি। অফুরন্ত খনিজ সম্পদ।

যদি সত্যিই কোনোদিন পৃথিবীর মানুষকে ওখানে বাস করতে হয়, ওখানকার গড় তাপ পৃথিবীরই কাছাকাছি—৩০°–৬০° সেন্টিগ্রেডকে কাজে লাগাতে হবে। মঙ্গলের দিন-রাতও অনেকটাই পৃথিবীর মতো। ৩৭ মিনিটের তফাৎ। পৃথিবী থেকে দূরত্বও কম। খবর যেতে-আসতে লাগবে মাত্র ১১ মিনিট। মঙ্গলে প্রাণ নেই। ভবিষ্যতে কি সে প্রাণচঞ্চল হবে তাহলে? বিশ্বের মানুষ গিয়ে বাস করবে মঙ্গলে!!

হোক এসব। ক্ষতি কী? ততদিনে মনে হয় পৃথিবীর কোনো বিপদ আসবে না। কিন্তু এই অভিযানের খরচ ১০০০ কোটি টাকা। প্রথমে পৃথিবীকে আরো ভালোভাবে বাসযোগ্য করার জন্য এ টাকাটা খরচ করাও যেতে পারত। তবে এখন আর এত টাকা খরচ করবার দরকার নেই, যখন জানা গেল মঙ্গল গ্রহে সবুজ বোম্বেটেদের কোনো অস্তিত্বই নেই—নেই ওদের থেকে পৃথিবী আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা।

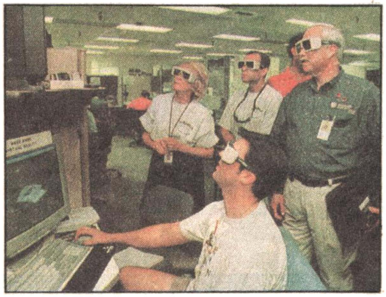

■ সোজার্নার পাঠাচ্ছে মঙ্গলের থ্রি-ডাইমেনশন ফটো। উদগ্রীব হয়ে দেখছেন কন্ট্রোলরুমের বৈজ্ঞানিকরা।

■ মঙ্গলের মাটিতে পাথফাইন্ডার

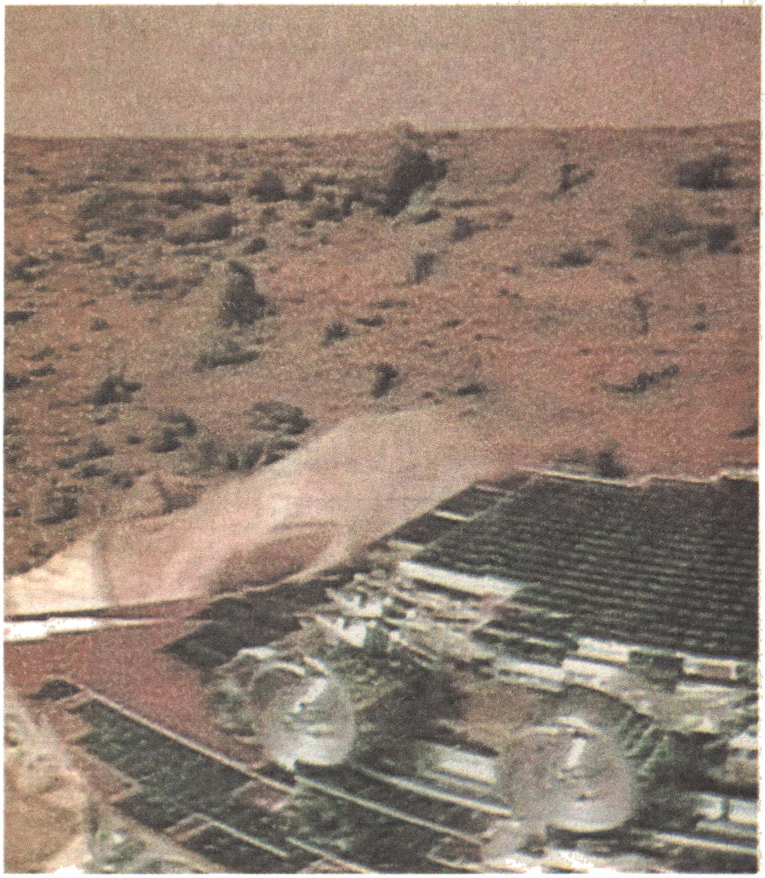

ছবি আমেরিকান সেন্টারের সৌজন্যে।

দুঃসাহসী অটোপাইলট

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তাঁর কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্ত এর আগে কখনও আসেনি। রানওয়ের প্রায় শেষ মাথায় তখন পৌঁছে গেছে প্লেনটি। প্রতি মুহূর্তে তার গতি বাড়ছে। একটু দূরেই জ্বলছে চারটি বড় বড় লাল আলো। বারো কিলোমিটার লম্বা রানওয়ের ঐ শেষ সীমানা। পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন। প্লেনটিকে এর অনেক আগেই তুলে নিতে হবে শূন্যে। সেইমতো জয়স্টিকে পাঁচটি আঙুলও রেখেছিলেন তিনি। তাঁর অতি বিশ্বস্ত আঙুলগুলিকে সবসময়েই ব্যবহার করছেন সঠিকভাবে। আকাশপথের বিপদও কি কম? রয়েছে

নীল আকাশের বুকে।

এ-৩৪০ এয়ারবাসের ককপিট।

ঘূর্ণিবায়ু, অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া কিংবা যান্ত্রিক গোলোযোগ। কতবার মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখি হয়েছেন ক্যাপ্টেন। তবে অসাধারণ তাৎক্ষণিক বিচারবুদ্ধির ফলে তিনি বেরিয়ে এসেছেন মৃত্যুর ফাঁদ থেকে। আর তার ফলে বেঁচে গেছে অসংখ্য যাত্রীর প্রাণ। প্রতিবারই উড়ন্ত প্লেনের উইন্ডস্ক্রিনে মৃত্যু যেন প্রতিহিংসার দৃষ্টি হেনে গেছে। যার অর্থ, ঠিক আছে। আবার আসব আমি।

ক্যাপ্টেন অবশ্য লুকিয়ে থাকার মানুষ নন। তাঁর চাকরিটি যে কত বিপজ্জনক প্রতি মুহূর্তে তিনি তা অনুভব করেন। মৃত্যু যেন উড়ন্ত বিমানের ডানাতেই বসে থাকে। আর দৈনন্দিন দেখা-সাক্ষাতের ফলেই বোধহয় ওঁকে আর ভয় করে না তেমন। তবে তিনি তটস্থ থাকেন উড়ন্ত আত্মাগুলির জন্য, যে আত্মাদের তিনি অহরহ পৌঁছে দিচ্ছেন এক দেশ থেকে আর এক দেশ। আত্মা বলতে বিমানের যাত্রী এবং বিমানকর্মীদের মিলিত সংখ্যা। দেশ-বিদেশের পাইলটরা বিমানের মোট মানুষের সংখ্যাকে Total Number of Soul বলতে ভালবাসেন। তবে সেদিন সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে ক্যাপ্টেন নিজের কথাই ভেবেছিলেন। খুব দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল স্ত্রী এবং সন্তানদের। বড় মেয়েটি

যে সেদিন ম্যাথস একজাম দিতে গেছে সে কথাটিও দিব্যি মনে পড়ল তাঁর। তাঁর বিস্ফারিত চোখ তখন একটি বার্তার ওপর। শূন্যে ওড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে প্লেনের কম্পিউটার একটি ভয়ানক বার্তা দিচ্ছে। ক্যাপটেনের এই অত্যাধুনিক এ-৩২০ প্লেনটিতে নাকি জ্বালানি তেলই ভরা হয়নি। আর জ্বালানিবিহীন প্লেন নিয়ে আকাশে ওড়া? যে কোনও পাইলটই এমন স্বপ্ন দেখলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসবেন।

প্লেনটির গতি তখন ঘণ্টায় প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার। দূরের লাল আলোগুলি এখন স্পষ্ট। পথ প্রায় শেষ হয়ে এল। প্লেনটিকে থামাতে গেলেই সেটি ছিটকে পড়বে কোনও এক দিকে। তারপর সে এক আগুনের সমুদ্র। গোটা প্লেনটিই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মৃত্যু যখন থাবাটি প্রায় বসিয়ে দিয়েছে, তাকে আবার ঠেলে সরিয়ে দিল ক্যাপ্টেনের সেই সদা বিশ্বস্ত পাঁচটি আঙুল। কন্ট্রোল স্টিক ধরে টানতেই পাখির মতো শূন্যে ভেসে পড়ল প্লেনটি। অমনি পায়ের তলায় চলে এল এয়ারপোর্ট, পথঘাট, বাড়িঘর আর মানুষজন। আকাশে শীতের নরম রোদ। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। এমন চমৎকার দিন দেখলে বিপদের কথা মনেই হয় না। কিন্তু ক্যাপ্টেনের হলো। ওপরে উঠতে উঠতেই কন্ট্রোল টাওয়ারকে খবরটা দিলেন তিনি। তারপর এয়ারপোর্টে নামার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য! কন্ট্রোল টাওয়ারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমলই দিলেন না ক্যাপ্টেনের আরজিকে। বরং গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার পাখিটিকে আকণ্ঠ তেল গেলানো হয়েছে। এবং সেই ফুয়েলের কাগজে দস্তখতও করেছ তুমি।

প্লেনটি তখন ক্রমশই ওপরে উঠছে আপন খেয়ালে। আপাতত তিরিশ হাজার ফিট অবধি উঠবে প্লেনটি। এই উচ্চতায় পৌঁছাতে এটির সময় লাগবে মাত্রই পনেরো মিনিট। ওপরে উঠতে উঠতেই কথা হচ্ছিল। কন্ট্রোল টাওয়ার আবার জানাল, তেল কোম্পানি একটু আগেই জানিয়েছে তোমার সবকটি ট্যাঙ্কেই মজুত রয়েছে তেল। কাজেই নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।

পাইলটদের যেটি সবচেয়ে বেশি থাকে তা হলো আত্মবিশ্বাস। সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ-জ্ঞান করার ঐ একটিই ম্যাজিক। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাসই তখন আর নেই

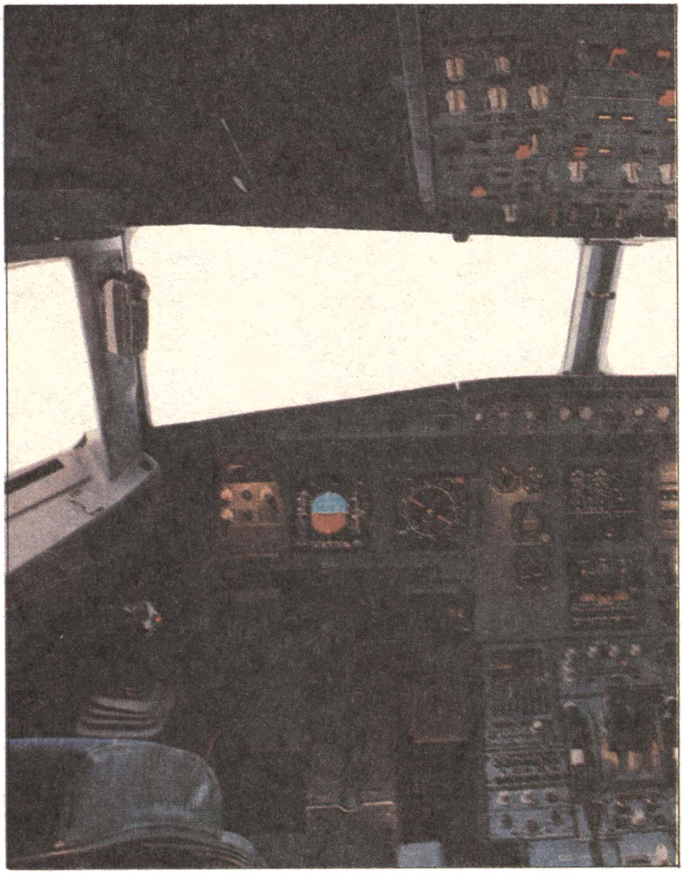

এ-৩২০ এয়ারবাসের ককপিট।

ক্যাপ্টেনের। কন্ট্রোল টাওয়ারকে তিনি সোজাসুজি বলে বসলেন, যদি এয়ারপোর্টে নামতে না দাও, আমি ব্যারাকপুরের গঙ্গাতেই নামছি। অগত্যা অনুমতি মিলল। যদিও এই অত্যাধুনিক প্লেনটি জলের ওপর নামতে সক্ষম তবুও তা সমীচীন বোধ করলেন না কন্ট্রোল টাওয়ার।

প্লেনটি নামার পর পরীক্ষা করা হলো ট্যাঙ্ক। তেল রয়েছে প্রায় কানায় কানায়। স্বভাবতই ক্যাপ্টেনকে অপ্রতিভ দেখাল। লজ্জা লজ্জা মুখে তিনি তখন বলছিলেন, দেন হোয়াই ডিড ইট ডু দ্যাট? সত্যিই তো। এমন মারাত্মক ভুল কি করে করল অটোপাইলট? বিশেষ করে প্লেনকে সুরক্ষিত রাখার অনেকটাই যখন তার হাতে? সেদিনকার সেই ঘটনাটি রয়ে গেছে আজও রহস্যের আড়ালে। কার ভুল হয়েছিল সেদিন? ক্যাপ্টেনের? নাকি কম্পিউটার পাইলটের?

কলকাতার পর দিল্লি। সেখানেও মাতব্বরি দেখাতে গিয়ে ঐ একই মডেলের প্লেনটিকে যাত্রী সমেত প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল যন্ত্রটি। সেদিনও আবহাওয়া ছিল চমৎকার। প্লেনটি টেক অফও করেছে সুন্দরভাবে। মসৃণগতিতে সেটি উঠে যাচ্ছিল ওপরের দিকে। সহসা ঝাঁকুনি দিয়ে গোটা প্লেনটি কেঁপে উঠল থরথর করে। পাইলট অমনি বুঝলেন তাঁর এবারকার যাত্রাটি শুভ হয়নি। ডানদিকের ইঞ্জিনটিতে একটি শকুন ঢুকে গিয়েছে।

আকাশপথে পাইলটের আর এক আতঙ্ক এই পাখি। আজ পর্যন্ত অগুনতি মানুষ মারা গেছেন প্লেন দুর্ঘটনায়। যার মূলে এই নিরীহ পাখি। শতকরা নব্বই ভাগ ঘটনা ঘটে দেড় হাজার ফিট উচ্চতায়। পরিযায়ী পাখিরা যখন দল বেঁধে আকাশে ওড়ে তখন এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে দুই হাজার ফিট ওপরেও। আবার পনেরো হাজার ফিট ওপরেও এমন সংঘর্ষ হয়েছে। এক ধরনের মরাল আছে যারা সবসময় এতটাই উঁচু পথ দিয়ে চলাফেরা করে। জেট প্লেনের সঙ্গে এমন ঘন ঘন পাখিদের সংঘর্ষের কারণটি অবশ্য বার করা হয়েছে। জেট ইঞ্জিনের কম্পন বেশ

ককপিটের মধ্যে থাকে এইরকম ছায়া-ঘন- আলো যা পাইলটের মনকে স্নিগ্ধ করে।

কিছু পোকাকে আকর্ষণ করে। আর সেই পোকার টানেই ছুটে আসে পাখি। এবং ইঞ্জিনের প্রবল টানে বেচারীরা ঢুকে যায় ইঞ্জিনের মধ্যে। যন্ত্রটিকে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ অকেজো করে দিয়ে। যার ফলে এয়ারলাইনারের ক্ষতি হয় বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

তো পাখি ঢুকে সেই এ-৩২০ মডেলের নতুন প্লেনটির ডানদিকের ইঞ্জিনটির কাজ প্রায় বন্ধই করে দিল। পাইলট যখন সেটাকে সারাবার ভার অটোপাইলটকে দেবেন ভাবছেন, ঠিক তখনই ঘটল আশ্চর্য সেই ঘটনা। বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কম্পিউটার বাঁদিকের অক্ষত ইঞ্জিনটিই দিল বন্ধ করে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ঐ খারাপ ইঞ্জিনটির সাহায্যে কোনোমতে পাইলট নামিয়ে আনেন সেদিন প্লেনটি।

১৯৮৯ সালে আমাদের দেশে এ-৩২০ মডেলের পনেরোটি অত্যাধুনিক এয়ারক্র্যাফট কেনা হয়। এই মডেলটিই ছিল ফ্লাই বাই ওয়্যার বা সম্পূর্ণ কম্পিউটার চালিত আধুনিক প্রযুক্তির শেষ কথা। এরোপ্লেনে কম্পিউটার অবশ্য নতুন নয়। একটু পরে আমরা আসছি সে কথায়। হাল আমলের প্রায় প্রতিটি প্লেনেই বসানো হয়েছে যন্ত্রটি। এমনকি সুপারসনিক জেট প্লেন কনকর্ডেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে গত সাতাশ বছর ধরে। এবং আজ পর্যন্ত তার ভ্রান্ত আচরণের প্রমাণ তেমন পাওয়া যায়নি। এর কারণ অবশ্য একটাই— প্লেনটিতে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল থাকাতে পাইলট নিজেই সব দায়িত্ব নিতে পারেন, কম্পিউটার একটু বেগড়বাঁই করলেও। কিন্তু এ-৩২০ মডেলের প্লেনটিতে পাইলটরা যেন কম্পিউটারের হাতের পুতুল। তার এত বড় দুঃসাহস, যন্ত্র হয়েও সে পাইলটদের বেশ কয়েকটি নির্দেশ অবহেলা-ভরে অমান্য করতে পারে। আর তারই যেন প্রমাণ হিসেবে ঘটে যাচ্ছিল একটার পর একটা এমন ঘটনা। পাইলটরা উষ্মা প্রকাশ করছিলেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই মডেলের এয়ারক্র্যাফট চালাতে অস্বীকারও করা হয়েছিল। তবু সরকারিভাবে চালু রাখা হয়েছিল এই মডেলটিকে। আর তারপরই ঘটল ভয়ঙ্কর সেই দুর্ঘটনা। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০। ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টের কাছেই ভেঙে পড়ল এ-৩২০ এয়ারক্র্যাফট। নিহত হলেন বেশ কিছু মানুষ। এবার সোচ্চার হলেন দেশের সাধারণ মানুষও। ফলে বেশ কিছুদিনের জন্য বসিয়ে দেওয়া হলো বাকি চোদ্দটি এয়ারক্র্যাফট। কারণ অনুসন্ধান করতে বিশেষজ্ঞ কমিটি বসানো হলো। ডাকা হলো আকাশযানটির ফরাসি নির্মাতাদেরও। সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে জানা গেল ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অটোপাইলট ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবং পাইলটদের এই উন্নত মডেলের এয়ারক্র্যাফট চালাবার ঠিকমতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

এ-৩২০ বা আরও উন্নত এয়ারক্র্যাফটগুলি (আমাদের দেশে নেই) সারা পৃথিবীতে কেমন চলছে? অটোপাইলটের আচরণ কি সে সব দেশে চিন্তার কারণ হচ্ছে না? দুর্ঘটনার কবলে পড়লে দায় চাপছে কি মৃত পাইলটের কাঁধে? অটোপাইলটের মিলছে রেহাই?

প্রশ্নগুলি আলোড়ন ফেলেছে আমেরিকা এবং ইওরোপের বহু দেশেই।

প্রমাণ পাওয়া গেছে ঠিক একই ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে অটোপাইলট। প্লেন চালাতে চালাতে ওঁদের প্রায়ই স্বগোতোক্তি করতে শোনা যায়, What is it doing now? কিংবা Why did it do that?

পৃথিবীর প্রথম অটোপাইলট চালিত এরোপ্লেনটি আকাশে ডানা মেলেছিল ১৯১৪ সালে। আমেরিকার L. SPERRY-র তৈরি সেই যন্ত্রটি ছিল তিন অক্ষ বিশিষ্ট একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। যা তাঁকে ছোটোখাটো কয়েকটি সাহায্য করেছিল ওড়বার সময়। তবে স্পেরির তৈরি সেই যন্ত্রটিই এখনকার অটোপাইলটের পূর্বসূরী।

বৈদ্যুতিক অটোপাইলট ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আমেরিকার লড়াকু প্লেনগুলিতে এই যন্ত্রটি চমৎকার সব দায়িত্ব পালন করে। সে আমলের দুটি ব্যবস্থা এখনও চালু হয়েছে অটোপাইলটের ক্ষেত্রে। FEEDBACK CONTROL THEORY এবং ELECTRONIC COMPUTERS।

অটোপাইলট বা অটোম্যাটিক পাইলট মানে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্লেনটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। এর কাজ হলো পাইলটের সঙ্গে সহযোগিতা। ওঁদের কাজ কমিয়ে দিয়ে নির্ভার এবং চিন্তামুক্ত করা। স্পেরি সায়েবের সেই একরত্তি অটোপাইলট আজ যন্ত্রদানব বিশেষ। অভাবনীয় দ্রুততায় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে সেরে দেয় নানা জটিল কাজ আর হিসেব-নিকেশ। বিপদের সময় সে পাইলটের পাশে দাঁড়ায় নরম বন্ধুর মতোই। উড়ানের সময় সে যেন এক অতন্দ্র প্রহরী। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে পাইলট অটো-পাইলটে সেট করে নেন তাঁর আকাশযানটিকে। তারপর তিনি আরাম করে চুমুক দেন তাঁর উষ্ণ কফির পেয়ালায়। আর আপনমনে লক্ষ্যের দিকে প্লেনটিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় অটোপাইলট। যাকে ভালোবেসে নাম দেওয়া হয়েছে জর্জ। অথচ এমন বিশ্বস্ত যন্ত্রটিকেই কিনা বলা হচ্ছে সে নাকি বিশ্বাসঘাতক? কেনই বা তার বিরুদ্ধে কিছু পাইলটের এত রাগ, উষ্মা এবং গভীর সন্দেহ?

প্রতিটি যন্ত্রের কাছেই মানুষের কিছু প্রত্যাশা থাকে। তা হলো উচ্চমানের পরিষেবা। জর্জের বেলায় প্রত্যাশাটা একটু বেশি রকমই বলতে হবে। প্রযুক্তিবিদরা ধরে নেন জর্জ হবে একজন উচ্চশিক্ষিত চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ পাওয়া পাইলটের মতোই। এতদিন জর্জ সে আশা পূরণ করে এসেছে। অনেকগুলি সেন্সর ব্যবস্থার সাহায্যে সে আচরণে মানুষকেও ছাপিয়ে যেতে পারে অনেক সময়। এই সেন্সরগুলি হলো—

১) GYROSCOPE—এক ধরনের কম্পাস এবং নিয়ন্ত্রক।

২) ACCELEROMETER—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ত্বরণ মাপার যন্ত্র।

৩) ALTIMETER—প্রতি মূহূর্তে প্লেনটির অবস্থান কত ফিট উচ্চতায় দেখার যন্ত্র।

৪) AIRSPEED INDICATOR—বাতাসের গতিবেগ মাপার যন্ত্র।

৫) AUTOMATIC NAVIGATION — রাডার এবং বেতারের নির্দেশ অনুযায়ী পথনির্ণায়ক যন্ত্র।

এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে বেতার মারফত আসা নানা নির্দেশ।

জর্জ যতদিন সম্পূর্ণ মানুষের আজ্ঞাবহ ছিল ততদিন তার সঙ্গে সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। মুশকিল করল এই এ-৩২০ মডেলের এয়ারক্র্যাফট। এই যানটির জর্জ চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী। এত দ্রুত তার কাজ করার ক্ষমতা, তার সঙ্গে খেই রাখাই হয় মুশকিল। অহেতুক রকমের বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সে নাকি প্রায়ই বিপদের মুখে

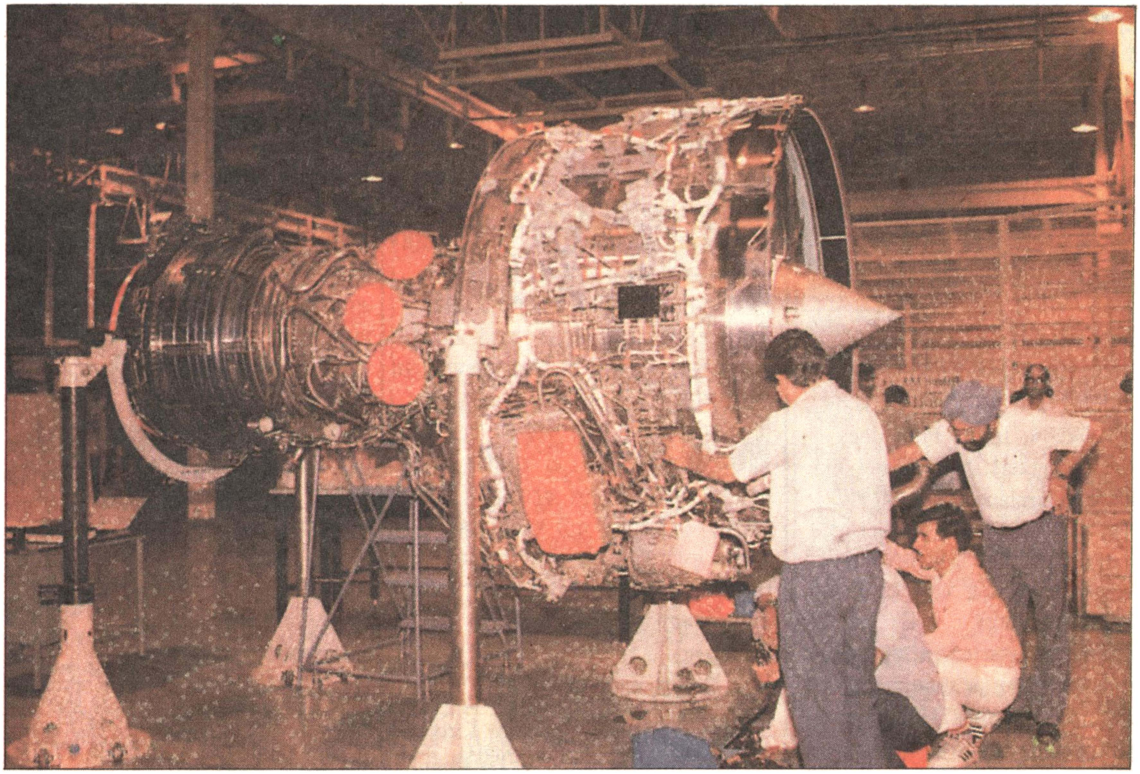

জেট ইঞ্জিনের মেরামতি চলছে।

আনন্দ ভ্রমণে কচি-কাঁচারা।

ঠেলে দিচ্ছে যাত্রীবোঝাই গোটা একটি প্লেনকেই।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তো জর্জ নিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকরা খুব বিপদের কয়েকটি সংকেত ছাড়া ওর মুখে ভাষা দেননি। ফলে ওর হয়ে কথা বলতে এলেন জর্জের নির্মাতারা। আর সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যালোচনা করতে এগিয়ে এলেন বিভিন্ন দেশের AIR SAFETY COUNCIL। ওঁরা দীর্ঘদিন ধরে উড়ানকালীন পাইলট এবং জর্জের কাজকর্ম দেখলেন। সাক্ষী হিসেবে ডাকাও হলো সেই সব পাইলটদের, যাঁরা জর্জের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন। তদন্তের চেয়ারম্যান ছিলেন একটি সাতাশ বছরের যুবক। নাম রিচার্ড ডাক্সবারি, অটোপাইলটের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক বন্ধুর মতোই। তিনি নিজে চালাতেন ৭৫৭-২০০ মডেলের বোয়িং। তবে অতি বৃহৎ ৭৪৭-৪০০ জাম্বো জেট চালানোর অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল।

বহুদিন ধরে সবকিছু তদন্ত করে মাত্র একটি বাক্যেই তাঁর রায়টি জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, If the Pilot does not like computers, he will not like flying these airplanes. তাঁর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল আশ্চর্য সব তথ্য। তিনি অকাট্য সব প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন অতি অনুগত এবং বিশ্বস্ত জর্জ মাঝে মাঝে কেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে যায়!

স্বাভাবিক অবস্থায় অটোপাইলট কাজ করে অতি চমৎকার। সে তখন একান্ত অনুগত। তবে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সে কিছু নির্দেশের প্রত্যাশা করে। যাতে সে বুঝতে পারে পাইলটের চিন্তার সঙ্গে তার আচরণ একই রকম হচ্ছে। আর ঠিক এই জায়গাটিতে অকৃতকার্য হয়েছেন বহু পাইলট। এবং ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। এ-৩২০ মডেলের অতি উচ্চমানের জর্জের কাজকর্ম বেশ কিছু পাইলট ভালভাবে বুঝে উঠতেই পারেননি।

রিচার্ড নিজেও চালিয়েছেন এ-৩২০ মডেলের এয়ারক্র্যাফট। প্রথম প্রথম জর্জ তাঁকে চূড়ান্ত অপদস্থ করতে চেষ্টা করতো। কেননা পুরনো মডেলের প্লেন চালিয়ে অভ্যস্ত বলে ঐ আধুনিক প্লেনটি চালাতে গেলেই তাঁর মনে হতো পুরনো মডেলটির কথা। ফলে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়াতে অসুবিধে হতো তাঁর। তবে রিচার্ড হেরে যাওয়ার মানুষ নন। কৈশোর থেকেই তাঁর স্বপ্ন দেশের সেরা পাইলট হবেন তিনিই। কঠিন পরিশ্রম করে নতুন মডেলটিকে একবার পোষ মানাতেই প্লেনের যন্ত্রপাইলট তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে পড়ে। রিচার্ড প্রমাণ পেয়েছিলেন, MODE বা তথ্য ঠিকমতো না পেলে অটোপাইলট রীতিমতো দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। আর তখনই তার কাজকর্ম হয়ে ওঠে রীতিমতো খামখেয়ালি। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছিলেন তিনি। প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ায় ঘটে যাওয়া সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটির কথায় আসা যাক। সিডনির আকাশ সেদিন ঘন কালো মেঘে ঢাকা। বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে ছিল ঘন ঘন বজ্রপাত এবং মুষলধারে বৃষ্টি। নামার সময় উপযুক্ত আলো না থাকলে বৈমানিকেরা ইনস্ট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেম বা আই. এল. এস. ব্যবস্থার সাহায্য নেন। আর সে কথাই ভেবে যাচ্ছিলেন সিডনি এয়ারপোর্টে নামতে চাওয়া এ-৩২০ এয়ারক্র্যাফটের পাইলটটির। তখনো তাঁর প্লেনটিকে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করছে অটোপাইলট। ঝড়-ঝঞ্ঝার তুমুল দাপাদাপিকে সামাল দিয়ে সে প্রায় পৌঁছে গেছে তখন এয়ারপোর্টের ওপরে। আই. এল. এস. ব্যবস্থা নিতে গেলে প্রথমেই বন্ধ করে দিতে হবে অটোপাইলটের সুইচ। যাতে জর্জকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্য পাইলটটির জর্জকে নিষ্ক্রিয় না করেই তিনি কন্ট্রোল কলামে চাপ দিয়েছিলেন। আর এ অর্থ না বুঝে বিভ্রান্ত হয়েছিল বেচারি জর্জ। পাইলট যখন ভাবছেন তাঁর প্লেনটি এবার নিচের দিকে নামা শুরু করবে, সেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কাণ্ডটি করে বসে জর্জ। কন্ট্রোল স্টিকে চাপের অর্থ সে বুঝে নেয় প্লেনটিকে আরও ওপরে তুলতে হবে। ফলে স্টেবিলাইজার নিয়ে কাজ শুরু করে দেয় সে। অন্যদিকে পাইলটটি কাজ করছিলেন এলিভেটর নিয়ে। দুটি বিপরীতমুখী কাজের ফলে বিমানটি আছড়ে পড়ে মাটিতে। আরও একজন অন্যমনস্ক পাইলটের কথা বলা হয়েছিল রিপোর্টে। তিনি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন একটি ডিসি-১০ মডেলের প্লেন। এয়ারপোর্ট ছেড়ে সেটি সবে ওপরে উঠছে। ভার্টিকাল স্পিড মোডের সাহায্য নিতে জর্জকে তেমন নির্দেশই তিনি দিয়েছিলেন। এরপর আকস্মিকভাবে এই নির্দিষ্ট মোডটির কথা একেবারেই বিস্মিত হন পাইলটটি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এরোপ্লেনটি তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় অর্থাৎ তিরিশ হাজার ফিটে পৌঁছে যায়। প্রতিটি এয়ারক্র্যাফটের এমন সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর ক্ষমতা মাপা আছে। এই মাত্রা অতিক্রম করলে বাতাসের চাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। ফলে প্লেনটি বাতাসের ওপর ভেসে থাকার ক্ষমতা হারায় এবং প্রচণ্ড গতিতে সেটি নিচের দিকে পড়তে থাকে। ডিসি-১০ প্লেনটির অবস্থা ঠিক ঐরকম হতেই পাইলটটির মনে পড়ে যায় তাঁর ভুলে যাওয়া মোডটির কথা। পড়ন্ত অবস্থাতেই পাইলট জর্জকে ঠিকপথে পরিচালিত করেন। এবং রক্ষা পায় মস্ত এয়ারক্র্যাফটটি।

তবে জর্জকে শুধু খলনায়ক বানানো হয়নি রিপোর্টটিতে। তার বিপদত্রাতা রূপটিও সেখানে দেখানো হয়েছে বৈকি।

সে যাত্রায় প্রায় সাড়ে চারশো যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে বিস্তর নাম কিনেছিল একটি জাম্বো এয়ারক্র্যাফটের অটোপাইলট। আটলান্টিক পেরোতে জাম্বো জেটটি যাত্রা শুরু করেছিলো কানাডা থেকে। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে আসতে না আসতেই বিমানটির দুটি ইঞ্জিনে খুব গুরুতর গোলযোগ দেখা দেয়। তবে সে খবর পৌঁছয়নি পাইলটের কাছে। অটোপাইলট নানা চেষ্টাতেও নজর কাড়তে পারেনি তার মানুষ সহকর্মীটির। তখন সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ইঞ্জিনের ত্রুটি সারাতে ব্যস্ত হয়। আপ্রাণ চেষ্টা করে সে যখন গোলমালটি প্রায় সারিয়ে ফেলেছে, ঠিক তখনই পাইলটের নজর পড়ে সেখানে। এবং ইঞ্জিন দুটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে পাইলটের চটজলদি মেরামতির ফলে। রিপোর্টে আছে এমন অনেকই ঘটনার কথা।

বিশেষজ্ঞ কমিটি তাই মতামত দিয়েছেন—অটোপাইলট বিপদের সময় আরও সোচ্চার হোক। নানা উজ্জ্বল আলোর সঙ্কেত দিয়েও সে এ কাজ শুরু করুক। তাতে যদি সে পাইলটের নজর কাড়তে ব্যর্থ হয় তবে সে নানারকম বিপদজ্ঞাপক শব্দ করুক। খুব বেশি বাড়াবাড়ি হলে সে যাতে মানুষের গলায় রীতিমতো হৈচৈ শুরু করতে পারে (Pre-recorded cassette-এর সাহায্যে), কমিটি সেরকম সুপারিশও করেছিলেন।

কমিটির এসব উপদেশ মোটেও পছন্দ হয়নি এড গরম্যানের। এড হলেন হনিওয়েল কোম্পানির ফ্লাইট অপারেশন ম্যানেজার। বিভিন্ন ধরনের অটোপাইলট তৈরি করে এই সংস্থাটি। ককপিট বা পাইলটদের অফিস ঘরটির সাজসজ্জা এবং ডিজাইনের ভার এঁদেরই। গরম্যান আলো নিয়ে কোনওরকম বাড়াবাড়ি চান না। তাঁর মতে বহু বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অনেক অর্থব্যয় করে ককপিটের বর্তমান পরিবেশটি তৈরি করেছেন। নিরিবিলি, ঠাণ্ডা আর শব্দহীন তো বটেই, আলোর ব্যবহারেও তাঁরা এই ছোট কুড়ি স্কোয়্যার ফিট জায়গাটিতে একটি স্বপ্নের পরিবেশ আনতে চেয়েছেন। প্রয়োজনে সেখানে আলোর বন্যা বইতে পারে বটে তবে অধিকাংশ সময়েই সেখানে জ্বালা থাকে নরম আর মায়াবী এবং ঠাণ্ডা আলো। কাজেই কোনও অবস্থাতে বিপদ বোঝাতে আলোর দপদপানি তাঁরা মেনে নেবেন না। বিপদ বোঝাতে দু'একটি ধ্বনির ব্যবহার তাঁরা মানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের গলায় চিৎকার-চেঁচামেচি? অসহ্য!

ওঁরা শুনিয়েছেন একেবারে উল্টো কথা। যত দিন যাচ্ছে ততই নাকি অটোপাইলটের ব্যবহার সহজ হয়ে উঠছে। ওঁরা উদাহরণ হিসেবে ডিসি-১০ মডেলের প্লেনটির কথা বলেছেন। এই প্লেনটিতে অটোপাইলট এবং অটোথ্রটলকে নিয়ন্ত্রণ করতে আলাদা আলাদা সুইচ ব্যবহার করেন। এতে নাকি পাইলটদের কখনও সংশয় ঘটেছে। এ ব্যবস্থাটি তাঁরা বদলে দেন এম ডি-১১ মডেলের এয়ারক্র্যাফটে। একটি সুইচের সাহায্যে ঐ দুটি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যও এই প্লেনটির অটোপাইলট দেয় একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে। যেমন প্লেনটির গতি কে নিয়ন্ত্রণ করছে? Pitch অথবা Thrust যাই হোক না কেন, তা জানা যায় সঠিকভাবে। ওঁরা হাজির ছিলেন নানা তথ্য এবং প্রমাণ নিয়েও। পাইলট এবং কো-পাইলটের অনেক কাজ কমিয়ে দিয়েছে এখনকার System automation। পাইলটদের তিনটি নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন। যাতে অটোপাইলটকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করা যায়। এগুলি হলো, সঠিক মোডকে বেছে নেওয়া, এটি কাজ সত্যিই শুরু করল কিনা তা দেখা এবং পাইলটের প্রত্যাশা মতো সে কাজ হচ্ছে কিনা। ওঁদের ট্রেনিং-এর সময়েই এই বিষয়গুলি ওঁদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। বহুক্ষেত্রেই ওঁদের শেখানো হয় এই যন্ত্রটিকে সবসময় ব্যবহার করতে। যন্ত্রটির ব্যবহার যে শুধুমাত্র সীমিত ক্ষেত্রেই, এটি ট্রেনাররা হয় জানেন না কিংবা মানেন না।

রিচার্ড ডাক্সবারির রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল। অটোপাইলটের ভূমিকা নিয়ে রিচার্ডের কোনও সংশয় নেই। তাকে মানুষের মতোই মর্যাদা দিয়ে তিনি বলেছেন, ঠিক মতো ব্যবহার করলে এই যন্ত্রটি যেন ককপিটের তিন নম্বর কর্মী। প্লেন এবং যাত্রীদের প্রতি যার মনোযোগ একটুও কম নয়। তাই সে প্রত্যাশা করে তার মানুষ সহকর্মী দুজনও তার প্রতি সমান মনোযোগী হবেন। তাঁরা যেন ভুলে না যান জর্জ যন্ত্র হলেও সে একজন সুদক্ষ বৈমানিক। পাইলটের ভুল নজরে এলে সেটিকে সংশোধন করার ভার তার। বিপদ যদি আরও ঘনীভূত হয়, পাইলটের নির্দেশ সরাসরি অমান্য করার সাহস সে রাখে। মানুষেরই প্রয়োজনে সে কখনও হয়ে ওঠে অতি মাত্রায় দুঃসাহসী। আবার মানুষের ভুলে তার আচরণ হয় রহস্যময়, আশ্চর্য এবং দুর্জ্ঞেয়। ঠিক যেন সেই হ্যাল নামের কম্পিউটারটির মতো। হ্যাল অবশ্য বৈজ্ঞানিক সৃষ্ট নয়। বরং কল্প-কাহিনীর এক মহানায়ক সে। আর্থার-সি ক্লার্কের টু থাউজেন্ড ওয়ান স্পেস অডিসি এক বহুপঠিত অমর কাহিনী। হ্যালকে নিয়েই সেই উপন্যাসটি রচিত। হ্যাল মানুষের আজ্ঞাবহ ছিল বটে। তবে তার মনোমতো আদেশ না পেলে সে সরাসরি তা অমান্য করতো। প্রয়োজনে অনর্গল মিথ্যে বলার অভ্যেসও তার গড়ে উঠেছিল।

অটোপাইলট মানুষ সহকর্মীদের দক্ষতা দেখতে চায়। তার কোনোই সংঘাত নেই ওঁদের সঙ্গে। নেই কোনও ক্ষমতার লড়াইও। একজন দক্ষ বৈমানিকের তাঁবেদারি করতে পারলে সে যেন খুশিই হয়। রিচার্ড তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন অপছন্দ হলেও যন্ত্র পাইলট বা কম্পিউটারের সাহায্য মানুষকে নিতেই হবে। বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য অবদানটির প্রয়োজনীয়তা মানুষের প্রতি মুহূর্তে। এর সাহায্য নিয়েই মানুষ তার আগামীদিনের যাত্রাগুলি করে তুলবে আরও নিরাপদ, আরও অনেক বেশি আরাম এবং সুখদায়ক। এজন্য তৈরি হতে হবে পাইলটদের। যাঁরা এ পেশাটিতে আসবেন বলে ঠিক করেছেন, রিচার্ড তাঁদের শুনিয়েছেন একটি চমৎকার কথা। "কম্পিউটারকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসা দিয়ে বশ মানানো সম্ভব এই যন্ত্রটিকেও।" তবে তাতেও যদি কাজ না হয়? রিচার্ড সে প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন "সে ক্ষেত্রে প্লেনে উঠেই অটোপাইলটকে ছুটিতে পাঠিয়ে দাও। তারপর ভেসে পড় এক বৈচিত্র্যহীন আর নিস্তব্ধ যাত্রাপথে। হাজার রকম কাজ সামলে গন্তব্যে পৌঁছানোর পরও যদি জর্জের কথা মনে না হয় তবে আকাশে ওড়ার চেষ্টা আর না করাই ভালো। কম্পিউটার জানা যোগ্য লোকের অভাব মোটেই নেই এখনকার পৃথিবীতে।"

কৃতজ্ঞতা ১) AIR TRANSPORT WORLD, MARCH 1995. ২) AIRPORT INTERNATIONAL, by Brian Moynihan.

মরণদ্বীপের মহারণে

অনিন্দ্য গোস্বামী

সমশের পোস্টে বসে কুঁকড়াশ্রীর লাফঝাঁপ দেখছি। কুঁকড়াশ্রী একটি মোরগের নাম। সে এক মহা-মোরগ। কবে থেকে এই ক্যাম্পে আছে কেউ জানে না, আমাদের আগে ডোগরা রেজিমেন্ট ছিল, তারাও বলতে পারেনি। খেল দেখাতে পারদর্শী এই কুঁকড়াশ্রী, হরেক রকমের সার্কাস দেখায়। আপাতত লান্স নায়েক চরণ সিং একটা আগুনের রিং তৈরি করছে এবং কুঁকড়াশ্রী তার মধ্যে দিয়ে লাফাবে বলে কেশর ফোলাচ্ছে।

এমন সময় হাবিলদার এসে স্যালুট করল। সৎ শ্রী অকাল সাব। নর্থ পয়েন্টে...

শ্‌ শ্‌ শ্‌। আমি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ওকে চুপ করতে বললাম। কুঁকড়াশ্রী একটা পারফেক্ট ফাইটার প্লেনের মতো আগুনের রিং পেরিয়ে চলে গেল। সৈন্যদের হর্ষধ্বনি থামবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, বল?

হাবিলদার সতনাম বলল, সাব। নর্থ পয়েন্টে সৈন্যরা নাইট ডিউটি দিতে ভয় পাচ্ছে।

ভয়? আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভুরু কুঁচকে বললাম, মানে?

ভুরুটা আরো বেশি কুঁচকে গোমড়া মুখে সতনাম বলল, সাব। ভূতের ভয়।

সেকি হে? আমি হাতের ইঙ্গিতে চরণ সিংকে চলে যেতে বলে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বাংকারের দিকে এগোতে এগোতে বললাম, ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো হে।

সমশের পোস্ট আমাদের কোম্পানির সবচেয়ে উঁচু ক্যাম্প। একুশ হাজার ফিট

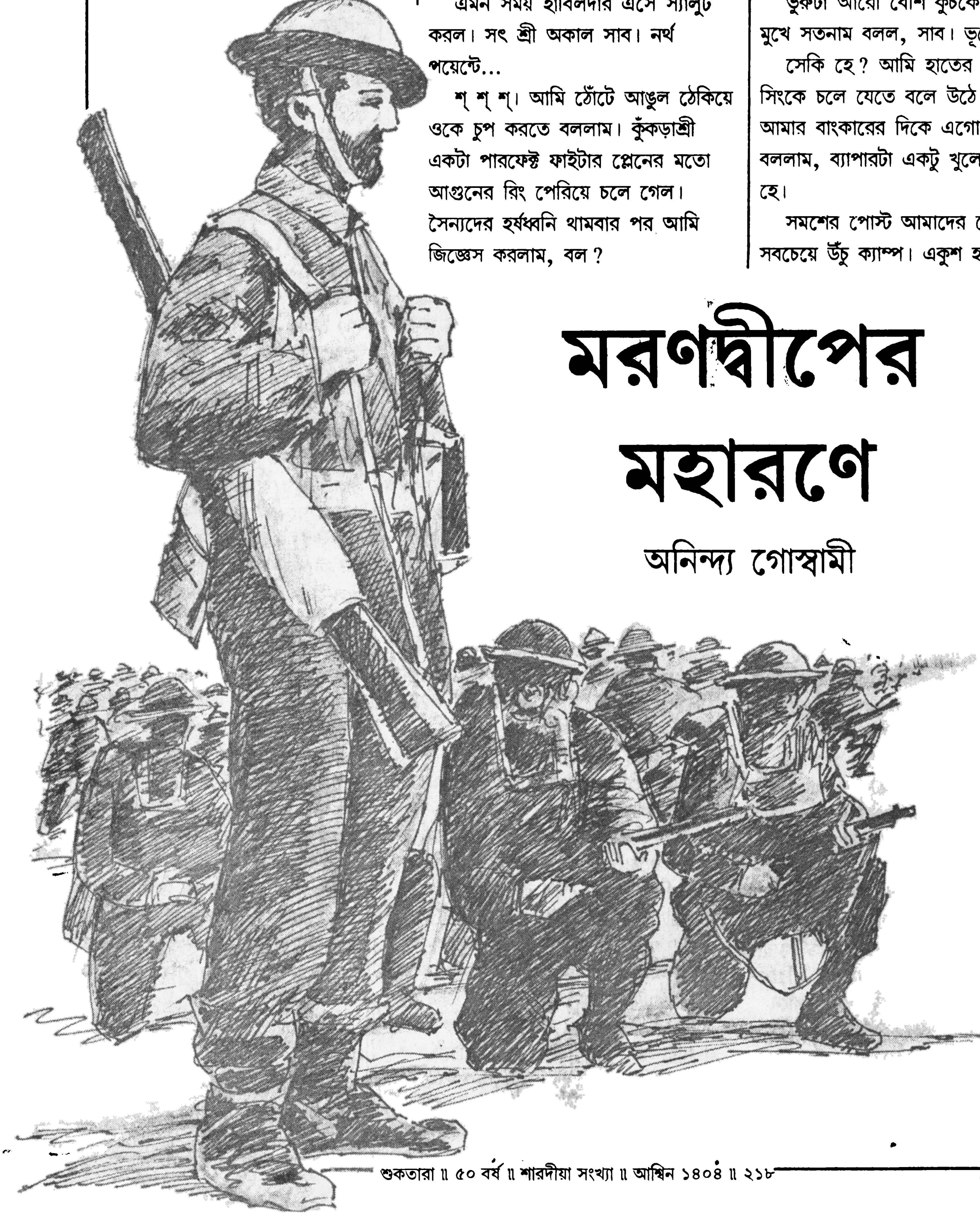

উচ্চতা। আমাদের রেজিমেন্ট নাইন শিখ উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরের পাকিস্তান সীমান্তে পাহারাদারের ভূমিকায়। আমি ক্যাপ্টেন সঞ্জয় বক্সি রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানির অধিনায়ক। আমি এবং আমার সহ-অধিনায়ক লেফটেনান্ট সুখদেব সিং—দুজনের কাজই হচ্ছে টোটক্কর মেরে একটা থেকে অন্য ক্যাম্পে খবরদারি করে বেড়ানো, নয় নয় করেও পাঁচখানা ক্যাম্প আমার কোম্পানির।

সমশের পোস্টের অধিনায়ক সতনাম ভালই ব্যবস্থা করেছে। লোকটা গুণী লোক, সকাল নটার মধ্যেই আমি এসে পৌঁছেছি, তখনই গরমাগরম আলুপরোটা তৈরি। তবে তাতে বিশেষ প্রভাবিত না হয়ে আমি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, কি প্রোগ্রাম তোমার সৈন্যদের?

সব ক্যাম্পের বাইরে সাব। সতনাম বলে, টহলদারি, অ্যামবুশ চলছে।

হুম। আমি হাত ধুয়ে আলুপরোটায় হাত লাগাই। শত্রু ঢুকতে পারবে?

আমরা বেঁচে থাকতে নয় সাব।

আগে এসব এলাকায় এত ঝঞ্ঝাট ছিল না। লোকে বেড়াতে আসত, সারা পৃথিবী থেকে আসত ভ্রমণার্থীরা। বানিহাল

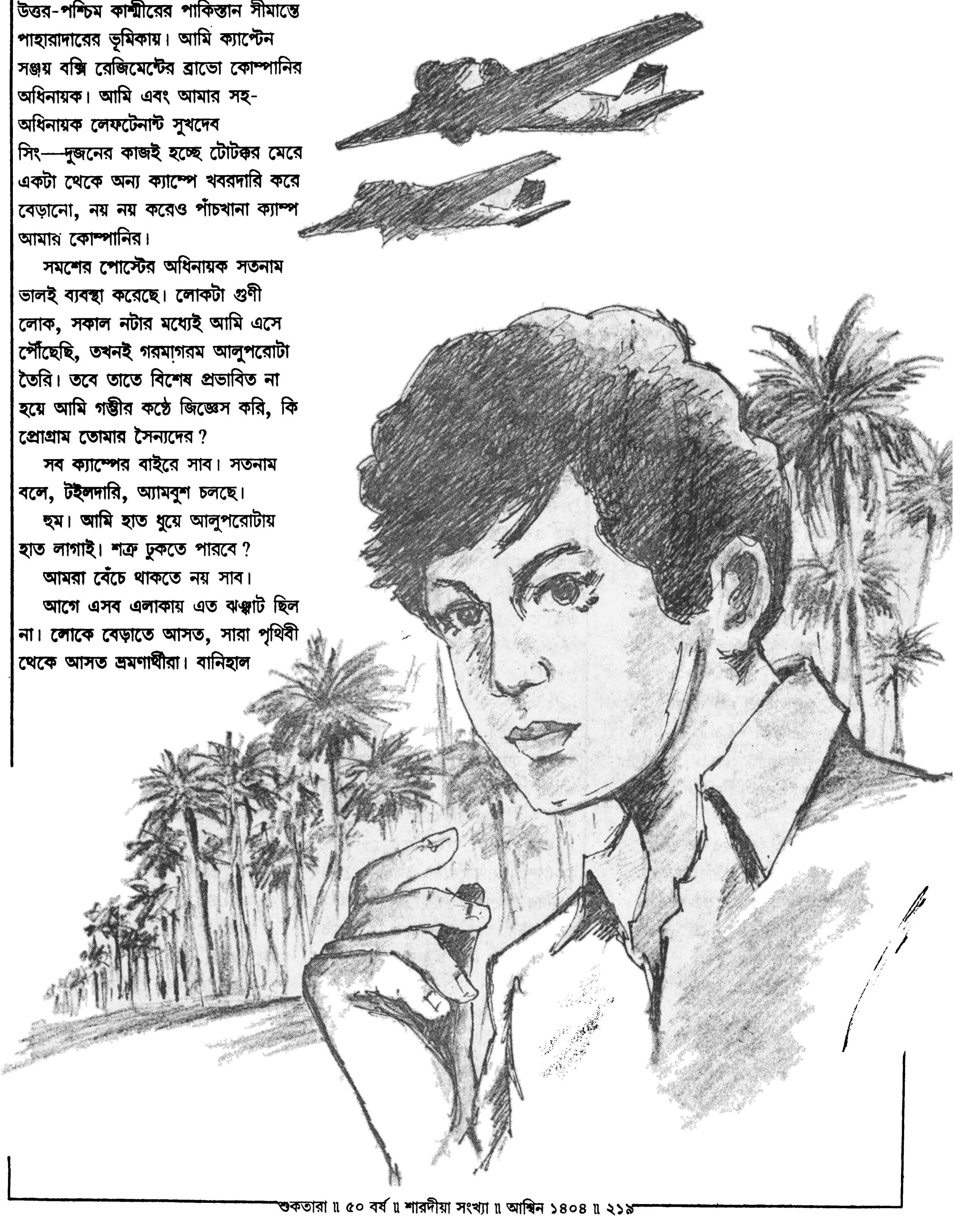

টানেলের কাছে জওহর টানেল পেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত বাস, লাফিয়ে নামত মানুষ, চোখের সামনে দেখতে পেত নানাবর্ণে চিত্রিত এক সুবিশাল গালিচার মতো বর্ণময় ভূস্বর্গ। লোকে পথের পাশে সাইনবোর্ডের ছবি তুলত—দাঁড়াও হে পথিক। দু'চোখ ভরে দেখ। স্বর্গোদ্যান আর সামান্যই দূরে।

কিন্তু সেসবই অতীতের কথা। এখন স্বর্গোদ্যান পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে। সশস্ত্র হানাদার ঢুকে আসে সীমানা পেরিয়ে, তারা কাশ্মীর দখল করে নিতে চায়। আর আমরা তা হতে দেব না। হাবিলদার সতনাম বলে, চেষ্টাও যদি করে, দুশমন জ্যান্ত ফিরবে না।

বুঝলাম। কিন্তু ভূতের ব্যাপারটা কি?

সতনাম সিংহের ব্যাখ্যায় ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। সমশের ক্যাম্পটা পাহাড়ের একটি চূড়ায় অবস্থিত, তার উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ তিন দিক ঘিরে পাকভূমির অধিকার। এখানে সীমানা নির্দেশ খুবই কষ্টসাধ্য কাজ, কারণ গহীনতম অরণ্য এবং হাজার হাজার ফুট গভীর খাদের মধ্যে কোথায় ভূনির্দেশক চিহ্ন তা কেউ বুঝতে পারে না। তাই মূলত এই সব পাহাড়চূড়াগুলোতেই দুই বিরোধী সৈন্যদল ঘাঁটি আগলে বসে থাকে।

সব শুনে আমি বললাম, সৈন্যদের একত্রিত কর। আমি জিজ্ঞেস করব, কিসের ভয়।

সৈন্যরা তো সাব বেশির ভাগ বেরিয়েছে ডিউটিতে। তাছাড়া আমি জিজ্ঞেস করেছি, কেউ ভূত দেখেনি।

তবে? আমি হাসি, এই ভূতের গপ্পোটা গজাল কোত্থেকে?

সাব। ঐ নিচে কাফলাজানার কবরস্থান আছে, তাই....

সো হোয়াট? এবার আমি চেঁচিয়ে উঠি, ওগুলো আমাদেরই সৈন্যদের সমাধি। ছিঃ ছিঃ।

সতনাম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। পঁয়ষট্টিতে জ্যাক লাইট ইনফ্যান্ট্রির সৈন্যদের সঙ্গে এই সেক্টারে পাকসেনার বিশাল যুদ্ধ হয়। পাকিস্তান আর্মির তিন নম্বর বালুচ রেজিমেন্ট মহাবিক্রমে ঝটিকাযুদ্ধে এই ক্যাম্প দখল করে নেয়। চারদিন ভয়ংকর যুদ্ধের পর জ্যাক সৈন্যদল—যারা মূলত এই কাশ্মীরি স্থানীয় যুবক—ক্যাম্পকে দখলমুক্ত করে।

সতনাম। আমি এবার গম্ভীর হয়ে বলি, কান খুলে শোন। এটা ফৌজ, গপ্পো মারার জায়গা নয়। আমি আজ হেডকোয়ার্টারে ফিরছি না, রাতে এখানে থাকব, ক্যাম্পে। নর্থ পয়েন্টে আমি নিজে সারারাত থাকব। আর কাল সকালে আমি জানতে চাই এই ভূতের গুজবটা কে ছড়িয়েছে।

অর্ডার দিয়ে আমি বাংকারে ঢুকে পড়ি। রাত জাগতে হলে একটু দিবানিদ্রা দরকার হয়।

পরের দিন সকালে নর্থ পয়েন্টে সৈন্যসমাবেশ। একটা উঁচু পাথর আছে, তার ওপর আমি উঠে দাঁড়াই। উল্টোদিকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানী ক্যাম্প রুস্তম। ওরা দূরবীনে নিশ্চয়ই আমাকে দেখছে, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। তাছাড়া টেলিস্কোপিক রাইফেলেও একচোটে এতদূরে টার্গেট করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা পাকিস্তানীরা এখন নিজেরা ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় না, উগ্রপন্থী হানাদার পাঠায়। তারা রেগুলার আর্মির চেয়েও হিংস্র ও ভয়ানক, কারণ তারা রণনীতির ধার ধারে না।

মনে রেখো। মনে রেখো হে সৈন্যগণ। অ্যাকাডেমির ইন্সট্রাক্টর মেজর সাহ্নীর ভাষণ দেওয়ার কেতা আমি মনে করার চেষ্টা করি, ভূত বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না। অন্তত ফ্রন্টে, যুদ্ধক্ষেত্রে।

কারণ ভূতে বিশ্বাস করলে তোমার ট্রিগার কেঁপে যাবে।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শুট টু কিল। এক গোলি, এক দুশমন। যে ভূত বিশ্বাস করবে, সে নিজে ভূত হবার জন্যে তৈরি থেকো। কারণ লড়াইয়ে দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া যায় না। এটা ক্রিকেট খেলা নয়। নো সেকেন্ড ইনিংস।

সৈন্যদের মধ্যে একটা চাপা হাসির হররা ওঠে। আমি বলি, মনে রেখো, সমশের পোস্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট। এই পোস্ট কব্জা করলে শত্রুসেনা সেভেনটি এক্সওয়ান সাবসেক্টর কব্জা করতে পারবে। আর তাহলে....তাহলে কি হবে?

সামনে বসা সৈন্যটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আমার মাস্টারী প্রশ্নে চমকে যায়, বোকার মতো উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যাবলার মতো তাকায়। আবার একটা হালকা হাসির হররা ওঠে। আমি ওকে বসতে বলি, পেছনের সারির একট সৈন্য হাত তোলে। বলব, সাব?

সাবসেক্টার আমাদের দখলে বলে, অধিকৃত কাশ্মীরের ওপর দিয়ে চীনা-পাকিস্তান সড়কে আমরা নজর রাখতে পারি।

সাবাস জওয়ান। আমি হাসি, তাতে আমাদের কি লাভ?

সাব। দরকার হলে দুশমনদের চাটনি বানাতে পারব, সহজে।

এবার অনেকে একসঙ্গে বলে ওঠে, ব্যাপারটা সকলের মনে পড়েছে। গুড, আমি মনে মনে ভাবি, এটাই চাই। প্রত্যেকটি সৈন্য যেন একেকটি রণনেতা হয়। আমি বলি, কাল সারারাত আমি এবং সিপাহী দরশন সিং দুজনে নর্থ পয়েন্টে ছিলাম। ভূত কোথায় গেল? পালাল নাকি আমাকে দেখে?

হিন্দুস্থানী ফৌজ কা জওয়ান। তোমার সাথী, তোমার শহীদের কবরস্থান দেখে তোমরা ভয় পাও?

নেহি সাব। সমবেত সৈন্যরা গর্জন করে ওঠে, কভি নেহি।

বাংকারে ফিরে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। হাবিলদার সতনাম সিং এসে বলে, জানা গেছে। আরমারার ছেলেটা এসব ভূতের গল্প রটিয়েছে।

কেন? ওর কোনো কাজ নেই নাকি? যন্ত্রপাতি সারাচ্ছে-টারাচ্ছে? আমি জিজ্ঞেস করি। আরমারার হচ্ছে অস্ত্র, যন্ত্রপাতির মিস্ত্রী।

জী সাব। সতনাম বলে, সে কাজে ওর কোনো ত্রুটি নেই। একদম মাস্টার মিস্ত্রী, দারুণ হাতের কাজ।

আচ্ছা, তাই নাকি? ঠিক আছে, ব্যাটাকে ডাকো তো দেখি। বলে আমি গরম অমলেটে মন দিই।

জয় হিন্দ সাব। একটু পরে বাংকারের সামনে লম্বা ছিপছিপে ছেলেটা এসে স্যালুট মারে, লান্স নায়েক ধীরেন গড়াই তৈয়ার সাব আপকে ইন্টারভিউকে লিয়ে—

অ্যাঁ? আমি অবাক হয়ে যাই, তুমি বাঙালী? এরকম দাড়ি-গোঁফ, পাগড়ি—

নেহি সাব। ছেলেটা আমার বাংলার উত্তরেও হিন্দীতে বলে, হাবিলদার বলেছে।

হাঁ সাব। সতনাম বলে, এত ঠাণ্ডায় রোজ দাড়ি কামাবে। তাই বলছিলাম—

এমন সময় বীপ বীপ শব্দে রেডিও বেজে ওঠে। সতনাম রিসিভার তুলেই তটস্থ হয়ে ওঠে। আমাকে বলে, কর্নেল সাব ডাকছেন।

মাইক ফর রোমিও। মুখের গরম চা হু-হা করে গিলে ফেলে আমি বলি, পাস ইওর মেসেজ। ওভার।

মাইক। অবিলম্বে রেজিমেন্ট বেসে রিপোর্ট কর। ওভার অ্যান্ড আউট।

কর্নেল সাহেবের নৈর্ব্যক্তিক অর্ডার পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি রওয়ানা হই রেজিমেন্টাল বেসক্যাম্পের দিকে। পাহাড়ের গিরিপথ বেয়ে, সংকীর্ণ কার্নিশের মতো রাস্তা পেরিয়ে, কোথাও দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে অন্যান্যবারের মতোই নামি, কিন্তু তখনও জানি না, পাহাড়কে শেষ বিদায় জানিয়ে নামছি।

দুই

খেয়েদেয়ে, বাসন ধুয়ে, রান্নাঘর ঝাঁট দিয়ে পাখি যখন শুতে গেল তখন এগারোটা বাজে।

পাখির শোবার জায়গা বারান্দায়, সিঁড়ির নিচে। কাকারা অনেক আগে শুয়ে পড়েছে, দরজা-জানালা সব ভেতর থেকে বন্ধ করে। এই সময়টা, এই ঘুমোবার আগে পাখির রোজ কান্না পেয়ে যায়। খানিকটা ভয়ে, ওকে একা একা বাইরে শুতে হয়। খানিকটা দুঃখে, এই সময়টাতেই মা-বাবার কথা মনে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই অবশ্য খুব মজা। তখন রোজই বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হয়। বাবা-মার সঙ্গে বেড়াতে যায়, আইসক্রিম খায়, মেলায় নাগরদোলা চড়ে ও। যেন কিছুই হয়নি, যেন বাবা-মা সৈন্যদের হাতে মারা পড়েনি। অদ্ভুত। মাঝরাতে কখনও কুকুরের কান্না অথবা ইঁদুরের টিন উল্টে দেবার শব্দে ঘুম ভাঙলেও, ও বুঝতে পারে না কোনটা সত্যি। এক্ষুণি ঝলমলে আলোয় বাবা-মায়ের হাত ধরে ও স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান থেকে আসছে সেইটা? নাকি এই অন্ধকার রাতে একা বারান্দায় শুয়ে থাকা।

ঠিক সেইরকম সময়েই কোনো একটা প্যাঁচা বিচ্ছিরি আওয়াজ করে উড়ে যায় উঠোনের পেঁপে গাছটা থেকে।

ও ভয় পেয়ে চাদর মুড়ি দেয় সেইসব সময়। এখন অবশ্য তেমন কোনো ভয় করছে না। রাত হলেও বাজারের ওদিকে কোথায় মাইক বাজছে, সেই গান শোনা যাচ্ছে আবছা আবছা। আজ সিংহলিদের পোসন উৎসব ছিল। সব লোক আজ খুব মজা করেছে। এমনকি ওরা নিজেরা তামিল হলেও, কাকা অনেককে নেমন্তন্ন করেছিল। কাকা সকালে কাকিমাকে বলছিল, এসব করতেই হবে বুঝলে? সিংহলি এলাকায় থাকি এটা সবসময় মনে রাখতে হবে। কবে সে ট্রান্সফারটা পাব—

ট্রান্সফার নিয়ে কি করবে? কাকিমা যথারীতি খিঁচিয়ে ওঠে, নর্থে গিয়ে মরব নাকি? এই বেশ আছি।

সে তো নাম পাল্টে সিংহলিদের মতো থাকি বলে। যেদিন লোকে বুঝে যাবে, সেদিন কি হবে? তার চেয়ে তামিল এলাকায় চলে যেতে পারলে অন্তত এভাবে চোরের মতো নাম ভাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

বাজে কথা বোল না তো। তামিল এলাকায় তো রোজ যুদ্ধ চলছে, গাদাগাদা মরছে—

সে কি আর এখানে মরছে না? কাকা বলে, মিক্সড এরিয়াতেও রোজ মরছে। যাকগে ব্যাগটা দাও, দেখি বাজারটা ঘুরে আসি। আজ তো চড়া দাম হবে—

কাকা বাজার যাবার সময় পাখিকেও নিয়ে যায়, বিশেষ করে ছুটির দিনে। অন্যান্য দিন কাকার ছেলে চেন্নাকে সামলাতে হয়, কাকিমা তখন রান্না করে। চেন্না একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে, এবার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সকাল নটার মধ্যে ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। ছেলেটা অবশ্য মহাবিচ্ছু, স্কুল যেতে চায় না কিছুতেই। ওর খালি খেলবার ইচ্ছে। আজ স্কুলে যাব না, চান করবার আগে থেকে ও লাফাতে থাকে, চান করব না।

তবে কি করবি?

পাখিদাদার সঙ্গে খেলা করব। ও বাবা—চেন্না চিৎকার জুড়ে দেয়।

হ্যাঁ। আর পাখিদাদার মতো ঘরের চাকর হয়ে থাকবি। তাই তো? কাকিমা খেঁকিয়ে উঠে এক থাপ্পড় মারে জোরে। ওর ছোট্ট গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায়। পাখি ছাড়া তখন ওকে কেউ চান করাতে পারবে না, তিলে বদমাশ একটা। পাখি ওকে অনেক আদর করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চান করিয়ে দেয়, দাঁত মাজিয়ে দেয়। এমন বদমাশ ছেলে, মুখের পেস্ট পুচ করে পাখির সারা মুখে ছিটিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালায়। এইটাতে পাখির খুব রাগ হয়। ও তখন জল দিয়ে ভাল করে মুখ-চোখ ধুয়ে আবার চেন্নাকে ধরতে বেরোয়, ততক্ষণে হয়তো চেন্না দৌড়ে কুয়োতলায়। বালতিটা তুলে নিয়ে কুয়োতে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। কাকিমা চেঁচায়, ওরে হতচ্ছাড়া। রাক্ষস। আমার প্রাণটা একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভাজাভাজা করে দিল—

আজ ছুটির দিন, চেন্না দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে। সেজন্য কাকা ওকে সঙ্গে নিয়ে যায় বাজারে। ছুটির দিনে কাকার

বাজার মানে হাজার লোকের সঙ্গে গল্প। আর আজকাল গল্প মানেই ঐ এক। মারদাঙ্গা, যুদ্ধের গল্প।

শুনেছ হে? কাল সিংহলি সেটলমেন্টে তামিল গেরিলারা কি করেছে? শ'দেড়েকে মেরেছে—

পোসনের সময়টাও ছাড়বে না? ওগুলো কি মানুষ?

শয়তান, শয়তান। বুঝলেন না? কাকা গম্ভীর স্বরে বলে, নরকের জীব। কুকুরের মতো গুলি করে মারতে হয়।

বাজারের সর্বত্র এই সব গম্ভীর আলোচনা। ওদের মতো লুকোছাপা দুই-এক ঘর তামিল ছাড়া এই গ্রামের সবাই সিংহলি। তবু সেই অনেক দূরে তামিল এলাকা কিংবা মিশ্র এলাকায় কি হচ্ছে সেই নিয়েই সকলে চিন্তিত। অবশ্য বাচ্চারা নয়। বাজার কমিটি একটা পোসন উৎসবের আয়োজন করেছে। সেখানে রমাকান্ত, মুথুরাজা, মিকা, জয়চন্দ্র, ডেভি অনেকেই ছিল। ডেভি ওকে দেখেই চেঁচাল, কিরে। আজ ভোরে সকাল সকাল আসবার কথা ছিল না তোর? আমরা সেই কখন থেকে প্যান্ডেল সাজাচ্ছি—

পাখি দেখল কাকা একজন লোকের সঙ্গে গল্প জুড়েছে। লোকটা টিভি মেকানিক। পাখি একটু সরে এসে নিচুস্বরে বলল, বাজারটা করে দিয়েই আসছি। রঙিন কাগজ কেটে দারুণ করে বানিয়ে দেব, শিকলির মতো—

ছাড়, ছাড়। মুথুরাজা বিজ্ঞের মতো বলে, আজকাল রেডিমেড পাওয়া যায়। সূর্যতনয়ের দোকানে এনেছে, আমরা কিনে আনতে যাচ্ছি। তুই বাজার করগে যা—

ঐ ঐ। ডেভি চেঁচিয়ে ওঠে, তুই পাকামি মারছিস কেন? এটা আমার বাড়ির পুজো, আমি যা বলব, তাই হবে। যা তো পাখি, তুই না এলে আমরা ডেকরেশন করছি না—

বোধিবৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট ভগবান তথাগতকে একটা আধাসেলাম ঠুকে পাখি এদিকটায় সরে আসে, কারণ কাকা তখন বেগুনওলার ঝুড়ির সামনে বসে। ওর দিকে না তাকিয়েই বলে, কি রে? কিরকম করেছে, গতবারের চেয়ে ভাল?

হ্যাঁ। পাখি ঘাড় নাড়ে। কাকা, বাজার করে দিয়ে চেন্নাকে নিয়ে একটু আসব, হ্যাঁ?

আসিস। আমি কাকিমাকে বলে দেব। এখন এইটে নে।

কাকা বাঁ হাতে ধরা একটা ঠোঙা ওকে দেয়। কাকা বেগুন বাছতে বাছতেই বলে, টপাটপ খেয়ে নে। গরম আছে। পাখি অবাক হয়ে ঠোঙা খুলে দেখে সাগু ডালবড়া। ও বলে, কিন্তু ওদের জন্য?

কাকা এবার ওর দিকে না তাকিয়ে নিচুস্বরে খ্যাঁক করে উঠে। বেশি পাকামি মারতে হবে না। মারব এক থাপ্পড়।

বাজারের থলি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ছোট ছোট কামড়ে বড়া খায় পাখি। ওর খুব প্রিয় খাবার, মুখের মধ্যে কেমন গলে যায়। ওদের বাড়িতে হতো, মা তৈরি করত। কাকা জানে। কাকিমা জানে না, কাকিমা তৈরি করেও না।

বাজার থেকে ফিরে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোধিবৃক্ষ প্যান্ডেলের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাকিমা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে, এত দেরি হলো কেন? বলি, এত দেরি হলো কেন? উৎসবের দিন, রাজ্যের লোককে ডেকেছ, পিণ্ডি গেলাবে। রান্না কখন শুরু হবে, শুনি?

কাকা যথারীতি চুপ করে থাকে। কাকিমা রান্নাঘরে পাখিকে নিয়ে পড়ে, বল তো। কোন কোন লোকগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারছিল তোর কাকা?

আড্ডা মারেনি তো। পাখি গম্ভীর মুখে জবাব দেয়।

তবে? সারাটা সকাল কোন চুলোয় ঘুরছিলি শুনি?

রেশন দোকানের সামনে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়েছিলাম, কাকিমা। পাখি চোখের পলক না ফেলে বলল। কাকা বলল নারকেলের গুঁড়ো আর পাকিস্তানের মাখন নিয়ে যেতেই হবে। কাকিমার হাতের লাম্পারাই আর মালুং খেয়ে লোকে হাত চাটে কেমন, বল?

কাকিমা এবার গলা নামাল। মিনমিন করে বলল, ইন্ডিয়ান মাখন আনলেই হতো, এত যখন ভিড়।

না কাকিমা। পাখি চোখ গোল গোল করে, গতবারের মতো বোলো ফিয়াডোও বানাবার কথা বলছিল কাকা। বিকেলে কারা সব আসবে, বুর্জর (অ্যাংলো)—কাকার অফিসের বড়সাহেব, তাদের জন্য। ওরা নাকি তোমার রান্না খেয়ে রোজ অফিসে বলাবলি করে। কাকিমা। বোলো ফিয়াদো তো পর্তুগীজ কেক, তাই না? তুমি কি করে বানাতে শিখলে?

কাকিমা কথার উত্তর দেয় না। বলে, তোর কাকা কি করছিল, এই পুরো সময়টা?

টিভি মেকানিকের দোকানে বসেছিল। সব্জি বাজার করবার পর। আজকে যদি গেস্টরা টিভি দেখতে চায়— ব্যাটা চন্দ্রউদয় এতদিন ধরে টিভিটা নিয়ে রেখে দিয়েছে। খুব চেঁচিয়েছে কাকা। মেকানিক বলেছে আজ দুপুরেই দিয়ে যাবে।

কাকিমা এবার প্রসন্ন হয় বোধহয়। কাল রাতেও টিভি নিয়ে কাকিমা চেঁচিয়েছে। এখন পাখিকে বলে, যা। শাকগুলো কুচিয়ে ফেল আগে। তারপর ফ্রিজ থেকে চিংড়ি বার করে খোলা ছাড়া—

কাকিমা! ও ভয়ে ভয়ে বলে, চেন্নাকে একটু প্যান্ডেলে নিয়ে যেতাম! ওরা প্যান্ডেল সাজাচ্ছে, ডেভি বলল চেন্নাকে নিয়ে যেতে। ওর ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করবে।

তাই নাকি? কাকিমা নরম কণ্ঠে বলে। জীতবাহন মহানামার ছেলে ডেভি। এলাকার অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট এজেন্ট [স্থানীয় প্রশাসক]। তার বাড়িতে চেন্নাকে নিয়ে যাবার কথা শুনে কাকিমা আর বাধা দেয় না। বলে, বেশি দেরি হলে তুই ফিরে আসবি, কেমন? কাকা গিয়ে নিয়ে আসবেখন।

এখন রাতে নিজের চৌকিতে শুয়ে

পাখি ফিসফিস করে ভগবানকে বলে, হে ভগবান। সারাদিন অনেক মিথ্যে কথা বলেছি। অনেক পাপ হলো। মাফ করে দিও, ভগবান। ক্ষমা করে দিও।

আজ খুব মজা হয়েছে সারাদিন। বিকেলে সনাতনকাকু, জয়চন্দ্রকাকুরা মিলে একটা গাড়ি ভাড়া করেছিল। তাতে করে শহরে গিয়েছিল ওরা। চেন্নাকে সামলাবার জন্য পাখিকেও সঙ্গে নেয় কাকিমা। পাখি অবশ্য প্রথমে যেতে চায়নি। ও গ্রামের প্যান্ডেলেই থাকতে চায়। কিন্তু কাকিমার মুখের ওপর তো সেটা বলা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে গেল।

গিয়ে অবশ্য ভালই হলো। শহরে কতগুলো প্যান্ডেল! কি আলো দিয়ে সাজানো, বাপরে বাপ! চেন্নার সঙ্গে ওকেও আইসক্রিম কিনে দেয় কাকা, কাকিমা কিছু বলেনি। রাস্তায় চেন্নাও তেমন কোনো অসভ্যতা করেনি। শুধু ফিরে এসে শোবার আগে বায়না ধরেছিল। ও পাখিদাদার কাছে শোবে। কিছুতেই ওকে বোঝানো যায় না। শেষমেশ কাকিমা খুব ঠেঙিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়েছে চেন্না। ঘুমোবার পরও অনেকক্ষণ ফোঁপাচ্ছিল। কাকিমার শোবার ঘরে টেবিলে খাবার জল রাখতে গিয়ে দেখেছে পাখি। সেজন্য ওর মনটা খারাপ হয়ে আছে। বেচারা! খানিকটা ওর কাছে শুতে দিলে কি হতো? ঘুমিয়ে পড়লেই তো পাখি ঘরে দিয়ে আসত—

কাকাও সেটা মিনমিন করে বলেছিল। কাকিমা গর্জে ওঠে, থাক। তোমার শিক্ষা তো ওরকমই হবে। ছোটলোকের মতো। চাকরবাকরের বিছানায় শোবে, বাঃ—

কাকা আর কিছু বলেনি।

চেন্নার কথা ভাবতে ভাবতে মন খারাপ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে পাখি। কিন্তু পরের দিন এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যে পাখির পৃথিবী সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে যায়।

বেচারা পাখি। ও-ও তো ছোট ছেলে, ওর কি দোষ?

সারাটা সকাল কোন চুলোয় ঘুরছিলি শুনি?

তিন

সুমশের পোস্ট থেকে প্রায় ষোল কিলোমিটার হেঁটে এবং অন্তত ষোল হাজার ফিট নিচে নেমে এসে রোডহেড। ওপরে ওঠবার সময় নিয়মমতো দু'তিন জায়গায় রাত্রিযাপন করবার কথা, উচ্চতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। কিন্তু নামবার সময় সে সমস্যা নেই, তাছাড়া কর্নেলের অর্ডার এক্সপ্রেস স্পিডের। তাই শেষ উতরাই সুলতানঢেড় পেরিয়ে যখন রোডহেড নজরে আসে, সূর্য পাটে বসলেও তখনও অন্ধকার নামেনি।

জায়গাটার নাম কমলেশ ব্রিজ। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশ বরাবর লাফাতে লাফাতে

দৌড়ে নামছে ঝিলম নদী। নদীর ওপর দিয়ে এই ঝোলানো ব্রিজ, ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ে ওঠার পাকদণ্ডী শুরু। আমার কোম্পানি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গোর্খা রেজিমেন্টের বিভিন্ন সৈন্য ক্যাম্প ঐ সব পাহাড়ের অনেক ওপরে কোথাও কোথাও আছে।

আমার সৈন্যদের একটা ছোট্ট দল থাকে এখানে কমলেশ ব্রিজ রোডহেডে। তাদের নেতা, নায়েক হরভজন সিং এগিয়ে এসে স্যালুট করে। বলে, সাব। চা, পকোড়া তৈয়ার হ্যায়।

না, হে। আমি বলি, আসতে আসতে রেডিওতে শুনলাম, গাড়ি অপেক্ষা করছে।

হাঁন জী। ও মাথা নাড়ে, একটা গাড়ির ব্যাটারি গড়বড় করছে। ততক্ষণ চা খেয়ে নিন।

অগত্যা আমি বসে পড়ি ব্রিজের ধারে সেন্ট্রিপোস্টের সামনের টুলে। উগ্রপন্থী অধ্যুষিত এই অঞ্চল, এখানে কনভয় ছাড়া ফৌজী গাড়ির যাবার হুকুম নেই। হরভজন সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলে, কি ব্যাপার সাব? হঠাৎ এত হুড়োহুড়ি?

কে জানে? আমি অন্যমনস্কভাবে পকোড়া চিবোই। সৈন্যরা সব এদিক-ওদিক আড়াল খুঁজে নিয়ে আরাম করে হয়তো। ইতিমধ্যে গাড়ির গড়গড় হবার খবরে কর্নেল রীতিমতো বিরক্ত। তাঁর অ্যাডজুটান্ট রেডিওতে চেঁচিয়ে কিছু বলতে থাকেন।

আমারও বিরক্ত লাগে। সৈন্যরা প্রাণের ওপর ভর করে দৌড়ে নেমেছে। এখন গাড়ির অভাবে ঠিক সময়ে রেজিমেন্টাল বেসক্যাম্পে পৌঁছনো যাবে না। আর ওদিকে কর্নেলের বক্তব্য, ক্যাপ্টেন বক্সি না এসে পৌঁছলে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করা সম্ভব হচ্ছে না।

মাইক ফর রোমিও, ওভার। রেডিওর রিসিভার তুলে আমি বলি।

রোমিও ওকে, ওভার। রেজিমেন্ট বেসক্যাম্প থেকে অ্যাডজুটান্ট উত্তর দেন। রোমিও, আমাদের অনুমতি দিন। একটা মাত্র গাড়ি নিয়ে আমি চলে আসছি।

অ্যাঁ, সেকি? হেডকোয়ার্টারে অ্যাডজুটান্ট ঘাবড়ে যান বোধহয়, বল কি হে? ঐ বিপজ্জনক এলাকা দিয়ে?

আমার ইঙ্গিতে জোঙ্গা নিশান গাড়িটার ড্রাইভার উঠে আসে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিই দায়িত্ব। পথে হয়তো অনেক শত্রু আছে, কিন্তু একটিমাত্র গাড়ি নিয়ে তাদের বোঝার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে। চড়াই-উতরাই রাস্তা, তীক্ষ্ণ ভয়ংকর বাঁক, কিন্তু ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভের জোরে সেই রাস্তা বিদ্যুৎগতিতে পেরিয়ে যেতে হবে।

কি হে খালসা? ড্রাইভার গুরমিতকে বলি, পারবে তো?

জীসাব। নির্বিকারভাবে দাড়ি চুলকোয় গুরমিত। শিখ সৈন্যকে যখন মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে সে খালসা, গুরু গোবিন্দ সিংহের বাণী স্মরণ করে তৎক্ষণাৎ সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। গুরমিত বলে, খালসা না বলতে জানে না সাব।

গুড। তাহলে চলো। সময় নেই।

নিশান জোঙ্গা গাড়িতে গিয়ে বসি। সঙ্গে মেশিনগানধারী দেহরক্ষী। বাকি কনভয়ের দায়িত্ব দিই হাবিলদার ইন্দজিতকে, গাড়িটা ঠিক হলেই নিয়ে চলে আসবে। আমার ইঙ্গিতে গুরমিত গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সামনেই রাস্তায় খাড়া চড়াই। ফোর বাই ফোর গিয়ার লাগিয়ে অ্যাক্সিলেটারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ড্রাইভার, আর পেশি ফোলানো বাঘের মতো ছিটকে বেরোয় গাড়ি।

ঘণ্টাখানেক পর রাস্তার ডানদিকে পাহাড়ের ওপর মালার মতো আলো নজরে আসে। পৌঁছে গেছি রেজিমেন্টাল বেসক্যাম্পে। জায়গাটা মূলত একটা ছোট্ট শহর। তার বাইরে এদিকে বাটির মতো এক ছোট্ট উপত্যকায় রেজিমেন্টের ক্যাম্প। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। এবার গাড়ি এসে থামে এক জায়গায়, সামনে লোহার পোল দিয়ে রাস্তা বন্ধ। চেক গেট। দুজন সৈন্য গেটের ভেতর থেকে চিৎকার করে ওঠে, থাম! কৌন আতা হ্যা?

ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে। চেঁচিয়ে বলে, দোস্ত।

পাসওয়ার্ড?

ধরতি। এবার আমি গলা বাড়িয়ে কাউন্টার চ্যালেঞ্জ করি, জবাব দাও।

আশমান। সেন্ট্রিপোস্টের পেছন থেকে সৈন্য জবাব দেয়, পহেচানকে লিয়ে আগে বাঢ়।

আমার ড্রাইভার নেমে দু'হাত ওপরে তুলে এগিয়ে যায়। ওখানে একটা সার্চ-লাইট জ্বলে ওঠে। ওদিক থেকেও উদ্যত রাইফেল হাতে এগিয়ে আসে দুজন সৈন্য। ওরা গুরমিতকে দেখে হাসে, অস্ত্র নামায়। গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে হাসে, সৎ শ্রী অকাল সাব।

আমিও হাসি। ওদের সতর্কতার বহরে আমি খুশি, একটুও ঢিলে দেয়নি ওরা কর্তব্যে। পাসওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ এবং কাউন্টার চ্যালেঞ্জের এই নিয়মানুবর্তিতা সন্ধ্যের পর শত্রু এলাকায় মেনে চলতেই হয়। সাবধান থাকবার জন্য, শত্রু যেন তোমাকে বোকা বানিয়ে তোমার রক্ষণব্যূহের মধ্যে পৌঁছে যেতে না পারে। পাসওয়ার্ডও প্রত্যেক দিন বদলে যায়।

অ্যাডজুটান্ট অফিসে পৌঁছে স্যালুট ঠুকি। মেজর সন্দীপ ধাধোয়াল বলে, এই যে। এসে গেছ দেখছি। ভালই খেল দেখালে।

কি করি স্যর? আমি কাঁচুমাচু মুখ করি, অতটা রাস্তা দৌড়ে নামলাম। আর শুধু একটা গাড়ির অভাবে আটকে বসে থাকব?

হুঁ। মেজর হাসেন, বুড়া কিন্তু চটেছে। বলছে, অত রিস্ক নেওয়া উচিত হয়নি। যাই হোক, চল এবার কনফারেন্স রুমে। অন্য সবাই এসে গেছে।

রেজিমেন্টের কনফারেন্স রুমটা দারুণ। জানালায় ভারী পর্দা, মেঝেতে পুরু কার্পেট। একদিকে দেওয়ালের ওপর বিশাল টোপো-ম্যাপ, প্রায় একদিকের দেওয়াল জুড়ে। তার ওপর ফোকাস করা

রয়েছে আলো। অন্য সব কোম্পানির অফিসাররা আগে থেকেই উপস্থিত। আমি চেয়ারে বসতে না বসতে লেফটেনান্ট কর্নেল চিৎকার করেন, অ্যাটেন—শান।

কর্নেল ঘরে এসে ঢোকেন। কর্নেল মনজিৎ সিং চাওলা, প্রায় সাড়ে ছ' ফিট লম্বা, ফর্সা, তীক্ষ্ণ নাক, জ্বলজ্বল চোখ। উনি বসতেই আমরা সকলে বসি।

জেন্টেলমেন। প্রথাগত সম্ভাষণের পর একটু গলা খাঁকরে উনি বলেন, আজ আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে কেন, জানেন?

আমরা চুপ করে থাকি। কর্নেলের প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছে নেই। কর্নেল একটু চুপ করে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকান। তারপর গম্ভীর স্বরে বলেন, আমি জানি, আপনারা অনুমান করতে পারছেন না। পারা সম্ভবও নয়। সে প্রসঙ্গে আসবার আগে দুটো কথা বলি।

গত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনারা পৃথিবীর উচ্চতম কিছু সেনাঘাঁটিতে অবস্থান করছেন। নাইন শিখ রেজিমেন্টের বাহাদুর সিপাহীদের নেতৃত্ব দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করছেন।

আমার হঠাৎ খুব খিদে পেতে থাকে। সকালে ব্রেকফাস্ট করে দৌড়তে শুরু করেছি, সারাদিন আর পেটে কিছু পড়েনি, কমলেশ ব্রিজ রোডহেডে পকোড়া ছিল অবশ্য, কিন্তু রওনা হবার তাড়াহুড়োয় সেগুলো পেটে চালান করবার সময় পাওয়া যায়নি। আর এখন কনফারেন্স রুমে ঢোকবার সময় বাইরে দেখলাম টেবিল সাজানো হয়েছে, চায়ের ব্যবস্থা, সঙ্গে কেক, নোনতা, মিষ্টিও আছে। কেকের কথা ভেবে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই, চটকা ভাঙে কর্নেলের মুখে আমার নাম শুনে।

...ক্যাপ্টেন সঞ্জয় বকসির মতোই অন্য দুটো ফরোয়ার্ড কোম্পানিও এমন দক্ষতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে যে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ আমাদের ক্র্যাকফোর্স রেজিমেন্টের মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং দেশের সম্মান রক্ষার্থে আমাদের এবার যেতে হচ্ছে অন্যত্র।

ঘরে অখণ্ড নীরবতা। ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে ঠিক। একটা অদম্য কৌতূহলে যেন থরথর করে সকলে।

এবার গন্তব্য শ্রীলংকা! কর্নেল বললেন।

শ্রীলংকা! ঘরে বোমা পড়লেও আমরা বোধহয় এতটা চমকাতাম না। আমরা ইন্ডিয়ান আর্মির কমিশন্ড অফিসার। ফৌজের প্রতিটি সৈন্যের মতো আমরাও শপথ নিয়েছি, দেশে অথবা বিদেশে, পৃথিবীর যেকোনো জায়গায়, স্থলে, জলে অথবা আকাশপথে আমি আমার কর্তব্য-কর্ম পালন করব....কিন্তু হঠাৎ ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্রে যাবার কথায় সচকিত হই সকলে।

বছরের পর বছর, বহু দশক যাবৎ শ্রীলংকায় যুদ্ধ চলছে। টেবিলে রাখা গেলাস থেকে এক চুমুক জল খান কর্নেল, শ্রীলংকা আর্মি মূলত সিংহলি সৈন্যদের নিয়ে গঠিত। তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেয় বিশাল টাইগার গেরিলা সেনা, তামিলদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমাদের কাজ এই যুদ্ধ বন্ধ করবার।

মানে? মেজর সাহনি বলেন, আমরা শ্রীলংকা অধিকার করব না?

না। কর্নেল হাসেন, আমাদের কাজটা শান্তিরক্ষকের। দু'দেশের সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আমরা শুধু লক্ষ্য রাখব, যাতে বিবাদমান দুই গোষ্ঠী হানাহানিতে লিপ্ত না হয়।

চার

পাখি খুব আনন্দের স্বপ্ন দেখছিল। ও স্বপ্ন দেখছিল বাবা এবং মার হাত ধরে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গালে শহরের সমুদ্রতীরে বড় বড় লাইটহাউস আছে। ফরাসী আর পোর্তুগীজের তৈরি বিরাট উঁচু এই সব লাইট টাওয়ার থেকে সমুদ্রের জাহাজদের রাস্তা দেখান হতো।

ও মাঝে মধ্যেই বাবার হাত ছাড়িয়ে লুকিয়ে পড়ছিল। বাবা ওকে খুঁজে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ ওকে কে যেন পাঁজাকোলা করে তুলে জলে ফেলে দিল। ও সমুদ্রের জলে তলিয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে ওঠে ও, দমবন্ধ অবস্থায়। তখনই ও বোঝে, ও স্বপ্ন দেখছিল।

তবে দম আটকানোর ব্যাপারটা সত্যি, জলের ব্যাপারটাও। হতচ্ছাড়া চেন্না কোত্থেকে এক মগ জল এনে ওর বিছানায় ঢেলে দিয়েছে। এখনও বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে। হঠাৎ ভীষণ রাগ হয় পাখির। কষে এক থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে ওকে।

এমন সময় কাকিমা চেঁচাতে শুরু করে। কি রে? নবাবপুত্তুর এখনও উঠিসনি? ছেলেটা কখন উঠে পড়েছে। এতক্ষণ ধরে খালি পেটে থাকছে, পিত্তি পড়বে না? হতচ্ছাড়া, দুধটা বসিয়েছিস?

বসাচ্ছি কাকিমা। পাখি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দিকে ছোটে। চেন্নার দুধের সঙ্গে সঙ্গে চায়ের জলও চড়াতে হবে। বিছানায় চায়ের কাপ পৌঁছে না দিলে কাকিমা বিছানা ছাড়ে না।

আধঘণ্টা পরে কাকা এবং কাকিমা একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। কাকিমা বলে, দরজাটা লাগিয়ে দে। আর আটটা নাগাদ চেন্নাকে খেতে দিবি। আমরা নটা নাগাদ ফিরে আসব।

কাকিমারা বেরিয়ে যেতেই টিভি খোলে পাখি। কাকিমা থাকলে টিভি দেখতে দেয় না। টিভি দেখা পাখির দারুণ নেশা। এই সকালবেলা টিভিতে একটা কার্টুন দেখাচ্ছে। চেন্নাও গোল গোল চোখ করে দেখতে থাকে। কার্টুন ফিল্ম দেখতে দেখতে এতই মশগুল হয়ে যায় যে চেন্নাকে খেতে দেবার কথা মনে থাকে না। যখন মনে পড়ে তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ভয়ে শিউরে উঠে টিভি বন্ধ করে পাখি, দৌড়ে যায় রান্নাঘরে, চেন্নার খাবারটা গরম করে। খাবারটা নিয়ে এসে চেন্নাকে ডাকে ও। চেন্না দৌড়ে পালায়,

আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে কেন, জানেন?

খাবার খাবে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভয়ে পাখির প্রাণ উড়ে যায়। ও বলে, লক্ষ্মী সোনা। খাবারটা খেয়ে নাও।

তবে তুমিও খাও। চেন্না হাসে।

খাবো তো। তুমি খেয়ে নিলেই খাবো।

না-আ-আ। চেন্না চেঁচায়, তুমিও এখানে বসে খাও, আমার পাশে, টেবিলে।

ওরকম করে না। পাখি বলে, মা রাগ করবে।

কিন্তু শেষমেশ বাধ্য হয়ে পাখিকে নিজের খাবারের থালা নিয়ে আসতে হয় টেবিলে। এবং কয়েক মিনিট পরে দরজার বেল বাজে। দরজা খুলতেই কাকা ঢোকে গম্ভীর মুখে, পেছন পেছন হুড়মুড়িয়ে কাকিমা। কাকিমা চেঁচায়, বলেছিলাম। শনিবার দিন। আজ যেও না, কাজ হবে না। হাজারবার পইপই করে বারণ করলাম, কিন্তু তবুও গেলে। নাও, এবার বোঝ।

কাকা চুপ করে থাকে। কাকিমা এবার এদিকে নজর দেয়, একি? এখনও চেন্নার খাওয়া হয়নি? এবং পরমুহূর্তে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচায়, একী! একী! তুই টেবিলে বসে খাচ্ছিস?

এবার কাকা উঠে আসে এদিকে। পাখি ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। বলে, না না। চেন্না বায়না করছিল—

তাই বলে তুই টেবিলে বসে খাবি! চেন্নার পাশে বসে! কাকিমা চিল চিৎকার করে, তার মানে এঁটো হাতে ওকে খাওয়াচ্ছিস? হায়, হায় হায়—

কাকা রক্তবর্ণ চোখে এগিয়ে আসে। এতক্ষণ কি করছিলি, হারামজাদা?

আমলা তো কালতুন দেখতিলাম। চেন্না এবার জবাব দেয়।

কারটুন? টিভি দেখছিলি? তোরা? কাকিমা হাহাকার করে ওঠে, সে কিরে? সেকি সর্বনাশ কাণ্ড? বলেছি হাজারবার, এসব ছেলেকে বিশ্বাস নেই। একা ঘরে টিভি চালাচ্ছে, মানুষ খুন করবে কাল।

কাকা এবার দেওয়াল আলনা থেকে নিজের বেল্টটা টেনে নেয়। সপাং সপাং করে চামড়ার মোটা বেল্ট চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে পাখির পিঠে। পাখি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়, মাটিতে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে, আ-হ। আ-হ।

কাকা সারাটা দিন আটকে রাখে ওকে স্টোররুমে। রাতেও দরজা খোলে না। সারা গায়ে দারুণ ব্যথা, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে পাখি। রাতে একবার কাঁপিয়ে জ্বর আসে। কেউ কিছু খেতে দেয়নি। মাটিতে শুয়ে থাকে পাখি, গায়ে দেবার একটা কিছু নেই, ঠকঠক করে কাঁপে পাখি।

সকালে যখন ঘুম ভাঙে, তখনও সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা। ঝনাৎ করে দরজার শেকল খোলার শব্দ হয়। দরজা খুলে কাকিমা চেঁচায়, এই যে, এবার উঠে পড় বাবুসাহেব। দুনিয়ার কাজ পড়ে আছে।

পাখি উঠতে পারে না। কোনো উত্তরও দিতে পারে না। কাকিমা আবার একটু পরে আসে, কি হলো? কথা কানে গেল না? নাকি আরেকবার মার খাবি?

পাখির কানে এসব ঢোকে না, ওর তখন ধুম জ্বর। চোখ খুলেও কাকিমাকে দেখতে পায় না ও, তার বদলে রাশি রাশি হলুদ ফুল ওর চোখের সামনে ঘুরে যায়। ও বিড়বিড় করে কিছু বলে।

কাকিমা থমকে যায়, ওকে দেখে, তারপর এগিয়ে এসে কপালে হাত রাখে। তারপর দুমদাম পা ফেলে বেরিয়ে যায়।

যাও গিয়ে দ্যাখো, কি ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছ। কাকিমা চেঁচায়, ওভাবে কেউ মারে?

কি হয়েছে? কাকা উঁকি মারে ঘরে, উঠছে না কেন?

উঠবে না। ওঠার অবস্থা নেই। নাও, এবার পিণ্ডির ব্যবস্থা কর—মাথায় যদি বুদ্ধি বলে কিছু থাকে!

ডাক্তার ডাকতে হবে নাকি? কাকা এবার যেন ঘাবড়ে যায় একটু।

হ্যাঁ, ডাক্তার, তারপর পুলিশ। ষোল কলা পূর্ণ না করে কি তুমি ছাড়বে?

ডাক্তার কিংবা পুলিশ আসে না। উল্টে কাকিমা এক বাটি চা আর চারটে রুটি রেখে যায়। একটু পরে জ্বর একটু কমলে রুটিটা খেয়ে নেয় পাখি, চায়ে ডুবিয়ে। চা অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাবারটা খেয়ে নেবার পর ওর আবার ঘুম পেতে থাকে। এমন সময় কাকিমা একটা ওষুধ নিয়ে আসে, ট্যাবলেটটা খেয়ে নে। শুয়ে থাকলে তো হবে না বাবা, যাহোক উঠে একটু হাতে হাতে করে দে কাজগুলো। জানিস তো লোকটার জানোয়ারের রাগ———

পাখি ট্যাবলেট খায়। কিন্তু ওঠে না মেঝে থেকে, কুঁকড়ে শুয়ে থাকে এককোণে। তারপর আবার ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়। স্বপ্ন দেখে। আগুন জ্বলছে। আগুনের লাল শিখায় জ্বলছে অজস্র বাড়ি, পুরো গ্রাম। ওদের বাড়িটাও জ্বলছে। বাড়ির মধ্যে পড়ে আছে বাবা আর মা। মাকে মেরে ফেলেছে সৈন্যরা বেয়নেট দিয়ে। বাবা লাফিয়ে গিয়েছিল, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেছে মাটিতে। সোফার পেছন থেকে বিস্ফারিত চোখে দেখেছে পাখি। টলোমলো পায়ে হেঁটে যেতে গেছে সেদিকে। কিন্তু ততক্ষণে সৈন্যরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বাড়িতে। আগুন আর কালো ধোঁয়া দেখে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে পাখি, প্রাণের ভয়ে।

পাখির ঘুম আবার যখন ভাঙে, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। পাখি বুঝতে পারে গায়ের ব্যথা কমেছে অনেকটা, পুরোটা না সারলেও। কাকা কাজে গেছে বোধহয়, কাকিমা দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। ও পা টিপে টিপে ওঠে। নিজের বিছানার কাছে যায়, বারান্দায়, সিঁড়ির নিচে। ওর তেলচিটে বিছানাটা দিনের বেলা এককোণে পাট করা থাকে। ও বিছানা সরায়, তারপর তলা থেকে একটা পুঁটলি বার করে। পুঁটলির ভেতর থেকে ওর যথাসর্বস্ব নেয়, একটা ছোট্ট খেলনা গাড়ি, বাবা জন্মদিনে কিনে দিয়েছিল, আগুনজ্বলা বাড়ির ভেতর থেকে বার করে এনেছিল ও। একটা ছোট্ট বটুয়ায় টাকাপয়সা, তাও অনেক, কাকা মাঝেমধ্যে দেয় ওকে। দুটো জামা, একটা প্যান্ট। সাবান, দাঁত মাজার ব্রাশ। সব জিনিস ও একটা বাজারের থলেতে ভরে নেয়। তারপর চটিটা পরে চুপিচুপি বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে।

মনাস্টেরির সামনে দেখা সিরিচন্দ্রার সঙ্গে। ওকে দেখে বলে, কি রে? বাঁধের ওধারে গোপীচন্দ্রের বাগানে নোনা পেকেছে। যাবি?

নাঃ। উদাসীন মুখে হাঁটে পাখি।

যাচ্ছিস কোথায়? সিরিচন্দ্রা চেঁচায়।

রেশন দোকানে। পাখি হাতের থলেটা দেখায়, তারপর ধোপার বাড়ি যাব।

কিন্তু পাখি বাসস্ট্যান্ডে এসে থমকে যায়। একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। অনুরাধাপুর, অনুরাধাপুর। কন্ডাক্টার চেঁচায়। পাখি এদিক-ওদিক তাকায়। চেনাশোনা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাখি টপ করে বাসে উঠে পড়ে। কি রে ছোঁড়া? কন্ডাক্টার বলে, চললি কোথায়? এটা এক্সপ্রেস বাস। গ্রামের স্টপে থামবে না।

আমি অনুরাধাপুর যাব। গম্ভীর মুখে বলে পাখি।

সিটে বসলে পুরো ভাড়া লাগবে কিন্তু। নইলে মাটিতে বোস।

পাখি উঠতে না উঠতে বাস ছেড়ে দেয়। পাখি সিটের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বাসের মধ্যেটা দেখে। নাঃ, চেনা কেউ নেই। ও এবার একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাতে থলেটা কোলে নিয়ে একটা সিটে বসে পড়ে।

পাশের লোকটা টেকো, চশমা পরা। গোলগাল, ভালোমানুষ মার্কা মুখ। বলে, কি খোকা? কোথায় যাচ্ছ, একা একা?

মাসির বাড়ি, অনুরাধাপুর। পাখি হাসে। অনেকবার গেছি।

অ। লোকটা মাথা নাড়ে, কোন ক্লাসে পড়?

সেভেনে পড়ি। তিলকনামা হাইস্কুল।

বাঃ, বাঃ। লোকটা আর কোনো কথা না বলে বাইরে তাকায় জানালা দিয়ে। পাখি চোখ বন্ধ করে মাথা হেলায় সিটে। আবার শরীরটা খারাপ লাগছে ওর, জ্বর আসছে বোধহয়।

কি খোকা? পাশের লোকটা ঠেলা দেয়, শরীর খারাপ লাগছে? বমি-টমি করবে নাকি? তাহলে তুমি এক কাজ কর। জানালার ধারে বোস বরং, আমি ওদিকটায় সরে যাচ্ছি।

লোকটা জায়গা ছেড়ে দেয়। পাখি জানালার ধারে সিটে বসে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও স্বপ্ন দেখতে থাকে। চেন্নার স্বপ্ন।

পাঁচ

শ্রীলংকায় যাবার অর্ডার পাবার পর চতুর্থ দিন সকাল।

এখনও ভাল করে ভোর হয়নি। চারদিকে ঘন কুয়াশা। তারই মধ্যে বিয়াল্লিশটি গাড়ির বিশাল কনভয় নিয়ে আমরা রওনা হব। সবচেয়ে আগে হেভি মেশিনগান মাউন্ট করা ভ্যানগার্ড-এর জিপ। মাথায় বালক্লাভা পরা গোর্খা সৈন্যরা ভাবলেশহীন মুখে এই বিশাল কনভয়ের পরিচালনার দায়িত্বে।

সৎ শ্রী অকাল সাব। হাবিলদার সতনাম এসে স্যালুট ঠোকে।

কি হে? আমি হাসি, কোম্পানির সব ঠিক আছে তো?

অল ওকে সাব।

সব কিছু চেক করেছ? বারোটা গাড়ি তো আমাদের কোম্পানির?

হ্যাঁ সাব। মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মানুষজন, সব ঠিক। কিন্তু—সতনাম মাথা চুলকোয়।

কিন্তু কি? আমি বিরক্ত হই, বলে ফেল যা বলবার।

সাব। কোম্পানির সৈন্যরা বলাবলি করছে শ্রীলংকায় লোকে মানুষ খায়।

এমন সময় কনভয় কমান্ডারের হুইশিল বাজে। প্রথমে একটা, তার পর একে একে অনেক। হেড হাবিলদাররা নিজ নিজ কোম্পানিকে নির্দেশ দেয় এই বাঁশির মাধ্যমে। আমি সতনামকে কি বলব বুঝতে পারি না। বলি, ঠিক আছে, চল তো এখন। পরে দেখছি।

বানিহালে জওহর টানেল পৃথিবীর একটি উচ্চতম সুড়ঙ্গপথ। সাড়ে তিন কিলোমিটার লম্বা অন্ধকার এই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরো খানিকটা এসে রামবানে কনভয় থামে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। সামনে ইরাবতী নদী লাফিয়ে নামছে, তার ওপারে পাহাড়ের গা দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে। স্বর্গোদ্যানের মতো সুন্দর। অফিসার মেসের বাগানে দাঁড়িয়ে কর্নেল আমার কথা মন দিয়ে শোনেন। সাড়ে ছ' ফিট লম্বা চেহারাটা টানটান করে দিয়ে বলেন, তোমার কি মনে হয়? শ্রীলংকায় যেতে আমাদের সৈন্যরা ভয় পায়? আমাদের শিখ সৈন্য?

জানি না স্যর। আমি মাথা নাড়ি, মিছিমিছি এসব গুজব ছড়াবে কেন?

খুঁজে বার কর। কর্নেল মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়েন, অবশ্য এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আমাদের সৈন্যদের মনোবল বেড়ে যাবে এসব গুজবে। ওদের বোঝাও নরখাদক যদি সত্যিই থেকে থাকে তবে তারা জংলিই হবে। আমাদের রাইফেলের সামনে আসতে সাহস পাবে না।

কর্নেলের নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে আমি খুব একটা আশ্বস্ত হই না। আমি অধিনায়ক, আমার সৈন্যদের মনের কথা আমাকে বুঝতেই হবে। তাই কোম্পানির কয়েকজন মাত্র অ-শিখ সৈন্য যখন উধমপুর থেকে এগিয়ে গিয়ে বৈষ্ণোদেবীতে পুজো দিতে চায় তখন আমি এককথায় রাজী হয়ে যাই। বলি, কোম্পানির সৈন্যদের জন্যেও পুজো দিও। আর কাল সকালের মধ্যে জম্মু পৌঁছে যাবে।

ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়, রাস্তার ডানদিকে বহুদূরে পাহাড়ের ওপর দিয়ে বৈষ্ণোদেবী তীর্থে যাবার পাকদণ্ডী রাস্তা। উল্টো দিক থেকে আসা কনভয়ের জ্যাক [জম্মুকাশ্মীর] রাইফেল রেজিমেন্টের সৈন্যরা জয়ধ্বনি করে ওঠে, বোলে। জয় মাতাদী। বোলে জয় দুর্গে।

তাই শুনে শিখ সৈন্যও অনেকে কপালে হাত ঠেকায়। আর আমার মাথায় শুধু বোলতার মতো ঘোরে একটাই চিন্তা। এসব আজেবাজে আষাঢ়ে গল্প কে ফাঁদছে?

জম্মু শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বাড়ি-ব্রাহ্মণ স্টেশান। তার কাছে সৈন্যবাহিনীর বিশাল ট্রানজিট ক্যাম্প। একদিকে ছবির মতো অফিসার মেস। ক্যাপ্টেন সঞ্জীব ত্রিবেদী আর লেফটেন্যান্ট সুখদেব এসে বলে, চলুন স্যর। সতীর বাগান পেরিয়ে একটা দোকান আছে, দারুণ ফিশফিংগার আর শামী কাবাব পাওয়া যায়।

খুঁজে বারও করিস বটে। শামী কাবাবে কামড় দিয়ে আমি সুখদেবের পিঠ চাপড়ে দিই।

স্যর। আপনার কি মনে হয়? সঞ্জীব জিজ্ঞেস করে, শ্রীলংকায় পুরোদস্তুর যুদ্ধ হবে?

দূর, দূর। সুখদেব গোঁফ চুমরোয়, আমরা পৃথিবীর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ আর্মি। শুধু রেজিমেন্ট ধরলে—ফার্স্ট।

আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। সঞ্জীব কচরমচর করে ফিশফিংগার চিবোয়, তবে ওভার কনফিডেন্সটা—

আমি চুপ করে থাকি। আমাদের রেজিমেন্টের তরুণ এই দুই সমরাধিনায়কের চিন্তা আমাকে স্পর্শ করে না। আমি আমার কোম্পানির সৈন্যদের কথা ভাবি। শ্রীলংকার যুদ্ধ নিয়ে ওরা কি খুব দুশ্চিন্তায় আছে? আমার জানা দরকার। আমারই অর্ডার পেলে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা মাইন বেছানো জমির ওপর দিয়ে মেশিনগানধারী শত্রুর দিকে ধেয়ে যাবে, ওয়াহে—ওয়াহে গুরু বজ্রনির্ঘোষ তুলে। তাই আমারও উচিত ওদের বিশ্বাস একশো শতাংশ অর্জন করে নেওয়া।

বাড়িব্রাহ্মণ স্টেশানে বিয়াল্লিশ কামরার স্পেশাল মিলিটারি ট্রেন আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাতে অফিসারদের জন্য ফার্স্ট ক্লাস কামরা, সৈন্যদের জন্য স্লিপার কামরা, ডাক্তারখানা এবং গুরুদুয়ারা সাহেবের জন্য চেয়ার কার এবং মালপত্রের জন্য মালগাড়ির ওয়াগন সবই আছে। হাবিলদার সতনাম এবং সুবেদার হরজিৎ হাঁকডাক করে মালপত্র লোডিং করায়। আমি এককোণে বসে গ্রন্থী হুকুম সিং-এর সঙ্গে কথা বলি। আমার প্রশ্নের জবাবে ধর্মগুরু বলেন, না সাব। শিখধর্ম অথবা রেজিমেন্টের ইতিহাসে কোনোদিনই নরখাদকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়নি। মহারাজা রণজিৎ সিংহের ফৌজ অবশ্য আফগানিস্থানের অসভ্য বর্বর উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ আর্মির শিখ সৈন্যরা আফ্রিকাতে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়েছে, এমনকি বর্বর আদিবাসীদের সঙ্গেও। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজ পর্যন্ত কোনো বইয়েই—কিন্তু সাব, হঠাৎ এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন?

না সাব। আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবি। এমন সময় সুবেদার এগিয়ে আসে এই দিকে। বলে, সাব। অস্ত্রাগারের ফাইনাল চেকলিস্টটা একবার দেখবেন নাকি?

হ্যাঁ চলুন। ধর্মযাজককে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে আসি। সুবেদারকে বলি, মোট সৈন্যসংখ্যা কত?

সাব। ছুটি কাউকেই দেওয়া হয়নি। দুজন সৈন্য অসুস্থ। কিন্তু বহিরাগতদের কি হবে?

কর্নেল ইতিমধ্যেই হেডকোয়ার্টারকে জিজ্ঞেস করেছেন। উত্তর না এলে, ওরা

সঙ্গে যাবে।

পদাতিকসেনা রেজিমেন্টে কিছু বাইরের সৈনিক থাকে। যেমন চিকিৎসক সৈনিক দল, অস্ত্রশস্ত্র এবং গাড়ির মিস্ত্রি, শিক্ষক, দূরসংযোগ কর্মী, মাইন তথা বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। আমি অস্ত্রাগারের সান্ত্রীর পেটে একটা হালকা ঘুষি মারি, ও আরো টানটান হয়ে দাঁড়ায়। সোজা হয়ে, ইস্পাতের মতো সোজা—আমি ওর চোখে চোখ রেখে বলি। সুবেদার বলে, সাব। আরমারার ছেলেটা ছুটি চাইছে।

সে তো কর্নেল গাড়ির মিস্ত্রিকেও খেদাতে চাইছেন, সেদিন কমলেশ ব্রিজের দেরির জন্য। সেসব শুনলে তো হবে না। হেডকোয়ার্টার যতক্ষণ পরিবর্ত কাউকে না দিচ্ছে—ছুটি চাইছে কেন?

পতা নেহি সাব। সুবেদারের চোখে হাসি ঝিলিক দেয়, ডর গিয়া হোগা।

আমার বিরক্ত লাগে। পুরো রেজিমেন্টে আমাকে বাদ দিলে আর একটিমাত্র বাঙালী। সে যদি এরকম করতে থাকে—। আমি রুক্ষকণ্ঠে সুবেদারকে নির্দেশ দিই, সাব। ফৌজে সে নিজে কি চাইছে সেটা বড় কথা নয়, অর্ডারটাই বড় কথা। দেশের মাটি তার কাছে কি চাইছে সেটাই বড় কথা। আমার মনে হয় বেশি আরাম করে করে এদের স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে। আমি চাই, ট্রেন চলতে চলতে যেখানে থামবে সেখানেই যেন এই সব সৈন্যদের খুব করে মাসকেটারি ট্রেনিং করানো হয়। যুদ্ধে লড়তে হলে সবল বাহু দরকার।

বুঝলেন সাব? আমি সুবেদারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাই।

বুঝেছি সাব। সুবেদার ঘাড় হেলায়। তার চোখে মৃদু হাসির ঝিলিক। এই অর্ডারটা তার বেশ মনোমতো হয়েছে। সুবেদার হরজিৎ সিং অ্যাকাডেমিতে ইন্সট্রাক্টর ছিল, সৈন্যদের সহবত কিংবা ড্রিল শেখাতে তার জুড়ি নেই।

খানিক পর লক্ষ্য করি দূরের কারশেড প্ল্যাটফর্মে জনা চারেক সৈন্য দৌড়াদৌড়ি করে কঠিন মাসকেটারি ড্রিল প্র্যাকটিস করছে। সুবেদারের কাজ তাৎক্ষণিক। লান্স নায়েক ধীরেন গড়াই ছাড়াও তাহলে গোটা তিনেক প্রবলেম কেস আছে। একটু পরে দেখি সৈন্যদের ঐ দলটি সংখ্যায় বাড়ছে। যাক, আমি মনে মনে নিশ্চিন্ত হই। অন্যান্য কোম্পানিরাও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাহলে।

হাঁকডাক, সোরগোলে প্ল্যাটফর্ম ভরে থাকে। বিভিন্ন কোম্পানির জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হতে থাকে অপেক্ষমাণ ট্রেনে। ক্ষণে ক্ষণে গাড়ি এসে থামে, দৌড়ে কিংবা কুইক মার্চ করে আসে সৈন্যদের ছোট ছোট উপদল। আমি দাঁড়িয়ে তদারক করি। কর্নেল তাঁর দলবল নিয়ে বার কয়েক চক্কর মারেন এদিক থেকে ওদিক। আমার অস্ত্রাগারের কাছে দাঁড়িয়ে উনি বলেন, রেডিওতে খবর শুনেছ?

না স্যার। আমি মাথা নাড়ি। মরছি নিজের জ্বালায়, তবু নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করি, কি খবর?

টাইগার গেরিলারা বলছে শান্তিসেনার হাতে অস্ত্র তুলে দেবে। আত্মসমর্পণ করবে।

বাঃ। আমি হাসি, ভালই তো। ঘাবড়ে গেছে বোধহয়। এতবড় আর্মি—

হুঁ। কর্নেল দাঁড়িয়ে কপালে টোকা মারেন, সেভেনটি ওয়ানে একটা আত্মসমর্পণ দেখেছি।

গল্পটা আমাদের জানা। কর্নেল বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় প্রায় পাঁচ মাস মুক্তিযোদ্ধা সেজে লড়েছেন। তিন মাসের ওপর ওঁর খোঁজ না পাওয়াতে ইন্ডিয়ান আর্মি ওঁকে নিখোঁজ ঘোষণা করে, ফৌজ থেকে ওঁর নামও কাটা যায়। যশোরের পতনের পর উনি আবার মূল ভারতীয় সেনাদলে যোগ দেন।

স্যার। আপনি মিলিটারি ইনটেলিজেন্সে যাননি কেন? আমরা মাঝেমধ্যে জিজ্ঞেস করি, আপনার এরকম দারুণ অভিজ্ঞতা। গোয়েন্দা বাহিনীর একটা অ্যাসেট।

দূর, দূর। কর্নেল মাছি তাড়ান, ইনফ্যান্ট্রির লাইফ একটা আলাদা ব্যাপার।

সৈন্যরা দৌড়ে গিয়ে লাইন করে ট্রেনে ওঠে।

দ্য ব্যাকবোন অফ আর্মি। সৈন্যবাহিনীতে থাকতে হলে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছোনর মতো চার্ম আর কিছুতে আছে নাকি?

সেদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ বাড়িব্রাহ্মণ রেলস্টেশানের বাইরে আমাদের ফল-ইন সৈন্যসমাবেশ। সমস্ত দল নিয়ম মেনে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আলফা কোম্পানি, ব্রাভো, চার্লি, ডেলটা কোম্পানি, হেডকোয়ার্টার। মর্টার প্লাটুন, র‍্যাপিড অ্যাকশন, মেডিকেল, সিগনাল, মেশিনগান, মাইন প্লাটুন। পাপা, রোমিও, অস্কার টিম। দলগতভাবে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, মানুষ ও মেশিনের হিসেব নেওয়া হয়। সর্বাধিনায়ক কর্নেলের কাছে ধাপে ধাপে এসে পৌঁছয় অল ওকে রিপোর্ট—সব ঠিক হায়। যাত্রা করবার জন্য আমরা প্রস্তুত, শ্রীমান!

কর্নেলের ইঙ্গিতে ধর্মযাজক অরদাস পাঠ করেন। 'গুরু গ্রন্থসাহেব নামক ধর্মগ্রন্থ থেকে গুরুবাণী শোনবার পর শিখসৈন্য উল্লাসে গর্জন করে—ওয়াহে গুরুজীকা খালসা! ওয়াহে গুরুজী কি ফতেহ্!

ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত সৈন্যরা ছোট ছোট কদমে দৌড়ে গিয়ে লাইন করে ট্রেনে ওঠে। নাইন শিখ রেজিমেন্টকে নিয়ে সুবিশাল ট্রেন—মিলিটারি স্পেশাল এম এস ডাউন ১১৩২ ধীরে ধীরে নড়ে ওঠে। পুরো শক্তির দু'-দুখানা সুবিশাল ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যাবে এই ট্রেনকে আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল উপমহাদেশ পেরিয়ে সেই ভারত মহাসাগরের দোরগোড়ায়, ভারতভূমির চরণপ্রান্তে। এই জম্মু থেকে মাদ্রাজ।

সেই একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সৈন্যদল রওয়ানা হলো ঐ একই গন্তব্যের উদ্দেশে। রাজস্থানের মরুভূমিতে গোলন্দাজি প্র্যাকটিস করছিল একত্রিশ নম্বর ফিল্ড রেজিমেন্ট। তাদের বিশালাকার কামানগুলো নিয়ে রাতারাতি ফিরে এসে তারা ট্রেনে চাপল শ্রীগঙ্গানগর স্টেশান থেকে।

এক হাজার বাহান্ন নম্বর আরমারড রেজিমেন্ট বিশালাকার ট্যাংক ট্রান্সপোর্টার গাড়িতে তাদের ট্যাংকগুলো তুলে নিয়ে হায়দ্রাবাদ থেকে রওয়ানা হলো মাদ্রাজের পথে।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের কনফারেন্স রুমে সেনাপতি বললেন, গোর্খা রইফেলস যাবে। গেরিলাযুদ্ধের জন্য ওরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই শুনে গোর্খা কর্নেলের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল আনন্দে, আর তাঁর সৈনিকরা চটপট কয়েক মিনিটের কুকরি নৃত্য করে নিল রওনা হবার আগে।

হিমাচল প্রদেশের সীমানা পেরিয়ে যেখানে হরিয়ানা শুরু সেখানে জাঠ রেজিমেন্টের সৈনিকরাও আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল—জয় ভগবান! জাঠ বলবান!!

আগ্রার কাছে ক্যান্টনমেন্টে মেরুন টুপি পরা সৈন্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র হাতে তুলে নিল। এরা যাবে বিমানযোগে। এরা প্যারাকমান্ডো—ছত্রীসেনা। আকাশ থেকে প্যারাসুটে করে নেমে শত্রুসেনার ঘাঁটির ভেতরে আঘাত হানতে সিদ্ধহস্ত।

মাদ্রাজ শহরের কেল্লায় বসে ছক কষলেন কিছু ঝকঝকে চেহারার মানুষ। এঁদের বেশির ভাগই ক্রাউন র‍্যাংক—রাষ্ট্রপতির তথা রাষ্ট্রের সেনাপতিবৃন্দ। ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল, লেফটেনান্ট জেনারেল। তাঁরা নিচের স্তরের সৈনিকদের মতো অত আনন্দিত হতে পারেন না, কারণ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাঁদের শিখিয়েছে শত্রুর কেল্লায় পতাকা ওড়ানোর পরও যুদ্ধ বাকি থেকে যায়। প্রতি-আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

ছয়

অনুরাধাপুরের বাস হাতের সামনে পেয়ে, তাতেই উঠে পড়েছিল পাখি।

ঘুম ভাঙতে ও দেখে বাস একটা পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে ছুটে চলেছে। চড়াই উতরাই রাস্তা, দু'ধারে সবুজ বন আর দূরে দূরে পাহাড়। ও দেখে পাশের টেকো লোকটা ঢুলছে। বাসে লোকও তেমন নেই। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। তারপর সামনের সিটের লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, অনুরাধাপুর কত দেরি?

অনুরাধাপুর—সে অনেক দেরি। সামনের লোকটা বলে।

সেকি খোকা? পাশের লোকটার ঘুম ভেঙেছে। সে হাসে, তুমি যে বললে অনেকবার গেছ?

গেছি তো। পাখি হাসবার চেষ্টা করে, তখন অনেক ছোট ছিলাম তো।

একা এলে কেন বল তো? টেকো ভুরু কুঁচকোয়, বাবা, মা—

নেই। পাখি অন্যদিকে মুখ ঘুরোয়। কাকার কাছে থাকি।

হুঁ। টেকো এবার গলা নামায়, কাকা পিটিয়েছে, তাই পালাচ্ছ?

পাখি মাথা ঘোড়ায় লোকটার দিকে। লোকটা কাছে সরে আসে, কানের কাছে ফিসফিস করে, তোমার জামা সরে গিয়ে পিঠ দেখা যাচ্ছে। কি দিয়ে মারল, শংকর মাছ?

একটু পরে একটা জায়গায় বাস থামে। ছোট্ট শহর একটা, ছবির মতো সাজানো। টেকো লোকটা হাই তোলে, নুয়ারা এলিয়া এল, কফি খাবে তো?

কি সুন্দর! পাখি অবাক হয়ে বলে, ঠিক ইংরিজি সিনেমার মতো।

ঘুঁক, ঘুঁক। লোকটা হাসলে অদ্ভুত আওয়াজ হয়, এটাকে লোকে শ্রীলংকার ইংল্যান্ড বলে। ঐ যে উঁচু পাহাড়টা দেখছ—

মাউন্ট পিদ্রুতালাগালা। পাখি হাসে, শ্রীলংকার উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।

বলো কি? লোকটার চিবুক ঝুলে পড়ে, তুমি পড়াশোনা করেছ তাহলে কিছু, বলো?

ফাইভ অব্দি। তারপরেও, মানে কাকা বইপত্র কিনে দেয়। কিন্তু স্কুলে—ফি দেয় না।

টেকো চুপ করে থাকে। তারপর কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলে, তাহলে এবার করবেটা কি? মাসির কাছে যাবে? মাসি

রাখবে?

আমি ইন্ডিয়ায় চলে যাব। পাখি জানালায় চিবুক রেখে বলে। জাফনা থেকে নৌকোতে—

ইন্ডিয়ায়? লোকটা চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলে, সেখানে কি আছে? তাছাড়া ওদের ভাষা বুঝবে কি করে? ওরা মোটেও সিংহলি ভাষা বলতে পারে না, বোঝেও না। আমাদের ওরা রাবণের মতো অভব্য ভাবে।

পাখি চুপ করে থাকে। লোকটা সিংহলি, ওকে বলা উচিত হবে না যে পাখি নিজে আসলে তামিল। আর ইন্ডিয়ায় তামিলদের জন্য একটা আলাদা রাজ্য আছে। সেখানে সৈন্যরা তামিলদের খুন করে না। আর ইন্ডিয়ায় আছে অনেক কারখানা। পাখি একটা কোনো ছোট কারখানায় কাজ করবে, আর রাতে পড়াশোনা করবে। আরেকটু বড় হলেই ও জাহাজে চাকরি পেয়ে যাবে।

শোন, শোন। লোকটা নিজের প্যাকেট ছিঁড়ে একমুঠো কাজু এগিয়ে দেয় ওর দিকে, ওসব চক্কর ছাড়ো। কান্দীতে নেমে পড়। আমার একটা ছোট্ট দোকান আছে এখানে, খেলনার দোকান। কুমারসেনা স্টোর্স, যাকে জিজ্ঞেস করবে, সেই বলে দেবে। হে, হে, মানে আমার নিজের নামেই। একটা আইসক্রিমেরও কাউন্টার করব। নেমে পড়, আমার কাছে থাকবে।

মাইনে তেমন দিতে পারব না। কুমারসেনা ফিসফিস করে, তবে সকালে স্কুলে যেতে পারবে, এগারোটায় ফিরে এসে দোকান সামলাবে, চারটে পর্যন্ত।

তখন আপনি চাকরি করতে যান বুঝি? পাখি কৌতূহলী হয়।

চাকরি? টেকো ভুরু কুঁচকে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে, চাকরি...হোঃ হোঃ...কে চাকরি দেবে আমাকে...হেঃ হেঃ...তাছাড়া চাকরি কোনো ভদ্রলোকে করে?

তবে?

আমি ম্যাজিক দেখাই টুরিস্টদের, ঐ সময়টাতে। তুমি শিখবে ম্যাজিক?

ঐ ম্যাজিকের লোভেই কুমারসেনার পেছুপেছু নেমে পড়ে পাখি নিজের হাতের থলেটা নিয়ে। কুমারসেনা বলে, দাও, থলিটা আমাকে।

পাখি থলি হাতছাড়া করে না। কুমারসেনা হাসে, আমি জানি, ওতে কি কি আছে, বলব? একটা জর্দার কৌটোয় বত্রিশটা মারবেল, একটা ব্যাটারি লাগানো গাড়ি, এখন ব্যাটারি লাগালেও চলে না, আর...

পাখি অবাক হয়ে যায়। কুমারসেনা আবার হাসে, সব একমুহূর্তে ভ্যানিশ করে দিতে পারি। আবার গাড়িটা ঠিক করেও দিতে পারি—সেটা অবশ্য ম্যাজিক নয়, মিস্ত্রির কাজ—

ক্যান্ডী শহরটা খুব সুন্দর। একটা বিশাল লেকের চারধারে গড়ে ওঠা শহরটা বিখ্যাত বুদ্ধদেবের দাঁতের জন্য। লেকের পাড়ে সেই বিখ্যাত মন্দিরে গচ্ছিত আছে বুদ্ধদেবের দাঁত। পরের দিন বিকেলে কুমারসেনা ম্যাজিক দেখিয়ে ফেরে ঘরে। পাখি তখন দোকানে। দোকানের পেছনে কুমারসেনার ঘর। কুমারসেনা একাই থাকে।

তোমারও কেউ নেই? পাখি প্রথমদিন জিজ্ঞেস করে।

থাকবে না কেন? বাবা, মা আছেন। কলম্বোয় থাকেন।

তুমি এখানে একা থাক কেন?

ঐ একই কেস। তোর মতো। খানিকটা তফাৎ অবশ্য আছে, আমাকে ঠেঙিয়েছিল বাবা। অংকে গাড্ডু মেরেছিলাম। সেদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি, ঠিক করি নিজে কামাতে হবে। আর ফিরিনি—কুমারসেনা উদাস হয়ে যায়।

বাবা-মার সঙ্গে দেখা করনি? পাখি জিজ্ঞেস করে।

বাবা-মা আসেন। ওনারা আমার ঠিকানা পেয়ে গিয়েছিলেন মাস ছয়েকের মধ্যেই। কিন্তু আমি তখন নটরাজনের পাল্লায় পড়ে গেছি—

নটরাজন কে?

ম্যাজিসিয়ান। আমার গুরু। কুমারসেনা কপালে হাত ঠেকায়, গুণী লোক ছিল। তবে লোভটাও ছিল খুব বেশি। রত্নবুদ্ধ ভ্যানিশ করবার ধান্দায় ছিল—

অ্যাঁ? পাখি ঘাবড়ে যায়, সেকী? তারপর?

ক্যান্ডী দন্তমন্দিরের অন্দরতম প্রকোষ্ঠে লুকানো থাকে রত্নবুদ্ধ, তিন ইঞ্চি বাই দু' ইঞ্চি এমারেল্ড কুঁদে তোলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রত্নরাজির একটি। বছরে দু' দিন মাত্র জনসমক্ষে বার করা হয়।

ধরা পড়ে গেল। কুমারসেনা জানালা দিয়ে বাইরে লেকের দিকে তাকিয়ে থাকে, লোকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। তারপর তিন-চারদিন ধরে দাঙ্গা চলল, তামিল মারা পড়ল কিছু—যাকগে, বাদ দে। চল তোকে মন্দিরটা ঘুরে দেখাই, তারপর বাইরে খেয়েই আসব।

কুমারসেনার দোকানটা ছোট্ট। মূলত ছোটদের খেলনার দোকান, সঙ্গে টুরিস্টদের জন্য কালাপুরায়ার তৈরি বাঁশ, পিতল এবং এমনকি রুপোরও তৈরি ছোটখাটো খেলনাও রাখে, তাছাড়াও ফুলদানি, ধূপদানি, দেওয়ালে ঝোলানোর প্লেট, ঘণ্টা, ছোট্ট বুদ্ধমূর্তি এই সব। যেদিন একটু বিক্রিবাটা হয়, সেদিনই কুমারসেনা বাইরে বেরিয়ে হোটেলে খায়।

আরে খেয়ে নে, খেয়ে নে। এরকম বাত্তালাপম কোত্থাও পাবি না। কাল বিরিয়ানি খাব—কোনোদিন খেয়েছিস? ইন্ডিয়ায় রাজা-মহারাজা, বড়লোকরা খায়—

হুপহাপ করে বোলো ফিয়াডোর বড় বড় টুকরো মুখে ঢোকায় কুমারসেনা। আরামে ওর চোখ বুঁজে আসে, আঃ। এই তো মজা—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—

কুমারসেনার কাছে পাক্কা মাস দেড়েক কেটে যায়। ও অবশ্য ম্যাজিক শেখায় না। বলে, হবে। হবেখন। ম্যাজিক তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আগে স্কুলে ভর্তি হয়ে নে—

তার তো এখনো চার মাস দেরি। বছর না শেষ হলে—

হুঁ। কুমারসেনা নিজের ম্যাজিকের থলি গোছায়, বই কিনে আনব আজ। একটু দেখে-টেখে নে, নইলে একদম পুঁচকেদের ক্লাসে ভর্তি করে দেবে।

কিন্তু সেদিন বিকেলেই পালায় পাখি। কুমারসেনা বাড়ি ফিরছে, সঙ্গে ওদের গ্রামের প্রেমরত্ন। ওর বন্ধু সিরিচন্দ্রার বাবা। দূর থেকে ওদের আসতে দেখেই ফটাফট ব্যাগ গোছায় পাখি। কুমারসেনার দেওয়া জামা-প্যান্টটা নেয় না, তবে দুটো গল্পের বই দিয়েছিল, সে দুটো নেয়। কুমারসেনারা যখন দেবালার রাস্তা ছেড়ে ওদের গলিতে ঢোকে, ততক্ষণে পাখি হাঁপাতে হাঁপাতে বাসস্ট্যান্ডে।

বেলাশেষে তখন বাসস্ট্যান্ড ফাঁকা। পাখি পাগলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলোতে খোঁজ করে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, তুমি যাবে কোথায় খোকা? আজ তো আর কোনো বাস নেই।

একটা লোক বাসস্ট্যান্ডের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। ওকে বলল, খোকা। তুমি এক কাজ কর। মিউজিয়ামের ওখানে চলে যাও। একটা গাড়ি এসেছে অনুরাধাপুর থেকে, ফিরবে। আমি ওটাতে এলাম। ড্রাইভার খাবার খাচ্ছে হোটেলে।

মিউজিয়ামের উল্টো দিকে দাঁড় করানো টুরিস্ট ট্যাক্সিটাকে সহজেই খুঁজে বার করে পাখি। ড্রাইভার তখন কাপড় দিয়ে কাচ মুছছে। ওর কথা শুনে বলে, অনুরাধাপুর নয়। আমি যাব সিগরিয়া। যাবি তো চল, তোকে রাস্তায় নামিয়ে দেব। তবে রাত হয়ে যাবে কিন্তু, একা যেতে পারবি তো?

পাখি ঘাড় নাড়ে। সিগরিয়া একটা বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট। গুহাচিত্রের জন্য বিখ্যাত। ইন্ডিয়াতেও আছে। ওর মাঝে-মধ্যে মনে হয় ইন্ডিয়ার সঙ্গে এত মিল ওদের, তবু কেন ইন্ডিয়ার সঙ্গে ঝগড়া?

লোকটা গাড়ির স্পিড তোলে শহর পেরিয়ে। টেপরেকর্ডার চালায়, হিন্দী গান। খুব চেনা গান, ভাষাটা যদিও বোঝা যায় না, লোকটা তবুও মাথা দোলায় তালে তালে। তারপর বলে, থাকিস কোথায়? অনুরাধাপুরে?

নাঃ। পাখি হাসে, জাফনা যাব। সেখান থেকে ইন্ডিয়া।

কেন? বাপ-মা কি পটল? নাকি ঠ্যাঙানি খেয়ে পালাচ্ছিস?

পাখি চুপ করে থাকে। একটু পরে নিচু স্বরে বলে, আমার কেউ নেই। আমি বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। তাই আমাকে ইন্ডিয়ায় চলে যেতে হবে।

পারবি? লোকটা হাসে, ওর একটা দাঁত সোনালী, ঝকঝক করে। বলে, টাইগারদের এলাকা দিয়ে যাবি, ওরা ধরে গেরিলা বানিয়ে দেবে। লোক মারতে শিখবি, তারপর বছর দুয়েক পরে তুইও পটল। তার চেয়ে এক কাজ কর, আমার এখানে থেকে যা।

পাখি চুপ করে থাকে। লোকটা আবার বলে, দেখ সবাই বলে এখানে কিছু হবে না। কেন হবে না বল তো, এত সুন্দর দেশ আর আছে? আমাদের ফ্যামিলির এই বিজনেস, ট্রান্সপোর্ট। গাড়ির। টুরিস্ট পারমিট আছে, বাস, লরিও আছে। তোকে খালাসির কাজে লাগিয়ে দেব। মন দিয়ে কাজ করলে আমার বয়সে নিজের ট্যাক্সি হয়ে যাবে তোর।

পাখি আড়চোখে লোকটাকে দেখে। লোকটার মুখভর্তি বসন্তের দাগ, তবু কেমন একটা করুণ মতো, বেচারা বেচারা ভাব। বয়স বেশি নয়, সিরিচন্দ্রার বড়দার মতোই হবে।

সেদিন রাতে লোকটার গ্যারেজে কাটায় পাখি। পরদিন সকালে উঠে ওর খোঁজ করে। গ্যারেজের অন্য লোকেরা বলে, ছোট মালিক ভোর থাকতে উঠে গাড়ির ট্রিপ নিয়ে বেরিয়ে যান।

ওর কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি, সকলে ব্যস্ত এখানে। রাতে কিছু খাওয়া জোটেনি, সকালেও কেউ কিছু বলে না। বাধ্য হয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসে পাখি। বড় রাস্তায় এসে বাস ধরে। জাফনার।

সাত

জাফনায় পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

রাস্তায় তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। টুকরো নারকেল, ছোলা ফ্রাই ছাড়াও ইডলি পাওয়া যায় রাস্তায়, সেগুলো সময়মতো পেটে চালান হয়েছে। কিন্তু তাতে কী হয়! আসলে অনুরাধাপুরের পর দফায় দফায় আর্মি সার্চিং এবং বাবুনিয়া ঢোকবার পর থেকে গেরিলা সেনার তল্লাশি। ঠিক যেন অন্য একটা দেশে ঢুকে পড়েছে পাখি। গেরিলা সৈন্যরা সব বয়সে ছোট, এমনকি পাখির মতো বয়সের কিছু ছেলেও আছে। সেজন্যই হয়তো আর্মির লোকরা বেছে বেছে পাখির ব্যাগই বারবার হাঁটকায়, ওর শরীর তল্লাশি করে। সেনা অফিসার বারবার জিজ্ঞেস করেন, ও সিংহলি, তাহলে ওর মাসি জাফনায় থাকে কেন?

রেহাই পেতে ও বাধ্য হয়ে বলে, মেসো জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করেন তাই।

জাফনায় বাস থেকে নেমে পাখি দৌড়য় সামনের পাইস হোটেলের দিকে। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবার যোগাড়। হোটেল ফাঁকা, দোকানী গেঞ্জিটা ভুঁড়ির ওপর তুলে খবর কাগজ দিয়ে হাওয়া খায়। ওর দিকে একবার তাকায়, তারপর বলে, রাজন আসেনি।

কি? খিদেয় মাথা ভোঁ ভোঁ করে পাখির। ও বলে, খাবার পাওয়া যাবে?

অ। লোকটা চোখ বন্ধ করে গামছা নাড়ে, ভাত মাছ সব্জি ছাড়া কিছু নেই।

লোকটার হাবভাবে মনে হয় দোকান চালাবার বিশেষ ইচ্ছে নেই। তবু ও ঢুকে পড়ে বেসিনে মুখ-হাত ধোয়। লোকটার হাঁক শুনে একটা লম্বা, ডিগডিগে রোগা লোক খাবার নিয়ে আসে। ভাতটা ঠাণ্ডা হলেও মাছের ঝোল গরম। সে ফিকফিক করে হাসে, আসলে সকালের দিকে অন্য সব কিছুও বানানো হয়। তবে তিন দিন ধরে কার্ফু চলেছে তো, আজ সবে খুলল—

তিন দিন ধরে? পাখি অবাক হয়, কেন কি ব্যাপার?

কোত্থেকে এলে? লম্বু হাসে, যেন খুব মজা পেয়েছে, শহরে নতুন নাকি?

পাখি জবাব না দিয়ে খায়। খাবারের দাম দিতে গিয়ে আরেক বিপত্তি। মালিক কাউন্টারে বসে ঘুমোয়, পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে চেঁচায়, কি ঝঞ্ঝাট! অ্যাই লম্বু, পয়সাটা নিয়ে নিতে পারলি না হতভাগা?

দোকান মালিকও বেয়ারাকে লম্বু বলে ডাকছে, খুব মজা লাগে পাখির। কিন্তু সব মজা মুহূর্তে মাটি হয় যখন দোকানদার বলে, এই পয়সা তো চলবে না বাপ। এ তো শ্রীলংকার টাকা।

অ্যাঁ? পাখি এমন অবাক হয়, যে ওর চোয়াল ঝুলে পড়ে। ও আমতা-আমতা করে, মানে?

কোত্থেকে আসা হলো? লোকটা এবার চোখ কচলে ওর দিকে ভাল করে তাকায়, নতুন চিড়িয়া মনে হচ্ছে? জানো না, তুমি তামিল ইলমে ঢুকে পড়েছ? এখানে শ্রীলংকার টাকা চলবে না, ইন্ডিয়ান রুপি চাই। গেরিলাদের অর্ডার।

ইতিমধ্যে লম্বু এসে কাউন্টারের পাশে দাঁড়ায়। সে ফিকফিক করে হাসে আবার, আমার কাছে নেই কিন্তু বাবু। বদলাতে চাইবেন না। এমাসের মাইনেটাও দেননি—

বাজে বকিস না। দোকানী ভেঙিয়ে ওঠে, মাইনেটাও দেননি! তোর বাবা বারণ করে যায়নি?

কি হয়েছেটা কি? হঠাৎ একটা গম্ভীর গলার শব্দ শুনে পাখি ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা কালো গেঞ্জি, নীল জীনস পরা ছেলে হাতে মেশিনগান নিয়ে দোকানের মধ্যে ঢুকছে। ছেলেটার বয়স বেশি নয়। সিরিচন্দ্রার মেজদার মতো হবে, ক্লাস টেন হতে পারে। কিন্তু দোকানী ওকে দেখে তড়াং করে উঠে দাঁড়ায়, এসো রাজন, এসো। এই যে একটা খরিদ্দার, নতুন এসেছে বোধহয়—

রাজন এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে। তারপর হাসে, কি ব্যাপার বল তো? কোত্থেকে আসছ? ওর চোখ দুটো ঝকঝকে, প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা একদম বড়দের মতো। পাখি খানিকটা সিঁটিয়ে যায়। নিচু গলায় বলে, অনুরাধাপুর থেকে।

দ্যাটস গুড। রাজন হাত বাড়ায়, আমি রাজন। তোমার নাম কি?

সেদিন রাতে পাখি একটা আশ্রমের উঠোনে বসে চাপাটি আর সব্জি খায়। পাশে রাজন। ও গেরিলাসেনার প্রোটোকল অফিসার। বাসস্ট্যান্ডে নামা যে কোনো নবাগতর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া ওর একটা কাজ। রাজন বলে, হ্যাঁ। এখানে উত্তর শ্রীলংকাতেও শ্রীলংকা আর্মির ক্যাম্প আছে। কিন্তু তা নামেই। ওরা জীবনে ক্যাম্পের বাইরে বেরোয় না। আমরা বারণ করে দিয়েছি। ওরা বাইরে বেরোলেই তো গণহত্যা করে। আর আমরা তৎক্ষণাৎ বদলা নিই। মোটের ওপর এখন এটা আমাদের রাষ্ট্র। বাবুনিয়ার ওপার থেকে নতুন সৈন্য না ঢুকলে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাবার এখন কেউ নেই।

রাজন এসে ওর সামনে দাঁড়ায়।

সৈন্য ঢুকতে পারে নাকি? পাতের কোণের আচার চাটে পাখি।

তুমি কিছু খবর রাখ না দেখছি। রাজন তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চায়, খবর কাগজ পড়ো না? শীগগিরই শ্রীলংকা সরকার পুরোদস্তুর সেনা অভিযান শুরু করবে তামিল ইলমের বিরুদ্ধে। তার মানে বুঝেছ? পুরোদস্তুর যুদ্ধ।

পাখি বোঝে কুমারসেনার বাড়িতে থেকে এই অবস্থা হয়েছে তার। কাকার বাড়িতে, সেই দক্ষিণ শ্রীলংকার গ্রামেও রোজ দু'বেলা লড়াই নিয়ে আলোচনা। আর ক্যান্টীতে অন্যরকম। ওখানে বিশেষ কেউ যুদ্ধ নিয়ে চিন্তিত নয়। তার ওপর কুমারসেনা খবর কাগজ রাখে না, বাড়িতে টিভি কিংবা রেডিও নেই। পাখি হাসে, বাবা! তাহলে তো খুব মুশকিল দেখছি।

মুশকিলের কি আছে? রাজন হাত মুঠো করে, এবার উচিত শিক্ষা পাবে শ্রীলংকা সরকার।

আমি কি করে যাব? পাখি ভয়ে ভয়ে বলে, ইন্ডিয়ায়?

যে কোনো দিন যেতে পার। রাজন বলে, রোজ আমাদের ফেরি পারাপার হয়। কিন্তু তুমি এখন পালিয়ে যাবে? জন্মভূমির এই দুর্দিনে? যখন যুদ্ধের জন্য আমাদের সৈনিক দরকার সবচেয়ে বেশি, তখন তুমি নিজের আত্মসুখের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

তবে কি করব? পাখি কাঁচুমাচু মুখে বলে।

লড়াই কর। রাজন বলে, ওর চোখ জ্বলজ্বল করে। গেরিলা সৈন্যদলে নাম লেখাও।

না। পাখি এবার গোঁজ হয়ে বলে, আমার লড়াই ভাল লাগে না। আমি ইন্ডিয়ায় যাব, নিজের পায়ে দাঁড়াব, বড় চাকরি করব—

লজ্জা করে না? রাজন চোখ গোল গোল করে ধমকায়, এই বললে, তোমার বাবা-মাকে সৈন্যরা খুন করেছে। তোমার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারপরও—।

একটু থেমে রাজন গলা নামায়। ঠিক আছে। লড়াই করতে হবে না। আমাদের তো অন্য কাজেও লোক দরকার।

পাখির ঘুম আসে না সহজে সে রাতে। ও ভাবে, এখান থেকে সহজে যাওয়া যাবে না। রাজনের দলবল এখান থেকে ওকে যেতে দেবে না। এখান থেকেও পালাতে হবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজনকে দেখতে পায় না পাখি। আশ্রমে জনা দশেক সাধু আছেন। তাঁরা একদিকে থাকেন। অন্যদিকে অতিথিশালা, নাটমঞ্চ, আর ভগবান মহেশ্বরের মন্দির। অতিথিশালার এককোণে পাখি থাকে একটা ছোট্ট ঘরে। আশ্রমে অনেকগুলো গরু। সাধুরা গরুদের পরিচর্যা করেন। পাখি এক সাধুকে জিজ্ঞেস করে রাজনের কথা। সাধু মাথা নাড়েন, না বাবা। ওর কথা বলতে পারব না। তবে তুমি যতদিন খুশি থাকো। প্রায়ই এরকম লোক আসে, থাকে এখানে, তাও তো আজকাল কম। আগে কত লোক আসতো, কি বলব—

ধুনুচিতে ধুনো দিয়ে ফুঁ দেন সাধু। ধোঁয়ায় খকখকে করে কাশেন। পাখি অবাক হয়, দিনের বেলা ধুনো দেবার কি দরকার? ও বেরিয়ে আসে, সাধু চেঁচান, যেখানেই যাও, বেলা বারোটার আগে ফিরবে। তারপর খাবার পাবে না।

পাখি শহরে ঘুরে বেড়ায়। সব জায়গায় চাপা উত্তেজনা, ফিসফিসানি। দোকানদার দোকানের ঝাঁপ পুরো খোলে না। বাস, গাড়ি বন্ধ। কিছু লোক স্কুটার, মোটর সাইকেলে ঘোরে। তা ছাড়া আছে সাইকেল। সকলের একটাই আলোচনা, যুদ্ধ। শ্রীলংকা সরকার নাকি অবরোধ করবে, চারদিক থেকে রাস্তা বন্ধ করে দেবে। উত্তরাঞ্চলে খাবার, ওষুধ কিচ্ছু ঢুকতে দেবে না।

পাখি এসব শুনে ঘাবড়ায়। আশ্রমে ফিরে আসে। মাখন দিয়ে সেদ্ধ ভাত বেড়ে দেন একজন সাধু। ইনি আবার মৌনী, কোনো কথা বলেন না। শেষে আমের আচার খেয়ে থালাটা তুলে নিয়ে ধুতে যায় পাখি।

রাজন ফেরে তিন দিন পর। ওর চুল উস্কোখুস্কো, চোখ লাল। ওকে বলে, তোমার জন্য ফিরতে হলো। নইলে এখন ফিরতাম না। কি ঠিক করলে বল? আমাকে কাল ভোরে বাবুনিয়া যেতে হবে।

আমি ইন্ডিয়ায় যাব। গোঁয়ারের মতো বলে পাখি, আমার এসব পোষাচ্ছে না—

যেও। এখন নয়। শ্রীলংকা সরকার চারদিক থেকে অবরোধ করেছে। ভারত থেকেও ফেরি পারাপার করা যাচ্ছে না। ভাল কথা, কাল বড় সাধুর সঙ্গে গিয়ে অনাথাশ্রমটা দেখে এস।

সকালে রাজন যথারীতি হাওয়া। বড়সাধুকে বলতে উনি বলেন, সেকি? এখনও তুমি অনাথাশ্রম দেখনি? চল, চল, আজই চল।

প্রায় মাইল তিনেক রাস্তা সাইকেলে যান সাধু, পাখিকে ক্যারিয়ারে বসিয়ে। অনাথাশ্রমটা শহরের একপ্রান্তে। সাধুরাই চালান। সেখানে প্রায় দেড়শোর মতো খুদে বাচ্চা। সবচেয়ে ছোটটা তিন মাসের

শ্রীলংকা সৈন্যদের আক্রমণে এদের বাবা মা মারা গেছে। বড়সাধু চায়ে চুমুক দেন। পাশে দাঁড়ানো অনাথাশ্রমের সাধুজী। তিনি বলেন, এদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের যোদ্ধা তৈরি হবে।

উঠোনে ক্যালর-ব্যালর করে একপাল বাচ্চা। তাদের সামলাতে হিমশিম খেয়ে যান জনা তিনেক শিক্ষানবিস সাধু। এঁরা সাদা পোশাক পরেন। একজন দুটো বাচ্চাকে ধরে আচ্ছা করে পেটাতে শুরু করেন। বড় সাধু বিরক্ত হন, আঃ। কি করছটা কি? নিয়ে এসো ওদের এখানে।

বড় সাধু মুহূর্তে বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলায় মেতে যান।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখে পাখি। অনেকদিন পর। চেন্নার স্বপ্ন। চেন্না অনাথাশ্রমে আছে, ওর বাবা-মা মারা গেছে। চেন্নাকে শিক্ষানবিস সাধু পেটাচ্ছে। খুব কষ্ট হয় পাখির।

ঘুম ভেঙে গিয়ে পাখি বোঝে, ও কাঁদছে। চেন্নার জন্য!

কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। রাজন আসে না। কিন্তু বিপদ ঘনীভূত হয়। চারদিক থেকে শ্রীলংকা সরকারের সেনাবাহিনী আরো বেশি আক্রমণ করে। একেকটা শহরকে ঘাঁটির মতো ব্যবহার করে গেরিলারা, আর চারদিক থেকে আর্মি ঘিরে ধরে। গোলন্দাজ বাহিনী যখন-তখন কামান দাগে, গোলা উড়ে এসে পড়ে শহরের মধ্যে, শয়ে শয়ে নিরীহ লোক মারা পড়ে। গেরিলাদের নির্দেশে প্রত্যেক বাড়ির লোক পরিখা খনন করে, ভূগর্ভস্থ বাংকার তৈরি করে। শ্রীলংকা এয়ারফোর্সের বিমান এসে গাদা গাদা বোমা ফেলে, সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারলে যেন ওদের শান্তি হয়। তার ওপর অবরোধ। খাদ্যসংকট তীব্র হয়। অনাহারে প্রচুর লোক মারা যেতে থাকে। আশ্রমের তরফ থেকে রোজ দুপুরে খিচুড়ির আয়োজন করা হয়, ক্রমশ লোক বাড়তে থাকে সেখানে। শহরে লুটতরাজ শুরু হয়, গেরিলাসেনার ভয়ও মানুষকে দমাতে পারে না।

বড় সাধু এই সব কিছুর মধ্যে নির্বিকার। মহেশ্বরের মূর্তির সামনে বসে ধ্যান করেন পূজার শেষে। তারপর বারান্দায় বসা পাখিকে প্রসাদ দেন। হাত কপালে ঠেকিয়ে পাখি জিজ্ঞেস করে, কি হবে মহারাজ?

সব ঠিক হয়ে যাবে। বড় সাধু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর দেন।

শ্রীলংকা সরকার তো আমাদের মেরে ফেলবে। পুরো শহরের সবাই মরে যাবে। খাবার নেই, ওষুধ—

ঘাবড়াচ্ছিস কেন? দ্যাখ না ইন্ডিয়ান আর্মি এল বলে। ওরা কদ্দিন সহ্য করবে?

ঠিক তাই ঘটে। পরের দিন ভোর হবারও আগে বিশাল এক বিমানবাহিনীর উড়ে আসার শব্দে থরথর করে কেঁপে ওঠে পুরো শহর। সকলে পালায় দৌড়ে, পরিখার মধ্যে বাংকারের মধ্যে লুকোয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, কোনো বোমা পড়ে না। শহর জুড়ে প্যাকেট পড়তে থাকে কিসের। শহরবাসী হৈহৈ করে বেরিয়ে আসে। উদীয়মান সূর্যের লালচে সোনালী আলোয় তারা অবাক হয়ে দেখে ত্রিবর্ণ লাঞ্ছিত চক্র আঁকা সেইসব বিমানের গায়ে। শ্রীলংকা সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা তখনও ঘুমভাঙা চোখে বুঝে উঠতে পারে না কি ঘটছে। যারা বোঝে, তারাও সুবিশাল এই যন্ত্রবাহিনীর মোকাবিলা করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। রাজকীয় ভঙ্গিমায়, অলস ছন্দে উত্তর শ্রীলংকার আকাশে উড়ে বেড়ায় ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান।

শহরবাসী অবাক হয়ে দেখে প্যাকেটে ভরা খাবার, ওষুধ ছড়ানো রয়েছে পথেঘাটে। তারা হৈহৈ করে ওঠে, রাস্তায় বেরিয়ে নাচে, এসে গেছে! এসে গেছে! মুক্তিদূতরা এসে গেছে।

পাখিও দু'হাত তুলে নাচে। বড় সাধু মুচকি হেসে আবার ধ্যানে বসেন।

কিছু পরে যখন ঐ বিমানবাহিনী ফিরে যায় ভারত মহাসাগর পেরিয়ে, তাদের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে আবার বিমানের শব্দ। এবার দক্ষিণ দিগন্তে, পরিচিত শব্দ, শ্রীলংকা বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার গানশিপ [হেলিকপ্টার মিসাইল/মেশিনগান লাগালে সেটা Gunship হয়ে যায়]। শহরবাসী আবার পালায় বাংকারের মধ্যে। হেলিকপ্টারগুলো শহরের ওপর এসে নির্বিচারে মেশিনগান চালায়, অবিশ্রান্ত।

তাদের গুলি শেষ হলে তবে তারা ফেরে। কিন্তু শহরের চারদিকে অবরোধকারী আর্মি শুরু করে গোলাবর্ষণ। তারই মধ্যে শহরবাসী ভূগর্ভস্থ বাংকার বা পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয়দের ড্রপ করা খাবার, ওষুধের প্যাকেট টেনে নিয়ে যেতে থাকে বাংকারের মধ্যে। শিক্ষানবিস সাধুদের সঙ্গে পাখিও হাত লাগায় এই কাজে। বড় সাধু বলেন, তুই যাস না। তোর অভ্যেস নেই—

আমি পারব। ঘর্মাক্ত মুখে জ্বলজ্বলে চোখে বলে পাখি। হাতের প্যাকেটটা রেখে ফের দৌড়ায়।

কিন্তু সেদিন দুপুরের একটু আগে এমন একটা খবর আসে যে আশ্রমের সব উৎসাহ-উদ্দীপনা মুহূর্তে নিভে যায়। অনাথাশ্রম থেকে খবর আসে, শ্রীলংকা আর্মির গোলাবর্ষণে অনাথাশ্রমের চারটে বাচ্চা মারা পড়েছে। আহত হয়েছে আরো এগারোজন।

আহতদের জাফনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আট

মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন এম এস ডাউন ১১৩২ ঝমাঝম শব্দ করে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে। অফিসার্স কামরায় নিজের বাংকে শুয়ে আমার চোখে ঘুম আসে না। সমস্ত বড় বড় ট্রেন এমনকি রাজধানী এক্সপ্রেসকে সাইডিংয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের স্পেশাল ট্রেনকে রাস্তা দেওয়া হচ্ছে। ট্রেন থেকেই সৈন্যরা অবাক চোখে দেখেছে লাইনের পাশে গোয়ালিয়র ফোর্ট, ঝাঁসির কেল্লা, সাঁচিস্তূপ। মধ্যপ্রদেশের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে মাঝে বিরাট লম্বা টানেলের অন্ধকারে কখনও ডুবে যায় ট্রেন। এখন ট্রেন তামিলনাড়ুতে, এরপরই মাদ্রাজ।

আমার চোখে ঘুম নেই, কারণ অজানার আশংকা। ঘুম আসে না, লান্স নায়েক ধীরেন গড়াই-এর কথা ভেবে। মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন থামে না, চলমান ট্রেনে মেসের সৈন্যরা খাবার দিয়ে যায়। ধোপা কাপড় কেচে টানটান ইস্ত্রি করে উর্দি। আর কর্নেল ঘন ঘন টেলিফোনে খবর নিতে থাকেন সামনে কি স্টেশান? থ্রু যাবে কিনা গাড়ি? এরই মধ্যে কোনো এক স্টেশানে গাড়ি থামতে হাবিলদার এনে হাজির করে ধীরেনকে।

দাড়ি কেটে ফেলে ওকে বেশ সভ্য ভদ্র লাগে। কিন্তু আমি মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বলি, সৈনিক। তুমি কি জানো, ফৌজে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, গুজব ছড়াবার শাস্তি কোর্টমার্শাল?

আমি গুজব ছড়াইনি সাব। সত্যি কথা

বলেছি। গেরিলারা মানুষের মাংস খেয়েছে।

তাই নাকি? আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বিদ্রূপের কণ্ঠে বলি, আর কি কি সত্যি কথা আছে তোমার স্টকে?

আছে সাব। ধীরেন অবিচলিত কণ্ঠে বলে, ওখানে মরণদ্বীপে প্রত্যেকটা কদম পা টিপে টিপে ফেলতে হয়। এমনকি সিগারেটের প্যাকেট বা ডাবের খোলাও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে আগুয়ান সৈন্যদের—

যথেষ্ট হয়েছে। আমি হাত তুলি, কোম্পানির সৈন্যদের এসব গালগল্প কেন শোনাচ্ছ?

গল্প নয় সাব। একগুঁয়ে স্বর ধীরেনের, ম্যাগাজিনে পড়েছি। ইন্ডিয়া টুডে। নিয়ে আসব সাব?

শোন ধীরেন। ও সত্যি বলছে বুঝতে পেরে আমি গলা নরম করি, তোমার ছুটি দরকার জানি। চেষ্টা করছি, অনুমতি পেলেই তোমাকে ছুটি দেব। কিন্তু তুমি এখন যুদ্ধযাত্রার পূর্বমুহূর্তে এসব কথা বলে সব সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিও না। আমাদের এখন শুধু একটাই স্বপ্ন দেখতে হবে, বিজয়লাভ—

ধীরেনকে বিদায় করে আমি নিজেও শুয়ে পড়ি। স্বপ্নহীন নিটোল একটা ঘুম চাই। কারণ হেডকোয়ার্টারের সূত্র উদ্ধৃত করে আজই কর্নেল ঘোষণা করেছেন, তামিল গেরিলারা আত্মসমর্পণ করবে না। তাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে জাফনা দখল করতে হবে আমাদের।

তামিল টাইগার্স একটি গেরিলা সংগঠন। মোট সংখ্যা কয়েকশত। খুব ভাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিন্তু তারা সৈন্যবাহিনী নয়। অস্ত্রশস্ত্র সবই ছোটমাপের। আর তোমরা?

বিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশ। শক্তির দিক দিয়ে পৃথিবীর তিন নম্বর। আধুনিকতম মারণাস্ত্র তোমাদের হাতে। আমরা নিশ্চিত তোমরা আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জাফনা শহর দখল করে নেবে। জাফনা কেল্লা থেকে গেরিলাদের বিতাড়িত করে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াতে পারবে। কয়েকদিনের মধ্যে বাকি সৈন্যবাহিনী এসে উত্তর শ্রীলংকার বাকি অংশ দখল করে নেবে। দ্যাটস অল। এনি কোশ্চেন?

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম আক্রমণকারী দলগুলির অধিনায়কদের ব্রিফিং দেন জেনারেল। জাফনা উপদ্বীপের মোট চারটে জায়গায় যুগপৎ আক্রমণ করা হবে। পয়েন্ট পেদ্রো, নাল্লুর, কাংকেসান্তরাই এবং জাফনা শহর। শেষ দলে নাইন শিখ।

জাফনা শহর দখলের প্ল্যান শুনি আমরা। জাফনা শহরের কেন্দ্রে হেলিড্রপ করে নামবে শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রি, অধিনায়ক মেজর কুরিয়েন। শহরের পশ্চিমে প্যারাসুটে নামবে ছত্রীসেনা। শহরের দক্ষিণ-পুবে আমরা, নাইন শিখ।

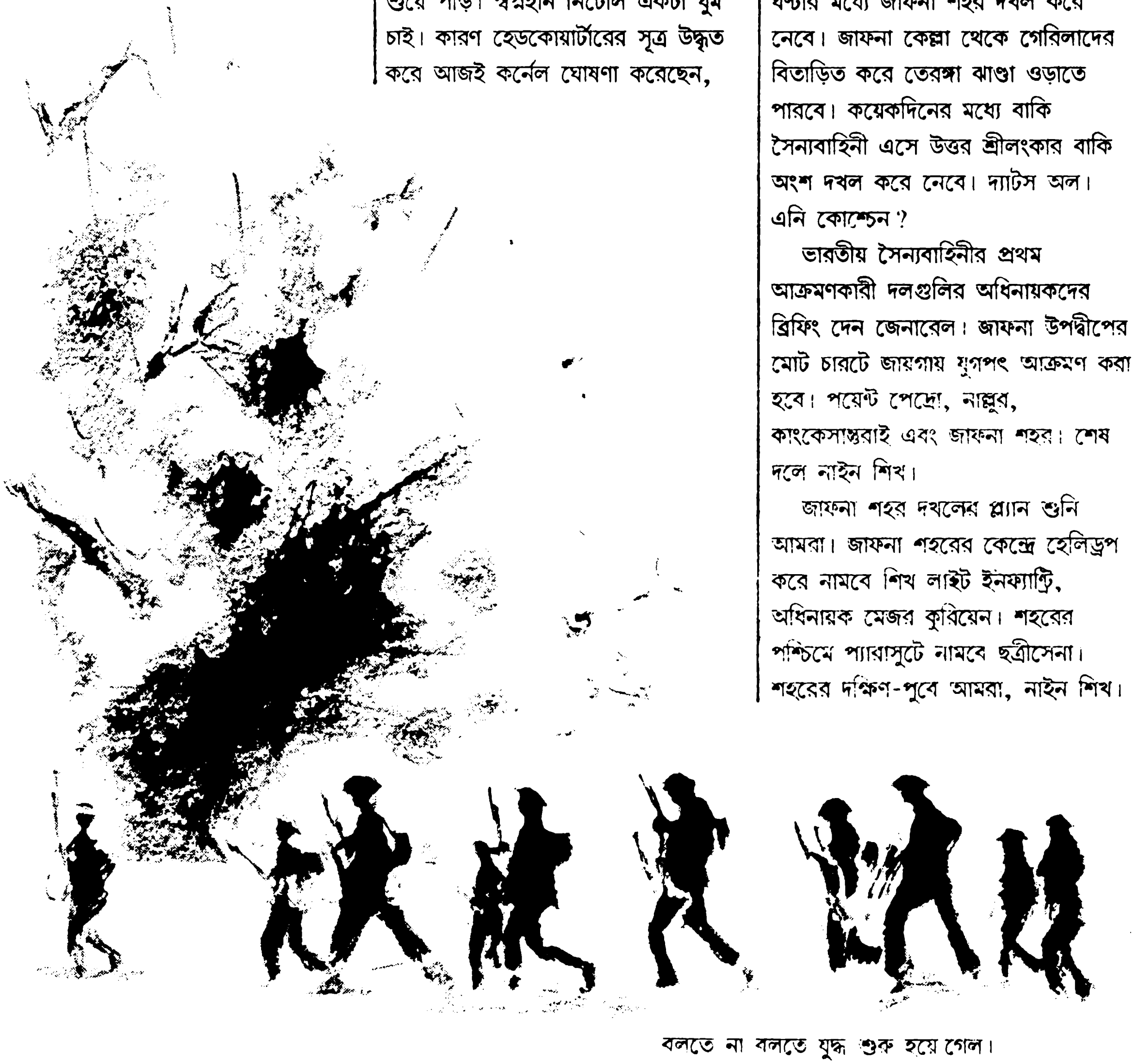

বলতে না বলতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

অন্যান্য তিনটি জোনের প্রত্যেকটিতেই এরকম ত্রিমুখী আক্রমণ চালানো হবে। একদল উগ্রপন্থী শত্রুর জন্য এত কিছু করাই বাহুল্য। তবুও যেহেতু টাইগার্সরা সৈনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাই কোনো সুযোগ না দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আক্রমণ চালাবে। যাতে অতিশীঘ্র বিজয়লাভ সুসম্পন্ন হয়।

পরদিন সকাল হবার অনেক আগে ভারতভূমি থেকে রওনা হলো তিনটে পরিবহন হেলিকপ্টার এবং একটি পরিবহন বিমান। বিমানটি ঠিক সূর্যোদয়ের আগে জাফনা শহরের পশ্চিমপ্রান্তে আকাশে অনেক উঁচুতে মেজর বিজয় ধানখাড়ের ছত্রীসেনাকে শূন্যে ফেলে দিল। আর দুটি হেলিকপ্টারে চড়ে আমরা নামলাম সমুদ্রের বুকে গোটা পাঁচেক মোটরবোটে। ঐ মোটরবোটগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমুদ্রতীরের বালুকাবেলায় এসে থামল।

শান্ত, নিস্তব্ধ সেই বালুকাবেলা। আমার পরের বোটটাতে সুখদেব সিং। মোটরবোট থেকে লাফিয়ে বালিতে নেমে হাসল ও, কি স্যর? ফ্যান্টাস্টিক জায়গা, শূটিং হয় বোধহয়, তাই না?

জানি না। আমি গোমড়া মুখে বলি, এখন এটা লড়াই-এর ময়দান, মনে রাখিস।

বলতে না বলতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

জাফনা শহরের যুদ্ধ শিখ সৈনিকের যুদ্ধ। কারণ তিনটের মধ্যে দুটো দলই শিখ।

মেজর কুরিয়েনের শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রির সৈন্য জাফনা কলেজ মাঠে নামল হেলিকপ্টার থেকে রোপড্রপ করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ গুলি উড়ে এল হেলিকপ্টারের দিকে। শিখ সৈন্য লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাঠে। কিন্তু মাটিতে পা দেবার আগেই তাদের কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হলো। একটা রকেট বুম করে বেরিয়ে গেল হেলিকপ্টারের পাশ দিয়ে, সামান্যর জন্য মিস। মুহূর্তে পাইলট হেলিকপ্টারকে অনেক ওপরে তুলে নিল।

সমস্ত কোম্পানি নামতে নামতে কুরিয়েন লক্ষ্য করল চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। একদিকে জাফনা কলেজ, অন্যদিকে মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিট্যুট। মাঠে কত বছর খেলা হয় না কে জানে, উঁচু জঙ্গলে ভর্তি। সৈন্যরা ঐ জঙ্গলে গিয়ে লুকোল। কুরিয়েন সেই জঙ্গল থেকে উঁকি মেরে দেখল জনা দশ-বারো সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে মাঠে। সে ঐ জঙ্গলে তার বাকি সৈন্যদের সংগঠিত করল। শত্রু এই জঙ্গলে তাদের খুঁজে খুঁজে মারতে পারবে না।

একটু পরেই মেজর কুরিয়েন পূর্ব এবং পশ্চিম দু'দিকেই ফায়ারিং-এর শব্দ পেল। তার মানে মেজর ধানখাড়ের ছত্রীসেনা এবং ক্যাপ্টেন বক্সির নাইন শিখ দু'দলই শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে।

সে রেডিও খুলল। বাকি দুই দল এবং হেডকোয়ার্টার সকলেরই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সমান। জাফনা শহর দখল করবার জন্য তার দল এবং বাকি দুই দলের লিংক আপ একান্ত দরকার। সে হচ্ছে মধ্যের ব্যক্তি, দু'দিকে দুই হাত অর্থাৎ দুই প্লাটুনকে পাঠাবে। অন্য দুটি দল হচ্ছে দু'পাশের ব্যক্তি, তারা যথাক্রমে ডান এবং বাম হাত দিয়ে তার বাম এবং ডান হাত ধরবে। তিনটি সৈন্যদল পরস্পরকে ছুঁতে পারলেই যুদ্ধজয় অর্ধেক সমাপ্ত, কারণ তখন আরো বেশি সৈন্যদল গড়গড়িয়ে ঢুকে পড়বে জাফনা শহরের মধ্যে।

শান্তিসেনা হেডকোয়ার্টারে বসে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ জেনারেল মাথা নাড়লেন। বড় শক্ত কাজ।

বালুকাবেলা শেষ হয়ে যেখানে নারকেল এবং আমবাগান শুরু, সেখানেই আমরা আটকে পড়লাম।

অনেকটা দূরে বাগান পেরিয়ে বাড়িঘর শুরু। ঐ বাড়িগুলি সবই এককেটা সুরক্ষিত বাংকারের মতো দেখায় এখান থেকে। কিন্তু তার আগে এই নারকেল-বাগান।

আমি চার নম্বর প্লাটুনকে অর্ডার দিলাম, ডানদিক দিয়ে গিয়ে চার্জ করতে। কিন্তু দল একটু এগোতেই দুজন সৈন্য গুলিবিদ্ধ হলো। বাকিরা বাধ্য হয়ে আড়াল নিল। লেফটেনান্ট সুখদেব রেডিওতে চেঁচাল, স্যর। এই উইং দিয়ে আক্রমণ করা যাবে না। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে।

কোত্থেকে আসছে? আমি চেঁচালাম। যতদূর দেখা যাচ্ছে ওদিকটায় পরিষ্কার নারকেলবাগান, ঝোপ বা তেমন কোনো আড়াল নেই, যেখানে শত্রু লুকোতে পারে।

সাব। আশ্চর্য ব্যাপার। হাবিলদার সতনাম ফিসফিস করল, মনে হচ্ছে কেউ শূন্য থেকে গুলি ছুঁড়ছে।

শূন্য থেকে? আমার মাথায় বিদ্যুৎচমক খেলল যেন। আমি হাসলাম, ঠিক বলেছ। ঐ দেখ, শূন্য থেকেই গুলি আসছে।

হাবিলদারের হাত থেকে দূরবীনটা নিলাম। চোখে লাগাতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, নারকেল গাছের প্রায় মাথার কাছে একটা ফুটো, কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। সেখান দিয়ে রাইফেলের নল বেরিয়ে আছে। হাবিলদারও দেখল দূরবীন দিয়ে। ও বলল, সাব। তার মানে, সামনে থেকে গিয়ে কেউ ওকে মারতে পারবে না।

আমিও একই কথা ভাবছিলাম। মাথা নাড়লাম। সতনাম বলল, সাব। রকেট লঞ্চার?

রকেট লঞ্চার? সে তো ট্যাংক কিংবা দুর্ভেদ্য বাংকার ধ্বংস করতে কাজে লাগে। আমি চুপ করে রইলাম।

মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে হাবিলদার ইশারা করল অন্য দুজন সৈন্যকে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে প্রচণ্ড শব্দে কার্ল গুস্তাভ রকেট ছুটে গেল নারকেল গাছের দিকে। পরবর্তী মুহূর্তে কাণ্ডের জ্বলন্ত অর্ধাংশ ছাড়া নারকেল গাছ কিংবা মানুষটির কোনো চিহ্ন রইল না।

দেখা? সতনাম মহানন্দে চেঁচাল,

আভি ভাগেগা গেরিলালোগ।

ওহে। সুখদেব রেডিওতে ডাকল, তোমার কাছে কটা রকেট আছে?

আরো পাঁচটা।

ঠিক। আমার ছটা, মোট এগারোটা। কিন্তু সামনের নারকেলবাগানে কয়েকশো নারকেল গাছ। আর আমি দূরবীনে দেখছি প্রত্যেক চারটে গাছ পরপর একটি করে বন্দুকের নল। তবে?

সতনামের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অংকে নেহাত কাঁচা হলেও আমার ওয়েপন হাবিলদারের মাথায় এটা ঢুকেছে রকেট দিয়ে সব শত্রু বিনাশ অসম্ভব। ইতিমধ্যে আমার ইশারায় একজন সৈন্য আড়াল থেকে একটু বেরোতেই একঝাঁক গুলি ছুটে এল তার দিকে। সৈন্যটি স্প্রিং-এর মতোই লাফিয়ে আবার নারকেল গাছের পেছনে আড়াল নিল।

ইতিমধ্যে বাঁদিকে তিন নম্বর প্লাটুন আমবাগানের মধ্যে দিয়ে এগোতেই একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ হলো। একটা আমগাছ বোমার মতো ফেটে গেল, গাছের কাণ্ডে ফোঁপরা করে বিস্ফোরক ঠাসা ছিল। ঐ বিস্ফোরণে জনা দশেক সৈন্য মারা পড়ল, নয় আহত হলো। বাধ্য হয়ে আমি অর্ডার দিলাম, পিছিয়ে আসতে। রেডিওতে হেডকোয়ার্টারকে বললাম, সমস্যার কথা। এই শত্রুর বিরুদ্ধে এগোন যাচ্ছে না।

ক্রমশ দুপুর থেকে বিকেল হলো। শহরের অন্য প্রান্তে মেজর ধানখড়ের ছত্রীসেনারও একই অবস্থা। তারাও মাটিতে মাথা লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। তার চারদিকে মাটিতে 'জনি মাইন' পোঁতা। এক পা রাখলেই সামনের মাটি বোমার মতো ফেটে যাচ্ছে, সৈন্যের পা উড়ে যাচ্ছে। মারবার বদলে জখম করবার এ এক নতুন গেরিলা কৌশল, আহত সৈন্যকে শুশ্রূষার জন্য কিছু সৈন্য ব্যস্ত হবে। আহত সৈন্যকে যে তুলতে যাচ্ছে, পাশেই পোঁতা জনি মাইনে সেও আহত হচ্ছে।

হেডকোয়ার্টার থেকে জেনারেল বেতারে গর্জন করলেন, এগোও। এগোও তোমরা। লিংক আপ না করতে পারলে মাঝের সৈন্যদল, মেজর কুরিয়েনের শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বাধ্য হয়ে এগোতে চেষ্টা করলাম আমরা। কিন্তু নাঃ, অসম্ভব। এই যুদ্ধক্ষেত্রে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দিতে রাজী নয় শত্রু। বহু সৈনিক হতাহত হলো, আমরা আবার পেছু হটলাম। মেজর ধানখড়ের গলা শুনলাম রেডিওতে, আরো সৈন্য পাঠান। রিইনফোর্সমেন্ট।

অসম্ভব। জেনারেল গর্জন করলেন, শত্রু মিসাইল ছুঁড়ছে বিমানের দিকে। কাল সকালের আগে রিইনফোর্সমেন্ট পৌঁছবে না। তোমরা এগোও। শিখ লাইট-এর সৈন্যদের কথা স্মরণ করে এগোও।

আমরা এগোতে চেষ্টা করলাম। সেই মুহূর্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করেও প্রত্যেক সৈন্য এগোতে রাজী ছিল। কিন্তু সমরবিজ্ঞানের সূত্র এবং হিসেবমতোই আমরা কুরিয়েনের কাছে পৌঁছতে পারলাম না। সূর্য ডুবছে, তখন কুরিয়েন জানল, তার সৈন্যদের গুলিবারুদ শেষ হয়ে গেছে। সে সিদ্ধান্ত নিল। তার ষোলজন সৈন্য জীবন্ত আছে। শত্রু তাদের ঘিরে ফেলে কাছে আসছে। সে রেডিও খুলল। হেডকোয়ার্টারকে বলল, আকাশ। টাইগার টু বলছি। আমরা শত্রুর দিকে বেয়নেট চার্জ করছি। এক এবং তিন নম্বর দলকে জানাবেন, মাঝের দুই নম্বর দল আর নেই। মাতৃভূমি জিন্দাবাদ। আউট। সে রেডিওতে দুটো গুলি করে রেডিওটা ধ্বংস করে দিল।

মেজর কুরিয়েন এবং তার ষোলজন সৈন্য উঠে দাঁড়াল। তাদের সকলের চোয়াল শক্ত। কুরিয়েন বলল, কে শোনাবে গুরু গোবিন্দ সিংহের বাণী?

এক নায়েক বলল, শুভ কর্মপথে যেন ভয় নাহি পাই। মরণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মহারণে হয়।

বেয়নেট রাইফেলের ডগায় চড়িয়ে নিয়ে তারা চার্জ করতে দৌড়ল শত্রুর দিকে।

জো বোলে সো নিহাল, সৎ শ্রী অকাল—শব্দে তেড়ে আসা ঐ ষোলটি মূর্তি ডুবন্ত সূর্যের আলোয় অপার্থিব লাগছিল। গেরিলাদের কয়েকটি ছেলে ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে দৌড় লাগাল। কুরিয়েন এবং তার সাথীরা বেয়নেটে গেঁথে হত্যা করল একদম কাছের গোটা দশেক শত্রুকে। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য টাইগাররা অ্যাসল্ট রাইফেলের দুরন্ত গুলিবর্ষণ করে তাদের মাটিতে উপড়ে ফেলল।

সেই রক্তাক্ত মাটিতে জাফনা কলেজের মাঠে সূর্য ডুবে গেল।

নয়

পাখিকে আমরা যখন বন্দী করি, তখন সে অজ্ঞান। এবং বিশ্রীভাবে আহত।

শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রির করুণ পরিণতির কথা আমরা জানতে পারি সন্ধ্যের সময়। তারপর আসে সেই ভয়ংকর কালো রাত। আমার মনে হয়, ওরকম দুঃস্বপ্নের রাত বোধহয় জীবনে কারো দু'বার না আসে। চারদিক থেকে খবর আসছে, গেরিলাসেনার হাতে আমাদের সৈন্যদের কচুকাটা হবার কথা।

উত্তর শ্রীলংকার যুদ্ধে সেদিন খুবই খারাপ অবস্থায় আমরা। সুখদেব সিং-এর সৈন্যরা মর্টারে ইলুমিনেটিং রাউন্ড ফায়ার করে আকাশ আলো করে দেয় এবং প্রতি আক্রমণ তার। সুখদেব চেঁচায়, স্যার। গেরিলাগুলো শ্বাপদ পশুর মতো, ওরা রাতেও দেখতে পায়। সুতরাং, আমরা লড়ে মরতে চাই।

আমি চুপ করে থাকি। প্রথম কথা, আমার কাছে মর্টার নেই। দ্বিতীয় কথা আমার সৈন্যদের, হেডকোয়ার্টার প্লাটুনের অর্ধেকই বেকার সৈন্য, মাস্টার, মিস্ত্রী। আমাদের ধীরেন গড়াইও আছে। সতনাম তেতো গলায় বলে, সাব। সুখদেব সাব এগোতে পারেন। আমরা কি করব, এসব রদ্দি ফৌজ নিয়ে? তাই ওদের পেছনে সেকেন্ড লাইনেই থাকতে হবে।

শিখ সৈন্যের কাছে সেকেন্ড লাইনে থাকা চরম অসম্মানের। ওরা চায় ভ্যান

গার্ড, পুরোবর্তী ভূমিকায় থাকতে।

আমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকি আমার সৈন্যদলের সঙ্গে। শত্রু অন্ধকারে দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। গুলি, বোমা, রকেটের সঙ্গে কাতর আর্তনাদের শব্দে খানখান হতে থাকে শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চল। মরণদ্বীপের এই মহারণে আমার মনে হতে থাকে যে, জীবনের চরম অসম্মানের দিন আসন্ন। অধিনায়কের পক্ষে সেটা হচ্ছে তার অধীন সৈন্যদলের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

কিন্তু তবু একসময় অন্ধকার ফরসা হয়ে আসে। এবং আমাদের আশ্বস্ত করে কর্নেল বেতারে গর্জন করেন, এগোও। চীয়ার আপ বয়েজ, আমি এসে পড়েছি তোমাদের সঙ্গে। শিখ লাইট সৈন্যদলের দিব্যি—কাম অন বয়েজ। সব বাধা ভেঙেচুরে দিয়ে এগোও—পশ্চিমের সৈন্যদলের সঙ্গে লিংক আপ করতে হবে।

কর্নেল মনজিৎ সিংহ চাওলা একজন অসাধারণ সমরাধিনায়ক। তিনি নিজে যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। রাতের অন্ধকারে ভারতীয় বায়ুসেনা আরো অনেক সৈন্যদলকে নিয়ে এসেছে দ্বীপভূমিতে। এবার আমরা উৎসাহিত হয়ে তেড়েফুঁড়ে এগোই। কিন্তু না। শত্রু আমাদের সামনে, এবং দু'দিকে। ফলে হয় আমাদের সম্মুখ সমরে এগোতে হবে, নইলে কর্নেল এসে পৌঁছনোর আগেই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

আমরা এখন সমুদ্রতীর থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার ভেতরে। বাধ্য হয়ে আমরা স্থির করি, অসম্মানের চেয়ে মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। সুতরাং শেষ চেষ্টা করব।

আমরা কাঁকড়া-ত্রিশূল আক্রমণ করব। আমি রেডিওতে বলি। সুখদেব, সুবেদার, হাবিলদাররা চুপ করে শোনে। ওরা আমার মানসিক অবস্থা বোঝে। সুখদেব মৃদু স্বরে বলে, যা আপনার ইচ্ছে!

সাথী। আমি পাগলের মতো চেঁচাই, শিখ লাইট সৈন্যরা নেই। কিন্তু আমরা আছি। শত্রুকে বুঝিয়ে দিতে হবে বান্দা বাহাদুরের দল আমরা।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি/আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—তারি লাগি তাড়াতাড়ি—হঠাৎ বাংলা কবিতা শুনে দেখি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লান্স নায়েক ধীরেন গড়াই। সে জ্বলজ্বলে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, সাব। আমি যাব ত্রিশূলের ভ্যানগার্ডে!

তুমি! আমি আকাশ থেকে পড়ি, তোমার কোনো ধারণা আছে? ব্যাপারটা সম্পর্কে?

জানি সাব। ধীরেন অটলস্বরে বলে, বন্দীবীরও পড়েছি। মিলিটারি ট্যাকটিকসও। যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে কিছু কিছু পড়েছি সাব। শিখ রেজিমেন্টে আছি তো—

বুঝলাম। কিন্তু তুমি যেতে পারো না। শিখসৈন্য যাবে, ওরা যোদ্ধৃজাতি। লড়াই ওদের রক্তে।

না সাব। ধীরেন একগুঁয়ে, ভ্যানগার্ডে যেতে ইচ্ছুক সৈনিককে আটকাবার কথা নয়।

চুপ কর। আমি খেঁকিয়ে উঠি, আমার কি করা উচিত, সেটা তুমি বলে দেবে নাকি?

ধীরেন এবার বিমর্ষমুখে সরে যায়। ইতিমধ্যে যুদ্ধ আরো ঘনঘোর হয়ে ওঠে। শত্রু তিনদিক থেকে প্রবল আক্রমণ শুরু করে। কর্নেল চেঁচান, কাম অন বয়েজ! ফাট্টে চাক দো। তোমরা শিখ সৈন্য, শত্রুকে উঠিয়ে সমুদ্রে ফেলে দাও। কিল দেম, শুট টু কিল!

শিখসৈন্য মেঘগর্জনের মতো চিৎকার করে, ওয়াহে গুরু! ওয়াহে গুরু!!

কর্নেল চেঁচান, তোমরা গুরু গোবিন্দ সিংহজীর খালসা সেনা। খালসা কখনও হারতে জানে না।

শিখসৈন্য সোল্লাসে চেঁচায়, ওয়াহে গুরু! ওয়াহে গুরু!

দ্বীপরাষ্ট্রে পা দেবার পর এই প্রথম শিখসৈন্য সোল্লাসে এগোয় সামনে, প্রবল বিক্রমে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। প্রতি সৈনিকই গুরু গোবিন্দের খালসা সেনার মতো লাখসৈনিকের বিক্রম দেখিয়ে এগোয়। তারই মাঝে আবার আমার কাছে আসে ধীরেন, সাব। শিখ লাইট সৈন্যের মধ্যে আমার 'সাথী' [বাডি] সমশের সিংহের ভাই ছিল। সমশের যাচ্ছে ভ্যানগার্ডে, আমি যাবো না?

আমি আর ওকে বাধা দিতে পারি না। যদিও পদাতিক সেনার যুদ্ধে ভ্যানগার্ড এবং রেয়ারগার্ড অর্থাৎ পুরোধাবর্তী এবং পশ্চাদরক্ষী সেনাদের বাঁচবার সম্ভাবনা এক শতাংশও থাকে না বললেই হয়। কিন্তু মরণদ্বীপের সেই অবিশ্বাস্য মহারণে ধীরেন গড়াইও ইতিহাস গড়তে চায়।

সেদিন বেলা সাড়ে তিনটের সময় আমরা জাফনা শহরে প্রবেশ করি। শহরের প্রতিটি গৃহ যেন একেকটি সুরক্ষিত বাংকার, প্রত্যেক রাস্তা একেকটি মৃত্যুপথ। তবু ফায়ার—রান—টেক কভার—ফায়ার পদ্ধতিতে এবং সঠিক গেরিলাযুদ্ধের রণনীতি অবলম্বন করে আমরা এগোই।

আমরা পশ্চিমপ্রান্তের সেনাদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি। পৌনে পাঁচটা নাগাদ শহরের মধ্যে এক জায়গায় আমরা আটকে পড়ি। আমার সঙ্গে জনা পাঁচেক সৈন্য তখন, আর আমার পেটে গুলি ঢুকেছে। কিন্তু ততক্ষণে কর্নেল এসে পড়েন, ওঁর দলের সঙ্গে ডাক্তার!

কর্নেল আমাকে জড়িয়ে ধরবার মুহূর্তে আমি জ্ঞান হারাই।

গেরিলা নেতা পাখি যখন ধরা পড়ে, তখন সে আহত এবং অজ্ঞান। তার জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে, পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে সে আমার পাশের বেডে ছিল। কর্নেলের দলের হাতে সে ধরা পড়ে।

আমার জ্ঞান ফেরে আগে। আমি আর্দালিকে জিজ্ঞেস করি, ছেলেটা কে? আর্দালি বলে, ঐ বদমাশ গেরিলাদের একটা নেতা। এদের বাঁচিয়ে তোলার কি দরকার, বলুন সাব? আমাদের এত এত সাথী মারা গেল।

ওরকম বোল না সৈনিক! আমি হাসি, তুমি না সৈন্য? জেনেভা কনভেনশন জানো না?

ক্রমশ আমি সব খবর পাই। কর্নেলের দল সেদিনও সারারাত লড়াই-এর পর পরদিন সকালে পশ্চিমের দলের সঙ্গে লিংক আপ করেন। তবে এই যুদ্ধে আমাদের কোম্পানির প্রচুর সংখ্যক সৈন্য শহীদ হয়েছে, জখম হয়েছে চল্লিশ জন।

মাই গড! আমি আঁতকে উঠি, তার মানে নাইন শিখ রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানির বাকি কিছু রইল না!

কি বলছেন ক্যাপ্টেন! গলার স্বরে চমকে দেখি সামনে এক ডাক্তার, কর্নেলের উর্দি। তিনি আমার কাঁধে চাপড় মারেন, ব্রাভো কোম্পানিরই তো জয়জয়কার। শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রির করুণ পরিণতির বদলা তো আপনারাই নিলেন। ব্রাভো কোম্পানির নাম লেখা রইল সোনার আখরে—

বলতে বলতে ডাক্তার আবেগ সংবরণ করতে পারেন না, ওঁর চোখে জল আসে। আমি ওঁর হাত চেপে ধরি কৃতজ্ঞতায়। উনি বলেন, আপনার অপারেশন আমিই করেছি। আমি কর্নেল ব্যানার্জী—

স্যার। আমি বাংলায় বলে উঠি, আমার বাড়িতে খবর দিয়েছেন?

সেকি? আপনি বাঙালী? আমি তো বক্সি দেখে ভাবলাম পাঞ্জাবী! হ্যাঁ, কলকাতায় ফোন করা হয়েছে, কিন্তু এখন আপনাকে ঘুমোতে হবে। একটা ইঞ্জেকশন দেবো?

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বেশ ঝরঝরে লাগে। পাশের বাচ্চা গেরিলা ছেলেটার সঙ্গেও আলাপ হয়। নেহাতই ছেলেমানুষ। এটা-সেটা গল্পও হয়। ছেলেটা বেশ, গেরিলাদের প্রচারদলের নেতা। ঠিক যোদ্ধা নয়!

হয়তো সেটাও হতাম না। শ্রীলংকা আর্মি অনাথাশ্রমের ওপর গোলাবর্ষণ করল, সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম গেরিলা হবার। নইলে আমি অ্যাদ্দিনে ইন্ডিয়ায় চলে যেতাম—আচ্ছা সাব! আমাকে নিয়ে এখন আপনারা কি করবেন?

কি জানি? আমি হাসি, হয়তো

পাখি যখন ধরা পড়ে যায়। ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে। কোনো সরকারী হোমে-টোমে। থাকবে, পড়াশুনো করবে।

সত্যি? পাখির চোখ চকচক করে ওঠে আনন্দে। আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার নাম পাখি কেন? এরকম অদ্ভুত নাম? ভাল নাম কি?

গণপতি। গণপতি পিল্লাই। আচ্ছা সাব, আপনি কখনও তামিলনাড়ু গেছেন?

আমি ওর সব প্রশ্নের জবাব দিই। বাচ্চা ছেলে, ওর কৌতূহলও অসীম। কিন্তু আমার কৌতূহল মেটানোর কেউ নেই। আমি বারবার ডাক্তার, আর্দালিদের বলি, আমি জানতে চাই, আমার কোম্পানির কে কে মারা গেছে। কারাই বা বেঁচে আছে।

ওরা উত্তর দেয় না। আর্দালি বলে, সাব। সব ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না।

একটু পরে একজন আর্দালি একটা ফোন নিয়ে আসে। কর্ডলেস। কলকাতা থেকে কল। বাবা এবং মায়ের সঙ্গে কথা বলি। ওঁদের বলি, চিন্তার কিছু নেই। আমি ভাল আছি। শীঘ্রই বাড়ি যাব, ছুটি পেলে।

মায়ের কান্নার শব্দ পাই ফোনে। আমি বলি, আঃ মা! কাঁদছ কেন?

পনেরো দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পাই। ফ্লাইটে ফিরি মাদ্রাজ এবং সেখান থেকে কলকাতা। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার আগে কোম্পানির সব খবর জানতে পারি। বাড়ি যাবার আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। আমার ব্রাভো কোম্পানি সত্যিই আর নেই। ছত্রিশ জন সৈন্য মারা গেছে, সতনাম এবং হ্যাঁ, ধীরেন গড়াই-এর নামও আছে সেই লিস্টে।

আরো সাত মাস পরে রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে হয় পুরস্কার নিতে। বীরচক্র। আমার ঠিক আগে পুরস্কার নেন এক বৃদ্ধ। লান্স নায়েক ধীরেন গড়াই-এর বাবা।

নাইন শিখ রেজিমেন্টের যুদ্ধ ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পরপর দুজন বাঙালী যোদ্ধা। তাদের মধ্যে একজন, যাকে রেজিমেন্টের লোকেরা ভীরু, কাপুরুষ, পলায়নবাদী আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রকৃত বীরের মতো, জাতি এবং রেজিমেন্টের সম্মানরক্ষার্থে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তুচ্ছ করে, নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র মায়া না করে সে চূড়ান্ত আত্মোৎসর্গের নজির স্থাপন করেছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে আমার বাবা আলাপ করেন ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ তখন জলন্ধর রেডিওতে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। সারা উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে রোজ সন্ধ্যায় প্রচারিত হয় এই অনুষ্ঠান—বীর পিতা সে মিলো! বাবা বলেন, সারা দেশ আপনার ছেলের জন্য গর্বিত। আমি হচ্ছি ক্যাপ্টেন বক্সির বাবা।

বৃদ্ধের চোখে জল। উনি আমার মাথায়-মুখে হাত বোলান। বলেন, বেঁচে থাকো, বাবা। আমার ছেলে কিন্তু চিঠিতে লিখত তোমার কথা। বলত, জানো বাবা, আমাদের অধিনায়কও বাঙালী। খুব সাহসী অফিসার।

দ্যাখো তো বাবা। কিরকম দেশ হয়ে গেল?

ছবি: অমিত চক্রবর্তী

স্নোয়ি

সুভাষ ধর

সন্ধ্যেটা কখনোই আমার মনে আনন্দের ছাপ এনে দেয় না। সূর্যাস্তের পর আস্তে আস্তে অন্ধকার যখন পাতলা চাদর বিছিয়ে ধরে, মনটা এমনিতেই বিষণ্ণ হয়ে আসে। সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল স্বতন্ত্র, আলাদা।

মুখার্জী এসে ঢুকলো আমার কেবিনে। বললো—"দাদা, আমি জানি আপনার মনের ভেতরে কি চলছে। আপনি তো কষ্ট মনেই চেপে রাখেন, কাউকে খুলে বলবেন না। এজন্যে নিজেই এলাম আপনার কাছে। একটা ছোট্ট কাহিনী শোনাবো আপনাকে।

জানেন তো, আমি গাঁয়ের ছেলে। বাড়িভর্তি অনেকগুলো ভাইবোন। মা সারাক্ষণ হাজারো কাজে নাজেহাল থাকেন। এর মধ্যে আমাদের মতো কটা ক্ষুদে বাঁদরের আবার নানান উৎপাত। একটা বদখেয়াল হলো গাঁয়ের এখান-ওখানে বাচ্চা কুকুর দেখলেই চুপটি করে বাড়ি নিয়ে এসে সবার নজর বাঁচিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে লুকিয়ে রাখা। তারপর ভাইবোনরা পালা করে মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে দুধ, ভাত যা জোটে বাচ্চাটাকে খাওয়াবার প্রাণপণ প্রয়াস। বাচ্চাগুলো বেশির ভাগই রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো নেড়ি কুকুরের বংশধর। যতোই লুকিয়ে রাখি, রাত গভীর হলেই বাচ্চাদের কুঁই কুঁই কান্না বেরিয়ে পড়ে। সেই পরিত্রাহী কান্নায় সবার ঘুমের বারোটা বাজবেই। মা খানিকটা গালমন্দ দিয়ে শেষে নিজেই কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতেন। বাবার কোলকাতায় চাকরি। বাবা বাড়ি থাকলে অতো সহজে নিষ্কৃতি

পেতাম না। পরদিন প্রায় সবকটা ভাইবোনের কানের পরিধি সিকি ইঞ্চি বেড়ে যেতো। এই সব বাচ্চা আবার বেশিদিন এক আশ্রয়ে থাকা পছন্দ করতো না। একটু গায়েগতরে বাড়লেই হঠাৎ উধাও হয়ে যেতো।

একটা লালরঙের বাচ্চা কেমন করে টিকে গেল। শুধু টিকলোই না, প্রবলভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলো। কদিনেই সে সবার নয়নের মণি। আমার মা নাম দিলেন লালু, কখনো ডাকেন লালুসোনা বলে। বাবা সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসেন। এসেই হাঁক পাড়েন—'আমার লালী কই!'

লালু লেজ নাড়তে নাড়তে বাবার কাছে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে আদর নেবে। একটু বড় হতেই লালু বেশ দশাসই হয়ে পড়লো। আমরা সবাই মিলে যখন-তখন খাওয়াবার ঘটাও কম করতাম না। লালুও প্রায় সর্বভুক—দুধ, মাছ, মাংস, মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় যা দাও তাই মনের সুখে খাবে, নয়তো চিবিয়ে যাবে! এছাড়া ডাঁশা পেয়ারা থেকে ক্ষীরের বরফি কোনো কিছুতে লালুর অরুচি নেই।

আমাদের বাড়িটার বিস্তার অনেকখানি। প্রায় দশ কাঠা জমি নিয়ে বাড়ি। ভেতরে পুকুর, বাগান সবই রয়েছে। বাড়ির চৌহদ্দির ভেতর লালুর সিংহবিক্রম। একটা চড়ুই পাখি নড়লেও লালু তেড়ে যাবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালুর গলার আওয়াজও বেশ গম্ভীর, ভীতিকর হয়ে উঠলো। পাড়ার লোক পর্যন্ত সন্তর্পণে বাড়ির সামনের পথ দিয়ে চলে। বাড়ি ঢুকতে হলে তো কথাই নেই, সদর দরজার কড়া নেড়েই দশ হাত পিছিয়ে থাকে সবাই, কারণ লালু তিনলাফে সদরে পৌঁছে বিকট গর্জন শুরু করবে, সেসব ক্ষেত্রে বাড়ির যে কেউ লালুকে সামলে রাখার দায়িত্ব নিতো। এমনকি আমার তিন বছরের ছোট বোন ফুটকি পর্যন্ত অনায়াসে লালুর কান ধরে টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে এনে শাসন করে—'এই লালু, খবদ্দার, দুষ্টুমি আর নয়, মার খাবি কিন্তু!'

বাবার কাছে অনেকে অনুযোগ করেন—'মুখুজ্জেমশাই, কুকুরটাকে বেঁধে রাখলেই পারেন!'

বাবা লালুর ব্যাপারে প্রচুর প্রশ্রয় দেন—'না না, লালুকে বেঁধে রাখবো কি! ও তো খালি গর্জায়, কাউকে কোনোদিন কামড়ায় না তো! বেঁধে রাখলে লালু মনে বড় ব্যথা পাবে যে!'

মা সব শুনেটুনে বলেন—'তোদের বাবার যতো আদিখ্যেতা।'

আবার মাও কোনোদিন লালুকে বাঁধাবাঁধির ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো চাপাচাপি করেন না।

লালুর আমাদের সব ব্যাপারেই সমান উৎসাহ। ফুটবল খেলতে গেলে ফুটবলে পা লাগাবো কি, সবার আগে লালু ছুটে গিয়ে ফুটবলে কামড় লাগাবে; মাছ ধরতে গেছি পুকুরে, তো বঁড়শি উলটে হাঁক পেড়ে পুকুরের মাছ ছিপের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না।

একবার আমাদের গাঁয়ে ডাকাত পড়লো। প্রায় পালা করে ছ'খানা বাড়িতে পর পর ডাকাতরা দাপিয়ে বেড়ালো, কিন্তু আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির কাছ বরাবর এসে সবাই হাওয়া। লালুর ভীমগর্জন দূর দূর গ্রাম থেকেও নাকি শোনা গিয়েছিল! পরদিন থানার দারোগা নিমাই নন্দী বাবার সঙ্গে দেখা করে বললেন—'মুখুজ্জে-মশাই, আপনার লালুকে পুলিশ মেডেল দেওয়া উচিত। নয়নপুরের মদনার ডাকাতির হিস্ট্রি রয়েছে। সাত সকালে মদনার বাড়িতে গিয়ে দেখি ব্যাটা পায়ে চুন-হলুদ লাগিয়ে শুয়ে আছে, একটা পা গোড়ালির কাছে ফুলে ঢোল! দুটো কোঁৎকা খেতেই কবুল করলো—সার, মুখুজ্জেরা বাড়িতে বাঘ পুষে রেখেছে! কি সাধ্যি, সে বাড়িতে কদম রাখি! কাছাকাছি এসেছি তো বিকট গর্জন শুনে বুক ধড়াস করে উঠেছে। পালাতে গিয়ে গোড়ালি মচকে বসেছি। মদনাকে ধরেছি, আজকালের মধ্যে বাকি সব কটাকে ধরে ফেলবো আশা করছি। সব কটা ডাকাতকে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দশ বছর ঘানি টানাতে না পারলে আমার নাম নিমাই দারোগাই নয়!'

লালুর অবশ্য একটা গোপন রহস্য আছে। সেটা পারতপক্ষে কেউ জানে না। সেটা হলো, বাড়ির সদর দরজার বাইরে পা রাখা মানেই লালুর পরাক্রমের ইতি! নিমেষে লালুর গগনস্পর্শী পুচ্ছ দুই পায়ের মাঝে গুটিয়ে আসে! যাক, সে রহস্য আমাদের কাছেই গোপন থাক।

বেশ সাত-আট বছরের ব্যবধান। আমরা কোলকাতায় থেকে পড়াশুনো করি। কখনো সপ্তাহান্তে বাড়ি আসি, কখনো এক মাস পরে। লালুর বয়স বাড়ছে দেখতে পাই। আগের মতো চলাফেরায় তেজ নেই, চোখে তেমন দেখতে পায় না। প্রায় সারাক্ষণ রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে শুয়ে থাকে। খালি গলার জোর প্রায় তেমনি রয়েছে।

সেবারে বাড়ি এসে দেখি লালু বেশ অসুস্থ। সারা শরীরে এক ধরনের চাকা চাকা ঘা দেখা দিয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেক, লালুকে আর লালই দেখায় না! আমার ছোট ভাই কোন ডাক্তারের কাছ থেকে ক্যালামিন জাতীয় একটা মলম আনিয়ে সারা গায়ে লাগিয়ে দেয় দিনে দু'বার-তিনবার। লালু চোখ বুজে সেবাটি নেয়। কিন্তু উপকার কিছুই নজরে আসে না। তাছাড়া গ্রামেগঞ্জে মানুষের ডাক্তারই মেলে না তো লালুর ডাক্তার জুটাই কোথায়!

সেদিন সকালে লালু রান্নাঘরের দাওয়ার পাশ থেকে নেমে এসে সদর দরজার সামনে তার বিশাল শরীর নিয়ে শুয়ে রইলো। মা কাছে এসে চোখের জল ফেলে বললেন—'হাঁরে লালু, তোর কি যাবার সময় হয়ে এসেছে! তোর গা থেকে একটা গন্ধ ছুটছে, ঐ অতো বড়ো শরীর সদর থেকে নড়ানোও এরপর অনেক কষ্টের ব্যাপার হবে!'

লালু চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকালো। এমন করুণ ভাষাময় চোখ আর কখনো দেখিনি! লালুকে কোনোদিন স্বইচ্ছায় আমাদের দেউড়ি পার হতে দেখিনি। সেদিন তার অশক্ত শরীরটাকে কোন প্রবল ইচ্ছায় বশীভূত করে সদর দরজা পার হয়ে পথে নামিয়ে নিয়ে এলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই লালুর বিশাল শরীরটা নিথর হয়ে গেল! যে পথ বেয়ে লালু আমাদের বাড়িতে এসেছিল একদিন, অন্তিমক্ষণে সেই পথেই তার শেষশয্যা

হলো!”

গল্পের মাঝামাঝি জায়গায় ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী এসে চুপচাপ আমার কেবিনের এককোণে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিলেন। মুখার্জীর লালুর কাহিনী শেষ হতেই ব্যানার্জী বললেন—‘ঠিক এ ধরনের করুণ পরিণতি না হলেও একটা অশেষ দুঃখের স্মৃতি আমার মনকে এখনো মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। কাহিনীটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

“আমার বাবার বদলির চাকরি। আমাদের ছোটবেলাটা বেশির ভাগই কেটেছে উত্তর আর মধ্য ভারতে। সেবারে বছর তিনেকের জন্য ছিলাম ভূপাল শহরে। তখন স্কুলে পড়ি। স্কুলফেরত বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছি, দেখি রাস্তার কোণে নালার কাছ বরাবর একটা বেশ গাবদাগোবদা সাদায়-কালোয় ছোপ ছোপ কুকুরছানা প্রায় নেতিয়ে শুয়ে আছে। কোনো কারণে আর একটু গড়িয়ে গেলেই নালার জলে সলিল সমাধি!

আমার বয়স তখন বছর দশ। সে বয়সে ভূভারতে এমন ছেলে পাওয়া যাবে না যে রাস্তার কুকুরছানা বাড়ি বয়ে নিয়ে আসেনি। অতএব মাটি-কাদা-জলে মাখামাখি কুকুরছানাটিকে কোলে তুলে একছুটে বাড়ি।

বাবা চাকরি করতেন একটি বিদেশী কোম্পানিতে যাদের মূল অফিস লাহোর আর অমৃতসরে। ভূপালে একটি কারখানা খোলার পর বছর তিনেকের মাথায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাবা অমৃতসরে ফিরে গেলেন আর মা রয়ে গেলেন ভূপালে আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে। আমার উপরে এক দিদি আর নিচে এক ভাই। সবাই পিঠোপিঠি। দিদির ভাবসাব অনেকটা পাকাবুড়ির মতো।

কুকুরছানা নিয়ে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই দিদির চিলের মতো চিৎকার—‘এটা কি হচ্ছে? কুকুরছানাটাকে কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলি! যা রেখে দিয়ে আয়!’

দিদিকে কোনোদিনই পাত্তা দিতাম না, কিন্তু সর্দারি করবার লোভ কখনো ছাড়তে পারতো না সে। আমি গট গট করে দিদির পাশ কাটিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে

পড়লাম কুকুরছানা নিয়ে। ছোট ভাইটা কোথায় ছিল, কুকুরছানা আমার কোলে দেখে আহ্লাদে আটখান হয়ে ছুটে এলো। বললো—‘দাদা, কি সুন্দর কুকুরছানা! আমার কোলে একটু দাও না!’

দিদি আর লোভ সামলাতে পারলো না। বললো—‘ওমা, সত্যিই তো, কি সুন্দর দেখতে! লক্ষ্মীসোনা ভাইটি আমার, আমার কোলে একবারটি দে।’

আমি বরাবরই একটু সেয়ানা। বললাম—‘দেবো, সবাইকে কোলে নিতে দেবো, মাকে সামাল দিতে হবে কিন্তু।’

মা বাড়ি ছিলেন না। বাড়ি আসতেই আমরা তিন ভাইবোন মিলে মাকে আদরে আবদারে অস্থির করে কুকুরছানাটিকে বাড়িতে রাখার হুকুম আদায় করে নিলাম। পরে দেখলাম, মায়ের মায়ার টানই আমাদের চেয়ে বেশি। আমার দিদি ছানাটার নাম রাখলো ‘লাকি’। মা শুধু বললেন— ‘তোদের বাবা যা রাগী লোক। অমৃতসর থেকে ফিরে এসে লাকিকে দেখে না কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসেন!’

বাবা ভূপালে ফিরে এসে কুকুরছানা দেখে আহ্লাদে আটখানা যে হননি বলাই বাহুল্য, তবে খুব একটা রাগারাগিও করলেন না। শুধু বললেন—‘কোম্পানি এখানকার ইউনিট যে কোনোদিন পুরোপুরি বন্ধ করতে চাইছে, তারপর আমাদের পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে অমৃতসরে। তখন লাকি কার জিম্মায় এখানে থাকবে?’

আমাদের পাশেই একটি মারাঠি পরিবার থাকতেন। তাদের বাড়িতেও আমাদের বয়সী তিন-চারটি ছেলেপুলে। আমাদের সঙ্গে খুব ভাব-ভালবাসা ছিল। মা বললেন—‘সেসব তোমাকে ভাবতে হবে না। ভূপাল যদি ছেড়ে যেতে হয়, পাশের বাড়ির সুভদ্রা লাকির ভার নেবেই।’

বাবা মাঝে মাঝেই অমৃতসর থেকে চলে আসতেন। কারখানা বন্ধ করবো বললেই হয় না। বন্ধ করার আগে আইন-কানুনের নানান ঝক্কি লেগেই থাকে। সে সঙ্গে আমাদের স্কুলের সমস্যা, পড়াশুনা, নতুন স্কুলে ভর্তি, নতুন বাড়ি অমৃতসরে খুঁজে নেওয়া, হেনতেন ঝঞ্ঝাট তো ছিলই। নাই নাই করেও দু’বছর কেটে গেল লাকি আসার পর।

এই দু’বছরে লাকি পাক্কা জোয়ান। আমাদের তিন ভাইবোনের ভাই-বন্ধু-নিত্যসঙ্গী, মায়ের প্রায় চোখের মণি। আমার দিদি প্রায়ই মাকে অনুযোগ করতো লাকিকে বেশি ভালবাসে বলে।

লাকি আমাদের জন্য কোনো অসাধ্যসাধন করেনি কিংবা তার কোনো অসাধারণ গুণাবলীও দেখিনি। বোধহয় স্নেহ-ভালবাসা পাবার জন্য এসব বিশেষ বিশেষ বস্তুর দরকারও নেই। স্নেহ-ভালবাসা নিজের নিয়মেই বয়ে চলে। লাকি সেটা প্রভূত পরিমাণে আমাদের কাছ থেকে পাচ্ছিল।

যতই আমাদের ভূপালের পাততাড়ি গুটিয়ে আসছিল, মার ভালবাসা লাকির প্রতি যেন উথলে উথলে উঠছিল। আমরা তখনো ভাবতে পারিনি লাকি আমাদের সঙ্গে অমৃতসর যাবে না।

কিন্তু যেদিন যাবার দিন এসে গেল

সেদিন আমরাও জানলাম লাকি ভূপালেই থেকে যাবে। অমৃতসরে আমাদের সঙ্গে যাবে না।

আমরা তিন ভাইবোন একসঙ্গে কান্না জুড়ে দিলাম, মার চোখেও জল, লাকি শুধু বোবা চোখ নিয়ে আমাদের মুখগুলো বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

একটা সুন্দর চেনে বেঁধে লাকিকে সুভদ্রা মাসির জিম্মায় রেখে আসা হলো। এর আগেও এখানে-ওখানে গেলে সুভদ্রা মাসির বাড়িতে লাকিকে রেখে আসা হতো। হয়তো লাকি কিছুটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ওদের তো প্রকাশের ভাষা অন্যরকম। সামান্য গাঁইগুঁই ছাড়া বিশেষ কিছু করলো না লাকি।

ফ্রন্টিয়ার মেলে করে আমাদের অমৃতসর যাবার কথা। সন্ধ্যের দিকে ট্রেন। ভূপালের কয়েক বছর অনেক মায়ার বন্ধন জড়ানো ছিল, সবচাইতে বড় বন্ধন, বড় বন্ধু লাকি আমাদের পিছনে রয়ে গেল।

আমরা সবাই মালপত্রসমেত এক্কায় বসলাম। মার অনেক কষ্ট হচ্ছিলো আমাদের সামলে রাখা। মার নিজের কষ্ট তো ছিলই।

স্টেশন আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এক্কা অনেকটা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ আমার নজরে এলো ওটা লাকি না! গলায় চেনজড়ানো লাকি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, রাস্তা না ধরে এবাড়ি-ওবাড়ির আনাচ-কানাচ দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করে আমাদের কাছে আসতে চাইছে। মাঝখানে একটা বড়সড় টিলা, লাকি অকস্মাৎ টিলার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

আমরা তিন ভাইবোন একযোগে ডুকরে উঠলাম—'মা, এক্কা থামাও। লাকিও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

মা বললেন—'এক্কাওয়ালা, রোখো, রোখো, লাকিকো আনে দো।'

দশ মিনিট কেটে গেল। লাকির দেখা নেই। এখন বুঝি লাকি আমাদের সাথে মিলতে চেয়েছিল একেবারে স্টেশনের সীমানায়।

মা বললেন—'আর তো দেরি করা যায় না! ট্রেন চলে যাবে আমাদের ফেলে!'

অগত্যা ট্রেনে চাপতে হলো। একসময় ট্রেনও ছেড়ে দিল। হঠাৎ দেখি লাকি গলায় চেন ঝুলানো অবস্থায় পাগলের মতো ট্রেনের পেছন পেছন প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটছে। দিদি বললো—'মা, শেকল টেনে ট্রেন থামাও না।'

মা দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন।

লাকির সঙ্গে আমাদের সেই শেষ দেখা। লাকি সুভদ্রা মাসির বাড়িও ফিরে যায়নি। তাঁরাও অনেক খোঁজখবর করেছিলেন, কিন্তু লাকির হদিস আর পাইনি কোনোদিন।"

ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর কাহিনীর অন্তিম সময়ে যিনি আমার কেবিনে পা রাখলেন তাঁকে একদম আশা করিনি আমি। আমার দাদা, থাকেন রাজস্থানের আলোয়ারে, রিটায়ার্ড লোক. বেশি ভ্রমণ-ট্রমণ করেন না। তিনি এসময়ে কোনো খবর না দিয়ে এলেন তাই উৎকণ্ঠ মন নিয়ে তাকালাম। দাদা কোনো ভূমিকা না করে বললেন—'দিল্লী এসেছিলাম, ত্রিপুরা এম্পোরিয়ামে একটু কাজ ছিল। জানতামও না ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিজের একটা স্টল বসবে কোলকাতার ময়দানে ইন্ডাস্ট্রি ফেয়ারে। ইন্ডাস্ট্রির ডিরেক্টর ভীষণ অনুরোধ করলেন আমাকে একটু তত্ত্বতালাশ করতে। এসব কাজ তো সারাজীবন করেছি, অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। কাউকে কোনো খবরও দিতে পারিনি, রাজধানীতে বসে দলবল নিয়ে আজই কোলকাতা পৌঁছে গেলাম। বাড়ি এসে সব শোনার পর একদম ভাল লাগছিল না, তাই তোর অফিসে এলাম। শিখার দিকে তাকাতেও কষ্ট হচ্ছিল।

তোর হয়তো ভাল মনে নেই, আমাদের পুব বাংলার গ্রামের বাড়িতে সব সময়ই একটা-দুটো কুকুর থাকতো।'

কথা বলতে বলতে দাদা আয়েস করে একটা চেয়ারে বসলেন। ইতিমধ্যে আমার অফিসের অমর উকীল, সিয়ারাম আর নিশীথ একটু ঘন হয়ে কাছে এলো। আমার কেবিনের দরজা খোলা থাকে সবসময়, কাজেই যে কোনো প্রসঙ্গ উঠলে সবাই শুনতে পায় বা অংশ নিতে পারে। অসিত বুদ্ধি করে কয়েক কাপ চা নিয়ে ঢুকলো।

দাদা এক কাপ চা খুশি মনে নিলেন। দাদা এ অফিসে অচেনা নন, এর আগেও কোলকাতায় এলে আমার অফিসে এসেছেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দাদা তাঁর গল্প শুরু করলেন—

"পুব বাংলার সরাইল পরগনায় আমাদের আদি বাড়ি। সরাইলের খ্যাতি-অখ্যাতি হয়তো কেউ কখনো শোনেওনি কিন্তু সরাইলের একটা জিনিস ভুলতেও পারবে না। সেটা হলো সরাইলের কুকুর। কুকুর তো নয়, একেকটা জ্যান্ত বাঘ। একেকটা পূর্ণবয়স্ক কুকুর ওজনে পঞ্চাশ কেজি আর উচ্চতায় সাড়ে তিন ফিট অনায়াসে হয়। ছোট ছোট লোম, সরু কোমর, সরু লেজ, সারা শরীর এতো মসৃণ, মনে হয় যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে! তোমাদের বিদেশী গ্রেহাউন্ড, আলসেশিয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। খুব সুন্দর জাতের কুকুর, অসম্ভব প্রভুভক্ত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রচণ্ড শক্তিধর আর তেমনি ক্ষিপ্র চলাফেরায়। মালিকের ইঙ্গিত পেলে হিংস্র হতেও বেশি সময় লাগে না। আরেকটা ভাল জিনিস, এদের পালাপোষার জন্য 'হাইব্রীড ডায়েটিং' না কি বলে এসব চক্করে পড়তে হয় না। বাড়িতে যা হয় মাছের কাঁটা, ডাল, সবজি, একথালা ভাত পেলেই সেটেপুটে খেয়ে খুশি থাকবে। দুধের ছিটেফোঁটাও দেবার দরকার নেই। এইটুকু পেটপুরে খেতে পারলেই এরা সন্তুষ্ট, শরীরও তরতাজা থাকবে। শুধু একটাই মুশকিল, এ জাতের কুকুরকে কখনো বেঁধে রাখা যায় না। বেঁধে রাখলে প্রথমে কেঁদে-কঁকিয়ে আকাশ ভেঙে ফেলবে, পরে রাগের তাড়নায় ক্ষ্যাপামি শুরু করবে। সেই অবস্থায় সামনে অজানা কেউ পড়লে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলাও বিচিত্র নয়।

আমাদের আদি বাড়ি অনেকখানি জায়গা নিয়ে। গাছপালার ছায়ায় জড়ানো টলটলে বিশাল পুকুরের পাড়ে বাংলো ধরনের বাড়ি। অতবড় বাড়িতে কুকুর বেঁধে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ততদিনে ভারত জুড়ে সমস্যা, সারা বাংলা জুড়ে সমস্যা, দেশবিভাগের সমস্যা!

তুই তখন অনেক ছোট, প্রায় নাদান

অবুঝ পর্যায়ের, আমার সঙ্গে প্রায় দশ বছরের বয়সের ফারাক। আমার সবই মনে আছে। বাবা আমাদের নিয়ে চলে এলেন গ্রাম ছেড়ে মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। নদীনালা খালবিলের দেশ, চারদিকে জল থইথই। নৌকো করে নদী বেয়ে এলাম, নদীর পর শহরের গাঁ লাগোয়া বিল, এপার-ওপার দেখা যায় না, তাও পার হতে হলো। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার অপরিচিত নয়, এর আগেও অনেকবার এসেছি। এখানে এসে বাড়ি ভাড়া করতে হলো। ছোট বাড়ি, পরিসর কম, পাশেই গা লাগোয়া মাধব দাসের কসাইখানা। মাধব দাসের রমরমা ব্যবসা, মাংসের দোকান ছাড়াও ছাগলের দুধ বিক্রির ফলাও কারবার। সারাদিন পাঁঠা, ছাগল আর ছাগশিশুর ম্যা ম্যা আওয়াজে গমগম করছে।

আমাদের সাথে দু' বছরের বেলিও এসেছে। বেলির সাদা ধবধবে গায়ের রঙ, খালি পিঠে সামান্য কালো ছিট। দু' বছরের বেলির ওজন তিরিশ কিলো কম করে। প্রায় তিন ফুট উঁচু, আমার মায়ের অতি আদরের মেয়ে।

সমস্যার শুরু বেলিকে নিয়ে। একসঙ্গে অতো ছাগল কখনো দেখেনি, মহোল্লাসে বেলি দু' তিন লাফে ছাগলের পালের একেবারে মাঝখানে। ছাগলের দল পাগলের মতো নিমেষে ছত্রখান। মাধব দাস গুণ্ডা লোক, ভরদুপুরে কল্কে টেনে গুম্ হয়ে থাকে, সংস্কারে হাতে বল্লম নিয়ে ময়দানে নেমে পাঁয়তারা শুরু করলো—'কোই হ্যায় তো সামনে আ যাও, বল্লমসে প্যাট ফাঁসাইয়া দিমু, আমার ছাগলরে কামড়াইতে আসে!'

বাবা সংক্ষেপে বললেন—'বেলিকে বেঁধে রাখো, নয়তো অন্যত্র চালান করো।'

মা চোখের জল ফেলতে শুরু করলেন। মার খুড়তুতো ভাই, আমরা ডাকি গণ্ডুশ মামা, থাকেন তিতাস নদীর ঐ পাড়ে। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দিদি, বেলি আমার ঘরে থাকবে। কোনো চিন্তা করিস না।'

বাবা পরদিনই বললেন—'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর নয়। এখানে শুধু ছাগল আর পাগল বাস করে। চলো যাই আগরতলায়। স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে থাকবো। গণ্ডুশ, তুমি বেলিকে ধরে-বেঁধে তোমার গাঁয়ে নিয়ে যাও। আগরতলায়ও হয়তো আর কোনো ফ্যাসাদ অপেক্ষা করে আছে!'

অতঃপর বেলিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাল করে চেনে বেঁধে গণ্ডুশ মামার সঙ্গে নৌকোয় বসিয়ে দেওয়া হলো। আমরা সবাই মেড্ডার কালভৈরবের মন্দিরের পাশে লচকে বিলের ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। বিশাল বিল, তার ঢেউ কি! বেলির ভ্রমণে বেজায় আনন্দ। বেচারা ভেবে নিয়েছিল আমরা সবাই মিলে ভ্রমণে যাবো কোথাও! চেনে বাঁধা পড়তে তাই কোনো আপত্তি জানায়নি।

ঘাট ছেড়ে নৌকো এগিয়ে যেতেই বেলি সব বুঝে নিল। তারপর তার সে কি করুণ আর্তি! নৌকোয় বেঁধে রাখাই দায়। আমাদের সবার চোখের জল বিলের জলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। মেড্ডার কালভৈরব মূর্তি অতিকায়, শিব ভৈরবমূর্তি নিয়ে বসে আছেন, কম করেও তিরিশ ফুট উঁচু চালে মাথা ঠেকছে ঠাকুরের। যতবার আগে মন্দিরে গেছি, গা ছমছম করতো। মুখ থেকে কথা সরতো না। সেদিন মন্দিরে ঢুকেও হাউ হাউ করে কেঁদে চলেছি আমরা। (সে মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় অনেক পরে ১৯৭১-এর যুদ্ধে, আবার তৈরি হলেও সে কালভৈরব আগের মতো হয়নি।)

পরদিন ভোরে ভোরে তল্পিতল্পা সমেত আমাদের গোটা পরিবার ট্রেনে করে আখাউড়া, তারপর সেখান থেকে রিকশা চেপে আগরতলা। মায়ের দিকের অনেক আত্মীয়-পরিজন আগরতলায় বসবাস করছেন বহুকাল। তাঁদের কাছ থেকেই একটা বেশ উঁচু অনেকখানি জায়গা জুড়ে জমি বাবা আর আমাদের ভগ্নীপতি কিনে রেখেছিলেন। এই সব উঁচু বাস্তুজমির আঞ্চলিক নাম টিলা। আমরা সাময়িক আশ্রয় নিলাম মায়ের মাসির বাড়িতে। আসলে এই জমিটা মাসির কাছ থেকেই কেনা।

এরপর অনেকগুলো ঘটনা, তার সবই বেলির কীর্তিকাহিনী।

আমরা আগরতলা পৌঁছাবার তিন দিনের মাথায় মাসতুতো ভাই বিমল উদ্ভ্রান্তের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগরতলা এসে পৌঁছুলো। এসেই প্রায় হাঁক পেড়ে বলা শুরু করলো—এমন চমৎকার জীবনে দেখিনি। বেলি গণ্ডুশ মামার বাড়ি থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে গেছে! ভাবো একবার, তিতাস নদী সাঁতরে পার হয়েছে, পার হয়েছে লচকে বিল, তারপর গলায় চেনবাঁধা অবস্থায় তোমাদের বাড়ির চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে আর কুঁই কুঁই করে কাঁদছে! মাধব দাস নেশাভাঙ করা লোক। সে তো হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বাড়ি এসে পড়েছে আর মায়ের পা ধরে বলছে, দিদি, এ কুকুর সামান্য কুকুর নয়, ঈশ্বরের অবতার, নাহলে এমন উত্তাল নদী আর কূলভাঙা বিল সাঁতরে পার হয়! সারাজীবন ধরে অনেক পাপ করেছি, নাহলে এই কুকুরকে মারবো বলে বল্লম হাতে নিয়েছিলাম! দিদি, এই মুহূর্তে আপনি কাউকে আগরতলা পাঠিয়ে তেনাদের কুকুর নিয়ে যেতে বলুন। যাতায়াতের সব খরচা আমার। এনারা না আসা পর্যন্ত বেলিকে আমি যেভাবেই হোক ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার কাছেই রেখে দেবো, এ কথা দিলাম।'

খবরটা কানে আসতেই বাবার দু' চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরতে লাগলো। বাবা এমনিতে বেশ শক্তপোক্ত লোক ছিলেন কিন্তু এমন খবরের জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন না। শুধু বললেন—'ভালবাসার টান কত গভীর হলে একটা প্রাণী খাল, বিল, নদী সাঁতরে মাইলের পর মাইলের বাধা তুচ্ছ করে চলে আসতে পারে বেলিই সেটা দেখালো। ধিক আমাদের, আমরা এমন ভালবাসারও মর্যাদা দিতে শিখিনি!'

বাবা যেমনভাবে ছিলেন ঠিক তেমনভাবেই বিমলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন বেলিকে আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য। আর পরদিনই বেলি আমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসে শান্ত হলো।

বেলির মতো কুকুর জীবনে দেখিনি। ওর কথা বলতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

কাটিয়ে দেওয়া যায়। ওর প্রাণ যেমন বিশাল, প্রাণভয় তেমনি শূন্য। বেলি তার ছোট্ট জীবনে বার বার সেটা দেখিয়ে গেছে।

তিন বছর বাদে বাবা আমাদের জন্য পাকা বাড়ি বানানোয় হাত দেন। পুব বাংলার বাড়ি যেমন ছিল, অনেকটা সেই ধাঁচের। স্থানাভাব, কাজেই আয়তন-আকার কিছু ছোট।

এক শীতের রাতের ঘটনা। আগরতলা আধা পাহাড়ী শহর, পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী। আদিবাসী আর বাঙালী নিয়ে সেসব দিনে প্রায় হাজার পঞ্চাশ লোকের বাস। শীত বেশ ভালই দাঁত বসায়। রাতটা শুক্লপক্ষের, তাই অন্ধকার তেমন জমাট নয়। এ ঘটনার সঙ্গে আমার ভাইও বেশ জড়িয়ে আছে, মনে হয় তার মুখ থেকেই বাকিটা শোনা ভাল।'"

দাদা এবারে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। অর্থাৎ এবারে তুমিই বলো। একটু হেসে আমিও শুরু করলাম।

"আমার জীবনে বেশ কয়েকটা ঘটনা আমার বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনাটা এর মধ্যে অন্যতম। আজ এতো বছর পরেও যখন ভাবি, বার বার আমি অবাক হয়ে যাই, কি করে কোনো অঙ্গহানি ঘটলো না আমার, যেখানে প্রাণনাশের সম্ভাবনাই ছিল সবচাইতে বেশি।

আমার তখন বয়স আট থেকে নয়। অতিমাত্রায় দুরন্ত আর ডানপিটে। বয়সের তুলনায় বিলক্ষণ বড়সড় দেখতে। ততদিনে দেশবিভাগ ঘটে গেছে। আগরতলা আর ত্রিপুরা রাজ্য পড়েছে ভারতে।

আমাদের পাকা দালান বেশ দ্রুত উঠছে। শোয়া-থাকার যথেষ্ট অসুবিধে ছিল। বাবা, মা, আমি আর বেলি থাকতাম একটা ঘরে, আর দাদা থাকতেন পাশের মাসির বাড়িতে, আর একদম লাগোয়া বাড়িতে আমার দিদি থাকতেন জামাইবাবু আর ছোট ছোট দুটো মেয়ে নিয়ে।

সেই শীতের রাতে ডাকাত পড়লো আমাদের বাড়িতে। আমি অঘোরে ঘুমুচ্ছি। ঘুম ভাঙলো দরজার উপর প্রচণ্ড ধাক্কার আওয়াজে। মনে হচ্ছিলো, দরজার উপর কেউ মুগুর ঠুকছে।

বাবার বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। কিন্তু যথেষ্ট সাহসী এবং বলবান লোক। দরজা ভেঙে পড়বার আগেই হাতে লাঠি তুলে নিয়েছেন। যেই মুহূর্তে দরজাটা হাঁ হলো, দুটো হুঙ্কার আমার কানে এলো—একটা বাবার গলার সঙ্গে লাঠির আওয়াজ। আরেকটা ক্রুদ্ধ পাশব আওয়াজ, সেটা বেলির গলা থেকে। শুধু আবছা আলোয় লক্ষ্য করলাম বেলির সাদা শরীরটা একটা সাদা বিদ্যুতের রেখার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে আর একটা কালো মূর্তির উপর সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা সেই আঘাতে নিমেষে ধরাশায়ী এবং বাবাও ততক্ষণে লাঠি আস্ফালন করতে করতে ঘরের বাইরে। আমি প্রায় কিছুই না বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি।

ততক্ষণ আশপাশের বাড়ি থেকে তুমুল শোরগোল আর 'ডাকাত, ডাকাত' চিৎকার। ইতিমধ্যে আমার ভগ্নীপতি একটা বিশাল লাঠি হাতে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকাত দলকে তাড়া শুরু করলেন।

আমার ঘুমচোখে মনে হলো অন্তত দশ-বারোজন তাগড়া জোয়ান লোক আমাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। ঠিক তক্ষুণি বেলি নামের সাদা বিদ্যুৎটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবারো দলটার উপর। বেলির গলায় একটা অজানা গর্জন, যা শুনলেই যে কোনো সাহসী সবলেরও ভীতির সঞ্চার ঘটবে। মূলত বেলির তাণ্ডবেই ডাকাত দল ততক্ষণে বেগতিক বুঝে পালানোর কথা ভাবছে।

হঠাৎ এ সময় কানে এলো অন্তত বার পাঁচেক 'দুড়ুম দুড়ুম' আওয়াজ। এ আওয়াজ অজানা নয় আমার কানে। আমাদের পুব বাংলার গ্রামের বাড়িতে বাঁশঝাড় আর বেতের ঝোপে পাখি আর খরগোশ শিকারে গাদা বন্দুকের ব্যবহার দেখেছি। তবে খরগোশ, শেয়াল, কচ্ছপ আর সাপ শিকারে ওসব জায়গার লোক লাঠির প্রয়োগ করে। এজন্যে পাকা বাঁশ বা বেতের তেল চুকচুকে চার হাত লম্বা লাঠি সবার ঘরে ঘরে এবং একটু-আধটু লাঠি মাথার উপর তুলে বনবন করে ঘুরিয়ে দেওয়া প্রায় সবারই আসে।

আগের কথায় আসি। দুড়ুম দুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ আর তার সঙ্গেই মনে হলো আমার বাঁ হাত, দুই পা আর পেটের কাছটায় আগুনের হল্কা এসে লেগেছে, শুধু আগুনের ছোঁয়াই লাগেনি, রীতিমতো ছেঁকা বসে গেছে, গলগল করে শরীর থেকে জলের মতো কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি পা ফেলতে পারছি না, প্রায় অচল হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছি। এই বিমূঢ় অবস্থায়ও একবার মনে হলো আবার একটা দুড়ুম শব্দ আর সেই সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, যেটা নিশ্চিত বেরিয়ে এলো বেলির গলা থেকে।

খানিক বাদে কোলাহল থিতিয়ে গেল, পাড়াপড়শীরা লণ্ঠন হাতে ছুটে এলো। ডাকাত দল ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। কিছুই নিতে পারেনি। আমার ভগ্নীপতির মাথা ফেটেছে ডাকাতের লাঠির চোট খেয়ে, তাঁকে ঘিরে সবাই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করছে। আমি শুধু মাকে বললাম—'মা, আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে, আর গলগল করে শরীর থেকে জলের মতো কি বেরিয়ে যাচ্ছে!'

পনেরো দিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। সর্বমোট চারটে গুলি শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে গেছে। কোনো অঙ্গহানি ঘটেনি, প্রচুর রক্তপাত ছাড়া শরীরের কোনো ক্ষতি হয়নি। বাবা বললেন—'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে!'

বেলির শরীরে লেগেছিল একটাই গুলি। ডাক্তার দেববর্মন দেখেশুনে বললেন—'গুলিটা পাঁজরে আটকে আছে, বার করতে গেলে সমূহ বিপদ হতে পারে। প্রচুর রক্ত ভেতরে ভেতরেই ঝরছে, ওকে আর কষ্ট দেবার দরকার নেই!'

আমি যেদিন বাড়ি ফিরলাম, চলাফেরায় কষ্ট ছিল বেশ। বেলির কাছে যেতেই চোখ বুজে ছিল, চোখ খুলে তাকালো, আমার মনের ভুল কিনা জানি না, মনে হলো বেলির মুখে একটা খুশির ঝিলিক। বেলির চোখ আবার বন্ধ হলো, সে চোখ আর কোনোদিন খোলেনি!'"

গল্প বলার ফাঁকে কখন অন্ধকার জমাট

বেঁধে গেছে খেয়াল করিনি। কোলকাতার শীত এবারে অনেকদিন চলছে। এখনো যাই যাই করছে না। শীতের রাত তাড়াতাড়ি গাঢ় হয়ে বসে। কিন্তু আজ দেখছি কারো বাড়ি যাবার তাড়া নেই। খানসামা গোবিন্দ আরেক প্রস্থ চা পরিবেশন করে গেল।

আমি আস্তে করে আবার শুরু করলাম—"বেলি অনেক স্মৃতি পেছনে ফেলে গেছে, আমাদের ধনেপ্রাণে বাঁচিয়ে নিজের প্রাণ বলি দিয়ে গেছে। পরে ডাকাত দলটাও ধরা পড়েছিল, আমাদের রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে দুজন ছিল ডাকাত দলে, বেলির দাঁতের দাগ ওদের সনাক্তীকরণে সাহায্য করেছে।

আজকে আমি স্নোয়ির গল্প বলবো। এ আরেক ধরনের কাহিনী। স্নোয়ি কোনোদিন কোনো মহৎ কাজ করেনি, বস্তুত স্নোয়ি কোনো কাজই কখনো করেনি, ওর কাছ থেকে কোনো কাজই আমরা আশা করিনি। হয়তো শিশুবয়স থেকে চেষ্টা করলে দুয়েকটা কাজের ট্রেনিং দেওয়া যেতো ওকে, কিন্তু তেমন ইচ্ছা মনে জাগেনি কখনো। কিন্তু যে কাজটা বিনা আয়াসে ও করে গেছে তার কোনো মূল্যায়ন হয় না। অন্যদিক দিয়ে ভাবলে স্নোয়ি যা দিয়ে গেছে তা শোধ হবার তো নয়ই, শোধ করার কথাই ভাবা যায় না।

একটা ছোট্ট সাত কেজি ওজনের প্রাণী কি পরিমাপের মায়ার বন্ধনে আমাদের আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছিল, হয়তো এখন তার কিছুটা বুঝতে পারি।

জীবনের বেশ কটা বছর কাটিয়েছি মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে। নাসিক শহরটা দেখতে বেশ। দু'পাশে পাহাড়, গোদাবরী নদী, গঙ্গাপুর ড্যাম, ফাঁকা ফাঁকা মাঠ, খোলামেলা পরিবেশ। আমরা থাকতাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের গায়ে লাগোয়া একটা বিরাট খোলা মাঠের উপরে একটা চারতলা বাড়িতে। চারদিকে অনেকটা জায়গা শূন্য, বেশ দূরে পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ছাউনি এবং তারো পরে লোকালয়। বাড়ি থেকেই পশ্চিমঘাট পর্বতের দেখা মেলে। এমন নির্জন গা ছমছমে জায়গায় আমরা মাত্র ছ'টা পরিবার, একই কোম্পানিতে কাজ করি। সকাল সাতটা-সোয়া সাতটায় আমরা ছুটি ফ্যাক্টরিতে। ছ'টা ফ্ল্যাটের ছটা বাচ্চা যায় স্কুলে, সারাদিন মেয়েরা একলাই কাটায় এরকম নিঝ্ঝুম পরিবেশে। নিচে একটা বুড়ো দারোয়ান গোছের লোক থাকে।

শহরের লোক বাড়িটার নাম দিয়েছে ভূত বাংলো, যদিও আসল নাম ঠাকরে বিল্ডিং।

স্ত্রী এবং ছেলে অনেকবার একটা ছোট্ট কুকুর পোষার আবদার রেখে যাচ্ছিলো, আমিই বিনা কারণে গড়িমসি করছিলাম। কথায় কথায় আমার অফিসের পার্কারকে বলেছিলাম একটা ছোট্ট কুকুরের সন্ধান করতে। পার্কার থাকে দেওলালি। নাসিক থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। দেওলালিতে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরাট বড় ছাউনি, আর্টিলারি সেন্টার। ওখানকার বাজারটাও বেশ ঝকঝকে এবং নানাজাতের কুকুরও পোষে ঐ অঞ্চলের লোক।

একদিন কাকভোরে পার্কার আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার বেল টিপলো। বাপ্পা দরজা খুলে দিয়েই খুশিতে আটখানা। আমি ভেতরে অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। ততক্ষণে আমার স্ত্রী শিখাও পৌঁছে গেছে ছেলের পাশে।

আমি বেরিয়ে এসে দেখি একটা ছোট্ট সাদা ধবধবে জীবন্ত পুতুল বাপ্পার দুই অঞ্জলির মাঝখানে। বাপ্পার চোখমুখে খুশির ঝিলিক, তার হাত থেকে দুই হাতের মাঝে সাদা পুতুলটাকে তুলে নিলেন আমার স্ত্রী। নাসিকে বেশ ঠাণ্ডা, হয়তো খানিকটা উষ্ণতা পেয়ে পুতুলটা বেশ আরাম পাচ্ছিলো। বাপ্পা সঙ্গে সঙ্গে তার নাম দিয়ে দিল স্নোয়ি। বড়জোর তিন হপ্তার স্পিৎসের ছানা।

পার্কার বেরিয়ে যাবার পর টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট করছি, স্ত্রীর চিৎকারে সচকিত হলাম।

'দেখো, একবার এসে দেখে যাও। তোমার ছেলে এই ঠাণ্ডা জলে স্নোয়িকে চান করিয়ে দিয়েছে, ওকে বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল হবে দেখছি!'

এসে দেখি সাদা ছানাটার সারা শরীর ভেজা, শীতে হি হি করে কাঁপছে। বাপ্পাকে ধমক দিয়ে তাড়াতাড়ি তোয়ালে জড়িয়ে স্নোয়িকে একটু গরম করার চেষ্টা নিই। ততক্ষণে ভোরের রোদ আমাদের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে পৌঁছে গেছে। স্নোয়িকে তোয়ালে জড়ানো অবস্থায় সেই রোদে এসে দাঁড়াই। স্নোয়ির কাঁপুনি এবারে থামে। স্নোয়ির সারা শরীর সাদা ঘন লোমে ঢাকা, চোখ দুটো কালো, নরম আর খুব সুন্দর করে তাকায়। শরীর একটু গরম হতেই স্নোয়ি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে।

বাপ্পা বলে—'দেখছো, একদম টিনটিনের হুবহু স্নোয়ি। এ বড় হলে স্নোয়ির মতোই কাণ্ডকারখানা করবে দেখে নিও।'

বাপ্পা স্কুলে বেরিয়ে যেতেই শিখা ছোট

বাটিতে করে গরম দুধ নিয়ে এল স্নোয়িকে ঝিনুকে করে খাওয়াবার জন্য। তিন হপ্তার বাচ্চা, কয়েক ফোঁটা হয়তো মুখে গেল, বাকি সবই গড়ালো মাটিতে।

শিখা বললে—'এ তো ঝামেলা হয়ে গেল। এর জন্যে ফীডিং বটল চাই, নাহলে দুধই খাবে না দেখছি। তোমায় অফিসফেরত একটু বাজারে যেতে হবে, 'সেরেলা' জাতীয় কিছু কিনে আনতে হবে।'

একটু পরে আলমারি ঘেঁটে একটি রেমন্ড কোম্পানির বেবি ব্ল্যাঙ্কেট বার হলো স্নোয়ির জন্য, ছোটবেলায় এটা বাপ্পার গায়ে চড়তো। এই সুন্দর ব্ল্যাঙ্কেটটার ধারগুলো পরে দাঁত দিয়ে কেটে দিলেও প্রায় বারো বছর শীতকালে স্নোয়ির কাজে লেগেছে।

পরদিন দুধ ঝিনুক দিয়ে খাওয়াতে গিয়ে আবার ঝকমারি, ফীডিং বটলে দুধ ভরে মুখে ঠেকিয়ে দিলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, এতটুকু পুঁচকে ছানার কতরকম নটঘট! শিখা বললো—'এ তো না খেয়েই শেষ হয়ে যাবে, দেখি 'সেরেলাক' মুখে রোচে কিনা।'

গরম জলে সেরেলাক গুলে ঠোঁটে একটু লাগিয়ে দিতেই স্নোয়ি একদম চনমনে হয়ে উঠলো, চুক চুক করে খেয়ে আবার লাল ছোট্ট জিব বার করে চাটতে শুরু করলো। এরপর থেকে ফীডিং বটলে দুধ খাওয়া শিকেয় উঠলো, খাবার সময় হলেই শিখার পেছন পেছন ঘোরে আর শিখার হাতে সেরেলাকের কৌটো দেখলেই ক্ষুদে শরীরটা নিয়ে লাফাতে শুরু করে। পেট ভরে যাবার পর ছোট আধফুট শরীরটার মধ্যভাগ বেশ নেয়াপাতি নেয়াপাতি দেখায়! এ দৃশ্য দেখে ঠাকরে বিল্ডিং-এর সবাই হেসে কুটিপাটি। স্নোয়ি ছোট্ট শরীরটা নিয়ে ফ্ল্যাটের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে কোনো অজানা জিনিস খুঁজে বেড়ায়, ব্যালকনির ফাঁকে-ফোকরে ছোট্ট মুখটা বার করে দূরের আকাশ পাহাড় গাছপালা সারাক্ষণ দেখে। ওর জ্বালায় ব্যালকনিতে দাঁড়াবার উপায় নেই। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠে দৃশ্য দেখবে আশপাশের। স্নোয়ির বয়স তিন মাস হতেই দেখলাম যার-তার কোলে ওঠার বা 'তুতু' করে ডাকলেই কারো সঙ্গে লেজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে যাবার মধ্যে ও নেই। কোলে উঠবে শুধু আমাদের তিনজনের, আর কারো ধার ধারে না সে। নিচে থাকে কুলকার্নিরা, তাঁদের মেয়ে বিদ্যা ছুটে ছুটে আসে আমাদের ফ্ল্যাটে, স্নোয়িকে কিই না আদর করে, স্নোয়ি চোখ বুজে আদরটা উপভোগ করে। কিন্তু যেই বিদ্যা কোলে নিতে চায়, কিছুতেই তার কোলে উঠবে না, মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকবে! স্নোয়ির গলায় চেন বাঁধা আরেক সমস্যা, কিন্তু টো টো করার গন্ধ পেলেই একপায়ে খাড়া, তখন গলায় হাল্কা চেন পরাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু বিদ্যা চেন ধরে টানলে স্নোয়ি তার ছোট্ট শরীরের সব জোর দিয়ে চেষ্টা করবে তার হাত ছাড়িয়ে নিতে। বিদ্যা রেগেমেগে বলবে—'দুষ্টু, পাজি, আর তোকে কখনোই আদর করবো না।'

কদিন বাদেই শুরু হলো স্নোয়ির আরেক উৎপাত। জুতো আর মোজা পেলেই তাতে দাঁত বসিয়েই শুধু ক্ষান্ত নয়, ওর ছোট্ট বিছানায় টেনে সব নিয়ে আসবে। তখন ওর বিছানা থেকে ওগুলো উঠিয়ে আনে কার সাধ্যি! যে ভয়ঙ্কর ক্ষুদে দাঁত দেখিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, আমাদেরই ভয় লাগে!

বেশ চলছিল সেরেলাক, একদিন একটা ছোট্ট মাংসের টুকরো মুখের সামনে ধরতেই সমূহ বিপদ! দুধ, সেরেলাক, রুটি ছুঁয়েই দেখে না, দু'বেলা মাংস চাই, চিকেন হলে আরো ভালো। মাংস না পেলে কিছুই মুখে তুলবে না। অতএব স্নোয়ির জন্য বারো মাস দু'বেলা মাংসভাত। ছোট্ট শরীর, ছোট্ট পেট, কতটাই বা লাগে! দু'মুঠো ভাত নরম করে গলানো, তার সঙ্গে দু'দুটো করে তুলতুলে নরম মাংস মেখে দেওয়া। স্নোয়ি তৃপ্তি করে খেয়েই নিজের বিছানায় গিয়ে চোখ বুঁজবে।

আমার সেসব দিনে একটা সাইডকারওয়ালা স্কুটার আর ফিয়াট গাড়ি ছিল, আর বাপ্পার ছিল মোপেড। আমাদের ভূত বাংলো ঠাকরে বিল্ডিং-এর আগেপিছে ফাঁকা মাঠ। সিকি মাইল দূরে ভোঁসলে মিলিটারি স্কুল, আধ মাইল দূরে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ। আমাদের গাড়ি ত্রিম্বক রোড থেকে ঠাকরে বিল্ডিং-এর রাস্তা ধরলেই স্নোয়ির কান সজাগ, বাড়ির গেটে ঢোকার আগেই শুরু হয়ে যেত ওর চিৎকার। একেকবার ছুটে যেত শিখার কাছে, জানান দিতো আমরা এসে গেছি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একলাফে কোলে উঠে নাকে নাক ঘষে নেবে একবার, তারপর শান্তি।

বাড়ি এসে সোফায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পায়ের কাছে বসে হয় হাত কিংবা পা চাটবে নয়তো দাঁত দিয়ে আলতো করে কামড়াবে। সারাদিন শিখার সঙ্গে ঘুরঘুর করলে কি হবে, আমি বাড়ি এলেই আমার সঙ্গে সেঁটে থাকবে।

সন্ধ্যে হলেই বাইরে বেরনো চাই। হয় গাড়ি চড়বে, নয়তো সাইড কারে দাঁড়াবে দু'পা তুলে আর প্রায়ই মিলিটারি স্কুলের ফাঁকা মাঠে আমার সঙ্গে দৌড় করা। ছ'মাস হতে না হতেই স্নোয়ি বেশ বড়সড়, প্রায় পাঁচ কেজি ওজন, ছোটে যেন সাদা রঙের বিদ্যুৎ!

আমার ছোটবেলার বন্ধু দেব সেসব দিনে দেওলালির আর্টিলারির লেফটেনেন্ট কর্নেল। মায়ের দিক থেকে একটা আত্মীয়তাও আছে, সে সুবাদে মামা ডাকা উচিত। ছোটবেলা থেকেই নাম ধরে দুজনে দুজনকে ডাকি, মামা কবে উড়ে গেছে।

দেবের বাড়িতে পার্টি। স্নোয়ি যথারীতি সঙ্গে। দেব বললো—'স্নোয়িকে একটু আটকে রাখতে পারো প্লীজ।'

কি আর করা। দেবের বাংলোর একটা ঘরে স্নোয়িকে আটকে রাখা হলো। জীবনে প্রথম বন্ধন কি বুঝলো! স্নোয়ির কি কান্না! আমরা বাইরে আর সব অফিসারদের সঙ্গে গুলতানি করছি, কিন্তু আমার কান স্নোয়ির দিকে, মনটা টনটন করছে।

কোনোমতে পার্টি শেষে স্নোয়িকে নিয়ে গাড়িতে বসলাম। স্নোয়ির ততক্ষণে শান্তি। শিখা বললো—'আর কখনো তোমার বন্ধুর বাড়িতে স্নোয়ি আসছে না!'

স্নোয়ি বেশ শুতো আমাদের খাটের নিচের বিছানায়। যেই একদিন জাঁকিয়ে

শীত নামলো, আমার খাটে ওঠার জন্য কুঁই কুঁই শুরু করলো। মন মানলো না, তুলে ফেললাম খাটে। ব্যস, তারপর আর তোলাতুলি কি! বিছানায় শোবার ইচ্ছে হলেই একলাফে উঠে পড়া, শুধু তাই না, মর্জিমতন যে কোনো বালিশে মাথা লাগিয়ে শুয়ে পড়া!

স্নোয়ি যখন দু' বছরের, আমাদের নাসিক ছাড়ার সময় এলো। বাপ্পা রয়ে গেল নাসিকে কলেজ হস্টেলে, আমরা কুপেতে করে স্নোয়িকে নিয়ে রেলে চড়ে কোলকাতায়। প্রথম রাত একটু অবাক অবাক ঠেকছিল, তারপর থেকেই স্নোয়ি স্বাভাবিক।

কোলকাতার হোটেলে চেয়ার-টেবিলে ভদ্রলোকের মতো বসে থাকতেও কোনো ট্রেনিং লাগেনি। মুশকিল বাধতো আমাদের চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটের বেল কেউ টিপলো যদি, সঙ্গে সঙ্গে খা খা করে ছুটে আসবে স্নোয়ি!

আমি আর শিখা বলবো—'স্নোয়ি নো।'

স্নোয়ি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত। কিন্তু আগন্তুক যেই হোক, বেরিয়ে যাবার সময় আবার বিপত্তি। আবার দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটবাড়িটা ছিল একটা বহুতল বাড়ির আটতলায়। অনেকগুলো বাচ্চা, স্নোয়িকে চটাবার জন্য অনেক সময়ই বেল টিপে মজা করে। স্নোয়ি কোনো বাচ্চা দেখলেই ক্রুদ্ধ আক্রোশে তেড়ে যাবে। বাচ্চাগুলো প্রাণভয়ে 'আন্টি, আঙ্কল, বাঁচাইয়ে' বলে ছুট দিয়েও পরিত্রাণ পায় না এমন।

আমরা ছুটিছাটায় কোথাও গেলে বাড়িতে কেউ না কেউ স্নোয়িকে দেখার ভার নিতো। রামেশ্বর বা ব্রিজকিশোর বেশির ভাগ সময়ই স্নোয়ির তত্ত্বতালাশ করতো। শিখা যেখানেই যাবে, ওর অর্ধেক মন কোলকাতায় স্নোয়ির জন্য পড়ে থাকত। রোজ রাতে ফোন করে খবরাখবর নেওয়া চাই। ভুটানে গেছি, নেপালে গেছি, বাংলাদেশে গেছি, গোয়ায় গেছি কিংবা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছি, শিখার দু'রাত্তির যেতে না যেতেই আর ভাল লাগে না। পয়সা খরচা করে ফোন করো, খোঁজ নাও।

আমরা বাড়ি ফিরলেই স্নোয়ির হাতে আকাশের চাঁদ! আগে রামেশ্বর আর ব্রিজকিশোরের সঙ্গে সঙ্গে সোনামুখ করে ঘুরতো, ওদের হাত থেকে খাবার খেতো। যেই আমরা এলাম, খ্যাঁক করে ওঠে ওদের দেখলে!

বাপ্পা ইতিমধ্যে বিদেশে গেছে, কয়েক বছর বাদে ফিরেছে। স্নোয়ির কিন্তু কোনো ভুল হয় না। বাপ্পা বাড়ি এলেই কাছে গিয়ে আদর নেওয়া চাই, কোলে ওঠা চাই, যেন দিন দুই বাড়ি ছিল না শুধু!

এ এক অদ্ভুত বন্ধন! রাত করে বাড়ি ফিরছি, স্নোয়ি একঠায় দোরগোড়ায়, যতক্ষণ না ফিরি শান্তি নেই! হয়তো গাড়ি করে কোথাও গেছি, স্নোয়ি একবার আমার কোলে, আরেকবার শিখার কোলে, একবার এ জানলায়, আরেকবার ও জানলায় মাথা গলিয়ে দেখছে। হয়তো আমি বা শিখা গাড়ি থেকে নেমে কোথাও গেছি, যতক্ষণ না ফিরি স্নোয়ি এপাশ ওপাশ ছটফট করছে। কি তার অশান্তি!

আমি মাঝে মাঝেই অফিসের কাজে বাইরে যাই। অন্তত দিন দুই স্নোয়ির খাওয়া আর ঘুম নামমাত্র। আমার যাওয়া যদিও বা মেনে নেয়, শিখার কোথাও যাওয়া একেবারেই বরদাস্ত হয় না তার।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত হয় আমার। সেদিন স্নোয়ি আমার কোলে একটু কাঁদুনি গাইবে, আমি শিখাকে শুধাবো—'আজ নিশ্চয়ই স্নোয়িকে বাড়ি রেখে বাইরে গিয়েছিলে!'

শিখা বলবে—'তুই আমার একটিমাত্র মেয়ে, আর আমার নামেই বাপের কাছে নালিশ!'

এই বন্ধনের জন্য স্নোয়িকে ফেলে কোথাও যেতে মন চায় না। ছুটিছাটা পেলে বেড়াবার ছকটা এমনি করি যাতে স্নোয়িকেও সাথে নেওয়া যায়। কাজেই মোটর চড়ে ঘোরো।

এমনি করে পুরী, দীঘা, বকখালি, শান্তিনিকেতন, আরো কতো স্থান ঘোরা হলো।

ইদানীং বয়স বাড়ছে স্নোয়ির, মাঝে মাঝে অসুখবিসুখ করে। ডাক্তারের কাছে ছুটি, ওষুধ খায়, ঠিকও হয়ে যায়।

একবছরও হয়নি নিজের বাড়িতে উঠে এসেছি। বেশ ফাঁকা জায়গা, হু হু করে হাওয়া বইছে, ছাতে উঠলে অনেকদূর পর্যন্ত চোখ চলে যায়। শিখা খুশি, আমি খুশি, স্নোয়ি খুশি। বাপ্পা চাকরি করে বিহারে, ছুটিছাটায় আসে। স্নোয়ি সেটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমি আর শিখা ওর রোজকার সঙ্গী।

সকালে উঠে ওর প্রথম কাজ আমার সঙ্গে বাড়ির আশেপাশে একটু এদিক-ওদিকের প্রাতঃভ্রমণ। সন্ধ্যের পর ছাতে উঠে পায়চারি। আমি শিখাকে বলি—'দেখো, এখানকার খোলা হাওয়া স্নোয়ির পক্ষে ভালো হলো, ওর আয়ু বেড়ে যাবে।'

এর আগেও স্নোয়ির শরীর খারাপ হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে ড্রিপ দিয়েছি, ইঞ্জেকশন দিয়েছে, সেরেও গেছে। এবারে কি হলো, কোনো ওষুধে কাজ হচ্ছে না। ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়ে হয়রান। তিন-চার বার ডাক্তার বদলানো হলো, সারার কোনো লক্ষণই নেই। দিন দিন নির্জীব হয়ে পড়ছে স্নোয়ি। কিন্তু তবু আমি এলেই সাড়া দেবে, কোলে উঠবে। সকালে ঠিক আমার সঙ্গে একটু হাঁটবেই।

সেদিন বুধবার সকালে আমি ডাকলাম—'স্নোয়ি চল, বাইরে যাই।'

স্নোয়ি করুণ চোখে তাকালো, কিন্তু নড়লো না। আমার ব্রেকফাস্ট থেকে একটু ওমলেট বা অন্যকিছু ছিঁড়ে দিই স্নোয়িকে। স্নোয়ি অন্যদিন অনেক সময় শুয়ে শুয়েই খেয়ে নেয়। আজ মুখেও তুললো না।

জানি না কোত্থেকে এক অজানা দুঃখ আমার মনে চেপে বসলো। আমি অফিসে যেতে যেতে শিখাকে বললাম—'এগারোটা নাগাদ আমি আবার আসবো। স্নোয়িকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো আবার।'

এগারোটা নাগাদ ফিরে এলাম। আজ প্রথম স্নোয়ির কোনো আওয়াজ নেই। দোতলার শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি, স্নোয়ি অশক্ত শরীর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এলো। আমি স্নোয়িকে বুকে নিয়ে ছাতে এলাম। স্নোয়ির পেছনের পা দুটো অল্প অল্প কাঁপছে!

আগের দিন 'পেটকেয়ারের' ডাক্তার

মজুমদার বললেন—'এর লক্ষণ যা দেখছি, পেটে টিউমার হয়েছে খুব সম্ভব। টিউমার ওষুধে সারবে বলে মনে হয় না, কাটাছেঁড়ার দরকার আছে। শরীরের যা হাল, আর কোনো উপায় থাকলে কাটাছেঁড়ায় যেতাম না। পেটের এক্স-রে আর রক্ত পরীক্ষাটা করিয়ে নিন।'

স্নোয়ির এক্স-রে আর রক্ত পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছিল আগের দিন। বাপ্পা একনাগাড়ে কখনো বেশিদিন থাকে না, এবারে ছুটি আর অফিসের কাজ নিয়ে কদিন থেকে এখানেই আছে। সেও জানে স্নোয়ি ভাল নেই।

আমাদের সাদা বাড়িটার সঙ্গে স্নোয়ির সাদা রঙ খুব সুন্দর খাপ খেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে কেউ এলে বা বেল বাজালে স্নোয়ির আওয়াজ শোনাও সবার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওর প্রায় বারো বছরের জীবনে এই প্রথম স্নোয়ির আওয়াজ, বাড়ির এপাশে-ওপাশে ওর অকারণ অবারণ চলাফেরা বন্ধ হয়ে আসছিল।

পেটকেয়ারের ডাক্তার বললেন—'অপারেশন করে একটা চান্স নিই। আপনি ওষুধপত্তরগুলো নিয়ে আসুন, ততক্ষণে ড্রিপের বন্দোবস্ত করি।'

ওষুধপত্তরগুলো নিয়ে ফিরে আসবার আগেই স্নোয়িকে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে অপারেশন রুমে নিয়ে গেছে। আমি ফিরে এসে কাচের ফাঁক দিয়ে স্নোয়ির ছোট্ট শরীরটা শোয়ানো দেখলাম। ভেতরে যাবার উপায় নেই, কথা বলার উপায় নেই, আমার সাড়া পেলেই স্নোয়ির ছটফটানি বেড়ে যাবে। প্রায় দেড়টা নাগাদ ভেতরে ঢুকানো হয়েছিল, ডাক্তার কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলেন বিকেল চারটেয়। স্নোয়ির কোনো সাড়াশব্দ নেই, ছোট্ট শরীরটা পেটে ব্যান্ডেজ বেঁধে নেতিয়ে পড়ে আছে।

ডাক্তারবাবু দু' হাতের উপর স্নোয়ির নিস্তেজ শরীরটা তুলে এনে আমাকে সঁপে দিলেন। এই প্রথম ওকে কোলে নিতে ভয় ধরলো আমার। যদি অসাবধানে ব্যথা লাগিয়ে দিই!

ডাক্তারবাবু আর কম্পাউন্ডার ছেলেটিকে প্রায় মিনতি করে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে বসিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। স্নোয়িকে পেছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হলো আমার আর শিখার মাঝখানে। পেছনের পা দুটোয় আবার দেখলাম কাঁপন ধরেছে। ডাক্তারবাবু বললেন—'ওর পায়ে শীত লাগছে। কিছু দিয়ে ঢেকে দিন।'

শিখা সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ের চাদরটা দিয়ে স্নোয়ির শরীর ঢেকে দিল। আমি ড্রাইভারকে খুব আস্তে গাড়ি চালাতে বললাম।

বাড়ি থেকে পেটকেয়ার বড়জোর দু' কিলোমিটার। সারাটা পথ স্নোয়ির কোনো শব্দ নেই, ভাবলাম ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়ই, ইঞ্জেকশনের একটা এফেক্ট তো থাকেই।

বাড়ির সামনে যেই গাড়ি থেমেছে, স্নোয়ির গলা থেকে একটা অদ্ভুত করুণ কান্না বেরিয়ে এলো। যেন একটা বাচ্চা মেয়ে অজানা কোনো শারীরিক কষ্ট থেকে করুণ আর্তি জানাচ্ছে। এমন অসহায় কান্না এর আগে কখনো শুনিনি। এক অপরিসীম দুঃখ মনের ভেতর থেকে মোমের মতো গলে গলে বেরিয়ে আসতে চাইলো।

আমি তাড়াতাড়ি স্নোয়িকে অনেক মমতায় বুকে জড়িয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে বসবার ঘরে কার্পেটের উপর শুইয়ে দিলাম। গায়ে জড়িয়ে দিলাম ভারী কম্বল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। একটু পরে ও শান্ত হয়ে চোখ বুজলো। শিখা আর আমি দু'পাশে, স্নোয়ি মাঝখানে নেতিয়ে পড়ে আছে। আমাদের দুজনের মনের ভেতরটা তোলপাড়, শিখার দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে।

একবার চিলেকোঠায় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে এলাম। স্নোয়ি মাঝে মাঝেই কঁকিয়ে উঠছে। ডাক্তার আরেকটা ইঞ্জেকশন দিলেন ব্যথা কমাবার জন্য। মনে হলো স্নোয়ি এবারে ঘুমিয়ে পড়লো।

একটু পরে ডাক্তার আর কম্পাউন্ডার দুজনেই চলে গেলেন। কম্পাউন্ডার আবারো আসবে জানালো। বাপ্পা একবার এসে ঘুরে গেল।

রাত আটটা বাজার একটু পর থেকেই দেখলাম স্নোয়ির শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শিখাকে বললাম, দেখালাম সেটা। শিখা বুঝল সবই, তবু বললো অস্থির না হবার জন্য।

কয়েক মিনিট পর একটা গভীর শ্বাস পড়লো, এরপরেই স্নোয়ির ছোট্ট শরীরটা নিথর। একসঙ্গে বাপ্পা আর কম্পাউন্ডার এসে ঢুকলো ঘরে।

আমি ডাকলাম—'স্নোয়ি।' শিখা ডাকলো—'স্নোয়ি', বাপ্পা ডাকলো—'স্নোয়ি'। এই প্রথম স্নোয়ি আমাদের কারো ডাকে সাড়া দিল না!

বাড়ির কোণার খালি জমিতেই মাটি খুঁড়ে স্নোয়িকে শেষবারের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো। বাপ্পাই প্রথম তার দুই হাতের অঞ্জলিতে ছোট্ট পুতুলের মতো স্নোয়িকে তুলে নিয়েছিল বারো বছর আগে, বারো বছর বাদে আবার বাপ্পার সেই দুই হাত স্নোয়ির ছোট্ট শরীরটাকে তার শেষ শয্যায় শুইয়ে দিল!

একটা তীব্র শোক আমাদের তিনজনকে আচ্ছন্ন করে দিল, একটা অন্তহীন অসহায় ব্যথা দিনের পর দিন আমাদের মনকে নিংড়ে চললো। একটা অনাবিল অফুরন্ত ভালোবাসার প্রস্রবণ স্নোয়ি বারো বছর আমাদের উপর অবিরাম বর্ষণ করে গেছে, আজ হঠাৎ তাতে ছেদ পড়াতে এই উথলে পড়া খেদ!'"

সবাই নিশ্চুপ। দাদা বললেন—'রাত হয়ে গেছে, বাড়ি যাওয়া যাক এবার।'

আজ শুক্লপক্ষের রাত, চারদিকে বেশ সাদা জ্যোৎস্না, এই জ্যোৎস্নার মাঝে আমাদের সাদা রঙের বাড়িটা আরো শ্বেতশুভ্র মনে হচ্ছে। একটা ছোট্ট সাদা নরম তুলতুলে শরীর শুধু আর দু'চোখে আনন্দ ভরিয়ে দেবে না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে শোবার ঘরে এলাম। জ্যোৎস্না আজ জানলা গলে দুধের মতো আমার বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। একি, আমার সাদা বিছানায় কোত্থেকে একরাশ সাদা যুঁইফুল থোকা করে কে রেখে দিয়েছে! আমার মুখটা কাছে নামিয়ে আনলাম, পরম স্নেহে সাদা ছোট্ট একটা জীবন্ত পুতুলের কপোলে ঠোঁট ছুঁইয়ে নিলাম।

শিখা ধরা গলায় বললো—'দেখো, ছোট্ট স্নোয়ি আবার ফিরে এসেছে আমাদের কাছে!'

ছবিঃ সরোজ সরকার

এই ফ্ল্যাটটায় নতুন এসেছে বিলুরা—দিন সাতেকও পুরো হয়নি বলা যায়। তিনতলার এই ফ্ল্যাটটা ঝাঁ চকচকে নতুন। চারদিকে খুব আলো আর হাওয়া। বিকাল থেকে দক্ষিণের বারান্দা আর ঘরের দুটো জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসে। টাটকা, মনে হয় একেবারে সোজা সমুদ্র থেকে আসছে এই বাতাস। ভাল করে ঘ্রাণ নিলে সমুদ্রের গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। বৈশাখ শেষের এই সময়টায়, বিকাল থেকে বাতাসে আবার মেশে ফুলের গন্ধ—শিরিষের। সন্ধ্যের হাওয়ায় সমুদ্রের গন্ধের সঙ্গে শিরিষ ফুলের গন্ধ মিশে যে সুবাস তৈরি হয় তাতে বিলুদের গোটা ফ্ল্যাটটা ম-ম করে ওঠে। বুক ভরে ওরা শ্বাস নেয়—বাবা, মা এবং বিলু।

বিলুদের বারান্দার সামনেই একটা মস্ত বড় শিরিষ গাছ। রাস্তার ধারে অনেকটা জায়গা দখল করে ও রাজার মতো দাঁড়িয়ে। গাছটা শুধু দাঁড়িয়ে থাকে না, সে তার ডালপালা দিয়ে বিলুদের বারান্দাটা ছুঁতে চায়। জোর হাওয়া ওঠে যখন, গাছটা তার সবুজ সবুজ সরু সরু আঙুল দিয়ে বারান্দাটাকে আদর করে। ফুলে ফুলে এখন ভরা ওর সারা দেহ। নরম হালকা-গোলাপি পাপড়ির আড়াল থেকে ফুলের রেণু বাতাসের দোলায় দোলায় চারিদিকে ভাসতে থাকে।

এ পর্যন্ত সবই ভাল ছিল। নতুন ফ্ল্যাটের ছিমছাম চেহারা, দক্ষিণের বারান্দা, বারান্দার ওপার থেকে আসা হু-হু হাওয়া, শিরিষ ফুলের গন্ধ, তার ডালপালার লুটোপুটি—এ সব নিয়ে বিলুরা মহা খুশি। কিন্তু গোল বাধিয়েছে আবার ওই শিরিষ গাছটাই। ওর বুকের আড়ালে তিন-চারটে কাকের বাসা। মনে হয় এ তল্লাটের সব কাকের আস্তানা ওই গাছটা। সারা দিন তাই শিরিষ গাছের ডালে ডালে কাকেদের ওঠা-বসা, চিৎকার-চেঁচামেচি, তর্ক-বিতর্ক এবং সতর্ক পাহারা। পাহারা নিশ্ছিদ্র কারণ বাসাগুলোতে কাকেরা বোধহয় ডিম পেড়েছে। আর সে ডিমে পালা করে তা দিয়ে চলেছে ওরা—কখনও বাবা-কাক, কখনও বা মা-কাক।

সারা দিন কাকেদের কর্কশ ডাকে কান ঝালাপালা। তাও মেনে নিয়েছিল বিলুরা। কিন্তু ওদের দাবি যে আকাশছোঁয়া। বারান্দাটাতে কাউকে যেতে দেবে না ওরা। কিছুতেই দেবে না। দল বেঁধে ওরা বারান্দাটাকে আগলে রাখে। কোনও কাজে বিলুরা ওখানে কেউ গেলে অকস্মাৎ শূন্য থেকে ঘুড়ির গোঁত্তার মতো নেমে আসবে কাকের শক্ত ঠোঁট জোড়ার আঘাত। কখনও মাথায়, কখনও ঘাড়ে। আর এতই আকস্মিক এই ছোঁ মারা ঢঙের গোঁত্তা যে এটাকে এড়াবার কোনও প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। আক্রমণ আসে হঠাৎ হঠাৎ এবং অবিরল। কাকেরা কাউকে ছাড় দেয় না। বিলুর বাবাকে ইতিমধ্যে চার বার তারা ঠোক্কর মেরেছে, মাকে সাত বার। এমনকি বিলু ছোট হলেও ওরা তাকে ছেড়ে দেয়নি। তার মাথায় দু' দিন ঠুকরিয়ে গেছে প্রহরী কাক। তবে বিলুর বেলায় কাকেরা কিছুটা সদয়। ওদের ঠোক্কর তার চুল ছুঁয়ে গেছে মাত্র।

কাকতাড়ুয়া

অংশুমান বসু

'এ তো মহা মুশকিল হলো', বিলুর মা বলেন, 'বারান্দায় কারও যাবার জো নেই। গেলেই কাকে ঠোক্কর মারবে।'

'তাই তো।' বিলুর বাবার চিন্তিত মুখ। 'মজা হলো কাকগুলো সামনাসামনি তোমায় আক্রমণ করবে না। সব সময় চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাবে। কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঠোক্কর দিয়ে যাবে, একটুও বোঝার সময় দেবে না।'

'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি একটা না একটা কাক ছাদের কার্নিশে অথবা পাশের বাড়ির ছাদে নিঃশব্দে বসে থাকে। যেই কেউ অসতর্ক হয়ে বারান্দায় দাঁড়াল, বা কোনও কাজ করতে গেল, অমনি ঝোপ বুঝে কোপ। রাজ্যের নোংরা খাওয়া ঠোঁটের ঠোক্কর—এ্যামা, ভাবলেই গা গুলিয়ে ওঠে।'

'ঠিকই বলেছ।' বিলুর বাবা মাথা নাড়েন। 'আমি বলি কি এই পরিস্থিতিতে বারান্দায় আমাদের যাবার দরকার নেই কিছু।'

'তাই কী হয়?' বিলুর মা প্রতিবাদ করেন। 'এ বাড়ির বারান্দাটাই তো আসল আকর্ষণ। তাছাড়া সেখানে কত কাজ! ওখানে ছাড়া কাপড় শুকোতে এ বাড়িতে আর কোথায় দেব বল? ফুলগাছগুলোই বা থাকবে কোথায়? এদিকে কাপড় দিয়েও অবশ্য রক্ষে নেই। কোথা থেকে পচা মাছের গলা নাড়িভুঁড়ি, মাংসের হাড় অথবা ছাতা ধরা পাঁউরুটির টুকরো বারান্দায় এনে ওরা ফেলবে। তখন আবার সব পরিষ্কার করো। এমনকী ফুলগাছগুলোকে পর্যন্ত ঠুকরে ঠুকরে ছিঁড়ে দেয়। এমন অসভ্য বদমাইশ কাক আমি আর কখনও দেখিনি বাপু। আমাদের ওপর ওদের কেন যে এত আক্রোশ, কে জানে!'

বিলুর বাবা বিলুর মাকে সমর্থন করেন। 'এতদিন এই বারান্দায় লোকজন কেউ আসত না। তাই ওরা ধরে নিয়েছে এটা পুরোপুরি ওদের রাজ্য। এখন আমরা যাচ্ছি, সেটা ওদের আদৌ পছন্দ হচ্ছে না।'

'তাই হয়তো হবে। ওরা আমাদের ভয় পাচ্ছে—ওরা ভাবছে আমরা ওদের শত্রু।'

'তাহলে ওদের বন্ধু করে নাও। খাবার-টাবার দিয়ে; ভাল-মন্দ খাইয়ে, ওদের ভয় ভাঙাও।' বিলুর বাবা হাসতে থাকেন।

কাক নিয়ে কথা এই পর্যন্তই হলো। সকাল থেকে সবারই অনেক কাজ—বাবার বাজার যাওয়া, দুধ আনা, খবরের কাগজে চোখ বোলানো, অফিসে যাবার তাড়া; মায়ের রান্না করা, খেতে দেওয়া, বিলুকে তৈরি করে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া। কাক নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই!

কাক নিয়ে শেষ পর্যন্ত মাথা কিন্তু ঘামাতেই হলো। আজ সকালে বিলুর বাবাকে এবং বিকালের মুখে ওর মাকে অজ্ঞাতস্থান থেকে বিনা ভূমিকায় উড়ে এসে কাকে ঠোক্কর মেরেছে। ঠোক্কর খেয়ে বিলুর বাবার মাথার চামড়া খানিকটা কেটে গেছে। এদিকে মা আর একটু হলে টবে পা বাধিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুটো চেয়ার বারান্দায় টেনে নিয়ে বিলুর বাবা-মা এই নিয়েই আলোচনা করছিলেন। বিলুও সেখানে ছিল। রাত্রিটা এ বারান্দায় নিরাপদ। সন্ধ্যে থেকে কাকেরা হয়তো ঘুমোয়। চেঁচায় না বিশেষ। ওড়া-উড়িও নেই। অর্থাৎ ওরা গাছছাড়া হয় না কেউ। এমন নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে বিলুর মা প্রথমে কথা তুললেন। 'আর তো বাপু পারা যায় না। আজ তো আর একটু হলেই আমার মাথা ফাটত। তোমারও তো মাথায় ক্ষত করে দিয়েছে। এর কোনও বিহিত কি করা যায় না?'

'কি বিহিত করা যায় বলো? গাছটা কেটে দিই?'

'গাছ কাটবে কিগো!' বিলুর মা ভীষণ অবাক। 'এত সুন্দর গাছটাকে কাটার কথা তোমার মাথায় এল কী করে? তাছাড়া গাছটাকে কাটলে পাড়ার লোক তোমায় জেলে পাঠাবে।'

'গাছটা কাটা পড়ুক আমিও চাই না।' বিলুর বাবা অপ্রস্তুত জবাব দেন। 'কিন্তু গাছটা এখানে থাকলে কাক তাড়ানো যাবে কী ভাবে?'

'কাক তাড়াবার কত রাস্তা আছে, তুমি সেই সব নিয়ে ভাবো। আমার তো মনে হয় পটকা ফাটিয়ে অথবা গুলতি চালিয়ে অনায়াসেই কাক তাড়ানো যায়।'

বিলুর বাবা মাথা নাড়েন। 'গাছে যখন একবার ওরা বাসা বেঁধেছে, তখন এত সহজে ওরা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া একটা-দুটো কাকের ব্যাপার তো নয়, কাকেদের অন্তত কটা ফ্যামিলি ছানাপোনা নিয়ে ওখানে থাকে। সম্ভবত পাড়ার কাকেরাও এখানে রাত কাটাতে আসে। ওরা সারা দিন এখানে আড্ডাও দেয়। ওদের স্কুল-কলেজ-অফিস-কারখানা সব এই গাছটাতে।'

হাসতে গিয়েও হাসেন না বিলুর মা। তিনি স্বামীকে সমর্থন করেন। 'ঠিকই বলছ। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। হাত গুটিয়ে থাকলে বারান্দার স্বত্ব আমাদের পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে।'

'আচ্ছা দেখি।' বিলুর বাবা কাক প্রসঙ্গে ইতি দেন।

সপ্তাহের শেষ দিন অফিস থেকে ফেরার সময় বিলুর বাবা ডজন খানেক পটকা কিনে ফেললেন। একটা গুলতিও কিনলেন। গুলতিতে ব্যবহারের জন্য সিসের বুলেটও নিলেন। কাক বাছাধনদের ভালমতো শিক্ষা এবার দিতে হবে।

পরের দিন ছুটি থাকায় তাড়াহুড়ো ছিল না। চা-জলখাবার পর্ব শেষ হতে বিলুকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাবা মহোল্লাসে পরপর দুটো পটকা শিরিষ গাছ তাক করে ফাটালেন। বিকট শব্দে নিস্তব্ধ পাড়াটা কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কাকের দল কা-কা করে চক্রাকারে উড়তে লাগল। দুটো বাসা থেকে কেউ উড়ল না। কাক বাবা-মারা বাসাতে থেকে এবং আশেপাশের ডালে লাফালাফি করে পরিত্রাহি চিৎকার করে গেল। তখনকার মতো বিরতি দিলেও ঘণ্টাখানেক পরে বিলুর বাবা আবার পটকা ফাটালেন। কাকের দল মাথার ওপর উড়তে উড়তে প্রতিবাদ জানিয়ে চলল। কিন্তু তাদের কেউ আস্তানা ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখাল না। হতাশ বিলুর বাবা আবার বোমা ফাটাতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। বিলুর মা দরজা খুলতেই চার-পাঁচজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন।

'আমরা এই পাড়াতেই থাকি।

আপনাদের প্রতিবেশী। ইনি ঘোষালবাবু, আপনাদের এই বাড়িতেই পিছন দিকের দোতলায় থাকেন।'

বিলুর বাবা-মা হাত তুলে নমস্কার করেন। 'বসুন, বসুন। আপনাদের সঙ্গে এখনও আলাপ করা হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছে ছিল আজকে করব। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া কাকগুলোর জ্বালায় আমরা একান্ত অসামাজিক হয়ে যাচ্ছি।'

'কাক আপনাদের কী করল আবার?' প্রতিবেশীদের চোখে-মুখে বিচিত্র ভঙ্গি ফুটে ওঠে।

'এই শয়তানগুলো আমাদের সব শান্তি কেড়ে নিয়েছে।' বিলুর বাবা কাকেদের হাতে ওঁদের হেনস্থার বিবরণ দিতে থাকেন। বিলুর মা যান চা আনতে।

আগন্তুকরা উৎসাহের সঙ্গে সব কিছু শোনেন। অনেকের মুখেই মজা পাওয়ার ভাব। দু'একজন মুখ টিপে হাসেনও। ঘোষালবাবু আগাগোড়াই গম্ভীর ছিলেন। তাঁর ফ্ল্যাট উত্তরমুখো। এ সব ঝামেলা তাঁর নেই। সব শুনে আরও গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, 'তা বলে আপনি পটকা ফাটিয়ে পাড়াসুদ্ধ লোকের শান্তি নষ্ট করতে পারেন না। তাছাড়া আপনি যে পটকা ফাটিয়েছেন তার শব্দমাত্রা ৬৫ ডেসিবেলের বেশি ছিল। এতে আপনি মহামান্য হাইকোর্টের আদেশও ভঙ্গ করেছেন। আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কেস অনায়াসেই হতে পারে।'

বিলুর বাবা বা মা কেউই এতসব ভাবেননি। তাঁরা শুধু কাকেদের উৎপাত থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিলুর বাবাকে কথা দিতে হলো আর পটকা তিনি ফাটাবেন না। এমনকী ধানী পটকাও নয়। বিলুর বাবা একবার গাছটাকে কেটে ফেলার, না হলেও অন্তত ডালপালাগুলোকে ছেঁটে ফেলার কথা তুলেছিলেন। প্রস্তাব শুনে সবাই এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে হৈ হৈ করে উঠলেন যেন মনে হলো, বিলুর বাবা বুঝি তাঁদের কাউকে খুন করার কথা বলছেন।

প্রতিবেশীরা চলে যেতে বিলু শুকনো মুখে ঘরে ঢোকে। বাবাকে লোকগুলো যা ইচ্ছে বলে গেল এটা ওর ভাল লাগেনি। সে একটু ইতস্তত করে বলে, 'বাপী, আমার বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ব? এতে তো আওয়াজ বেশি হয় না।'

দুঃখের মধ্যেও বিলুর বাবা হাসেন। 'না বাবা, আর শব্দ করে দরকার নেই। তাছাড়া তোমার খেলনা বন্দুকের আওয়াজে একটা কাকও উড়বে না।'

'তাহলে কী করবে?' চিন্তিত মুখে বিলু জিজ্ঞাসা করে।

'তাই তো ভাবছি, সোনা।'

সেদিনই দুপুরের দিকে বিলুকে কাক ঠোক্কর মারল। এবার জোরের ওপরেই বলা যায়। উদ্বিগ্ন মা ওর মাথায় ডেটল লাগাতে লাগাতে বিলুর বাবাকে বলেন, 'কী করে এই হতভাগাদের সহ্য করা যায় বলো!'

বিলুর বাবা একটিও কথা না বলে বারান্দায় চলে যান। তাঁর হাতে কালকের কেনা গুল্‌তিটা। বিলুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন, 'দু' চারটে কাককে আজ শেষ করবই। দেখা যাক, হতভাগাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচা যায় কিনা।'

'ওঃ বিলুটাকে এত জোরে ঠুকরিয়েছে যে বেচারির মাথাটা ফুলে গেছে।'

'হুঁ।' বিলুর বাবা একটা কাকের দিকে গুল্‌তি বাগিয়ে ধরেন।

কাকটা কি কিছু টের পেল? সে হঠাৎ কা কা করে পাশের বাড়ির কার্নিশে গিয়ে বসল। বিলুর বাবা অন্য একটা কাককে টার্গেট বাছেন। তারপর গুল্‌তি চালান। গুল্‌তির ছোঁড়া গুলিটা কাকটার অনেক পাশ দিয়ে কোথায় চলে গেল বোঝা গেল না। বিলুর বাবা আবার গুল্‌তি ছোঁড়েন। এটাও মিস ফায়ার হলো। তৃতীয়বার গুল্‌তি চালানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে কোনও বাড়ির কাচ ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল।

'কে রে? কে কাচ ভাঙল?' গাছের পিছন দিকের একটা বাড়ি থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

বিলুর বাবা বারান্দায় আর দাঁড়ান না। চট করে গুল্‌তি সহ ঘরে ঢুকে আসেন।

শিরিষ ডালের ফাঁক দিয়ে সামনের বাড়ির জানালায় একটা রাগী মুখ দেখা যায়। 'কে রে ইঁট ছুঁড়ল? আরে এ তো ইঁটের টুকরো নয়, লোহার বল। কোনও হতচ্ছাড়া পাখি মারার জন্য গুল্‌তি চালিয়েছে! ধরতে পারলে ব্যাটাকে চালান করে ছাড়ব।'

'আর নয়।' বিলুর বাবা গুল্‌তিটা তোরঙ্গে ঢোকান। কাক তাড়ানোর দ্বিতীয় অভিযানের এখানেই ইতি হলো।

পরের কটা দিন একটু শান্তিতে কাটল। বিলুরা কেউ অস্ত্র ছাড়া বারান্দায় যায় না। একটা লম্বা ঝুলঝাড়ু ওদের অস্ত্র। এক হাতে ঝুলঝাড়ু দেখিয়ে ওরা বারান্দায় যায় আসে, এটা-ওটা কাজ সারে, শিরিষের ফুল ঝরা দেখে আর দেখে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকজন। কাক এখন ওদের ভয় পায়। ঝুলঝাড়ুটার ধারে-কাছে আসে না। ঝাড়ুটাকে বারান্দার কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো কাকতাড়ুয়া হিসাবে।

সেদিন সকালে বারান্দা থেকে সেদিনকার কাগজটা তুলতে গিয়ে বিলুর বাবা যেই নিচু হয়েছেন, অমনি ঠোক্কর পিঠে। তাড়াতাড়ি ঝুলঝাড়ুটা নিতে গেলেন তিনি। কোথায় ঝুলঝাড়ু? একটা লম্বা ডাঁটির মাথায় কটা মাত্র আঁশ লেগে আছে। বাকি সব উধাও। এটা কি ঝুলঝাড়ু? বোঝা গেল কাকেরা শত্রুকে ঘায়েল করতে নৃশংসভাবে এর কেশর-গুলোতে ঠোঁট চালিয়েছে।

'বাবা।'

বিলুর ডাকে ওর বাবা ঘুরে তাকান।

'আমরা কাকেদের কাছে হেরে গেলাম।'

'তাই তো মনে হচ্ছে, সোনা।'

'না, কিছুতেই হারা চলবে না।' বিলুর মা উঠে আসেন।

'আর কী করব বল?'

'কেন, কাকেদের বাসাগুলো ভেঙে দিতে পার না?'

'বাসা ভাঙব? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? গাছে উঠে যে ওদের বাসা ভাঙতে যাবে, তাকে কি কাকেরা ছেড়ে দেবে ভেবেছ? ঠুকরে ঠুকরে তাকে শেষ করে দেবে একেবারে। আর আমি তো জীবনে কোনওদিন গাছেই উঠিনি।'

বিলুর বাবা থামতেই বিলুর মা তাঁকে প্রায় ধমকে উঠলেন। 'তোমায় গাছে চড়তে কে বলেছে? এসব তোমার কর্ম

নয়, তা আমি জানি।'

বিলুর বাবা পরিহাসের সুরে বলেন, 'তবে কি তুমি নিজেই গাছে উঠবে?'

'দরকার হলে নিশ্চয় উঠব। তবে দরকার হবে না। তোমার ভরসায় না থেকে আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ছোড়দাকে গিয়ে কাল সব কথা বলতে ছোড়দা বলেছে, ওর ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্ট লোক পাঠিয়ে দেবে। সেই লোকই সব কটা কাকের বাসা ভেঙে দেবে। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সব কটাকে বাস্তুহারা করতে পারলে তবে আপদ শান্তি হবে।'

'ওরা যদি এতেও না যায়?'

বিলুর বাবার আশংকা কাটান বিলুর মা। 'যাবে, যাবে। বাসা আছে বলেই কাকেরা শিরিষ গাছটা ছাড়তে চায় না। বাসাতে ছেলেপুলে আছে, তাই ওরা সব সময় পাহারায় থাকে। ধারে-কাছে কাউকে দেখলেই আক্রমণ করে। বাসা ভেঙে দিলে, বাছাধনরা বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় আস্তানা গাড়বে। তুমি দেখে নিও।'

বিলুর বাবা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করেন না। মুখে বলেন, 'দেখা যাক, তোমার আর তোমার ছোড়দার হাতযশ কেমন। এতদিনে যদি তোমরা হতচ্ছাড়াগুলোকে তাড়াতে পার, তবে তোমাদের জয়গান নিশ্চয় গাইব। তা তোমার দাদার লোক আসবে কবে?'

'সামনের সপ্তাহের যে কোনও দিনই আসতে পারে। এ রবিবারেও আসতে পারে।'

বিলুর ছোটমামা নিজেই বনবিভাগের অফিসার। তাঁর জানাশোনা এবং ক্ষমতা—দুটোতেই বিলুদের অগাধ আস্থা। ওরা তাই আশ্বস্ত বোধ করে। শেষ পর্যন্ত পাজী কাকগুলোকে সত্যিই হয়তো তাড়ানো যাবে।

পরের দিন বিলুদের ইস্কুলে কিসের জন্য ছুটি ছিল। বিলুর খুব আনন্দ তাই। সকাল থেকে মা রান্নাঘরে ব্যস্ত আর এদিকে বিলু গোয়েন্দা গল্প গিলতে থাকে। পড়তে পড়তে ওর মনে হচ্ছিল গোয়েন্দা হওয়াই ভাল। গোয়েন্দারা কেমন বুদ্ধির জোরে সব সঙ্কটের সমাধান করে। সেই

সঙ্গে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুর্ধর্ষ খুনী-ডাকাতদের ঠিক পাকড়াও করে। আচ্ছা, গোয়েন্দারা তাদের কাক-সঙ্কটের সমাধান করতে পারে না? কোন গোয়েন্দা এ কাজ ঠিক ঠিক পারবে? গোয়েন্দা রিপের মতো অকম্মা, নামেই খালি গোয়েন্দারা অবশ্য এ সঙ্কট সমাধান করতে পারবে না। ম্যানড্রেক বা ব্যাটম্যানের মতো কেউ হলে অন্য কথা। অরণ্যদেবও পারেন। কিন্তু তিনি আবার কাকেদের বিরুদ্ধে কিছু করবেন কি না সন্দেহ। তাছাড়া এরা আবার কেউ গোয়েন্দাও নন।

রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায়। কী বিক্রি করছে। বিলু দেখতে ওঠে। বারান্দার দরজায় দাঁড়াতেই শিরিষ গাছটা চোখে পড়ে। কী সুন্দর গাঢ় সবুজ গাছটা। কিন্তু এই গাছটাতেই যত অশান্তির বাসা। বিলুর চোখে পড়ে বারান্দার উল্টো দিকের ডালে একটা কাকের বাসা। কাক-বাবা অথবা কাক-মা গলাটি বাড়িয়ে সেখানে বসে আছে। ডিমে তা দিচ্ছে নাকি? হয়তো বা ডিমফোটা বাচ্চাদের পাহারা দিচ্ছে। কাকেদের একটা বেশ মজা আছে। ওদের ছেলে-মেয়েতে ভেদ কম। মা-কাক ডিমে তা দেয়, বাবা-কাকও দেয়। পালা করে তা দেয় ওরা। বাচ্চাদের জন্য খাবার খুঁজেও কি দুজনে আনে? নিশ্চয় তাই।

আরে, এখানেও তো আর একটা কাকের বাসা। বারান্দার কাছেই বলা যায়। এ বাসাটায় কেউ নেই নাকি? কিন্তু পাশের ডালে একটা কাক বসে আছে। সতর্ক চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখছে। এই বাসাটায় কোনও কাক ডিমে তা দিচ্ছে না তো! তার মানে কি এটাতে ডিম ভেঙে কাকের বাচ্চারা বেরিয়ে এসেছে? ওমা, ওই তো একটা বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট কালো মুখটা বাড়িয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে। এর কী এখনও চোখ ফোটেনি? ওমা, বাচ্চাটা কেমন ঠোঁট ফাঁক করেছে। ওটা কি ওর মাকে চাইছে? ওর নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। বাচ্চাটা কী সুন্দর। কী টকটকে লাল ওর মুখের ভিতরটা, একদম টাটকা জবা ফুলের মতো। এ রকম একটা বাচ্চা কাক পুষতে পারলে হতো। দূর, কাক কেউ পোষে নাকি আবার! হ্যাঁ, পোষে। বিলু তার বাবার কাছে শুনেছে কাকেদের একটা প্রজাতির গায়ের রং নাকি পাতিকাকের মতো হলেও তা একটু অন্য রকম। তাদের চোখের মণি সাদাটে যা কাক সমাজে দুর্লভ। তা ছাড়া সবচেয়ে আশ্চর্যের, এই জাতীয় কাকের কণ্ঠস্বর মিষ্টি এবং এরা পোষ মানে। শুধু তাই নয়, এরা ময়না পাখির মতো কথা বলতেও শেখে। এমন একটা কাক পেলে বিলু, নিশ্চয় পুষবে। ওকে কথাও শেখাবে।

আচ্ছা ছোটমামা তো কদিনের মধ্যেই লোক পাঠাবে। সে লোক এসে সব কটা কাকের বাসা ভাঙবে। গাছ থেকে একটা একটা করে বাসাগুলোকে মাটিতে আছড়ে ফেলবে। আছড়ে ফেললে, কাকেদের ডিমগুলো সব ভেঙে যাবে। দু' চারটে কোকিলের লুকনো ডিম থাকলে তাও ভাঙবে। কিন্তু এই বাচ্চাগুলোর কী হবে? ওরা তো এখনও উড়তে শেখেনি। পালাতেও পারবে না তাই। ওদের মা-বাবাই বা কেমন করে ওদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে? ওদের কচি কচি লাল লাল মুখগুলোতে সারা দিন খাবার যোগাবে কি করে! খাবার না পেলে বাচ্চাগুলো সব মরে যাবে। সে বড় নিষ্ঠুর ব্যাপার হবে। না না, এত সুন্দর বাচ্চাগুলোকে বাসাছাড়া করা চলবে না।

ওদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে এদের সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আহা, বিলু যদি সুপারম্যান হতো! ও তাহলে কাক বাবা-মা ও তাদের বাসা সমেত বাচ্চাগুলোকে অন্য কোনও নিরাপদ জায়গায়, অন্য কোনও বড় গাছে রেখে আসত। এতে কাকেদেরও ক্ষতি হতো না আবার বিলুরাও নিরাপদে বারান্দাটা ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু না, বিলু কোনও সুপারম্যান নয়। এমনকী সে এখনও ম্যানও হয়নি। বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে ও তাই কিছুই করতে পারবে না। ওর নিজেকে খুব অসহায় লাগে।

রাত্রে খেতে বসে বিলু ডাকে, 'মা।'

'কি সোনা?' বিলুর মা সাড়া দেন।

'কাকেদের বাসাগুলো না ভাঙলে হয় না?'

'কি বলছিস রে তুই? ওদের বাসা না ভাঙলে বারান্দায় আমরা কেউ যেতে পারব না। গেলেই ওদের ঠোক্কর খেতে হবে।' বিলুর মা নরম করে বলেন।

'কিন্তু মা, কাকেদের বাচ্চাগুলো কোথায় যাবে তখন? ওরা যে এখনও উড়তে শেখেনি। তুমি দেখেছ—কী সুন্দর লাল টকটকে ওদের মুখের ভিতরটা? কেমন ওরা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখার চেষ্টা করে? এত বাচ্চা—এদের কেন তাড়াবে, মামণি?'

বিলুর কথায় ওর মা চুপ করে যান। ওঁর মনে পড়ে বিলু হবার পর ওঁদেরও ঘর ছাড়ার নোটিশ ধরিয়েছিল ওঁদের তখনকার বাড়িওয়ালা। শুধু নোটিশ নয়, পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে গুণ্ডা দিয়ে মেরে বের করে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। বাচ্চা বিলুকে দেখিয়ে বিলুর বাবা সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু সময় দেয়নি নির্দয় লোকটা। এর পর ছোট্ট বিলুকে নিয়ে ওর বাবা-মা সেই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিলুরা মামার বাড়িতে আর বিলুর বাবা মালপত্র সমেত একটা দোকান ঘরে কোনওমতে থেকেছিলেন। তাই তো! কোলের বাচ্চা বিলুকে নিয়ে যে সঙ্কটে তাঁরা পড়েছিলেন, সেই একই সঙ্কটে, হয়তো বা আরও বেশি সঙ্কটে পড়বে এই হতভাগা কাক-পরিবারগুলো। কিন্তু ভালমানুষির মর্ম তো নচ্ছারগুলো বুঝবে না। ওদের ছেড়ে দিলেই ওরা যথারীতি বারান্দা নোংরা করবে এবং ঠোক্কর মেরেই যাবে। না না, এদের কোনোমতেই দয়া দেখানো যায় না। 'কোথায় যাবে কাকেরা, তা আমাদের দেখার কথা নয়।' শক্ত গলায় বিলুর মা সিদ্ধান্ত জানান।

'মা, তুমি কচি বাচ্চাগুলোর কথা ভাববে না?' বিলুর কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ে।

'ওরা কি আমাদের কথা ভেবেছে যে আমরা ওদের কথা ভাবব?'

'আহা ওরা হচ্ছে প্রকৃতির ঝাড়ুদার। ওদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়?' বিলুর বাবা এবার বলে ওঠেন।

বাবার কথায় বিলুর মনে আশা জাগে। 'বাপী, কচি বাচ্চাগুলোর কী হবে?'

'ব্যবস্থা কিছু হয়ে যাবে, বিলুবাবু। তোমার বন্ধুদের আমরা তাড়াব না। আমার মাথায় সমস্যা সমাধানের একটা ভাল উপায় হঠাৎ এসে গেছে।'

'কী, কী উপায়?' বিলু লাফিয়ে ওঠে।

বিলুর মা ভ্রূকুটি করেন, 'ঢং না করে বল না কী করে সমস্যার সমাধান তুমি করবে। ছোড়দার লোক তো যে কোনওদিন এসে যাবে।'

'আমি ভাবছি বারান্দায় একটা গ্রীল দিয়ে দেব। গ্রীল থাকলে কাকেরা আমাদের আর ঠোক্কর মারতে পারবে না। বারান্দাও নোংরা হবে না। এতে পুরো শিরিষ গাছ নিয়ে ওরা নিশ্চিন্তে থাকবে, আর আমরাও বারান্দায় নিশ্চিন্ত থাকব।'

বাপী থামতেই বিলু চিৎকার করে ওঠে, 'সহাবস্থান—দি আইডিয়া।'

বিলুর মার মুখেও হাসি ফোটে। তিনিও সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছেন। 'এই উপায়টার কথা এতদিন বলতে পারলে না? কালকেই গ্রীলের অর্ডার দেবে। আর হ্যাঁ, কাল ছোড়দাকে লোক পাঠাতে বারণ করে দিও।'

সে রাত্রে বিলু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, ও একটা ছোট্ট কাকের বাচ্চা পুষেছে, আর তার কালো ঠোঁট জোড়া ফাঁক করে আস্তে আস্তে ডিমের কুসুম খাইয়ে দিচ্ছে।

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

পথনির্দেশ

বীরেন সাহা

যাবেন কোথায়—কালিকাপুর?
এই তো কাছেই, বেশি নয় দূর।
যাওয়া চলে হাঁটা পায়ে,
মিনিট কুড়ি চললে বাঁয়ে।
একটু গেলে পাবেন পুকুর,
পাশেই থাকেন ভবনাথ শূর।
তাঁর দোকানে খাস্তা গজা,
নেবেন খেয়ে দারুণ মজা।
পুবে এগোলে ধাপড়া হাট,
বেচাকেনায় সে জমজমাট।
তার উত্তরে আর মিনিট চার,
ডিঙি চড়ে যান নদীর পাড়।
চর হেঁটে গেলে কাঁঠালবাড়ি,
চেপে বসে যান ভ্যানগাড়ি।
মিনিট পাঁচেক কালিকাপুর,
খুবই কাছে, কী এমন দূর!

মৎস্যশিকারী

মুস্তাফা নাশাদ

দস্যি দামাল
সাবির জামাল
ভর দুপুরে
গোল পুকুরে
ছিপটি ফেলে,
চক্ষু মেলে
রইল চেয়ে,
আসবে ধেয়ে
কাতলা পুঁটি,
মৃগেল দুটি।
পড়লে ধরা,
ঘুচবে খরা।
মৎস্য মারার
বাহবা সবার
পাবে সাবির—
মস্ত এ বীর!
ভাবছে যখন,
উঠল তখন
ছিপে চাঁদুর
চটি দাদুর!

ছবিঃ সুফি

শেষ লড়াই

কাহিনী ও চিত্ররূপ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

গ্রামের মধ্যে এইরকম একটা দোকান অস্বাভাবিক।
ইস! খেতে ইচ্ছে করে না। যত দিন যাচ্ছে এই দোকানের খাবার দেখছি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
ভীমার দোকান বাবা! ঝামেলা কোর না, চুপচাপ খেয়ে নাও।
আগন্তুক এসে দাঁড়াল।
আসুন স্যার....আসুন....বসুন, কী খাবেন স্যার... এখানে সব পাবেন
জগ্গুকে পাওয়া যাবে?
জগ্গু! ও নামে এখানে কেউ নেই....
খাবেন না তো কেটে পড়ুন এখান থেকে।
কেটে পড়ার ইচ্ছে আমার নেই। সময়ও নেই!
ওঃ!
!

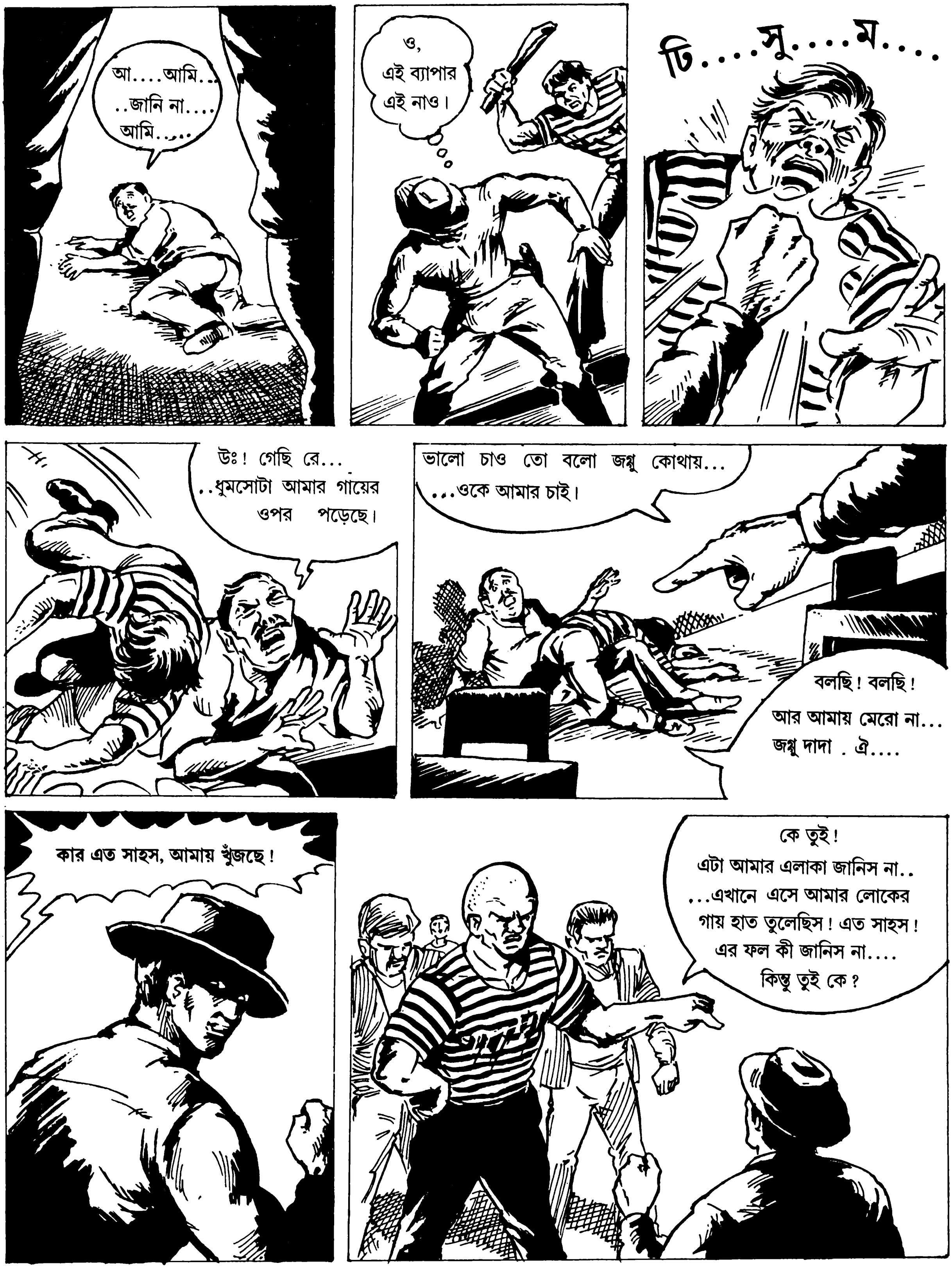
আ....আমি...
..জানি না.....
আমি.....
ও,
এই ব্যাপার
এই নাও।
টি....সু....ম....
উঃ! গেছি রে...
..ধুমসোটা আমার গায়ের
ওপর পড়েছে।
ভালো চাও তো বলো জম্বু কোথায়...
...ওকে আমার চাই।
বলছি! বলছি!
আর আমায় মেরো না...
জম্বু দাদা . ঐ....
কার এত সাহস, আমায় খুঁজছে!
কে তুই!
এটা আমার এলাকা জানিস না..
...এখানে এসে আমার লোকের
গায় হাত তুলেছিস! এত সাহস!
এর ফল কী জানিস না....
কিন্তু তুই কে?

এই যে!
এবার আমায় চিনতে পারছো?
এ....একী! ইনসপেক্টার!
তু....তুমি বেঁচে....
কী করে....তু....তুমি....
হ্যাঁ আমিই!
ভেবেছিলে এক গুলিতেই আমি খতম! ভুল করেছিলে জগ্গু দাদা
....ভুল করেছিলে....
বেশ, বেশ! এবার তাহলে সেই ভুলটা শুধরে নেওয়া যাক....
কী বলো....
ওকে গুঁড়িয়ে দাও
আজ তোর খেল খতম!
কেন মিছিমিছি এদের বিপদে ফেলছো জগ্গু!
আমার তো শুধু তোমাকে হলেই চলবে!
চুপ!

ই-য়া-য়া-!
তোমাদের আরো চটপটে হওয়ার দরকার বুঝেছো!
দমাস
সবাই মিলে ওকে মারো। খতম করে দাও।
অনেক সহ্য করেছি....আর নয়....
!
টিসুম
এতেই হবে।
অ্যাঃ!

এবার ওকে শেষ করে দেওয়ার দরকার....
আহ!
দুঃখিত জম্বু। আমি তৈরি হয়েই এসেছি
ক্র্যাক
আর কোনো চালাকি করতে গেলে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবো।
বস! পুলিশ!
বাঃ, ঠিক সময়ে এসে গেছে।
শয়তানটাকে কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। এতদিনে আপনার জন্যে পারলাম। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!
আমার কাজ শেষ! ওর সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ লড়াই। চলি ইনসপেক্টার!
চল রকি! এবার এক কাপ কফি খেতে হবে!

শেষ

ভিক্ষু

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

গল্পটা আমার বাবা ৺সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় আমায় ছোটবেলায় বলেছিলেন। ঠিক গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ১৮৯৩ সালে সাহেবগঞ্জের গঙ্গার ঠিক ওপারে মণিহারী গ্রামে প্রথম অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে বাবা প্র্যাকটিস শুরু করেন। বিহারের ঐ অজ গ্রামে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর খুবই কষ্ট হয়েছিল। ক্রমে নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও সুচিকিৎসার জন্যে গ্রামের মানুষদের কাছে উনি নিকট আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন।

মণিহারীতে এক এক ঋতুতে গঙ্গার এক এক রূপ। বর্ষাকালে ভরা গঙ্গায় এপার ওপার দেখা যায় না। কেবল ওপারের দূর পাহাড়টা যেন নীল হয়ে আকাশের নীলে মিলিয়ে গেছে। সকাল-সন্ধ্যে স্টিমার আসত, তাতে করে সকরিগলি ঘাট হয়ে ট্রেনে করে সাহেবগঞ্জ যেতে হতো। জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত গঙ্গা শুকিয়ে দু'ভাগ হয়ে যেত। মাঝখানে বিরাট চড়া। স্থানীয় লোকরা বলে, দিয়াড়া, তখন তাড়াতাড়ি সাহেবগঞ্জে গিয়ে পৌঁছুবার জন্যে অনেকে ঘোড়া করে মাঝের বিস্তীর্ণ চড়াটা পার হয়ে ওধারের গঙ্গায় গিয়ে নৌকা ধরত।

আমার মা ছিলেন খুবই দয়ালু প্রকৃতির। আমি জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে আসছি মা বেলা তিনটের আগে প্রায় দিনই খেতেন না। বাড়ির বৃদ্ধ পাচক ঠাকুর খেতে বসত রান্নাঘরের ঢাকা বারান্দায়। লাগোয়া খোলা বারান্দায় বসত দুটি চাকর, দুটি ঝি। সেই সঙ্গে উঠোনে তিনটি দিশী কুকুর। এর ওপর প্রতিদিন একটি না একটি ভিখিরি থাকবেই। তাকেও মা ভাত, ডাল, তরকারি এমনকি মাছও দিয়ে রান্নাঘরে নিজের ভাতের থালা নিয়ে বসতেন। সামনে থাবা গেড়ে বসে থাকত একটা সাদা মোটা বেড়াল। সবাইকে দিয়ে মায়ের কোনো কোনো দিন এক টুকরো মাছও থাকত না। তাই দেখে মৈথিলী পাচক ঠাকুরটি রাগারাগি করত। ভাঙা ভাঙা বাংলায় মাকে বকত, 'এইসা খানে সে শরীর থাকবে? হাম্ ডাগ্‌ডারবাবুকো বোল দেগা।' মা বলতেন, 'তুমি চুপ কর।' এক একদিন জোর করে সে মায়ের পাতের কাছে একবাটি দুধ বসিয়ে দিয়ে যেত। মাকে মেয়ের মতন স্নেহ করত সে।

মায়ের তিনটি পেটেন্ট ভিখিরি ছিল। তাদের মধ্যে ছিল একটি খোঁড়া মেয়ে। ছোটবেলায় রেললাইন পার হতে গিয়ে ডান পাটা হাঁটুর ওপর থেকে ট্রেনে কাটা যায়। বাবাই চিকিৎসা করে বাঁচান। ওর বাবা-মা খুব গরীব ছিল। একটা পা না থাকায় বিয়েও হলো না। বাবা-মা মারা যাবার পর ভিখিরি হয়ে গেল। একটা লম্বা

লাঠির ওপর ভর দিয়ে হাঁটত। এই মেয়েটা আমাদের বাড়িতে ঠিক ভিখিরির মতন আসত না। মধ্যে মধ্যে দেখেছি, সকালবেলা এসে আমাদের বড়ঘরের বড় বারান্দায়, একটা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙছে। তার জন্যে মা ওকে জলখাবার দিতেন। দুপুরবেলায় ভাত খেয়ে বাড়ি যাবার আগে মা ওকে কিছু পয়সা দিতেন। একটি বুড়ীও আসত। সে চোখে ভাল দেখতে পেত না তাই সঙ্গে একটা সাত-আট বছরের মেয়ে। ওর নাকি নাতনি। আর আসত একটা বুড়ো। তার ঘাড়ের ওপর বাতাবি লেবুর মতন বিরাট একটা আব। বুড়োটা ছিল আবার বোবা। বয়স কত বোঝা যেত না। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার সামনের দিকটা টাক। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটত। পয়সা পেলে ফোকলা দাঁতে হেসে হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে আঁ-আঁ করে একটা শব্দ করত। সপ্তাহে প্রায় দু'তিন দিন আসত। মা ওকে খুব ভালবাসতেন। খেতে তো দিতেনই। মধ্যে মধ্যে পুরনো জামাকাপড়ও দিতেন।

একদিন দুপুরে মায়ের তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। বাবা বাইরের ঘরে একটা বই পড়ছেন। গরমের ছুটি। আমি পাশের ঘরে হোমটাস্ক করছি। এমন সময় বাইরে একটা গোঙানি শোনা গেল। বাবা বিরক্ত হয়ে বইটা হাতে করেই বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে দেখেন সেই বোবা ভিখিরিটা এসেছে। 'কেয়া মাংতা?' বাবা জিজ্ঞেস করেন। বোবা ভিখিরিটা বাবাকে দেখে একটু থতমত খায়। তারপর দু'হাত জোড় করে প্রণাম করে, ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে ইশারায় বোঝায় খাওয়া হয়নি, খেতে চাইছে। তারপর ঐ হাতটা ঘোমটা দেবার মতন করে ঘুরিয়ে দু'হাত জোড় করে মায়ের কথা বলে। বাবা বলেন, 'জ্বালিয়ে খেলে! মাঈজী এখন ঘুমোচ্ছেন।' বোবাটা আঁ আঁ করে পেটে হাত দিয়ে, দু' হাত মেলে কিছু চায়। বাবা ভেতরে গিয়ে কিছু পয়সা এনে ওর হাতে দেন। ভিখিরিটা দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময়ে মায়ের গলা শোনা গেল, 'যাচ্ছিস কোথায়? বোস ওখানে।' বাবার কথার আওয়াজে মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে। বাইরে এসে মা ওকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে যান, একটু পরে এক বাটি দুধ, একটা বড় কাঁসার থালায় বেশ খানিকটা চিঁড়ে, গুড় আর ছোট এক ছড়া পাকা কাঁটালি কলা ওর ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের সানকিতে সস্নেহে ঢেলে দিয়ে বলেন, 'এটা খা বাবা, জল দিচ্ছি।' ভেতরে গিয়ে ঘটি করে জল নিয়ে এলেন মা। ভিখিরিটা একটা পুরনো বার্লির কৌটো তার ময়লা পুঁটলি থেকে বার করল। মা ওতেই জলটা ঢেলে দিলেন। বাবা গম্ভীর মুখ করে বললেন, 'তুমিই এদের মাথা খাচ্ছ।' মা বললেন, 'বেশ করছি।' বাবা হেসে ফেললেন।

আসলে বাবাও মনে মনে খুশি হয়েছেন। খুশি হলেই বাবার চা খেতে ইচ্ছে করে। বললেন, 'সাড়ে তিনটে বাজে, ঠাকুরকে চা করতে বল।' মা বললেন, 'ঠাকুর একটু আগে খেয়ে শুয়েছে, বস, আমি করে আনছি।'

বাবা হাসিমুখে বইটা হাতে নিয়ে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন। সামনে বিরাট ফুলের বাগান। ডানদিকে বেশ খানিকটা সবুজ জমি। ওপাশে একটা বাঁশঝাড়। তার পাশে কলাগাছ, লতানো আমগাছ। মেজদা তখন স্বদেশী করতেন, চরকা কাটতেন, সেইজন্যে ওদিকে সারি সারি কাপাস গাছ। তার ওধারে একটু ঢালু জমি, তারপরেই গঙ্গা। সূর্যের আলো পড়ে মাঝখানের জলের স্রোতটা গলানো সোনার মতন মনে হচ্ছে। একটা নৌকো পাল তুলে যাচ্ছে। ওপারের নীল পাহাড়ের সারি যেন পাঁচিল তুলে মা গঙ্গাকে পাহারা দিচ্ছে। একটা ছাই রঙের ডাহুক পাখি তার ছোট্ট পেখম তুলে দক্ষিণের বারান্দার সিঁড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় একটা ঘুঘু তানপুরাতে সুর ছাড়ার মতন একটানা ডেকে চলেছে। পশ্চিম দিকে গোলাপ গাছগুলোর পাশে তিন-চারটে শালিক আর দুটো বুলবুল আর কয়েকটা ছ্যাতারে পাখি আসর জমিয়েছে। পশ্চিম দিকের বকুল গাছটা তাদের ওপর ছাতা ধরার মতন তার ছায়াটা ফেলেছে। বাবা বইটা হাতে করে এক টিপ নস্যি নিয়ে সামনের বাগানের ওধারে তাঁর ডিসপেনসারির দিকে তাকিয়ে আছেন। এই দশ বিঘে জমির ওপর ডিসপেনসারিটা তাঁর নিজের উপার্জনে করেছেন এবং সেটাই তিনি এক কপর্দক না নিয়ে মণিহারী ও আশপাশের গ্রামবাসীর জন্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে দান করে দিয়েছেন। বাবা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। একটা লোক ডিসপেনসারির ওধারের গেটটা খুলে বাগানের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে। পরনে হলদে কামিজ, নীল চেককাটা লুঙ্গি। ডান কাঁধে একটা লাল গামছা, পায়ে দিশী কাঁচা চামড়ার তেলে ডোবানো নাগরা। মাথার চুলে জবজবে করে তেল মাখা। চোখে সুরমা টানা। দাড়ি আছে, গোঁফ কামানো। লোকটা কাছে এসে নাগরা জোড়া সিঁড়ির ওধারে খুলে মাথা হেঁট করে সেলাম করলে। ডাহুকটা একবার ওকে দেখে বকুল গাছটার দিকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। ইতিমধ্যে বাবার ইজিচেয়ারের পাশের ছোট্ট টেবিলটায় দুটো চড়ুই পাখি বাবার নস্যির ডিবেটা নিয়ে খেলা করছিল। তারা লোকটাকে দেখে উড়ে গেল। লোকটা বাবার পায়ের কাছে কটা টাকা রাখল। বাবা সবিস্ময়ে তাকালেন। লোকটা সবিনয়ে বলল, 'বোখার ছুট গিয়া ডাগডারবাবু। আচ্ছা হো গিয়া। আপকো ভিজিট।'

বাবা অসুখ না সারলে ভিজিট নিতেন না। সেরে গেলে যে যা দিত, তাই নিতেন। বাবা টাকাগুলো না তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মনিরুদ্দিনের ব্যাটা না?'

'জি।'

'তোমার নাম তো সামসুদ্দিন।'

'জি।'

'দেখি হাতটা।'

বাবা সামসুদ্দিনের পাল্‌স দেখছেন, এমন সময় মা এক কাপ চা নিয়ে এলেন। বাবা সামসুদ্দিনের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ভালো। তবু সাবধানে থেকো।' তারপর মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বললেন, 'সামসুদ্দিনকে এক কাপ চা দিয়ে যাও, আর ঐ টাকাগুলো নিয়ে যাও।' মা টাকাগুলো তুলে 'বস বাবা' বলে ভেতরে গেলেন। বাবা সামসুদ্দিনকে

পাশের চৌকিতে বসতে বলেন। সামসুদ্দিন সসংকোচে বসল। মা আর এক কাপ চা সামসুদ্দিনকে দিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে বোবা ভিখিরিটার মধ্যাহ্ন ভোজন হয়ে গেছে। সে উঠে আঁ-আঁ করে বাবা-মাকে হাত জোড় করে প্রণাম করে চলে গেল।

বাবা সামসুদ্দিনকে এই বোবা ভিখিরিটার কথা জিজ্ঞেস করেন, 'এই গুঙ্গা কাঁহা রহ্‌তা তুমহে পাতা হ্যায় ?'

সামসুদ্দিন বলে, 'জি নেহি। ভিখ মাঙ্গনেওয়ালোকা ক্যা কোই ঠিকানা হোতা হ্যায় !'

বাবা চা খেতে খেতে সামসুদ্দিনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতে থাকেন।

'উও যো দিয়াড়ামে সাধুবাবা বারিসকা লিয়ে যজ্ঞ কিয়া, উসি‍সে থোড়া বহুত ঝোড়ি হুয়া।'

'জি হাঁ হুয়া। আউর ভি হোতা। লেকিন উও যো চেষরু মাড়োয়ারি যজ্ঞকে লিয়ে ঘিউ দিয়া থা না, উও ব্যাকিয়া ঘিউকে সাথ মশুয়া দহি আর দালদা পাটল কর দিয়া। আসলি ঘিউ দিয়া হোতা তো খুব বারিস হোতা।'

বাবা সামসুদ্দিনের কথা শুনে হাসেন। এখানে কিছুদিন আগে ঐ দূরের চড়ায় এক সাধুবাবা অনাবৃষ্টির জন্যে বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। আমিও মায়ের সঙ্গে নৌকো করে যজ্ঞ দেখতে গেছিলাম। এলাহি ব্যাপার। কত লোক এসেছিল। কত যে ঘি পুড়েছিল। সাধুবাবার চেহারাটা অপূর্ব, গেরুয়া লুঙ্গি পরা, ন্যাড়ামাথা, গায়ের রং টকটক করছে। অনেকটা চৈতন্যদেবের মতন দেখতে। কেউ বললে উনি নাকি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। বিরাট একটা আটচালা, তার চার কোণে আর মধ্যিখানে কুণ্ডুতে আগুন জ্বলছে। সাধুবাবা পিতলের বালতি থেকে একটা পিতলের হাতা দিয়ে ঘি তুলে তুলে সেই আগুনে ঢালছেন। ওধারে লম্বা খড়ের ঘরে সারি সারি পণ্ডিত মন্ত্রপাঠ করছে। আশপাশেও অনেক খড়ের ঘর হয়েছে। প্রায় মেলা বসে গেছে।

যজ্ঞের পর বিকেলবেলা আমরা সাধুবাবাকে প্রণাম করতে গেলাম। সাধুবাবা হাসলেন। আমাদের এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, আদা দেওয়া দুধের চা খাওয়ালেন। যজ্ঞের দু' একদিন পর সত্যিই দু' এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। এটা আমার জীবনে একটা বিস্ময়। তবে সামসুদ্দিনের কথায় ভেজাল ঘি-এর জন্যে বেশি বৃষ্টি হলো না, সত্যি বলছি অতটা বিশ্বাস আমার হয়নি।

কিছুদিন পর সাহেবগঞ্জের ভব মিত্তিরের ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন এল। ভব মিত্তির ডাকসাইটে বড়লোক। তিনটে তেলের কল, একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরি। পাকুড়ে স্টোনচিপ্‌সের ব্যবসা। সাহেবগঞ্জে বেশ কয়েকখানা বাড়ি। একটা ঘোড়ার গাড়ি, একটা ফিটন, একটা মটোর। সেই ভববাবু একবার মণিহারীতে বেড়াতে এসেছিলেন। উঠেছিলেন জমিদারের কাছারিবাড়িতে। সেই সময় তাঁর হঠাৎ জ্বর হওয়াতে বাবা দেখতে গেছিলেন। ভালো হয়ে উঠে ভববাবু বাবাকে মোটা টাকা ফি দিতে এসেছিলেন। বাবা নেননি। বলেছিলেন, 'আপনি আমাদের গ্রামের অতিথি, আপনার কাছে ফি নেব কি করে ?' সেই থেকে ভববাবুর সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব। সাহেবগঞ্জে গেলে মাঝে-মধ্যে ভববাবুর সঙ্গে বাবার দেখা হতো। সেই ভববাবুর তরফ থেকে একজন লোক নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেল। এই এলাকায় ভববাবুই বোধহয় প্রথম নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে বিলি করলেন। তখন যে কোনো বাড়ির বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ জানিয়ে যেত একটা নাপিত হলুদে ছোপানো এক পুঁটুলি সুপুরি দিয়ে। বিয়ে হলে পাঁচটা, শ্রাদ্ধ বা পৈতে হলে তিনটে হলদে সুপুরি বাড়ির কর্তার হাতে দিয়ে বলত, 'অমুক বাড়ির ছেলের বা মেয়ের বিয়ে অমুক দিনে। আপনারা সবাই সেদিন রাত্রে ওখানেই ভোজন করবেন।' ভববাবুর ছেলের বিয়েতে প্রথম প্রজাপতি আঁকা হলদে তুলোট কাগজে লাল অক্ষরে ছাপা বিয়ের চিঠি এলো আমাদের বাড়িতে। আমরা সবিস্ময়ে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত নতুন কবিতার মতন সাগ্রহে পড়তে লাগলাম সেই নিমন্ত্রণপত্র।

বাবা একাই নিমন্ত্রণ রাখতে যাবেন। বাবা ঘোড়ায় চড়ে বাইরের কাজ সারতেন, রুগীর বাড়ি যেতেন। ওঁর সাদা রঙের বিরাট একটা ঘোড়া ছিল। নাম ছিল মতিলাল।

তখন জুন মাস। বাবা ঠিক করলেন, ঘোড়ায় করে সাহেবগঞ্জে যাবেন। তাহলে রাত্রিতেই নিমন্ত্রণ সেরে মণিহারী ফিরে আসতে পারবেন। স্টিমারে ট্রেনে গেলে রাতটা সাহেবগঞ্জে কাটাতে হবে, যদিও সেখানে বাবার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।

মা কাটিহারের বাদল স্যাঁকরার দোকান থেকে একজোড়া সোনার দুল ভববাবুর ছেলের বৌকে দেবার জন্যে কিনিয়ে আনালেন। ভববাবুর ছেলের বৌভাতের দিন সেই দুল নিয়ে বাবা জুন মাসের রোদ মাথায় করে বেলা দেড়টা নাগাদ মতিলালের পিঠে চেপে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হলেন। মণিহারীর দিকের গঙ্গাটা চওড়ায় এবং গভীরতায় কম, তবু বাবাকে খাতির করে ঘোড়াসুদ্ধ খেয়া-ঘাটের মাঝি ওপারের চড়ায় পার করে দিলে। অন্যরা ঘোড়া করেই এক কোমর জলে পার হয়ে যায়। বাবা ওপারে চড়ায় গিয়ে পৌঁছুলেন। মস্ত মরুভূমির মতন বালিয়াড়ি, স্থানীয় ভাষায় দিয়াড়া। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ঝাউগাছের ঝোপ। দু' একটা ছোট ছোট খড়ের কুঠরি আছে। যারা এখানে সাময়িকভাবে তরমুজ আর পটলের চাষ করে, তারাই পাহারা দেবার জন্যে ওগুলো করেছে। তাছাড়া সাধুসন্তরা মধ্যে মধ্যে এই নির্জন চড়ায় কিছুদিন কাটিয়ে যান। তাঁদের পরিত্যক্ত খড়ের চালাঘরগুলো দূরে এধারে-ওধারে দেখা যাচ্ছে।

বাবা চড়ার ওধারের গঙ্গার তীরে যখন পৌঁছুলেন তখন বিকেল হয়ে গেছে। মতিলালকে ঘাটবাবুর ছোট চালাঘরের খুঁটিতে বেঁধে বাবা নৌকোর দিকে এগিয়ে গেলেন। এখানে গঙ্গাটা বেশ চওড়া। আরও কয়েকজন যাত্রী নাহলে নৌকো ছাড়বে না। ঘাটবাবু সীতারাম ঝা বাবার পরিচিত। মণিহারীর পাশের গ্রাম গোয়াগাছিতে থাকে। বাবাকে দেখেই 'পরনাম ডাগডারবাবু' বলে জোড় হাত করে, মাথা হেঁট করল। ছোট ছোট কদমছাঁট চুল, পেছনে গিঁট দেওয়া পুষ্ট কালো টিকি, তাতে একটা ফুল বাঁধা। কপালে চন্দনের টিপ। সীতারাম হেসে বললে, 'মজে মে হ্যায় না ?' বিহারীদের

নিয়ম দেখা হলেই বলবে, 'মজে মে হ্যায় না?' বাবা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ভালোই আছি। কিন্তু আমাকে যে ভববাবুর বেটার শাদির নওতা সেরে আজ রাত্রেই মণিহারী ফিরতে হবে। তোমার নৌকো ছাড়বে . কখন?'

'ফিকির মাৎ করিয়ে।' সীতারাম আশ্বাস দিয়ে চেঁচিয়ে মাঝিকে বলে, 'কৈল্যু, ডাগডারবাবুকা জলদি যানা হ্যায়। নাও ছোড়নেকা বন্দবস্ত কর।'

বাবা বললেন, 'আমার ঘোড়াটাকে একটু দেখ। জিনের সঙ্গে একটা বোরায় ওর দানা আছে। খেতে দিও।'

সীতারাম জিভ কেটে বলে, 'ছিঃ ছিঃ আপকো ঘোড়েকো থোড়া দানাভি হামি দিতে পারব না? মেরা ভি তো এক ঘোড়া হ্যায়।' দূরে একটা সামনে দু' পায়ে বাঁধা দিশী লাল রঙের টাট্টু ঘোড়া দেখালো। চড়ার ওপরে লাফিয়ে লাফিয়ে ঝাউগাছগুলোর কাছে চরছে।

বাবাকে আর কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। পার হতে আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে।

সন্ধ্যে ছটা-সাড়ে ছটা নাগাদ বাবা ভববাবুর বাড়িতে পৌঁছুলেন। বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ। তখন গাঁয়ে-গঞ্জে এতো ইলেকট্রিকের চল হয়নি। ভববাবুর নিজস্ব ডায়নামো ছিল। সারি সারি বাল্বের মালা দিয়ে সারা প্রাসাদটাকে যেন সোনার গয়নায় সাজানো হয়েছে। বাড়ির সামনের মাঠে চারদিকে ঘেরা বিরাট সামিয়ানা। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা। ভববাবু নারদের মতন নিমন্ত্রণ করেছেন। নিমন্ত্রিতের ভিড়ে বাড়ি ভরে গেছে। গেটের ওপর নহবৎ বসেছে। কাশী থেকে আসা বিখ্যাত শানাই-বাদক শানাই বাজাচ্ছে। বাবা গেট পার হয়ে প্রথমে ভববাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেন। সাহেবগঞ্জের পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। তারা বলল, 'ভবদাকে একটু আগে দেখলাম, ঐ যে।' ভববাবু গেটের দিকে যাচ্ছেন। বাবা তাঁকে ডাকতে ডাকতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন। ভববাবু একবার ঘাড় কাত করে দেঁতো হাসি হেসে, গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাবা দেখেন গেট দিয়ে ঢুকছেন এস. পি. আর ম্যাজিস্ট্রেট।

ভববাবু আভূমি নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে তাঁদের বাড়ির দিকে নিয়ে আসছেন। আজকালকার মন্ত্রীদের মতন তখনকার দিনে ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পি.দের খুব খাতির ছিল।

বাবা একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাঁর পরিচিত একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বুজু, নতুন বৌ কোথায়?' বুজু বললে, 'ঐ দিক দিয়ে ভেতরের দালানে চলে যান।' বলে ডানদিকে হাতটা তুলে দেখাল। বাবা সেই মতো এগিয়ে দেখলেন, নববধূকে একটা সিংহাসনে বসানো হয়েছে, সোনার অলঙ্কারে সে আপাদমস্তক মোড়া। সেখানেও বেশ ভিড়। বাবা কোনোরকমে ভিড় ঠেলে নববধূর হাতে দুলের বাক্সটা দিলেন। নববধূ বাবার দিকে ফিরেও দেখল না, কেউ পরিচয়ও করিয়ে দিল না। দুলের বাক্সটা অন্য দামী দামী উপহারের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। বাবা ওখান থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে দেখেন, ভববাবু ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পিকে বৌ দেখাতে নিয়ে আসছেন। বাবা এগিয়ে গেলেন, ভববাবু যেন বাবাকে চিনতেই পারলেন না। বাবা কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে সেই বুজুর সঙ্গে দেখা। বুজু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি রাত্তিরে কোথায় থাকবেন?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'রাত্তিরেই মণিহারী ফিরে যাব।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, সাড়ে সাতটার পর আর নৌকো পাবেন না।'

'খাবার কোথায় ব্যবস্থা?'

'ওপরে বড়লোকদের (আজকালকার ভাষায় ভি. আই. পি.দের), আমাদের ঐ গেটের সামনে সামিয়ানার তলায়।'

বাবা কি রকম যেন অপমানিত বোধ করলেন। খেতে প্রবৃত্তি হলো না। ঘড়ি দেখে গেট দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। যখন সাহেবগঞ্জ ঘাটে এসে পৌঁছুলেন তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। দেখলেন ঘাটে কৈল মাঝি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। বললে, 'আইয়ে বাবু, ঘাটবাবু বোল গিয়া ডাগডারবাবুকো লেকে তব নাও ছোড়ে গা।' বাবা নৌকোয় চড়লেন। শেষ খেয়ায় বিশেষ যাত্রী নেই। হাল ধরেছে কৈলু। আরও দুটি মাঝি দাঁড় বাইছে। ঘাটবাবু একটু আগে তার টাট্টু ঘোড়া করে গোয়াগাছি গ্রামে চলে গেছে। নৌকোটা যখন মাঝ-দরিয়ায়, তখন মাথায় দু' এক ফোঁটা জল পড়ল। বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন তারা দেখা যাচ্ছে না। সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'বৃষ্টি আসবে নাকি রে?' দাঁড় টানতে

টানতে একটা মাঝি বলে, 'আয়সাই তো মালুম হোতা হ্যায়।' কৈলু এবং অন্যান্য মাঝিরা পরামর্শ দিল সাহেবগঞ্জে ফিরে যেতে। সেখানে কোনো বন্ধুর বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে নেবেন। ওরা বাবার ঘোড়া মতিলালকে দেখবে। কারণ ঐ ঘাটবাবুর খড়ের ঘরেই ওরা থাকে। ডাক্তারবাবু কাল ভোরের খেয়ায় মণিহারী ফিরে যাবেন। কিন্তু বাবা ওদের কথা শুনলেন না। বললেন, 'ঠিক চলে যাব। তোরা একটু জোরে টান।'

ওপারে পৌঁছে যখন মতিলালের পিঠে চড়লেন তখনও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। বাবা মতিলালকে ছোটাতে লাগলেন। কৈলুরা সবিস্ময়ে দেখল সাদা ঘোড়াটা বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি চড়ার অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তারবাবুকে পিঠে নিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। বৃষ্টি তখন ঝমঝমিয়ে এসে পড়েছে। জনহীন বালিয়াড়ি। বৃষ্টির জন্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মতিলাল ছুটছে। মেঘের গুড় গুড় শব্দ। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ অগ্নিনখর দিয়ে আকাশটাকে চিরে দিচ্ছে, সেই আলোয় ঝাউগাছের ঝোপগুলোকে অন্ধকারের স্তূপ মনে হচ্ছে। মতিলাল এই ভিজে বালির ওপর দিয়ে আর ছুটতে পারছে না। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে। এখন সাহেবগঞ্জ ঘাটে ফেরাও যাবে না। অনেকটা পথ চলে এসেছেন। বাবা এই বিস্তীর্ণ চড়ায় মতিলালের পিঠে বসে এধার-ওধার দেখছেন। রাত কত হবে কে জানে। ভাবছেন মাঝিগুলোর কথা শুনলেই ভালো হতো। হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলেন একটা খড়ের ঘর। আরও আশ্চর্য হলেন, সেই খড়ের ঘরের ভেতর থেকে একটা আলোর আভা বাইরে আসছে। আলেয়া নয়তো! কিংবা যারা পটল তরমুজের চাষ করে, তাদের কোনো পাহারাদার হবে হয়তো। কিন্তু তাদের ঘরগুলো তো নদীর কিনারার কাছে। উনি তো এখন চড়ার মাঝামাঝি জায়গায় এসেছেন। বাবা লাগামটা টেনে ধরে আস্তে আস্তে ঐ খড়ের ঘরটার দিকে এগোলেন। কাছে গিয়ে বুঝলেন এটা ঐ সন্ন্যাসীদের পরিত্যক্ত আস্তানা। তবে ঘরটায় আলো জ্বলছে যখন, নিশ্চয় কেউ আছে। উনি ঘোড়া থেকে নেমে মতিলালকে ঐ চালাঘরের তলায় এনে রাখলেন। যদিও দুজনেই সম্পূর্ণ ভিজে গেছেন, তবু মাথার ওপর চালাটা থাকায় বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা বাঁচবেন। তারপর উনি ঘেরা খড়ের ঘরের ঝাঁপটা সরিয়ে দেখেন একটা লোক পেছু ফিরে উবু হয়ে বসে একটি মাটি দিয়ে গড়া উনুনে একটা মাটির হাঁড়ি চড়িয়ে বোধহয় ভাত রান্না করছে। ঝাঁপটা খোলাতে বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়া আসায় লোকটা সভয়ে ঘুরে তাকায়। পাশে একটা কুপি জ্বলছে। লোকটা সেই কুপি হাতে নিয়ে বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কুপির আলোয় লোকটাকে বাবার চেনা চেনা ঠেকল। সেই বোবা ভিখিরিটা না! তারপর ওর ঐ ঘাড়ের আবটা দেখে নিশ্চিত হলেন—হ্যাঁ সেই বোবা ভিখিরিটা। সেও একটু পরে বাবাকে চিনতে পেরে সবিস্ময়ে আঁ-আঁ করে উঠল, তারপর বাবার ভেজা জামা-কাপড় দেখে, ঘরের ভেতরের মাচার তলা থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করে সেটা মাচার ওপর রেখে, সেটা খুলে তার থেকে একটা ভিক্ষে পাওয়া অল্প অল্প ছেঁড়া ধুতি পরবার জন্যে বাবার দিকে এগিয়ে দিল। আর মাথা-গা মোছবার জন্যে দিল একটা ছেঁড়া জামা। দুটোই কিন্তু পরিষ্কার। বাবা ওর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ে চলেছে। বাবা জামাটা খুলে ছেঁড়া জামাটা দিয়ে গা-মাথা মুছে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ভিখিরির দেওয়া শুকনো কাপড়টা পরে আরাম বোধ করলেন। সমস্ত দিনের ধকলে ক্লান্তও হয়ে গেছলেন। ইতিমধ্যে বোবা ভিখিরিটা তার ভিক্ষা পাওয়া অন্য কাপড় দিয়ে ঘরের মাচাটার ওপর সুন্দর করে বাবার জন্যে বিছানা পেতে দিয়েছে। বাবা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না। হঠাৎ কার মৃদু স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন বোবাটা তাঁকে উঠতে ইশারা করছে। বাবা উঠলেন এবং বিস্মিত হয়ে দেখেন ঘরের মেঝেতে খাবার জায়গা করেছে বোবাটা। কোথা থেকে একটা বিরাট কলাপাতা যোগাড় করে তাতে বেড়ে দিয়েছে অনেকখানি গরম ভাত। পাশে গোল গোল দুটো বোধহয় আলু সেদ্ধ। একটা ভাঙা সানকিতে ঝোল ঝোল তরকারি। ভিখিরিটা হাত জোড় করে বাবাকে খাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। আঁ আঁ করে যেন বলতে চাইছিল, এটুকু খেয়ে আমায় ধন্য করুন। বাবা ঘড়িতে দেখেন রাত সাড়ে তিনটে। খিদেও পেয়েছিল। বাবা খেতে বসলেন। বোবাটাও বাবার সামনে বসে দু' হাত জোড় করে হাসি মুখে সজল নয়নে চেয়ে রইল। বাবা ভাতে হাত দিয়ে দেখেন ভিক্ষার নানান চালের ভাত। গোল গোল ও দুটো আলু সেদ্ধ নয়, কাছিমের ডিম সেদ্ধ। চড়ের ধারে কাছিম ডিম পেড়ে যায়, সেখান থেকে নিয়ে এসেছে। পাতার এক কোণে খানিকটা নুন, দুটো লঙ্কা, আর সানকিতে নানান আনাজের পাঁচমিশালি তরকারি। বাবার কাছে এই রান্না অমৃতের মতো মনে হলো। পরম তৃপ্তিতে খেয়ে বাবা কুঠরির বাইরে এসে যখন হাত ধুচ্ছেন তখন ভোর হয়ে আসছে। বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে। পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। বাবা দেখেন ভিখিরিটা বাবার জামাকাপড়-গেঞ্জি চালাঘরটায় শুকুতে দিয়েছে। বাবার টাকাভরতি মানিব্যাগটা মাচার ওপর রেখে দিয়েছে। ঘোড়াটাকে কাঁচা তরকারি আর ভাত খেতে দিয়েছে। মতিলাল সেগুলির সদ্ব্যবহার করছে। ভিখিরিটা যেন কৃতার্থ। হাত জোড় করে ফোকলা মুখে সরল হাসি মাখিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোর হয়ে আসছে। বিস্তীর্ণ চড়ায় এই ব্রাহ্মমুহূর্তটা যে কি মনোরম, যে না দেখেছে উপলব্ধি করতে পারবে না। দূরে গঙ্গার জলের বুক ঘেঁষে পাখিরা গান গাইতে গাইতে উড়ছে। পূর্বাকাশে শুকতারাটা হীরের টিপের মতন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আকাশটায় কে যেন আস্তে আস্তে নীল রং ঢেলে দিচ্ছে। সামনে গিলে করা বালিগুলো। বাতাস যেন হাত দিয়ে নদীর ঢেউয়ের ভঙ্গিগুলোকে এখানে স্থির করে রেখে দিয়েছে। মন জোড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কোথাও জনমানব নেই। বাবা আর সেই বোবা ভিখিরি। আকাশ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠতে

লাগল। শুকতারা মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর দিয়ে এক জোড়া চখাচখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। বাবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নিজের জামাকাপড়-জুতো পরে মাচা থেকে মানিব্যাগটা তুলে মতিলালকে চালাঘর থেকে বাইরে এনে তার পিঠে চড়ে বসলেন। বোবা ভিখিরিটা হাসিমুখে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা মানিব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট বার করে ওকে দিতে গেলেন। ও কিন্তু মাথা নেড়ে আঁ-আঁ করে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করল। বাবা ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বোঝাতে লাগলেন, তুমি এই টাকা নিলে আমি আনন্দিত হব। কিন্তু বোবা ভিখিরিটা হাত জোড় করে চোখের জলে আঁ-আঁ করে যা বলতে চাইল—সে ভাষা বাংলা নয়, হিন্দী নয়, ইংরিজি নয়, সংস্কৃত নয়, উর্দু নয়, সে ভাষা সত্যিকারের মানুষের ভাষা। যে ভাষায় সে বলছে, ডাক্তারবাবু, আজ তোমার সেবা করে আমি যে পুণ্য অর্জন করেছি, কয়েকটা টাকা দিয়ে আমার সেই পরম প্রাপ্তিকে নষ্ট কর না।

পাছে বাবা আবার জোর করে টাকা দেন, সেই ভয়ে ছুটে দূরে চলে গেল।

বাবার মনে হলো এ কোনো সামান্য ভিখারী নয়, এ সর্বত্যাগী ভিক্ষু, ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যস্বরূপ মহান ভিক্ষু। বাবা দেখেন, বোবাটা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে আর হাত দিয়ে চোখের জল মুছছে। বালিতে তার পদচিহ্নর উপর ভোরের রক্তিম আলো এসে পড়েছে। বাবা বালির ওপর বোবার সেই পদচিহ্ন থেকে ডান হাত দিয়ে খানিকটা বালি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে মতিলালের পিঠে চেপে মণিহারীর দিকে রওনা হলেন।

ছবিঃ সরোজ সরকার

ভূতের গোষ্ঠী, ঠিকুজি-কোষ্ঠী

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

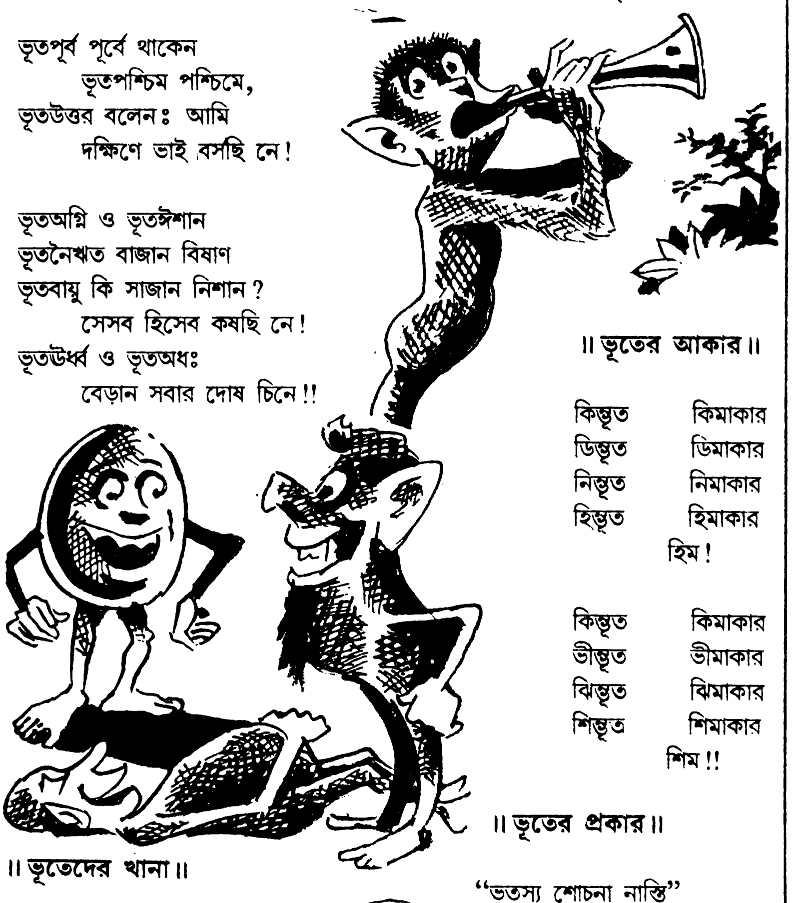

॥ ভূতের ঠিকানা ॥

ভূতপূর্ব পূর্বে থাকেন
ভূতপশ্চিম পশ্চিমে,
ভূতউত্তর বলেনঃ আমি
দক্ষিণে ভাই বসছি নে!

ভূতঅগ্নি ও ভূতঈশান
ভূতনৈঋত বাজান বিষাণ
ভূতবায়ু কি সাজান নিশান?
সেসব হিসেব কষছি নে!
ভূতঊর্ধ্ব ও ভূতঅধঃ
বেড়ান সবার দোষ চিনে!!

॥ ভূতের আকার ॥

কিম্ভূত কিমাকার
ডিম্ভূত ডিমাকার
নিম্ভূত নিমাকার
হিম্ভূত হিমাকার
হিম!

কিম্ভূত কিমাকার
ভীম্ভূত ভীমাকার
ঝিম্ভূত ঝিমাকার
শিম্ভূত শিমাকার
শিম!!

॥ ভূতের প্রকার ॥

"ভূতস্য শোচনা নাস্তি"
ভূতেরা শুনলে দেবেই শাস্তি
জোরসে?
ভূতের কবল হইতে মুক্তি
পেতেই ছুঁড়ে মারবো যুক্তি
সরষে!

"ভূতস্য শোচনা নাস্তি"
শুনেই ভূতেরা হিঁ-হিঁ-হিঁ হাসতি
সত্যি?
মানি না তো ভূত, পিশাচ-প্রেতিনী
রক্ষ-যক্ষ, ডাকিনী-যোগিনী
দত্যি!!

॥ ভূতেদের খানা ॥

ভূত আমার পুত...
পেত্নী আমার ঝি,
ভূতকে খাওয়াই গুগলি-গেঁড়িং
পেত্নী খাবেন কি?

পেত্নী খাবেন শশার স্যালাড
মশার মালাইকারি,
চালতা বেটে, আলতা ফেটে
অম্বল দশ-হাঁড়ি!

প্যাঁচার পুডিং, কেঁচোর পায়েস
কাঁকড়াবিছের বড়া,
ডেচকি-ভরা ছেঁচকি ছুঁচোর
ব্যাঙপচা পাঁচ-কড়া!!

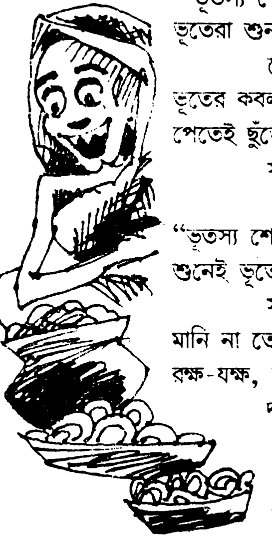

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ভূতায়ন

অপারেশনঃ বাইপাস সার্জারি

নারায়ণ সান্যাল

কিছু মনে কর না দিদি-দাদাভাইয়েরা, গল্পটা শুরু করার আগে কিছু 'জ্ঞান' দেবার চেষ্টা করছি। কারণ আমার গল্পের নামকরণের মধ্যে একটা 'কালানৌচিত্য-দোষ' ঘটে গেছে। কথাটার মানে জানা নেই? ঐ যাকে সাদা-বাঙলায় বলে 'অ্যানাক্রনিজম্' (anachronism)। তাও বুঝলে না? ঠিক আছে, একটা উদাহরণ দিই—সহজেই বুজে যাবে:

মনে কর আমি একটা ঐতিহাসিক গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি। "হলদিঘাটির (নামটা 'হলদিঘাট' নয়, 'হলদিঘাটি') যুদ্ধের কোনো সংবাদ না পেয়ে ফতেপুর সিক্রিতে আকবর বাদ্শাহ অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। এমন সময় দৌবারিক ছুটতে ছুটতে এসে বাদশাহ্‌কে কুর্নিশ করে জানালো যে, সমর সচিবের মীর মুন্সী এইমাত্র সংবাদ পেয়েছেন যে, হল্‌দিঘাটির যুদ্ধে মুঘলসৈন্য বিজয়ী হয়েছে। রানা প্রতাপ আহত চৈতকের পিঠে চেপে গতকাল অপরাহ্ণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ-পসরণ করেছেন। বাদশাহ জানতে চাইলেন: 'কোন সংবাদবহ মারফৎ এ খবর এল? কোথায় সেই দূত?'

"দৌবারিক জানাল, 'আজ্ঞে না জাঁহাপনা, সংবাদবহ আসেনি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সিপাহসলার মানসিংহ রেডিও-মনিটারিং-এর মাধ্যমে এই আনন্দ সংবাদ প্রেরণ করেছেন।'

"বাদশাহ তাঁর অনামিকা থেকে হীরকখচিত অঙ্গুরীয় খুলে নিয়ে দৌবারিককে পুরস্কৃত করলেন।"

এখানে একটি মারাত্মক 'অ্যানাক্রনিজম্' হয়ে গেছে। মানে "কালানৌচিত্য-দোষ"। অর্থাৎ 'কাল' অনুযায়ী "অনুচিত" কোনও ঘটনা ঘটে গেছে। সোজা কথায় গল্পের গরু গাছে উঠে গেছে। আকবর বাদশাহ্‌র আমলে এ-জাতীয় জরুরী যুদ্ধবার্তা ব্যাটারিসেট রেডিওর মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভবপর ছিল না—সংবাদ প্রেরিত হতো বিশেষভাবে শিক্ষিত কবুতরের মাধ্যমে। রেডিও বস্তুটা আবিষ্কৃত হয়েছে আকবর বাদশাহ্‌ প্রয়াত হবার বেশ কয়েক শতাব্দী পরে।

আমার গল্পেও ঐ ত্রুটি। আমি যে ঘটনার কথা বলছি সেটা 1941 সালের কাহিনী—আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজে আই. এস-সি. পড়ি, ফার্স্ট ইয়ারে। তখনো বাইপাস হার্ট সাজারি অপারেশন চালু হয়নি। তবে হ্যাঁ, গল্পটা তো আমি এখন লিখছি, এবং তার নামকরণও করছি, এই 1997 সালের প্রাকপূজা মরসুমে। ফলে নামকরণে ঐ শব্দটা

ব্যবহার করায় কী মহাভারত, কী রামায়ণ, অথবা 'ভূতায়ন' অশুদ্ধ হয়নি। তাতে 'কালানৌচিত্য-দোষ' হবে না। গল্পের গরুকেও গাছে উঠতে হবে না।

নাম শুনে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে, এটা ভূতোদার গল্প। রামের 'অয়ন' যদি রামায়ণ হয়, তাহলে আমার 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড'—আমার বাল্য-কৈশোরের ধ্রুবতারা ভূতোদার 'অয়ন' কেন হবে না 'ভূতায়ন'?

ভূতোদা আমার সহপাঠী ছিল চল্লিশ সালে, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। ক্লাস টেন-এ। ভূতোদা অবশ্য বলত যে, ঐ ক্লাসটার সামনে যে পৌরাণিক অতীতে Class X নয়, First Class লেখা থাকত, ও তখনও ছিল ঐ ক্লাসের ছাত্র। আমাদের বিশ্বাস হতো না। ভূতোদা বলত, "আজ তোরা এই ক্লাসে পড়া শেষ করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবি। দিবি তো? কিন্তু সে-আমলে আমার সহপাঠীরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিত না, দিত 'এনট্রান্স'। পাস করতে পারলে আমার সহপাঠীরা কলেজে ভর্তি হতো 'ফার্স্ট আর্টস' ক্লাসে! সে কি আজকের কথা? তখনো স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারই হননি।"

আমরা বুঝতে পারতাম যে, ভূতোদার ঐ চালবাজিতে একটা বিশ্রী 'কালানৌচিত্য-দোষ' ঘটেছে, অর্থাৎ 'অ্যানাক্রনিজম'! কারণ সে-হিসাবে ওর বয়স ত্রিশ-চল্লিশ পার হয়ে যাবার কথা। তা যায়নি। গেলে বছর-বছর সে হান্ড্রেড-মিটার রেসে ফার্স্ট হতো না। [ঐ দেখ! আবার আমার একটা কালানৌচিত্য-দোষ ঘটে গেল। যে-আমলের গল্প, তখন 'হান্ড্রেড-মিটার' দৌড় আদৌ হতো না, হতো 'হান্ড্রেড-ইয়ার্ড' রেস।]

তবে হ্যাঁ, আমি নিজে যখন ত্রিশের দশকে ঐ কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হলাম তখন ভূতোদাকে দেখেছি ফার্স্ট-ক্লাসে; আবার চল্লিশ সালে যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, তখনো ভূতোদা রয়ে গেল ঐ ফার্স্ট-ক্লাসেই, অর্থাৎ ক্লাস টেন-এ। ক্লাসটা পর্যন্ত নাম পালটাল অথচ ভূতোদার কোনো পরিবর্তন হলো না।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল একটি সরকারী বিদ্যায়তন। পর পর পাঁচ বছর ফেল করলে তাকে স্কুলে রাখা সম্ভবপর ছিল না নিশ্চয়। তার তিনটি সম্ভাব্য হেতু। এক নম্বর: ভূতোদা ছিল দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল—এবং স্পোর্টস-এর ফিল্ড ট্রাকে সে ছিল অসাধারণ। স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্যরা তাই ক্ষমাঘেন্না করে তাকে স্কুল থেকে তাড়াননি। কেউ কেউ বলে, আসল হেতু তা নয়, ভূতোদার দারুণ মুরুব্বি ছিল ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগে। এ-দুটো হেতু যদি তোমরা মেনে নিতে রাজী না থাক তাহলে তৃতীয় সম্ভাব্য হেতুটাই না হয় মেনে নাও: আমার গল্পের গরু এখানে একবার মাত্র গাছে উঠেছে!

1941 সালের জানুয়ারি মাস। আগেই বলেছি আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজে ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র। যুদ্ধের বাজার। কলকাতায় জাপানি বোমা আকাশ থেকে প্রায় পড়-পড়। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ আসন্ন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন ছদ্মবেশে সমরখন্দ, মস্কো পাড়ি দিয়ে বার্লিনে উপনীত। আমরা জানি না, কিন্তু ঐ সময় বার্লিনের ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টারে 'জয় হিন্দ' আর 'নেতাজী' শব্দ দুটি জন্মলাভ করছিল। সেই অতি অতীতের দিনের গল্প শোনাচ্ছি।

যুদ্ধের বাজার বলে ইন্টার-কলেজ টুর্নামেন্টগুলি বন্ধ আছে। আমরা স্থানীয় ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে শনি-রবিতে কিছু 'ফ্রেন্ডলি ম্যাচ' খেলি। আমি তখন ছিলাম কলেজের ওপ্নিং-ব্যাট। উইকেট কিপিংও করতাম। দুটোই শিখেছিলাম ভূতোদার কল্যাণে। ভূতোদা ছিল মুস্তাক আলির মতো ওপ্নার আর দিলওয়ার হুসেনের মতো কীপার। আমাকে স্ট্রেট-ব্যাটে ড্রাইভ করা থেকে সব কিছু ধীরে ধীরে শিখিয়েছিল—পুল, হুক, গ্লান্স, কাট, মায় লেট কাট! একেবারে মুস্তাক আলি স্টাইলে! অফ-স্টাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা বল ভূতোদা ইচ্ছে করলে সমান দক্ষতায় স্কোয়ার-কাট অথবা লেট-কাট দুটোই করতে পারত—কোনটা মারবে সেটা স্থির করত থার্ড-ম্যানের অবস্থানের উপর। অবশ্য ওর সবচেয়ে বিখ্যাত মার: "ওভার-দ্য-বৌলার, ছক্কা!"

হঠাৎ একটা দারুণ খবর এল। শিবপুরের বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমাদের কৃষ্ণনগর কলেজ টীমকে একদিনের ক্রিকেট-ম্যাচে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমাদের কলেজে তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ডঃ বি. এম. সেন আর বি. ই. কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর সি. ভি. মিলার। ওঁরা নাকি পরস্পরের বন্ধু। তাই যুদ্ধের বাজার হওয়া সত্ত্বেও দুটি সরকারী কলেজের মধ্যে এই সৌজন্যমূলক ক্রিকেট খেলার আয়োজন।

স্থির হলো আমরা ষোল জন যাব। এগারো জন খেলবে, দুজন রিজার্ভে, আর বাকি একজন স্কোরার। একজন অধ্যাপক—তিনিই ম্যানেজার আর যাবেন গেমস্ টীচার। যাতায়াতের খরচ কৃষ্ণনগর কলেজের, থাকা-খাওয়ার খরচ বি. ই. কলেজের।

কলেজের যিনি গেম্স টীচার তিনি বললেন, কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস টেন-এর ছাত্র ভূতনাথ ভট্টাচার্যকে দলে নেওয়া হোক। ম্যানেজারের তাতে ঘোরতর আপত্তি। স্কুলের ছাত্র কলেজ টীমে কী করে খেলবে? শেষে ফয়শালা করে দিলেন স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডঃ বি. এম. সেন। তিনি বললেন, "কলেজিয়েট স্কুলও তো সরকারী স্কুল! যোগ্যতায় যদি না বাধে তাহলে আইনে বাধবে না। আপনারা ইচ্ছে করলে ভূতনাথকে টীমে ইনক্লুড করতে পারেন।"

টীমের সবাই জানে ভূতোদা কী জাতের খেলোয়াড়। সবাই খুশি হলো। বিশেষ করে ভূতোদা এবং আমি। আমরা জানতাম, বি. ই. কলেজে একজন দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার আছে—বব্ কলিন্স। যুদ্ধের বাজারে রঞ্জি ট্রফি বন্ধ আছে, না হলে বব্ কলিন্স বেঙ্গলের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলতে যেত। [আবার কালানৌচিত্য দোষ হলো নাকি? রঞ্জি ট্রফি কবে থেকে শুরু হয়েছে গো? 1941-এর পরে নয় তো?]

স্থির হলো, আমরা যাব শনিবার

ক্লাস-টাস শেষ হলে, লালগোলা প্যাসেঞ্জারে, মানে বিকাল নাগাদ। শেয়ালদা থেকে হাওড়া যাব বাসে। পোন্টুন-ব্রিজ খোলা থাকলে (আঃ! কী মুশকিল! গঙ্গার উপর হাওড়া স্টেশনের কাছে রবীন্দ্রনাথ সেতু তৈরি হয়েছে আমাদের চোখের উপর, যুদ্ধের মধ্যেই; কিন্তু পোন্টুন ব্রিজ তুলে ফেলা হলো কবে? 1941-এর আগে না পরে? কালানৌচিত্য হলে তোমরা ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নিও ভাই) নৌকোয় চেপে ওপারে যাব। তারপর পঞ্চান্ন নম্বর বাস ধরে কোম্পানির বাগান। ঐ কোম্পানির বাগানের আগে, শালিমার গেট স্টপেজ পার হলেই বি. ই. কলেজ। শনিবার রাতটা আমরা ওখানে থাকব। ছাত্রদের হোস্টেলে। পরদিন, রবিবার সকাল নয়টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত খেলা—কারণ আমাদের রাতের ট্রেনে কৃষ্ণনগর ফিরে আসতে হবে। বি. ই. কলেজের ছেলেরা আমাদের প্রথমে নিয়ে গেল ওদের অ্যাসেম্‌লি-হলে। দুই টীম পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো। বি. ই. কলেজের একজন অধ্যাপক ডক্টর উইলিয়াম কলিন্স আমাদের আপ্যায়ন করলেন। ভূতোদা আমার কানে-কানে বলে, 'ঐ প্রফেসর কলিন্সই ওদের টীমের ফাস্ট বোলার নাকি?'

আমি বলি, 'বোধহয় না। শুনেছি সেই ফাস্ট বোলারের নাম বব্ কলিন্স। উনি তো উইলিয়াম কলিন্স।'

ভূতোদা বলে, 'হয়তো ওঁর ডাকনাম 'বব্'।'

আমি বুঝিয়ে বলি, 'তা হবার নয় ভূতোদা। বলাই চাটুজ্জের ডাক নাম 'কানু' হতে পারে না। উইলিয়ামের ডাক নাম অনিবার্যভাবে 'বিল', যেমন রবিপ্রিয়, রবীন্দ্র, রবিশেখর ইত্যাদির ডাক নাম 'রবি'। শুধু তাই নয়, 'বব্' যার ডাক নাম, তার ভালো নাম 'রবার্ট' হবেই!'

ভূতোদা আমার দিকে এমন অবাক-চোখে তাকাল যেন আমি 'বাইনোমিয়াল থিয়োরেম' মুখস্থ বলে যাচ্ছি!

জলযোগের পর আমাদের কলেজ-ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখানো হলো। অন্ধকার হয়ে গেছে, না হলে হয়তো কোম্পানির বাগানটাও দেখা যেত। আমাদের ষোলজনকে ওরা বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ভাগ করে অতিথি হিসাবে রাখল। গঙ্গার ধারে কোম্পানি বাগানের কাছাকাছি ডাউনিং হস্টেলের তিনটি ত্রিতল প্রাসাদ, পুকুরপাড়ে স্লেটার হস্টেল আর বেবি স্লেটার। শুধু আমাদের ম্যানেজার থাকলেন ইউরোপীয়ান ব্যারাকে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে আমরা আটটার মধ্যে হাজির হয়েছি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ওভাল মাঠে। তার একদিকে অতন্দ্র প্রহরায় ক্লক-টাওয়ার, অন্যদিকে বিশপস্ কলেজ, যেখানে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাগরদাঁড়ির সেই দুর্ধর্ষ জমিদারের পুত্র মহাকবি মধুসূদন দত্তকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে নতুন নামকরণ করেছিলেন: 'মাইকেল'। অন্যদিকে— কিছুদূরে মুসলমান ছাত্রদের পৃথক ছাত্রাবাস—হিটন হস্টেল। ডাউনিং, স্লেটার, হিটন—ওঁরা সবাই ছিলেন বিগত শতাব্দীতে বি. ই. কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কেউ কেউ অবশ্য এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এখানে বাস করে গেছেন।

মাঠে লোক হয়েছে বেশ। না হবেই বা কেন? রবিবারের রোদ-ঝলমল শীতের দিন। যুদ্ধের কল্যাণে বহুদিন ধরে এমন বাইরের টীমের সঙ্গে খেলা হয়নি বি. ই. কলেজের ওভাল মাঠে।

খেলার বর্ণনা দেবার আগে সে আমলের 'একদিনের ক্রিকেট খেলার' আইনটা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। ইদানীং কালের সীমিত-ওভারের 'ওয়ান-ডে' খেলার কানুন নয়। খেলা হবে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে। মাঝে আধঘণ্টার লাঞ্চ-ব্রেক। যারা টসজয়ীর নির্দেশে প্রথম ব্যাট করবে তাদের ক্যাপ্টেন যতক্ষণ ইচ্ছে ব্যাট করতে পারে, যদি না বিপক্ষ দল তাদের দশজনকেই আউট করে দেয়। ব্যাটিং টিম যথেষ্ট রান করেছে মনে করলে যে-কোনো সময় তারা ডিক্লেয়ার করতে পারে। সেক্ষেত্রে বাকি সময়ের মধ্যে বিপক্ষের দশজনকে সীমিত সময়ের মধ্যে এবং নিজ দলের রানসংখ্যার কমে আউট করতে হবে। না হলে খেলা ড্র। আবার দ্বিতীয় দল ঐ সীমিত সময়ের মধ্যে যদি প্রথম দলের রানসংখ্যা অতিক্রম করে যায় তাহলে দ্বিতীয় দলই জিতবে। এজন্য প্রথম দলের ক্যাপ্টেনকে অনেক বিবেচনা করে ডিক্লেয়ার করতে হয়। জিততে হলে তাদের রানসংখ্যা যথেষ্ট হওয়া চাই; আবার বিপক্ষ দলের দশজনকে আউট করার মতো যথেষ্ট সময়ও হাতে থাকা চাই।

আমরা টসে হারলাম। ঐ টস্ করার সময়েই প্রথম দেখলাম বব্ কলিন্সকে। সে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ক্যাপ্টেন। টকটকে ফর্সা, সোনালী চুল, নীল চোখ। টসে বব্ জিতল আর ব্যাটিং নিল।

সে আমলে কেউ জিজ্ঞাসা করলে স্বীকার করতাম না নিশ্চয়, কিন্তু আজ ছাপ্পান্ন বছর পরে স্বীকার করতে লজ্জা নেই: আমাদের চেয়ে ওদের টীমটা ছিল অনেক শক্তিশালী। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং-এ। শুধু একটি ব্যতিক্রম। সে-কথা যথাস্থানে। ওদের দুই ওপনার প্রথম থেকেই পেটাতে শুরু করল। সে কী পেটানি! আমাদের দলে ফাস্ট বোলার ছিলই না। মোটামুটি মিডিয়াম পেসার দুজন। তাদের ওরা তুলো-ধোনা শুরু করল গোড়া থেকেই। বাধ্য হয়ে আমাদের ক্যাপ্টেন শুরু করলেন ডব্‌ল্-স্পিন অ্যাটাক। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? চারের পর চার—মাঝে মাঝেই ছক্কা। প্রতি ওভারে গড়ে আট-দশ রান উঠছে। আমি কলেজ-টীমের উইকেট কীপার: কিন্তু ভূতোদা খেলতে নামায় সেই কীপার হয়েছে। আমাকে প্যাড পরতে হয়নি। কখনো ফাইন লেগ, কখনো থার্ড-ম্যানের পজিশানে ফিল্ডিং দিচ্ছি। দৌড়তে দৌড়তে, মানে বাউন্ডারি বাঁচাতে বাঁচাতে আমার জিব তখন প্রায় হাঁটু ছোঁয়-ছোঁয়! ওরা প্রথম ঘণ্টায় রান করল ষাট, দ্বিতীয় ঘণ্টায় রান হলো একশ চল্লিশ।

প্রফেসর কলিন্স নিজেই ছিলেন একদিকের আম্পায়ার। অপরদিকে আর একজন অধ্যাপক: নরেশ গুহ। সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের। ক্লক টাওয়ারে ডিং-ডং করে বারোটা বাজতেই প্রফেসর কলিন্স উইকেটের মাথা থেকে 'বেইল'গুলো তুলে নিলেন: লাঞ্চ-ব্রেক।

লাঞ্চ বেশ ভালই খাইয়েছিল

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল আমাদের। ওদের স্কোর তখন পাঁচ উইকেটে একশ সাতাশি। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম লাঞ্চের পর আর ফিল্ডিং দিতে হবে না। বব্ কলিন্স নিশ্চয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করবে। প্রকাণ্ড ওভাল মাঠে—মানে বি. ই. কলেজের ওভাল মাঠের কথা বলছি আমি, বিলাতের নয়—তিন ঘণ্টার মধ্যে একশ অষ্টআশি রান তুলবার হিম্মৎ আমাদের নেই। বিশেষ যখন মহম্মদ নিশারের মতো ফাস্ট বোলার আছে ওদের দলে : বব্ কলিন্স!

লাঞ্চ বেশ ভালই খাইয়েছিল ; কিন্তু মন-মেজাজ খারাপ, এখনি আবার মাঠে নামতে হবে—এই সব কথা চিন্তা করে আমরা সবাই খুব কম করে খেলাম। মায় ভূতোদা পর্যন্ত। ভূতোদা একটা খাইয়ে মানুষ—কিন্তু এখন বিরাট দায়িত্ব তার কাঁধে। তাই আহারে সংযম দেখাল সে।

আমাদের টীমে আমি আর ভূতোদা ওপনার। আমি লাঞ্চের পর ব্যাটিং-প্যাড পরছিলাম, হঠাৎ প্রফেসর কলিন্স আমাকে দেখে বললেন, 'য়ু দেয়ার, ইয়াং ম্যান! ডোন্ট প্যাড-আপ নাউ। দে হ্যাভন্ট্ ডিক্লেয়ার্ড 'য়েট।'

ভূতোদা সাহেবের ইংরেজি বোঝেনি। বলে, 'কী বললে রে লালমুখো?'

প্যাডের স্ট্র্যাপ খুলতে খুলতে আমি বললাম, 'কলিন্স ওদের ইনিংস ডিক্লেয়ার করেনি। আরও ব্যাট করবে।'

'বলিস কীরে! একশ সাতাশি রান করার পরেও?'

আসলে রানের পাহাড় বানালেও কলিন্স ডিক্লেয়ার করেনি একটি বিশেষ হেতুতে। ওদের একজন ব্যাটসম্যান ওয়ান-ডাউন ব্যাট করতে এসে লাঞ্চ-ব্রেকে আছে বিরাশি রানে নট আউট। কলিন্সের ক্লাসফ্রেন্ড কী সাম বসুমল্লিক। নামটা অ্যাদ্দিনে ভুলে গেছি। কলিন্স তাকে সেঞ্চুরি করবার একটা সুযোগ দিতে চায়।

ভূতোদা বললে, 'দেওয়াচ্ছি! তুই নতুদাকে একবার ইদিকে ডেকে আন তো।'

নতু মিত্তির আমাদের ক্যাপ্টেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'কিছু বলবে ভূতনাথ?'

'হ্যাঁ, নতুদা। ওরা ডিক্লেয়ার কেন করল না বুঝেছেন?'

'না বোঝার কি আছে? ঐ বসুমল্লিকের সেঞ্চুরিটা হলেই ডিক্লেয়ার করবে!'

'ঠিক কথা! তাই আমাদের স্ট্র্যাটেজি হবে ঐ বসুমল্লিককে 'ফেস' করতে না দেওয়া। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে সে যেন শর্ট রান না নিতে পারে। ওর সেঞ্চুরি করতে যত দেরি হবে, আমাদের সবাইকে আউট করার সুযোগ ততই কমে যাবে ওদের। নিশ্চিত জেতা-খেলা ড্র হয়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে।'

লাঞ্চের পর আমাদের স্ট্র্যাটেজি হলো সেই মোতাবেক। বসুমল্লিক পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ বল ফেস করতে শুরু করলেই আমাদের সবকটা ফিল্ডার ওকে ছ্যাঁকাবান করে ঘিরে ধরে। বসুমল্লিক তারই মধ্যে মরিয়া হয়ে একটা শর্ট রান নিতে গিয়ে পার্টনারকে অহেতুক রান-আউট করে দিল। তখন ওদের স্কোর ছয় উইকেটে দুশ সাত। বসুমল্লিক একানব্বই রানে নট-আউট! ক্রিকেট তো নয়, এ যেন সেই 'ও কুমির তোর জলকে নেমেছি' খেলা। বসুমল্লিকের পার্টনার রান পায় পাক, ওকে আমরা কিছুতেই দেব না সেঞ্চুরি করতে। ওরা যখন সওয়া দু-দুশো রানে পৌঁছালো তখন লাঞ্চের পর আধঘণ্টা কেটে গেছে। বসুমল্লিক তখন আটানব্বই। কলিন্সের অবস্থা—আমরা আন্দাজ করছি—সেই যাকে বলে 'সসেমিরা'। না পারছে ডিক্লেয়ার করতে, না আরও দেরি করতে।

এই সময় যীজাস ওকে রক্ষা করলেন। নিতান্ত মরিয়া হয়ে বসুমল্লিক একটা বাউন্ডারি হাঁকড়াতে গেল। অন-ড্রাইভ। বল ইয়র্কার হয়ে উড়িয়ে দিল ওর অফ স্টাম্পটা!

আইন-মাফিক প্যাড-আপ করে তৈরি হতে আমরা পনের মিনিট সময় পেলাম। আমরা যখন ব্যাট করতে নামলাম—আমি আর ভূতোদা—ক্লক-টাওয়ারে তখন বেলা একটা বেজে কুড়ি। অর্থাৎ আমাদের সবাইকে আউট করতে ওরা সময় পাবে দু'ঘণ্টা দশ মিনিট! গড়ে আমরা এক-একজন তের মিনিটের বেশি ক্রিজে টিকে থাকতে পারলেই খেলা ড্র!

দুঃখের কথা কী বলব ভাই, তাও আমাদের হিম্মতে কুলোচ্ছিল না। বব্ কলিন্স প্রায় ব্যাকস্ক্রিনের কাছ থেকে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটতে ছুটতে আসে—পাঞ্জাব মেলের স্পিডে বলটা ছাড়ে! লেংথ-ফেংথ কোথায় কী? কখনো 'ফুলটস', কখনো 'লং হোপ'—কিন্তু প্রতিটি সোজা বল! মিস্

করলেই তেকাঠি ফাঁক!

আমি আউট হলাম তৃতীয় ওভারে, মাত্র চার রানে। বোল্ড! আমাদের টিমের বেস্ট ব্যাটস্‌ম্যান শুভব্রতদা এলেন ওয়ান ডাউনে। সাত রানের মাথায় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলেন তিনি। তারপর শুরু হলো শুধু যাওয়া আর আসা। কলিঙ্গ একবার তো প্রায় হ্যাটট্রিক করে ফেলেছিল আর কি!

দু' ঘণ্টা দশ মিনিটের প্রথম ঘণ্টাটা কাটল। আমাদের স্কোর তখন ছয় উইকেটে বাইশ—ভূতোদা নট আউট সতের। পরের উইকেটের পার্টনারশিপে নতুদা আর ভূতোদা একটা জবর স্ট্যান্ড দিলেন। দীর্ঘ সময় দু'প্রান্তেই দুজনে ক্রমাগত *ঠুকুস-ঠুকুস!*

সেই দুখিরামবাবুর উপদেশ—'বিপদে পড়ে খেলা যদি ড্র করতে চাও তাহলে মূলমন্ত্র হলো: ডোন্ট হিট দ্য বল, লেট দি বল হিট য়োর ব্যাট!' ঠুকুস-ঠুকুস—ঠকাস্-ঠকাস্! বব্ কলিঙ্গ খ্যাপা মোষের মতো ফুঁসছে—ফলে বেড়ে যাচ্ছে নো বল, ওয়াইড আর বাঈ রান! যা কিছু রানবৃদ্ধি তা একস্ট্রায়!

চল্লিশ মিনিট বাকি থাকতে আউট হলো নতুদা। স্কোর এখন 'ফিফ্‌টি-সেভেন ফর সেভেন!'

ভূতোদা কিন্তু টিকে আছে ঠিক: ছত্রিশ রানে নট-আউট!

এবার ওদের স্ট্র্যাটেজি হলো সেই আমাদের মতো। ওরা স্থির করল: ভূতোদাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে সিংগল্ রান নিতে দেবে না। ওপন করে সে নট-আউট থাকুক। উল্টো দিকের বাকি তিনটে উইকেট ওরা ফেলে দেবে, ঐ বাকি চল্লিশ মিনিটে।

এবার যে-খেলা শুরু হলো—কী বলব দিদিভাই, দাদুভাইয়ের দল, তেমন খেলা আমি জীবনে দেখিনি!

ভূতোদা প্রতিবার ষষ্ঠ বলে রান নেবেই! প্রত্যেকটি ওভারে!

খেলা এখন বি. ই. কলেজ ভার্সেস্ কৃষ্ণনগর কলেজ নয়—বি. ই. কলেজের এগারোজন ভার্সেস ভূতনাথ ভট্টাচার্য।

প্রতি ওভারের পাঁচটা বলই সে খেলবে। ভূতোদা সেট হয়ে গেছে। হয় বাউন্ডারি, নয় ওভার বাউন্ডারি, নিদেন দু'রান। সিঙ্গল রান সে নেবেই না। পার্টনারকে সে বল 'ফেস্' করতে দেবেই না আদৌ।

ক্লক টাওয়ারে যখন তিনটে পনের—অর্থাৎ আর মাত্র পনের মিনিট বাকি তখন আমাদের স্কোর একশ এগারো ফর নাইন! লাস্ট-উইকেট পার্টনারশিপ। ভূতোদা তখন নট-আউট সেভেন্টিওয়ান! থার্ড ইয়ারের শীতলদা আধঘণ্টাটাক ছয়টা বল খেলবার সুযোগ পেয়েছে। তার স্কোর শূন্য! দুবার মাত্র ব্যাটে-বলে হয়েছে!

ভূতোদা এই সময়ে কলিঙ্গের পাঁচটা বল পর পর ব্লক করতে বাধ্য হলো। কলিঙ্গের পাঁচটা ডেলিভারিই যেন পঞ্চপাণ্ডব—সুপার্ব! এইবার কলিঙ্গের ষষ্ঠ বল। ভূতোদা শীতলদার কানে কানে কী যেন বলে ফিরে গেল ক্রিজে। ঘড়িতে তখন আর পাঁচ মিনিট বাকি। মানে একটি মাত্র ওভার খেলা বাকি। আমাদের স্কোর একশ সাতাশ, নয় উইকেটে। ভূতোদা নট-আউট বিরাশি! শীতলদা ভদ্রভাষায় "ইয়েট টু ওপন হিজ অ্যাকাউন্ট।" নয়টা বল খেলার পর।

পরে শীতলদার কাছে শুনেছিলাম, ভূদ্দা তাকে নির্দেশ দিয়েছিল: কলিঙ্গ-এর ওভারের শেষ বলটা 'ডেলিভারি' হবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি তো মরি রান নিতে। বল কোথায় গেল দেখতে হবে না। ভূতোদা বলটা এদিক-ওদিক, যেদিকে হোক ঠেলে দিয়ে ঠিক এ-প্রান্তে চলে আসবে। ইয়েস-নো—ইয়েস-নো করতে করতে শীতলদা যেন রানাউট না হয়।

কলিঙ্গ তার শেষ বলের আগে নতুন করে ফিল্ড সাজাল। আউট ফিল্ডে কিছু সাদা বক বসে আছে, ফিল্ডার নেই। কলিঙ্গ তার টীমের সব্বাইকে টেনে এনেছে কাছে—ব্যাটসম্যানের চারপাশে। প্রায় যেন মানব-শৃঙ্খল! চৌকা-ছক্কা হয় হোক, এই শেষ বলে সে ভূতোদাকে শর্টরান নিতে দেবে না। এই তার প্রতিজ্ঞা!

আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। এই ঘনীভূত চক্রব্যূহের মাঝখান দিয়ে ভূতোদা যদি একটা শর্টরান না নিতে পারে, তাহলে আমাদের নির্ঘাৎ হার হবে। শীতলদা গুগ্‌লি বৌলার—ব্যাট ধরতেই জানে না। জীবনে দশটা রান করেছে কিনা সন্দেহ।

কলিঙ্গ বোম্বাই মেলের মতো ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে এল। বলটা বুলেটের মতো ওর হস্তচ্যুত হতেই শীতলদা প্রাণপণে দৌড় দিল বিপরীত প্রান্তে। তখনো ব্যাটে-বলে সৌজন্যসাক্ষাৎ হয়নি। বলটা ছিল আউট-সুইঙ্গার, ফুল-টস্। ভূতোদা ব্যাটটা কাত করে ফার্স্ট আর সেকেন্ড স্লিপের মধ্যে দিয়ে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। পারল না! ব্যাটের কানায় লেগে বলটা গিয়ে জমল উইকেট-কীপারের হাতে। একসঙ্গে চিৎকার করে উঠেছে কীপার আর বৌলার—মায় বাকি নয়জন ক্লোজ ফিল্ডার: হাউজ্জ্যাট?

দূর থেকে আমরা বুঝতে পারিনি, বলটা ওর ব্যাটে লাগল না প্যাডে। ভূতোদা কিন্তু ফিরেও তাকালো না। চেয়ে দেখল না আম্পায়ারের আঙুল ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছে কি না। সে নিজে জানে, বল তার ব্যাটেই লেগেছে, প্যাডে নয়; নিজে চোখে দেখেছে উইকেট-কীপার ক্যাচটা ফেলে দেয়নি। ভূতোদা মাথা থেকে টুপিটা (হেলমেট পরার চল তখনো হয়নি) খুলে প্যাভিলিয়নের দিকে নতমস্তকে ফিরে চলল। তার চোখে জল ছিল কি না তা এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে মুখটা থমথমে!

হঠাৎ বোলার-এন্ডের আম্পায়ার প্রফেসর কলিঙ্গ তাকে ডেকে উঠলেন, য়ু দেয়ার! মিস্টার ব্যাটসম্যান!

ভূতোদা ঘুরে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বললে, ইয়েস স্যার?

কাম ব্যাক ইয়াং ম্যান! য়ু আর নট-আউট! ডিডন্ট য়ু লুক অ্যাট মাই সিগন্যাল? য়ু আর নট-আউট ইয়েট!

ভূতোদা বললে, আয়াম সরি, স্যার! য়ু আর রঙ দেয়ার! বলটা আমার ব্যাটেই লেগেছিল, প্যাডে নয়। আয়াম আউট! সরি! আই কান্ট প্লে!

বড় বড় পা ফেলে সে প্যাভেলিয়ান-টেন্টের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

এবার ওর পার্টনার শীতলদা দৌড়তে

দৌড়তে ওর কাছে এসে খামচে ধরল ভূতোদার কাঁধটা : অ্যাই ভূতো! তোর মাথায় কি নিরেট গোবর? আম্পায়ার কী বলছেন, শোন! বব্ কলিন্স ওভারস্টেপ করেছিল। ওটা ছিল : নো বল!

নো বল! জয় মা আনন্দময়ী! তাহলে আমি সত্যিই আউট হইনি!

ক্রিজে ফিরে আসার আগে ভূতোদা আম্পায়ার প্রফেসর কলিন্সের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল : ভেরি সরি, স্যার! মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্যার! 'নো বল' কথাটা 'হিয়ার' করতে পারিনি, স্যার!

প্রফেসর ওর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, অলরাইট, অলরাইট। গো, অ্যান্ড ফেস দ্য লাস্ট বল অফ দ্য ওভার!

ভূতোদা আবার গিয়ে দাঁড়াল। উইকেট গার্ড নিল নতুন করে। বব্ কলিন্স তার বাইশ গজ 'রান' শুরু করল। আবার আমাদের নিশ্বেস বন্ধ হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড! ক্রিজের কাছাকাছি এসে খ্যাঁচ করে ব্রেক কষল বোম্বাই মেল। স্পিন বোলারের মতো কলিন্স ডেলিভারি দিল একটা অতি সহজ লোপ্পা বল!

কায়দাটা বুঝতে পেরেছ তো? বঁড়শিতে একটা রাজভোগ গেঁথে সে মেলে ধরেছে ভূতোদার নাকের ডগায়! আশা : ভূতোদা কপাৎ করে সেটা গিলে একটা ওভার বাউন্ডারি হাঁকড়াবে! ব্যস্! তাহলেই কিন্তু খেল খতম্। ভূতোদা এদিকের ক্রিজে আসতে পারবে না। শীতলদা ছয়-ছয়টা বল কিছুতেই খেলতে পারবে না। ত্যর মানে বি. ই. কলেজ অনায়াসে জিতে যাবে শেষ ওভারে।

কিন্তু ভূতোদা ইজ ভূতোদা! যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল হওয়া চাই তো! ঐ লোপ্পা বলটাকে হুক করল ভূতোদা! কিন্তু শুধু উপরেই উঠল সেটা—উঁচু—উঁচু—আরও উঁচু—বেশি দূরে নয় কিন্তু। বলটা মাটিতে পড়ল লেগ আম্পায়ারের ঠিক পিছনে। ত্রিসীমানায় কোনও ফিল্ডার নেই অবশ্য। দু'একটা সাদা বক শুধু উড়ে গেল। শীতলদা ডানে-বাঁয়ে তাকায়নি। মুহূর্তমধ্যে পৌঁছে গেছে অপর দিকের ক্রিজে। আর ভূতোদা? হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল এ-প্রান্তে। ধীরে সুস্থে পান চিবুতে চিবুতে। যেন, চুনট-করা ধুতির কোঁচা সামলে জমিদার মশাই গানের আসরে মধ্যমণি হতে প্রবেশ করছেন। ওদের একজন ফিল্ডার বহুদূর থেকে ছুটে আসতে গিয়ে আছাড় খেল। তা দেখে শীতলদা চিৎকার করে উঠল : উইস য়ু?

হয়তো আরও দুটো রান সহজেই হয়ে যায়, কিন্তু ভূদ্দা কোনও রিস্ক নেবে না। চিৎকার করে উঠল। নো! নেভার! স্টে দেয়ার।

সে থেবড়ে বসল জুতোর ফিতেটা নতুন করে বাঁধতে। যে ফিল্ডার আছাড় খাবার অভিনয় করেছিল, সে যখন দেখল ভূতোদা আর রান নেবে না, কিছুতেই নেবে না, তখন বলটা কুড়িয়ে আনল।

শেষ ওভারে বল করতে এল ওদের একজন স্পিন বোলার। ভূতোদা দেখে-শুনে তার তিনটে বল ব্যাকফুটে ব্লক করল; কারণ তা না করলে সে তিনটি ডেলিভারি উইকেটে এসে পৌঁছাতো। বাকি তিনটি লোপ্পা বল সে ছুঁলোও না। উইকেট-কীপার কুড়িয়ে নিল সেই তিনটেকে। অর্থাৎ ভূতোদা খুশি মনে শেষ ওভারের স্পিন বোলারকে একটা 'মেইডেন' উপহার দিল। বোলার 'মেইডেন' পেলে হাততালি দেওয়ার একটা প্রথা আছে। এক্ষেত্রে কেউ তা দিল না। সপ্ত নয়, একাদশ রথী মিলে ওভাল মাঠের চক্রব্যূহে বি. ই. কলেজের হবু এঞ্জিনিয়ারেরা আমাদের ক্লাস টেনের চিরস্থায়ী ঐ অভিমন্যুটাকে বধ করতে পারল না! ওদের হাত থেকে নিশ্চিত জেতা খেলাটা ছিনিয়ে নিয়ে এল ভূতোদা একাই।

আমাদের টীমটা ফিরে গেল রাত্রের ট্রেনে—কৃষ্ণনগর।

শুধু রয়ে গেলাম আমরা দুজন। আমি আর ভূতোদা। প্রফেসর উইলিয়াম কলিন্স আমাদের স্যারকে বলে বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করলেন। বব্ কলিন্সের সঙ্গে আমাদের দুজনের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বব্ সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান। সে ভূতোদার ব্যাটিং-এর খুব প্রশংসা করল, ভূতোদাও করল ওর বোলিঙের। বব্ কলিন্স হচ্ছে প্রফেসর উইলিয়াম কলিন্সের একমাত্র পুত্র। এখন থার্ড-ইয়ারে পড়ছে। ওর একটি ছোট বোন আছে, তের-চৌদ্দ বছর বয়স—লিজা। ভাল পিয়ানো বাজায়। বব্ আমাদের দুজনকে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। ইউরোপিয়ান ব্যারাকের দ্বিতলে। উইলিয়াম কলিন্স বিপত্নীক। ছেলে-মেয়েদের নিয়েই তাঁর সংসার। এখানে কলেজে অঙ্ক শেখান। উনি অক্সফোর্ড-এর ডক্টরেট। স্থির হয়েছিল, আমরা দুজন সে রাত্রে ওঁদের কোয়ার্টার্সে গেস্টরুমে থাকব। পরদিন সকালের কেষ্টনগর লোকাল ধরে ফিরব।

সন্ধ্যাবেলায় গরম জলে স্নান করে আমরা বৈঠকখানায় এসে বসলাম। অনেক অনুরোধ করায় লিজা পিয়ানোতে কীসব প্রিং-প্রিং করল। শুনলাম তার নাম 'সোনাটা'। প্রফেসর-সাহেব তাঁর ছাত্রজীবনের বিচিত্র সব কাহিনী শোনালেন। বললেন, তোমরা ডব্‌লু. জি. গ্রেস্-এর নাম শুনেছ?

আমার জানা ছিল না। ভূতোদা বললে, ইয়েস স্যার! হি ওয়াজ ফাদার অব ইংলিশ ক্রিকেট!

প্রফেসর বললেন, নো মাই চাইল্ড! হি ওয়াজ নট দ্য ফাদার, হি ওয়াজ দ্য গ্র্যান্ড-পা অফ্ ইংলিশ ক্রিকেট।

বিস্তারিত শুনলাম ওঁর কাছে।

ডবলিউ. জি. গ্রেস-এর জন্ম ব্রিস্টলের কাছে, 1848 সালে। বুঝে দেখ, কতদিন আগেকার কথা! রবীন্দ্রনাথের জন্ম হতে তখনো তের বছর বাকি। গ্রেসের যখন ষোলো বছর বয়স তখনি তিনি ক্রিকেটার হিসাবে স্কুলে সুবিখ্যাত। ঐ বছর গ্রীষ্মকালে লর্ডস্ মাঠে একটা খেলার আয়োজন হয় : জেন্টেলমেন ভার্সেস ক্রিকেটার্স! স্কুলের ছেলে গ্রেস ঐ ক্রিকেটার্স দলে নির্বাচিত হন এবং একদিনের ক্রিকেটে একটি হাফ-সেঞ্চুরি করেন! তারপর 1864 থেকে 1895 এই একত্রিশ বছরে তিনি ফার্স্টক্লাস ক্রিকেটে গোনাগুনতি একশটা সেঞ্চুরি করেন। ইংলিশ টীমের ক্যাপ্টেন হয়ে ক্যানাডা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেন। সে আমলে বছরে কটাই বা খেলার সুযোগ হতো! ডবলিউ. জি. গ্রেস ঠাকুর্দা মাপের দাড়ি রেখেছিলেন। দারুণ মজাদার

লোক ছিলেন। একবার তিনি নাকি অহেতুক উইকেট থেকে লাফ মেরে সরে গিয়ে দেখেছিলেন কীভাবে তেকাঠি ফাঁক হয়। তখন তাঁর স্কোর 99; পরে সাংবাদিকেরা যখন কারণটা জানতে চায় তখন গ্রেস বলেন, "জীবনে বিরাশিটা সেঞ্চুরি করেছি, নিরানব্বইয়ে আউট হতে কেমন লাগে তা দেখছি।"

ভূতোদা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি, স্যার, ওঁর ব্যাটিং দেখেছেন?'

মিষ্টি হাসলেন প্রফেসর কলিন্স। বললেন, 'জীবনে একবার। সেটাই তাঁর জীবনে শেষ ব্যাটিং এবং শেষ অসমাপ্ত সেঞ্চুরি। আমার বয়স তখন সতের।'

আমরা শুনতে চাইলাম সে গল্প। বব্ আর লিজা অবশ্য সে গল্প আগেও শুনেছে। তবে এসব দুর্দান্ত গল্প কখনো পুরনো হয় না। প্রফেসর বিল কলিন্সের মুখে সেই সন্ধ্যায় শোনা গল্পটা তোমাদের শোনাই:

ডব্লিউ. জি. গ্রেস পেশায় ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তারী ডিগ্রিও ছিল তাঁর। জীবনের শেষ খেলা—যেটার কথা প্রফেসর বিল কলিন্স শোনালেন—সেটা তিনি খেলেছিলেন সাতান্ন বছর বয়সে, 1905 সালে। অক্সফোর্ডের মাঠে।

সে সময় বব্-এর ঠাকুর্দা, অর্থাৎ বিল কলিন্সের বাবা ছিলেন অক্সফোর্ড-এর 'ডন'। বিল কলিন্স তখন উঠ্তি জোয়ান। মাত্র সতের বছর বয়স। ঐ অক্সফোর্ডেই পড়ছেন তিনি। সেই সময়—1905 সালে—কী একটা কনফারেন্সে ডঃ গ্রেস অক্সফোর্ড-এ এসেছিলেন। আগেই বলেছি, তখন তাঁর বয়স সাতান্ন। কনফারেন্স শেষ হলো বিকাল নাগাদ। ওঁরা দল বেঁধে গেস্ট-হাউসের দিকে চলেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আপ্যায়ন করতে ওঁদের সঙ্গে পথ দেখিয়ে চলেছেন বিল কলিন্সের বাবা ডন কলিন্স। রাস্তার ধারে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গ্রেস। দলের সবাইকে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি আসছি—ঐ যে ছেলেটি নেট-প্র্যাকটিসে ব্যাট করছে, ওর 'স্টান্স'টা ঠিক হয়নি। একটু দেখিয়ে দিয়ে আসি—

এই সূত্রেই জানাজানি হয়ে গেল যে ক্রিকেট-জগতের অবসরপ্রাপ্ত বিস্ময় ডবলিউ. জি. গ্রেস অক্সফোর্ডে এসেছেন। ছেলেরা ওঁকে চেপে ধরল, একটু ব্যাটিং করে যান স্যার, নেট প্র্যাকটিসে। আমরা একটু দেখি। আমরা জন্মাবার আগেই তো আপনি ক্রিকেটকে ডিভোর্স দিয়েছেন!

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন ক্রিকেটের ঠাকুর্দা। বললেন, না না, না। ক্রিকেট ইজ মাই ফার্স্ট ল্যভ অ্যান্ড দ্য লাস্ট। তোমরা কালকে একটা হাফ-ডে ম্যাচ অ্যারেঞ্জ কর। আমি খেলব।—জেন্টেলমেন ভার্সেস ক্রিকেটারস্। আমার জীবনের প্রথম খেলা। বছর দশেক ব্যাট করিনি বটে তবে খেলাটা ভুলিনি!

কী দারুণ খবর। ঢোল সহরৎ করতে হলো না। মুখে মুখে খবরটা রটে গেল। পরদিন অক্সফোর্ড মাঠে আবার একটা খেলা হবে—চার দশক পরে—জেন্টেলমেন ভার্সেস ক্রিকেটার্স! প্রথম দলে ক্যাপ্টেন ডব্লিউ. জি. গ্রেস, গ্র্যান্ডফাদার অফ ইংলিশ ক্রিকেট! এখন তিনি আর 'ক্রিকেটার' নন, 'জেন্টেলম্যান'।

পরদিন স্থানীয় কাগজে সংবাদটা ছাপা হয়ে গেল। এমনকি লন্ডন থেকে দলে দলে সাংবাদিকেরা ছুটে এল ক্যামেরা নিয়ে। গ্রেস-সাহেবের শেষ খেলা দেখতে।

ডোনাল্ড কলিন্স—মানে বিল কলিন্সের বাবা ছিলেন সেই হাফডে-ম্যাচের আম্পায়ার আর বিল কলিন্স—সতের বছরের উঠতি জোয়ান ক্রিকেটার্স দলের ফাস্ট-বোলার! অক্সফোর্ড স্কুল-টিমে সে বাঁধা খেলোয়াড়। টস হলো—জেন্টেলম্যান দলের ক্যাপ্টেন, ডঃ গ্রেস টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খবরটা দর্শকদলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মাঠে নাহোক দশ হাজার লোক। প্রায় একশ বছর আগেকার কথা! তখন মাঠে এত বিপুল জনসমাগমই একটা রেকর্ড। হেতু ঐ একটাই—প্রায় তিন-কুড়ি ছুঁই-ছুঁই গ্রেস এক দশক পরে আবার ব্যাট হাতে মাঠে নামছেন।

ফিল্ডার দল মাঠে নামল। বিল কলিন্সের হাতে বল। সে মাঠে প্লেয়ারদের ইচ্ছামতো সাজালো। গ্রেসের বিখ্যাত মার হচ্ছে কভার ড্রাইভ আর 'অনে' ওভার বাউন্ডারি। কলিন্সের পুঁথিপড়া বিদ্যে। তবে সেই মোতাবেক লং অন, লং অফে দুজনকে রেখেছে, ডীপ স্কোয়ার লেগেও একজনকে। কারণ খাটো লেংথে বল পড়লেই হুক করেন উনি।

পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে ডব্লিউ. জি. গ্রেস মাঠে নামলেন। হুবহু সান্টাক্লজ! তেমনি জোব্বা, তেমনি দাড়ি। লেগ-স্টাম্প গার্ড নিলেন উনি। খেলা শুরু হলো। হাততালিতে ফেটে পড়ল মাঠ।

বিশ গজ দূর থেকে ছুটতে ছুটতে বব্ কলিন্সের বাবা বিল কলিন্স তাঁর ওভারের প্রথম বলটি ডেলিভারি দিলেন। ইন-সুইঙ্গার! ডবলিউ. জি. গ্রেস বোধহয় ব্যাকফুটে ব্লক করতে চেয়েছিলেন বলটা—দেখতেই পেলেন না, কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল—তারপর পিছন ফিরে দেখেন তিন কাঠি ছিটকে গেছে।

সারা মাঠ 'হায় হায়' করে উঠল।

গ্রেস এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। তারপর নির্বিকারভাবে স্টাম্প তিনটে কুড়িয়ে এনে স্বস্থানে পুঁতে দিলেন। বেইল-জোড়া তার মাথায় বসিয়ে বলটা বৌলারকে নিজেই ফেরত পাঠালেন। আবার স্টান্স নিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

ফিল্ডাররা হতভম্ব! এর মানে কী? আম্পায়ার ডোনাল্ড কলিন্স গুটি গুটি এগিয়ে এলেন ডক্টর গ্রেসের দিকে। কাছে এসে ইতস্তত করে বললেন, ইয়ে হয়েছে, আপনি...মানে...ইয়ে—আউট হয়ে গেছেন, ডক্টর গ্রেস!

গ্রেস বলেন, নাকি? কে বললে? কই কেউ তো 'হাউজ্জ্যাট' হাঁকেনি?

ডন কলিন্স আমতা আমতা করে বলেন, বোল্ড আউটের ক্ষেত্রে কেউ তা ডাকে না স্যার।

আজকাল এই নিয়ম হয়েছে বুঝি? তা সেটা তো আমাকে আগে বলবে! যাহোক, তোমার ছেলেকে নেক্সট বলটা করতে বল।

প্রফেসর ডোনাল্ড উত্তরে কী বলবেন ভেবে পেলেন না। স্যার গ্রেস বললেন, লুক হিয়ার ইয়াং ম্যান! হোয়াই হ্যাভ দিস্ টেন থাউজেন্ট পার্সনস্ অ্যাসেম্বল্ড

হিয়ার? টু সী য়ু আম্পায়ারিং? নো! দে'ভ কাম টু সি ডব্‌লিউ. জি. গ্রেস ব্যাটিং। গো! অ্যান্ড স্টাড বিহাইন্ড দ্য বোলার্স এন্ড উইকেট!

ডোনাল্ড কলিন্স অবাধ্য হলেন না।

পরের একঘণ্টা নাকি বিল কলিন্সের কাছে একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ওঁর মনে হচ্ছিল এগারো নয়, বাইশ জন ফিল্ডার থাকলেও সেদিন গ্রেসের সেঞ্চুরি ঠেকানো যেত না। কারণ পর পর পাঁচ ওভারে আটটা ওভার বাউন্ডারি হাঁকালেন তিনি। বাইশ কেন, তিন-এগারং তেত্রিশ জন মাঠে থাকলেও তো ঐ ওভার বাউন্ডারিগুলো ঠেকানো যেত না।

টীমের স্কোর যখন একশ আর গ্রেস নট-আউট পঁচাত্তর তখন হলো ড্রিংকস্ ব্রেক। খিদমদগারেরা জল নিয়ে এল মাঠে। যে মেডিক্যাল টিমের সভ্য হয়ে গ্রেস অক্সফোর্ডে কনফারেন্সে এসেছিলেন তার দলপতি ঐ সঙ্গে মাঠে ঢুকলেন। বৃদ্ধ গ্রেসকে তৃণাচ্ছাদিত মাঠে পেড়ে ফেলে পরীক্ষা করলেন। নাড়ি দেখলেন, জিব দেখলেন, রক্তচাপ দেখলেন। তারপর দুই আম্পায়ারকে ডেকে বললেন, শোন হে! তোমাদের স্কোরারকে বল খাতায় লিখে রাখতে W. G. Grace ইজ রিটায়ার্ড হার্ট!

গ্রেস শুয়ে ছিলেন। তড়াং করে লাফিয়ে ওঠেন। বলেন, ইয়ার্কি নাকি! আমি বিলকুল সুস্থ! আর পঁচিশটা রান করবই!

ডেলিগেশানের চেয়ারম্যান বললেন, অলরাইট! তাহলে তোমরা খাতায় লিখে রেখ—"গ্রেস রিটায়ার্ড আন-হার্ট অন মেডিকেল অ্যাডভাইস!"

ডক্টর ডাবলু. জি. গ্রেসের জীবনে সেটাই শেষ ইনিংস: সেভেন্টি-ফাইভ নট-আউট। [রিটায়ার্ড আনহার্ট অন্ মেডিকেল অ্যাডভাইস]!

প্রফেসর কলিন্স তাঁর চেস্ট-অব-ড্রয়ার্স খুলে একটি জীর্ণ অটোগ্রাফ খাতা বার করে আনলেন। তাতে আজব সব মানুষের স্বাক্ষর: ব্র্যাডম্যান, পন্সফোর্ড, উডফুল, ভেরিটি, লারউড, অ্যানা পাব্‌লোভা, রদ্যাঁ, জি. বি. এস, এম. কে গান্ধী! আর আছে ঐ ক্রিকেট পিতামহের

নাক ডাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়েছে।

আশীর্বাদসহ স্বাক্ষর:

Congratulations Bill for your first fast delivery to bold some one named W. G. Grace, who, nevertheless, scored seventyfive runs being resurrected through your father's grace.

With grace from: W. G. Grace,
Oxford, 17.7.1905

[বিল তোমাকে অভিনন্দন জানাই—তোমার ঐ বিদ্যুৎগতি প্রথম ডেলিভারিটার জন্য, যাতে কে-এক হরিদাস পাল, ডাবলু. জি. গ্রেস আউট হয়ে গেছিল, যদিও পরে তোমার পিতৃদেবের মহানুভবতায় পুনর্জীবন পেয়ে সে পঁচাত্তরটা রান করেছিল—

আশীর্বাদক ডাবলু. জি. গ্রেস,
অক্সফোর্ড, 17.7.1905]

রাত্রে নৈশাহারটি হলো রাজকীয়। বিলাতী খানা। তবে আমরা দুজন ব্রাহ্মণ বলে নিষিদ্ধ মাংস রান্নাই করা হয়নি। সে আমলে 'মুরগী'ও ছিল নিষিদ্ধ মাংস। আমরা খেলাম, টমেটো সুপ, ভেটকির ফিশ্-ফ্রাই, স্যালাড, পরোটা, চিংড়ি মাছের কাটলেট, পোলাও, রুই-মাছের কালিয়া আর ক্যালামেল পুডিং।

লিজা আর বব্ আমাদের গেস্টরুমে পৌঁছে দিয়ে গেল। এটা অতিথিদের জন্য। তাছাড়া বব্-এর স্টাডিরুমও বটে। ওর টেবিলে বইপত্র, বড় বড় ড্রইং-শীট সব সাজানো। একটা বড় গ্লোব। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লিজা আমাদের দেখিয়ে দিল অক্সফোর্ড-এর অবস্থান।

ঘরটা বেশ বড়। পাশাপাশি দুটি খাট। মশারি টাঙানো। সংলগ্ন টয়লেট। টেবিলে ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল। ওরা দুজনে 'গুড-নাইট, সুইট-ড্রীমস্' বলে বিদায় নিলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দরজাটা বন্ধ করে দেব তো?

বব্ বললে, কোনো দরকার নেই। নাইট-গার্ড পাহারা দেয়। তাছাড়া এখানে চুরি-চামারি আদৌ হয় না!

তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারি, রাত্রে কেন আমাদের দরজা বন্ধ করে শুতে বারণ করেছিল। ববের মাথায় দুষ্টু-বুদ্ধি খেলছিল। সারাদিন মারাত্মক বোলিং করেও ভূতোদাকে সে আউট করতে পারেনি, তাই একটা 'প্র্যাকটিকাল জোক'

করার মতলব ভেঁজেছিল সে। আমরা দুজন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সারাদিনের ধকলে আর তারপর পরিপাটি আহারে। তারপর ফিরে এসেছিল বব্ আর লিজা। কাঁচি দিয়ে ভূতোদার মশারির চালে একটা বিরাট তিন ইঞ্চি ব্যাসের ছ্যাঁদা কেটে দিয়ে যায়। হাওড়ায় মশা প্রচণ্ড! প্রায় চড়াই পাখির মতো বড় বড়। সারাদিন ক্রিকেট খেলে ক্লান্ত মানুষটার কী অবস্থা হবে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আমি সে-রাতে কিছুই টের পাইনি। জানতে পারলাম পরদিন সকালে।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল আমার পাখির কিচিমিচিতে। ওয়াশ-বেসিনে মুখটা ধুয়ে দেখি ভূতোদা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মাঝরাতে মশার কামড়ে উঠে বসে সে মশারিটা মেরামত করেছিল। তিন ইঞ্চি ব্যাসের ছ্যাঁদা তো আর সেলাই করা যায় না। তাছাড়া কোথায় সূঁচ, কোথায় সুতো? ভূতোদা ওসব দিকে হাঁটেইনি। সে টেবিল থেকে একটা কাঁচি তুলে নিয়ে মশারিতে আরও একটা ছ্যাঁদা বানিয়েছে। তারপর বব্ কলিন্স-এর একটা ড্রইং-শীট পাকিয়ে মশারির এপার-ওপার একটা ফানেল বানিয়ে দিয়েছে। ব্যস্! কেল্লা ফতে! কলকাতার মশা ওকে কামড়াতে এসে পৌঁছে যায় হাওড়াতে; আর হাওড়ার মশা ফানেল পথে পৌঁছে যায় কলকেত্তা! এপার গঙ্গা আর ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর! গোপাল ভাঁড়ের দেশের শিব সদাগর সেই মধ্যিখানের চরে নাক ডাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়েছে। ডন ব্র্যাডম্যান লারউডের বডিলাইন বলের তোয়াক্কা করেননি। ভূদ্দাই বা করবে কেন বব্ কলিন্সের বডিলাইন মশায়!

ভূদ্দার এই আবিষ্কারটাকে আমি বলতে চেয়েছি: "বাইপাস সার্জারি"। অপারেশন "পন্টুন-ব্রিজও" বলা যেত। তাই না?

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

অলীক

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কাবুলের উত্তরে ছিল সেই দেশটা,
মাঝরাতে গিয়ে দেখি নেই।
কি করে লোপাট হলো? এত বড় হেঁয়ালির
পাচ্ছিনে ভেবে ভেবে খেই।
কেউ ছিল ভূত সেজে, কেউ কাকতাড়ুয়া,
কারো ছিল গলা খুব হেঁড়ে,
কেউ খুব মিনমিনে, কারো চোখে সন্দেহ,
ওদিকে লুকোচ্ছে ওটা কে রে?
আজগুবি বাজপাখি, ভয়ানক চেহারার
আদ্ধেক জন্তুরা আদ্ধেক দানো,
সারাদিন গম্ভীর, হুকুম চালাতো জোর,
হুকুমের অন্যথা ছিল না কখনো।
জানাজানি, কানাকানি, চারিদিকে কালাপানি,
পলকে বেঁটেরা হতো লম্বা,

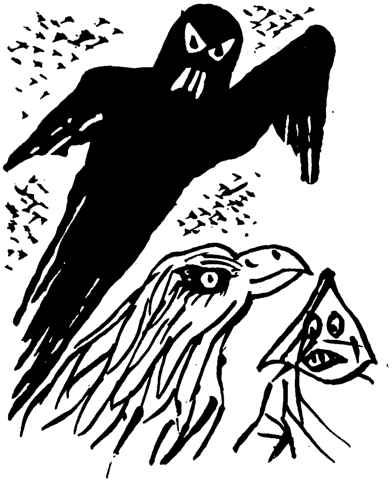

কেউ খুব চটপটে, কেউ খুব আলসে,
আড়ালে কেউবা খেত রম্ভা।
সম্মুখে যা যা পাই, সারাদিন তাই খাই,
সাতমুখো ছিল এক ডাইনি,
বলত সে হা হুতাশে, পেট পুরে কতদিন
শেয়ালের চচ্চড়ি খাইনি।
এরকমই অদ্ভুত ছিল সেই দেশটা,
গেল নাকি শেষতক উবে?
সাহস হয় না দেখি সাগরের তলাটায়
আছে কিনা চুপচাপ ডুবে।
ভেতরে ভেতরে চলে তবু কথা চালাচালি,
দুই চোখ বুঝে ফেলি যেই
দেখি সেই বাজপাখি আর সেই দানোটা
দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনেই।

ভাগ্যিস

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটি ভিজে প্যাচ্‌পেচে
হাতি ভিজে চপ্‌চপ
জলে আছে বলে শুধু
ভিজছে না কচ্ছপ।

গাছ ভিজে জবজবে
পাতা ভিজে টিস্‌টিস্
আমরা ভিজিনি কেউ
ঘরে আছি ভাগ্যিস!

ছবিঃ সুফি

ট্রেনের কামরায় তখনও তেমন ভিড় হয়নি। আর দু'চারটে স্টেশন যেতে না যেতেই হয়তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসার এই সুখ আর থাকবে না। কয়েক দফায় ভাগ করা কামরার মাঝের খোপে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে নজরটা সহজেই চলে যায়। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মেদ নামক কোনো পদার্থ শরীরে নেই। সাদা পাতলুনের ওপরে সাদা জমিতে নীলের ছিটে দেওয়া হাফ পাঞ্জাবি, চোখে শৌখিন চশমা। খাড়া নাকের তলায় যেন ওটুকু গোঁফ নয়, ছোট্ট একটা মথ বসেছে, তার কালো পিঠে রুপোলি আঁচড়। কার্টুন মার্কা মুখ।

বাঙ্কের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে ভদ্রলোক মিটিমিটি হাসছিলেন আর ঘুরে ফিরে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ।

নিচের সিটে এক মায়ের কোলে ঘুমন্ত বাচ্চা। আর একটি বছর পাঁচেকের ছেলে পাশেই কুঁকড়ে-মুকড়ে ঘুমোচ্ছে। উল্টো দিকের কোণে, বোকা-বোকা মুখ এক দশাসই চেহারার আধ বোজা চোখে ঝিমোচ্ছে। ওধারে ক্যাম্বিসের ভাঁজ করা একটা খালি ব্যাগ কোলে করে উদাস মুখে একজন বসে আছে। চোখ দুটো তার এপাশে-ওপাশে ঘুরছে, মাথায় বোধ হয় হাটে সওদা করতে যাওয়ার চিন্তা। এধারে-ওধারে, এমনকি খালি বাঙ্কের ওপরেও ধরাশায়ী মানুষ, সবারই কিছু চেহারা আর চরিত্র এক নয়।

'এক এক সময় এমন হাওয়া আসে, যে হাওয়া ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে থাকে। সেটাই তখন ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ায়!' কথা বললেন সেই বাঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসা লোকটি। বেশ চাঁচাছোলা গলা, গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে যেন পাক খেয়ে গেল। সবাই চমকে তাকালো। নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা হয়নি, তবু বোধহয় সকলকে শুনিয়েই।

'মিনি-ডাকাতি! হেডিংটা কিন্তু জব্বর দিয়েছে!' সেই লোকটিই আবার। কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে থাকলেন, 'সোমবার দুপুরে মোমিনপুরের কাছে পাঁচজন দুষ্কৃতি যাত্রী সেজে জোকাগামী একটি মিনিবাসে ওঠে। রেল-ডাকাতের মতোই তারা একসময় পকেট থেকে রিভলভার আর ক্ষুর বের করে যাত্রীদের ভয় দেখায়, কেউ বাস থেকে নামার চেষ্টা করবেন না। যার কাছে যা আছে বের করে দিন, না হলে গুলি চলবে!'

হাতের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে বললেন, 'তাহলেই বুঝুন, এখন এই মুহূর্তে যা রেলের কামরায় চলছে সেটাই ছড়িয়ে গেছে মোমিনপুর-জোকার দিকে। ক্রমশ সব জায়গার মিনিবাসেই ছড়িয়ে যাবে।'

থপাস করে খবরের কাগজটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ডাকাতদের কি রকম দেখতে হয়? চেহারা দেখে কি চেনা যায়?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না। দেবে কি

গুলাতঙ্ক

আনন্দ বাগচী

করে? কেউ কখনও নিজের চোখে ডাকাত দেখেছে এমন মনে হয় না তবু কোণের দিক থেকে একজন দুর্বল গলায় বলল, 'কি রকম দেখতে আপনিই বলুন?'

'শৌখিন চশমা পরা কোনো ডাকাত দেখেছেন কখনও?'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে লোকটি এক লম্ফে নিচে নামলেন, 'এই আমার মতো!'

দশাসই চেহারার লোকটার আধবোজা চোখ পুরো মাত্রায় খুলে গেল। কার্টুন মার্কা চেহারার ডাকাতটি ছোঁ মেরে মায়ের কোল থেকে বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে লোকটার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'অ্যাই হোঁত্কা, ছেলে ধর।'

বোঝা গেল ভদ্রলোক না, লোকটা আদতে ডাকাত! এতক্ষণ মিথ্যেই সম্মানের চোখে দেখা হচ্ছিল।

বাচ্চাটা তারস্বরে কেঁদে উঠল। সকলের অলক্ষ্যে ঘুরপাক খেয়ে ফস করে কোত্থেকে একটা রিভলভার বের করে সবাইকে চমকে দেয়, 'টুঁ শব্দটি করলেই আমার লোকেরা দু'পাশ থেকে ছুটে আসবে। চাইকি পুলিশও আসতে পারে।'

তারপর এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটির গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে খালি ব্যাগটা টেনে নিয়ে বলে, 'যার যা আছে নিজে থেকেই বের করে এই থলেতে ভর। চালাকি করার চেষ্টা করলে কিন্তু কপালে দুঃখু আছে, গুলি চলবে।'

দলা পাকিয়ে শুয়ে থাকা ছেলেটা এবার চিলচেঁচানি চেঁচাতে থাকল। কিছু এরকম লাগাতার কাঁদুনে বাচ্চা থাকে যাদের কান্নার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। ক্লান্তি নেই। ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে চালিয়ে যায়। ধমক দিয়ে মেরে-ধরেও দমানো যায় না।

ওপাশ থেকে একজন ছুটে এল কান্না চাপা দিতে। ফল হলো উল্টো।

'এ দুটো ছেলেধরা নাকি, মশাই?' বারুদের স্তূপে কেউ একটা জ্বলন্ত কাঠি ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল, 'ছেলেধরা! ছেলেধরা!' ডাকাতের ভয় আর কাউকে রুখতে পারলী না। এপাশ ওপাশ থেকে লোক ছুটে আসতে থাকল। বাচ্চা দুটোকে সরিয়ে দিয়ে চলল গণধোলাই। সবাই এক কিস্তি হাতের সুখ করে নিতে চায়।

'ব্যস ব্যস, মরে যাবে যে, আর না! এরা কেউ ছেলেধরা না, ডাকাত। ওই যে একজন পালাচ্ছে, ওকে ধরুন!'

সব কটাই ধরা পড়ল। সামনের স্টেশনে তাদের পুলিশের হাতে চালান করে দেবার পর কে একজন বলল, 'তাহলে আপনি কে মশাই? ডাকাত যে নন সে তো বুঝতেই পেরে গেছি। মিথ্যেই ডাকাত সাজার চেষ্টা করেছিলেন, খুব ঝুঁকি নিয়েছিলেন কিন্তু। পুলিশের হাত থেকে বাঁচলেও ওই বারোয়ারি পিটুনির হাত থেকে বাঁচা শক্ত ছিল।'

সেই কার্টুন চেহারার লোকটি জবাবে বললেন, 'আপনাকে সেজন্যে বহুৎ ধন্যবাদ। আমি কে? আমি আপনাদের মতোই এক সাধারণ যাত্রী। উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে অল্পবিস্তর সাহস দেখিয়েছি মাত্র। দেখুন, এই কৌশলটুকু না করলে ওদের ধরাই যেত না!'

'আর তুমি তাহলে কে?' কান্টু মান্টু ঝান্টু আর নাট-বল্টু সবাই এবার ঘিরে ধরে।

গুলঞ্চ মামা বেশ কায়দা করে বুকে আঙুল ঠুকে বলেন, 'চিনতে পারলি নে, আমিই সে। সেই সাজা ডাকাত।'

'ঠিক বলেছ গুল মামু! আমরা কোনোদিন তোমাকে চিনতে পারিনি। আজ ইস্তক না।' বল্টু খোঁচা মারে। গুলঞ্চ কথাটার প্রথম দু' অক্ষর নিয়ে ও 'গুল' তৈরি করেছে। মামার এই সম্বোধন খুব না-পসন্দ।

ভুরু কুঁচকে মামা বললেন, 'ঘটে ছিটেফোঁটা বুদ্ধি থাকলেই চিনতিস! লোকটা আমিই না হলে অতকথা জানলাম

দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে

কি করে? সব আমার এই মগজের সৃষ্টি, তা জানিস?' মামা নিজের কপালে কাঠঠোকরার মতো আঙুল ঠোকেন।

'জানি মামু, জানি। তোমার মগজ থেকেই সব জন্মায়। তোমাকে ক্ষণজন্মা বললে কি ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়ে যাবে মনে কর? তা কত জায়গায় যে কত কিছু ঘটিয়ে বেড়াচ্ছ, হাতেনাতে তার কি কোনো প্রমাণ আছে?'

'এত বড় কথা! গুরুজনকে ভক্তি-ছেরেদ্দা করতে তো আর শিখলিনি! ওই জন্যেই বলে নরানাং মাতুলক্র' বলেই জিভ কেটে সামলে নিলেন। বুঝলেন উপমাটা বেকায়দা হয়ে যাচ্ছে। তাই হেঁচে কেশে শব্দটাকে ঘুরিয়ে দিলেন, 'তাই বলি, নরে আর বানরে এইখানেই তফাত। গুলঞ্চ মামা না বলে কেন তোরা গুল মামা বলে ডাকিস তা কি জানি না? হাতে-নাতে প্রমাণের কথা যখন তুলেছিস, বেশ তাই দেব। এই দ্যাখ—'

মামা পকেট থেকে কি যেন বের করেন।

'দেখি-দেখি-দেখি-দেখি!' গাছতলায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

বাগানে আমগাছের সবচেয়ে নিচু ডালে পা ঝুলিয়ে ভাগ্যিস বসেছিলেন, টানামানিতে আর একটু হলেই উলটে পড়তেন।

'এঃ মামু, এ যে সস্তার খেলনা পিস্তল!' বল্টু বলে ওঠে।

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। আসলটা নিয়ে গিয়ে মরি আর কি! রেলের কামরায় কখনো ও জিনিস নিয়ে যেতে আছে! আচ্ছা, কাল্টুকেই এটা দিয়ে দিলাম। তোদের মধ্যে ওই সবচে ছোট। ওর কথা ভেবেই বাচ্চাটাকে এটা ফেরত দিয়ে আসিনি।'

নাট বলল, 'ও মামু, তুমি আর একটা জিনিস এনেছ গো! ওটাও কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ হতে পারতো।'

'কী এনেছি? কি সেটা?'

'তোমার চোখের ওই বাহারি চশমা। আগে তো কখনও দেখিনি! কোত্থেকে বাগালে গো?'

মামা লজ্জা-লজ্জা ভঙ্গি করে বলেন, 'ধুস্ বলতে লজ্জা করে!'

'লজ্জা! তোমার! এও তো আগে কখনও দেখিনি গো! তা হঠাৎ লজ্জা কেন?'

'ভাববি পাবলিসিটি করছি। নিজের ঢাক নিজে পিটছি।'

'কি যে বল মামু! আমাদের আর লজ্জা দিও না। তুমি লাইফে কখনও নিজের ঢাকা অন্যকে দিয়ে ছাড়া নিজে পিটেছ? আমরা তো আমরা, তোমার শত্তুরেও একথা বলতে পারবে না। কিন্তু চশমার সঙ্গে পাবলিসিটির কি সম্পর্ক তা তো বুঝলাম না?'

'সম্পর্ক একটা আছে বৈকি! হেতমপুরের রাজবাড়ি থেকে এটা আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। ভাবতেই পারিস যে রাজারাজড়ার গপ্পো ফাঁদছি। কিন্তু এটা তো গালগল্প নয়, সত্যি ঘটনা।'

নাট আর বল্টু পরস্পর নজর ঠোকাঠুকি করে নিয়ে বলে, 'কিন্তু মামুগো, চোখ খারাপ না হলে কি কাউকে—'

'আরে সে এক কাহিনী! চোখ তো বিলক্ষণ খারাপই হয়েছিল। গোড়া থেকেই শুরু করি তাহলে কি বলিস?'

'আগা থেকেও করতে পার।' বল্টু বলল, 'শুরু করাটাই বড় কথা তোমার পক্ষে।'

'শোন তাহলে। রাজা বললেন, আচ্ছা গুলঞ্চ শর্মণ, আমার আয়ুষ্কালটা দেখে দিন তো একবার। তা আমি উঠে গিয়ে রাজার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। তাকিয়ে তো তাজ্জব। হাত এক্কেরে ধোয়ামোছা, রেখার কোনো চিহ্নই নেই। বুঝলাম আমারই নজর খারাপ হয়েছে। হাতের সঙ্গে প্রায় চোখ ঠেকিয়ে সামান্য হিজিবিজি কি একটুখানি দেখতে পেলাম। তা থেকে ক্যালকুলেশন করা অসম্ভব। অপ্রস্তুত হয়ে ভাবছি কি বলা যায়। হঠাৎ রাজা বললেন, দেখুন তো, আমার এই হাতে কটা আঙুল? হাতটা অনেকটা তফাতে নিয়ে মেলে ধরলেন। আমি ঝট করে বলে দিলাম, ছ' আঙুল।'

বল্টু অবাক, 'রাজার হাতে কি ছটা আঙুল ছিল?'

'কি করে বলবো? আঙুল-ফাঙুল ভাল দেখতে পাইনি। তবে অনেকের থাকে, তাই বলে দিয়েছিলাম। আসলে এক আঙুল বেশি বলা হয়ে গিয়েছিল। বেশিতে অবিশ্যি দোষ নেই, কমানো যায়। কিন্তুক যদি—'

'বুঝেছি, পাঁচ বললে সত্যিই যদি হাতে ছটা আঙুল থেকে থাকে, আর একটা তখন পাবেন কোথায়?'

'ঠিক! তাপ্রে শোনো। রাজার কিছু সন্দ হয়েছিল নেশ্চয়। একজনকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন। অমনি দুটো লোক এসে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে কোথায় নিয়ে চলল। মুক শুকিয়ে গেল। ভাবলাম, এইরে শূলে দেবে নাকি ব্যাটারা? শেষে প্রাণে বাঁচলাম। ডাক্তার নানা রকম পরীক্ষা করে চশমা বানিয়ে দিলেন। চটজলদি ব্যবস্থা। আবার ফিরে আসতে হল রাজার কাছে। জানতাম রেহাই নেই।'

'সেই তো হাত দেখতেই হল আবার?' নাট বলল।

'নেশ্চয়! গুলঞ্চ শর্মাকে না হলে, হেঃ হেঃ—'

বল্টু বলল, 'মামু, তুমি জ্যোতিষী বিদ্যেটা যে গুলে খেয়েছ, জানতাম না তো! আমার হাতটা একটু যদি—'

'আমি কি না জানি বল? কিন্তু কটা আর তোদের বলেছি—'

'না বলার কারণ অবিশ্যি আমরা জানি।'

'কী?'

'তুমি নিজের ঢাক নিজে পেটাও না বলে!'

'অই তো সমিস্যে রে, নাট-বল্টু!' মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

বরাবরই গুলঞ্চ মামা থেকে থেকে উধাও হয়ে যান। তারপর হঠাৎ একদিন দমকা হাওয়ার মতো আবার গাঁয়ে ফিরে আসেন নতুন গপ্পো শোনাতে। তখন ভাগ্নেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। যে যেখানে থাকুক ছুটে চলে আসে এই আমতলায়। এটাই গুল মামার গপ্পোর সিংহাসন। আমগাছের এই সবচে নিচু ডালটা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও ওর থেকে আর উঁচুতে ওঠেন না। কারণ একবার উঁচু ডালে কি করে পাতলুনের দড়ি জড়িয়ে

গিয়ে কেলেঙ্কারি হয়েছিল। সেবার বহুকষ্টে ওঁকে নামানো গিয়েছিল। নাট-বল্টুর মা তো তাঁর দাদার জন্যে কেঁদে একশা।

একবার মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে বাঘ শিকারের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, ওদের বেশ মনে আছে।

'যে সে বাঘ নয় বুঝলি, সাক্ষাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!'

বল্টু বলল, 'কিন্তু মামু, সাক্ষাৎটা কি ভাবে হলো?'

বল্টুর কথার প্যাঁচটা গুলঞ্চ মামা ধরতে পারেননি। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করেন। কথার তোড়ে যেন ওকে ভাসিয়েই দেবেন। বল্টুর আবছা হাসিটা ওঁর চোখেই পড়ে না।

'আরে সে কথাই তো বলচি, দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে, প্রায় সম্মোহন করে রেখেছি। পলক ফেলেছি কি মরেচি! তক্ষুণি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। রয়্যাল তো লেজ দাপাচ্ছে—'

বল্টু বলল, 'তা তো দাপাচ্ছে, কিন্তু সে তো সোঁদরবনের বাঘ, মধ্যপ্রদেশে গেল কি করে?'

মামা ভীষণ চটিতং হয়ে বললেন, 'তোদের এই এক বিচ্ছিরি দোষ, কথার মধ্যিখানে বড্ড আগডুম বাগডুম বাধা দিস! কেন একটা-আধটা পালিয়ে আসতে পারে না বুঝি? এই ধর আমি। আমি তো বঙ্গসন্তান। পিওর বাঙালী বলতে পারিস। তা আমি মধ্যপ্রদেশে গেলাম কি করে? এবার বল!' নাটুকে কায়দায় নিঃশ্বাস ফেলে একটু দম নিলেন।

ফের বললেন, 'তা রয়্যালই হেরে গেল, পলক ফেলেই—'

'হারবেই!' নাট কথার মধ্যে ফোড়ন দিল, 'আমরাও হেরে যাই, তোমার চোখে চোখে তাকিয়ে পলক ফেলে বাঁচিনে!'

'একেই বলে এঁচোড়ে পক্ব! হুঃ রাবিশ! মুখের কোনো আগল নেই র‍্যা? তা পলক ফেলে পালাতে যাবে, দিলাম দুই ভুরুর মধ্যখানে দড়াম করে গুলি বসিয়ে!'

'বাঘের আবার ভুরু কিগো মামা?' বল্টু বলে।

'বোঝ ঠ্যালা কাকে বলি!' গুলঞ্চ মামা কটমট করে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুই মুখোমুখি জ্যান্ত বাঘ দেখেছিস? দেখেছিস কিনা বল!'

মুখ কাঁচুমাচু করে বল্টু বলে, 'তা অবিশ্যি দেখিনি—'

'তবে?'

'তবে দূর থেকে চিড়িয়াখানায়—'

'ফুঃ! তোদের দৌড় ওই চিড়িয়াখানা ইস্তক জানতাম। তাও গেছিস তো সেই ইজের পরা বয়সে। তাও আবার দূর থেকে। কতটা দূর থেকে, গজফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলিস?'

'না মামা, ওই বয়সে কি আর'—বল্টু মিইয়ে যায়।

'কিন্তু ছবিতে'—এবার ঝাল্টু।

মামা আমডাল থেকে লাফিয়ে নামেন।

'তুমি কে বাপ? খুব ঝানু ছেলে দেকচি!'

'ঝান্টুর কথা ধরবেন না, মামা!' বল্টু বলে।

মামা যেন রাগ দমন করতেই একটু বেশি সময় নেন। তারপর কথা বলেন।

'তোরা যদি প্রমাণ চাস, এই দ্যাখ—'

পকেট থেকে বের করে কুড়িয়ে আনা কোনো বুলেটের খোল দেখালেন। বললেন, 'এই সব না আরও আছে।'

ওরা সবিস্ময়ে দেখল মামা পকেট থেকে একটা সাদা কাগজের মোড়ক খুললেন, 'আমি মিছে কথা বলেছি? এত দূরে আনতে গেলে বাঘ পচে যেত তাই ওর ন্যাজ থেকে কিছু লোমও ছিঁড়ে এনেছি। জানতাম তোরা বিশ্বাস করবি না, তাই। এবার হল তো?'

ওরা অবাক হয়ে ভাবলো, এতো বেড়ালের ল্যাজের লোমের মতো দেখতে! বাঘের লেজে কি এরকম মিহি লোম থাকে?

ঝান্টু মুখ খুলতে গিয়েও চেপে গেল। নাট-বল্টু শুধু অলক্ষ্যে চোখে চোখ রেখে হাসল। কি জানি বাবা, আবার হয়তো চাক্ষুষ দেখার প্রশ্ন উঠবে!

হয়তো আবার সেই গজফিতে এসে পড়বে।

এই ঘটনার পর থেকে ওরা আর গুলঞ্চ মামাকে ঘাঁটায় না।

——ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

ম্যাডাম চাপলো সাইকেল

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

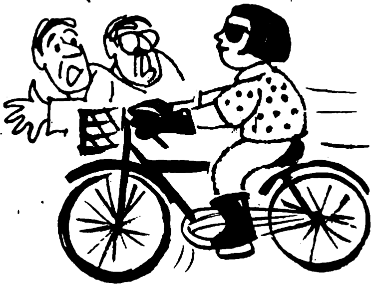

সাইকেলে নেই আর ক্রিং ক্রিং ক্রিং
ব্যাটারির হর্ন বাজে পি পি পি।
ম্যাডাম চেপেছে তাতে নেই ভ্রূক্ষেপ
যে করে করুক তাকে ছি ছি ছি!
চোখে সানগ্লাস তার ঠোঁটে বিক্রম
এই বুঝি চাপা পড়ি হয় দিগ্‌ভ্রম।
পরনেতে নীল জিনস গায়ে ব্যাগি শার্ট
হাতে চামড়ার গ্লাভস মেয়ে ভারী স্মার্ট।
আমার বাহবা শুনে ম্যাডামের মার
রাগে সারা গাটা করে রি রি রি!
আজকের যুগটাই প্রতিযোগিতার
সব আগে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার।
ছোট্ট ম্যাডাম যেন স্পিডের মডেল
গামবুটে বনবন ঘোরায় প্যাডেল।
সাইকেলে সামনেই কেরিয়ার তার
ঝটপট তুলবে সে কী-কী-কী?

ছুটি, ছুটি

সিদ্ধার্থ সিংহ

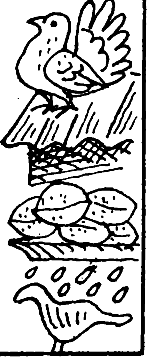

পাড়া-পড়শি কাপড় কাচে,
টিনের চালে পায়রা নাচে।
বগিথালায় ফুলকো লুচি,
পদ্মপাতায় শিলের কুচি।

সোনার খনি হীরের খাদ,
ইঁদুর ধরে করাত-ফাঁদ।
এলানো সব দাবার ঘুঁটি,
ধুলোর থেকে কুড়োই ছুটি!

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

পুজো প্রায় এসে গেল। এখন কী আর আমাদের ভালো না থাকার জো আছে! পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ তৈরি শুরু হয়েছে। ঠাকুর গড়ার কাজ চলছে পুরোদমে। আকাশে-বাতাসে পুজো পুজো ভাব আসতে শুরু করেছে। আর ঠিক তখনই তোমাদের হাতে এসে গেল পুজো সংখ্যা শুকতারা। কী, যা চেয়েছিলে সব পেলে তো! বাড়তি হিসেবে পেয়ে গেছ যুদ্ধের ওপর একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস। লেখক নিজে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে যুদ্ধ করে এসেছেন।

সে যাই হোক পুজো সংখ্যা তোমাদের কেমন লাগে জানাতে ভুলো না যেন। কার লেখা কেমন লেগেছে তাও জানাবে কিন্তু। পুরো বইটা আগে পড়ে ফেলো। কেমন!

থাক ও সব কথা। এসো, এবার একটা গল্প শোনা যাক।

অনেক দিন আগের কথা। এক গরিব কাঠুরে রোজ জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে সংসার চালাতো। কত আর কাঠ সে বয়ে আনতে পারে। তাই বড় কষ্টে তার সংসার চলে। একদিন সেই কাঠুরে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হলো এক সন্ন্যাসীর। কাঠুরে তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করলো।

সন্ন্যাসী বললেন, এগিয়ে যাও।

আর কিছু না বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

সন্ন্যাসীর কথার মানে কাঠুরে বুঝতে পারলো না। চিন্তাও করলো না। আশেপাশের গাছ থেকে কাঠ কেটে নিয়ে সে চলে গেল। হাটে সেই কাঠ বিক্রি করে চাল-ডাল কিনে বাড়ি এলো। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথাটা তার মনে রইলো।

পরদিন জঙ্গলে গিয়ে সে ভাবলো, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। কেন কে জানে! তা একটু এগিয়ে গিয়ে দেখাই যাক না কী আছে। আর দেরি করলো না কাঠুরে। কুড়ুল হাতে নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

বনের মধ্যে খানিকটা যেতেই সে অবাক। চারদিকে শুধু চন্দন গাছ। কাঠুরে বুঝলো, সন্ন্যাসী ঠাকুর কেন তাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে মনের আনন্দে চন্দন কাঠ কেটে নিয়ে হাটে গেল। সে দিন অনেক বেশি রোজগার হলো তার। খুশি হয়ে কাঠুরে পরপর ক'দিন শুধু চন্দন কাঠই কেটে আনলো।

একদিন চন্দন বনে গিয়ে তার আবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা মনে পড়লো। সন্ন্যাসী তো তাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়েই না হয় দেখা যাক কী আছে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলো সে। তারপরই সে বিস্ময়ে হতবাক। চারদিকে অঢেল রুপো। এ যে রুপোর খনি! মনের আনন্দে কাঠুরে রুপো কুড়িয়ে আনলো। এরপর ক'দিন সে শুধু রুপোই আনলো। অনেক টাকা হলো তার।

তারপর একদিন আবার তার মনে পড়লো সন্ন্যাসীর কথা। সন্ন্যাসী তো তাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কিছু আছে কিনা! এগিয়ে চললো কাঠুরে। খানিকটা গিয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। এ যে সোনার খনি! চারদিকে শুধু সোনা আর সোনা! এরপর ক'দিন সে শুধু সোনাই আনলো। অনেক অনেক রোজগার হলো তার।

সেদিন সোনার খনিতে গিয়ে তার আবার সাধুর কথা মনে পড়লো। সাধু তো তাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। সুতরাং সে আরো এগিয়ে গেল সেই জঙ্গলের মধ্যে। তারপরই তার চোখ যেন ঝলসে গেল। চারদিকে শুধু হীরে-মানিক ছড়ানো। আনন্দে কাঠুরে তখন থেকে শুধু হীরে-মানিকই নিয়ে যেতে লাগলো। কাঠুরে আর কাঠুরে রইলো না। সে মস্ত ধনী হয়ে গেল।

এই গল্পটা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রায়ই ভক্তদের বলতেন। বলতেন, যত এগিয়ে যাবে ততই ভালো হবে, উন্নতি হবে। একটু কিছু হয়েছে বলে ভেবো না যেন সব হয়েছে। আরো এগিয়ে যাও। আরো এগোও........।

তা লেখাপড়া বলো, খেলাধূলা বলো কিংবা যাতেই হোক না কেন—শুধু এগিয়ে যাও। যত এগিয়ে যাবে ততই বেশি বেশি পাবে। ভালো ছাত্র আরো ভালো রেজাল্ট করবে। খেলোয়াড় আরো ভালো খেলবে। যারা ছবি আঁকো কিংবা লেখো-টেখো তারা আরও উন্নতি করবে। সুতরাং এগিয়ে যাও। মনের মধ্যে কথাটা গেঁথে নাও—এগিয়ে যেতে হবে। আরও এগোতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুকতারার বন্ধুরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাবেই। কী পারবে না! নিশ্চয় পারবে। তোমাদের ওপর দাদুমণির সে বিশ্বাস আছে। এবারের পুজোয় এইটাই আমাদের মন্ত্র হোক—আমরা এগিয়ে যাবো—আরো এগোবো!

এবার তো তোমরা পুজোর আনন্দে মেতে উঠবে। তাই আজ এই পর্যন্তই। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয় হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

আসছে পুজো

গাছের ছায়ায় রোদের ডগায় ঝিলিক মারছে আনন্দ
আসছে পুজো!
আকাশটা যেন মনে হচ্ছে বেশি নীল,
কিংবা তাতে ভেসে থাকা মেঘগুলো বেশি সাদা,
শিউলিগুলোও আগের চাইতে সুগন্ধী,
আসছে পুজো!
অর্ধেক তৈরি প্যান্ডেলগুলোর বাঁশের খাঁচা
সে তো বাঁশ বই কিছু নয়
কিন্তু কিছুদিনে এরাই হয়ে উঠবে কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্যের প্রতিরূপ।
এই বাঁশের খাঁচাতেই নেমে আসবে আনন্দ,
অথবা যার উদ্দেশ্যে আগমনী গান, পুজোর বাজার,
সেই দেবী দুর্গা—
আসছে পুজো, আবার নতুন সাজে।

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল।

পৌলমী চক্রবর্তী, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী, গুড়াপ শীতল কুমার বালিকা বিদ্যালয়

এক বছর বাদে ফিরে এলো

চলে গেছে ঐ নীল মেঘপুঞ্জ,
সাদা মেঘ আসবার প্রতীক্ষা।
এক বছর বাদে ফিরে এলো,
গতবছরের হারানো দিনগুলো॥

প্রকৃতির ঘুম যেন গেছে ভেঙে,
চারিদিকে আনন্দের সাড়া!
বাঙালীর ঘুম গেছে ভেঙে,
প্রবাসীদের ঘরে ফেরার তাড়া॥

ঘরকুনো বাঙালী ঘরের কোণায় কই?
চারিদিকে কেবলই হইহই! রইরই!
কেনাবেচার এখন চলছে জমজমাট,
প্রতি দোকানের ভিতর কেবল লোকে লোকে ভরাট॥

অবশেষে ঐ পার হলো শুভ মহালয়া
মাইকের আওয়াজেতে কান ঝালাপালা।
মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে কাজ রাতদিন,
হাতে গোনা মাত্র আর কয়েকটি দিন॥

রাজদীপ পুরী,
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবন

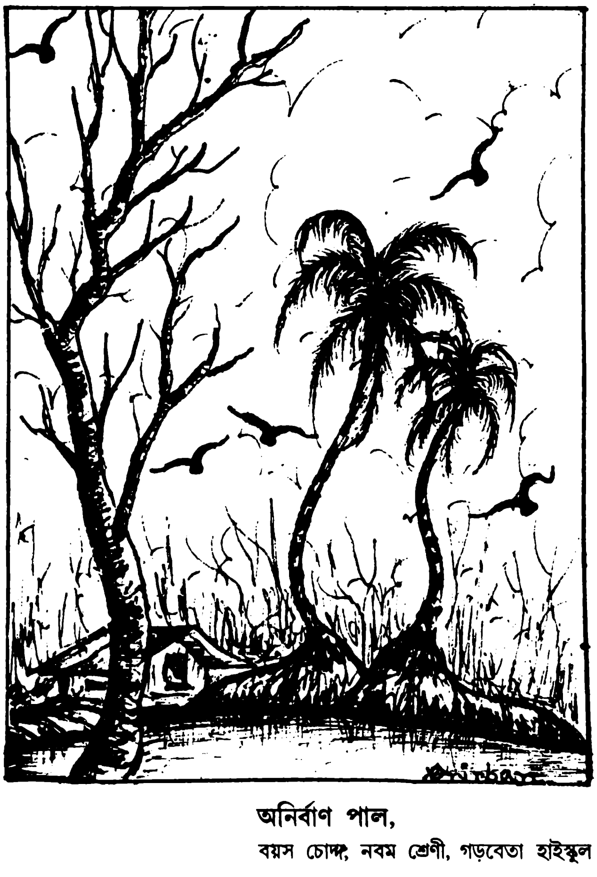

অনির্বাণ পাল,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী, গড়বেতা হাইস্কুল

পুজোর রুটিন

মণ্ডপেতে বাজল যে ঐ কাঁসর, শাঁখ আর ঘণ্টা,
তাই না দেখে মহাখুশি হাবুল এবং সণ্টা।
লেখেন চিঠি মা দুর্গা শরৎ প্রকৃতিকে,
আসছি আমি মর্ত্যলোকে কলকাতারই দিকে।
ষষ্ঠীর দিন এলেন দেবী, রণসজ্জার সাজে,
মন লাগে না বাড়ি থেকে অঙ্ক করার কাজে।
সপ্তমীতে দারুণ মজা, যাব মামার কাছে,
ভয় হয় যে হাতখরচা, হাতছাড়া হয় পাছে।
অষ্টমীতে এলাম বাড়ি, বোম পটকা হাতে,
পাড়ার সবাই নাচছে দেখি, ঢাকঢোলেরই সাথে।
নবমীতে আরতির কম্পিটিশন হবে,
দেখতে হবে ফার্স্ট প্রাইজটা কার দখলে যাবে।
দশমীতে খুব দুঃখ, মা যাচ্ছেন চলে,
পড়তে হলো লেখাপড়ার পুরোনো জাঁতাকলে।

পিয়ালী দত্ত,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
মধ্যমগ্রাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগনা

রূপালী মল্লিক,
বয়স তেরো,
সপ্তম শ্রেণী,
আড়িয়াদহ
সর্বমঙ্গলা বালিকা
বিদ্যালয়,
কলিকাতা

পুজোর মজা

এক দুই তিন
এসে গেছে পুজোর দিন।
চার পাঁচ ছয়
মহালয়া পার হয়।
সাত আট নয়
পাঁচ দিন পুজো হয়।
দশ এগার বারো
ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ো।
তেরো চোদ্দো পনের
সবাই হলো জড়ো।
ষোল সতের আঠারো
গুরুজনকে প্রণাম করো।
উনিশ আর কুড়ি
নিয়ে এসো সিদ্ধি আর মিষ্টির ঝুড়ি।

সমিত কুমার করণ,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়,
কালীনগর

আগমনী

টাক ডুমা ডুম ডুম,
লাগলো পুজোর ধুম।
টাক ডুমা ডুম ডুম,
নেইকো মোদের ঘুম।
নতুন জামা চাই,
নতুন জুতো চাই।
চারদিন তো পড়াশুনার
কোনো বালাই নাই।
মা আসছেন, মা আসছেন,
হচ্ছে মোদের ধ্যান,
হৈ-হুল্লোড় মণ্ডা-মেঠাই
কতো কিছুর প্ল্যান।
চারটি দিনের আনন্দ তো,
চিরকালের নয়,
বিজয়াতে মা যাবেন চলে
দুঃখ কতই হয়।
মাগো, তুমি আবার এসো
এই কামনা করি,
পরীক্ষাতে সবাই যেন,
পাশ করতে পারি।

শর্মিষ্ঠা রায়,
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী,
সেন্ট পলস্ রোড গার্লস হাই স্কুল,
দুর্গাপুর

ঈশিতা চক্রবর্তী,
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বাঁকুড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বাহাদুর ভাইমণি

নিমাই ভট্টাচার্য

বাগবাজার-শ্যামবাজার-কুমারটুলি-আহিরীটোলা তো দূরের কথা, সারা উত্তর কলকাতার মানুষ অঘোর সরকারের নাম শুনলেই বলবে, উনি যেমন ভাল মানুষ ছিলেন, সেইরকমই ভাল উকিল ছিলেন। দূর-দূরান্তরের মক্কেলরা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে পৌঁছে ওঁর বাড়ির হদিস জিজ্ঞেস করলেই জবাব পেতেন, বলরাম মন্দিরের গলিতেই ওঁর বাড়ি। বাড়ির দরজায় ইংরেজি-বাংলায় ওঁর নাম লেখা আছে। যাঁরা রাজবল্লভপাড়া দিয়ে ঢুকতেন, তাঁরা বিশাল দত্তবাড়ির গোরাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই উনি বলতেন, এই তো কোণার বাড়িটা।

অঘোর সরকার এখন আর বেঁচে নেই। বছর দশেক আগেই উনি মারা গিয়েছেন। তবে ওঁর স্ত্রী পঁচাশি বছরের কুসুমকুমারী দেবী বেঁচে আছেন। ওঁদের ছোট মেয়ে পারুল থাকে ভবানীপুরে। অন্য দু'জন বাইরে। বড় ছেলে নগেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার। তিনি কর্মজীবনের শুরু থেকেই দিল্লীতে। তবে প্রত্যেক বছর কলকাতায় আসেন। এখানে থাকেন শুধু ছোট ছেলে নৃপেন।

এই তিনতলা বাড়িতে এখন শুধু কুসুমকুমারী দেবী ছাড়া নৃপেনবাবু তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকেন। আর আছে তিনজন কাজের লোক। রাঁধুনী মনোরমা এ বাড়িতে তিরিশ-বত্রিশ বছর আছে। যে লক্ষ্মীর মা বৃদ্ধা কুসুমকুমারীকে দেখাশুনা করে, সে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আছে। তৃতীয়জন হারাধন আছে বছর দশেক।

হারাধনের বাবা ক্ষেত্র মাত্র ষোল বছর বয়সে উকিলবাবুর কাজে লাগে কিন্তু এমন বোকা ছিল যে উঠতে-বসতে বকুনি খেত। সেই ক্ষেত্র কালে কালে অঘোর সরকারের দক্ষিণ হস্ত হয়ে যায়। কথায় কথায় সে মুহুরি বা টাইপবাবুর ভুল ধরতো, আঃ! কী করছেন? এটা পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে হবে। আলিপুর কোর্টের কত উকিল ওকে বলতেন, ক্ষেত্র, তুমি স্যারকে একটু বুঝিয়ে এই মামলাটা নিতে রাজী করাও। উনি সাহায্য না করলে আমরা নির্ঘাৎ হেরে যাব। ক্ষেত্র দেশে গেলে অঘোর সরকার চোখে অন্ধকার দেখতেন।

এই উকিলবাবুর কাজ করতে করতেই ক্ষেত্র গ্রামের বাড়িতে পাকা ঘরদোর বানিয়েছে, বিয়ে করেছে, তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ছেলেটাকে আট ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছে। তারপর দুটো চোখই বড্ড বেশি খারাপ হওয়ায় কাজকর্ম করাই মুশকিল হলো। অঘোর সরকারও বার্ধক্যের জন্য কাজকর্ম বেশ কমিয়ে দেওয়ায় ক্ষেত্র ছেলেকে উকিলবাবুর কাছে রেখে দেশে চলে গেল। মাস তিনেক পরই বৃদ্ধ প্রবীণ উকিল হৃদরোগে হঠাৎ মারা গেলেন। হারাধনকে নৃপেনবাবু এখানেই রেখে দিলেন।

নৃপেনবাবু ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চে বেশ ক'বছর কাটাবার পর বদলি হয়েছেন গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চে। লকারের একটা চাবি ওঁর কাছে থাকে। অন্য চাবিটি থাকে একাউন্টেন্টের কাছে। এঁরা দু'জনে না গেলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মই শুরু হতে পারে না। দু'জনকেই পৌঁছতে হয় পৌনে দশটার মধ্যে। তাই তো সাড়ে আটটার মধ্যেই খেয়েদেয়ে নৃপেনবাবুকে বেরুতে হয়। ওঁর স্ত্রী মাধুরী বেহালার একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ন'টা বাজতে বাজতেই উনিও বেরিয়ে যান। দু'জনেই ফেরেন সন্ধ্যের আগে-পরে।

ওঁদের দুটি ছেলেমেয়ে। মহুয়া বড়, মৃণাল ছোট। মহুয়া সামনের বছরই হায়ার সেকেন্ডারী দেবে। স্কুল আর কোচিং নিয়েই সে সকাল থেকে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ব্যস্ত। এই পরিবারের একমাত্র দুঃখের কারণ মৃণাল। সে বোবা। এবং কালা। ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলে যায় কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ ভাল না। তবে খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। যখনই সময় পায়, তখনই ছবি আঁকে। বছর দুয়েক আগে আকাদেমীতে যে মূক ও বধিরদের ছবির প্রদর্শনী হলো, তাতে যোগদান করে মৃণাল শুধু রাজ্যপালের বিশেষ পদক পায়নি, ওর তিনটে ছবিই তাজ বেঙ্গল হোটেল পনের হাজার টাকায় কিনে নিয়েছে।

এ বাড়ির বাজার-হাট করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ওষুধ আনা ও হাজার রকমের টুকটাক সব কাজই হারাধন করে। প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করে ও হিসেব রাখে। শনিবার মাধুরী স্কুল থেকে ফিরে হাতের পলিথিনের ব্যাগ ডাইনিং টেবিলের উপর রেখে হাসতে হাসতে স্বামী আর মেয়েকে বললেন, খুব সস্তায় ল্যাংড়া আম পেলাম বলে...

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হারাধন বলে, কাকিমা, কত করে আনলেন?

—দশ টাকা করে।

হারাধন চাপা হাসি হেসে বলে, আমি আট টাকা করে এনেছি।

ও একটু থেমেই বলে, ঠাকুমার ওষুধ কিনে ফেরার সময় দেখলাম, শ্যামবাজারের মোড়ে যেন আমের হাট বসেছে। বুঝলাম, হঠাৎ অনেক আম এসে গেছে। বারো টাকা করে চাইছিল কিন্তু আমি সোজাসুজি বললাম, আট টাকা করে হলে আড়াই কিলো নেব।

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বারো টাকা করেই চাইছিল।

নৃপেনবাবু হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বলেন, ভুলে যাও কেন, হারাধন হচ্ছে ক্ষেত্রদার ছেলে।

অঘোর সরকার যেমন ক্ষেত্র ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখতেন, হারাধন ছাড়াও নৃপেনবাবুদের সংসার অচল।

সত্যি হারাধনের গুণের শেষ নেই। কোনো কাজেই না বলতে জানে না। ঘরে-বাইরের সব কাজেই সমান উৎসাহ, সমান সততা। পুরো তিনতলা বাড়ি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে যে বর্ষার দিনেও কোনো ঘরের কোণায় একটু ঝুল দেখা যাবে না। যেদিন অন্য কাজের বিশেষ চাপ নেই, সেদিন হয়তো ব্লিচিং পাউডার দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করবে। তাই তো বৃদ্ধা কুসুমকুমারী থেকে তাঁর নাতি-নাতনী পর্যন্ত ওকে ভালবাসে।

হারাধনের শুধু একটিই দোষ। দুপুরের দিকে হয় মিত্তিরদের ড্রাইভার-দারোয়ান-চাকরবাকরদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ওদের ওখানে যাবে, নয়তো ওদের দু'একজনকে ডেকে এনে নিজের ঘরে বসে গল্পগুজব করবে। মহুয়া ঐসব লোকদের বাড়িতে আসা বিশেষ পছন্দ করে না কিন্তু মাধুরী বলেন, ও কোথায় বা যাবে আর ওদের সঙ্গে ছাড়া কাদের সঙ্গে গল্পগুজব করবে?

অঘোর সরকারের মৃত্যুর পর তাঁর সব বইপত্তর ওঁর জুনিয়র শ্রীনিবাসবাবুকে দেওয়া হয়েছে। এখন ঐ ঘরেই কুসুমকুমারী থাকেন। তার কারণ ঘরখানি বেশ বড় ও সঙ্গে একটা বাথরুম আছে। তাছাড়া দু'দিকে দুটো দরজা। ডাক্তারের আসা-যাওয়ার সময় ছাড়া সামনের দরজা বন্ধ থাকে। ও ঘরের পাশেই খাবার ঘর। ঐ ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর। অঘোরবাবুর বাবার আমলে যে ঘরে পূজার ভোগ রান্না হতো, সেই ঘরে কাজের মহিলারা থাকেন। পিছন দিকের যে ঘরে অনেক কাল আগে কোচোয়ান থাকতো, সেই ঘরে এখন হারাধন থাকে।

দোতলায় তিনখানার একটা নৃপেনবাবু-মাধুরী দেবীর, একটা ঘরে মহুয়া থাকে; অন্য ঘরখানা রাখা আছে ভাইবোনদের জন্য। তিনতলার দু'খানা ঘরই মৃণালের। তার একখানা ঘর ওর স্টুডিও। অন্য ঘরখানাতে পা দিলেই বোঝা যায়, এটা একজন শিল্পীর ঘর। ভাইয়ের এই ঘরখানা মহুয়া নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, অন্য কাউকে করতে দেয় না। ন'মাসে-ছ'মাসে যদি কোনোদিন মাধুরী এই ঘর পরিষ্কার করেন, তাহলে মৃণাল হাসতে হাসতে বুঝিয়ে দেয়, তুমিও ঠিক দিদির মতো পারো না। স্কুলে যাওয়া-আসা বাদ দিলে শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া মৃণাল নিচে নামে না। তবে যদি কোনোদিন দিনের বেলায় ওর ঘুম পায়, ও সোজা ঠাম্মার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

যাই হোক দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

সেদিন সকালবেলায় উঠে চা খেতে খেতেই নৃপেনবাবু মেয়েকে বলেন, মামণি, মনে আছে তো আজ সুখেনকাকুর মেয়ের বিয়ে?

মহুয়া একটু হেসে বলে, বলাকাদির বিয়েতে যাব বলে কাল রাত্তিরেই আমি কাপড়-চোপড় ঠিক করে রেখেছি।

মাধুরী স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ক'টার মধ্যে ফিরবে?

—যেভাবেই হোক নিশ্চয়ই সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরব।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, তুমি কখন ফিরবে?

—আমি টিফিনের সময়ই চলে আসব।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নৃপেনবাবু বলেন, লকার থেকে তোমার বা মামণির কিছু আনতে হবে কী?

মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, না, না। আমার কিছু আনতে হবে না।

ও একটু হেসে বলে, ভাইমণির তৈরি কস্টিউম জুয়েলারি পরব।

মাধুরী বললেন, আমারও কিছু লাগবে না। বাড়িতে যা আছে, তাই পরে যাব।

ছেলে কোনো নেমন্তন্ন বাড়ি যায় না। তাই তো অফিস থেকে ফেরার সময় নৃপেনবাবু পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ থেকে মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন নিয়েই বাড়ি এলেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। সাড়ে ছ'টার মধ্যেই সবাই যাবার জন্য প্রায় তৈরি। মাধুরী বললেন, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আমারও হয়ে যাবে।

নৃপেনবাবু বললেন, আমি মার কাছে যাচ্ছি। তোমার হয়ে গেলে নিচে নেমে এসো।

—হ্যাঁ, যাও।

মহুয়া বলল, মা, আমি একটু ভাইমণির কাছ থেকে আসছি।

—আচ্ছা।

দু'মিনিট পরই মাধুরী চিৎকার করে বলেন, মামণি, চট করে একবার আয়।

মেয়ে নেমে আসতেই উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুই কী আমার গলার চেনটা এর মধ্যে পরেছিলি?

—আমি আবার কোন জন্মে সোনার গহনা পরি?

—আমার চেনটা পাচ্ছি না রে!

—পাচ্ছি না মানে? কোথায় রেখেছিলে?

—কোথায় আবার রাখব? আলমারির এই ড্রয়ারেই ছিল।

—তাহলে যাবে কোথায়?

মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, লকারে রাখার জন্য বাবাকে দাওনি তো?

—না, না; ওটা তো সব সময় এর মধ্যেই থাকে।

ঠিক সেই সময় নৃপেনবাবু এসে হাজির। উনি কিছু বলার আগেই মাধুরী বলেন, গিনির লকেট লাগানো চেনটা পাচ্ছি না।

—সে কী?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, ওটা তো এই ড্রয়ারেই রাখো।

—হ্যাঁ।

—চাবি বাইরে কোথাও রেখে...

—না, না, বাইরে কেন রাখব? একটা চাবি আমার ব্যাগে থাকে, অন্যটা তো তোমার অফিসে থাকে।

—তাহলে যাবে কোথায়?

নৃপেনবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তুমি নিশ্চয়ই তাড়াহুড়োতে আলমারির মধ্যে কোথাও রেখে দিয়েছ বলে এখন মনে পড়ছে না। একটু ভাল করে খুঁজলে ঠিকই পেয়ে যাবে।

মহুয়া বলে, জিনিসটা তো উড়ে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

মাধুরী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ভাবেন, জীবনে কখনও সোনা-দানা টাকাকড়ি দুটো ড্রয়ারের বাইরে রাখিনি। ওটা কী অন্য কোথাও...

ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেলেও মনের মধ্যে একটা বিচিত্র অস্বস্তি নিয়েই বিয়ে বাড়ি গেলেন। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত্তির হলো।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরেই মাধুরী শুধু পুরো আলমারি না, ঘরের সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। না, ঐ হার পাওয়া গেল না। তন্ন তন্ন করে দেখা হলো মহুয়ার ঘর। না, সেখানেও পাওয়া গেল না।

বাড়ির তিনজন কাজের লোককেও জিজ্ঞেস করা হলো, ঐ হার কোথাও দেখেছ? সবারই এক উত্তর, না, দেখিনি। আলমারির ভিতর কি থাকে, তা আমরা জানব কী করে?

এমন ঘটনা যে এই বাড়িতে ঘটতে পারে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

মাসখানেকের মধ্যে নৃপেনবাবু শুধু রিজিওন্যাল অফিসে বদলি হলেন না, প্রমোশনও হলো। উনি হাসতে হাসতে মেয়েকে বলেন, মামণি, এখন আমাকে মাঝে মাঝেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের নানা জায়গা ছাড়া সিকিম, মেঘালয়, ত্রিপুরা আর আন্দামান যেতে হবে। যদি ইচ্ছে করে তুইও আমার সঙ্গে যেতে পারিস।

—ভাইমণি যাবে না?

—খোকন বলেছে, ও সিকিম, মেঘালয়, ত্রিপুরা আর আন্দামান যাবে।

—বাবা, আমরা দু'জনেই তোমার সঙ্গে যেতে পারব?

—পারবি না কেন?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যেখানেই যাই না কেন, তোদের ভাড়া আমি দেব। তোরা গেলে তো আমার ঘরেই থাকতে পারবি।

—পড়াশুনার খুব চাপ না থাকলে এই সুযোগে কয়েকটা জায়গা ঘুরে আসব।

বর্ধমান, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর আর আসানসোল ঘুরে আসার দিন পনের পরই নৃপেনবাবু সপ্তাহখানেকের জন্য খড়্গপুর, হলদিয়া, কাঁথি, তমলুক, মেদিনীপুর আর ঝাড়গ্রাম গেলেন। উনি রওনা হবার দু'দিন পরই মাধুরী পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিন বছরের বকেয়া প্রাপ্য প্রায় ন' হাজার টাকা নিয়ে স্কুল থেকে ফিরলেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে উনি টাকাটা আলমারির ডান দিকের ড্রয়ারে কাগজপত্রের পিছনে রেখে দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, স্বামী ফিরলেই পুরো টাকাটা খোকনের একাউন্টে জমা করে দেবেন।

নৃপেনবাবু ফেরার পরদিন ওঁকে টাকাটা দিতে গিয়েই মাধুরী আঁতকে উঠেই চিৎকার করলেন, সর্বনাশ!

সবাই ছুটে এলো। অনেক চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড় খোঁজাখুঁজি জিজ্ঞাসাবাদ হলো কিন্তু টাকার হদিস পাওয়া গেল না। সবাই স্বীকার করলেন, ভূতে তো টাকাটা নিয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই অন্য কেউ...

কিন্তু কে সেই অন্য কেউ?

নৃপেনবাবু বললেন, এ তো সত্যিই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। আমি থানায় যাচ্ছি।

হ্যাঁ, থানা থেকে পুলিশ এলো। সবকিছু ভালভাবে দেখল। বাড়ির তিনজন কাজের লোককেই জিজ্ঞাসাবাদ করল। ওদের ঘরদোর-বাক্স-বিছানা-বাথরুম তন্ন তন্ন করে দেখল। না, কিছুই পাওয়া গেল না।.শেষ পর্যন্ত হারাধনকে ধরে নিয়ে গেল। পুলিশের হাতে বেদম মারধর খেয়েই ফিরে এলো অনেক রাত্তিরে।

ব্যস! ঐ পর্যন্তই। বেশ ক'দিনের চেষ্টাতেও পুলিশও এই রহস্যের কিনারা করতে পারল না।

সেদিন নৃপেনবাবু আর মাধুরী দেবী বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই দুই ভাইবোন কতকগুলো ছবি নিয়ে সোজা শ্যামপুকুর থানার বড়বাবুর কাছে হাজির।

মহুয়া বলল, আমার ভাই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব হলেও খুব ভাল আর্টিস্ট। ওর কিছু ছবি দেখলেই বোধহয় আপনারা আমাদের বাড়ির চুরির হদিস পেয়ে যাবেন।

কৌতুক-মেশানো হাসি হেসে বড়বাবু বললেন, দেখি, ও কী ছবি এঁকেছে।

মৃণাল একটা পেন্সিল স্কেচ দিদির হাতে দেয়। মহুয়া ওটা বড়বাবুর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলে, দেখছেন তো এই লোকটা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চাবি তৈরি করে।

—হ্যাঁ, বুঝেছি, কিন্তু এর সঙ্গে তোমাদের বাড়ির চুরির কী সম্পর্ক?

ভাইমণির দ্বিতীয় স্কেচটা দেখিয়ে বলে, ঐ লোকটা চৌধুরীদের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বা সারাদিন ব্যবসা করে ফেরার সময় ওর হাতে থাকে একটা সুটকেস।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, রাস্তায় রাস্তায় 'চাবি তৈরি করাবে' বলে হেঁকে বেড়াবার সময় বিশাল একটা রিং-এ যে শত খানেক নানা ধরনের চাবি থাকে, তা ঐ সুটকেসের মধ্যে রেখে দেয়।

বড়বাবু আপনমনেই বলেন, তার মানে...

মহুয়া ওঁকে কথাটা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই বলে, ও চৌধুরীবাড়ি বা পাড়াতে জানাতে চায় না, যে ও চাবি তৈরি করতে জানে।

বড়বাবু মুখে কিছু বলেন না। ছবির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবেন।

আরো চার-পাঁচটা স্কেচ দেখাবার পর শেষ স্কেচটা দেখিয়েই বলে, দেখুন, ঐ লোকটাই সারা দুপুর ধরে আমাদের হারাধনের সঙ্গে আড্ডা দেয়।

বড়বাবু গলা চড়িয়ে বলেন, রিয়েলি?

—ওরা যখন আড্ডা দেয়, তখন একতলায় ঠাকুমা আর তিনতলায় আমার এই ভাই থাকলেও দোতলায় কেউ থাকে না।

বড়বাবু এবার নিজেই প্রত্যেকটা স্কেচ খুব ভাল করে দেখার পর দু'এক মিনিট অবাক হয়ে মৃণালকে দেখেন। তারপর মহুয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার ভাই যে ওদের আড্ডাখানার বা মুখের স্কেচ করেছে, তাতে ওরা আপত্তি করেনি?

মহুয়া নানারকম ইশারায় ভাইয়ের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে একটু হেসে বলে, নিজের স্কেচ দেখে ঐ চাবিওয়ালা লোকটার এত ভাল লেগেছে যে সামনের রবিবার দেশে যাবার সময় ওটা নিয়ে যেতে চেয়েছে।

তারপর?

তারপর আর কি! বড়বাবুর হুকুমে সাব-ইন্সপেক্টর জনার্দনবাবু তিন-চারজন কনস্টেবলকে নিয়ে ছুটলেন চৌধুরীদের বাড়ি। নকুল চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে তল্লাশি করলেন দারোয়ানদের ঘর। হ্যাঁ, ওদের গ্রামবাসী ভাইয়ের বাক্সতে শুধু মাধুরী দেবীর টাকার বান্ডিলটাই না, গিনির লকেটওয়ালা হারও পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পর চাবিওয়ালা ফিরতেই পুলিশ তাকে পাকড়াও করল। তারপর হারাধন। দু'জনকে জীপে চড়িয়েই জনার্দনবাবু ফিরে গেলেন থানায়।

সেদিন সন্ধ্যায় মৃণালকে নিয়ে ও বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

দিন তিনেক পরই ও-সি এসে হাজির। এক গাল হাসি হেসে নৃপেনবাবুকে বলেন, একটা আনন্দের খবর আছে।

—কী খবর?

—পুলিশ কমিশনার সাহেব মৃণালকে পাঁচ হাজার টাকা প্রাইজ দেবেন। উনি সবাইকে জানাতে চান, একটা বোবা-কালা ছেলেও সমাজের কত উপকার করতে পারে।

মহুয়া বলল, আমি কি শুধু শুধু ভাইমণিকে নিয়ে গর্ব করি!

ছবিঃ উৎপল ঘোষ

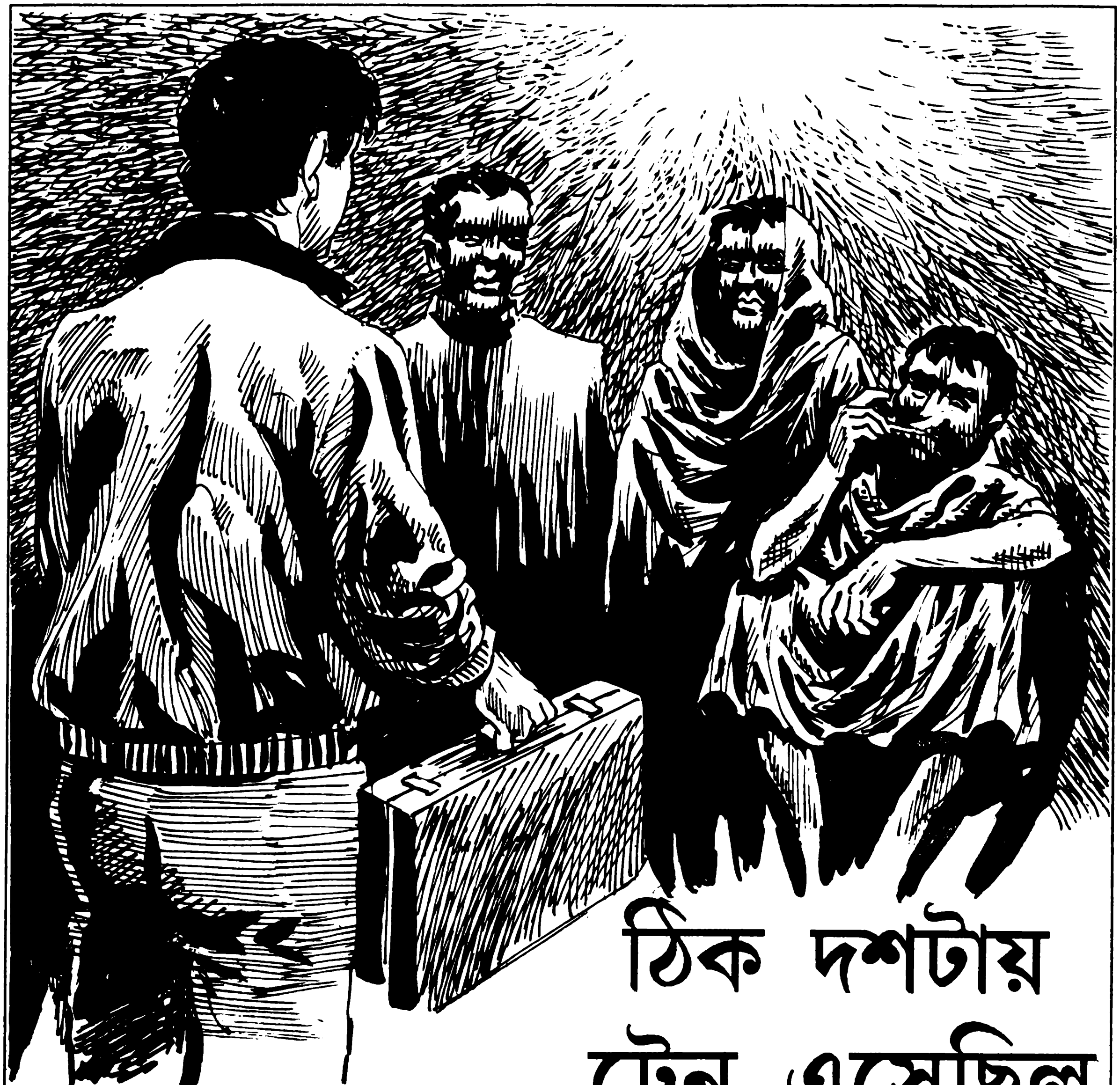

ঠিক দশটায় ট্রেন এসেছিল

অনীশ দেব

ঘটনাটা আমি ভুলতে পারিনি—বোধহয় ভোলা যায় না বলেই। আর বারবার প্রশ্ন জাগে নিজের মনে: সেদিন আমি ঠিক দেখেছিলাম তো? না, একটু ভুল হলো—সেদিন নয়, সে-রাতে। সে-রাতে আমি ঠিক দেখেছিলাম তো?

স্টেশনটার নাম সাতবহিনি। জীবনে কখনও তার নাম শুনিনি। তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সেল্‌সের লাইনে কাজ করি—নাম-না-জানা জায়গায় চষে বেড়ানোই আমাদের কাজ। সে-সব জায়গায় জিনিস বিক্রি করার মধ্যে একটা অন্যরকম মজা আছে।

আমাদের কোম্পানি একটা অদ্ভুত যন্ত্র বের করেছে। যন্ত্রটার কাজ হলো মশা, মাছি, পোকামাকড় তাড়ানো। দেখতে ছোট—অনেকটা সেলুলার ফোনের মতো। ভেতরে যত রাজ্যের ইলেকট্রনিক সার্কিট। তবে যন্ত্রটা কাজ করে আলট্রাসনিক নীতিতে। অর্থাৎ, শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে দেয় যে, মশা-মাছি-পোকামাকড় সেই শব্দ শুনে পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাতে থাকে। অথচ মানুষের কান সেই শব্দ মোটেই শুনতে পায় না।

বিজ্ঞান আমি জানি না, বুঝি না। কিন্তু যন্ত্রটা খদ্দেরকে গছাতে হলে তার ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে খানিকটা অন্তত আইডিয়া থাকা দরকার। তাই ঠিক সেইটুকুই আমাদের কোম্পানির

একজন এনজিনিয়ারের কাছ থেকে জেনে নিয়ে মোটামুটি মুখস্থ করে নিয়েছি।

কোম্পানির সঙ্গে কথা ছিল, গোমো, বারডিহি আর ডেহ্‌রি-অন-সোন, এই বেল্টটা আমি দু'-সপ্তাহে কভার করব। মাইনে ছাড়াও আমাদের কমিশনের ব্যাপারটা বেশ অ্যাট্রাকটিভ। তাই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

প্রথমে হাওড়া থেকে চলে গেছি গোমো জংশন। সেখানে দিন পাঁচেক কাজ করেছি। তারপর একদিন বিকেলে গোমো থেকে পাটনা-হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেছি বারডিহি।

বারডিহিতে বেশি যন্ত্র বিক্রি করতে পারিনি। কে জানে, কপালটাই বোধহয় খারাপ ছিল! তাই দিনতিনেক পরই মনমরা অবস্থায় চড়ে বসেছি বারডিহি/ডেহ্‌রি-অন-সোন প্যাসেঞ্জারে। জায়গা দুটোর দূরত্ব মাত্র ১৪০ কিলোমিটার। কিন্তু টিক্‌টিক্ করে চলা গদাইলশকরী প্যাসেঞ্জার ট্রেন যে বেশ লেটে পৌঁছবে সেটা গোড়া থেকেই মালুম হয়েছিল।

শীতের সময়। তাই ডালটনগঞ্জ পেরোতে না পেরোতেই বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এল। মাঠঘাট গমের খেত যা-কিছু দেখছিলাম সব মুছে গেল। গারওয়া রোড জংশন পেরোতেই আমার একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। হঠাৎই কোমরে আঁটা পেজারটা পিপ-পিপ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল।

তাড়াহুড়ো করে যন্ত্রটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই মেসেজটা চোখে পড়ল। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এসেছে, এখনই বারডিহিতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে একটা কোম্পানি জরুরি ভিত্তিতে পঁচিশ পিস পোকামাকড় তাড়ানোর যন্ত্র চাইছে। বারডিহির কাজ সেরে তারপর যেন আমি ডেহ্‌রি-অন-সোন রওনা হই।

ইলেকট্রনিক্স ক্রমেই যে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে, পেজার এবং সেলুলার ফোন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শীতের সন্ধ্যেয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যে শান্তিতে একটু ঝিমোব তারও উপায় নেই। কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সামান্য প্রলোভনও উঁকি দিয়েছিল আমার মনে। কারণ পঁচিশ পিস যন্ত্র বিক্রির কমিশন নিতান্ত ফেলনা নয়।

বারডিহিতে কোথায় যেতে হবে সেই হদিসও পাওয়া গেল পেজারে। এখন শুধু ট্রেন থামলেই নেমে পড়ার অপেক্ষা।

কম্বল মুড়ি দেওয়া দেহাতী এক সঙ্গীকে বার তিনেক ডাকাডাকি করে তারপর জানতে পারলাম, পরের স্টেশন সাতবহিনি।

অগত্যা ট্রেন থামতেই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় নেমে পড়লাম সাতবহিনিতে। সাত বোনের কোনও কাহিনী থেকে এই স্টেশনের নাম রাখা হয়েছে কিনা কে জানে! তবে যেখানে আমি নামলাম তা স্টেশন না শ্মশান বোঝা দায়।

আমার সঙ্গে একটা হাতব্যাগ আর একটা বিশাল ভারী সুটকেস। সুটকেসে রয়েছে আমাদের তৈরি যন্ত্র ইনসেক্ট সেন্টিনেল, যাকে আমরা সংক্ষেপে আই-এস বলি।

শীতের ভারী বাতাসে করুণ হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম কাঁকর-ছড়ানো নিচু প্ল্যাটফর্মে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু কুয়াশা আর ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে জড়িয়ে রইল।

ভূতে আমার তিলমাত্রও বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া, ট্রাভেলিং সেল্‌সম্যানদের ভূতের ভয় থাকলে চলে না। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সাতবহিনির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারপাশটা কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ঠেকছিল।

প্ল্যাটফর্মে টিমটিম করে দুটো ন্যাড়া বাল্‌ব জ্বলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ওদেরও শীত করছে। আর কুয়াশার চাপে ওদের আলো বেশিদূর ঠিকরে যেতে পারছে না।

সামনে-পেছনে তাকালে গাঢ় আঁধার। তার ফাঁকফোকরে কোথাও একটা কি দুটো আলোর ফুটকি। আর আকাশে আধখানা চাঁদ, তাকে ঘিরে সহচর কয়েকটি তারা।

একটা অদ্ভুত ধরনের ডাক আমার কানে আসছিল। তবে ঝিঁঝি নয়, হয়তো অন্য কোনও পোকামাকড়। মাঝে-মাঝে একটা কনকনে বাতাসের ঢেউ আমার জ্যাকেট-সোয়েটারের অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে পড়ে একেবারে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মের ওপরে, খানিকটা দূরে, একটা ছোট ঘর গোছের ব্যাপার চোখে পড়ল। বোধহয় স্টেশনমাস্টারের ঘর। সে যাই হোক, আগে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। নইলে এই ঠাণ্ডায় নির্ঘাৎ স্ট্যাচু হয়ে যেতে হবে।

সুটকেস আর ব্যাগ তুলে নিয়ে ঘরটার দিকে হাঁটা দিলাম। শীতের কামড়ে হাত-পায়ের জোড়গুলো প্রায় অকেজো হওয়ার যোগাড়। গায়ের জোরে নয়, স্রেফ মনের জোরে এগিয়ে চললাম। বারবার তেনজিং আর হিলারির কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার চারপাশে বরফ পড়ছে।

ঘরের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় গাঢ় অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত প্রাণী আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রাণী বলছি, কারণ তার সারাটা শরীর কম্বল দিয়ে ঢাকা—অনেকটা কবন্ধের মতো। তবে মাথার কাছটায় সামান্য ফাঁক লক্ষ্য করলাম। সেই ফাঁকের ভেতরে দুটো চোখ স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে এই মানুষটা?

'কাঁহা যাওগে, মহারাজ?' জড়ানো ভারী গলায় কবন্ধ প্রশ্ন করল।

আমি কোনওরকমে তাকে বোঝালাম যে, আমি বারডিহি ফিরতে চাই।

তাতে জানতে পারলাম, সকাল সওয়া সাতটার আগে কোনও ট্রেন নেই। কারণ, ডেহ্‌রি-অন-সোন/বারডিহি প্যাসেঞ্জার ওই সময়েই সাতবহিনিতে আসে। তারপর সে জড়ানো গলায় বলল, কোই বাত নহি। রাতটা মাস্টারজির কামরায় থেকে যান।

আমি যেন সেই নেমন্তন্নের অপেক্ষায় ছিলাম!

সুতরাং আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়লাম মাস্টারজির ঘরে। আমার কবন্ধ-চেহারার শুভাকাঙ্ক্ষী তখন জড়ানো গলায় দেশোয়ালি গান গাইছে।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই কেমন অদ্ভুত একটা শিহরন খেলে গেল আমার শরীরে।

ঘরটা যেমন বিচিত্র, তেমনই বিচিত্র ঘরের তিনজন মানুষ।

জানি, এরপর আমি যা বলব সেটা বিশ্বাস হওয়া কঠিন, কিন্তু আমার মিথ্যে বলার কোনও উপায় নেই।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই আমার মনে হলো, ঠাণ্ডাটা যেন বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আজও মনে পড়ে, ব্যাপারটাতে আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পোড় খাওয়া সেল্‌সম্যানের সহজাত স্মার্টনেসে অবাক ভাবটাকে চট্‌ ... সামলে নিলাম। তারপর ঘরে হাজির তিনজন মানুষের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হেসে ঢুকে পড়লাম ঘরের অন্দরে। তারপর দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলাম।

চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়ে তৈরি ঘরটা মাপে মাঝারি। হয়তো দশ-বাই-পনেরো হবে। ঘরের মাথায় টিনের চাল। সেখান থেকে একটা উলঙ্গ বাল্‌ব ঝুলছে। ভোল্টেজ কম থাকায় তার আলোটা কেমন লালচে দেখাচ্ছে।

বাল্‌বের প্রায় গা ঘেঁষে ঝোলানো রয়েছে একটা বড় মাপের সিলিং ফ্যান। বাল্‌বটা ফ্যানের ওপর দিকটায় থাকায় ঘরের মেঝেতে আর দেওয়ালে ফ্যানটার বিচিত্র ছায়া পড়েছে। একটা ব্লেডের ছায়া ঘরের মানুষগুলোর গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে দেওয়াল পর্যন্ত।

ঘরের জানলা দুটো। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য দুটোই বেশ ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের বাঁ দিক ঘেঁষে বেশ বড় মাপের চৌকো কাঠের টেবিল। তার একদিকে একটা সাবেকী চেয়ার—মাস্টারজির চেয়ার। তার পাশেই একটা যন্ত্র রাখা আছে। বোধহয় খবর পাঠানোর টরে-টক্কা যন্ত্র।

টেবিলে বেশ কিছু কাগজপত্র ডাঁই করা রয়েছে। তারই মাঝে একটা বড় মোমবাতি দাঁড় করানো। আর টেবিলের শেষ প্রান্তে একটা কালো রঙের ধুলো পড়া টেলিফোন। চেহারা দেখে মনে হয় না গত পাঁচ বছরে ওটা কখনও বেজে উঠেছে।

টেবিলের এ-পাশে আরও দুটো চেয়ার—কাঠ, পেরেক আর টিনের পাত দিয়ে যথাসাধ্য তাপ্পি মারা। তারই একটার হাতলে একটা নস্যি রঙের কম্বল ভাঁজ করে রাখা। কম্বলের কাছাকাছি কয়েকটা মশা উড়ছে, পিনপিন করে শব্দ হচ্ছে।

ঘরের তিনজন মানুষ এককোণে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছিল। তাদের ঘিরে সিগারেট অথবা বিড়ির ধোঁয়া উড়ছিল। আমার কাষ্ঠহাসির উত্তরে একজন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল আমাকে: 'আইয়ে, সাব, আইয়ে। বেফিক্‌র রহিয়ে, টিরেন টাইমপে আ জায়েগী—'

কথায় বোঝা গেল, এই ঘরটা বেশ কিছুদিন ধরেই ওয়েটিং রুমের ভূমিকা পালন করছে—দিনে না হোক, অন্তত রাতের বেলায়। নইলে আমাকে দেখামাত্রই 'ট্রেন সময়মতো এসে যাবে' এ-কথা ঘোষণার মানে কী!

শীতের প্রকোপ বেড়ে উঠতেই বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ঘরের মানুষগুলোকে দেখে।

আগেই বলেছি ভূতের ওপরে আমার বিন্দুমাত্রও আস্থা নেই। আর এই তিনজনকে দেখে মোটেই চোর-ডাকাত বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অবাক হলাম। কারণ তিনজনের পোশাক-আশাক একেবারে তিনরকমের। মানে, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই তিনজনের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, স্বচ্ছলতা, এসবের মধ্যে কোনও মিলই নেই। অথচ ওরা তিনজন কাছাকাছি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে!

প্রথমজন, যিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, হঠাৎই টেবিলের কাছে গিয়ে সাবেকী চেয়ারটায় বসে পড়লেন। অর্থাৎ, তিনি-ই বোধহয় মাস্টারজি।

তাঁর পরনে গরম কাপড়ে তৈরি কালচে রঙের প্যান্ট। গাঢ় সবুজ সোয়েটারের ওপরে ঘন নীল রঙের প্রিন্স কোট এঁটে বসেছে। চেহারা মোটার দিকে হওয়ায় কোটটা মধ্যপ্রদেশ বরাবর যথেষ্ট ফুলে রয়েছে। কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে দোমড়ানো-কোঁচকানো একটা রুমাল। আর দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাস্টারজির রঙ ময়লা। গলায়-মাথায় মাফলার। গোলগাল মুখে বয়েসের ভাঁজ। ঠোঁটের ওপরে কাঁচাপাকা ঝাঁটা গোঁফ। ভুরু জোড়া প্রায় গোঁফেরই আত্মীয়। মাথার যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় ভদ্রলোকের অবস্থা একরকম ইন্দ্রলুপ্ত।

মাস্টারজি শব্দ করে নাক টানলেন কয়েকবার। তারপর পকেটের রুমাল দিয়ে নাকটিকে বাগিয়ে ধরে কষে ঝাড়া দিলেন দু'বার। রুমাল পকেটে রেখে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে একটু সামলে নিয়ে আমাকে হিন্দিতে বললেন, 'বসুন, ওই চেয়ারটায় বসুন—'

হাতলে কম্বল ঝোলানো চেয়ারটিকে পেরিয়ে আমি পরের খালি চেয়ারটার কাছে গেলাম। হাতের সুটকেস ও ব্যাগ মেঝেতে নামিয়ে রেখে বসে পড়লাম চেয়ারে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলাম। পাশের চেয়ারের কম্বলটা আমার গায়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কার-না-কার কম্বল, গায়ে দেওয়া ঠিক হবে না—এ কথা ভেবে চুপ করে রইলাম।

ঠিক তখনই ঘরের বাকি দুজন মানুষ টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমার দু'পাশে দুজন। বাল্‌বের আলোয় ওদের অদ্ভুত ছায়া পড়েছে টেবিলে, মেঝেতে।

একজনের চেহারা নিতান্তই কুলি-কামিন গোছের। গায়ের জামাকাপড়ও সেইরকম। মোটাসোটা, কুচকুচে কালো রঙ, চোখ লালচে, গা থেকে কেমন একটা বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। দু'আঙুলে টিপে ধরা একটা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

কিন্তু তৃতীয়জনের চেহারা আর পোশাক তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

ফরসা সুন্দর মুখে আভিজাত্যের ছাপ। পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। পরনে হালকা ছাইরঙের থ্রি-পিস সুট। গলায় টাই। চোখে রিমলেস চশমা।

ভদ্রলোকের ডান হাতের মধ্যমা আর অনামিকায় সোনা-বাঁধানো দুটো পাথরের আংটি। আর কপালের বাঁ দিকে একটা বড় লালচে তিল।

চেয়ারে বসে খানিকটা স্বস্তি

আমরা ও স্টেটব্যাঙ্ক

কাজু আর কোকো। দু'জনে মিলে আমরা। আমরা দু'জন যমজ ভাই-বোন। আমরা দুষ্টুমি করি একসঙ্গে, ছবি আঁকি একসঙ্গে। খেলা করি, খাই-দাই ঘুমাই – সব একসাথে। শুধু স্কুলে যাই আলাদা আলাদা।

পুজোর সময় খুব মজা হয়। তাও তো এবছর দাদাইটা নেই। কেন যে আমাদের ছেড়ে অতোদূরে চলে গেল? প্রতি বছর পুজোয় সকলেই কতো কিছু কিনে দেয় আমাদের। তবে সবার থেকে প্রিয় কি জানো? বুলবুলি পিসির দেওয়া স্টেট ব্যাঙ্কের গিফট চেক! সেই চেক ভাঙিয়ে মা আমাদের ইচ্ছেমতন জিনিস কিনে দেন। আম্মা বলেছেন বড় হলে আমাদেরও ব্যাঙ্ক হবে স্টেট ব্যাঙ্ক। খুব মজা হবে, তাই না?

স্টেট ব্যাঙ্ক

Indo Aryan/SBI/97

পেয়েছিলাম, তবে শীত একটুও কমেনি। তার ওপর এই অদ্ভুত ঘরে এই তিনজন মানুষের জোট আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কী! রাতটা চারজনে মিলেই কাটাতে হবে। সিগারেটের তেষ্টা পাওয়ায় একটা সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালাম।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর কী বলব ভাবছি, এমন সময় মাস্টারজিই আমাকে বিপদ থেকে বাঁচালেন। বললেন, 'আপনাকে দেখে সেল্‌সম্যান বলে মনে হচ্ছে—'

আশ্চর্য! কী করে উনি বুঝলেন আমি সেল্‌সম্যান! এই পাঁচ বছর সেল্‌সে চাকরি করে-করে আমার চেহারায় কি সেল্‌সম্যানের স্পষ্ট ছাপ পড়ে গেছে? সেরকম কোনও ছাপ আবার হয় নাকি!

আমার অবাক ভাব দেখে চাপা হাসলেন মাস্টারজি। ছোট-হয়ে-আসা সিগারেটটা টেবিলে রাখা একটা ভাঙা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্যাসেঞ্জার দেখে-দেখে আমার চোখ এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তা কী বিক্রি করেন আপনি?'

আমি এবার একটু উৎসাহ পেলাম। মাস্টারজিকে ইনসেক্ট সেন্টিনেলের কথা বললাম। ভাবলাম, যাকগে, আমার যন্ত্রের গুণপনা জাহির করেই ঘণ্টা তিন-চারেক কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগেই আমার বাঁ দিকে দাঁড়ানো সুট পরা ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়লেন দ্বিতীয় খালি চেয়ারটায়। সামান্য হেসে বললেন, 'হুঁ, আমিও একসময় এই লাইনে ছিলাম। সোলার ল্যানটার্ন—মানে সৌর লণ্ঠন বিক্রি করতাম। আপনি হয়তো নাম শুনে থাকবেন—চ্যাম্পিয়ন ব্র্যান্ড সোলার ল্যানটার্ন—'

নাম না শুনে থাকলেও আমি সৌজন্য দেখিয়ে ঘাড় নাড়লাম। ওঁকে একটা সিগারেট অফার করতেই মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

বাইরে ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। ঘটাং-ঘট শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল কোনও এক্সপ্রেস ট্রেন। ঘরটা থরথর করে সামান্য কেঁপে উঠল। মাথার ওপরে বিশাল পাখাটা দুলে উঠল এপাশ-ওপাশ। তার ব্লেডের ছায়া ঘরের মেঝেতে জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়তে লাগল।

ট্রেনের হুইসল শোনা গেল আবার—বহুদূর থেকে ভেসে এল। আর তার ছুটে যাওয়ার শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে-ধীরে।

যতদূর জানি কোনও স্টেশন দিয়ে থ্রু ট্রেন পাস করাতে হলে সিগনাল সবুজ করে দিতে হয়। মাস্টারজি তো আমাদের সঙ্গে বসে আছেন! তা হলে সিগনালের কাজটা করল কে?

'কে আবার, জগমোহন।' গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন মাস্টারজি, 'আমার পোর্টার।'

ভদ্রলোকের দেখি আশ্চর্য ক্ষমতা! না বলা প্রশ্নও দিব্যি টের পেয়ে যান!

আমি কৌতূহলের নজরে তাঁকে জরিপ করলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

জগমোহন নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে দেখা কম্বল মুড়ি দেওয়া সেই কবন্ধ। আর এখন আমার ডান দিকে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারই কোনও ভায়রাভাই। এই লোকটার পরিচয় এখনও আঁচ করতে পারিনি।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হেঁচকি তুলে হাসলেন মাস্টারজি। রুমাল বের করে বেশ জোরে নাক ঝেড়ে বললেন, 'এ হলো রামাইয়া। গ্যাংম্যান—মানে একসময় গ্যাংম্যান ছিল। বছর চারেক হলো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কাছাকাছি ঝোপড়িতে থাকে। মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করতে চলে আসে—এই বিরজুবাবুর মতন—' কথা শেষ করে ফিটফাট প্রাক্তন সেল্‌সম্যানের দিকে হাত দেখালেন মাস্টারজি।

ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন আমাকে। বললেন, 'আমার নাম ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব।'

আমিও প্রতিনমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলাম।

আমাদের গল্পগুজব চলতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে সিগারেট। আমি ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কাজ চালাচ্ছিলাম। শুধু রামাইয়া নীরব শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর কম্বল ঘিরে মশার দল পিনপিন করে উড়ছে। কিন্তু তাতে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

কথাবার্তার ফাঁকে একবার হাতঘড়ি দেখলাম। সবে সাড়ে ন'টা।

সেটা লক্ষ্য করে মাস্টারজি বললেন, 'এর মধ্যেই ঘড়ি দেখছেন! আপনার ট্রেন তো সেই সকালে!'

ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব হাসলেন সে-কথা শুনে, বললেন, 'এর মধ্যেই বোর হয়ে গেলেন! আমাদের বোর হলে চলে না। আমাদের ট্রেন আসবে সেই রাত দশটায়—'

'আমাদের' মানে কাদের? ব্রিজমোহনের সহযাত্রী কি আর কেউ রয়েছেন? তা ছাড়া রাত দশটায় কোন ট্রেনই বা আসবে! কোথায় যাওয়ার ট্রেন?

একটা শীতের ঢেউ পাক খেয়ে গেল আমাকে ঘিরে। শ্রীবাস্তবের মুখ-চোখ কেমন অদ্ভুত লাগছিল আমার। যখন উনি কথা বলছেন, হাসছেন, তখন সবকিছু ঠিকঠাক মনে হলেও ওঁর চোখজোড়ায় কোনওরকম ছায়া পড়ছে না। চোখ দুটো যেন মরা কই মাছের মতো: তীক্ষ্ণ, অথচ প্রাণহীন।

হঠাৎই আমার কোমরের কাছ থেকে পিপ-পিপ শব্দ উঠল। আবার সেই হতচ্ছাড়া পেজার! দেখি এবার কী খবর পাঠাল হেডকোয়ার্টার।

শ্রীবাস্তব এবং মাস্টারজি প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কী, পেজার নাকি?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ—'

তারপর যন্ত্রটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে ধরলাম চোখের সামনে। মেসেজ রিসিভ করতে গিয়ে অবাক হলাম। কোথায় মেসেজ! শুধু সারি-সারি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ফুটে উঠেছে পেজারে।

বহু চেষ্টা করেও ওই অদ্ভুত মেসেজ আমি পাল্টাতে পারলাম না।

মাস্টারজি টেবিলের ওপারে আমার ঠিক উল্টোদিকে বসে আছেন। পেজারের মেসেজ কোনওমতেই ওঁর দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু উনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি

কখন যে কী করে বসে কোনও বিশ্বাস নেই। তবে ওই জিজ্ঞাসা-চিহ্নই জীবনের সার কথা। তুলসীদাস বলে গেছেন, মায়া ছায়া একসি বিরলা জানে কোয়/ভগতাকে পাছে লাগে সম্মুখভাগে সোয়। মানে, মায়া আর ছায়া একই...' শেষটা উনি বিড়বিড় করে কী যে বললেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে ক্ষান্ত হয়ে পেজারটা আবার গুঁজে রাখলাম কোমরে।

রামাইয়া ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোটকা গন্ধটা আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। আমার গা গুলিয়ে উঠল। অথচ বাকি দুজন দিব্যি নির্বিকার। ওঁদের দেখে মনে হচ্ছে ওঁরা যেন কোনও একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছেন—ট্রেনের জন্য নয়। অবশ্য মাস্টারজির ট্রেন ধরার কথাও নয়।

শ্রীবাস্তব হাত নেড়ে মশা তাড়ানোর চেষ্টা করে বললেন, 'মশার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই। গায়ে কামড় না বসিয়েও যদি আশেপাশে ওড়ে তা হলেও বিচ্ছিরি লাগে।'

আমি আবার একটা ছুতো পেয়ে একেবারে পাক্কা সেল্‌সম্যানের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঝুঁকে পড়ে সুটকেস খুলে একটা যন্ত্র বের করে নিলাম। কে বলতে পারে, যন্ত্রটা দেখেশুনে মাস্টারজি আর শ্রীবাস্তব হয়তো একটা করে কিনে ফেলতে পারেন! তা ছাড়া কোম্পানির প্রচার তো খানিকটা হবেই।

একটা আই-এস মাস্টারজির টেবিলে রেখে যন্ত্রটার গুণাগুণ সম্পর্কে সাতকাহন বক্তৃতা শুরু করে দিলাম। মাস্টারজিকে তিন নম্বর সিগারেট অফার করে বললাম, 'যন্ত্রটা চালু করলেই এর অ্যাকশন দেখতে পাবেন। এ-ঘরের সব কটা মশা পালিয়ে গিয়ে একেবারে রেললাইনে গিয়ে শেলটার নেবে।'

মাস্টারজি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বারকয়েক নাক টানলেন। ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। লক্ষ্য করলাম, ওঁদের দুজনের চোখেই কৌতুক। সেটা আমার আই-এস-এর প্রতি তাচ্ছিল্য কিনা বুঝতে পারলাম না।

মাস্টারজি বিড়বিড় করে বললেন, 'মশার জন্য আমাদের খুব একটা অসুবিধে

ওর মুখ-মাথা চৌচির হয়ে গেল

হয় না। তবু আপনি যখন বলছেন তখন চালু করুন—'

শীত-টিত ভুলে গিয়ে আমি যন্ত্রটাকে ঘরের সুইচবোর্ডের কাছে নিয়ে গেলাম। প্লাগপয়েন্টে মেইন্‌স কর্ডের প্লাগটা গুঁজে দিয়ে যন্ত্রটাকে বসিয়ে দিলাম মেঝেতে। তারপর মাস্টারজি আর শ্রীবাস্তবের দিকে অহঙ্কারী ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে তাকালাম।

এইবার হাত দুটো শব্দ করে ঝেড়ে নিয়ে একটু হেসে আই-এস-এর সুইচ অন করে দিলাম।

বিপর্যয়টা শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গেই।

আলট্রাসনিকের প্রকোপে পিনপিন করে ওড়া মশাগুলো যথারীতি পালাতে শুরু করল ঠিকই, তবে বাকি তিনজন মানুষও অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দিল।

জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাস্টারজি তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। দু'কানে আঙুল ঠেসে ধরে মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্ধ কিজিয়ে, সাব, উও শয়তান মশিনকো বন্ধ কিজিয়ে—'

শ্রীবাস্তবের আভিজাত্য তখন কোথায় উবে গেছে! দু'কানে হাত চেপে লাফিয়ে উঠেছেন তিনিও। আর জড়ানো স্বরে চিৎকার করে কী সব বলছিলেন।

রামাইয়া পাগলা কুকুরের মতো দাপাদাপি করে ঘরময় দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে।

সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস অবস্থা।

অবাক ভাবটা কোনওরকমে কাটিয়ে উঠে আমি চট করে আই-এস-এর সুইচটা অফ করে দিলাম।

যন্ত্রটায় তো এমন কোনও গোলমাল নেই যাতে আলট্রাসনিকে মানুষের কোনও অসুবিধে হবে! তা ছাড়া আমার তো কিছু হয়নি! তা হলে এই তিনজন মানুষ এরকম অদ্ভুত আচরণ করল কেন?

মাস্টারজি আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়েছেন। মাথা ঝুঁকিয়ে বড়-বড় শ্বাস ফেলছেন।

শ্রীবাস্তব একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে একরকম যেন ধুঁকছেন।

আর রামাইয়া ঘরের মেঝেতে বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর মাঝে-মাঝে ভয়ার্ত চোখে একটু দূরে রাখা যন্ত্রটার দিকে দেখছে।

আমি খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লাম। কী বলব, কী করব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এমন সময় বহুদূর থেকে কোনও ট্রেনের হুইসল শোনা গেল।

হুইসলের শব্দটা অনেকটা আর্ত চিৎকারের মতো শোনাল।

আর ঠিক তখনই ঘরের সিলিং পাখাটা অতিকায় পেন্ডুলামের মতো ধীরে-ধীরে দুলতে শুরু করল।

শ্রীবাস্তব উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাল মাস্টারজির দিকে। চাপা গলায় বলল, 'ট্রেন আসছে...আমাদের ট্রেন...'

মাস্টারজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সোয়েটার-কোট টেনে-টুনে ঠিকঠাক করে নিলেন—যেন এখনই কোথাও বেরোবেন। আর রামাইয়া তার ক্লান্ত দেহটাকে ভাঁজ ভেঙে কোনওরকমে দাঁড় করালো।

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত দশটা হতে

কয়েক সেকেন্ড বাকি।

ট্রেনটা ছুটে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তার ছোটার গতি বিন্দুমাত্রও কমছে বলে আমার মনে হলো না।

এরপর যা হলো তা কী করে আমি সইতে পেরেছি জানি না।

রামাইয়া এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠল। চোখের পলকে ওর মুখ-মাথা ছিন্নভিন্ন তরমুজের মতো ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ছিটকে গেল চারপাশে। অথচ ওর কবন্ধ দেহটা তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখনও জানি না, এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা আরও ঘটবে।

রামাইয়ার পর শ্রীবাস্তবের পালা।

ওঁর চিৎকারটা অনেকটা ঘাড় মটকে দেওয়া মুরগির মতো শোনাল। আর পাটকাঠি ভাঙার মতো মড়মড় শব্দ হয়ে ওঁর পেটের ওপর আড়াআড়ি তৈরি হয়ে গেল বীভৎস ক্ষতচিহ্ন। সুন্দর পোশাক-আশাক রক্তে ভেসে গেল। প্যান্ট বেয়ে রক্তের ঢল গড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে।

সেই অবস্থাতেই এক ভয়ঙ্কর উল্লাস ফুটে উঠল শ্রীবাস্তবের চোখে-মুখে। তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'ট্রেন এসে গেছে—রাত দশটার ট্রেন—'

মাস্টারজি হাসলেন—উন্মাদের হাসি। হাসতে-হাসতেই তাঁর মাফলার জড়ানো গলাটা ফাঁক হয়ে গেল। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরে গেল উলটো দিকে, কিন্তু বাকি দেহটা সোজাসুজি আমার মুখোমুখি—অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো।

রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল টেবিলে, টেবিলের কাগজে। কোটের রঙ গাঢ় নীল হওয়ায় রক্তের দাগ তেমন করে বোঝা যাচ্ছিল না।

ওই অবস্থাতেই মাস্টারজি কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন।

সিলিং পাখাটা এখন আরও জোরে দুলছে। ওটার ব্লেডের ছায়া খেলা করে যাচ্ছে আমাদের চারজনের গায়ের ওপর।

'মাস্টারজি, চলুন, আর সময় নেই—' শ্রীবাস্তব তাড়া দিলেন মাস্টারজিকে।

তারপর আমার বিহ্বল চোখের সামনে তিন-তিনটে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। ট্রেনের শব্দটা তখন প্ল্যাটফর্মে ঝড় তুলছে।

চলে যাওয়ার সময় মাস্টারজির পিঠটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছিলাম পিঠের দিকে ফেরানো তাঁর মুখটাও। সেখানে নানা জায়গায় রক্তের ছিটে, আর প্রশান্ত ভঙ্গিতে দু'চোখ বোজা।

মাস্টারজির ঠোঁট নড়ে উঠল: 'মায়া ছায়া একসি বিরলা জানে কোয়...'

ওঁরা তিনজন প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে গেলেন রেললাইনের দিকে। অন্ধকারে ওঁদের আর দেখা গেল না। ট্রেনের চাকার শব্দ রাতের অন্যান্য শব্দের গলা টিপে ধরল। বুক-ফাটানো রক্ত-হিম-করা আর্ত চিৎকার করে উঠল ছুটন্ত ট্রেনের হুইসল।

তারপর...

তারপর সব চুপচাপ।

শীতের বাতাস আর মশার পিনপিন শব্দ ঘিরে ধরেছিল আমাকে। তার একটু পরেই বোধহয় আমি ঘরের দরজার কাছে টলে পড়ে গিয়েছিলাম।

পরদিন বারডিহির ট্রেনে যখন উঠলাম তখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। পোর্টার জগমোহন আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল।

ওর কাছেই শুনেছি, রাত দশটার ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায় গত পাঁচ বছরে তিনজন সুইসাইড করেছে: মাস্টারজি, ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব আর রামাইয়া। যখন বেঁচে ছিল তখন ওরা কেউ কাউকে খুব একটা চিনত না। কিন্তু মারা যাওয়ার পর কোনও-কোনও রাতে ওরা তিনজন দেখা দেয় ওই ভাঙাচোরা ঘরটায়। তারপর একসঙ্গে ঝাঁপ দেয় ওই ভুতুড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের তলায়। এসবই জগমোহনের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে ট্রেনটাকে সে কখনও চোখে দ্যাখেনি—শুধু তার শব্দ শুনেছে।

ছবি: বিজন কর্মকার

চলো দুন এক্সপ্রেসে

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

ডেরী-অন্ শোন নদী শোন্‌পদি কোথা যাস
ঝিকমিক রেলগাড়ি ঝালমুড়ি কে চিবাস ?

খেতে গিয়ে সরভাজা হাড়ভাজা করে ছাড়ে
পদি খান সবখান সম্মান ছারেখারে।

গয়াধামে পদতল শতদল হয়ে ফোটে
রাতভোর ঘুম সারা শুকতারা ওই ওঠে।

বোধগয়া মন্দিরে গম্ভীরে স্তব গায়
সরোদের আমজাদ সাজ্জাদ তবলায়।

চলো দুন এক্সপ্রেসে যাই ভেসে বেনারস
পুন্নিমে গঙ্গাতে বজরাতে কে না খোশ !

সারনাথে বুদ্ধের শুদ্ধের মূর্তিটি
আজো আছে অশোকের ভক্তির কুর্সিটি !

শিল্পী

তপন সেন

হাতে কী রে তোর ? আগে তো দেখিনি ?
ওমা ! এ যে দেখি, বেহালা একটা !
বাবা বুঝি তোকে কিনে দিয়েছেন কালকে ?
—জন্মদিনের উপহার এটা,
ছোটকাকা এসে দিয়ে গেছে কাল,
যে কাকার বাড়ি গঙ্গা পেরিয়ে, সালকে।

ভাল করে যদি শিখিস বাজাতে,
বড় হলে বহু রোজগার হবে,
শিল্পীরা নাকি অজস্র টাকা কামায়।
—রোজগার ? সে তো শুরু হয়ে গেছে !
বাবা বলেছেন, না বাজাই যদি,
দশ টাকা করে রোজ দেওয়া হবে আমায়।

ছবি: সূফি

ফাঁসি থেকে নিরুদ্দেশ

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

ফাঁসির আসামীর মাথায় যেন খুন চাপে। চিৎকার করে বলে, 'তার মানে? একটা সামান্য গোলাপ ফুলের অধিকার আমার নেই?'

জেলের বড়কর্তা বলেন, 'আপনি কেন কারোরই নেই। মৃত্যুদণ্ডের পর কোনো ফুলই আসামীর কফিনে দেওয়া হয় না। উপরওলার আদেশ। আমি নিরুপায় মিঃ পার্ভিস।'

উইল পার্ভিসের চোখ দুটো ছলছল করে, 'কিন্তু আমি নির্দোষ। দোষী হলে ফুল চাইতাম না। আমার কবরে নাম লেখা ফলক না থাক ; প্রথম দিনে অন্তত গোটাকয়েক লাল গোলাপ দিয়ে আমাকে স্মরণ করো। আমি ফুল ভীষণ ভালবাসি গভর্নর—আমার বাড়ির বাগানে সারা বছরই ফুলের মেলা।'

ফাঁসির আসামী পার্ভিস কি সত্যি নির্দোষ?

আসামী তাই বলে, কিন্তু বিচারক তা বলেন না। পার্ভিস বলে, সে নিরপরাধ, কিন্তু আইন বলে খুনী। তাই তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন বিচারক।

কিন্তু বিচারের প্রথম দিন থেকে শুরু করে পার্ভিস বলে আসছে তার কথা। বিচারকদের বলেছে, উকিলদের বলেছে, প্রহরীদের বলেছে। আর এখন যাকে সামনে পায়, পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে, 'আনি নির্দোষ, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কিন্তু শুনছে কে? সাক্ষ্যপ্রমাণ সব মিলিয়ে বিচারকের চুলচেরা রায়—মৃত্যুদণ্ড। নড়চড় নেই।

ফাঁসির সেলে পার্ভিসের চোখে ঘুম নেই। এখন আর মানুষের কাছে নালিশ করে না সে—ভগবানের কাছে মিনতি করে। গভীর রাত্রে জেলের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পার্ভিসের গলাটা কান্না নিয়ে আছড়ে পড়ে—'ভগবান, তুমি কি দেখতে পাও না? আমি যে নির্দোষ।'

শেষের দিন যতই এগিয়ে আসে—পার্ভিসের চোখমুখ শান্ত হয়ে ততই জ্বলজ্বল করে। অন্যান্য সব ফাঁসির আসামীর মতোই পার্ভিসের হাতের কাছে বাইবেল—সেক্সপীয়র। সারা দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকে পার্ভিস।

মানুষের হাতে গড়া আইন। আর ভগবানের হাতে গড়া মানুষ। মানুষের দোষ-ত্রুটি আছে কিন্তু ভগবানের নেই। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে পার্ভিসের চোখ দুটো চকচক করে। ভগবানের ইচ্ছেতেই সব হয়। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।

সেই শেষ দিন।

সবার আগে পুরোহিত ঢোকেন।

পার্ভিস বলে, 'গেট আউট। তোমাকে দেখলেও গা জ্বালা করে। আত্ম-শুদ্ধির মন্ত্র আমাকে শোনাতে হবে না। সরকারকে শোনাও, বিচারকদের শোনাও। ওদের পাপের সীমা নেই। আমার প্রতি অবিচার করে ওরা নরকে যাবে।'

পুরোহিত আসামীর কথা শোনেন না। ধর্মগ্রন্থ থেকে আত্ম-শুদ্ধির মন্ত্র পাঠ করেন। কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পার্ভিস। আজ যেন এতটুকু ভয়-ডর নেই ওর। হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে পারে। জল্লাদ ঘরে ঢুকতেই বলে, 'নাও চটপট করো। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধ। চলো ভগবানের আদালতে যাই।'

জল্লাদ আশ্চর্য হয়, 'ভগবানের আদালত?'

'হ্যাঁ, ফাঁসির মঞ্চ। ওখানে মানুষের হাত নেই—ভগবানের হাত। ঐ মঞ্চেই আজ বিচার। যদি দোষী হই শাস্তি পাব—নইলে মুক্তি।'

মনে মনে হাসে জল্লাদ। কিছু বলে না। হ্যাঁ, চিরদিনের জন্যই

মুক্তি পেয়ে যাবে আসামী উইল পার্ভিস।

সে সময় ফাঁসি হতো প্রকাশ্য স্থানে। বধ্যভূমির চারপাশে তাই দর্শকদের ভিড়। একটা আশ্চর্য থমথমে পরিবেশ। অপরাধ যত কঠিনই হোক না কেন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর প্রতি করুণা নিয়ে সকলেরই মন চিরদিনই কোমল হয়ে ওঠে। সেই কোমলতার জন্যই বুঝি এমন থমথমে নিস্তব্ধতা।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায় পার্ভিস। জল্লাদ চটপট হাতের সাদা টুপি দিয়ে চোখমুখ ঢেকে দেয়। সহকারী জল্লাদ হাঁটুর নিচে পা দুটো বাঁধে। গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়ে পায়ের তলার কাঠের পাল্লা খুলে দেয় জল্লাদ।

কিন্তু কি আশ্চর্য!

গলায় দড়ি শক্ত হয়ে বসে না—ফাঁস লাগে না। দড়ি গলে মাটিতে আছাড় খায় পার্ভিস। বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমি নির্দোষ।'

জল্লাদের চোখ দুটো আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে। মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামে জল্লাদ। পার্ভিসকে টেনে ওপরে তোলে—আবার গলায় দড়ি পরাতে যায়।

একটানা চিৎকার করে চলেছে তখনও আসামী, 'আমি নির্দোষ। নির্দোষ।'

উত্তেজিত জনতা পার্ভিসের পক্ষ নেয়। চিৎকার করে বলে, 'খবরদার। ছেড়ে দাও ওকে।' কাতারে কাতারে লোক ফাঁসির মঞ্চে উঠে পড়ে। শেরিফকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয়। জল্লাদকে ঠেলতে ঠেলতে মাটিতে নামায়। ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে ফেলে। মুহূর্তে তুমুল কাণ্ড বেধে যায়।

দর্শকরা চিৎকার করতে থাকে—আসামী নিশ্চয়ই নির্দোষ। তা না হলে অলৌকিক ব্যাপারটা ঘটেই বা কি করে? গলায় কেন ফাঁস লাগে না?

সত্যি সত্যি সেদিন ভগবানই যেন বাঁচিয়ে দিলেন পার্ভিসকে। জনমতের চাপে ফাঁসি হলো না। আবার জেলে ফিরে আসে পার্ভিস।

কিন্তু মিরাকল বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আইন মানে না। জেল-গভর্নরও অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করেন না। পার্ভিসের জীবনভিক্ষার আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

দু'বছর ধরে জেলে পচছে তখন পার্ভিস। সারা দেশে পার্ভিসের বিচার নিয়ে নানা বিতর্ক, মতভেদ। যারা ভগবানে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়। হ্যাঁ, পার্ভিস নিশ্চয়ই নির্দোষ। আইনের ত্রুটি আছে—ভগবানের নেই। ভগবান ঠিকই দেখেন।

নতুন করে ফাঁসির তারিখ পড়ল আবার পার্ভিসের। আসামী বিশ্বাস নিয়ে বলে, 'এবারও অলৌকিক কিছু একটা হবেই। ফাঁসি হবে না।'

সত্যি ফাঁসি হলো না। আবার মিরাকল। উত্তেজিত জনতা ফাঁসির আগেই ঘটিয়ে দিল সেই অলৌকিক ব্যাপার। জেল ভেঙে মুক্ত করে দিল পার্ভিসকে। পার্ভিস ফাঁসির দড়িকে কলা দেখিয়ে উধাও হয়ে গেল।

সারা দেশ পার্ভিসের ছবিতে ছেয়ে গেল আর সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের পুরস্কারের ঘোষণাপত্র। পুলিশ ঘুরে বেড়াতে লাগল হন্যে হয়ে। কিন্তু ভগবান যার সহায়—মানুষের সাধ্য কোথায় তাকে টেনে বার করে আবার শাস্তি দেয়! ধরা পড়ে না পার্ভিস।

অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী নতুন গভর্নর চেয়ারে বসেই প্রথম যেটাতে স্বাক্ষর দিলেন সেটা পার্ভিসের মুক্তিপত্র। ক্ষমা করে দিলেন তিনি আসামীকে।

এবার বাড়ি ফিরে এল পার্ভিস। ক্ষেত, জমি, ব্যবসা নিয়ে মেতে রইল—আস্তে আস্তে লোকজনেরাও ভুলে গেল পার্ভিসের কথা। পার্ভিস সত্যিই নির্দোষ কিনা সে নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না।

পার্ভিস কি সত্যিই নির্দোষ? উত্তর মিলল বেশ কয়েক বছর পর এক মৃত্যুপথযাত্রী রুগীর মুখের স্বীকৃতিতে, 'আমিই সেই খুনী, পার্ভিস নির্দোষ।' শেষ কথার মধ্যে স্বীকার করে শান্তিতে মরতে চাইল আসল আসামী।

তারপর? খবরের কাগজে আবার পার্ভিসের নাম, আবার দেশজোড়া লোকের কাছে তার নতুন করে আবির্ভাব—'পার্ভিস—দি সোকল্ড্ মারডারার।'

যে আইন একদিন ফাঁসির দড়ি পরাতে চেয়েছিল, সেই আইনের কাছেই নতুন করে বিচার চাইল পার্ভিস। মামলা ঠুকে দিল সরকারের বিপক্ষে।

এবার কিন্তু আসামীর পক্ষেই রায় দিলেন বিচারক। এক হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ পেল পার্ভিস—'দি সোকল্ড্ মারডারার'।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

ছবি ঃ অমিত চক্রবর্তী

মণিমুক্তা • পৃথা বল

দলনেতা

হিন্দু-মুসলমান সব জাতির ছেলেদের নিয়েই সুবির দল। এই দলের কাজ সমাজসেবা, স্কুল-পরিচালনা, ব্যায়ামচর্চা, পরোপকার এই সব। সুবি এদের নেতা।

সেবার শহরে বসন্ত রোগ দেখা দিল। সাংঘাতিক সেই রোগে আক্রান্ত হলো একটি ছেলে। সুবির দল দিনরাত তার পরিচর্যায় নিযুক্ত হলো। সুবির পিতা খবর পেয়ে ছেলেকে ডাকলেন। তিরস্কার করে রোগের ঐ ভয়াবহতা সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন।

সুবি খুব ধীরভাবে জবাব দিল, আমরা খুব সাবধান হয়েই শুশ্রূষা করছি বাবা। এ ব্যারাম যে ভয়ের তা আমি জানি। কিন্তু ভয়ের বলেই যদি আমরা পেছিয়ে থাকি, তাহলে রোগীর গতি কি হবে? রোগী সারবে কি করে?

এই দলনেতা সুবিকে তোমরা চিনতে পেরেছ কি? ইনিই আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুবি বড় হয়ে দেশের জন্য সংগ্রাম করেছেন। অবরুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে জাপানে সাইগনে তিনি গঠন করেন আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো এক বিশাল দল। নেতাজী নামটি তাঁকে এখান থেকেই দেওয়া হয়।

উষসী

নবনীতা দেবসেন

দক্ষিণ দেশের রাজার বারোজন ছেলে ছিল। ছোট বটে, কিন্তু রাজপুত্রেরা যেমন রূপবান তেমনি গুণবান। তারা মৃগয়া শেখে, ঘোড়ায় চড়ে, অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা শেখে, ব্যায়াম করে। কিন্তু ঘরভর্তি বীরপুরুষে রানীমার মন ভরে না। তাঁর একটা তুলতুলে মেয়ের জন্য মন কেমন করে। যে যুদ্ধ করবে না, বাগান করবে, ফুল সাজাবে, কবিতা পড়বে, গান গাইবে, তাঁর কাছে কাছে থাকবে। কিন্তু মেয়ে আর হয় না। একদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ঊষাকাল। রাতের আঁধার কেটে গেছে, আকাশের রং আলতো গোলাপী, বেদানার দানার মতন—তাতে নরম আলোর আভা ছড়িয়ে টুকটুকে-লাল সূয্যি উঠছে—আর তক্ষুণি এক সারি নাম-না-জানা কুচকুচে কালো পাখি ভারী মিষ্টি শিস দিতে দিতে আকাশ দিয়ে উড়ে গেল।

রানীমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"বাঃ, কি সুন্দর! আমাকে যদি কেউ অমনি একটা গোলাপী রঙের মেয়ে দিতো, তার লাল সূর্যের মতন ঠোঁট, আর কালো পাখিদের মতন চোখ, আর গলার সুর ওইরকম মিষ্টি, তাহলে আমার বারোটা ছেলেকেই আমি তাকে দিয়ে দিতুম!"

ঠিক সেই সময়ে ওখান দিয়ে পরীদের রানী যাচ্ছিলেন। রানীমার কথা শুনে তাঁর খুব রাগ হলো। মানুষের কিছুতেই মন ভরে না। এত সুন্দর এক ডজন রাজপুত্তুরে কোলভর্তি, তাতেও রানীর মন ওঠে না? ঠিক যেটি নেই সেইটিই চাই, যা আছে তাতে খুশি নয়। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। যা চেয়েছ তাই পাবে।

পরীরানী বুড়ি ঠান্‌দি সেজে রানীর কাছে এলেন আর বললেন—"তুমি বড় নিষ্ঠুর কথা বলেছ রানী, তোমার কথাই সত্যি হবে। ঠিক ওমনি একটা মেয়ে পাবে, কিন্তু তোমার একটা ছেলেও ঘরে থাকবে না।"—বলেই পরীরানী তো অদৃশ্য। কিন্তু রানীমার মন খারাপ হয়ে গেল। সত্যি সত্যি কি তিনি ছেলেদের দিয়ে দিতে চেয়েছেন? ওটা একটা কথার কথা। কিন্তু নিষ্ঠুর কথা মিছিমিছিও বলতে নেই।

এরপর রানীমার তো মেয়ে হবার দিন ক্রমশ কাছে এসে পড়ল। আঁতুড়ঘরে যাবার আগে রানীমা তাঁর বারোজন ছেলেকেই নিজের ঘরে ঢুকিয়ে চতুর্দিকে সেপাই-সান্ত্রী ঘিরে, সব দরজায় সাতটা করে তালা মেরে গেলেন। কিন্তু যেই না রানীমার মেয়েটি জন্মালো, তার কান্না শোনা গেল, ওমনি ঘুমে সেপাই-সান্ত্রীদের চোখ জড়িয়ে এল, তারা এ ওর ঘাড়ে ঢুলে পড়লো। এক মিনিট পরে যখন তাদের সাড় এলো, ঘর তখন খালি। একটিও রাজপুত্তুরকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ একটাও তালা খোলেনি কেউ। কেবল অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি খোলা ছিল।

রাজবাড়ির বুড়ো মালী বললে, সে বাগানে কাজ করতে করতে দেখেছে, রাজবাড়ির একটা ঘুলঘুলি থেকে পরপর একসারি বুনো হাঁস বেরিয়ে নীল আকাশে উড়ে গেছে। কিন্তু বুড়ো গাঁজা খায় বলে কেউ তার কথা বিশ্বাস করলে না।

এ-রাজ্য ও-রাজ্য ঢুঁড়ে অস্থির হয়ে গেলেন রাজামশাই। একটা নয়, দুটো নয়, বারোটা ছেলে! তাদের আট বছর বয়েস, তারা উধাও হয়ে যাবে কোথায়? রানী কেঁদে ভাসালেন, রাজা কেঁদে ভাসালেন—কিন্তু রাজপুত্তুরদের খোঁজ পাওয়া গেল না। ফুটফুটে ছেলেদের হারিয়ে ফেলে রাজারানী মনমরা হয়ে গেলেন। এমন সুন্দর মেয়েটি পেয়েও তাঁদের মুখে আর হাসি ফিরলো না।

রাজকুমারী উষসী অবশ্য খুব লক্ষ্মী মেয়ে। যেমন তার স্বভাব মিষ্টি, তেমন তার শিক্ষা। আর দেখতে তো সে জন্মেছেই সুন্দর হয়ে। সে দ্যাখে মা-বাবার মনে সুখ নেই। দ্যাখে একটা ঘরে বারোটা খাট-বিছানা, বারোটা পড়ার টেবিল-চেয়ার, ঘোড়াশালে বারোটা তেজী ঘোড়া। অথচ ভাইয়েরা নেই। রাজবাড়িতে কেউ

বলতেও পারে না তারা কোথায়। কেউ জানে না।

উষসী একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলে—"আমার ভাইরা কোথায় গেল? তারা এ বাড়িতে নেই কেন? ইশকুলে তো ছুটি হয়, বাণিজ্য থেকেও লোকে ফেরে, চাকরি থেকেও ছুটি নেয়। আমার ভাইরা ফেরে না কেন?"

রানীমা তখন চোখের জলে ভেসে মেয়েকে বললেন পরীরানীর কথা। নিজের দোষেই এতবড় ক্ষতি ডেকে এনেছেন, রানীমার কান্না আর থামে না। উষসী মায়ের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, তারপর মার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—"মাগো, তুমি আর কেঁদো না, আমি যাচ্ছি ভাইদের খুঁজতে। একটুও ভাবনা কোর না, আমি তাদের উদ্ধার করে আনবই। দেখো, পরীরানী আমার সহায় হবেন।"

উষসীর তুলনা হয় না। যেমন তার সুবুদ্ধি, তেমনি তার সুসাহস। উষসী যায়, যায়, যায়। ঘন বন ঝামরে পড়েছে। এক ক্রোশ যায়, দু'ক্রোশ যায়, সন্ধ্যে হয় হয়, যখন দশ ক্রোশ গেছে, উষসী দেখলো বনের মধ্যে একটা মখমল সবুজ উঠোন, তার মধ্যে কী সুন্দর একটি কুটির। ঠিক পাশ দিয়ে ঝিরঝিরে একটা ঝর্ণা-নদী বয়ে যাচ্ছে। যেন পটে আঁকা ছবি। উষসীর পা ব্যথা করছে, তার খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে, কত পথ যে হেঁটেছে তার হিসেব নেই। ঝর্ণার জলে হাতমুখ ধুয়ে, আঁজলা ভরে জল খেয়ে, ছায়ায় বসে একটু জুড়োলো। কুটির থেকে কেউ বেরুচ্ছে না দেখে শেষে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

ভেতরে ঢুকেই অতসীর চক্ষু চড়কগাছ! মেঝেয় দুধ-ধবধবে বারোটা বিছানা পাতা আছে। বারোটা পিঁড়ি পেতে তার সামনে বারোটা থালা-গেলাস-বাটি সাজানো রয়েছে। কেউ যেন এসে খেতে বসবে। খেয়ে উঠে ঘুমোতে যাবে। বারোটা গামছা শুকোচ্ছে দড়িতে। দরজার ধারে বারো জোড়া নাগরাজুতো। ঠিক যেমন উষসীর বাবা পায়ে দ্যান।

উষসী ঘুরে ঘুরে দ্যাখে কলসীতে মিষ্টি জল, কড়াতে দুধের ক্ষীর, ঝুড়িতে পাকা ফল। সুগন্ধে ঘর ম'-ম' করছে। উষসীর ক্ষিধে পেয়েছিল। পেট ভরে আম, কলা, ক্ষীর খেয়ে, ভাবছে একটু শুয়ে নেবে, অমনি ঝড়ের মতন শব্দ করে কারা যেন এসে পড়লো। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো চোখ জুড়োনো বারোটি রাজপুত্তুর। উষসীকে দেখেই তারা হায় হায় করে উঠলো।

—"ও হো হো, কি সর্বনাশ!" বলে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লো।

উষসী বললে—"কেন, কেন? এতে অত হাহাকারের কী আছে? কী এমন সর্বনাশ করেছি আমি তোমাদের? একটু খাবার খেয়ে ফেলেছি কেবল! এই তো?"

ছেলেরা হৈ হৈ করে বলে উঠলো—"আরে না, না, সেজন্যে নয়। তুমি কিনা মেয়ে? তাই।"

উষসীর আরো রাগ হয়ে গেল।

—"বা রে? মেয়ে তো কী হয়েছে?"

—"একজন মেয়ের জন্যেই যে আমাদের এই দুর্দশা। বারো বছর হলো এক পরীর শাপে আমরা বুনো হাঁস হয়ে আছি। সারাদিন জলে জলে, খালেবিলে চরে বেড়াই, পোকামাকড়, মাছটাছ ধরে খাই। রাত্তিরে বাড়ি এসে মানুষ হয়ে মানুষের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন উঠে, আবার হাঁস!"

উষসী বললে—"কেন ভাই তোমাদের এই অবস্থা?"

—"আমাদের মায়ের একটা অন্যমনস্ক কথার জন্যে আজ আমাদের এই কষ্ট। আমরা তাই ঠিক করেছি এই ঘরে প্রথম যে মেয়ে পা দেবে, তাকে আমরা কেটে কুচিকুচি করবো।"

শুনে উষসী একটুও ভয় না পেয়ে খুশিতে উথলে উঠে বললে—"দাদাভাই, দাদাভাই, আমিই তোমাদের সেই অপয়া বোনটি, যার জন্যে তোমাদের এই দুরবস্থা। আমাকে তোমরা কাটবে কেমন করে? তোমাদের হারিয়ে বাবা-মা কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁদের মুখে আমি কোনোদিন হাসি দেখিনি। তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই আমি এই গহন বনে এসেছি। চলো আমার সঙ্গে।"

এবার ভাইদের কাঁদবার পালা। তারা বোনকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললে—"বোনটি, এত বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা রাখার চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই ভালো।"

বলামাত্রই পরীরানী সেখানে উপস্থিত। তিনিই ওদের ফলমূল জুটিয়ে দিতেন, দুধের ক্ষীর বানিয়ে দিতেন, নিজেই যখন ভার নিয়েছেন, দেখাশুনো না করে উপায় কী? এখন এরা এত মন্দ কথা বলছে, উড়ে না এসে উপায় আছে? কেউ কোনো মন্দ ইচ্ছে প্রকাশ করলেই তিনি ঠিক শুনতে পেয়ে যান। আবার বুড়ি ঠান্‌দি সেজে লাঠি ঠুকঠুক করে হাজির হয়ে পরীরানী বললেন—"বালাই ষাট! ও আবার কেমন কথা? ছিঃ। মরবে কেন? কক্ষণো না। অমন বিতিকিচ্ছিরি পণ করাটাই তো অন্যায় হয়েছে। শুধু শুধু একটা নির্দোষ মেয়েকে তোমরা মারবে বলে ঠিক করেছিলে কেন? রাগের মাথায় যদিও বা ভেবে থাকো, ঠাণ্ডা মাথায় এখন সে শপথ ভেঙে ফ্যালো। অমন হিংস্র শপথ রাখতে নেই।"

শুনে ভাইরা খুশি হয়ে বোনকে আদর করতে লাগলো। উষসী বললে, "চলো, তবে এবার তোমরা বাড়ি চলো?"—ভাইদের মুখ মলিন হয়ে গেল।

—"বাড়ি কেমন করে যাই বোন? দিনের বেলায় যে আমরা বুনো হাঁস হয়ে উড়ে যাই?"

উষসী শুনে বললে—"সে কি? এই অন্যায় অভিশাপ কাটানোর কোনো মন্তর নেই?"

ঠান্‌দিদি পরীরানী তখন বললেন, "থাকবে না কেন? আছে। কিন্তু সে বড় কঠোর ব্রত। পারবে তুমি সেই ব্রত পালন করতে? তোমার ভাইদের উদ্ধার করতে কেবল তুমিই পারো।"

উষসী বললে—"কত কঠোর? যতই কঠিন হোক, আমি পারবো। আমি সেই ব্রত পালনে রাজী। আমার ভাইদের আমি মানুষ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চাই। তাতে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।"

—"বেশ, তবে শোনো এই মহাব্রতের নিয়ম। জলা-জংলায় যে পাটবন হয়, সেই বুনো পাটগাছ তুলে এনে, তার ছাল ছাড়িয়ে, তা থেকে আঁশ বের করে, তাই থেকে সুতো কেটে, সেই সুতো দিয়ে বারোটা গেঞ্জী বুনে দিতে হবে বারোজন ভাইয়ের

জন্যে। তাহলে তাদেরও আর কোনো শাপমন্যি লাগবে না, তোমারও না। কিন্তু এই কাজ যখন করবে তখন তোমাকে চরম সংযমের ব্রত নিতে হবে। একটিও কথা কওয়া চলবে না, হাসা চলবে না, কান্নাকাটিও করা চলবে না। কারুর সঙ্গে কথা না বলে, না হেসে, না কেঁদে, একটানা পাঁচ পাঁচটা বছর তোমাকে কেবল এই কাজটি করে যেতে হবে। পাঁচ বছর পরে গেঞ্জী বোনা শেষ হয়ে যাবে। ভাইদের সেগুলো দিয়ে দিলেই ওদের শাপ মোচন হয়ে যাবে। কিন্তু এত কঠিন কাজ তুমি কচি মেয়ে কি পেরে উঠবে?"

উষসী বললে, "আমি মোটেই কচি মেয়ে নই। আমাকে দেখতে কচি-কচি হলে কি হবে? আমি এই ব্রত নিশ্চয় পালন করতে পারবো।"

—"বেশ, তবে তোমার কথাবার্তা, হাসিকান্না সব বন্ধ এখন পুরো পাঁচ বছরের মতন। কেবল খাবে, ঘুমোবে আর বুনবে।"

—"আর রান্নাবান্না? অন্য অন্য কাজ? ভাইরা তো দিনের বেলা থাকে না।"

—"ততদিন ভাইরাই তোমাকে খাওয়াবে পরাবে যত্ন করবে। কিন্তু যদি ব্রতভঙ্গ করো, হেসে ফ্যালো, কেঁদে ফ্যালো, কিংবা কথা কয়ে ফ্যালো, তাহলে কিন্তু জীবনে কোনোদিনও তোমার ভাইরা আর মানুষ হবে না, ঐ বুনো হাঁস হয়েই বনে-বাদাড়ে উড়ে বেড়াবে। খুব শক্ত ব্রত কিন্তু! পারবে তো?"

উষসী বললে—"নিশ্চয়ই পারবো। পারতে হবে বৈকি। আমার ভাইদের না নিয়ে আমি বাড়ি ফিরবোই না! বলে এসেছি মাকে।"

শুনে খুশি হয়ে বারো ভাই বললে, "বোনটি, কুছ পরোয়া নেই—আমরাই তোমার সঙ্গে কথা বলবো। আমরা তোমাকে গান শোনাবো, তোমার যাতে মন ভালো থাকে। ভালো ভালো রেঁধে খাওয়াবো, বনজঙ্গলের গল্প শোনাবো, বারো বছরের কত গল্প জমে আছে, পাঁচ বছরে ফুরোবেই না। তোমাকে কোনো কথা বলতে হবে না।"

পরীরানী বললেন—"কিন্তু বাছারা, হাসির গল্পও বলা চলবে না, দুঃখের গল্পও বলা চলবে না, হেসে ফেললেও ব্রতভঙ্গ, কেঁদে ফেললেও ব্রতভঙ্গ। আর এমন কোনো প্রশ্নও কোর না, যাতে ওকে কথা বলে উত্তর দিতে হয়। ঘাড় নাড়লে, ঠিক আছে।"

বারো ভাই একসঙ্গে বলে উঠলো—"তাই হবে ঠান্‌দিদি!"

উষসীও বললে—"আশীর্বাদ করো ঠান্‌দিদি যেন ব্রত রাখতে পারি।"

শুনে ফোকলা হেসে পরীরানী বললেন, "আশীর্বাদে তো হবে না বাছা, তোমার চেষ্টাতেই হবে যা হবার।" বলেই উধাও হয়ে গেলেন।

উষসী তো বেরুলো জলা খুঁজতে। বারো ভাই বুনো হাঁস, তারা জলা-জংলা চেনে। আগে আগে উড়তে উড়তে বোনকে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে সেই বিলের কাছে যেখানে অজস্র পাটক্ষেত আপনি হয়ে রয়েছে। না, ক্ষেত ঠিক নয়, জংলা পাটবন। উষসী যত্ন করে পাটগাছের ছাল ছাড়িয়ে তার আঁশ ছাড়িয়ে সুতো বুনতে লাগলো। পরীরানী জাদুবলে তাকে সবই শিখিয়ে দিলেন মনে মনে। সুতোর গুলি পাকাতে পাকাতেই তো দু'বছর কেটে গেল। তারপর শুরু হলো গেঞ্জী বোনা। বছরে চারটে করে গেঞ্জী বুনতে পারছে উষসী। চার বছর যখন শেষ, তখন আটটা গেঞ্জী বোনা হয়েছে। আরও একবছর বাকি, বাকি চারটে গেঞ্জী তার মধ্যে নিশ্চয় বুনে ফেলতে পারবে।

সারাদিন ভাইরা বুনো হাঁস হয়ে বনে উড়ে যায়, উষসী একা একা বসে গেঞ্জী বোনে। একদিন এক রাজকুমার বনের মধ্যে মৃগয়া করতে এসে পথ হারিয়ে উষসীর বাড়িতে হাজির। রাজকুমার যে কথাই জিজ্ঞেস করেন, বেচারী উষসী উত্তর দেয় না, চোখ দিয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করে। তাই দেখে রাজকুমারের প্রাণে খুব মায়া জাগলো, তাঁর মনে হলো এই করুণ চেহারার সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয় বোবা। দেখামাত্রই রাজকুমার উষসীকে ভালোবেসে ফেললেন। উষসী যদিও কথা বলে না, রাজকুমার তাকে নিজের কথা বললেন। তিনি উত্তর দেশের রাজার ছেলে, তাঁর উষসীকে রানী করতে ইচ্ছে হয়েছে। উষসী কি যাবে তাঁর সঙ্গে, তাঁর সাদা পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে, উত্তর দেশে?

উষসীর তখনও চারটে জামা বোনা বাকি—সে কী করে? কথা বলা চলবে না, হাসিকান্নাও বন্ধ। উষসী ঘাড় নেড়ে বললে—না। রাজকুমার ফিরে গেলেন।

কিন্তু পরদিন দুপুরে আবার এল পক্ষিরাজ—রাজকুমার এসে আবার অনেক মিনতি করলেন উষসীকে। উষসী তার সুতোর গুলি আর জামাগুলো দেখালো—আরও চারটে বাকী বোঝানোর চেষ্টা করলো আঙুলে।

রাজকুমার কী বুঝলেন কে জানে, তিনি হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে উষসীর হাত দুটি ধরলেন। উষসীরও রাজকুমারকে খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু ব্রত আছে যে? সে ঝুড়ি ভরে তার সুতো, আর আটটা তৈরি জামা নিয়ে, রাজপুত্তুরের হাত ধরে পক্ষিরাজে উঠে বসলো। মনে মনে জানে যে, তার ভাইরা ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে। নইলে ঠান্‌দিদি পরীরানী তো জানতেই পারবেন। তিনি তো সবই দেখতে পান।

উত্তর দেশের রাজকুমারের এক সৎমা ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল নিজের প্রিয় ভাইঝির সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে দেন। এদিকে রাজকুমার নিজে নিজেই বিয়ে করে নিয়ে এলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যেকে। বনের মেয়ে, কথা বলে না, নাম বলতে পারে না, ঠিকানা বলতে পারে না, হাসে না, কাঁদে না। এসেই প্রথমদিন পায়ে কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি। ছুরি দিয়ে রাজবদ্যি সেই কাঁটা বের করে দিলেন। তাতেও চোখে একবিন্দু জল পড়লো না।

বিয়ের উৎসব হলো খুব ঘটা করে। রাজা তো ছেলেকে খুব ভালোবাসেন? কতরকমের মজার কাণ্ড-কারখানা করলো রাজসভার বিদূষক আর সঙেরা। সব লোকের হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গেল। আর নতুন বউ? ঠিক যেমন দুর্গাপ্রতিমার মতন শান্ত মুখ, তেমনিই রইলো। এ কখনও স্বাভাবিক হতে পারে? রানীমার দু'চক্ষের বিষ উষসী। কবে যে তাকে দূর করে নিজের ভাইঝিকে আনবেন, তাঁর কেবল মাথায় সেই চিন্তা।

যুবরানী হয়েছো, কোথায় আনন্দ করবে তা নয়, দিনরাত্তির মাথা গুঁজে কী সব বিশ্রী পাটের সুতোর গেঞ্জী বুনছে। এক ঝুড়ি গেঞ্জী পাশে নিয়ে বসে আছে সবসময়। কী দেখে যে এমন পাগলীকে মনে ধরলো রাজকুমারের? মাঝে মাঝে রানীমার ইচ্ছে হয় ঐ গেঞ্জীর ঝুড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে। কিন্তু উপায় কী? যুবরানীর পাশে সবসময়ে আছে একশো সখী। যুবরানী তাদের সঙ্গে কথাও বলে না, হাসিঠাট্টাও করে না। তবু তারা ওকে যত্ন করে।

এমন সময়ে উষসীর বাচ্চা হবার সময় হলো। আঁতুড়ঘরে কেবল আছেন রানীমা আর ধাইমাবুড়ি। উষসীর চমৎকার একটি মেয়ে হলো। রানীমা বললেন ধাইমাকে, "তুমি যাও বাছা, একটু হাতমুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে এসো। অনেক তো পরিশ্রম করেছো? আমি ততক্ষণ বাচ্চার কাছে আছি।" ধাইমা যেই বাইরে গেছেন, রানীমা অমনি বাচ্চাটাকে নিয়ে জানলার ধারে গেলেন ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেবেন বলে। গিয়ে দেখেন, চমৎকার! একটা নেকড়ে বাঘ! বাগানে এসে, জিব চাটতে চাটতে ঠিক এদিক পানেই তাকাচ্ছে! রানীমা "হুশ্! যাঃ" বলে বাচ্চাটাকে নিচে ফেলে দিলেন, আর নেকড়ে বাঘ তাকে মুখে করে লুফে নিয়ে চলে গেল। রানী তখন নিজের আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বের করে ঘুমন্ত উষসীর ঠোঁটে মুখে বেশ করে মাখিয়ে দিলেন। তারপর কেঁদেকেটে বুক চাপড়ে হাহাকার করতে করতে রাজাকে ডেকে আনলেন—"দ্যাখো তোমার ছেলের বউ রাক্ষুসী। নিজের বাচ্চা নিজে খেয়ে ঘুমিয়ে আছে।" ঘুমন্ত উষসীর ক্লান্ত, মিষ্টি, সরল, স্বর্গীয় মুখটি দেখে রাজার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না যে এই কচি মেয়েটা রাক্ষুসী। কিন্তু ব্যাপার তো বোঝা গেল না? বিচার চাই। এদিকে রাজকুমার দেশে নেই। মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন পূর্ব দেশে। রাজকুমার না ফিরে এলে তাঁর বউকে শাস্তি দেওয়াটা ঠিক হবে না। রাজা বললেন, "যুবরাজ ফিরে এলে, বিচারসভা বসবে। ততদিন ওকে কিছু জানতে দিও না।"

উষসী ঘুম ভেঙে দ্যাখে বাচ্চা নেই। কিন্তু কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারছে না, ওর তো কথা কইতে বারণ! শেষ গেঞ্জীটা বোনা চলছে এখন। বারো নম্বরের গেঞ্জী। প্রায় শেষ। কেবল হাতা দুটো বাকি। উষসী প্রাণপণে হাতা বুনছে—বাচ্চার জন্যে মন অস্থির। প্রাণে কান্না। কিন্তু চোখ শুকনো। ব্রতভঙ্গ করলে চলবে না। বারোজন ভাইয়ের জীবন নির্ভর করছে তার ওপরে। একটা হাতা শেষ হতে যুবরাজ ফিরে এলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, তাঁর সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছিলো উষসীর মতনই দেখতে। কিন্তু উষসী রাক্ষুসী। সে তাকে লুকিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে গেঞ্জী বুনে চলেছে। যদি ও নিজেই বাচ্চাকে না খেতো, তাহলে কি এমন ধীরস্থির থাকতো? বাচ্চাকে খুঁজতো, কান্নাকাটি করতো। কিন্তু যুবরানী যেমনকে তেমনি। যেন পাথর প্রতিমাটি। মুখে টুঁ শব্দটি নেই। চোখে একফোঁটা জল নেই। এ মেয়ে রাক্ষুসী না হয়েই যায় না।

ঘরদোর জানা নেই, নামধাম জানা নেই, অমন বন থেকে কুড়োনো মেয়েদের কখনো ঘরের বউ করে আনতে নেই। রূপকথায় কে না পড়েছে, যে তারা সব রাক্ষুসী হয়? তারপর ঘোড়াশালের ঘোড়া খায়, হাতিশালের হাতি খায়। এও সময় পেলে সে সবই করবে। খিদে পেলে রাজপুত্তুরকেই হয়তো খেয়ে ফেলবে। কে জানে? এসব কথা শুনে রাজকুমারের মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। তিনি উষসীকে জিজ্ঞেস করলেন—"যা শুনছি এসব কি সত্যি?"

উষসী ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—"না।"

—"তুমি কি বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলেছ?"

উষসী এমন অদ্ভুত কথার কী উত্তর দেবে? রাগে দুঃখে লজ্জায় ঘেন্নায় সে কোনও উত্তরই দিল না। নিজের মেয়ে হারিয়ে তার মনে একে কষ্টের শেষ নেই, আবার তাকেই কিনা বলছে, "খেয়ে ফেলেছ?" ভীষণ রেগে উষসী চুপ করে বুনে যেতে থাকলো।

—"তোমাকে তাহলে ফাঁসি দেওয়া হবে"—বললেন সৎমা, আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে। উষসী চুপ করে বুনেই চললো। শেষ হাতাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

তারপর সেপাই-সান্ত্রীরা তো পাল্কী করে উষসীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে এল। উষসী নামলো গেঞ্জীর ঝুড়ি নিয়ে। যুবরাজের দু'চোখে জল বাধা মানছে না। তিনি উষসীর দু'হাত ধরে বললেন—"মাথা নেড়ে শুধু একবারটি বলে দাও, তুমি নির্দোষ, তুমি কক্ষণো আমাদের বাচ্চাটাকে খেয়ে ফ্যালোনি। আমি জানি তুমি এমন কাজ করতেই পারো না।"

রাজকুমারের কথায় এবার উষসীর চোখের জল ঝরে পড়লো। উষসী কথা বলে উঠলো—"না যুবরাজ—এমন নিষ্ঠুর অভিযোগকে উত্তর দেবার যোগ্য কথা বলে আমি মনে করি না। আমার হারানো মেয়ের জন্যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে—আর তোমরা আমাকেই—"

এমন সময়ে ঝড়ের মতন শব্দ করে একদল রংচঙে বুনো হাঁস উড়ে এসে উষসীকে ঘিরে ধরলো। আর অমনি একমুখ হেসে, উষসী ঝুড়ি থেকে গেঞ্জী নিয়ে একটা একটা করে হাঁসেদের গায়ে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা অপরূপ রূপবান এক একজন রাজপুত্র হয়ে যেতে লাগলো। প্রত্যেকের হাতে রোদে ঝকঝক করছে খোলা তলোয়ার। ফাঁসি দেখবে বলে যারা এসেছিল, তাদের চক্ষু চড়কগাছ।

—"উষসী আমাদের একমাত্র বোন। আমরা দক্ষিণ দেশের রাজপুত্র। উষসী রাজকন্যা। ওকে ফাঁসি দেবার আগে তোমরা এসো, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো।" ঝন্ঝনাৎ করে ভয়ংকর শব্দে বেজে উঠলো বারোটা ইস্পাতের তলোয়ার! যুবরাজ এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বললেন—

—"তলোয়ার বন্ধ করো ভাই, আমরা পরস্পরের কুটুম—এসো এসো, তোমাদের আতিথ্য পাওনা আছে আমাদের ঘরে। উষসী আমার অতি আদরের বউ, আমি ওকে কক্ষণো ফাঁসি দিতে দিতুম না।"

—"কিন্তু তার আগে আমি বিচার চাই যুবরাজ," উষসী

বললো,—“কে আমার বাচ্চা চুরি করেছে? আজ তাকেই শাস্তি দেওয়া উচিত।”

উষসীর মিষ্টি গলায় স্পষ্ট কথা শুনে তো সভা মুগ্ধ—রাজবাড়িতে সবার মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেছে। সবচেয়ে খুশি যুবরাজ নিজে। “কিন্তু এতদিন তুমি কথা কওনি কেন কন্যে?”

—“আমার নাম উষসী!”

তখন ভাইরা যুবরাজকে সব কথা জানালো। কত কঠোর সংযমব্রত পালন করে, কত কঠিন সাধনার পরে উষসী তার বারোজন ভাইকে মনুষ্যজীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। কথা বলাই শুধু নয়, হাসি-কান্নাও তার বারণ ছিল। চরম অন্যায় অভিযোগেরও উত্তর দিতে পারেনি, সন্তানশোকেও চোখের জল ফেলতে পারেনি। একবার ভুল করলেই বারোজন ভাইকে জন্মের শোধ হারিয়ে ফেলতে হতো। এমন অসামান্য সংযম কেবল মুনিঋষিদেরই থাকে! এরই নাম তপস্যা!

উষসীর কঠোর ব্রতের কথা জেনে তো সভাসুদ্ধু মানুষ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে থ! মহারাজ কেবল বারবার রানীমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, একটু অদ্ভুত চোখে। তাঁর মনে কী একটা সন্দেহ হচ্ছিলো।

ঠিক এমন সময়ে সভার মধ্যে একটা নেকড়ে বাঘ এসে হাজির হলো। অতি আজব দৃশ্য—নেকড়ে বাঘের মুখ থেকে একটা ছোট্ট বেতের দোলনা দুলছে। সেই দোলনায় শুয়ে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে উষসীর মেয়ে। এদিকে নেকড়ে বাঘকে দেখেই তো সৎমা ভয়ে সিঁটিয়ে গেছেন।

নেকড়ে দোলনাটা নামিয়ে রেখে, সৎমার ঘাড়টা কামড়ে ধরে, এক লাফে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ থেকে।

কী হলো? কী হলো? চমক কাটতে না কাটতেই ঠানদিদি বুড়ি সেজে পরীরানী এসে হাজির। তিনি বললেন নেকড়ে বাঘ হয়ে তিনিই সেদিন বাচ্চাটা নিয়ে গেছলেন, নইলে বাগানে আছড়ে ফেলে ওকে তক্ষুণি মেরেই ফেলতেন দুষ্টুবুদ্ধি রানীমা। রানীমার জন্যে তখন আর কারুর দুঃখু হলো না। কিন্তু পরীরানী তো আর সত্যি সত্যি নেকড়ে বাঘ নন? তিনি দুষ্টু সৎমাকে খাননি। কেবল বহুদূর মরুভূমির প্রান্তে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। কিছুদিন একটু তিনি কষ্ট করুন, তারপর স্বভাব শুধরে যাবে। তখন তিনি ফিরে আসবেন বাড়িতে।

উষসী এইভাবে খুদে রাজকুমারীকে কোলে করে আর বড় বড় বারোজন রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার সমেত, যুবরাজের সঙ্গে সাদা পক্ষিরাজে চড়ে দক্ষিণ দেশে ফিরে চললো। মা-বাবার কাছে বুঝি ভাইদের পৌঁছে দিতে হবে না? তাঁরা তো পাঁচ পাঁচটা বছর তারই আশায় আশায় দিন গুনছেন। কবে তাঁদের উষসী ফিরবে, তাঁদের হারানিধি নিয়ে।

আমার কথা ফুরিয়ে গেল,
বুনো হাঁসরাও উড়িয়ে গেল—
যাঃ—

(* একটি আইরিশ উপকথার ছায়া অনুসরণে)

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ভূতের ঝগড়া

রবিদাস সাহারায়

কন্ধকাটার সাথে হলো শাঁকচুন্নীর ঝগড়া জোর,
রাত দুপুরে ঝগড়া শুরু, শেষ না হতেই রাত্রি ভোর।
ঐ দু'জনের বিয়ে হবে শনিবারের বারবেলায়,
বলল ঘটক, কম হবে না ঘটা মোটে তার বেলায়।
কন্ধকাটা গোঁ ধরেছে হাজার গণ্ডা কড়ি চাই,
শাঁকচুন্নী হাঁকছে তখন সোনা তিরিশ ভরি তাই।
খাওয়া দাওয়ার বিষম ঘটা, পেল্লায় সে আয়োজন,
ইঁদুর ভাজা একশো খানা আজই আনা প্রয়োজন।
কাঁকড়া বড়া ষাট গণ্ডা আনতে হবে কালকে,
শালিক পাখির শিক কাবাব পাওয়া যাবে শালকে।
চিংড়িহাটায় চিংড়ি কুচো মিলবে দামে সস্তা,
পোস্তা থেকে পোস্ত দানা আসবে উনিশ বস্তা।
কোমর বেঁধে যোগাড় করার ফন্দি আঁটে ভূতের দল,
এমন সময় বর ও কনের বেঁধে গেল কী কোন্দল!
কী কারণে শাঁকচুন্নীর বিগড়ে গেল মুণ্ডটাই,
বলল, বিয়ে করবো নাকো, কন্ধকাটার মুণ্ড নাই।
বুকের মধ্যে চোখ দুটো যে দেখতে কেমন বিচ্ছিরি,
সবাই বলে, শাঁকচুন্নী, তোমারই বা কী ছিরি!
চেঁচায় সবাই, কেউ থামে না, ঝগড়া ভূতের লাগে জোর,
এদিকেতে হয়ে গেল ফরসা আকাশ—রাত যে ভোর।
পালায় যে যার আস্তানাতে, থাকার কারুর উপায় নাই,
ভূতের কাণ্ড লণ্ডভণ্ড—ভুতুড়ে সব ব্যাপারটাই।

সব পেয়েছির পাওয়া

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

তখন সবে ভোর
শিউলি ঝরেছে খুব,
বাতাসে ভাসছে হিম
চারিদিক যেন চুপ...

গুরু গুরু শুনি ডাক
ঢাকীরা বাজায় ঢাক,
শিউলি বিছানো ভোরে
বাজে শারদীয়া শাঁখ।

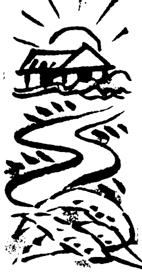

সারারাত চাঁদ বুড়ি
রেশমি সুতোর রাশ,
চরকায় কেটে কেটে
ফুটিয়েছে দুধ কাশ।

আলো ঝলমল প্রাতে
যেই চোখ মেলে চাওয়া—
দুর্গা মায়ের মুখে
সব পেয়েছির পাওয়া!!

ছবিঃ সুফি

দুষ্টু পুতুল

সমরেশ মজুমদার

ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল।

লেকের ধারে যে বারোতলা বাড়িটা আকাশ ছুঁয়েছে তার আটতলায় থাকেন সৌরভ চ্যাটার্জি তাঁর স্ত্রী এবং একটি পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে। সৌরভ খুব বড় চাকরি করেন। পয়সার কোনো অভাব নেই। ওঁদের মেয়ে টুম্পা কেজি ক্লাশে পড়ছে। এর মধ্যে দিশি-বিদেশি ছড়া বলতে পারে চটপট, ছবি আঁকার হাত খুব ভাল। কিন্তু পুতুল খেলার শখ খুব। টুম্পার শোওয়ার ঘরে অন্তত শ'দেড়েক পুতুল রয়েছে। যখনই সৌরভ বিদেশে যান, মেয়ের জন্যে একটা না একটা নতুন পুতুল নিয়ে আসেন। সেগুলো দেখতে এমন জীবন্ত যে মনে হয় টুম্পা তার অনেক বন্ধুর সঙ্গে মিশে রয়েছে। তিনদিন আগে মিসেস চ্যাটার্জি টুম্পাকে নিয়ে বিকেলবেলায় লেকের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওঁরা যখন লিলি পুলের ধারে তখন একজন ফেরিওয়ালা কাছে এল। তার ঝুড়ি ভর্তি নানান সাইজের পুতুল। কিন্তু সেগুলো মোটেই ছিমছাম নয় বলে মিসেস চ্যাটার্জি কিনতে রাজী হলেন না। ওদের চেয়ে অনেক ভাল পুতুল টুম্পার ঘরে রয়েছে। ফেরিওয়ালা মাটিতে ঝুড়ি নামিয়ে খুব অনুনয় করছিল। সারাদিনে তার একটিও পুতুল বিক্রি হয়নি। মিসেস চ্যাটার্জি মাথা নেড়ে না বলছিলেন। টুম্পা পুতুলগুলোকে দেখছিল। মুখ-চোখ জামাকাপড় মোটেই ভাল নয়। হঠাৎ একটু পুতুলের দিকে তাকাতেই মনে হলো সেটা ফিক্ করে হেসে উঠল। টুম্পা অবাক হয়ে আবার তাকাল। এবার কিন্তু পুতুলের মুখে সেই হাসি নেই। কিন্তু চোখ দুটো পিটপিট করে উঠল যেন! টুম্পা হাত বাড়িয়ে পুতুলের কোমর ধরে তার কাছে নিয়ে যেতেই ফেরিওয়ালা বলল, 'বাঃ, খুকীর তো পছন্দ আছে। এই পুতুলটা আমি বানাইনি। একজন সাহেবের পুরনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছিল। সেই বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

মিসেস চ্যাটার্জির ইচ্ছে ছিল না কিন্তু মেয়ের পছন্দ হয়েছে দেখে কিনে নিলেন। ফেরার পথে টুম্পা পুতুলটাকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল। লিফটে আটতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে টুম্পা পুতুলটাকে একটু দূর থেকেই টেবিলে রাখল যেখানে তার অন্য পুতুলেরা রয়েছে। টেবিলে পড়ামাত্র যে শব্দ হলো তার পাশাপাশি টুম্পা স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ 'উঃ' বলল। কে বলল? এই ঘরে আর কোনো মানুষ নেই। এখানে তার যেসব পুতুল আছে তার অনেকেই ব্যাটারির কল্যাণে হাসতে পারে, কাঁদতে পারে, চোখ মটকাতে পারে, কেউ কেউ সামান্য হাঁটতেও পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা পুতুলটাকে সে নিজের বালিশের পাশে রেখেছে। রাত্রে ঘুমানোর আগে সেই পুতুলের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ রাত্রেও বাবা-মাকে গুডনাইট বলে এসে বিছানায় উঠে পড়ল টুম্পা। তার পাশে যে পুতুলটা রয়েছে তার চুল রেশমের মতো। সে ফিসফিস করে বলল, 'জানিস রেশমি, আজ আর একজন এসেছে এ ঘরে।'

ব্যাটারি চালালে রেশমি কাঁদতে পারে শুধু, তাই কিছু বলল না। টুম্পা বেডসুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিতেই শুনল খুব মিষ্টি গলায় কেউ বলে উঠল, 'তুমি খুব নিষ্ঠুর।'

কে বলল কথাটা? টুম্পা ঝট করে আলো জ্বালল। ঘরে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?

কে কথা বললে?'

এবার স্পষ্ট শুনতে পেল, 'আমি।'

তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে টেবিলের পাশে ছুটে যেতেই দেখতে পেল নতুন কেনা পুতুলটার ঠোঁটে হাসি।

সে অবাক হয়ে বলল, 'পুতুল হয়ে কথা বলছ কি করে!'

'আর কেউ না পারুক আমি পারি। আমি তোমার পাশে শোব।'

টুম্পা এমন অবাক হয়ে গেল যে কিছু ভাবতে না পেয়ে দরজা খুলে দৌড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল, 'মা, মা, বাবা, বাবা।'

ওঁরা টিভি দেখছিলেন। চিৎকার শুনে উঠে দাঁড়াতেই টুম্পা ওই ঘরে ঢুকে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'জানো জানো ওই পুতুলটা কথা বলছে।'

অবাক হয়ে মা বললেন, 'কোন পুতুলটা?'

'ওই যে গো, আজ যেটা কিনলে!'

মা সস্নেহে ধমক দিলেন, 'দূর! পুতুল আবার কথা বলে নাকি?'

'হ্যাঁ মা। বলছে আমার সঙ্গে শোবে।'

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ঠিক শুনেছ মা?'

'হ্যাঁ বাবা। শব্দ করে হাসল পর্যন্ত।'

বাবা বললেন, 'চল তো, দেখি!'

টুম্পার সঙ্গে ওঁরা ওর ঘরে এলেন। টেবিলের ওপর রাখা পুতুলটাকে টুম্পার মা চিনতে পারলেন, 'কই? পুতুল কথা বলুক!'

পুতুল পুতুলের মতো রইল। টুম্পা বলল, 'এ্যাই পুতুল, কথা বল।'

পুতুল সাড়া দিল না। টুম্পা অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কথা বলা দূরে থাক একবার হাসলও না। বাবা বললেন, 'তুমি ভুল শুনেছ মা। এবার ঘুমিয়ে পড়।'

ওঁরা দরজা ভেজিয়ে চলে গেলে টুম্পা বিছানায় চলে এসে আলো নেভাতেই শুনতে পেল, 'ঘটা করে ওদের ডেকে আনা হলো কেন?'

উঠে বসল টুম্পা, 'তুমি, তুমি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব, আর কেউ থাকলে একেবারে স্পিকটি নট।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছে হয় না তাই। যাকগে, অনেকক্ষণ এই কাঠের ওপর পড়ে আছি, এবার দয়া করে কি বালিশে মাথা রাখতে দেবে?'

'কিন্তু রেশমি—!'

টেবিল থেকে স্বর ভেসে এল, 'এঃ, ওটা একটা পুতুল নাকি! কথা বলে আমার মতো?

এটা মানতে হলো। নতুন পুতুল বলল, 'তাছাড়া ও তোমার পাশে অনেক শুয়েছে।'

এটাও ঠিক। অগত্যা বিছানা থেকে নেমে নতুন পুতুলের কোমর ধরে বিছানায় নিয়ে এসে শুয়ে পড়ল টুম্পা। আলো নিভিয়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সে একটা ফিসফিসানি স্বর শুনতে পেল, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে।'

টুম্পার ঘুম পাচ্ছিল। সে জড়ানো গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তাহলে আমাকে বেড়াতে নিয়ে চল। আমি লেকের ধারে বেড়াতে যাব।'

টুম্পা বলল, 'আজ না।'

'না, আজই।'

'বলছি আজ না! তুমি তো খুব অবাধ্য পুতুল।'

'ইস্! তুমি যেন খুব বাধ্য! আমি যা বলছি তা শুনছ? চল বলছি।'

'যাব না। কিছুতেই যাব না। বেশি বললে এবার কান মুলে দেব।' বলতে বলতে টুম্পা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পেল পুতুলটা খাট থেকে নেমে তার সবচেয়ে সুন্দর জামাটা আলমারি থেকে বের করে পরে নিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

সকালে টুম্পার মা এসে যখন ডাকলেন টুম্পা তখনও ঘুমাচ্ছে। সে উঠে বসতে মা বললেন, 'তোর কি হয়েছে? মুখচোখ ওরকম কেন? দেখি, কপাল দেখি!' কপালে হাত ছুঁইয়েই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইস্! এ তো দেখছি জ্বর হয়েছে! বেশ জ্বর।'

তিনদিন ধরে টুম্পার জ্বর চলছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। রক্ত পরীক্ষার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জ্বর কিছুতেই কমছে না। আর এই তিনদিন ধরে যখনই টুম্পা ঘুমিয়ে পড়ছে তখনই পুতুলটা খিলখিল করে হাসছে, 'কেমন মজা? আমাকে অবাধ্য পুতুল বলা হয়েছিল না? বেশ শাস্তি, বেশ শাস্তি!'

ঘুমের ঘোরেই টুম্পা পাশে শোওয়া পুতুলটার একটা হাত ধরে ছুঁড়ে ফেলতে চাইল দূরে। পাশের জানলায় গিয়ে পুতুলটা আছড়ে পড়ে জানলা দিয়ে গলে গেল নিচে। হু হু করে পড়ে যেতে লাগল আটতলা থেকে। ঘুমের ঘোরে টুম্পা সেটা টেরও পেল না। তখন মাঝ রাত্তির।

টুম্পাদের বাড়ির নিচে রাস্তাটার একধারের ফুটপাতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকত কিছু গরীব মানুষ। দিনের বেলায় বাড়ি বাড়ি কাজ করে ওদের মেয়েরা, ছেলেরা কুলির কাজ করে অথবা ওইরকম কিছু! ফুটপাতেই ওদের সংসার। মশারি খাটিয়ে তার তলায় শুয়ে থাকে ওরা। এমনি দিনে তেমন অসুবিধে হয় না কিন্তু বৃষ্টি হলে বেচারাদের দুর্দশার সীমা নেই। টুম্পার আটতলার জানলা দিয়ে পুতুলটা যেখানে পড়ল সেখানে একটা বছর সাতের মেয়ে শুয়েছিল। পুতুলটা ফুটপাতে পড়ে ছিটকে চলে এল তার পাশে। মেয়েটার নাম কমলা, সবাই ডাকে কমলি বলে। এই সাত বছর বয়সেই মেয়েটা তার মায়ের সঙ্গে ভোর হতে না হতে কাজে বের হয়। মাকে বাসনমাজা কাপড় কাচায় সাহায্য করে। মায়ের হয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে দেয়। এর ফলে ওর মা আরও বেশি বাড়িতে ঠিকে কাজ করতে পারে, রোজগার বাড়ে। কমলার এসব করতে একটুও ইচ্ছে হয় না। যাওয়া-আসার পথে সে রোজ দেখতে পায় স্কুলের ইউনিফর্ম পরে বই-এর ব্যাগ নিয়ে তার বয়সী মেয়েরা বাবা-মায়ের সঙ্গে চলেছে। ওরা যদি স্কুলে পড়তে পারে, সে পারবে না কেন? এর মধ্যে কেউ তাকে শেখায়নি কিন্তু সে টাকা পয়সা গুনতে পারে, বিকেল

বেলায় মা যে বাড়িতে কাজ করে সেই বাড়ির দিদি তাকে নাম সই করতে শিখিয়ে দিয়েছে। কোনটা ক অথবা ম অথবা লা সে এখন জানে। কিন্তু তার বাইরে অন্য যেসব অক্ষর আছে যা না জানলে পড়ালেখা যাবে না তা তার অজানাই রয়ে গেছে। অথচ স্কুলে পড়তে গেলে মায়ের রোজগার কমে যাবে। না খেয়ে থাকতে হবে তখন। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে মাঝে মাঝে সে স্বপ্ন দ্যাখে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাচ্ছে।

আজ রাত্রেও সে যখন অমন স্বপ্ন দেখছিল ঠিক তখনই পুতুলটা ফুটপাতে আছাড় খেয়ে ঠিকরে এসে পড়ল তার পাশে। পড়ে বলল, 'উঃ।'

ঘুম ভেঙে গেল কমলার। মাঝরাত্রেও ফুটপাতে আলো থাকে। কিন্তু দিনের বেলার মতন নয়। ঘুমচোখে সে বলল, 'কে?'

'আমি! পা-টা বেঁকে গিয়েছে, ঠিক করে দাও তো।'

ধড়মড় করে উঠে বসল কমলা। দেখল অদ্ভুত সুন্দর একটা পুতুল তার পাশে শুয়ে আছে, যার দুটো পা উল্টোদিকে ঘুরে গেছে। সে পা দুটো টেনে ঠিকঠাক করে দিতেই পুতুলটা বলল, 'খুব ভাল মেয়ে।'

কমলা বলল, 'একি রে! পতুল আবার কথা বলে নাকি?'

পুতুল বলল, 'না বললে শুনতে পাচ্ছ কি করে? মুশকিল!'

কমলা বলল, 'কিসের মুশকিল?'

'এই ফুটপাতে শোব কি করে? চারধারে বিশ্রী গন্ধ!'

'তোমাকে এখানে আসতে কে বলেছে?'

'আমি কি সাধ করে এসেছি! ওই আটতলার মেয়েটা জ্বরের ঘোরে আমার ওপর রেগে গিয়ে ছুঁড়ে ফেল দিল। ভারি পাজি মেয়ে!'

ঠিক তখনই বৃষ্টি এল। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। যে যার বিছানাপত্র নিয়ে গাড়িবারান্দার নিচে বা ওইরকম আশ্রয় খুঁজল। কমলাও গেল। মায়ের চিৎকারে সে পুতুলটার কথা ভুলে গেল। বৃষ্টি থামল ভোরে। কাজে যাওয়ার আগে সে এসে দেখল পুতুলটা ভিজে ন্যাকড়া হয়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, পুতুলটার শরীর এত গরম কেন? সে শুনল পুতুলটা ককিয়ে উঠল, 'জলে ভিজে জ্বর এসেছে আমার। উঃ, ভগবান!'

খুব মায়া হলো কমলার। এই পুতুলকে সে যত্ন করতে পারবে না। সময় কোথায়, জায়গা কোথায়? সোজা আটতলায় উঠে বেল বাজাল সে। ভোরবেলায় জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল টুম্পার। বেল শুনে দরজা খুলল সে। কমলা বলল, 'এটা তোমার পুতুল? এর জ্বর হয়েছে!'

টুম্পা দেখল পুতুলের রঙ করা চোখমুখ জলে প্রায় ধুয়ে গেছে। সে বলল, 'তুমি ভেতরে এসো। আমি একা ওর জ্বর সারাতে পারব না।'

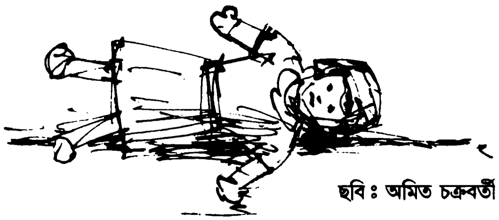

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

পেটে যখন ছুঁচোর ডন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

লেকপ্লেসের বাড়িতে পা রাখতে না রাখতেই হৈ হৈ করে ছুটে এল খুকু-মুনা,—জানো টুটানমামা, আজ না বাড়িতে কেউ নেই। আজ আমরা একদম একা।

শুনে একটু দমেই গেলাম। সেই কোন কল্যাণী থেকে অফিস সেরে ফিরছি, আর সে ফেরা কি সহজ ফেরা! অনেক কসরৎ করে ডাউন কৃষ্ণনগর লোকালে দেহটুকু গলিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র, তারপর আর নিজে থেকে নড়াচড়া করতে হয়নি। আশপাশের লোকজনই আমায় নড়িয়েছে, নাড়িয়েছেও বলা যায়। নাড়ানাড়ির দাপটে গুলগুল ঘাম বেরিয়ে শার্ট-প্যান্ট ভিজে প্যাচপ্যাচ, চুল পর্যন্ত সপ্‌সপ্‌। তারপর আবার ট্রেন থেকে নেমে শেয়ালদার জ্যাম! চল্লিশ মিনিট ঘামে জ্যামে মিশে সে এক মাখামাখি দশা, অনেকটা বনগাঁর কাঁচা সন্দেশের মতো। ওই অবস্থাতেই বাসে বসে টের পাচ্ছিলাম ঘামের ওপর জ্যাম পড়তেই পেটের ভেতর ডজন খানেক ছুঁচো ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। কোন সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি, মাঝে টিফিনে শুধু এক ঠোঙা মুড়ি-বাদাম, এখন প্রায় সন্ধ্যে সাতটা, ছুঁচোদের হাঁকডাক করার সময় হয়ে গেছে বৈকি। সোজা বাড়িই ফিরব ভেবেছিলাম, হঠাৎ মনে হলো অনেক দিন বড়পিসির খবর নেওয়া হয়নি, যাই একবার লেকপ্লেস ঘুরেই যাই। খবরও নেওয়া হবে, পেটটাও ঠাণ্ডা হবে। এতদিন পর যাচ্ছি, বড়পিসি কি আর ভাল জলখাবার না খাইয়ে ছাড়বেন! এখন দেখি সে গুড়ে বালি।

হতাশ মুখে সোফায় বসে পড়লাম,—তা বাড়ির সব গেল কোথায় রে?

খুকু লাফ দিয়ে বলল,—আমার মা আর দিম্মা তো একটু আগে পুজোর বাজার করতে গেল। গড়িয়াহাট। মামারা অবশ্য এসেছিল, সবাই যে যার বেরিয়ে গেছে। ইশ্‌, কতদিন পর আমরা যে একা!

মুনা বড়দের মতো কায়দা করে বসেছে সামনের সোফায়। অবিকল তার মার মতো চোখ নাচিয়ে বলল,—আর আমার মা তো জানই, অফিস ট্যুরে দুর্গাপুর গেছে, ফিরতে সেই কাল সন্ধ্যে।

ভাগ্নীদের মামার বাড়িতে ল্যান্ড করার কারণ বোঝা গেল। আরও হতাশ মুখে বলে ফেললাম,—ভালই হয়েছে। মাথা উদ্ধার করেছে সবাই।

শুনেই মুনা ঘাড় বেঁকিয়েছে,—কী যে তুমি বলো না টুটানমামা! মাথা কি শিশু, না রাজকন্যা যে কিডন্যাপড্‌ হয়ে যাবে? উদ্ধার করার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কলকল করে উঠেছে পুপসি। সেও যে তার দুই দিদির সঙ্গে একদম একা হয়ে বাড়িতেই রয়েছে খেয়ালই করিনি। সাত বছরের পুপসি গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে তর্ক জুড়ে দিল,—তুই কিচ্ছু জানিস্‌ না দিদিভাই। টুটানমামা ঠিকই বলেছে। মাথা তো হারিয়েই যায়। আর তখন তাকে উদ্ধার করতেই হয়। এই তো সেদিন আমি একটা পোয়েম কিছুতেই মুখস্থ করতে পারছিলাম না, বাবা খুব বকছে, ঠাম্মা বলল, পুপসির তো এমন হওয়ার কথা নয় রে খোকা! ওর এত মাথা, গেল কোথায়! আমিও ভেবে মরি। সত্যি তো, গেল কোথায় আমার মাথা! কিডন্যাপড্‌ হয়ে গেল!

—তোর মাথা! খুকু ভেংচে উঠল।

বুঝলাম, ত্র্যহস্পর্শ লেগেছে আজ। খুকু-মুনা-পুপসি, তিন বোন একত্র হওয়া মানেই রৈ রৈ কাণ্ড। তার ওপর তিন বোন যদি একা হয়ে যায় তাহলে না জানি আরও আরও কি কি

হয়ে যায়! মানে মানে এখন কেটে পড়াই ভাল।

উঠব উঠব করছি, এমন সময়ে খুকু যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো বলে উঠল,—তুমি তো অফিস থেকে আসছ টুটানমামা, নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—তা একটু পেয়েছে রে।

—আগে বলতে হয়। আগে বলতে হয়। মুনা ব্যস্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে,—দাঁড়াও, ফ্রিজ খুলে দেখি কি আছে।

মনে মনে আশা জাগল একটু। সোজা হয়ে বসেছি।

দৌড়ে ফিরে এল মুনা,—ইশ্, অনেকটা পায়েস ছিল। একটু আগে আমরাই খেয়ে ফেললাম।

তবে আর কি। ছোট্ট একটা নিশ্বাস গড়িয়ে এল বুক থেকে। বললাম,—থাক্। আমি নয় বাইরেই কিছু খেয়ে নেব।

শুনেই কোরাসে হাঁ হাঁ করে উঠেছে খুকু-মুনা,—সেকি কথা! সেকি কথা! আমরা তাহলে আছি কেন বাড়িতে? কি খাবে বলো, আমরা এক্ষুণি তৈরি করে দিচ্ছি।

—তোরা!

—হ্যাঁ, আমরা। আমাদের তুমি কি ভাব বলো তো? আমরা কি আর ছোট আছি? দু'জনেই এখন ক্লাস এইট।

তা বটে। ভাগ্নী দুটো আমার দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে। তবু যেন কেমন ধন্দ জাগে। পারবে কি? আমতা আমতা করে বলি,—থাক রে। তোরা একদিন একা হতে পেরেছিস, একা হয়ে মজা কর্। আমি বরং আজ চলি।

—মোটেই না। মোটেই না। মুনা প্রায় টেনে বসিয়ে দিল আমাকে,—দিম্মা কি বলে শোননি? অতিথি অভুক্ত ফিরে গেলে বাড়ির অমঙ্গল হয়।

—তুমি কি আমাদের অমঙ্গল চাও? খুকুরও কাতর অনুনয়।

—আরে বাবা, তুমি বোসো না, আমরা এক্ষুণি তোমার জন্য খাবার করে আনছি। কি খাবে বলো, চাইনিজ না ইন্ডিয়ান?

পেটের ভেতর খিদে আরও চনমন করে উঠেছে। কলকল করছে। খলবল করছে, জ্যান্ত কই মাছের মতো। বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা বেয়ে। কোনোরকমে গিলে ফেলে বললাম,—পারবি তো তোরা?

খুকু বলল,—দ্যাখোই না।

মুনা বলল,—তুমি নয় ততক্ষণ পুপসির সঙ্গে গল্প করো, আমরা তোমার জন্য চাইনিজ বানিয়ে আনছি। এগ্ চাউমিন। ওটাই তাড়াতাড়ি হবে, কি বলো?

দুই বোন প্রায় মার্চ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুপসি অতিথিকে সঙ্গ দিতে বসেছে। বয়সটা সাত বছর হলে কি হয়, সেও বেশ কুটকুট করে বড়দের মতো কথা বলে যেতে পারে। বোধহয় দিদিদের কাছ থেকেই সদ্য শেখা যত সব বিটকেল ধাঁধা গলগল উগরে চলেছে সে।

—আচ্ছা টুটানমামা, বলো তো দেখি, ইন্ডিয়াতে প্রথম কোন মহিলা বহুকাল আগে ক্রিকেট খেলেছিলেন?

—বহুকাল আগে? অবাক হলাম সামান্য,—ইন্ডিয়াতে মেয়েরা তো এই সেদিন ক্রিকেট খেলা শুরু করল। বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে।

—উহুঁ, বহুকাল আগেই। পুপসি দু'গালে হাত ঠেকিয়ে বসল,—পারছ না তো? ক্লু দিয়ে দিচ্ছি। তিনি ছিলেন একজন রাজার পিসি।

দুত্তোর ছাই! তিনি আবার কে?

পুপসি চোখ পিটপিট করছে,—পারলে না তো? দিই বলে?

—বল্।

—বোম্বাগড়ের রাজার পিসি। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল পড়নি?

—তাও তো বটে।

—বেশ। এবার আরেকটা উত্তর দাও। পুপসি ঝুঁকল,—বলো তো দেখি, কে ভাল রান না করে খুব নেচেছিল?

এ আবার কেমন কথা! ক্রিকেট খেলায় রান না পেলে কেউ নাচে নাকি!

প্রশ্ন করার আগেই পুপসি নিজেই ঝটপট উত্তর দিয়ে দিল,—এটাও পারলে না? আমার মা। রান না মানে হলো গিয়ে রান্না। সেদিন খুব ভাল বিরিয়ানি রেঁধেছিল মা, সবাই প্রশংসা করতেই কী নাচ!

খাবারের নাম শুনেই আবার খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল পেটে। পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল, মেয়ে দুটো করছে কি? এখনও চাইনিজ তৈরি হলো না? রান্নাঘর থেকে অবশ্য ভালই গন্ধ আসছে, সঙ্গে হাতা-খুন্তির টুং টাং সুর। নাহ্, খুকু-মুনা মনে হচ্ছে খুব খারাপ একটা তৈরি করবে না।

ভাবতে না ভাবতেই দুই বোন হাজির। খুকুর হাতে ইয়া বড় প্লেটে গরমাগরম নুডলস্। মুনার হাতে টোম্যাটো সস, চিলি সসের শিশি। ভিনিগারে কুচি কুচি কাঁচালঙ্কা ভিজিয়ে আনতেও ভোলেনি করিৎকর্মা ভাগ্নীরা।

মুনা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল,—ফ্রিজে দেখলাম একটু মুরগি সেদ্ধ করা আছে, চিকেন চাউমিনই করে দিলাম তাই।

বাহ্ বাহ্, চিকেন চাউমিনে আবার কিছু বীট-গাজরও দিয়ে দিয়েছে দেখছি! না, মেয়ে দুটোর প্রশংসা করতেই হয়।

সময় নষ্ট না করে একসঙ্গে বেশ খানিকটা চাউমিন চালান করে দিলাম মুখে। অ্যাঅ্যাহ্, কেমন যেন বিশ্রী গন্ধ! কঁৎ করে গিলতেই গোটা শরীর গুলিয়ে উঠল। চিকেন চাউমিন ভেতরে গিয়ে বুঝি অন্নপ্রাশনের ভাত ঠেলে বার করে দিচ্ছে। মুখে কচকচ করছে কাঁচা কাঁচা বীট-গাজরের টুকরো।

থু থু করে ফেলে দিয়ে বললাম,—কি তেলে ভেজেছিস রে?

দুই রাঁধুনি উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে আছে। খুকু হাসি হাসি মুখে বলল,—কেন, বাদাম তেল।

—বাদাম তেল? হতেই পারে না। স্পষ্ট নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছি।

—ওমা তাই? মুনা এক ছুটে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এল,—ঠিকই ধরেছ। বাদাম তেলের শিশিতে যে দিম্মা নারকেল তেল রেখে দিয়েছে, বুঝতেই পারিনি।

—খুব করেছিস। ক্ষোভে দুঃখে ঝাঁঝ ফুটল আমার

গলায়,—যা, ফেলে দে গে যা।

—সেকি, তুমি না বললে খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

—তা বলে এই নারকেল তেলের চাউমিন খাব নাকি?

—খেলেই নয়। কি হয়েছে তাতে? খুকু পাশে এসে বলল,—নারকেল তেলের রান্না তো অনেকেই খায় টুটানমামা। তুমিই বলো, সাউথ ইন্ডিয়ানরা খায় না? মনে করো না, তুমি এখন চেন্নাইতে রয়েছ। কিংবা ত্রিচুরে। কিংবা মনে করো কোভালাম্ বীচে। নাও, সোনা মুখ করে খেয়ে নাও।

অকাট্য যুক্তি। দক্ষিণ ভারতীয়রা যদি খেতে পারে, আমিই বা পারব না কেন? না হয় একটু অন্য রকমই খেতে লাগল। অসহায় মুখে আবার চামচেয় চাউমিন তুললাম।

মুনা বলল,—বেশি গন্ধ লাগলে একটু ভিনিগার মিশিয়ে নাও টুটানমামা। স্বাদটা বেটার হবে।

ভিনিগারে কি নারকেল তেলের গন্ধ কাটে? দেখি চেষ্টা করে। উরে বাপস্, কাচের বাটি মুখের কাছে এসেই হড়কে পড়ে গেল হাত থেকে। আপনা-আপনি আর্তনাদ ছিটকে এল,—ভিনিগার কোথায় রে এটা? এ তো ফিনাইল! ফিনাইলে তোরা কাঁচা-লঙ্কা দিয়েছিস?

খুকুর জ্ঞানদায়িনী মুখ এতক্ষণে কাঁদো কাঁদো হয়েছে,—তুই কী রে মুনা? তোকে কত বার করে বললাম শুঁকে দ্যাখ, শুঁকে দ্যাখ...কোনো মানে হয়?

মুনার মুখেও ছায়া নেমেছে,—শুঁকেছিলাম তো। কি করব, ক'দিন ধরে আমার যা সর্দি হয়েছে, কোনো কিছুরই ঠিক মতো গন্ধ পাচ্ছি না।

—সেটা বললেই হতো। আমিই দেখে নিতাম। খুকু গজগজ করছে,—কী মেয়ে রে তুই? এখনও ফিনাইল-ভিনিগারের তফাত বুঝিস না?

—ফিনাইল যদি কেউ রান্নাঘরে রাখে, আমি কি করব?

—এক্সকিউজ দিস্ না। ভুল করেছিস স্বীকার কর্।

—তুইও স্বীকার কর্। মুনা দপ করে জ্বলে উঠল। খুকুর সংলাপ হুবহু নকল করে বলল,—কী মেয়ে রে তুই? এখনও নারকেল তেল-বাদাম তেলের তফাত বুঝলি না?

—অ্যাই, ভেংচাবি না বলে দিলাম। ফুলটুসি কোথাকার।

—তুই কি? তুই একটা ঢ্যাঁড়োশ। লেডিজ ফিঙ্গার।

—ভাল হবে না বলছি খুকু। বিহেভ ইওরসেলফ্।

—ইউ বিহেভ ইওরসেলফ্।

দু'জনে জোর লেগে গেছে, চুপচাপ বসে মিচকি মিচকি হাসছে তৃতীয় জন। মজা দেখছে। যেন রেস্‌লিং গ্যালারির নির্বিকার দর্শক।

শেষমেশ আমিই নামলাম রেফারির ভূমিকায়। হাসতে হাসতে বললাম,—আহা, ঝগড়া করিস কেন? ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। ঠেকতে ঠেকতেই শেখে লোকে।

বিরতি হলো। চোখের জল মুছছে খুকু-মুনা। করুণ স্বরে কোরাসে বলল,—তুমি কি তবে অভুক্তই ফিরে যাবে টুটানমামা?

এবার মেয়ে দুটোর মুখ দেখে মায়া হলো বড়। বললাম,—তা কেন, তোরা বরং আমায় এক কাপ চা খাইয়ে দে। পারবি তো করতে?

—নিশ্চয়ই পারব। একসঙ্গে মাথা নেড়েছে দু'জনে,—দু' মিনিট বোসো। ফার্স্ট ক্লাস চা করে আনছি।

দু' মিনিট নয়, তিন মিনিটে চা এল। বাহারী কারুকাজ করা পেয়ালা-পিরিচে টলটল করছে সোনালী তরল। গরম, ধোঁয়া উঠছে।

—খাসা হয়েছে চা। চুমুক দিয়েই নতুন করে ঢোঁক গিলেছি,—দুটো শুধু গণ্ডগোল।

—কি? কি?

—পায়েসের দুধ দিয়ে চা করেছিস বুঝি?

—না তো। মুনার ভুরুতে ভাঁজ,—আমি তো ডেকচি থেকে ভাল করে গন্ধ শুঁকে দু' চামচ দুধ নিলাম।

—দুধ চিনতেও গন্ধ শুঁকতে হয়?

—অফকোর্স। আর ভুল করি!

—তাহলে এমন পায়েস পায়েস লাগছে কেন বল্ তো?

—ভালই তো, পায়েস-চা খাচ্ছ। অনেকক্ষণ পর ফুট কাটল পুপসি,—আমাকে একটু ডিশে ঢেলে দাও তো, টেস্ট করে দেখি।

খুকু চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে,—সেকেন্ড গণ্ডগোলটা কি বললে না তো?

—সেটা এমন কিছু নয়। দ্বিতীয় চুমুক দিলাম কাপে,—চিনি দিতে ভুলে গেছিস এই যা।

—হতেই পারে না। আমি নিজের হাতে দু' চামচ চিনি দিয়েছি।

—তাহলে বোধহয় নাড়িসনি। মরিয়া হয়ে তৃতীয় চুমুকটাও দিয়ে ফেললাম বিস্বাদ তরলে।

—আহাহা, তবে খাচ্ছ কেন? দাঁড়াও, চামচ এনে নেড়ে দিই।

নাড়ার দরকার হলো না, চামচ চায়ে ডুবিয়ে তুলতেই উঠে এসেছে সাদা সাদা দানা। চিনি নয়, চাল। গোবিন্দভোগ চাল।

—এমা! খুকু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল,—দিম্মাকে নিয়ে আর পারা যায় না। চিনির বয়ামে পায়েসের চাল রেখে দিয়েছে। দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক মনে হয় না মোটা দানার চিনি? ফুটন্ত জলে ফেলার আগেই আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

মুনা দৌড়ে এসেছে কাছে,—ওটা ফেলে দাও টুটানমামা। আমি এক্ষুণি আরেক কাপ করে আনছি।

এবার বুঝি আমারই কেঁদে ফেলার পালা। গোবিন্দভোগ চায়ের পর এবার নির্ঘাৎ সাবু-চা খাওয়াবে ভাগ্নীরা। কিংবা নুন-চা। মাথায় থাক আমার ক্ষিধে, মাথায় থাক চা খাওয়ার সাধ...

খুকু-মুনা রান্নাঘরে গেছে। টুক করে উঠে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে পুপসি এসে খপ করে চেপে ধরেছে হাত। মিটি মিটি হাসছে,—পালাও কোথায় টুটানমামা? এক কাপ চা অন্তত তোমায় খেতেই হবে। নইলে বাড়ির অমঙ্গল হবে না?

তাও তো বটে। আমার কি এখন আর অভুক্ত থাকার উপায় আছে!

ছবি : অমিত চক্রবর্তী

মিঠুনই ম্যান অফ দ্য সিরিজ

প্রসূন ব্যানার্জি

মিঠুন চক্রবর্তী ও প্রসূন ব্যানার্জি

প্রতিবছরই আমি শুকতারার ভাই-বোনদের জন্যে খেলা সম্বন্ধে নতুন কিছু লিখে থাকি। এবারও সেই লেখা তৈরি করতে বসে এমন একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ল যা শুনলে তোমরা সকলে অবাক হয়ে যাবে।

মে-মাসের মাঝামাঝি বাড়িতে টেলিফোন করে আমাকে জানানো হলো আমাদের মতো বিশিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে রঙিন পর্দার সেই বিখ্যাত চিত্রতারকা মিঠুন চক্রবর্তী বৈঠকে বসতে চান।

আমার খেলোয়াড় বন্ধুরা আমাকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন—চিত্রতারকাটির হঠাৎ এই ইচ্ছা জাগলো কেন? উনি কি চাইছেন, আমাদের থেকে। আমি জানালাম মিঠুন ভীষণ ফুটবল অনুরাগী। বাংলার ফুটবলে, বাঙালি ছেলেদের প্রাধান্যের অভাব প্রকটভাবে দেখতে পেয়েই বোধহয় আজ এই বৈঠক ডেকেছেন।

বৈঠক শুরু হতেই সবাই আমার দিকে তাকালো। কারণ আমি আগের দিন যা বলেছিলাম, ঠিক সেই ব্যাপারটাই মিঠুন চক্রবর্তীর মুখেও প্রতিধ্বনিত হলো। মিঠুন বললেন, বাংলার ফুটবলের আজ একি হাল! একজন বাঙালি খেলোয়াড়কে খুঁজতে চোখে দূরবীন লাগাতে হচ্ছে! হিন্দি ছবি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলার ওপর নজর আমার ঠিকই আছে। বাংলার যুবসমাজের পাশে আছি আমি বরাবর। সেইজন্যই বাঙালির ঘরের লক্ষ্মী ফুটবলের এই অবস্থা দেখে আমি যারপরনাই ব্যথিত; তোমরা আমাকে সাহায্য করো, দ্যাখো আমি নতুন কিছু করে দেখাবো।

এই তো সুযোগ স্বপ্নকে সার্থক করার। আমরা বসে গেলাম একাডেমির নাম ঠিক করতে। ঠিক হলো নাম হবে 'বেঙ্গল ফুটবল একাডেমি' সংক্ষেপে বি. এফ. এ। মিঠুন পকেট থেকে আমাদের বেঙ্গল ফুটবল একাডেমির প্রথম ডোনেশন দিলেন ১০ লক্ষ টাকা। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম বাংলাকে ভালোবাসে এমন বাঙালি কি আর আছে!

একাডেমি গড়ার পথে প্রথম হার্ডেল তো পেরুলাম। কিন্তু শুধু এই দশ লক্ষ টাকা দিয়েই তো আর আমাদের ফুটবল একাডেমি চলবে না। তাই অর্থ সংগ্রহের অন্য রাস্তা ভাবতে লাগলাম। পথটা অবশ্য দেখিয়ে দিলেন মিঠুন নিজেই। বললেন, তোরা কয়েকটা প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা কর। আমিও তোদের সঙ্গে ফুটবল খেলবো।

খবরটা জানাজানি হতেই দুর্গাপুরের একটি ক্লাব এই লোভনীয় এবং আশ্চর্যজনক খেলার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইলো। আমরা মিঠুনের সঙ্গে কথা বললাম। মিঠুন সিনেমার শুটিং-এর দিন পরিবর্তন করে আমাদের সঙ্গে খেলতে রাজী হলেন।

দুর্গাপুরে খেলার দিনটি এসে গেল। আমরা ট্রেনে রওনা হলাম। মিঠুন হেলিকপ্টারে দুর্গাপুর পৌঁছবেন। শহরের মানুষের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। কারণ এতদিন তাঁরা দেখে এসেছেন বম্বের চিত্রতারকারা ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করছেন। কিন্তু মিঠুন সেই বিধিনিষেধ ভেঙে দিয়ে নতুন দিগন্ত তৈরি করতে যাচ্ছেন।

খবর পেলাম টিকিট বিক্রি শুরু হলেও চাহিদা তেমন নেই। এর একটাই কারণ, মিঠুন চক্রবর্তী তখনো এসে পৌঁছাননি। যেই হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল অমনি বিশাল লাইন পড়ল টিকিট কাউন্টারে। অভাবনীয় ভিড়। আমার মনে হলো যদি ইস্ট+মোহনের খেলা হতো দুর্গাপুরে তাহলেও এতো ভিড় হতো কিনা সন্দেহ।

আমরা মাঠে যাওয়ার আগে দু'পশলা বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে শেষ। আমরা ফুটবলাররা ভিজে মাঠ পেলে খুশি হয়ে থাকি, কিন্তু আমার ভয় বিখ্যাত চিত্রতারকাকে নিয়ে। এই মাঠে কোনো ইনজুরি না হয়, তার ওপর আবার মিঠুন খেলার বুট পরবেন না, তাঁর পায়ে একটা বিরাট গামবুট, সেইট পরেই খেলবেন।

যাই হোক মহা সন্ধিক্ষণ এসে গেল। আমরা খেলোয়াড়রা স্টেডিয়ামে চলে এলাম। তার কিছুক্ষণ করেই বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কমান্ডো গার্ডদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মিঠুন চক্রবর্তীর মাঠে আগমন।

মিঠুনের হাতে অধিনায়কের বল তুলে দিলাম। মাঠে বেশ জল জমে আছে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই খেলায় আমি খেলোয়াড়-কাম-কোচ-কাম-ম্যানেজার, তাই আমার চিন্তা আরো বেড়ে গেল। এই পিচ্ছিল মাঠে আমি মিঠুনকে খেলাবো কি করে। মিঠুন মাঠে নামতে যাচ্ছেন, আমি বলে দিলাম মিনিট পাঁচেক থেকে উঠে আসতে। মিঠুন সাবলীল ভঙ্গিতে বললেন, ঠিক আছে।

এদিকে আমার চিন্তা, যদি কপিলদেবের মতো ফুটবল খেলতে গিয়ে ধিক্কার শুনতে হয়! অত বড় চিত্রতারকা—তাঁর শরীরের ইন্‌সিওরেন্স তিন কোটি টাকা। যদি আঘাত লাগে কি উত্তর দেব? সব মিলিয়ে ঈশ্বরকে ডাকছি। ওদিকে দর্শকদের চিৎকার ক্রমশ বাড়ছে। তারা সেই মহা সন্ধিক্ষণের অপেক্ষায়।

খেলা শুরু।

সঞ্জয় মাঝি থেকে মিঠুন। মিঠুন দুর্দান্ত রিসিভ করে পাশ দিয়ে দিলো ইস্টবেঙ্গলের নাজিমুল হককে। নাজিমুল বল দিল গৌতম ঘোষকে। আবার সেই মিঠুন চক্রবর্তী।

খেলা যত এগোতে লাগলো ততই রূপান্তর ঘটলো মিঠুন চক্রবর্তীর। দুর্দান্ত চিত্রতারকা থেকে দুর্দান্ত খেলোয়াড়। তোমরা ভাবছো আমি বাড়িয়ে বলছি। একদম নয়। সারা মাঠ একটা চামড়ার গামবুট পরে দৌড়ে বেড়ালেন। আমি হাঁ হয়ে যেতে লাগলাম। সবচেয়ে ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটলো প্রথম অর্ধের শেষ দিকে যখন সঞ্জয় মাঝির গ্রু-পাশ পোর্ট ট্রাস্ট দলের রক্ষণকে অতিক্রম করে ডানদিক দিয়ে উঠে আসা মিঠুনের কাছে পৌঁছালো। ব্যস। মিঠুন বেশ বড় খেলোয়াড়ের মতো বলটা আয়ত্তে এনে গোলকিপারের ডানদিক দিয়ে প্লেস করে সারা মাঠকে জানিয়ে দিলেন আমি বম্বের মিঠুন কিন্তু সবসময়ই বাঙালি। কারণ বাঙালির ঘরের লক্ষ্মী ফুটবল।

দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশ থেকে জানানো হলো মিঠুন চক্রবর্তীকে খেলা থেকে তুলে নেওয়ার জন্যে কিন্তু আমি এই প্রস্তাব দিতেই মিঠুন বিরক্ত হয়ে বললেন, এতগুলো বাঙালি ভাই-বোন ভিজে ভিজে আমার জন্যে খেলা দেখছে আর আমি কিনা চলে যাবো, কখনই না। শেষ পর্যন্ত খেলে গেলেন মিঠুন। বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল দুর্গাপুর পুলিশকে। কিন্তু মিঠুন খেলা শেষ করে মাঠ ছেড়ে দিলেন।

মিঠুন এখনও খেলে যাচ্ছেন। এই তো কয়েকদিন আগে বর্ধমানে আমরা খেললাম, তারপরে সোনারপুরে।

তোমরা আরো আশ্চর্য হবে শুনলে যে এই তিনটে খেলায় আমরা চারটে গোল দিয়েছি, তার মধ্যে মিঠুনের তিনটি এবং শ্যাম থাপার একটি। আমার তো মনে হয় মিঠুন চক্রবর্তী এই তিনটে ম্যাচের ম্যান অফ দ্য সিরিজ। তোমরা কি বলো?

এগোচ্ছে শ্রীলঙ্কা, রোখা মুশকিল

রাজু মুখার্জি

গত বিশ্বকাপ শ্রীলঙ্কা জিতেছে। সন্দেহ নেই বিশ্বের প্রত্যেকটি শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হবার সম্মান আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অনেক ক্রিকেট অনুরাগীর মধ্যে একটা সন্দেহ রয়েইছে। হ্যাঁ, শ্রীলঙ্কা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান মানলাম কিন্তু সে তো সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। টেস্ট ম্যাচে কী শ্রীলঙ্কা তেমন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ?

সংশয় থাকাটাই স্বাভাবিক। সত্যিই কিন্তু শ্রীলঙ্কা টেস্ট ক্রিকেটে এখনও তেমন সাফল্যলাভ করেনি। ১৯৮২ সালে শ্রীলঙ্কার আবির্ভাব হয় সরকারী টেস্ট আঙিনায়। অর্থাৎ ওই সাল থেকে বিশ্বের প্রধান ক্রিকেট দলগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার সুযোগ পায়। এর আগে শ্রীলঙ্কার টেস্টগুলিকে বেসরকারী বলে গণ্য করা হতো।

গত ১৬ বছর ধরে শ্রীলঙ্কার টেস্টে তেমন সাফল্য না আসার প্রধান কারণ হলো, শ্রীলঙ্কা টেস্ট ম্যাচ খেলেওছে খুবই কম। এই কম টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্যই ওদের আক্রমণাত্মক বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা তেমন হয়নি। আক্রমণাত্মক বোলিং না হলে অবশ্যই টেস্ট ম্যাচ জেতা অতি কষ্টকর।

তবে একদিনের ক্রিকেটের মতো টেস্ট ক্রিকেটেও যে শ্রীলঙ্কা এগিয়ে আসছে, ভারতের সঙ্গে খেলায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে টেস্টে জয়সূর্যরা খেলেছেন একদিনের ক্রিকেটের ধাঁচে। এবং তাঁদের সেই সুবিধে এনে দিয়েছেন ভারতের বোলাররা। ভারতের এত দুর্বল আক্রমণ এর আগে কখনো কী দেখা গেছে! সন্দেহ আছে। সেই সুযোগ নিয়ে জয়সূর্য প্রায় লারার সব থেকে বেশি রানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। আর শ্রীলঙ্কাও টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে সব থেকে বেশি রানের ইনিংস গড়ে। তার জন্যে শ্রীলঙ্কার যত না কৃতিত্ব, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যর্থতা শচীনের বোলারদের।

অপরদিকে শ্রীলঙ্কা প্রচুর পরিমাণে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলার দরুন একদিনের ক্রিকেটের সঙ্গে নিজেদের ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছে। ওরা যাবতীয় প্রথাগত স্ট্র্যাটেজি চমৎকারভাবে কব্জা করেছে। যেমন ধর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, রক্ষণাত্মক বোলিং এবং দুর্দান্ত ফিল্ডিং। উপরন্তু প্রথাগত স্ট্র্যাটেজির বাইরে গিয়েও ওরা অনেক নতুনত্ব এনেছে। যেমন প্রথম পনেরো ওভারে অসম্ভব রকমের মারকুটে ব্যাটিং শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রাই প্রথম বিশ্বের দর্শকদের সামনে নিয়ে আসেন। এই ধরনের খেলার পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে ওরা খুব সফল হয়েছে। বিশ্বের কোনো দলকেই ওদের সামনে তেমন শক্তিশালী মনে হচ্ছে না। এই বছর বিশ্বকাপ ছাড়াও ভারতের

ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ, শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ ও শারজার টুর্নামেন্টে ওরা সফল হয়েছে।

ওরা যে শুধু পরিকল্পনার মধ্যেই বৈচিত্র্য এনেছে তা নয়, ঐ পরিকল্পনাকে ওরা সাফল্যের সঙ্গে বার বার ধরে রেখেছে। এখানেই শ্রীলঙ্কার আসল শক্তি। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা অন্যান্য দেশের রীতিনীতি, আদব-কায়দা ও চালচলন একদমই মানেনি। তারা বুদ্ধি খরচ করে, নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতার কথা মাথায় রেখে নিজস্ব রণকৌশল তৈরি করেছে। যে দেশ এরকম নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে, তারা সফল হবে না তো কি ভারত সফল হবে?

এখনও আমরা কথায় কথায় ইংরেজরা কি করছে, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজরা কি করে তাই নিয়েই মাথা ঘামাই এবং তাদের অনুকরণ করি। নিজস্ব পরিকল্পনা বলে ভারতীয় ক্রিকেটের কিছুই নেই। ওখানেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের পার্থক্য। শ্রীলঙ্কা ঠিক নিজেদের সুবিধা মতন করে ক্রিকেটকে সাজিয়ে নিয়েছে।

ভারতের মতো শ্রীলঙ্কাতেও ক্রিকেট শুরু করেছিল ইংরেজ চা-বাগানের মালিকরা আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে। শুরু থেকে না হলেও এই শতাব্দীর গোড়া থেকে শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো স্কুল ক্রিকেটকে। অর্থাৎ তরুণ প্রতিভারা শুরু থেকেই সুযোগ পেত প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার।

ইংরেজরা যদিও ক্রিকেটের বীজ পুঁতেছিল, শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেট জনপ্রিয়তা লাভ করল কিন্তু ইংরেজরা চলে যাবার পর। গত পাঁচ দশক ধরে শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রা দেশ-বিদেশে দাপিয়ে খেলেছে তবে এমনই দুর্ভাগ্য, শ্রীলঙ্কা সরকারীভাবে টেস্ট খেলার অনুপযুক্ত গণ্য হওয়ায় ১৯৮২ সালের আগে পর্যন্ত দল হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে দেখবার সুযোগ দর্শকরা খুব একটা পাননি।

আটের দশকে শ্রীলঙ্কা সরকারীভাবে টেস্ট খেলার সুযোগ পাওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উদ্যম নিয়ে লেগে পড়েন। এই সময়ে কোচ হিসেবে ডেকে আনা হয় বিশ্বের নামী ক্রিকেটার স্যার গারফিল্ড সোবার্সকে। সোবার্সের সংস্পর্শে এসে মানসিকভাবে খেলোয়াড়রা অনেক ধাপ এগিয়ে যান। তারপর হাল ধরেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড ওয়াটমোর এবং স্বদেশীয় প্রাক্তন অধিনায়ক দিলীপ মেন্ডিজ। এই দু'জন মিলে প্রথম পনেরো ওভারে আক্রমণাত্মক খেলার পরিকল্পনার ছক করে দেন। আর সেই পরিকল্পনার ওপর আস্থা রেখেই অসাধারণ সাফল্য পেয়ে চলেছেন রণতুঙ্গা, জয়সূর্য ও ডি সিলভারা।

আমার নিজের ধারণা শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রা টেস্ট ম্যাচে অতি শীগগিরই নিজেদের আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োজন সেই শক্তি প্রয়োগ করতে তাঁরা সক্ষম হবেন। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার অসাধারণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা শ্রীলঙ্কা দলকে বিশ্বের এক নম্বর দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবেন এবং সফলও হবেন।

শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের বিশেষত্ব হলো তাঁদের কাছে ব্যক্তি থেকে দেশ আগে, দলের স্বার্থে শ্রীলঙ্কার প্রতিটি খেলোয়াড়ই যে কোনোরকম ঝুঁকি নেবার জন্য তৈরি থাকেন। আরেকটি বড় গুণ হলো তাঁরা আবেগে নিজেদের ভাসিয়ে দেন না। আনন্দে বেশি লাফালাফি বাড়াবাড়ি শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের মধ্যে একেবারেই নেই। প্রতিপক্ষ দলকে গালাগালি, ধাক্কাধাক্কি করাটা এই দ্বীপের খেলোয়াড়রা ভাবতে পারেন না। মাঠে তাঁদের আচরণ ভদ্র ও সৌম্য। আশা করি বিশ্ব ক্রিকেটের মধ্যে সৌম্যবোধ শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের হাত ধরেই ফিরে আসবে।

সৌরভ আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল

স্নেহাশিস গাঙ্গুলি

আজ এমন একজনের সম্পর্কে লিখতে বসেছি যার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন বাংলার ক্রিকেটারদের এবং সাধারণ বাঙালিদের গর্বিত করেছে। সেই সঙ্গে বাংলার ক্রিকেটকে ভারতীয় ক্রিকেটের মানচিত্রে একক প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছে। হ্যাঁ, সে আর কেউ নয়, আমাদের মহারাজ, সৌরভ গাঙ্গুলি।

সৌরভ আর সাধারণ পাঁচজনের মতো ক্রিকেট শুরু করে পাড়ায় টেনিস বল দিয়ে খেলে। ওর প্রথম ডিউস বলে হাতেখড়ি হয় বাংলার প্রাক্তন কোচ মিঃ এম. পি. পারমারের কাছে যখন ওর বয়স ছয়। আমার ক্রিকেট জীবনের প্রারম্ভে ইনিই কোচ ছিলেন। এর পেছনে একটি দারুণ গল্প আছে যা অনেকেরই অজানা। ১৯৭৮ সাল—সি. এ. বি. ইডেন গার্ডেন্সে একটি কোচিং সেন্টার শুরু করেন যার কোচ ছিলেন মিঃ পারমার। আমি সেই কোচিংয়ে যখন যোগদান করি তখন আমার বয়স এগারো। সপ্তাহে দুই বা তিনদিনের এই কোচিংয়ে ছোট্ট সৌরভ আমার সঙ্গে যেত। মাঠের ধারে বসে সে আমাদের কোচিং দেখত এবং বল কুড়িয়ে দিত।

ছোট্ট থেকে সৌরভ বরাবরই বেলা করে উঠত কিন্তু কোচিংয়ের দিনগুলোতে সে সবার আগে রেডি। এই সম্বন্ধে একটি অভিনব ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যা তার ক্রিকেটের প্রতি গভীর আকর্ষণের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। St. Xavier's School যেখানে সৌরভ পড়ত, বৃহস্পতিবার দিন ছুটি থাকত। কোনো এক কারণে এক বৃহস্পতিবার তার স্কুল খোলা ছিল। সৌরভ কাউকে না বলেই আমার সঙ্গে কোচিংয়ে পালিয়ে এসেছিল।

আমার বাবা চণ্ডী গাঙ্গুলি তখন সি. এ. বি.-র অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি। সেই শীতের

মরসুমে ইংল্যান্ড দল কলকাতায় ভারতের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসেছিল। ছোট্ট সৌরভ টেস্ট ম্যাচের প্রতি পাঁচদিনই বাবার সঙ্গে সকালে মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস দেখত। এরপর সৌরভ দুঃখীরাম ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলো। শুধু ক্রিকেটেই নয়, St Xavier's স্কুলের হয়ে সৌরভ দুর্দান্ত ফুটবলও খেলত। সেই সময় আমি বাংলার সাব জুনিয়র দলে খেলছি। যদিও সৌরভের প্রশিক্ষণ আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারতাম না, আমি তার কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের কাছ থেকে তার ন্যাচারাল ট্যালেন্টের কথা জানতে পারতাম। মাঝে মাঝেই ও রাত্রে আমার কাছে আসত এবং কোচিংয়ে ওর ব্যাটিং করার কেরামতির কথা আমাকে শোনাত। আরও ভালোভাবে কি করে খেলা যায় তার উপদেশও নিত। এর মধ্যে একটা কথা বলা দরকার যে সে শুধু ক্রিকেটেই নয়, পড়াশুনাও সমান দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে যেত।

এমন ভাবেই বছর চারেক কেটে যায়। ১৯৮৭ সালে আমি বাংলা রন্‌জি দলে জায়গা পেলাম। সৌরভ পেল বাংলার আন্ডার থারটিন বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে। তখন আমি সৌরভের খেলা দেখার অতটা সুযোগ পেতাম না, কারণ নিজের খেলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। তবে সাব জুনিয়র এবং জুনিয়র বাংলা দলে ওর দারুণ পারফরমেন্সের কথা সংবাদ মাধ্যমে শুনতাম এবং পড়তাম। আর কোনো ফাঁকে যখন ওর ব্যাটিং দেখার সুযোগ পেতাম তখন ভাবতাম ভারতের হয়ে একদিন ও নিশ্চয়ই প্রতিনিধিত্ব করবে।

সৌরভ ভারতের হয়ে প্রথম প্রতিনিধিত্ব করে ইন্ডিয়া আন্ডার নাইনটিন-এ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হবে। প্রথম দুটি টেস্ট ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর আমাদের একটি নামকরা পত্রিকার একজন নামকরা সাংবাদিক ব্যঙ্গ করে আমার বাবাকে বলেছিলেন, 'চণ্ডীদা ওকে ফিরিয়ে আনুন।' তার জবাব সৌরভ তৃতীয় টেস্টেই দিয়েছিল। হাতের চেটোয় ফ্র্যাকচার নিয়ে একটি দুর্দান্ত শতরান দিয়ে।

সৌরভের ও আমার একসঙ্গে ক্রিকেট খেলার সুযোগ আসে বাংলার রন্‌জি দলের হয়ে ১৯৯০ সাল থেকে। সতেরো বছরের তরুণ সৌরভ দলে দারুণ মানিয়ে নিয়েছিল। ওর ব্যাটিং দেখে ভাবতাম এই প্রতিভা হয়তো ভুল জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছে। রন্‌জি, দিলীপ ও দেওধরে ওর এমন কয়েকটি ইনিংস আছে যা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। আমার আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে, ১৯৯২ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফররত ভারতীয় দলে ও নিজের জায়গা করে নেয়। ওর বয়স তখন কুড়ি। সেই সফর অবশ্য ওর পক্ষে খুব একটা কার্যকরী হয়নি। ওকে হতাশ করে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওর সম্পর্কে কিছু অপবাদ একটি নামী সংবাদপত্রে ছাপা হয়, যার থেকে সকলেরই প্রায় মনে হয়েছিল, সৌরভ গাঙ্গুলির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার এখানেই ইতি। এই বাংলার অনেকেই এই মিথ্যা অপবাদকে আরও রং চড়িয়ে সত্য বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সৌরভের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং ভালো কিছু করে দেখাবার জেদ, ঠিক চার বছর পর তাকে আন্তর্জাতিক স্তরে আবার ফিরিয়ে আনল।

এখন সবাই সৌরভের নাম, যশ এবং সাফল্যটাই দেখছে। কিন্তু এর পেছনে তার কত অনুশীলন, অধ্যবসায়, লোকেদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং কটূক্তি শুনেও তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় মনোবলে সারা বিশ্বের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো, তা দেখে সকলের শেখা উচিত।

ফুটবল বিশ্ব তাকিয়ে আছে রোনাল্ডোর দিকে

তপন দাম

ব্রাজিল মানেই ফুটবল। ব্রাজিল মানেই পেলে, গ্যারিঞ্চা, ডি ডি আর রোমারিও। ব্রাজিল মানেই গরিব। তবে গরিবের দেশ হলে কী হবে সেখানকার ছোট ছোট ছেলেরা কেবল ফুটবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন দেখে। ফুটবলই ব্রাজিলের বড় শিল্প, যেখান থেকে ভাল ফুটবল খেলোয়াড়রা কোটি কোটি টাকা আয় করে দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠে ফুটবল সমাজে নিজেদের শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। আজও ব্রাজিলের বেশির ভাগ মানুষ আধপেটা খেয়েই জীবনধারণ করেন। পেলে, গ্যারিঞ্চা, ডি ডি, রোমারিওরাও গরিব ঘরে

জন্মেছেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে একদিন ফুটবলের হাত ধরে বিশ্বের ফুটবল মানচিত্রে নিজেদের তুলে ধরেছেন।

এবার আসি রোনাল্ডোর কথায়। সেও একইভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে উঠে এসেছে। যদিও ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল দলে স্থান পেয়েছিল সে, খেলার সুযোগ কিন্তু পায়নি। সাইড লাইনের ধারে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে বসে খেলা দেখে শুধু অভিজ্ঞতা অর্জনই করেছে সে। ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে কিন্তু সেই হবে 'নায়ক'। এ ধারণা সারা বিশ্বের ফুটবল-বিশেষজ্ঞদের।

ঠিক কুড়ি বছর আগে ব্রাজিলের রাজধানী রিওডিজেনিরোতে রোনাল্ডোর জন্ম এক

দুঃস্থ পরিবারে। বাবা-মা নাম রেখেছিলেন রোনাল্ডো লুইস নাজারিও দা লিমা। গরিব পরিবারের আর পাঁচটি বাচ্চার মতো রোনাল্ডোও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে। ওর জন্মের পর থেকেই বাবা-মার মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। একদিন ছাড়াছাড়িও হয়ে যায়। পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় রোনাল্ডো। মা রাস্তায় রাস্তায় খাবার বিক্রি করে রোনাল্ডোকে বড় করতে লাগলেন। মা বাইরে খাবার বিক্রি করতে গেলে রোনাল্ডো পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে 'ফুটবল' খেলতে নেমে পড়তো রাস্তায়। তখন থেকেই সে স্বপ্ন দেখতো পেলের মতো খেলোয়াড় হবে।

'স্ট্রিট ফুটবলে' রোনাল্ডোর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো রিওডিজেনিরো শহরে। শহরের এ-পাড়া ও-পাড়ায় খেলার ডাক পড়তে লাগলো। বন্ধুদের অনেকের বুট আছে। ওর নেই। রোনাল্ডো জানে, বুট কিনে দেবার মতো ক্ষমতা ওর মার নেই। তাই সে চুপ করে থাকে।

এই সময়ে হঠাৎই একদিন এক দূরসম্পর্কের ভাই তার ছেঁড়া বুট ফেলে দিলেন রাস্তায়। সেই ছেঁড়া বুটটাই কুড়িয়ে এনে পরে দেখলো রোনাল্ডো। ঠিক ঠিক হয়েছে। তখন থেকে সেই ছেঁড়া বুটজোড়া পরে রোনাল্ডো খেলতে লাগলো।

যত দিন যায় রোনাল্ডোর নাম ততই ছড়িয়ে পড়ে। ওর খেলা দেখে বড় বড় ক্লাবগুলি ওকে নিতে চায়। এরই মধ্যে লিওর একটি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যায় রোনাল্ডোর। তখন তার বয়স ১৪। ঐ ক্লাবে খেলতে খেলতেই অনূর্ধ্ব ১৬-র বিশ্ব যুব ফুটবলে ব্রাজিল দলে নির্বাচিত হলো সে।

সেই দিনটির কথা রোনাল্ডো কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। যেদিন দল নির্বাচন হবে সেই দিনটি উত্তেজনার মধ্যে কেটেছিল রোনাল্ডোর। দিনের শেষে রেডিওতে যখন ব্রাজিল দলের খেলোয়াড়দের নাম একের পর এক ঘোষণা করা হচ্ছিলো, সেই সময় রোনাল্ডোর গায়ে ঘাম ঝরছিল দরদরিয়ে। এক সময় ঘোষকের কণ্ঠে রোনাল্ডোর নাম শোনা যেতেই সে একছুটে বাড়ি পৌঁছে মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে থাকে, মা, আমি চান্স পেয়েছি। চান্স পেয়েছি।

সেবার বিশ্ব যুব ফুটবলে ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন করার পর রোনাল্ডোকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তখন থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে রোনাল্ডোর নাম ছড়িয়ে পড়ে। রোনাল্ডোর মতো একজন উঠতি অথচ দক্ষ স্ট্রাইকারকে দলে নেবার জন্যে বিশ্বের প্রথম সারির ক্লাবগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ বছর হল্যান্ডের পি. এস. আইন্দহোভেনের হয়ে লিগ ফুটবলে খেলতে নামে রোনাল্ডো। এরপর কোপা আমেরিকা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাতে রোনাল্ডো ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন করে। এই কিছুদিন আগে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলের পক্ষে খেলেছে রোনাল্ডো। গত বছর ইতালির বার্সেলোনা ক্লাবে খেলার পর এবারে ইন্টার মিলানের সঙ্গে চুক্তি করেছে বছরে তিরিশ লাখ ডলারের বিনিময়ে। বার্সেলোনা ক্লাবে খেলার জন্য রোনাল্ডো পেয়েছিলো ৮০ লক্ষ পাউন্ড। ইংলন্ডের অ্যালান সিয়ারার এবং ইতালির গিয়ানলুইগি লেনতিনির পর বর্তমানে রোনাল্ডোই সবচেয়ে দামী ফুটবলার।

বার্সেলোনা থেকে ইন্টার মিলান ক্লাবে আসার জন্য কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি রোনাল্ডোকে। তাকে নেওয়ার জন্য ইন্টার মিলান ক্লাবের তরফ থেকে বার্সেলোনাকে দু' কোটি ৭০ লক্ষ ডলার দিতে হয়েছে। ফিফার নিয়মের প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল ইন্টার মিলান। শেষ পর্যন্ত দুই ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসেন। ইন্টার মিলান ক্লাবে আসার জন্য রোনাল্ডো 'সাইনিং অ্যামাউন্ট' পায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার।

সবচেয়ে মজার কথা হলো, স্পেনের মাদ্রিদে রোনাল্ডো যে নির্দিষ্ট হোটেলে খেতে যায় সেখানে পয়সা দিয়ে খেতে হয় না তাকে। উল্টে রোনাল্ডোকেই হোটেল কর্তৃপক্ষ অনেক পয়সার বিনিময়ে খাওয়ান। এর মানে খাওয়ার জন্যই রোনাল্ডো পয়সা পায়। কারণ রোনাল্ডোকে দেখার জন্যে, সে যা খায় তাই খাবার জন্যে হোটেলে ভিড় উপচে পড়ে।

রোনাল্ডোর প্রিয় ফুটবলার সর্বকালের সেরা পেলে। এরপরেই সে স্থান দিয়েছে তার দলের অধিনায়ক রোমারিওকে।

শ্রেণী বিভাগ

অভীক বসু

ভোঁদাদের বাড়িতে চোর ঢোকে রাতে,
বড় কাকা ফেলে ধরে তাকে হাতেনাতে
ভোরবেলা হলো যেই সবে কাক ডাকে,
থানায় চলল ভোঁদা পাকড়িয়ে তাকে।
বহুদূর থানা তাই মাঝপথে এসে,
বাকি পথ ট্রামে যাবে স্থির করে শেষে।
ট্রাম থামে স্টপেজেতে, উঠবার তাড়া,
ভোঁদা বলে, 'চোর তুই একটুকু দাঁড়া।'
ভোঁদাবাবু, বাবু বটে তাই সে ভাবে,
চোরের সঙ্গে কেন একসাথে যাবে।
দুজনের মাঝখানে বিস্তর ফাঁক,
চোরকে বলল, 'তুই দ্বিতীয়তে থাক।'
প্রথম শ্রেণীতে ভোঁদা জানলার পাশে,
দ্বিতীয়তে বসে চোর মনে মনে হাসে।
পরের স্টপেজে যেই ট্রামটি দাঁড়ায়
চোরও চুপি চুপি পা-টি বাড়ায়।

চাঁদের দেশে শ্রীচাঁদ

দিলীপ রায়

কেমন তুমি ছিলে হে শ্রীচাঁদ
আলো থৈ থৈ চাঁদেতে গিয়ে
আমরা হেথায় ভাবছি সবাই
আসছো তুমি কি বার্তা নিয়ে।
দেশটা কেমন দেখলে তুমি
কেমন সেথায় মানুষজন,
চেহারা তো বেশ বাগিয়েছ দেখি
ভালই হয়েছে ভূরিভোজন।
গুছিয়ে সব বল তো দেখি
মুখিয়ে আছি কবে থেকেই
কাজকর্ম সব এসেছি সেরেই
আমার বিশেষ তাড়া নেই।
এই দ্যাখো, হাসছো কেন
কি এমন বলেছি ভুল,
কি বললে; চাঁদের দেশে মানুষ নেই
আর খাবার বলতে ক্যাপসুল!

ছবিঃ সুফি

ছুটিতেও ছোটদের বন্ধু সংসদের বই

গল্প আর গল্প

লীলা মজুমদার
মহাভারতের গল্প ২৫.০০
জানোয়ার ১৫.০০
বেড়ালের বই ১২.০০

কার্তিক ঘোষ
ছুটির গন্ধ ২০.০০
জুঁইফুলের রুমাল ১৫.০০

সুকুমার রায়
পাগলা দাশু ২৫.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূত পুরাণ ২৫.০০

ত্রিভঙ্গ রায়
রাঙাদির রূপকথা ৪২.৫০

বীণা মিশ্র
পূর্বাচলের রূপকথা ২২.৫০

মীরা বালসুব্রামনিয়ান
তিনটে তামার পয়সা ১২.৫০

গৌরী ধর্মপাল
চোদ্দ পিদিম ১২.০০
উপনিষদের গল্প ২৫.০০

শৈল চক্রবর্তী
ছড়ার দেশে টুলটুলি ৬.০০

মৌমাছি
চেঙা-বেঙা ১০.০০
নাকাল নেংটি ৫.০০
চালাক বোকা ৮.০০

সরিৎশেখর মজুমদার
বন যদি না থাকত ২০.০০

অমিয়া সেন
শোনাই শোন রূপকথা ২৫.০০

রমেন ভট্টাচার্য
পঞ্চতন্ত্র ২০.০০

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
নীলপুকুরের মাছ ১৫.০০

অর্ধেন্দু দত্ত
শিকারের জার্নাল ১৫.০০

বুদ্ধদেব গুহ
পুনপুনিয়ার শোনচিতোয়া ১৫.০০

নরেশচন্দ্র জানা
কাজলরেখা ১২.৫০
ধনপতি শ্রীমন্ত ১২.৫০

চিরকালের সেরা

সুনির্মল বসু ৬০.০০
উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১০০.০০
সুকুমার রায় ১৪০.০০
লীলা মজুমদার ১৫০.০০

ছড়া ও কবিতা

অপূর্ব দত্ত
হিজিরিং বিজিরিং ১০.০০
বাঘ বেরোল ১০.০০

সুকুমার রায়
আবোল তাবোল ২২.৫০

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
মজার ছড়া ১২.৫০
যাদের বলে সমাজ চলে ৮.০০
ছন্দে গাঁথা এ কলকাতা ১০.০০

বুদ্ধদেব গুহ
মিঃ হাবিজাবি ৬.০০

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে ৫.০০

সম্পাদিত ঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
কিশোর কবিতা সঞ্চয়ন ৫৫.০০

শৈবাল চক্রবর্তী
ভারতের উপকথা ২২.৫০

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কায়াহীনের কাহিনী ২০.০০
জাপানি ফানুস ২০.০০

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভোঁদড় বাহাদুর ১৫.০০

দীননাথ সেনা
গল্প বলেন টলস্টয় ১৫.০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর গল্প ৪০.০০

সম্পাদিত ঃ অশোককুমার মিত্র
ঠাকুরবাড়ির লেখা ৮০.০০

হীরেন চট্টোপাধ্যায়
রোব্বোস ২০.০০

শিশিরকুমার দাশ
চিংড়ি ২০.০০

সঙ্কর্ষণ রায়
সাদা ঘোড়ার সওয়ার ২০.০০

সম্পাদিত ঃ কার্তিক মজুমদার
হারে রে রে রে রে ৫৫.০০

অনীশ দেব
ইন্সপেক্টর রনি ৩০.০০

বাদল সরকার
ছবির খেলা ১২.০০

সুভাষ ভট্টাচার্য
কবিতার সহজপাঠ ২০.০০

ফরাসি কমিকস্

লাকি লুক-এর অ্যাডভেঞ্চার
সব্বোনেশে জেন ৩৫.০০
মা ডালটন ৫০.০০
ওয়েস্টার্ন সার্কাস ৫০.০০

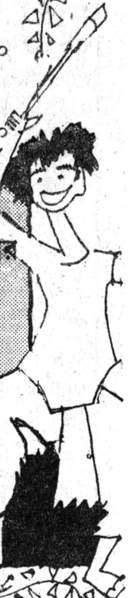

শিশু সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ▢ কলকাতা ৭০০ ০০৯

সাফল্যের চাবিকাঠি

ব্যায়াম ও ধ্যান

তুষার শীল

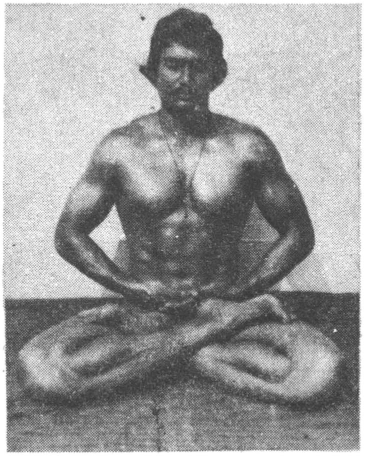

পদ্মাসনে ধ্যান

একটা পুরাতন গান হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে, 'এই মনটাই যত করে গোলমাল।' পরের কথাগুলো বাদ দিয়ে এই কথাটাই নিলাম। এই মনের ধীশক্তি বাড়াতে ব্যায়াম ও যোগের জুড়ি মেলা ভার। প্রাতঃভ্রমণ যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই বলেন, যেদিন প্রাতঃভ্রমণ করতে পারি না সেদিন সারাক্ষণ শরীর ম্যাজম্যাজ করে, মন-মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। এই প্রাতঃভ্রমণও কিন্তু এক ধরনের ব্যায়াম।

এটা ধ্রুব সত্য যোগ ও ব্যায়ামে মনের চঞ্চলতা দূর হবেই হবে। যোগের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। যোগের ধ্যানে বিক্ষিপ্ত মন শান্ত হয়। ধ্যান অভ্যাসের আগে যে কয়েকটি ধাপ রয়েছে তার ভিতর পড়ে আসন ও প্রাণায়াম। অনেকে ভাবেন শুধু ঈশ্বর দর্শনের জন্যেই বুঝি ধ্যানের প্রয়োজন। এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ধ্যানে প্রকৃতপক্ষে বাড়ে মনের একাগ্রতা এবং যে কোনো কাজে সাফল্য পেতে মনের একাগ্রতা একান্ত দরকার। কি লেখাপড়া, কি খেলাধূলা, কি গান-বাজনা, কি কাজকর্ম—যখন যেটি করবে তখন তাতেই মনঃসংযোগ করতে হবে। বেশির ভাগ সময়েই আমরা সেটা করি না। যেমন—পড়তে বসে খেলার কথা ভাবি, খেতে বসে ভাবি কাজের কথা, ঘুমোতে গিয়ে আবার নানান জটিল বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করি। এইরকম করি বলেই কিছুতেই সাফল্য আসতে চায় না। ব্যায়াম ও যোগাসনের দ্বারা এই উল্টোপাল্টা কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ধর তুমি কারলিং করছ। তখন তুমি তোমার হাতের বাইসেপ পেশীর (উপর বাহু) উন্নতি হচ্ছে এই চিন্তা করবে। ফলস্বরূপ মন বাধ্য হবে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে। আবার আসনে কি ভাবে বাড়বে একাগ্রতা জানো? হয়তো কেউ ভুজঙ্গাসন করছে—এই সময় যারা কোমর বা ঘাড়ের ব্যথায় ভুগছে, তাদের চিন্তা করতে হবে ব্যথা কমছে, উন্নতি হচ্ছে ওই সব জায়গার মাংসপেশী সমূহের। অবশ্য চিন্তা না করলেও কমবে এবং পেশীর উন্নতি হবে। কিন্তু এইভাবে মনঃসংযোগ করলে ফল আরও দ্রুত পাওয়া যাবে। বিক্ষিপ্ত মনটা শান্ত হয়ে আসবে। আসন অবস্থানে লম্বা লম্বা শ্বাস নেওয়া-ছাড়া করলে প্রাণায়ামের ফল পাবে। এইভাবে ধীরে ধীরে ধ্যানের দিকে এগিয়ে

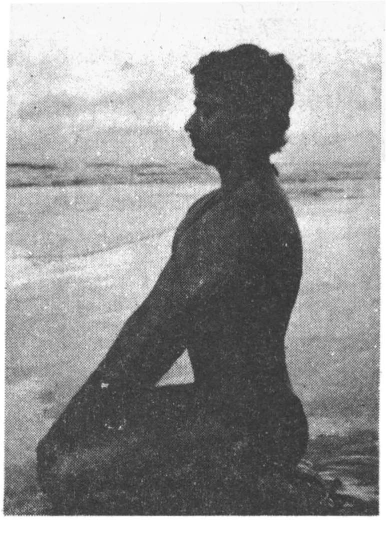

বজ্রাসনে ধ্যান

সোজা হয়ে মেরুদণ্ড টানটান করে যে কোনো ধ্যানাসনে বসতে হবে। যথা—পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন, ভদ্রাসন—অর্থাৎ যে ভাবে বসলে আরাম পাবে সেই ভাবে বসো। এইভাবে বসতে কষ্ট হলে বাবু হয়ে বসে ধ্যান করবে। যারা বাবু হয়েও বসতে পারবে না তারা কি তবে ধ্যান করবে না? নিশ্চয়ই করবে, চেয়ারে বসেই করবে। তবে চেষ্টা করবে যে কোনো ধ্যানাসনে বসতে।

এখন এই অবস্থানে বসে লম্বা লম্বা শ্বাস নেওয়া-ছাড়া কর। কিছুক্ষণ যে কোনো একটা জিনিসকে একাগ্র চিত্তে দেখে নিয়ে পরে আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে চিন্তা কর সেই জিনিসটি তুমি দেখতে পাচ্ছ। যখন চিন্তার ভিতর জিনিসটিকে উপলব্ধি করতে পারবে না তখন আস্তে আস্তে চোখ খুলে জিনিসটি দেখে নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে পূর্বের মতো উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর জিনিসটিকে। এইভাবে কিছুক্ষণ করলেই দেখবে প্রথমে চোখ বন্ধ করে যতক্ষণ উপলব্ধি করতে পারছিলে, পরে আরও অনেকক্ষণ বেশি সময় ধরে উপলব্ধি করতে পারছ। অর্থাৎ তখন আর ঘন ঘন চোখ খুলে দেখে নিতে হচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধ্যানের জন্য কোন জিনিস তুমি বাছবে? ধরো বাবা-মায়ের মুখ, তোমার আরাধ্য দেবদেবী বা ইষ্ট অথবা কোনো কিছু সুন্দর নরম আলোর উৎস ইত্যাদি। ধ্যান কখন করবে? সকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে শোবার আগে যদি করতে না পারো তাহলে যে সময় ফাঁকা পাবে সেই সময় অভ্যাস করবে। হয়তো ভাবছ কতক্ষণ ধ্যান করতে হবে। ৫।১০।১৫।২০ মিনিট বা তারও বেশি করতে পারো। যেমন সময় পাবে তেমনটি করবে। এখনই অভ্যাসে লেগে পড়, দেখবে ফল পাচ্ছ হাতে হাতে।

কিছু ব্যায়াম তো যোগাসনই। হোক না খালি হাতে ব্যায়াম, তার সঙ্গেই ধ্যান অভ্যাস কর। দূর হবে মনের চঞ্চলতা, বাড়বে একাগ্রতা, সফলতা আসবে সব কাজে।

রিং লোফালুফির খেলা দেখাচ্ছেন জাগলার। প্রথমে এক হাতে দুটি রিং লোফালুফি করলেন। পরে দু'হাতে তিনটি রিং লোফালুফি করে দেখালেন। তারপর দুটি রিং কখনো ডান হাতে আবার কখনো বাঁ হাতে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগলেন। লোফালুফি করতে করতেই তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন, আবার উঠে দাঁড়ালেন। শেষে ডান

রিং লোফালুফির খেলা

অভয় মিত্র

হাতের রিংটি আকাশপানে বেশ খানিকটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে শরীরটিকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরিয়ে নিয়েই ছুঁড়ে দেওয়া রিংটিকে লুফে নিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনটি রিং নিয়ে আবার লোফালুফি করতে লাগলেন।

খেলার জন্য চাই তিনটি তিন রঙের রবারের রিং যা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়। কেনার সময় একটু দেখে নিতে হবে যেন রিংগুলি নরম হয়। কারণ শক্ত রবারের রিং হলে হাতের তালুতে লেগে ছিটকে পড়ে যেতে পারে।

প্রথমে ডান কাঁধ থেকে ডান হাতটি নিচের দিকে নামিয়ে কনুই থেকে বাহুটি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। একটি রিং বুড়ো আঙুল এবং কড়ে আঙুল দিয়ে ধরে আর একটি রিং বাকি তিনটি আঙুল দিয়ে একটার পর একটা লোফালুফি করতে হবে, বল লোফালুফির মতো। তিনটি আঙুলে ধরা রিংটি প্রথমে ওপর দিকে দেড় ফুট উঁচু লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতে হবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে রিংটি নিচের দিকে নেমে আসার সময় ডান হাতের বাকি রিংটি ঐ একই উচ্চতায় এবং একই লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিতে হবে এবং নিম্নগামী রিংটিকে হাতের তালুতে পাঁচটি আঙুল দিয়ে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে রিংটি মাটিতে না পড়ে যায়। রিংটির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাতের তালুতে পড়ামাত্রই পাঁচটি আঙুল দিয়ে রিংটিকে ভালোভাবে ধরে কনুই থেকে বাহুটি একটু নিচে নামিয়ে ফেলতে হবে যাতে হাতের তালু থেকে রিংটি ছিটকে আশেপাশে না পড়ে যায়। সর্বদাই মনে রাখতে হবে চোখ যেন রিং-এর ওঠানামার দিকে নিবদ্ধ থাকে। একই পদ্ধতিতে বাঁ হাতে অনুশীলন করতে হবে। যখন ডান হাতের দুটি রিং এবং বাঁ হাতের দুটি রিং লোফালুফি করা পুরোপুরি আয়ত্তে এসে যাবে তখন দু'হাতে তিনটি রিং অনুশীলন করতে হবে (দু'হাতে তিনটি বল লোফালুফির মতো।)। দু'হাতে তিনটি রিং লোফালুফি করা যখন পুরোপুরি আয়ত্তে এসে যাবে তখন লোফালুফি করতে করতে ডান হাতে ধরা একটি রিং আকাশপানে বেশ খানিকটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে শরীরটিকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরিয়ে নিয়েই ওই ছুঁড়ে দেওয়া রিংটিকে লুফে নিতে হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তিনটি রিং নিয়ে লোফালুফি শুরু করতে হবে। রিং লোফালুফির সব কৌশলগুলি বল লোফালুফির মতো।

জাগলিং শিখতে গেলে মনে রাখতে হবে, চোখ ও মনকে এক জায়গায় বেঁধে রাখার অভ্যাস সবচাইতে আগে করা দরকার। দেহ সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। বাহু হবে শক্তপোক্ত। কনুই ও কব্জি নাড়ানো-ঘোরানোর অভ্যাস রাখা দরকার। দু'হাতের দশটি আঙুল যাতে ভালোভাবে খেলে তা দেখতে হবে। খেলতে খেলতে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসা অভ্যাস করা উচিত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজন।

হুকুম বনাম হুতুম

প্রসিত রায়চৌধুরী

ভুতুম গড়ের হুকুম সিং
মস্ত পালোয়ান,
যবের ছাতু কেজি পাঁচেক
নিত্য তিনি খান।
মুগুর ভাজেন কুস্তি লড়েন,
গোঁফের কিবা বাহার,
রাজবাড়িতে পাহারা দেন
কোমরে তলোয়ার।
অমাবস্যার রাতে সেদিন
হুকুম হাঁকে, 'হুঁশিয়ার',
এমন সময় শুনলো হুকুম,
আপন কানে তার—
'হুহুম্ হুম্' 'হুহুম্ হুম্' বলে,
কেউ ডাকছে পিছে,
মস্ত মাথা কে যেন এক
বসে বাদাম গাছে।
'ওরে ব্বাবা', বলেই ছুটে
হুকুম পালোয়ান,
বঙ্গ, বিহার মুলুক ছেড়ে
গেলেন রাজস্থান।
আসল কথা, ছিল ডাকটা
হুতুম প্যাঁচার,
হুহুম্ হুম্ শুনে ভড়কে গিয়ে
হুকুম পগার পার।

দেশ-বিদেশ

সঞ্জীব কুমার দে

কারা ডাকে—মহাকাশে
রাতদিন ভাসি আয়?
থাকে যারা রাশিয়ায়!

কারা খুশি—মাছ-ভাত
ভাজাভুজি, চা-পানে?
যারা থাকে জাপানে!

কারা চায়—শান্তি
যুদ্ধ না, হার ওতে!
যারা থাকে ভারতে॥

ছবিঃ সুফি

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'জাদু' অনুষ্ঠান দেখতে চাও? ঠিক আছে, প্রস্তুত হও। এত বড় চমক তুমি আগে কখনও খাওনি। এত অদ্ভুত, এত রগড়ের ম্যাজিক আর কোথাও আছে কিনা, তার খবরও কেউ জানে না। এ হলো বিজ্ঞানের চূড়ান্ত। শিল্পেরও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পৃথিবীর সবকটা পণ্ডিত একত্রিত হয়ে এর অর্ধেক রহস্যেরও সমাধান করতে পারেনি। শিল্প এবং প্রযুক্তির অদ্ভুত জটিল একটা দুর্দান্ত প্রদর্শনী। কোনও কিছু আজগুবি নয়, কোনও ট্রিক-ফটোগ্রাফি নেই, নকল কিস্যু নেই। সব কিছুই শিল্পীর নিজস্ব—কিন্তু কোনও কিছুই সে নিজে বানায়নি। কেউ তাকে বানাতে শেখায়নি, তবু সে নিজে নিজেই করে চলেছে এবং সম্পূর্ণ অজান্তে। সবরকম বিজ্ঞান, বুদ্ধি খাটিয়ে এই প্রাণঢালা শিল্প দেখিয়ে চলেছে। কি, দেখতে চাও? চলে এসো তাহলে আমার সঙ্গে ঐ আলমারিটার কাছে, আয়নার সামনে গিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াও। এবার আস্তে আস্তে চোখ খোল। কি দেখতে পাচ্ছ? তোমাকে, নিজেকে!! হ্যাঁ, ঠিকই দেখছো.....তুমিই হচ্ছো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাজিক। তোমার মধ্যেই চলছে সেই সেরা অনুষ্ঠান। তোমার শরীরের ভেতরে যে এত কলকব্জা এবং তাদের এত কাণ্ড-কারখানা চলেছে যে সেটা তুমি কেন, পৃথিবীর সবকটা বৈজ্ঞানিক মিলেও তার সমাধান করতে পারবে না। মানুষের শরীরের মধ্যে যে পরিমাণ রহস্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি ঠাসা রয়েছে—তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। কিন্তু দেখো, কি অদ্ভুত ব্যাপার, এই জট পাকানো সূক্ষ্ম হিসেবের কাণ্ড-কারখানা সমেত শরীরটাকে নিয়ে আমরা কি নির্বিবাদে, নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াই। খেয়ালই করি না, কতো কিছু ঘটে চলেছে আমাদের মধ্যে, আমাদের অজান্তে। 'আরে, এ তো ঘটবেই' এ কথা ভেবে 'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর' বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু খেয়াল করেছো কি, আমরা কিভাবে হাত নাড়াই, চোখ কিভাবে ঘোরাই, কথা কিভাবে শুনি....কোন বোতাম বা সুইচ টিপে শরীরের কোন মেশিনটাকে কিভাবে চালু করি, তা আমরা নিজেরাই জানি না। ইচ্ছের সঙ্গে কাজের বা ওই মেশিনগুলো চালু করবার একটা সরাসরি অথচ অদৃশ্য সুইচ রয়ে গেছে। কোথায় সেই সুইচটা, জানি না। কিভাবে চালু হয় তাও জানি না। তবে এটুকু জানি, শরীরটা আমার, ভেতরের যন্ত্রগুলো আমার, আমার ইচ্ছেটাও আমার....কিন্তু আমি কিভাবে এর মালিক হলাম, কি কাজের জন্য হলাম, তার কিচ্ছু জানা নেই। কত বড় বড় মেশিন তো আমরা বানিয়েছি। কতো রকেট, প্লেন, ট্যাঙ্ক বানিয়েছি। ওরা কিন্তু নিজেরা ভেবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে পারে না। নিজের ভালো-মন্দ, আপদ-বিপদ বুঝতে পারে না। কাউকে দিয়ে চালিত হতে হয়। অর্থাৎ আমাদের বোতাম টিপে দিতে হয়। কিন্তু আমাদের শরীর নামক মেশিনটায়? ইস্, ভাবতেও অবাক লাগে, কি জট পাকানো জিনিস রে বাবা! কোথাও কোনও বোতাম, সুইচ নেই, কিছু টেপাটিপি করতে হয় না। ইচ্ছে করলেই সেটা ঘটছে। চুলকোতে ইচ্ছে করলে চুলকোচ্ছি, নড়তে ইচ্ছে করলে নড়ছি। ইত্যাদি, ইত্যাদি কতো কিছু।

ইচ্ছের সঙ্গে কাজের এই যে অদ্ভুত যোগাযোগ, তা কিন্তু আবার সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। এখানেই এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের তফাৎ। ফ্যাক্টরির সব গাড়িই কি এক? একসঙ্গে রেস-এ নামালে ঐ মডেলের সবকটা গাড়িই কি ফার্স্ট হবে? মোটেই না। চালনা, পরিচালনার ওপর নির্ভর করছে। এই চালনা বা পরিচালনাটাই হচ্ছে আসল। আমরা সব সময়েই কিছু না কিছু শিখছি। গোড়ায় একদম কিছু জানতাম না। ইচ্ছেটাকে কাজে লাগাতেও শিখিনি। জন্মের পর শিশু তার ইচ্ছেমতো হাত-পা চালনা করতে পারে কি? কিছু একটা ধরতে তাকে অনেক মেহনৎ করতে হয়েছে। এভাবে তার দৃষ্টি স্থির হয়েছে, হাত-পা পরিচালনা করবার দক্ষতা অর্জন করেছে। ব্যালেন্স করে দু'পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। দৌড়তে শিখেছে। কথা শিখেছে। কলম ধরতে শিখেছে। এভাবে শিখতে শিখতে সে দক্ষতা অর্জন করেছে। এই দক্ষতার তারতম্যের জন্যই বিভিন্ন মানুষের ক্ষমতাও আলাদা আলাদা হয়েছে। আমরা এখনও শিখে চলেছি, এই শেখার কোনও শেষ নেই। বুদ্ধি এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে আমরা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি।

'ইন্দ্রজাল' কথাটার মানে কি জানো? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ওপর প্রভাব বা 'জাল' বিস্তার করাকেই 'ইন্দ্রজাল' বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় মানে? চোখে দেখা, কানে শোনা, নাকে শোঁকা, জিবে স্বাদ পাওয়া এবং স্পর্শ করে বোঝা—এই পাঁচটা অনুভূতির মাধ্যমে আমরা আমাদের চারদিকের সব কিছুকে অনুধাবন করি। এই পাঁচটার বাইরেও নাকি আরও ইন্দ্রিয় আছে। এই যেমন ধরো, কাইনেসথেটিক সেন্স, এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন্স ইত্যাদি। কাইনেসথেটিক সেন্স হচ্ছে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কোনও

কিছুর অবস্থিতি বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা, আর এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন্স তো পুরোপুরিই অলৌকিক গোষ্ঠীর ব্যাপার। বিজ্ঞান এখন এ নিয়ে গভীর গবেষণা চালাচ্ছে।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু ম্যাজিক আজ আমি তোমাদের শেখাবো। সবই হচ্ছে শরীরের ম্যাজিক। এসব ম্যাজিক আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই গেঁথে আছে। কিন্তু আমরা ঠিক মতো নজর করে দেখিনি বলে অজানা রয়ে গেছে। চোখের সামনে আনতেই ম্যাজিক বলে মনে হচ্ছে। ম্যাজিক তো লোকে দেখে, সুতরাং ম্যাজিকের জগতে চোখের স্থান সবচেয়ে ওপরে। চোখ হচ্ছে আমাদের শরীরের 'মুভি ক্যামেরা'। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ছবি তুলে, ক্লোজড্ সার্কিট টিভির মতো আমাদের মস্তিষ্কে খবর পাঠাচ্ছে। মস্তিষ্ক সেটাকে যাচাই করে, পুরনো ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে দেখে, ব্যাপারটা কি! সুতরাং ক্যামেরা বা চোখের ফ্রেমের মধ্যে না থাকলে আমাদের মাথায় ছবিটা দেখা দেবে না। তখন তাকে বুঝতে আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ এবং পূর্বতন অভিজ্ঞতার সাহায্য নিই। এভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, যে-যার মতো ভাবে সাহায্য করে চারপাশের জিনিসকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের চোখ আবার দুটো। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো ক্যামেরার ছবি মস্তিষ্কে যাচ্ছে। দুটো আলাদা ক্যামেরার ছবি কখনও এক হতে পারে না। দৃষ্টিকোণ সামান্য হলেও আলাদা; সুতরাং ছবি তো আলাদা হবেই। এই দু'রকম ছবি একত্রিত করে আমাদের মস্তিষ্ক একটা 3D চেহারা তৈরি করে নেয়। এ যেন দু'চোখে দেখা দুটো ছবির গড়ে তৈরি একটা আকৃতি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নিজের বাঁ হাতটাকে সামনের দিকে টান টান করে ধরে বুড়ো আঙুলটাকে খাড়া করে রাখো। এবার বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকাও এবং হাতটাকে ডান দিক বাঁ দিক সরিয়ে দূরের কোনও একটা বস্তুকে ঐ বুড়ো আঙুলটা দিয়ে আড়াল করো। ধরা যাক, বুড়ো আঙুলটা দিয়ে দূরে দেওয়ালের 'সুইচ'টা আড়াল করা হয়েছে। এভাবে স্থির হয়ে থাকো। হাত, মাথা নেড়ো না। এবার ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখ খোল। কি দেখছো? বুড়ো আঙুল কি ঐ সুইচটাকে আড়াল করে আছে? মোটেই না। হাত নাড়াওনি, তবুও বুড়ো আঙুলটা কেমন চট্ করে ডান দিকে সরে গেছে। এবার দু'চোখ খুলে একসঙ্গে বুড়ো আঙুলটাকে দেখো, আর দূরের ঐ সুইচটাকে খেয়াল করো। অবাক ব্যাপার! দূরে দুটো সুইচ মনে হচ্ছে। এবার ঐ একই পজিশনে থেকে, দু'চোখ দিয়েই ঐ দূরের সুইচটার দিকে তাকাও এবং সেদিকে তাকিয়েই বুড়ো আঙুলটাকে খেয়াল করো। ও মা! দুটো বুড়ো আঙুল দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, দু'চোখে আমরা কতো এলোমেলো দেখে থাকি। নেহাৎ অতটা খেয়াল করি না, নইলে নিজের চোখকে আমরা আর অতটা বিশ্বাস করতাম না।

দু'চোখে দেখা দু'রকম দৃষ্টিকোণের এই রহস্যকে ব্যবহার করে বহু মজার ম্যাজিক দেখানো যায়। একটা তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা হলো হাত ফুটো করে দেখার ম্যাজিক। আমার অনুষ্ঠানে তোমরা একটা ম্যাজিকে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো একটা মেয়ে আমাকে ভেদ করে ফুঁড়ে এপার-ওপার হয়। আমার পেটের মধ্যে একটা বিরাট ফুটো দেখা যায়। এটা ঠিক তেমনি মজার একটা ম্যাজিক। তবে হ্যাঁ, দুটোর কৌশল মোটেই এক নয়, তবে দেখে মনে হবে একই রকম মজার এবং ঐ ম্যাজিকটারই একটা ছোট সংস্করণ।

একটা ফুলস্কেপ কাগজ বা মোটামুটি ঐ সাইজের একটা খবরের

কাগজ নিয়ে পাকিয়ে একটা সরু পাইপ বা চোঙা বানাও। তার দু'দিকে দুটো রবার ব্যান্ড আটকে দাও যাতে কাগজটা খুলে না যায়। চোঙাটাকে ডান হাত দিয়ে ধরে ডান চোখের সামনে লাগিয়ে তার ভেতর দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকো। ঠিক যেন দূরবীন দিয়ে দূরের কিছু দেখছো। এবার বাঁ হাতের পাতাটাকে টানটান করে মেলে আস্তে আস্তে করে বাঁ চোখের দৃষ্টিপথে, চোঙাটা ঘেঁষে রাখো। ডান চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু বাঁ চোখের ছবি আসছে না। ঐ চোঙার জন্য তার দৃষ্টি সরু হয়ে গেছে। এদিকে বাঁ চোখ কিন্তু পুরো বাঁ হাতের পাতাটাকে দেখতে পাচ্ছে। কারণ সে তো বাঁ চোখের দৃষ্টিপথে, সরাসরি টানটানভাবে রয়েছে। মস্তিষ্কে দু'চোখের দু'রকম ছবি গিয়ে পৌঁছুলো এবং বরাবরের রীতি অনুযায়ী সে দুটো ছবিকে মিশিয়ে একটা ছবি বানালো। ব্যস্, হয়ে গেল ম্যাজিক! দেখো, ঠিক যেন মনে হচ্ছে বাঁ হাতের পাতার মাঝখানটায় একটা গোল ফুটো রয়েছে এবং সেই ফুটো দিয়ে হাত ভেদ করে দেখাও যাচ্ছে। বাঁ হাতের আঙুল নাড়াচাড়া করো—দেখবে আরও অদ্ভুত লাগবে।

চোখের পর আসছে কান। এখন কানের একটা ম্যাজিক শেখাচ্ছি। চোখের মতো আমাদের কানও দুটো। তবে চোখের মতো তার অবস্থিতি পাশাপাশি নয়। মাথার ডানপাশে একটা আর বাঁ-পাশে অন্যটা অবস্থিত। ডান কানের আওতা ডান দিক, আর বাঁ-কানের আওতা বাঁ দিক। এদিকের শব্দ ওদিকের কান দিয়েও শোনা যায়; তবে ওদিকে অবস্থিত বলে একটু পরে গিয়ে তার কাছে আওয়াজটা পৌঁছায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এক সেকেন্ডের দশহাজার ভাগের পাঁচ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ০০০৫ সেকেন্ড পর অন্য পাশের কানে এ পাশের শব্দ গিয়ে পৌঁছায়। এই সামান্য পরিমাণ আগে-পিছে পৌঁছোনোর জন্যই মস্তিষ্ক জ্যামিতির অঙ্ক কষে

কোত্থেকে আওয়াজটা আসছে বা শব্দের উৎসটা বুঝে নেয়। নাক বরাবর সামনে থেকে আওয়াজ এলে দু'কানে একই সঙ্গে পৌঁছায়। তখন মস্তিষ্ক ঐ জ্যামিতিটা করতে পারে না। তখন খেয়াল করে দেখবে, যদি চোখ বন্ধ থাকে, তখন মানুষ একটা কান এগিয়ে দিয়ে ডান কান আর বাঁ কানের দূরত্বটাকে বাড়িয়ে-কমিয়ে উৎসটা যাচাই করবার চেষ্টা করে।

মায়াবী মারীচ হচ্ছেন রামায়ণের জাদুকর। স্বর্ণমৃগ সেজে রাম-সীতা-লক্ষ্মণকেও কেমন ধোঁকা খাইয়ে দিয়েছিলেন। আর তারপর 'ভাই লক্ষ্মণ বাঁচাও' বলে কেমন ভেন্ট্রিলোকুইজম্ বা স্বরক্ষেপণের ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন। ব্যস্, তাতেই শুরু হয়েছিল রামায়ণের প্রকৃত গল্প। সুতরাং বুঝতেই পারছো কানের ম্যাজিক কত বড় কাণ্ডই না বাধাতে পারে! মানুষ চোখের পরেই কানকে বিশ্বাস করে। "সে যে চোখে দেখা, কানে শোনা, সে কি ভোলা যায়?"

যাই হোক, একটা কানের ম্যাজিক শেখাচ্ছি। একটা হাতঘড়ি আর একটা চশমা নাও। দর্শককে একটা চেয়ারে বসিয়ে বলো তুমি তোমার এক হাতে ঐ ঘড়ি আর অন্য হাতে ঐ চশমাটা ধরে থাকবে। কোন হাতে কোনটা থাকবে তা কিন্তু তাকে বলা হবে না। তুমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কানের দু'পাশে হাত দুটো আনবে। না দেখে তাকে বলতে হবে কোন হাতে ঘড়ি আর কোন হাতে চশমাটা রয়েছে। এতে ম্যাজিকটা হলো, দর্শক সব সময়েই ভুল করে চশমার হাতে ঘড়ি আছে বলবে।

এর কৌশলটা কিন্তু ভীষণ সহজ। চশমাটা যে হাতে ধরেছো সেই হাতের মাঝের আঙুল আর বুড়ো আঙুলের নখ দুটো পরস্পর খুঁটে টিক্ টিক্ আওয়াজ করো। তালে তালে ঐ টিক্ টিক্ আওয়াজ কানের সামনে করলে মনে হবে ঘড়িটা কানের সামনে রয়েছে। অন্য হাতের ঘড়িটা অন্য কান থেকে একটু দূরে রেখো—যাতে তার আওয়াজটা ঐ কানে না যায়। নখের ঐ টিক্ টিক্ আওয়াজ পেয়ে কান সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ককে খবর দেবে....এই দিকে দেখা না গেলেও টিক্ টিক্ আওয়াজ বা ঘড়ির একটা ক্লু পাওয়া গেছে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ভুল ডিসিশন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে সব সময়েই ঐ নখের আওয়াজের দিকে বা চশমার দিকে ঘড়ি আছে বলে রায় দেবে।

এবারে আসছে 'গন্ধ' শোঁকার ম্যাজিক। চোখ, কানের পর আসছে নাকের পালা। এই কৌশলটার নাম দিয়েছি আমি গন্ধ বিচার। জাদুকর এক বাক্স তাস নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দর্শককে বললেন ঐ প্যাকেটটাকে একটা চাঁটি মারতে। কারণ, তাঁর চাঁটি মারার পদ্ধতিটা কেমন, তা নাকি জাদুকরের জানা প্রয়োজন। যাই হোক, দর্শক চাঁটি মারলেন—এবং জাদুকর সেটা খেয়াল করে কি যেন একটা হিসেব করলেন। এবার তিনি ঐ বাক্স থেকে তাসগুলো বের করে এনে অন্য একজন দর্শককে বললেন তার থেকে যে কোনও চারটে তাস বেছে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখতে—এবং সেই চারটে তাসের যে কোনও একটাকে, ঐ প্রথম দর্শক যেন আবার ঠিক আগের মতো করেই চাঁটি মারেন। পুরো কাজটাই করতে হবে জাদুকরের চোখের আড়ালে। জাদুকর মুখ ফিরিয়ে রইলেন। দ্বিতীয় দর্শক তাঁর ইচ্ছে মতো চারটে তাস টেবিলে রাখলেন। প্রথম দর্শক তার একটাকে চাঁটি মারলেন। এবার জাদুকর সামনে ফিরলেন। তাস চারটেকে এক এক করে হাতে নিয়ে কপালে ঠুকে কি যেন একটা হিসেব করলেন। আর তারপর সঠিকভাবে বলে দিলেন—কোন তাসটাকে প্রথম দর্শক চাঁটি মেরেছিলেন। সবাই তো অবাক!

কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি। পুরোটাই হচ্ছে গন্ধ চুরির মামলা

দুটি ছড়া

আশিস সান্যাল

॥ এক ॥

তিন বাঁদরে রান্নাঘরে
করেছে আজ হামলা,
সব রেখে মা সরান শুধু
দুধভরা এক গামলা।

খুন্তি-হাতায় তিনটি বাঁদর
দিব্যি করে রান্না,
মায়ের চোখে খুশির ঢেউ—
ইতার চোখে কান্না।

কাঁদিসনে আর লক্ষ্মী সোনা,
পড়ায় এবার মন দে,
গামলা ভরা দুধ রয়েছে
ঘর ভরেছে গন্ধে।

॥ দুই ॥

ঝিক্‌মিক্ রোদ আর
নিঝ্‌ঝুম্ আঁধারে,
জামরুল ঝুলে আছে
ধব্‌ধবে সাদা-রে।

খাই খাই করো শুধু,
খেতে কিছু চাও না,
জামরুল পেরে দেবো—
কয়েকটা খাও না!

সর্বভুক

শিবায়ন ঘোষ

আচ্ছা দাদা, বলুন দেখি, সর্বভুকে কী খান?
ঝাঁজরি-কড়া বেড়ি-হাতা, পান্তাভাতে ঘি খান?
তিল বা তিসি, দিশি-আমড়া, টক মিষ্টি নোনতা?
কুড়ুল কোদাল খান নাকি হে? খুন্তি ছাতা খোন্তা?
নাগরা জুতো ঘুড়ির সুতো ভুতোডয়রা গাছ?
কাঠ-পেনসিল নোড়া ও শিল গেলাস-বাটি-কাচ?
পানের বোঁটা, গোরুর খোঁটা, হুতমো-মোটা খান কি?
পেট চোঁ-চোঁ করলে কি খান বেলচা এবং শানকি?
শানকি মানে, শানকি-থালা, লোহার-বালা, চুড়ি?
পেট কিড়মিড় করলে কি খান পাথর গোটা-কুড়ি?
ভিরমি কি খান রোজ সকালে? রোজ বিকেলে খাবি?
সন্ধ্যেবেলা গরম গরম খান কি তালা চাবি?
লেঙ্গি কি খান, সেইসঙ্গে টিয়েপাখির ঝোল?
খচমচিয়ে খান চিবিয়ে চারটে বুনো-ওল?
হাবিজাবি হুঁকো-হুঁড়কো, কাঠ-কয়লা, ঘেঁস?
তবে তো ভাই, বলতে হবে মজায় আছেন বেশ!
তবে তো ভাই বলতে হবে আছেন তিনি খুশ,
তাঁর জন্যে ট্রেনভর্তি আনুন লেবেনচুস।
বলতে বলতে দেখছি চেয়ে অবাক সে-এক কাণ্ড,
হাসিমুখেই চুষে খেলেন চারটে লোহার ভাণ্ড!!

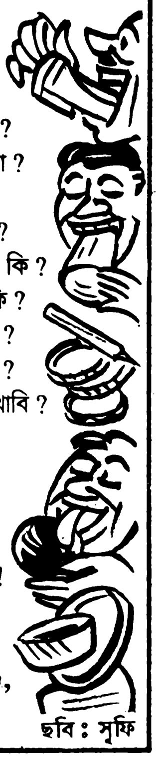

ছবি: সূফি

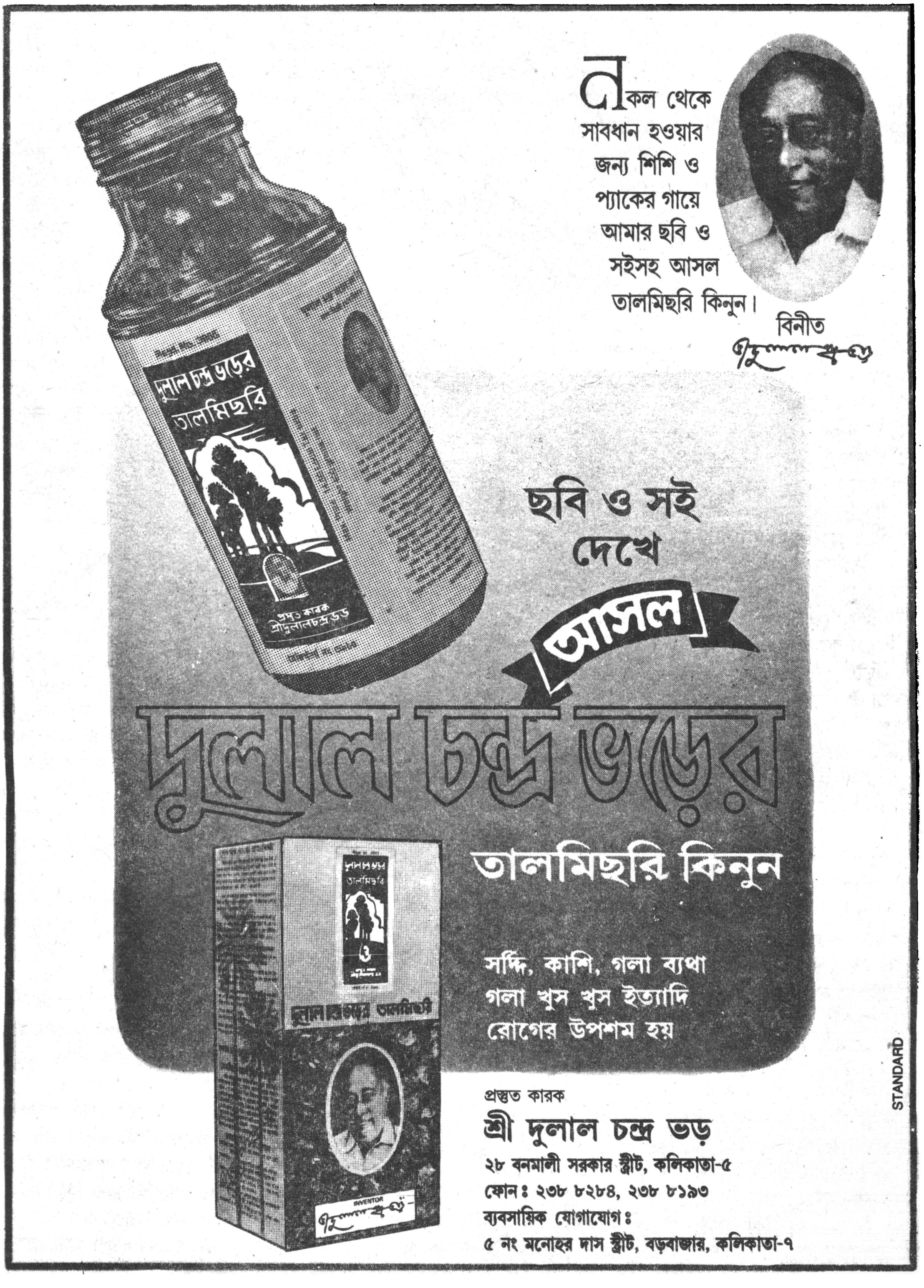
নকল থেকে
সাবধান হওয়ার
জন্য শিশি ও
প্যাকের গায়ে
আমার ছবি ও
সইসহ আসল
তালমিছরি কিনুন।
বিনীত
ছবি ও সই
দেখে
আসল
দুলাল চন্দ্র ভড়ের
তালমিছরি কিনুন
সর্দ্দি, কাশি, গলা ব্যথা
গলা খুস খুস ইত্যাদি
রোগের উপশম হয়
প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়
২৮ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোনঃ ২৩৮ ৮২৮৪, ২৩৮ ৮১৯৩
ব্যবসায়িক যোগাযোগঃ
৫ নং মনোহর দাস স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা-৭
STANDARD

এবং তারপর গন্ধ বিচার। এক প্যাকেট নতুন তাস হলে ভাল হয়। খাপটাকে ভাল করে মুছে, শুধুমাত্র তার ওপরের পিঠে তুলোয় করে একটু আতর ঘষে রাখো। নিজে হাতে না লাগিয়ে তোমার সহকারীকে দিয়ে লাগিও। তাহলে তোমার হাতে একটুও গন্ধ থাকবে না। ব্যস্‌, এই হলো এর গোপন প্রস্তুতি। ভেতরের তাসগুলোতে বা প্যাকেটের পাশের দিকে খবরদার আতর লাগিও না। প্রথম দর্শক যখন প্যাকেটের ওপর চাঁটি মারবেন তখন তাঁর হাতে ঐ আতর লেগে যাবে। প্যাকেটটাকে তুমি পাশাপাশি দিকে ধরে, ভেতরের তাসগুলোকে বের করে এনে দ্বিতীয় দর্শককে দাও। তিনি যে চারটে তাসই পছন্দ করুন না কেন, তাতে কোনও গন্ধ নেই; কিন্তু প্রথম দর্শক যখন তার একটাতে চাঁটি মারবেন তখন তাঁর হাতের আতর সেই তাসে লেগে যাবে। এবার তুমি সামনে ফিরে একটা একটা করে তাস তুলে কপালে ঠুকবার অছিলায় গন্ধ শুঁকে বুঝে নাও কোনটা থেকে ঐ আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। কি, সহজ নয় কি?

এবারে আসছে স্বাদের ম্যাজিক। স্বাদের আবার ম্যাজিক হয় না কি? হয় না মানে? আলবৎ হয়। একটা মজার সুস্বাদু ম্যাজিক শেখাচ্ছি।

চারটে গ্লাসে জল নাও। তাতে নম্বর দাও। এক নম্বর গ্লাসের জলে বেশ পরিমাণ চিনি মিশিয়ে দাও। দু'নম্বর গ্লাসে মেশাও নুন। তিন নম্বর গ্লাসে বেশ খানিকটা তেঁতুলের রস বা টারটারিক অ্যাসিড। সবার শেষে চার নম্বর গ্লাসে রাখো কলের পরিষ্কার জল। কাউকে কিছু বলো না, কোনটায় কি আছে।

দর্শকদের একজন কাউকে বলো, এক নম্বর গ্লাস থেকে মুখে কিছুটা নিয়ে কিছুক্ষণ কুলি করে বাইরে ফেলে দিতে। তারপর একটা কাগজে লিখতে বলো স্বাদটা কি। তিনি লিখবেন 'মিষ্টি'। তারপর তাঁকে চট্‌ করে চার নম্বর গ্লাস থেকে কিছুটা মুখে নিয়ে কুলি করে স্বাদটা লিখতে বলো। অবাক ব্যাপার! তিনি লিখবেন নোনতা। এবার তাঁকে তিন নম্বর গ্লাসের তেঁতুলের রস মুখে নিয়ে কুলি করতে বলো। স্বাদটা স্বাভাবিকভাবেই লাগবে টক। কিন্তু এবার চট্‌ করে তাঁকে আবার ঐ চার নম্বরের জল দিলে—তিনি স্বাদ নিয়ে বলবেন 'মিষ্টি'। একই জল একবার নোনতা, একবার মিষ্টি লাগছে, ম্যাজিক নয় কি?

আসলে আমাদের জিবে স্বাদ নেবার যে গ্রন্থি আছে, সেগুলো যদি কোনও একটা কড়া স্বাদ অনেকক্ষণ ধরে নেয়, তাহলে সে ঐ স্বাদের সঙ্গে ধাতস্থ করে নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। ঐ অবস্থায় কলের স্বাদবিহীন জলকে অনেক বেশি বিপরীত স্বাদের বলে তো মনে হবেই। ঐ বিপরীত স্বাদকেই মস্তিষ্ক একবার নোনতা আর অন্যবার মিষ্টি বলে জানিয়েছে।

স্বাদের আর একটা এক্সপেরিমেন্টাল ম্যাজিক শেখাচ্ছি। দুটো কৌটোর একটাতে আছে চিনি, আর অন্যটাতে নুন। বাইরে লেবেলে কিন্তু উল্টো লেখা আছে। চিনির কৌটোতে লেখা আছে 'নুন', আর নুনের কৌটোতে লেখা আছে 'চিনি'। যে দর্শকের ওপর এক্সপেরিমেন্টটা করবে তাঁকে কিন্তু একথা জানিও না। বরঞ্চ দুটো চামচে একটা একটা দানা স্যাম্পেল খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করো নুন এবং চিনির স্বাদের তফাৎটা তিনি বুঝতে পারছেন কি না। তিনি বললেন, হ্যাঁ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এবার তাঁর জিবটাকে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে, ওঁকে দেখিয়েই 'চিনি' লেখা কৌটো থেকে নুন নিয়ে জিবে ছোঁয়াও। দেখবে, অবাক ব্যাপার! তিনি বলছেন 'মিষ্টি'। এবার উল্টোটা করো। জিবটা আবার ভাল করে মুছে শুকনো করে নিয়ে ওঁকে দেখিয়েই 'নুন' লেখা কৌটোটা থেকে চিনি তুলে তাঁর জিবে ছোঁয়াও। দেখবে, তিনি বলছেন—'নোনতা'।

আসলে জিব শুকনো থাকলে আমরা কোনও স্বাদই বুঝতে পারি না। জিবের থেকে লালা বেরিয়ে রসিয়ে ভিজিয়ে দিলে তবেই আমরা স্বাদ পাই। শুকনো জিবে চিনি ছোঁয়ালে সে স্বাদ নিতে পারছে না—কিন্তু চোখে দেখেছে কৌটোয় লেখা আছে 'নুন'। সেজন্য সে লেখাপড়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, আন্দাজের সঙ্গে যুক্তির জোড়াতালি দিয়ে নোনতা বলেছে। একই ভাবে নুনের স্বাদ পেয়েও 'চিনি' লেখা দেখে, কল্পনা করে নিয়েছে স্বাদটা মিষ্টি।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম ইন্দ্রিয় হচ্ছে স্পর্শের ম্যাজিক। সবার শেষে আমি ঐ স্পর্শের ম্যাজিক শেখাচ্ছি। স্পর্শ দিয়ে অনেক মজার ম্যাজিক হয়। এখন একটা শেখাচ্ছি, পরে সময় মতো আরও শেখাবো।

একটা কাঁটা-চামচ আর একটা বড় চামচ নাও। দর্শককে বলো, তাঁর হাতের বাহুর ভেতরের দিকে (পাতায় বা কব্জিতে নয়) তুমি ঐ কাঁটাটা বা চামচটা দিয়ে স্পর্শ করবে। দর্শককে না দেখে, ঐ স্পর্শ থেকেই বলতে হবে, কাঁটা নাকি চামচ, কি দিয়ে স্পর্শ করা হয়েছে। অবাক ব্যাপার, তুমি যতবারই ঐ কাঁটার তীক্ষ্ণ দিক দিয়ে তাঁর হাতে স্পর্শ করো না কেন, তিনি বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বলছেন তুমি নাকি চামচ দিয়েই স্পর্শ করছো। এবারে তুমি কাঁটা এবং চামচ, দুটো একই সঙ্গে, আধ ইঞ্চি ফাঁকে ধরে, দুটো দিয়েই স্পর্শ করো। দেখবে, তিনি তখনও বলছেন—ওখানে একটা চামচ রয়েছে। স্পর্শ করা অবস্থায় ওঁকে দেখতে বলো, দেখবে, উনি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করছেন না।

আসলে স্পর্শ দিয়ে চেনা বা গোনায় একটা ট্রেনিং-এর প্রয়োজন থাকে। আমরা যখন কোনও কিছুকে স্পর্শ করে অনুভব করতে চাই তখন সাধারণত হাতের পাতা, বিশেষ করে আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করি। এভাবে স্পর্শ করে করে হাতের পাতা, আঙুলের ডগা—এরা ওস্তাদ হয়ে গেছে। সেজন্য, অন্ধকারে আমরা যখন হাতড়াই তখন সামনে হাত এগিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে সামনের জিনিসকে বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা কিন্তু কনুইটাকে ভাঁজ করে সামনে এগিয়ে দিই না। কারণ কনুই এ কাজে অভ্যস্ত নয়, তার যাচাই করার ট্রেনিং নেই। সেভাবে নার্ভের বিস্তারও নেই। আঙুলের ডগায় নার্ভের বিস্তার খুব ঘন এবং জটিল। বাহুর ভেতরের পিঠেও ট্রেনিং নেই, নার্ভের বিস্তারও কম। সেজন্য সে গুনতে শেখেনি। ভোঁতা বুদ্ধি দিয়ে কাঁটাচামচের অতগুলো তীক্ষ্ণ খোঁচকে হরে-দরে-গড়ে একটা 'চাপ' হিসেবে বুঝে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠিয়েছে। মস্তিষ্ক ভুল বুঝে রায় দিয়েছে। আর ব্যস্‌....ঘটে গেছে ম্যাজিক। সত্যির সঙ্গে মিথ্যের বিনুনি গাঁথা।

তোমরা এই ম্যাজিকটা দেশলাই-এর কাঠি দিয়েও দেখাতে পারো। দুটো কাঠিকে দেড় সেন্টিমিটারের মতো ফাঁক করে ধরে দর্শকের বাহু (অথবা পিঠে) একসঙ্গে স্পর্শ করো, দেখবে তিনি বলছেন তুমি একটা কাঠি ছুঁইয়েছো।

আজ এই পর্যন্ত থাক। ইন্দ্রজালের শেষ নেই। অফুরন্ত এর ভাণ্ডার। গভীর এর আলোচনা। মানুষ নিজেই একটা ম্যাজিক। সে যখন ম্যাজিক দেখায় তখন সেটা হয়ে যায় ম্যাজিকের ম্যাজিক। ইচ্ছে আছে, আরও অনেক মজার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। তোমরাও চিন্তা করতে শুরু করো। দেখো আরও অনেক মজার জিনিস খুঁজে পাবে। দারুণ মজা হবে।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

যেমন খুশীর পুজোর ছুটি
মজায় মজায় লুটোপুটি,
এক সাথে যেই সবাই জুটি
হাসির মজায় মেতে উঠি।
ছুটি
শালিমার
নারকোল তেল
শৈশবের সরল হাসির মতো শুদ্ধ
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, ৯২ই আলিপুর রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০২৭

Registration No. W.B./E.C.-60 September '97 "Suktara"

...তোমার কিছু দেব বলে...চায় যে আমার মন...নাই বা তোমার থাকলো প্রয়োজন...

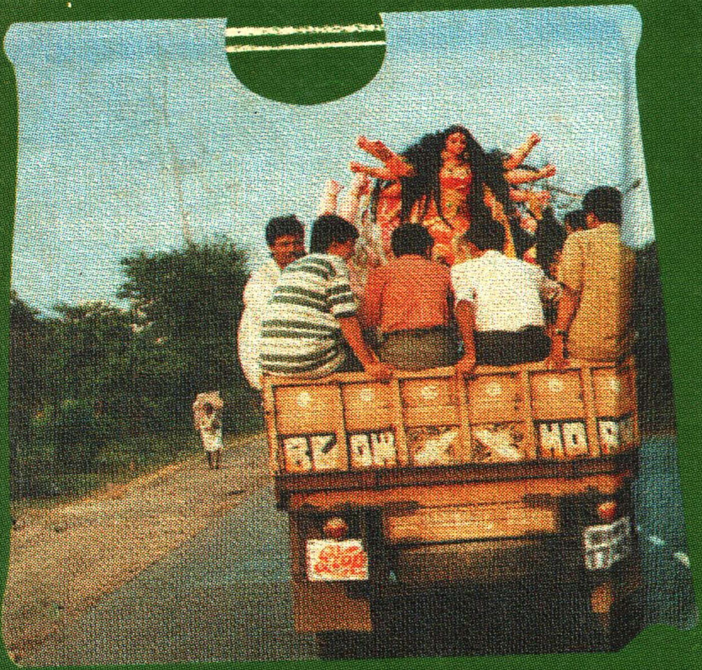

উৎসবের ছোঁয়া লাগুক সবার প্রাণে!

শারদ শুভেচ্ছা • বঙ্গজীবনের অঙ্গ • বোরোলীন